সূচীপত্র

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
অক্ষরের উৎপত্তি ...	৭২
অক্ষরের প্রকৃতি ও স্বরবর্ণোচ্চারণ	১৮৮
অপরাহ্ন	৮৩
অপূর্ব্ব মিলন	২১২
অপ্রত্যাশা	৪৭৭
অবশেষ	৪২২
অযোধ্যা	৩৩২
অসময়ে	৫৪০
আনন্দমঠ ও স্বদেশপ্রেম ...	৯৯
আনন্দরূপ	৪৮৩
আবরণ	২১৩
আসেসার	২৭৭
কংগ্রেসী কথা	৩৭৭
কাব্যের প্রকাশ ...	১৭৮
কৈকেয়ী	৫৪১
খেয়া	৮৯
চা-পান	৬৮
ছাত্রদিগের অভিভাষণ ...	৮৪
জাতীয় বিদ্যালয় ...	২৬১
জাপান	৪৬৯
জিজ্ঞাসা	৬৪
জিজ্ঞাসায় নিবেদন ...	১৩৪
জীর্ণতরী	৪২
জ্যোৎস্নারাত্রি	৯১
ততঃ কিম্	৪০০
তান-নগ্ন ...	২০৭

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
তীর্থদর্শন	৫০৯
দুর্ভিক্ষপীড়িত ভারতে ...	৬৫, ৯৩, ১২৫, ১৯৭, ২৫০, ২৮৬, ৩৬৩
দেবনাগর এবং বঙ্গাক্ষরের একত্ব	১৫
দেশনায়ক	৪৯
দ্বৈতভাব	৪৬৩
ধর্ম্ম, সমাজ ও স্বাধীনচিন্তা ...	৫৯৩
নববর্ষের প্রতি... ...	৬
নাট্যকলা ও রসতত্ত্ব ...	১
নীলাম্বরী	২২৪
নেশন্ বা জাতি ...	১০৫, ১৬০
পত্রালী	১৮০
পান্থপাদপ	৪২
পাষাণদেবতা ...	৯৫
পুত্রাভিলাষ	৩০৫
পূজারী	৪২
প্রাচীন সামাজিক চিত্র ...	১৫৮, ১৮৫, ১৭৩, ২২২, ৩৫৮, ৫৩৭,
প্রাদেশিক-সমিতি ...	৫৮২
ফলের বাগান	৪৭৮
বঙ্কিমচন্দ্র ...	২০
বঙ্কিমচন্দ্র ও স্বদেশীভাব ...	২৬৯
বঙ্কিমবাবু ও স্বদেশী ইতিহাস ...	৩৬৯
বর্ত্তমানযুগের স্বাধীনচিন্তা ...	১৬৪
বাঙ্লার চিত্র	৭৬, ১৭৩
বারাণসী-অভিমুখে	৩৮৬, ৪৫৪, ৫০৯, ৫৫৩

বিষয়।	পৃষ্ঠা।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
বিশ্বসাহিত্য	৪৮৭
বৈজনাথ	১৪০
ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ	৩৫১, ৩৯১
মধুবনে সন্ধ্যা	২৫৯
মহাপুরুষ	৪৭১
মুক্তকণ্ঠ	৬১১
মৃত্যু	৫০০
মোহিতচন্দ্র সেন	১৬৫
মৌনী	৫১৬
রাষ্ট্রনীতি	৪০, ৯০, ১৩৭, ২১১, ২৪৭, ৩১৮, ৩৫৪, ৪১৯, ৫১৪, ৫৫৮, ৬০৯
রাজতপস্বিনী	৭, ২৯, ১৩১, ১৯৩, ২৫৬, ৩১১, ৩৬০, ৩৯৫, ৪৬০, ৫০৩, ৫২৯; ৫০৯
রেখাক্ষর বর্ণমালা	৩২১
শয্যাসভার বক্তৃতা	৩১৩
শান্তং শিবমদ্বৈতম্	৪২৩
শিক্ষাসমস্যা	১৪৩
শিবাজী-উৎসব	২৩৫
শিবাজী-উৎসব ও ভবানীমূর্ত্তি	২৯৬
শিল্পে ত্রিমূর্ত্তি	১৪৫
শুভবিবাহ	১০১
শেষ কথা	৪৭০
সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের বিশেষত্ব	৪৬৪
সংস্কৃতশিক্ষাপ্রণালী	১১
সঞ্চয়	৩৪৪
সদানন্দ-সুরধুনী	৫৬১
সন্ন্যাস	৩৬৮
সভ্যতার আদর্শ	২৪৩
সমাপ্তি	৪৮
সাধক	১২৪
সাহিত্য-পরিষদ্	৫৬৫
সাহিত্যসম্মিলন	৫১৭
সৌন্দর্য্যবোধ (জাতীয় শিক্ষাপরিষদের প্রথম বক্তৃতা)	৪২৮
স্বদেশীব্রত	৫৭৫
স্মরণ	৩১৭
হর্ষবর্দ্ধন	৪৪৭

বঙ্গদর্শন।

নাট্যকলা ও রসতত্ত্ব।

বাংলাদেশের বর্ত্তমান নাট্যকলার আদর্শ যে সম্যক্ উদার, কিংবা তাহার অবস্থা যে খুব উন্নত,—এমন কথা বলিতে পারি না। বঙ্গ-রঙ্গালয়ের দোষ বিস্তর,—ইহা শতবার স্বীকার করি। এ দোষক্ষালনে আমার স্বার্থ নাই, তজ্জন্য কোনো ব্যগ্রতাও নাই। কিন্তু এর জন্য দায়ী কে,—এ প্রশ্নের বিশেষ আলোচনা আবশ্যক।

আবশ্যক এইজন্য যে, আমরা নাট্যকলা বা রঙ্গালয়কে বর্জ্জন বা উপেক্ষা করিয়া বর্ত্তমান সময়ে যে আমাদের জাতীয়জীবনকে সর্ব্বতোভাবে গড়িয়া তুলিতে পারিব, ইহা একেবারেই অসম্ভব। সভ্যসমাজে নাট্যকলা ও রঙ্গমঞ্চের শক্তি প্রভূত। এ শক্তিকে শিক্ষা-সাধনা-চরিত্র-প্রভাবে নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব, কিন্তু বৈরিতা করিয়া নির্ম্মূল করা সাধ্যায়ত্ত নহে।

কারণ, নাট্যকলা ও রঙ্গালয় মানবপ্রকৃতির একটা অতি স্বাভাবিক ও গভীর অভাব পূর্ণ করিয়া থাকে। নিকৃষ্টলোকে অপকৃষ্ট আমোদ-প্রমোদের লোভে নাট্যাভিনয় দেখিতে যায়, শ্রেষ্ঠজন রসতত্ত্বের সন্ধানে রঙ্গালয়ে গমন করেন। কিন্তু উভয় শ্রেণীই প্রকৃতির তাড়নায় নাট্যকলার অনুশীলন ও রঙ্গরস আস্বাদন করিয়া থাকেন।

নাট্যকলা ও রঙ্গালয়কে বর্জ্জন করেন কেবল তাঁহারা, যাঁহারা মানবের স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি ও জীবনের সুখসম্ভোগকে সতত পাপ-সংস্পৃষ্ট ও ধর্ম্মবিরোধী বলিয়া মনে করেন। আমাদের দেশে, বর্ত্তমানে, আর এক কারণেও একদল লোকে রঙ্গালয়কে বিষবৎ বর্জ্জন করিয়া থাকেন,—এ আপত্তির বিচার অন্যত্র করা যাইবে। য়ুরোপে যাঁহারা নাট্যকলা ও রঙ্গালয়ের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নিকট আমোদপ্রমোদ ও ভোগবিলাসমাত্রেই পাপহেতু বলিয়া অনুভূত হইত।

আমাদের দেশে সন্ন্যাসের একান্ত প্রভাবের সময়েও, জীবের স্বাভাবিক ভোগবিলাসেচ্ছা কদাপি একান্ত ধর্ম্মবিগর্হিত বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। বর্ণ ও আশ্রমভেদনিবন্ধন বিভিন্ন শ্রেণী ও আশ্রমীর আদর্শ, সাধন, বিধি-নিষেধাদি বিভিন্ন ছিল সত্য; কিন্তু জীবের আনন্দ যে হীন বা হেয় বস্তু, এ ভাব কখনো প্রকাশ পায় নাই।

জীব আনন্দ চায়—ইহা জীবপ্রকৃতিরই ধর্ম্ম। কারণ আনন্দেই জীবের উৎপত্তি, আনন্দেই তাহার স্থিতি, আনন্দেই তাহার লয়।

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।

আনন্দ হইতে জীব জন্মগ্রহণ করে, জন্মিয়া জীব আনন্দেই স্থিতি করে, প্রলয়কালে আনন্দের প্রতিই ধাবিত হয় এবং আনন্দেই প্রবেশ করে।

ফলত, বিধাতা এম্‌নি করিয়া আমাদিগকে গড়িয়াছেন যে, আমাদের সর্ব্ববিধ জীবনচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে, তাহারই অবশ্যম্ভাবী ফল ও অপরিহার্য্য পরিণামরূপে, কিছু-না-কিছু আনন্দ জাগিয়া উঠে। এই আনন্দটুকু না থাকিলে সংসারচক্র নিমেষে বন্ধ হইয়া যাইত।

কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।

কে বা শারীরচেষ্টা করিত, কেই বা প্রাণধারণের জন্য প্রয়াসী হইত, যদি এই আকাশে আনন্দ না থাকিত?

জীবের আনন্দের প্রতি লোভ যেমন স্বাভাবিক, আনন্দবস্তু যাহা, তাহাও সেইরূপ অতি শুদ্ধ, অতি পবিত্র। অপবিত্র আনন্দ এ জগতে কিছুই নাই। কারণ, জীবের যে আনন্দ, তাহাও ব্রহ্মানন্দেরই অংশ।

এতস্যৈবানন্দস্য ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি।

এই যে ব্রহ্ম, ইঁহারই কণামাত্র আনন্দ পাইয়া জীবসকল আনন্দিত হয়। সেই রসস্বরূপের রসই জীবের চিত্তে ইন্দ্রিয়রস, বিষয়রস, স্নেহপ্রেমদয়াদাক্ষিণ্য প্রভৃতি মানসরস এবং পরিণামে চিদানন্দ বা ভক্তিরসরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে।

অদ্বৈতের রাজ্যে অন্য বস্তুর সত্তা অসিদ্ধ। এইজন্য বস্তু যাহা, এ বিশ্বে তাহা মূলত এক, সত্তায় অভিন্ন; আকারে ও প্রকাশে বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন দেখায় মাত্র। জড়চৈতন্যের সকল শক্তি যেমন একই ব্রহ্মশক্তি-সমুদ্ভূত, ব্রহ্মশক্তিরই অনুপ্রকাশ; সকল জ্ঞান যেমন একই অখণ্ড ব্রহ্মচৈতন্যের চিদাভাস; সেইরূপ সর্ব্ববিধ আনন্দই মূলত ও বস্তুত ব্রহ্মানন্দ,—সেই অদ্বৈতানন্দেরই উপরে বুদ্বুদের ন্যায় ভাসিয়া-উঠিয়া জীবের চিত্তকে বিমোহিত করে, এবং সেই আনন্দেই আবার বিলীন হইয়া যায়।

জীবের আনন্দমাত্রেই ব্রহ্মানন্দের অনুপ্রকাশ, এইজন্য সকল আনন্দই শুদ্ধ ও পবিত্র। কিন্তু একই মূল হইতে উৎপন্ন বলিয়া, জীবানন্দের মধ্যে যে ইতরবিশেষ বা শ্রেষ্ঠনিকৃষ্টভেদ নাই, এমন নহে। ক্ষেত্রবিশেষে, অধিকারিভেদে, সকল আনন্দই বিশুদ্ধ ও পবিত্র, কিন্তু ক্ষেত্রের ও অধিকারের শ্রেষ্ঠনিকৃষ্টভেদ বা অধিকারীর উচ্চতানীচতানিবন্ধন আনন্দেরও শ্রেষ্ঠতা-নিকৃষ্টতা বা উচ্চত্বনীচত্বের বিচার হইয়া থাকে।

যার যেই রস, তার সেই সর্ব্বোত্তম,
তটস্থ হৈয়া বিচারিলে, আছে তরতম॥

ফলত, আমরা আনন্দের সত্তাগত কোনো ভালমন্দ আছে ভাবিয়া তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠনিকৃষ্টভেদ প্রতিষ্ঠা করি না, কিন্তু কেবল যে আধারে বা যে বিষয়-অবলম্বনে আনন্দ প্রকাশিত হয়, সেই আধার ও আলম্বনের শ্রেষ্ঠতা-নিকৃষ্টতা বিচার করিয়াই এইরূপ বিভেদ কল্পনা করি।

প্রথমত জীবের মধ্যে ইতরবিশেষ,—উচ্চনীচ, শ্রেষ্ঠনিকৃষ্ট—আছে। এই বিচার অবলম্বন করিয়া, শ্রেষ্ঠজীবের যে আনন্দ, তাহাই উচ্চ ও পবিত্র, নিকৃষ্টের যে আনন্দ, তাহাই হীন ও

অধম বলিয়া থাকি। আনন্দের শ্রেষ্ঠত্ব-নিকৃষ্টতা-নির্দ্ধারণে ইহাই মূলবিধান ও সর্ব্বসম্মত আদর্শ। এই আদর্শের দ্বারা জীবের আনন্দের বিচার করিয়া, তাহার ভালমন্দ প্রতিষ্ঠা করিলে কোনোই অন্যায় হয় না। কিন্তু মানুষ সচরাচর এরূপ বিচার করে না। সে সর্ব্বদাই শ্রেষ্ঠতর জীবের উন্নত আদর্শের দ্বারা নিকৃষ্টতর জীবের হীন আনন্দের বিচার করিয়া পদে পদে ভ্রমে পতিত হয়।

উদ্ভিদের মনস্তত্ত্ব আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। কিন্তু নধরদেহ শ্যামলপল্লবশোভিত সতেজ গুল্মলতাকে দেখিয়া মনে হয়, যেন উদ্ভিদ-জীবনেও প্রকৃতি আপনার সম্যক্ সার্থকতা লাভ করিয়া অনুপম আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন। কীটপতঙ্গাদির রীতিনীতি আমরা অনেক জানি, কিন্তু তাহাদেরও মনোভাব সম্যক্‌রূপে আমাদের বুদ্ধিগোচর করা অসাধ্য না হউক, নিতান্ত দুঃসাধ্য, সন্দেহ নাই। কিন্তু নিদাঘাপরাহ্নে প্রজাপতিযুগল যখন মৃদু মলয়লহরীর সঙ্গে অঙ্গ মিলাইয়া পরস্পরের পশ্চাতে নানা রঙ্গভঙ্গে উড়িয়া বেড়ায়, তখন তারাও যে মলয়চুম্বিত রবিকরোজ্জ্বল কুসুম-রাগগন্ধচর্চ্চিত আকাশের উষ্ণ সংস্পর্শকে প্রাণ ভরিয়া সম্ভোগ করিতেছে ও অজ্ঞানত ভাগবতী লীলার অমৃততরঙ্গে ভাসিয়া পতঙ্গজীবনের পরম চরিতার্থতা অন্বেষণ করিতেছে,—এ কথায় আর অবিশ্বাস হয় না। পশুপক্ষীর আনন্দ সকলেই প্রত্যক্ষ করেন।

বিশ্বে রস এক ভিন্ন দুই নাই; একই আনন্দধারা জগতে জড়ে, উদ্ভিদে, চেতনে—সকলের মধ্যে প্রবাহিত হইতেছে। এই সকলই ব্রহ্মানন্দ,—ভাগবতী লীলার তরঙ্গ হইতে উদ্বেল হইয়া ব্রহ্মাণ্ডকে স্নিগ্ধ করিতেছে,—বিমুগ্ধ করিতেছে,—প্রত্যেক জীবকে তাহার আপনার প্রকৃতির চরম-চরিতার্থতা-দানে পরিতৃপ্ত করিতেছে। এ সকলই সত্য। কিন্তু উদ্ভিদের যে আনন্দ, তাহা তাহার পক্ষে উত্তম হইলেও, কীটপতঙ্গাদি উদ্ভিদ অপেক্ষা উন্নততর জীবের পক্ষে নিতান্তই অধম। সেইরূপ কীটপতঙ্গাদির যে আনন্দ, তাহা কীট-পতঙ্গজীবনে সর্ব্বোত্তম, কিন্তু পশুপক্ষীর নিকটে নিকৃষ্ট, সন্দেহ নাই। আবার পশুপক্ষীর পক্ষে যে আনন্দ সর্ব্বোত্তম, মনুষ্যের পক্ষে তাহা অত্যন্ত হীন ও দূষণীয় বলিয়া পরিগণিত হইবে। আনন্দতত্ত্বেও অধিকারিভেদ আছে, স্বধর্ম্মপরধর্ম্মবিচার আছে। এখানেও—

স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।

বিভিন্ন শ্রেণীর জীবের মধ্যে যেমন আনন্দের তারতম্য আছে, সেইরূপ মানুষের মধ্যেও অনেক প্রভেদ রহিয়াছে। আনন্দের সাধারণ ধর্ম্ম এই যে, প্রকৃতির চরিতার্থতা হইতেই তাহা সর্ব্বথা উৎপন্ন হইয়া থাকে। পাশব-আনন্দে পশুপ্রকৃতির চরিতার্থতা সিদ্ধ হয়, মানবীয় আনন্দে উচ্চতর মানবপ্রকৃতির চরিতার্থতা সূচিত হয়, অধ্যাত্মজীবনের নির্ম্মল ব্রহ্মানন্দে অধ্যাত্মজীবনের চরম চরিতার্থতা প্রমাণিত হইয়া থাকে। কিন্তু মানুষ সকলে সমান নহে। মানুষের প্রকৃতি বিভিন্ন। কারো বা প্রকৃতি ঘোর তামসিক,—পশুত্বের ভূমি হইতে এইমাত্র যেন মানবরাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে। সেই তামসপ্রকৃতি মনুষ্যের আনন্দ—বহির্বিষয় ও বহিরিন্দ্রিয়ের অতি সঙ্কীর্ণ সীমাতেই আবদ্ধ থাকিবে। তাহার পক্ষে তখন উন্নত-তর আনন্দের অন্বেষণ করা অসম্ভব ও অসাধ্য।

একই ব্যক্তি জীবনের সকল অবস্থায় সমভাবাপন্ন থাকে না এবং তাহার অন্তঃপ্রকৃতির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার আনন্দের ও ভোগের প্রকৃতিও পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়।

প্রকৃতির চরিতার্থতা হইতেই জীবের আনন্দ উৎপন্ন হয়। ফলত স্বরূপজ্ঞান ও স্বরূপে অবস্থিতিই জীবের সর্ব্ববিধ আনন্দের একমাত্র কারণ। অন্ন-প্রাণ-মন-বিজ্ঞান-ও-আনন্দ-বস্তুরদ্বারা আমাদের এই মানবপ্রকৃতি রচিত হইয়াছে। অন্ন আমাদের দেহের ও এই বাহ্যজগতের জড়-উপাদানের নামান্তরমাত্র। আমাদের এই অন্নময়কোষ যখন অন্নে প্রতিষ্ঠিত হয়,—শরীরের জড়ধর্ম্ম যখন জড়প্রকৃতিতে নির্ব্বিরোধ প্রতিষ্ঠা লাভ করে, কেবলমাত্র দেহধারণের যে একটা মৃদুমন্দ অথচ নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ, আমরা তখন তাহাই ভোগ করিয়া থাকি। এইজন্য কেবল দেহধারণ করাই সুস্থব্যক্তির পক্ষে পরম সুখকর ব্যাপার।

জড়ের পরে প্রাণ। কিন্তু প্রাণবস্তু যে কি, তাহা এখনো প্রগাঢ়প্রহেলিকাচ্ছন্ন। তবে প্রাণবস্তু যাহাই হউক না কেন,—আমাদের প্রাণরূপে যাহা প্রকাশিত হয়, তাহা যে একটা বিরাট্‌প্রাণতার মধ্যে সতত বিরাজ করিতেছে, আমাদের প্রাণ যে সেই বিরাট্ প্রাণসাগরের সামান্য ও আপাতবিচ্ছিন্ন তরঙ্গভঙ্গমাত্র,—দেশকালের অনিত্য বালুকাতটের দ্বারা মূল সাগরদেহ হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে এবং সমুদায় প্রাণচেষ্টার মধ্যে সতত সেই বিরাট্ প্রাণসাগরেরই অন্বেষণ করিতেছে,—এ সকল তত্ত্ব প্রায় সর্ব্ববাদিসম্মত। আমাদের প্রাণময় কোষে শুদ্ধ প্রাণনক্রিয়ানিবন্ধন নিয়ত যে সুখ, আরাম, আনন্দ ও শান্তি সম্ভোগ করি, তাহাও আমাদের অন্তরস্থ প্রাণবস্তুর আত্মসাক্ষাৎকারলাভ ও স্বরূপে অবস্থিতি হইতে উৎপন্ন হয়।

মনোময় আনন্দ ও বিজ্ঞানানন্দ—সকলই এই একই প্রণালীতে উৎপন্ন হয়। মানসিক বৃত্তিসমুদায় যখন আপন আপন বিষয় প্রাপ্ত হইয়া স্বরূপের দর্শনলাভ করে, তখনই মানসানন্দ সঞ্জাত হয়। বিজ্ঞান যখন বহুত্বের মধ্যে একত্ব ও ভেদের মধ্যে অভেদ প্রত্যক্ষ করে, এবং আপনার মধ্যে ও আপনার অতীতে যে নিত্যশুদ্ধবুদ্ধ সাক্ষিচৈতন্য প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সমস্ত পরিণাম ও পরিবর্ত্তনকে সম্ভব করিতেছেন, তাঁহাকে উপলব্ধি করে, তখনই প্রকৃত বিজ্ঞানানন্দ লাভ হইয়া থাকে। তার উপরে, জীব যখন আনন্দময় কোষের অতীত যে আনন্দময় পুরুষ, আপনার আনন্দে তাঁহারই প্রকাশ প্রত্যক্ষ করিয়া আত্মারাম হয়, তখনই তাহার পরমানন্দলাভ ঘটে। সেই আনন্দও, জীবাত্মার আপনার অন্তরস্থ যে আনন্দবস্তু, তাহারই সঙ্গে যোগ ও তাহাতে অবস্থিতি হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

এইরূপে আনন্দের ইতরবিশেষ,—শ্রেষ্ঠনিকৃষ্টভেদ আছে সত্য; কিন্তু আনন্দমাত্রেই মূলত ব্রহ্মানন্দ ও তজ্জন্য প্রত্যেক অধিকারীর পক্ষে তাহার আপনার আনন্দ যে সর্ব্বোত্তম, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।

মানুষ আনন্দ চায়। ধর্ম্মে সে আনন্দ অন্বেষণ করে; কর্ম্মে সে আনন্দ অন্বেষণ করে; পুণ্যে সে আনন্দ অন্বেষণ করে; পাপেও সে সেই আনন্দই অন্বেষণ করে। কিন্তু ললিতকলানুশীলনে সে আনন্দের জন্যই

আনন্দকে খুঁজিয়া বেড়ায়। এখানে আনন্দই উপায়, আনন্দই উদ্দেশ্য।

আনন্দমাত্রেই রসাত্মক। রস হইতেই আনন্দ উৎপন্ন হয়। রসো বৈ সঃ—সেই পরমাত্মা রসস্বরূপ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি—এই রসস্বরূপ পরমাত্মার রস প্রাপ্ত হইয়াই জীব আনন্দী হয়। রসই এইজন্য আনন্দের স্বরূপ। ললিতকলা রসের উপর প্রতিষ্ঠিত। কাব্য, সঙ্গীত, চিত্র, ভাস্করবিদ্যা, নাট্যকলা, এই সকলই রসশাস্ত্রান্তর্গত। এই সকলেই আমরা রসের জন্য রসের, আনন্দের জন্য আনন্দের অন্বেষণ করিয়া থাকি।

জীবনের সর্ব্ববিধ স্বাভাবিক চেষ্টাতেই আনন্দ স্ফুরিত হয় সত্য; কিন্তু আহার-নিদ্রাদি শারীরচেষ্টাই হউক, অধ্যয়ন-অধ্যাপনাদি মানসচেষ্টাই হউক, কিংবা সন্ধ্যাবন্দনাদি ধর্ম্মকর্ম্মই হউক,—এই সমুদায়ের আনন্দ লক্ষ্য নহে, উপলক্ষ্যও নহে, অবান্তর ফলমাত্র। কিন্তু ললিতকলানুশীলনে আমরা আনন্দের জন্য আনন্দের অন্বেষণ করি। এখানে আনন্দ আমাদের লক্ষ্য, আর যাহা-কিছু তাহা উপ-লক্ষ্যও নয়, ফলমাত্র।

ললিতকলানুশীলনে জীবন উন্নত হয়, চরিত্র স্বল্পবিস্তর বিশোধিত হয়। সকল সাধনায় যেমন, তেমনি এ ক্ষেত্রেও শমদমাদি-অভ্যাস ব্যতিরেকে সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা নাই বলিয়া, স্বল্পবিস্তর এ সকলও অভ্যাস করিতে হয়; নতুবা কাব্য বা সঙ্গীত বা চিত্র বা নাট্যাভিনয়ে সফলকাম হওয়া যায় না। কিন্তু উন্নতি বা সাধনসম্পত্তিলাভ ললিতকলার উদ্দেশ্য নহে, কেবল আনন্দই তাহার একমাত্র লক্ষ্য।

অতএব সর্ব্ববিধললিতকলানুশীলনে এই লক্ষ্য ধরিয়া চলিতে হইবে। কাব্য, সঙ্গীত, নাট্যাভিনয়, চিত্রবিদ্যা, ভাস্কর্য্য, এ সকলই আপনাতে আপনি বিভোর হইয়া থাকিবে। ফলাফলনিরপেক্ষ হইয়া ও অপর সর্ব্বপ্রকারের চিন্তা ও বিচার বর্জ্জন করিয়া, শুদ্ধ আপনার অন্তরস্থ রসের আদর্শকে ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিবে। ইহাতেই এ সকলের চরম চরিতার্থতা লাভ হইবে।

কিন্তু জনসমাজের বিবিধ ভাব ও আদর্শের সংঘর্ষে পড়িয়া কাব্যসঙ্গীতনাট্যাদিও কখন-কখন আপনার মুখ্য লক্ষ্য যে আনন্দ, তাহাকে উপেক্ষা করিয়া, অবান্তর-লক্ষ্য-সাধনে নিযুক্ত হয়। কবি রসান্বেষণ ছাড়িয়া, লোক-চরিত্রগঠনে ব্যস্ত হইয়া, উপদেশাবলী রচনা করেন। সঙ্গীতাচার্য্য শব্দসন্ধানে যে স্বর্গীয় আনন্দের স্ফুরণ হয়, তাহাকে উপেক্ষা করিয়া, লোকের মনে বিবিধ সময়োপযোগী ভাব ও উদ্দীপনা জাগাইতে চেষ্টা করেন। সেইরূপ অভিনেতা বা অভিনেত্রীরাও নাট্যকলার যে মুখ্য উদ্দেশ্য,—শুদ্ধ আনন্দবিধান করা, তাঁহাকে স্বল্পবিস্তর অগ্রাহ্য করিয়া, কখন-কখন উপদেশমিশ্র-আমোদদানের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠেন। কিন্তু এবংবিধ সকল ক্ষেত্রেই ললিতকলার স্বল্পবিস্তর ব্যভিচার হইয়া থাকে।

বাংলা নাট্যকলা এবং বঙ্গরঙ্গালয় আজন্ম-কালই এইরূপ ব্যভিচারী হইয়া চলিয়াছে। এইজন্য এ সকলের দ্বারা বিশুদ্ধ রসতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা যতটা না হইয়াছে, তদপেক্ষা অধিক-পরিমাণে সমাজের সাধারণ ভাব ও আদর্শাদির পরিপুষ্টি সাধিত হইয়াছে।

আমাদের বর্ত্তমান স্বদেশী আন্দোলন ও তন্নিহিত স্বদেশহিতৈষার অভিনব ও প্রাণময়

আদর্শ—এতদুভয়ই বহুলপরিমাণে বাংলা নাট্যকলা ও বঙ্গীয় রঙ্গালয়সকলের দীর্ঘকাল-ব্যাপী চেষ্টার ফল। আরো অনেকে এক্ষেত্রে কার্য্য করিয়াছেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু বঙ্গ-রঙ্গালয়সমূহ যেরূপভাবে, যতটা বিস্তৃতরূপে ও যে-পরিমাণ সফলতাসহকারে এ কার্য্য করিয়াছে, আর কেহ সেরূপ করিয়াছে কি না, সন্দেহ।

সর্ব্বপ্রথমে—সে ত্রিশবৎসর পূর্ব্বেকার কথা—বঙ্গরঙ্গমঞ্চই নীলদর্পণ, সুরেন্দ্রবিনোদিনী, শরৎসরোজিনী, পলাশীর যুদ্ধ, ভারতমাতা প্রভৃতি নাটক ও রূপকের অভিনয় প্রদর্শন করিয়া শিক্ষিতবাঙালীর প্রাণে এক উন্মাদিনী স্বদেশ-হিতৈষা জাগাইয়া দেয়। সেই সময়ে একদিকে যেমন সুরেন্দ্রনাথের অগ্নিময়ী বাগ্মিতা, সেইরূপ বঙ্গরঙ্গভূমি ও জাতীয় নাট্যমন্দিরের প্রাণস্পর্শী নাট্যাভিনয়, বঙ্গে স্বদেশপ্রেমের এক অপূর্ব্ব বন্যা আনিয়াছিল।

সমাজসংস্কারেও তখন বঙ্গরঙ্গালয়সকল স্বল্প সাহায্য করে নাই। কুলীনকুলসর্ব্বস্ব, বিধবাবিবাহ প্রভৃতি নাটক রঙ্গমঞ্চে প্রকটিত করিয়া সময়োপযোগী সংস্কারকার্য্যেও জনগণকে ইহারা প্রচুরপরিমাণে প্রোৎসাহিত করিয়াছিল।

অতঃপর মধ্যযুগে সমাজসংস্কারের স্রোত মন্দীভূত হইলে, স্বজাতির শাস্ত্রসাহিত্য ও সভ্যতাসাধনার প্রতি লোকের প্রাণে এক নূতন অনুরাগের যখন সঞ্চার হইতে আরম্ভ করিল, তখন বঙ্গরঙ্গালয়সকল এই অভিনব ভাবকে অবলম্বন করিয়া পৌরাণিক আদর্শের ও পৌরাণিক ভাবের পুনঃপ্রতিষ্ঠাকার্য্যে নিযুক্ত হয়। বিগত পঞ্চদশ বৎসরের পৌরাণিক নাট্যাভিনয়ে আমাদের জাতীয়-জীবন কতটা পরিমাণে যে বলিষ্ঠ ও দ্রঢ়িষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে, তাহা সম্যক্‌রূপে পরিমাণ করা অসম্ভব। কিন্তু এই সকল চেষ্টা ও আন্দোলন-আলোচনা ব্যতিরেকে বর্ত্তমান স্বদেশী আন্দোলন ও স্বদেশী আদর্শ যে কখনো এরূপভাবে আমাদের চিত্তকে অধিকার ও অভিভূত করিতে পারিত না, ইহা স্থিরনিশ্চিত।

সর্ব্বশেষে বৎসরাধিককাল ধরিয়া, প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি নূতন নাটক রচনা ও অভিনয় করিয়া বাঙালীর জাতীয়জীবনে বঙ্গরঙ্গালয়-সকল যে অভিনব শক্তির সঞ্চার করিয়াছে, তাহারই ফলস্বরূপে আমরা এই বর্ত্তমান স্বদেশী আন্দোলন জাগ্রত করিতে পারিয়াছি, এ বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ নাই।

এই সকল কারণে, বাংলা নাট্যকলা ও বঙ্গরঙ্গালয় আমাদের জাতীয়জীবনে এমন একটা স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে, যাহাতে আর তাহাকে উপেক্ষা করিয়া চলা সঙ্গত হইবে না। ভাল হউক, মন্দ হউক, জনসাধারণের মতিগতির উপরে ইহাদের আধিপত্য প্রভূত। বঙ্গরঙ্গালয়ের এই অপরিসীম শক্তিকে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুসংস্কৃত করিতে না পারিলে, তাহাদের আপনার সফলতা ও আমাদের ভবিষ্য উন্নতি, উভয়েরই ব্যাঘাত উৎপন্ন হইতে পারে। প্রত্যুত, এই সকলকে সুনিয়ন্ত্রিত করিতে পারিলে, তদ্দারা এমন শক্তিসঞ্চার করা সম্ভব, যাহা না কাব্যে, না বাগ্মিতায়, না অন্য কোনো উপায়ে সম্ভব হইবে।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

রাজতপস্বিনী।

[জীবনীপ্রসঙ্গ]

১

পুঠিয়ার স্বর্গীয়া মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবীর স্বামী রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় রাজশাহীতে নীলবিদ্রোহের একজন কর্ম্মিষ্ঠ নেতা ছিলেন। অতএব জেলার সাহেবসুবাদের বিরাগে বিপদ্ আশঙ্কা করিয়া কিছুদিন সপরিবারে তাঁহাকে কলিকাতায় বাস করিতে হইয়াছিল। আমার পিতৃদেব রাজার দেওয়ান, সঙ্গে ছিলেন। মাতাঠাকুরাণী ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে উৎকট বায়ুরোগে আক্রান্ত হন। চিকিৎসকেরা সিদ্ধান্ত করেন, পীড়াটি হিষ্টিরিয়া-জনিত উন্মাদ। সুবিখ্যাত ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারা চিকিৎসার জন্য এই সময়ে তাঁহাকেও কলিকাতায় লইয়া যাওয়া হয়। আমি তখন দেড় কি দুই বৎসরের শিশুমাত্র। শ্যামবাজারে রাজার বাসাবাটীর নিকটে আমাদের বাসা ছিল।

মহারাণীমাতার বয়ঃক্রম তখন ন্যূনাধিক দ্বাদশবর্ষমাত্র, সমস্তদিন একা থাকিতে পারিতেন না। অক্রূরনামে দাসী তাঁহার আদেশে প্রত্যহ আমায় তাঁর কাছে লইয়া যাইত। দিনমান আমায় অবলম্বন করিয়া আনন্দে তিনি সময় কাটাইতেন। তখন হইতে আমার প্রতি তাঁর যে অপত্যনির্ব্বিশেষ স্নেহ জন্মিয়াছিল, চিরজীবন তাহা সমান ছিল।

"ফুলজানি"র উৎসর্গপত্রে তাঁহার এই বাৎসল্যভাব তাঁর স্বর্গারোহণের কয়মাস পরে স্বপ্নদৃষ্ট ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া চিত্রিত করিতে আমি প্রয়াস পাইয়াছি। অবশ্য অতটা শৈশবের কথা আমার নিজের মনে নাই। বড় হইলে মহারাণীমাতার মুখে যাহা শুনিয়াছি, তাহাই হৃদয়ে মুদ্রাঙ্কিত আছে। নারিকেল-কুল ও ইক্ষু আমার প্রিয়খাদ্য ছিল, তাহাই সংগ্রহ করিয়া প্রায় সমস্তদিন তিনি আমায় কাছে কাছে রাখিতেন। কতবার সে সব গল্প করিতে করিতে তাঁহাকে মাতৃস্নেহে বিগলিত ও উৎফুল্ল হইতে দেখিয়াছি। আমার শৈশবের খুঁটিনাটি আচরণগুলি কখন তিনি বিস্মৃত হন নাই।

ত্রয়োদশবর্ষ বয়সে তাঁহার বৈধব্য ঘটে। বিষয় কোর্ট-অব্-ওয়ার্ডসে গেলে মহারাণীর পিতৃদেব স্বর্গীয় ভৈরবনাথ সান্যাল মহাশয় অবৈতনিক ম্যানেজার ও অভিভাবক নিযুক্ত হন। আমার পিতা অতঃপর কিছুকাল ওয়াট্‌সন্ কোম্পানির প্রধান কর্ম্মচারী হইয়া রামপুর বোয়ালিয়াতে অবস্থিতি করেন। ৭।৮ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত আমি দেশে ছিলাম, মহারাণীমাতাকে আর দেখি নাই। যাহা হউক, ১২৭৪ সালের শ্রাবণমাসে পিতাঠাকুর-মহাশয়ের সঙ্গে তাঁহার আগ্রহে পুঠিয়ায় প্রথম গিয়াছিলাম, সে কথা বেশ মনে আছে। বর্ষা-কাল, পুঠিয়ার চারিদিক্ বন্যাজলে পূর্ণ, এক বাড়ী হইতে অন্য বাড়ীতে যাতায়াতে

নৌকা ভিন্ন গত্যন্তর নাই ;—ইহা সেই ছেলেবেলায় আমার ভারি নূতনরকমের মনে হইয়াছিল। মনে পড়ে, রাজবাটীর উদ্যানসন্নিহিত দ্বিতল গৃহে আমাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল এবং সে গৃহে অন্যান্য পুস্তকের মধ্যে একখানি কাদম্বরীর বাঙলা অনুবাদ দেখিতে পাইয়া গল্পটা খুব শীঘ্র পড়িয়া শেষ করিয়া ফেলিয়াছিলাম। নিষ্ঠুর ব্যাধ বৃক্ষকোটরের আশ্রয়স্থান হইতে পক্ষিশাবক অপহরণ করিয়া সজোরে আছড়াইয়া মারিতেছে—কাদম্বরীর এই করুণ চিত্র আমার তরুণ হৃদয়ে বড় আঘাত করিয়াছিল এবং পুঠিয়ার প্রাথমিক স্মৃতির সঙ্গে সে বেদনাটুকু মর্ম্মে মর্ম্মে জড়িত হইয়া আছে।

১২৭৭-৭৮ সনের পূজার পর পুনরায় আমরা পুঠিয়ায় গেলাম। মহারাণীমাতার অপত্যনির্ব্বিশেষ স্নেহে এবং তাঁহার অলৌকিক পবিত্রজীবনের ছায়ায় আমার পরম লাভ হইল। তাঁহার আদেশে প্রত্যহ সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমি রাজবাটী যাইতাম এবং প্রহর বাজিয়া না গেলে বাসায় ফিরিতে পারিতাম না। এই আড়াই-তিন-ঘণ্টা মাতা কতক আমার সহিত, কতক বা তাঁহার চারিপার্শ্ববর্ত্তিনী আশ্রিতা সধবা-বিধবাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় কাটাইতেন। আমায় কুশলাদিজিজ্ঞাসা করার পরই সুধাইতেন—"আজ কি কি দিয়ে খাওয়া হোল?" তার পর অন্যান্য কথা হইত। ছুটির দিন ছাড়া সচরাচর প্রাতে বা মধ্যাহ্নে রাজবাড়ী যাইতাম না, কিন্তু অনিবার্য্য কারণে কোনদিন এই সায়ংকালীন মাতৃদর্শন বাদ গেলে আমি বিষণ্ণ হইতাম, তিনিও লোক পাঠাইয়া তত্ত্ব লইতেন—কোন অসুখ করে নাই ত? রাজবাটীর মহিলারা আমায় ঘরের ছেলে মনে করিয়া অসঙ্কোচে গল্পগুজব করিয়া যাইতেন, তাহাতে মধ্যে মধ্যে রাজবাটীর ছোট-বড় কর্ম্মচারীদের সমালোচনাও পুরামাত্রায় রীতিমত না চলিত, এমন নহে। কিন্তু বাহিরে আসিয়া সে কথা কখন আমি কাহারও কাছে বলিতাম না। এই সময়ে মহারাণীমাতার সাবালিকাবস্থায় বিষয় কোর্ট-অব্‌-ওয়ার্ডস্‌-মুক্ত হওয়ার পর, শেষে যিনি দেওয়ান ছিলেন, তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করায় প্রয়োজন হইয়াছিল এবং পিতৃদেবমহাশয়কে সে পদে নিযুক্ত করার কথা চলিতেছিল। স্বপক্ষ-বিপক্ষ সকল দলের কথা শুনিতে-বুঝিতে পারিতাম না, এমন নহে। কিন্তু পিতা কখন কিছু জিজ্ঞাসা করিলেও মৌনী থাকিতাম। এই খবর কি করিয়া মহারাণীমাতা জানিতে পারিয়া প্রীত হইয়াছিলেন। কিন্তু ইহা তাঁহারই দৃষ্টান্তের ফল। আমি দেখিতাম, কথাবার্ত্তায় অধিকাংশসময়ে তিনি শ্রোতামাত্র।

আমার সমক্ষেই তাঁহার শয্যা রচিত হইত। প্রকাণ্ড দরদালানের মধ্যস্থলে শীতের সময় দেখিতাম, হর্ম্ম্যতলে একখানি মাতুরের উপর সামান্য পাতলা তোষক বৃহৎ একখণ্ড চাদরে আবৃত, তাহাতে একটিমাত্র লেপ ও উপাধান। গ্রীষ্মের দিনে একটি শীতলপাটিমাত্র। চারিদিকে আশ্রিতা আত্মীয়া ও অনাথা ব্রাহ্মণবিধবাদের শয্যা পড়িত। কি শীত, কি গ্রীষ্মে পরিধেয় একমাত্র বারহাতের মোটাথান। সচরাচর ময়মনসিংহের জমিদারী পুখুরিয়া পরগণা হইতে সে বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া আসিত। অগ্রহায়ণ-পৌষ-মাসে অপরাহ্নে প্রণাম করিতে

গিয়া প্রায় প্রত্যহ দেখিতে পাইতাম, কিছুমাত্র পূর্ব্বে হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিয়া রাণীমাতা শীতনিবারণ জন্য পিত্তলের আঙ্গুটায় রক্ষিত অগ্নিতে হাত সেঁকিয়া লইতেছেন—পরিধানে সেই একমাত্র থান। অবশ্য দিনের মধ্যে অনেকবার তাহা পরিবর্ত্তিত হইত। সকল ঋতুতে তাহাতেই আপাদমস্তক আবৃত থাকিত; কেবল কখন কখন দেখিতাম, মাথার চুল বাড়িলে দাসীরা তাহা কাটিয়া দিতেছে। রাজশাহীতে, বিশেষতঃ পুটিয়ায় দেখিতাম, নাপিতানীরা ক্ষৌরকার্য্য করে না। অতএব প্রয়োজনমতে নরসুন্দরেরা রাজান্তঃপুরে প্রবেশলাভ করিতে পারে। নখ কাটিবার সময় মহারাণীমাতা দীর্ঘ ঘোমটা টানিয়া বসিতেন। একবার নরসুন্দর অনবধানতাবশত নখ বেশী করিয়া কাটিয়া ফেলায় তাঁহার অঙ্গুলিতে রক্তপাত হইল। ভৃত্য ও দাসীরা ইহাতে কুপিত হইয়া উঠিলে, তিনি অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতে আমাদের দিকে সহাস্যে চাহিয়া ইঙ্গিতে সকলকে নিবারণ করিলেন।

দীনদুঃখী এবং এই পাপতাপময় সংসারের সকল শ্রেণীর আর্ত্তের প্রতি তাঁর যে অনির্ব্বচনীয় আড়ম্বরমাত্রশূন্য করুণার ভাব প্রতিনিয়ত দেখিতাম, তাহাতে ইহাই বুঝিতাম যে, তাঁর কাছে ছোট-বড় পাপিপুণ্যাত্মা সকলেই সন্তানতুল্য। কিন্তু পাপের প্রতি যে মর্ম্মান্তিক ঘৃণা অনুদিন তিনি পোষণ করিতেন, তাহাও কার্য্যে প্রকাশ পাইত। একদিন প্রাতঃকালে অন্দরে খবর আসিল, একটি স্ত্রীলোক তাঁহার কাছে নালিশ করিতে আসিয়াছে। উহার অসচ্চরিত্রতার কথা মহারাণীমাতার গোচর হইয়াছিল। দেখা করিলেন না, কিন্তু যাহাতে সে সুবিচার পায়, তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। আপনার লোক কেহ,—আত্মীয়ই হউক আর আশ্রিতই হউক,—কোন অন্যায় কি অযশের কাজ করিয়াছে শুনিবামাত্র তিনি কেবল অজস্র অশ্রুপাত করিতেন। অপরাধী ইহাতেই শাসিত হইত, অন্য কোনরূপ দণ্ডদান করিতে তিনি জানিতেন না। আমার পুঠিয়াবাসের প্রথমবৎসর বর্ষাকালে প্রবল বন্যা উপস্থিত হওয়ায় গরিব রাইয়তেরা বড় কষ্টে পড়ে। পুঠিয়ার রাজাদের বিষয়-আশয় অংশমত অনেককাল ভাগ-বাটোয়ারা হইয়া থাকিলেও সকল অংশের প্রজারা এই সময়ে তাঁহার সাহায্য তুল্যরূপে লাভ করিয়াছিল। রাজবাটীর সম্মুখে স্ত্রীপুরুষের জন্য অন্নবস্ত্র ও গবাদির জন্য খাদ্য বিতরণের যথেষ্ট আয়োজন হইয়াছিল। তাঁহার বিশেষত্ব এই দেখিতাম যে, বাহিরবাটীর চীলের কোঠায় আশ্রয় লইয়া খড়খড়ির পথে নিজে সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। তখনকার করুণ মুখচ্ছবি আজও আমার মনে পড়িতেছে। ইহার কিছুকাল পরে একবার অগ্নিদাহে পুঠিয়ার প্রায় সকল লোকের খড়োবাড়ী পুড়িয়া যায়। লোকের কষ্টের কথা শুনিয়া তিনি তাহা মোচনের বন্দোবস্ত যথাসাধ্য করিয়াছিলেন, ইহা বলা বাহুল্য। কিন্তু সেই সঙ্গে দুইতিনদিন তাঁহাকে যে দয়ায় গলিয়া-গিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে দেখিয়াছিলাম, তাহাতেই আমার হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল। রাজবাটীতে সর্ব্বদাই প্রায় পর্ব্বাদি উপলক্ষে সমারোহে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি ভোজন করান হইত। খাদ্যসামগ্রী চুরী যাওয়ার কথা শুনিলে হাসিয়া তিনি বলিতেন,

"খাবার জিনিষ কখন লোকসান হয়? কেহ না কেহ ত খাবেই!"

বসন্ত ও গ্রীষ্মকালের সন্ধ্যায় দেখিতাম, মাতা একরাশি ফুল লইয়া রাজপরিবারের গৃহদেবতা গোবিন্দজীর জন্য মালা গাঁথিতেছেন। তাঁহার (পাঁচ-আনির) অংশের পালা পড়িলে প্রত্যহ স্বহস্তে মাল্যরচনা করিয়া তিনি দেবতাস্থানে উপহার পাঠাইতেন। পালা পড়িলে এক রাজবাটীর গোবিন্দবাড়ী হইতে অন্যবাটীর গোবিন্দবাড়ী বিগ্রহ লইয়া যাওয়ার সময় চিরদিন ধুমধাম হয়। তদুপলক্ষে হাতিঘোড়া-লোকজন যেরূপ সজ্জিত হইত, প্রধান কর্ম্মচারীদিগকেও সেইরূপ বেশভূষার পারিপাট্য করিয়া গোবিন্দজীকে আনিতে যাইতে হইত। মহারাণীমাতার দেওয়ানরূপে পুনরায় পাঁচ-আনির সংসারে প্রবেশ করার পর আমার পিতৃদেবকে এই মাসিক সমারোহে অবশ্যই যোগদান করিতে হইত, কিন্তু তিনি বেশের কোন পরিবর্ত্তন করিতেন না। একদিন চীলের ঘরের খড়খড়ি হইতে ইহা লক্ষ্য করিয়া মহারাণী অসন্তুষ্ট হন। শুনিয়া পিতাঠাকুরমহাশয় বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, রাজার আমলে তিনি যেরূপ সজ্জা করিয়া তাঁর সঙ্গে বাহির হইতেন, এখন সেরূপ করিতে কষ্টবোধ করেন। শুনিয়া তাঁহার চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল, আর কখন সে প্রসঙ্গ তুলিতেন না।

পোষ্যপুত্রের নাবালকি অবস্থায় কোন সমারোহ উপলক্ষে অথবা সম্ভ্রান্ত কোন লোক হাজিরা দিতে আসিলে মহারাণীমাতাকে কখন-কখন বাহিরের বৈঠকখানায় আসিতে হইত। তথায় স্বর্গীয় রাজাবাহাদুরের কর্ম্মচারিগণপরিবেষ্টিত তৈলচিত্র লম্বমান ছিল। কদাচিৎ সে দিকে দৃষ্টি পড়িলে তাঁহার মুখ রক্তিম ও চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিত। এইজন্য সচরাচর তৈলচিত্রখানি বস্ত্রাবৃত করিয়া রাখা হইত।

প্রথমত স্বামীর আগ্রহে এবং পরে তাঁর পিতার যত্নে মহারাণীমাতা বেশ লিখিতে-পড়িতে শিখিয়াছিলেন। পিতৃদেবের মুখে শুনিয়াছি, কলিকাতায় শ্যামবাজারে অবস্থানসময়ে রাজার তাঁর প্রতি আদেশ ছিল, রাণীর কোন-কিছুর দরকার হইলে শ্লেটে তিনি লিখিয়া পাঠাইবেন এবং লেখায় ভুল থাকিলে সংশোধন করিয়া দিতে হইবে। এইরূপে তাঁর হস্তাক্ষর ও বর্ণবিন্যাস দুরস্ত হইয়াছিল। তাঁহার ন্যায় সুন্দর সুস্পষ্ট হস্তাক্ষর সচরাচর দেখা যায় না। ইদানীং তাঁর হাতের লেখা কতকগুলি খাতা দেখিয়াছিলাম, তাহাতে ভাল ভাল পুস্তক হইতে নকল করিয়া তিনি হস্তাক্ষর-উন্নতির চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রতিদিন লিপি সমাপ্ত করিয়া যে তারিখ ও সময় লিখিয়া রাখিতেন, তাহাতে অধিকাংশ লেখা গভীর রাত্রে সম্পাদিত হইত জানা যায়।

প্রথম-প্রথম পুঠিয়ায় গিয়া দেখিতাম, জ্যোৎস্নারাত্রে ছাদে বসিয়া তিনি বাঙলা সাপ্তাহিক কি মাসিক পত্র অথবা কোন পুস্তক চন্দ্রালোকে পাঠ করিতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে পার্শ্ববর্ত্তিনীদের নানা গল্প চলিত, কদাচিৎ মুখ তুলিয়া তিনি কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করিতেন। এইরূপ পড়ার অভ্যাস ৪।৫বৎসর আমি নিজে দেখিয়াছি। আমি বিস্ময়প্রকাশ করিলে বলিতেন, এ তাঁর অনেককালের অভ্যাস,

এমন কি, চন্দ্রালোকে স্বচে স্বতা পরাইতেও কষ্টবোধ করেন না। সংস্কৃত এবং বাঙ্‌লা গ্রন্থের তাঁহার যে সংগ্রহ ছিল, তাহা রাজধানীর কোন বৃহৎ পুস্তকালয়ের পক্ষেও গৌরবজনক। সংস্কৃত সামান্য বুঝিতেন, কিন্তু বাঙ্‌লায় উল্লেখযোগ্য কোন গ্রন্থ তাঁহার অপঠিত ছিল না। কোন নূতন গ্রন্থ প্রকাশ হইলে সংগ্রহ করিয়া উত্তমরূপে বাঁধাইয়া লওয়া ও গ্লাস্‌কেসে সাজাইয়া রাখা তাঁহার জীবনের একটি প্রধান আনন্দ ছিল। কলিকাতায় যখন কলেজে পড়ি, তখন একবার গ্রীষ্মের ছুটিতে পুঠিয়ায় আসিয়া বইগুলি আমি শৃঙ্খলার সহিত সাজাইয়া দিয়াছিলাম এবং একটি তালিকাও প্রস্তুত করিয়াছিলাম। সে যাহা হউক, কৈশোরে মাতৃভাষার পুস্তকরাশির সংস্পর্শে এইরূপে আসিয়া আমি বাঙ্‌লাসাহিত্যের স্বাদ পাইয়াছিলাম। ভাল বই হাতে আসিলেই মাতা আমায় পড়িতে দিতেন এবং পাঠ সাঙ্গ হইলে মতামত জিজ্ঞাসা করিতেন। আমিও কবিতা লিখিয়া মাঝে মাঝে তাঁকে পড়িতে দিতাম। তাঁহার অনুমোদন ও উৎসাহ চিরদিন আমায় সাহিত্যালোচনায় অগ্রসর করিয়াছে।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার।

সংস্কৃতশিক্ষাপ্রণালী।

কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে সংস্কৃতশিক্ষাপ্রণালী লইয়া কিঞ্চিৎ আলোচনা চলিতেছে। কয়েকদিন গত হইল, কলিকাতাস্থ সংস্কৃতকলেজে একটি সভা হইয়াছিল, উহাতেও কয়েকজন উচ্চপদস্থ বহুভাষাবিৎ পণ্ডিত এ বিষয় লইয়া কিছুক্ষণ বাদানুবাদ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতশিক্ষাই ইঁহাদের বিতর্কের বিষয় ছিল, চতুষ্পাঠী বা টোলের সংস্কৃতশিক্ষা উক্ত পণ্ডিতগণের বাদানুবাদের লক্ষ্য নহে।

প্রথম উচ্চারণের কথা। কেহ কেহ বাঙ্‌লাপ্রণালীতে সংস্কৃতের উচ্চারণ আদৌ পছন্দ করেন না। কেহ কেহ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। আমরা বলি, যাঁহারা বাঙ্‌লাপ্রণালীতে উচ্চারণের বিরোধী, তাঁহাদের মত অতি সমীচীন। সংস্কৃত যখন বাঙ্‌লা, হিন্দী প্রভৃতি ভাষা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্, তখন সাধারণ বাঙ্‌লার ন্যায় ইহার উচ্চারণ করিলে চলিবে কেন? উত্তরপশ্চিম প্রদেশ, মধ্যভারতবর্ষ, দক্ষিণাপথ প্রভৃতি সকল স্থলেই স্কুল্‌কলেজে সংস্কৃতশিক্ষা হইয়া থাকে, কিন্তু ঐ সকল প্রদেশের ছাত্রগণের সংস্কৃত-উচ্চারণের সহিত বাঙ্‌লাদেশের ছাত্রগণের উচ্চারণের কিরূপ প্রভেদ, তাহা যাঁহারা ঐ সকল প্রদেশে গিয়াছেন, তাঁহারা বিলক্ষণ অবগত আছেন। কাশী, অযোধ্যা, প্রয়াগ, পুনা, নাসিক প্রভৃতি স্থানের স্কুল্‌কলেজের ছাত্রগণের উচ্চারণ যেমন শ্রুতিমধুর, তেমনই বিশুদ্ধ। ঐ সকল প্রদেশের বিদ্যার্থিগণ হ্রস্ব, দীর্ঘ, ণ, ন, জ, য, ব, ব, শ, ষ, স প্রভৃতির উচ্চারণে অতীব সাবধান। তদ্ভিন্ন সংযুক্ত বর্ণগুলিও তাঁহারা যথাযথ উচ্চারণ করিয়া থাকে।

প্রাচীনকালে উচ্চারণের বড়ই কঠোর নিয়ম ছিল। উচ্চারণনিয়ামক গ্রন্থের নাম শিক্ষা। শিক্ষা বেদের অন্যতম অঙ্গ। শিক্ষার এক স্থলে লিখিত আছে—

'মন্ত্র যদি স্বর অথবা বর্ণ দ্বারা হীন হয়, তাহা হইলে সেই মিথ্যাপ্রযুক্ত বাক্যের কোন অর্থ হয় না, সেই বাগ্‌বজ্র যজমানকে হিংসা করে।' *

যদিও স্কুল্‌কলেজের বিদ্যার্থিগণের উচ্চারণ-দোষে এখন আর যজমানদিগের কোনরূপ হানির সম্ভাবনা নাই, তথাপি উহাতে যে শ্রবণ-সুখের বিলক্ষণ ব্যাঘাত ঘটে, এ বিষয়ে বোধ হয় কাহারও মতভেদ হইতে পারে না। সাহিত্যপাঠের উদ্দেশ্য শুধু ভাষাজ্ঞান নহে, শ্রবণেন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তিও উহার অন্যতম লক্ষ্য। বিশেষ কবিতা ও সঙ্গীত একই পদার্থ, সঙ্গীতের ন্যায় কবিতাও তানলয়বিশুদ্ধ স্বরে উচ্চারিত হইয়া হৃদয়ে অপূর্ব্ব আনন্দপ্রদান করে। যদিও ঐরূপ উচ্চারণ বিদ্যার্থিমাত্রেরই শক্তিসাধ্য নহে, তথাপি পদ্য যথার্থ পদ্যের ন্যায় ও গদ্য যথার্থ গদ্যের ন্যায় পঠিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

তাহার পর ব্যাখ্যার কথা। অনেকে সংস্কৃতব্যাখ্যার বিরোধী, কেহ কেহ আবার সংস্কৃতব্যাখ্যার অনুকূল। যাঁহারা সংস্কৃত-ব্যাখ্যা পছন্দ করেন না, তাঁহারা বলেন— "পরীক্ষার্থিগণ ব্যাখ্যাপুস্তক মুখস্থ করিয়া পরীক্ষককে ফাঁকি দেয়, অতএব সংস্কৃতব্যাখ্যা শিখাইবার প্রয়োজন নাই, শুধু ইংরেজী অনুবাদের সাহায্যে সংস্কৃত শিখাইতে হইবে।" এমন কি, তাহারা বাঙ্‌লার উপর এতদূর খড়্গহস্ত যে, ক্লাসে বসিয়া বাঙ্‌লাশব্দের উচ্চারণ পর্য্যন্ত মহাপাপজনক মনে করেন। এস্থলে আমাদের বক্তব্য এই যে, সংস্কৃতব্যাখ্যা পরিত্যাগ করিলে সংস্কৃত-অধ্যাপনার থাকিল কি? সংস্কৃতব্যাখ্যা শিখে বলিয়াই যাহা-কিছু সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি জন্মে। প্রতিবাক্য প্রয়োগ করিতে গিয়া কতপ্রকার নূতন উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট শব্দ ও ক্রিয়াপদ শিক্ষা করে এবং ভাবার্থ ও সরলার্থ লিখিতে গিয়া রচনানৈপুণ্য লাভ করিয়া থাকে। সকলেই যে ব্যাখ্যা মুখস্থ করিয়া পরীক্ষাসাগর পার হইতে চেষ্টা করে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণের মনে এরূপ ধারণা উৎপন্ন করিয়া দিলে প্রকৃত জ্ঞানার্থী বহুসংখ্যক ছাত্রের প্রতি অবিচার করা হইবে। বরাবরই আমরা এমন কতকগুলি করিয়া ছাত্র পড়াইয়া আসিতেছি, যাহারা চতুর্থশ্রেণী হইতেই আত্মনির্ভর করিতে চেষ্টা করিয়া থাকে। ঐ সকল ছাত্র দ্বিতীয় ও প্রথম শ্রেণীতে উঠিয়া ব্যাখ্যাপুস্তকের বিনা সাহায্যে সংস্কৃতে টীকারীতিতে ব্যাখ্যা ও সংস্কৃতে সরলার্থ লিখিয়া থাকে। অবশ্য এরূপ ছাত্রের সংখ্যা খুব অধিক না হইলেও নিতান্ত মুষ্টিমেয় নহে। যাহাদের শিক্ষায় অনুরাগ নাই, তাহারা চিরকালই ফাঁকি দিয়া আসিতেছে এবং চিরকালই দিবে। যাহারা ব্যাখ্যা মুখস্থ করিয়া উত্তীর্ণ হইতে পারে, তাহারা কি ইংরেজী অনুবাদ মুখস্থ করিয়া উত্তীর্ণ হইতে পারে না?

এই যে ইংরেজী অনুবাদের কথা উঠিয়াছে, আমরা জিজ্ঞাসা করি, শিক্ষাসংক্রান্ত কার্য্যে এমন কতগুলি পণ্ডিত আছেন, যাঁহারা সংস্কৃত-

* । মন্ত্রো হীনঃ স্বরতো বর্ণতো বা মিথ্যাপ্রযুক্তো ন তমর্থমাহ।
স বাগ্‌বজ্রো যজমানং হিনস্তি যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোঽপরাধাৎ ॥ (শিক্ষা ৫২)

গ্রন্থের তত্তৎক্ষণে ক্লাসে বসিয়া বিশুদ্ধ ইংরেজীতে অনুবাদ করিতে পারেন? আর ইংরেজীতেও ত সকল সংস্কৃতকথার অবিকল অনুবাদ হয় না। রঘুবংশের ১ম সর্গের ৪৫ শ্লোকে "হৈয়ঙ্গবীন" একটি শব্দ আছে, প্রত্যেক অনুবাদকই উহার "clarified butter" এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন, কিন্তু ঐরূপ অনুবাদে কি ঠিক অর্থ প্রকাশিত হইয়াছে? বাঙ্‌লায় যদি "সদ্যোঘৃত" শব্দটি প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে অতি সহজে অবিকল অর্থ প্রকাশিত হইতে পারে। একজন অনুবাদক রঘুবংশের চতুর্দ্দশ সর্গের ৫২ শ্লোকের দ্বিতীয় চরণের এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন—

"তাং ভ্রাতৃজায়াং পুলিনেঽবতার্য।"

"Helping his sister-in-law to alight on the sandy bank."

এখানে ছাত্র sister-in-law অর্থে শ্যালিকা বুঝিবে, কি ভ্রাতৃজায়া বুঝিবে? এতদ্ভিন্ন মধুপর্ক, অর্ঘ্য, যজ্ঞ, স্বয়ংবরা প্রভৃতি অসংখ্য শব্দ আছে, যাহার ইংরেজীতে অর্থ বুঝাইতে হইলে লম্বা লম্বা বাক্য ব্যবহার করিতে হয়।

কেহ কেহ বলেন—"সংস্কৃতের বাঙ্‌লায় অনুবাদ করার অর্থ অনুস্বারবিসর্গ পরিত্যাগ করা"। এ কথাটি কি ঠিক?

"পীত্বা জলানাং নিধিনাতিগার্ধ্যা-
দ্বৃদ্ধিঙ্গতেঽপ্যাত্মনি নৈব মাস্তীঃ।
ক্ষিপ্তা ইবেন্দোঃ সঙ্কচোঽধিবেলং
মুক্তাবলীরাকলয়াঙ্ককার॥"

(শিশুপালবধম্)

"যাং চ সন্নিহিতবিষমলোচনামনবরতমতিমধুরো রতিপ্রলাপ ইব প্রসর্পন্ মুখরীকরোতি মকরকেতুদাহহেতুভূতো ভবনকলহংসকুলকোলাহলঃ।"

(কাদম্বরী)

"অথান্তরেণাবটুগামিনাধ্বনা
নিশীথিনীনাথমুহঃসহোদরৈঃ।
নিগালগাদ্দেবমণেরিবোত্থিতৈ-
র্বিরাজিতং কেশরকেশরশ্মিভিঃ॥"

(নৈষধচরিতম্)

এই সকল স্থলের বিভক্তি পরিত্যাগ করিলেই কি বাঙ্‌লা অনুবাদ হয়। অনেকে মনে করেন, সংস্কৃতের বাঙ্‌লা অনুবাদ নিতান্ত সহজ ব্যাপার, উহাতে কোনরূপ বিদ্যাবুদ্ধির প্রয়োজন হয় না। কিন্তু তাঁহারা যদি স্বয়ং কোন কাব্যনাটকের বঙ্গানুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন, সংস্কৃতের প্রকৃত মর্ম্ম বাঙ্‌লাভাষায় প্রকাশ করা কিরূপ দুরূহ ব্যাপার। সংস্কৃতের ইংরেজী অনুবাদ অপেক্ষা বাঙ্‌লা অনুবাদ করা যে নিতান্ত সহজ, এ কথা বোধ হয় অনেকেই স্বীকার করিবেন না। বর্ত্তমান সময়ে মতামতপ্রকাশের সময় অনেকেই গড্ডলিকাপ্রবাহন্যায় অনুসারে কার্য্য করেন। একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি কোন মন্তব্য প্রকাশ করিলে সকলেই প্রায় নির্ব্বিচারে তাহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হন। বিশ্ববিদ্যালয়ে কিরূপ প্রণালীতে সংস্কৃতশিক্ষার প্রস্তাব হইয়াছে, তাহা সাধারণের অজ্ঞাত। তবে কিছুকাল পূর্ব্বে শিক্ষকসমিতির (The Teachers' Association) কোন অধিবেশনে একজন য়ুরোপীয় অধ্যাপক "বাঙ্‌লা ও সংস্কৃত ভাষার বিনা সাহায্যে শুধু ইংরেজী অনুবাদের দ্বারা সংস্কৃতশিক্ষা দিতে হইবে" এইরূপ প্রস্তাব করেন। উঁহার প্রতিবাদও হইয়াছিল, কিন্তু সভায় ভোট্ গণনা করিলে দেখা গেল, য়ুরোপীয় অধ্যাপকের পক্ষেই অধিকাংশ ভোট্ হইয়াছে।

অনেকে ভোট্‌ দিবার জন্যই সাজিয়া আসিয়াছিলেন। এমন কি, যাঁহাদের অতি অল্পদিন হইল, ইংরেজী বর্ণমালার সহিত পরিচয়স্থাপন হইয়াছে, তাঁহারাও অতি ব্যস্তসমস্তভাবে হস্তোত্তোলন করিয়াছিলেন। কার্য্যত শুধু ইংরেজী অনুবাদের দ্বারা সংস্কৃতশিক্ষা সম্ভব কি না, তাহা বিচার করিবার অবসর ইঁহাদের কাহারও ছিল না।

ব্যাকরণের কথা। শুনিতে পাওয়া যায়, কোন খ্যাতনামা ব্যক্তি নাকি বিদ্যালয়ে সংস্কৃতব্যাকরণের পরিবর্ত্তে হুইট্‌নিসাহেবের রচিত ইংরেজীভাষায় লিখিত সংস্কৃতব্যাকরণ প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। এই প্রস্তাবটি কার্য্যে পরিণত হইলে সংস্কৃতশিক্ষা উন্নতির চরমসীমায় উপনীত হইবে। আমরা এ সম্বন্ধে অন্য কিছুই বলিব না, পরে বিশেষভাবে উহার আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

স্বর্গীয় ভক্তিভাজন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্কলিত সংগ্রহপুস্তকগুলি বেশ উৎকৃষ্ট ছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু তখনও অনেকে ফাঁকি দিয়া উত্তীর্ণ হইত। এখন ইংরেজী হইতে বাঙ্‌লা অনুবাদে ২০ নম্বর ও বাঙ্‌লা প্রবন্ধরচনায় ২০ নম্বর এবং সংস্কৃতপাঠ্যে ৮০ নম্বর আছে। কাজেই ছাত্রদিগকে সংস্কৃতব্যাকরণ ও সংস্কৃতপাঠ্য অধ্যয়ন করিতে হয়। কিন্তু পূর্ব্বে ইংরেজী হইতে বাঙ্‌লা অনুবাদে ৫০ নম্বর ছিল, কাজেই অনেকে সংস্কৃতপাঠ্যের পাতা না উল্টাইয়াও সংস্কৃতে উত্তীর্ণ হইয়া যাইত। একজন প্রবীণ শিক্ষিতলোকের মুখে শুনিয়াছি, তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার সময় শুধু অনুবাদের প্রশ্নপত্রের উত্তর করিয়াই বৃত্তিসহ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।" বস্তুত এখন সংস্কৃতশিক্ষার যে অবনতি ঘটিতেছে, প্রশ্ননির্ব্বাচনের ত্রুটিই উহার অন্যতম কারণ।

পূর্ব্বে প্রশ্নপত্রে সন্ধি, শব্দরূপ, প্রকৃতিপ্রত্যয়, বাচ্যান্তর, কারক, ধাতুরূপ প্রভৃতি জিজ্ঞাসিত হইত, এখন কদাচিৎ দুইএকটি ধাতুরূপ ও সমাসবাক্য জিজ্ঞাসা করা হয়, আর-কোন বিষয়েরই প্রায় প্রশ্ন থাকে না। সুতরাং সাধারণ ছাত্রেরা ব্যাকরণের ঐ সকল অংশে মনোযোগ দিবে কিজন্য? তবে যাহারা শিখিবার উদ্দেশে সংস্কৃত পড়ে, তাহারা প্রশ্ন থাকিলেও পড়ে, না থাকিলেও পড়িয়া থাকে। তবে ঐ সকল সম্বন্ধে নিতান্ত দুরূহ কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া প্রত্যেক বিষয়েই সহজ সহজ দুইএকটি প্রশ্ন থাকা আবশ্যক।

তা ছাড়া, প্রবেশিকা পরীক্ষার পাঠ্যপুস্তকখানি কয়েকবৎসর হইতে একই আকারে প্রকাশিত হইতেছে। উহার কিছু আকারের পরিবর্ত্তন প্রয়োজনীয়। হিতোপদেশের মিত্রলাভপ্রকরণই উৎকৃষ্ট, কিন্তু দীর্ঘচ্ছন্দের শ্লোকগুলি ও নীরস দুইচারিটি কঠিন পদ্য পরিহার করা কর্ত্তব্য। রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের রচনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া অনেক পণ্ডিতই মতপ্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু চিরকালই কৌশল্যা ও দশরথের বিলাপ এবং দশরথের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াই যে পড়াইতে হইবে, তাহারই বা হেতু কি? রামায়ণে আরও ত সহজ ও সরস অংশ আছে। উহার রচনায় না হয় একটু উনিশ-বিশ থাকুক, তাহাতে ক্ষতিই বা কি? মহাভারত নীতির আকর, উহাতে

আরও কত সুন্দর সুন্দর কৌতূহলপূর্ণ উপাখ্যান আছে। হিতোপদেশ, রামায়ণ, মহাভারত ব্যতীত আরও এমন অনেক গ্রন্থ আছে, যাহা হইতে নীতিপূর্ণ উপাখ্যান সংগ্রহ করা যাইতে পারে। আর মধ্যে মধ্যে দুইএকটি প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা দিলেও মন্দ হয় না।

আমি এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে যে গুরুতর বিষয়ের আলোচনা করিলাম, ইহা লইয়া মাথা ঘামাইবার উপযুক্ত অনেক উচ্চপদস্থ কৃতবিদ্য লোক আছেন। তথাপি যে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটি প্রকাশ করিলাম, উহার কারণ শিক্ষাকার্য্যে ব্রতী থাকিয়া যে সকল বিষয়ে অভাব অনুভব করিয়া থাকি, তাহাই সরলমনে ব্যক্ত করিলাম, তজ্জন্য কেহ যেন ধৃষ্টতা মনে না করেন। উপসংহারে বক্তব্য, য়ুরোপীয় অধ্যাপক ও কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ আমাদের দেশীয়ভাষাশিক্ষা-সংক্রান্ত যে সকল প্রস্তাব উপস্থিত করেন, উহা আমাদের মঙ্গলোদ্দেশে করিলেও ঐ সকল প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার পূর্ব্বে দেশীয় কৃতবিদ্যগণের এ বিষয়ে বিশেষভাবে চিন্তা করা আবশ্যক। দেশীয়ভাষা যাঁহারা শিক্ষা দেন না, তাঁহারা আপন আপন ধারণাবশে যে সকল কল্পনা স্থির করেন, তাহা দেশের পক্ষে উপযোগী কি না, ভাবিয়া দেখা কৃতবিদ্য ব্যক্তিমাত্রেরই উচিত। শুনিতে পাওয়া যায়, য়ুরোপীয় বিদ্বান্ ব্যক্তিদের এমন একটি মহৎগুণ আছে যে, তাঁহারা আপন মতের অনুপযোগিতা উপলব্ধি করিলে উহার পরিবর্ত্তন বা পরিহার করিতে ক্ষণমাত্রও বিলম্ব করেন না।

শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী।

দেবনাগর এবং বঙ্গাক্ষরের একত্ব।

এখন পর্য্যন্ত বাঙলা এবং দেবনাগরের অধিকাংশ অক্ষরের একত্ব অতি সহজেই উপলব্ধি হয়। যে কয়টি অক্ষরের আকারগত প্রভেদ অধিক হইয়া পড়িয়াছে, তাহার কতক "ভাষাতত্ত্ব" প্রথমখণ্ডে প্রদর্শিত হইয়াছে। সেইপ্রকার আর সাতটি অক্ষরের পরিবর্ত্তন এক্ষণে দেখাইব।

'অ'—ইহার দেবনাগরীর আকৃতি আমাদের দেশের ছাপাতে অ এইরূপ; সুতরাং 'অ'র সহিত ইহার পার্থক্য অত্যধিক বলিতে হইবে। এই অক্ষরটি একবারও কলম না তুলিয়া লিখিতে গেলে (১) অ এইরূপ হয়; কিন্তু এতগুলি টান একবার কলম না তুলিয়া লেখা কঠিন, এইজন্য ইহা লিখিতে (২) অ এইরূপে লিখাই সম্ভব এবং উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের ছাপাতে নাগরী অকারটি ঠিক এইরূপ; এক্ষণে দেখিতেছি, ইহার বামদিকের ঊর্দ্ধাংশ ত্যাগ করিলেই অ থাকে, তাহাই বঙ্গাক্ষর।

ए—ইহার বঙ্গাক্ষর এ। ইহারা যে উভয়ে এক, তাহা সহজে পরিলক্ষিত হয় না; কারণ পূর্ব্বপ্রবন্ধোক্ত ह এবং চকারের ন্যায় ইহাদিগের অবস্থান বিপরীতভাবাপন্ন, অর্থাৎ দেবনাগরীতে এ অক্ষরের নিম্নভাগের টান দক্ষিণদিকে এবং বঙ্গাক্ষরের টান বামদিকে। উহাদিগকে বিপরীতভাবে একটানে লিখিতে গেলে নিম্নলিখিতপ্রকারে উহাদের একত্ব দৃষ্ট হয়—

ए ए ए ए এ এ (৩)

প্রভেদ এই যে, যে বস্তু হইতে এই অক্ষরটি কল্পিত হইয়াছে, তাহা কেহ বামদিক্, কেহ দক্ষিণদিক্ হইতে লক্ষ্য করিয়া অঙ্কিত করিয়াছে। এই অক্ষরটি মানবদেহের পঞ্জর হইতে কল্পিত হওয়া সম্ভব। বক্ষপঞ্জরের দক্ষিণার্দ্ধ দেবনাগরী 'এ' এবং বামার্দ্ধ বাঙ্লা 'এ'।

ओ, औ।—কে সহজে বলতে পারে যে, বাঙ্লা ও, ঔ, এই দুইটি দেবনাগরীরই সংক্ষিপ্তাকার। এই দুই অক্ষর লিখিতে যে সময় লাগে, তাহাতে অন্য ভাষায় অন্তত চারপাঁচটি অক্ষর লেখা যায়। একএকটি অক্ষর যদি এত সমারোহ করিয়া লিখিতে হয় তবে সাধারণ লেখাপড়ার কার্য্য একপ্রকার অচল হইয়া পড়ে; সুতরাং স্বাভাবিক নিয়মে সাধারণ লেখাপড়াতে ইহাদিগকে সংক্ষিপ্ত করিয়া লিখিতে হয়। দেখিতেছি, ইহাদের প্রত্যেকের মধ্যে দুই অক্ষর। একটি (৪) अ আর একটি (৫) (ো) ওকারচিহ্ন অথবা (৬) (ৌ) ঔকারচিহ্ন; উক্ত (৭) अ র সংক্ষিপ্তাকার (৮) अ ইহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। এক্ষণে আবার সেই (৯) अ কে (১০) (ো) ওকারের সহিত যুক্ত করিতে যোগের নিয়মানুসারে উভয় হইতে আরও কিছু কিছু ত্যাগ করিতে হয়; অতএব अ র (১২) "ও" এই অংশমাত্র রাখিয়া তাহার মাথায় (ো) ওকারের ঊর্দ্ধভাগ (১৩) (ো) যোগ করিয়া বাঙ্লা "ও" অক্ষরটি গঠিত হইয়াছে; আর ঔকারের মাথা ঐপ্রকার দুইটি, এইজন্য ঔ লিখিতে প্রথম (১৪) ও লিখিয়া তাহার উপর (১৫) (ৌ) এই দুইটি মাথা (১৬) ঔ এইপ্রকারে যোগ করিলে বাঙ্লা 'ঔ' অক্ষরটি উৎপন্ন হয়।

দেবনাগরের আর একটি অক্ষর प। ইহার সহিতও বাঙ্লা প অক্ষরটির বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। কিন্তু (১৭)

प = प = प = প

এইপ্রকারে উপরের মাত্রাটি কিঞ্চিৎ বক্র হইয়া বাঙলা 'প'র সৃষ্টি হইয়াছে।

ফ (ফ) অক্ষরটি যে প্রকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া ক্রমে বঙ্গীয় আকার ধারণ করিয়াছে, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

মাত্রা ত্যাগ করিলে—

(১৮) फ = ফ = ফ = ফ = ফ

আর একটি অক্ষর ম্ল। ইহার বামার্দ্ধভাগ লম্বভাব হইতে ক্রমে সমতলভাবে আসিয়া যে-প্রকারে বাঙলারূপ হইয়াছে, তাহা এই—

(১৯) ম্ল - ম্ল ন্ল ন্ল

ক, খ, গ এই তিনটি অক্ষরের একত্ব "ভাষাতত্ত্ব" প্রথমখণ্ডে দেখান গিয়াছে। অন্যান্য অক্ষরের একত্বসম্বন্ধে বোধ হয় কাহারও মনে দ্বিধা নাই। অতএব দেবনাগর এবং বঙ্গাক্ষরের মৌলিক একত্ব নিঃসন্দেহরূপে প্রতিপন্ন হইল।

দেবনাগর ও বঙ্গাক্ষরের উৎপত্তিকাল।

এক্ষণে আলোচ্য এই যে, দেবনাগর এবং বঙ্গাক্ষর কতকাল পূর্ব্বে সৃষ্ট হইয়াছে। ইহার কালনির্ণয় করার কোন উপায় এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই, ভবিষ্যতে হইবে কি না, কে বলিতে পারে। তবে আমরা এই পর্য্যন্ত জানি যে, ভারতবর্ষীয় এবং য়ুরোপীয় আর্য্যগণের মধ্যে অতি প্রাচীনকালে একটি প্রথা ছিল যে, তাঁহারা ধর্ম্মপুস্তকসকল ধর্ম্মযাজকশ্রেণী ব্যতীত অন্য কাহাকে পাঠ করিতে দিতেন না; ভারতবর্ষে যে অক্ষরে ধর্ম্মপুস্তকসকল লিখিত হইত, সে অক্ষর জনসাধারণে শিক্ষা করিতে পাইত না। সেই অক্ষর দেবনাগরী অক্ষর, অর্থাৎ দেবতাদের ব্যবহার্য্য নামে আখ্যাত হইয়া ধর্ম্মপুস্তকেই নিবদ্ধ ছিল। নাগরী এবং গ্রাম্য, এই দুইটি প্রতিযোগী শব্দ। গ্রাম্য ভাষা, গ্রাম্য অক্ষর, গ্রাম্য রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার প্রভৃতি সকলই নগরের ভাষাদি অপেক্ষা হীনতর; নাগরী ভাষা ইত্যাদি বলিতে মার্জ্জিত বা শ্রেষ্ঠ ভাষাদি বুঝায়, সুতরাং নাগরী অক্ষর বলিলে শ্রেষ্ঠতর অক্ষর বুঝায়; দেবনাগরী অক্ষরের অর্থ—দেবব্যবহৃত শ্রেষ্ঠাক্ষর। এই আখ্যার কারণ এই যে, হিন্দুরা বলেন, তাঁহাদের ধর্ম্মপুস্তকসকল দেবতাদের প্রণীত, তাহাদের রচয়িতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, নারদ প্রভৃতি। জনসাধারণের নিত্যনৈমিত্তিক-কার্য্যনির্ব্বাহের অন্যপ্রকার অক্ষরসকল প্রচলিত ছিল। ভারতবর্ষের প্রাচীন প্রস্তর-লিপি ইত্যাদিতে যে সকল অক্ষর দেখা যায়, তাহা সেই প্রাচীনকালের সাধারণ প্রচলিতাক্ষর। কারণ, পবিত্র দেবনাগর অক্ষর জনসাধারণের দৃষ্টিগোচরে আনা প্রাচীন ঋষিগণের উদ্দেশ্য ছিল না; কিন্তু কালধর্ম্মে ক্রমে ক্রমে ঋষিগণের সেই সকল নিষেধ-আজ্ঞা-সত্ত্বেও দেবনাগর কিছু কিছু করিয়া সাধারণ প্রচলিত ভাষাতে প্রবেশ করিয়াছিল।

ভারতবর্ষে যে সকল পুরাতন অক্ষর দেখিয়াছি, তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে গ্রীনার পার্ব্বতীয় অশোকাক্ষরে খ্রীঃ পূঃ ৩০০ অব্দে দেবনাগরী ও বঙ্গাক্ষরের প্রথম আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়; তাহার সপ্তত্রিংশৎ অক্ষরের মধ্যে পঁচিশটি প্রাচীন সাধারণ প্রচলিতাক্ষর, আর গ, দ, ট, ক, চ, ছ, ঢ়, প

এই আটটি দেবনাগরীর সদৃশ, অন্য চারিটির বঙ্গীয় অক্ষরের সহিত ঐক্য হয়।

তৎপরে ক্ষত্রপবংশীয় রুদ্রদাম অক্ষর (খ্রীঃ পূঃ ১০০)। ইহার ছত্রিশটি অক্ষরের মধ্যে একবিংশতিটি প্রাচীন সাধারণ অক্ষর, তেরটি দেবনাগরী ও দুইটি বঙ্গাক্ষরের ন্যায়। তদনন্তর এলাহাবাদের সমুদ্রগুপ্তাক্ষর (খ্রীঃ ৪০০)। ইহার চৌত্রিশটি অক্ষরের মধ্যে ষোলটি তাৎকালিক সাধারণ চলিতাক্ষর, আর অষ্টাদশটি আমাদের অক্ষরের সহিত সাদৃশ্য রাখে। তন্মধ্যে কেবল 'চ' আর 'ব' ব্যতীত আর সকল দেবনাগরীর ন্যায়।

কুমারগুপ্তাক্ষর মন্দসোর (খ্রীঃ ৪০০)। ইহারও তেত্রিশটি অক্ষরের মধ্যে আঠারটি প্রাচীন সাধারণ অক্ষর, আর পনরটির সহিত আমাদের অক্ষরের মিল আছে এবং তাহার দুইএকটি ব্যতীত সমুদয়ই দেবনাগরীর আকার। হূনরাজ তোরমানের অক্ষর (খ্রীঃ ৪৮৪)। ইহার চৌত্রিশটি অক্ষরের মধ্যে একবিংশতিটি প্রাচীন প্রচলিত অক্ষর এবং ত্রয়োদশটি আমাদের দেবনাগরী ও বঙ্গাক্ষরের সহিত মিলে, তাহার তিনচারিটি ব্যতীত সমুদয়ই দেবনাগরীর আকার। মন্দসোরের যশোধর্ম্ম ও বিষ্ণুবর্দ্ধন অক্ষর (খ্রীঃ ৫০০)। ইহার অষ্টাত্রিংশৎ অক্ষরের মধ্যে সতরটি প্রাচীন অক্ষর, একবিংশতিটি আমাদের অক্ষরের ন্যায় এবং তাহার ত্রয়োদশটি দেবনাগরী, অষ্টাক্ষরমাত্র বঙ্গীয়াকার।

ইহা দ্বারা পরিলক্ষিত হইতেছে যে, প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে স্থানে স্থানে বিভিন্নপ্রকার অক্ষর প্রচলিত ছিল, তাহাদের সহিত দেবনাগরীর কি বঙ্গাক্ষরের কোন সম্পর্ক ছিল না। ক্রমে দেবনাগরী এবং বঙ্গাক্ষর অল্পে অল্পে সেই সকল প্রাচীন অক্ষরকে বিচ্যুত করিয়া এ দেশের বর্ণমালামধ্যে স্বীয় প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছে; আর দেখিতেছি, খ্রীঃ পূঃ ৩০০ অব্দে পুরাতন অক্ষরের একতৃতীয়াংশ দেবনাগরী এবং বাঙ্‌লা দ্বারা পরিভ্রষ্ট হইয়াছিল এবং খ্রীঃ ৫০০ অব্দে অর্দ্ধাধিক অধিকার করিয়াছিল। ইহার পর দেখিতে পাই, খ্রীঃ ৯৬২ অব্দের অলবারের রাজা বিজয়পালের সময়ের পঁয়ত্রিশটি অক্ষরের মধ্যে সাতটিমাত্র প্রাচীন, সাধারণ প্রচলিত অক্ষর বর্ত্তমান, আর অষ্টাবিংশতিটি আমাদের অক্ষরের সদৃশ। তাহার বিংশটি দেবনাগরীর ন্যায়, দুইটি বঙ্গাক্ষরের আকার এবং ছয়টির উভয় আকারের সহিত সমান সম্বন্ধ। খ্রীঃ ১১০০ অব্দে বাঙ্‌লার রাজা বিজয়সেনের সময়ের সপ্তত্রিংশৎ অক্ষরের মধ্যে একটিও পূর্ব্বকালের সাধারণ প্রচলিত অক্ষর নাই, এগারটি দেবনাগরীর ন্যায়, পাঁচটি বাঙ্‌লার ন্যায় এবং আর সকল উভয়পক্ষে সমান। অতএব এই সময় অর্থাৎ ১১০০ খ্রীষ্টাব্দে দেবনাগরী ও বঙ্গাক্ষর দ্বারা প্রাচীনকালের সাধারণ প্রচলিত অক্ষরসকল সম্পূর্ণভাবে তিরোহিত হইল।

এখন দেখা গেল, উক্ত দেবনাগরী ও বঙ্গাক্ষর কোথা হইতে আসিয়া প্রাচীনকালের সাধারণ প্রচলিত অক্ষরকে তিরোহিত করিয়াছিল এবং তৎপূর্ব্বে তাহারা কোথায় কি ভাবে বর্ত্তমান ছিল; অর্থাৎ দেবনাগর পবিত্র অক্ষর, পূর্ব্বে ঋষিরা এই অক্ষর জনসাধারণকে শিক্ষা করিতে দিতেন না, ইহা কেবল অতি গুহ্য ধর্ম্মপুস্তকে সম্বদ্ধ ছিল। সে সকল পুস্তক অন্যের পাঠ করিবার অধিকার

দেবনাগর অক্ষর পূর্ব্বে কি ভাবে কোথায় বর্ত্তমান ছিল।

ছিল না। সাধারণের লেখাপড়ার কার্য্যের নিমিত্ত অন্যপ্রকার অক্ষর প্রচলিত ছিল, উক্ত প্রাচীন অক্ষরসকল সেই অক্ষর। ক্রমে দেবনাগর একটি-দুইটি করিয়া তাহাতে প্রবেশ করাতে সেই প্রাচীন অক্ষর কালক্রমে অপসৃত হইয়াছে। এক্ষণে সাহিত্যে অর্থাৎ সংস্কৃতে দেবনাগর এবং প্রচলিত লেখাপড়াতে বাঙলাতে বঙ্গাক্ষর ব্যবহৃত হইতেছে। ইহারা উভয়ে মূলত এক হইয়াও দুই আকারে দুই ভাবে ব্যবহৃত হইতেছে।

উপরে দেখিতে পাইয়াছি যে, খ্রীঃ পূঃ ৩০০ অব্দে প্রাচীন অক্ষরের একতৃতীয়াংশ দেবনাগরী দ্বারা বিচ্যুত এবং ১১০০ খ্রীষ্টাব্দে সম্পূর্ণভাবে তিরোহিত হইয়াছিল। খ্রীঃ পূঃ ৩০০ অব্দ হইতে খ্রীঃ ১১০০ পর্য্যন্ত চৌদ্দশত বর্ষে যদি দুইতৃতীয়াংশের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, তবে একতৃতীয়াংশ পরিবর্ত্তিত হইতে সাতশত বর্ষ লাগিয়াছিল বলিয়া ধরা যায়। তাহা হইলে খ্রীঃ পূঃ ১০০০ দশশত অব্দে দেবনাগর অক্ষর চলিতভাষায় প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল এবং তৎপূর্ব্বে উহা কেবল ধর্ম্মপুস্তকেই নিবদ্ধ ছিল। ধর্ম্মপুস্তকে কতকাল নিবদ্ধ ছিল, তাহা এখন পর্য্যন্ত অক্ষরদ্বারা প্রমাণ করার উপায় নাই। আমরা যেমন ভাষাদ্বারাই ভাষার আদিভাব নির্ণয় করিতে প্রয়াস পাইতেছি, তেমনি অক্ষরের বয়সও অক্ষরের দ্বারাই নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিলাম। তাহাতে ন্যূনকল্পে খ্রীঃ পূঃ ১০০০ বৎসর পর্য্যন্ত পাইতেছি; তৎপূর্ব্বে উহা অপ্রকাশিতভাবে কেবলমাত্র ধর্ম্মপুস্তকে কতকাল নিবদ্ধ ছিল, তাহা অক্ষরদ্বারা নির্ণয় করা যায় না, তাহা অন্য উপায়ে কালক্রমে জানা যাইতে পারে।

কোন জাতি সভ্যতার সোপানে সমারূঢ় হইলেই তাহাদের মধ্যে লিখনপ্রণালী সমুদ্ভূত না হইয়া থাকিতে পারে না; কোন বিষয়ের অভাববোধ হইলেই তাহার পূরণ করিবার উপায় আবিষ্কৃত হয়। যখন সমাজে জ্ঞানের ও সাহিত্যের উদ্ভব হয়, তখনি তাহার লিপি করার প্রয়োজনবোধ হইয়া থাকে এবং তাহাতেই লিখনপ্রণালীর সৃষ্টি হয়। ভূমিতে নানাপ্রকার বীজ নিহিত থাকে, তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না এবং জানিতেও পারা যায় না, কিন্তু বর্ষাগমে তাহারা আপনা হইতেই অঙ্কুরিত হইয়া প্রকাশিত হয়। তখন তাহাদের উদ্ভব যেমন হইতেই হইবে, সমাজমধ্যে জ্ঞান ও সাহিত্যের বিকাশ হইলে লিখনপ্রণালীর আবিষ্কারও সেইপ্রকার অবশ্যম্ভাবী। সভ্যতার কতদূর উন্নতি হইলে পর এ দেশে লিখনপ্রণালী প্রচলিত হইয়াছিল, তাহা দুইটিশব্দ দ্বারা আমরা জানিতে পারিতেছি; সেই দুইটি শব্দ "পত্র" এবং "খড়ী"। ইহাদের দ্বারা জানা যায় যে, যখন আমরা প্রথম লিখিতে শিখিয়াছিলাম, তখন খড়ীদ্বারা বৃক্ষপত্রে লিপি করিতাম। সুতরাং সভ্যতার অতি আদিম অবস্থায় যে আমরা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি, তাহা ভাষাতত্ত্বে ভাষাদ্বারাই প্রমাণিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীনাথ সেন।

বঙ্কিমচন্দ্র। *

বারবৎসর অতীত হইল, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার শ্যামাঙ্গিনী জননীর অঙ্কদেশ শূন্য করিয়া চলিয়া গিয়াছেন; কিন্তু এতদিন আমরা তাঁহার স্মৃতির সম্মানার্থ কোনরূপ আয়োজন আবশ্যক বোধ করি নাই। হেমচন্দ্রের শিঙা নিদ্রিত ভারতের প্রবোধনকার্য্যে সমর্থ হয় নাই, তাহার স্বপ্নভঙ্গ করিয়া নীরব হইতে বাধ্য হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্যবুদ্ধি যে এতদিন জাগে নাই, তাহা আমাদের অবস্থার পক্ষে স্বাভাবিক। বারবৎসর পরে যদি সেই কর্ত্তব্যবুদ্ধি জাগিয়া থাকে, সেই প্রবুদ্ধিসাধনে আমাদের কৃতিত্ব বিচার্য্য বিষয়। বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং কোন্ তপোলোকে বা মহর্লোকে বা সত্যলোকে অবস্থিত হইয়াও মর্ত্ত্যলোকের ধূলিধূসরিতা তাঁহার দুঃখিনী জননীকে আজও ভুলিতে পারেন নাই;—সেইখানে বসিয়া তিনি বৈদেশিক রাজপুরুষের নিষ্ঠুরহস্তপ্রেরিত-শল্যপ্রয়োগে জননীর হৃদয় বিদীর্ণ হইতে দেখিয়া 'কে বলে মা তুমি অবলে' বলিয়া কাতরকণ্ঠে গান গাহিতেছেন;— আর মানবের অশ্রুতিগোচর সেই সঙ্গীত বঙ্গমাতার সপ্তকোটি সন্তানের নিদ্রাভঙ্গ করিয়া সপ্তকোটি কণ্ঠে কলকলনিনাদ উত্থাপিত করিয়া বঙ্গভূমিকে জাগ্রত করিয়াছে। আমাদের কর্ত্তব্যবুদ্ধি আজ যদি জাগিয়া থাকে, স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রই আমাদিগকে জাগাইয়াছেন, আমাদের উহাতে কোন কৃতিত্ব নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতির উপাসনার জন্য আজিকার সভা আহূত হইয়াছে; এবং যাঁহারা এই উপাসনার আয়োজন করিয়াছেন এবং এই উপাসনাকর্ম্মকে সম্ভবত সাংবৎসরিক অনুষ্ঠানে পরিণত করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা, কি কারণে জানি না, আজিকার অনুষ্ঠানের প্রধান ভার আমার উপর অর্পণ করিয়াছেন। আমার প্রতি তাঁহাদিগের এই অহৈতুকী শ্রদ্ধার পরিচয় পাইয়া ও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি আমার ভক্তিপ্রকাশের অবসর লাভ করিয়া আমি যুগপৎ গর্ব্ব ও আনন্দ অনুভব করিতেছি, কিন্তু যোগ্যতর পাত্রে এই ভার অর্পিত হইলে উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীকে বঞ্চিত হইতে হইত না। কেবল যে সময়োচিত বিনয়প্রকাশের জন্য আমি এ কথা বলিতেছি, তাহা নহে; বঙ্কিমচন্দ্র যে বিস্তীর্ণ বঙ্গীয়সাহিত্যের ক্ষেত্রে নেতৃত্বগ্রহণ করিয়া তাঁহার সহবর্ত্তী ও পরবর্ত্তী অনুচরগণের পথপ্রদর্শক হইয়া গিয়াছেন, আমিও সেই বঙ্গীয়সাহিত্যের ক্ষেত্রের এক প্রান্তে একটি সঙ্কীর্ণপথ আশ্রয় করিয়া মন্দগতিতে ধীরে ধীরে পদক্ষেপে সাহসী হইয়াছি; ইহাই আমার জীবনের কাজ ও ইহাই আমার জীবিকা; কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার প্রতিভার অত্যুজ্জ্বল আলোকবর্ত্তিকা হস্তে করিয়া সাহিত্যক্ষেত্রের যে যে অংশ প্রদীপ্ত করিয়াছিলেন, সেই সেই অংশে আমার "প্রবেশ নিষেধ"। আমি দূর হইতে সেই আলোকের উজ্জ্বলদীপ্তিতে

* গত ২৬শে চৈত্র সোমবার ক্ল্যাসিক্ রঙ্গমঞ্চে বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতিসভায় শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় কর্তৃক পঠিত।

মুগ্ধ হইয়াছি মাত্র, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের ভাগ্যবান্ সহচরগণের ও অনুচরগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেও আমি অধিকারী নহি। আজিকার আয়োজনের অনুষ্ঠাতাদিগের অনুগ্রহ জন্য অকপট কৃতজ্ঞতাস্বীকারে আমি বাধ্য আছি; কিন্তু আমি আশা করি যে, আপনারা তাঁহাদের পাত্রনির্ব্বাচনে বিষয়বুদ্ধির প্রশংসা করিবেন না।

বাঙালীর জীবনের উপর বঙ্কিমচন্দ্র কত দিকে কত উপায়ে প্রভুত্ববিস্তার করিয়াছেন, তাহা আমরা জানি; কিন্তু বাঙ্লার বাহিরে সম্ভবত তিনি বঙ্গের প্রধান ঔপন্যাসিক বলিয়াই পরিচিত, এবং ভারতবর্ষের বাহিরেও সম্ভবত তিনি বাঙ্লার সার্ ওয়াল্টার্ স্কট্ মাত্র। ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত আমার পরিচয় অতি অল্পবয়সেই ঘটিয়াছিল, সে বয়সে উপন্যাসগ্রন্থের সহিত পরিচয় বড়-একটা স্পৃহণীয় বলিয়া বিবেচিত হয় না। আমার যখন আটবৎসর বয়স, তখন বঙ্গদর্শনে বিষবৃক্ষ বাহির হইতেছিল এবং আমি বঙ্গদর্শনের কয়েক সংখ্যা হইতে বিষবৃক্ষের দুইচারিটা পরিচ্ছেদ আত্মসাৎ করিয়াছিলাম। সেই বয়সে বিষবৃক্ষের সাহিত্যরসের কিরূপ আস্বাদ অনুভব করিয়াছিলাম, তাহা ঠিক্ মনে নাই; তবে এ কথা বেশ মনে আছে যে, পাঠশালায় গিয়া তারিণীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত ভূগোলবিবরণের ভারতবর্ষের অধ্যায়ে গঞ্জাম গঞ্জাম চত্বরপুর, মসলিপটম মসলিপটম, আর্কট আর্কট, মদুরা মদুরা, টিনিভেলি টিনিভেলি প্রভৃতি অপরূপ সুশ্রাব্য নামাবলী আবৃত্তির ত্রুটি ঘটিলে পণ্ডিতমহাশয়ের নিকট বেত্রাঘাত উপহার পাইয়া বাঙ্লা-সাহিত্যের প্রতি যে অনুরাগ দাঁড়াইয়াছিল, নগেন্দ্রনাথের নৌকাযাত্রা ও কুন্দনন্দিনীর স্বপ্নদর্শন নিতান্তই তাহার সমর্থন ও পোষণ করে নাই। আমার বেশ মনে আছে যে, 'পদ্মপলাশলোচনে তুমি কে' এই পরিচ্ছেদের সহিতই আমার তাৎকালিক বিষবৃক্ষপাঠ সমাপ্ত হয় এবং ঐ পরিচ্ছেদের শীর্ষস্থিত সংক্ষিপ্ত প্রশ্নটি মনের মধ্যে বিস্ময় ও কৌতূহলের উদ্রেক করিয়া কিছুদিনের জন্য একটা অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি করে। কিছুদিনের জন্য মাত্র, কেন না, পরবৎসর আমি পাঠশালার পরীক্ষাতে যে পুরস্কার পাইয়াছিলাম, বাড়ী ফিরিয়া দেখিলাম, তাহার রাঙা-ফিতার বন্ধনের মধ্যে শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত দুর্গেশনন্দিনী ও বিষবৃক্ষ নামক দুইখানি পুস্তক রহিয়াছে। এই সভাস্থলে যাঁহারা পিতার বা পিতৃস্থানীয় অভিভাবকের গৌরবযুক্ত পদবী গ্রহণ করেন, তাঁহারা শুনিয়া আতঙ্কিত হইবেন যে, ঐ পুরস্কারবিতরণে গ্রন্থনির্ব্বাচনের ভার আমার পিতৃদেবের উপর অর্পিত ছিল, এবং তিনিই আমার গঞ্জাম গঞ্জাম চত্বরপুর প্রভৃতি সূক্ষ্ম ভৌগোলিকতত্ত্বে পারদর্শিতার পুরস্কারস্বরূপ ঐ দুইখানি গ্রন্থ নির্ব্বাচন করিয়া তাঁহার নবমবর্ষের পুত্রের হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন। পুরস্কারহস্তে বাড়ী আসিয়া রাত্রিটা একরকমে কাটাইয়াছিলাম, পরদিনে বিষবৃক্ষ ও তার পরদিনে দুর্গেশনন্দিনী টাইটেল্-পেজের হেডিং মায় মূল্য পাঁচসিকা হইতে শেষ পর্য্যন্ত একরকমে উদরস্থ করি। ঐ দুই গ্রন্থের কোন্ অংশ সর্ব্বোৎকৃষ্ট বোধ হইয়াছিল, তাহা যদি এখন অকপটে বলিয়া ফেলি,

তাহা হইলে নিশ্চয়ই আপনারা আমার কাব্য-রসগ্রাহিতার প্রশংসা করিবেন'। বিষবৃক্ষের মধ্যে যেখানে ছেলের পাল "হীরার আয়ি বুড়ী হাঁটে গুড়ি গুড়ি" বলিয়া সেই বৃদ্ধার পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিল ও বৃদ্ধা ইষ্টিরসনামক ব্যাধির প্রতিকারবিষয়ে কেষ্টরসনামক ঔষধের উপযোগিতাসম্বন্ধে প্রতিবেশিনীর সহিত আলাপ করিতেছিল, সেই স্থানটাই গ্রন্থের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছিলাম। গজপতি বিদ্যাদিগ্গজকেই দুর্গেশনন্দিনীর মধ্যে সর্ব্বপ্রধান পাত্র স্থির করিয়াছিলাম, ইহাও নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করিতেছি। আমি যে সময়ের কথা কহিতেছি, সে সময়ে পল্লীগ্রামের মধ্যে কলিকাতার ফ্যাশন্ প্রবেশ করে নাই। তখন কোন গৃহস্থের বাড়ীতে যাত্রা উপস্থিত হইলে পল্লীগ্রামের যাবতীয় লোক সেই যাত্রা শুনিতে সমবেত হইত ও রাত্রি জাগিয়া যাত্রা শুনিতে বাধ্য হইত। যাত্রায় গানের ও বক্তৃতার মধ্যে মধ্যে সং আসিত। আমাদের মত বালকের নিকট ঐ গানের অংশ ও বক্তৃতার অংশটা অর্থাৎ অভিনয়ের অধিকাংশটাই অনাবশ্যক আড়ম্বর বলিয়া বোধ হইত; এবং সংএর ভাগটা কেন যে বাড়ান হয় না, ইহার কোন সঙ্গত কারণ নির্ণয় করিতে না পারায় বয়স্ক শ্রোতাদিগের রুচি ও প্রবৃত্তি আমাদের দুরধিগম্য হইত। বক্তৃতার দীর্ঘসমাসবহুল বাক্যপরম্পরা বরং সহ্য ছিল, কিন্তু গানের অংশ আরম্ভ হইলেই আমাদের ঘুমের সময় উপস্থিত হইত। গান, বিশেষত চোগাচাপকানধারী জুড়ির গান, বস্তুতই অসহ্য বোধ হইত। ছোটলাটদুয়ার চার্লস্ ইলিয়টের মত ক্ষমতা হাতে থাকিলে আমরা এক কলমে যাত্রা হইতে জুড়ি-সিস্টেম্ উঠাইয়া দিতাম, তাহার সন্দেহ নাই। ঠিক্ একই কারণেই দুর্গেশনন্দিনীপাঠমাত্রেই বিদ্যাদিগ্গজের প্রতি আমার আত্যন্তিক শ্রদ্ধা উপস্থিত হইয়াছিল। আশমানির ঘরে বিমলার আকস্মিক প্রবেশের সহিত বিদ্যাদিগ্গজ ঘরের কোণে লুকাইয়া আত্মগোপন করিলেন, এবং তাঁহার শীর্ষরক্ষিত হাঁড়ি হইতে অড়হরের ডাল বিগলিত হইয়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গে মন্দাকিনীর ধারা বহাইল, সেই বিবরণ যখনই পাঠ করিলাম, তখনই বুঝিলাম, শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাঙ্লাদেশে একটা মানুষের মত মানুষ এবং শ্রীতারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায় কখনই তাঁহার ভ্রাতা নহেন। আরও বুঝিলাম যে, বাঙ্লাসাহিত্য অতি উপাদেয় পদার্থ; এই সাহিত্যের সরোবরে বিদ্যাদিগ্গজের মত শতদলকমল যখন বিদ্যমান আছে, তখন গঙ্গাম গঙ্গাম চত্বরপুরের কাঁটাবন ঠেলিয়াও সেই কমলচয়নের চেষ্টা অনুচিত নহে।

আজিকার এই প্রবন্ধপাঠকের বয়ঃক্রম যে নয়বৎসরের অনেক উর্দ্ধে, সে বিষয়ে আপনারা সন্দেহ করিবেন না; কিন্তু আমার কাব্যরসগ্রাহিতার যে অধিক উৎকর্ষ ঘটিয়াছে, সে বিষয়ে আপনাদিগকে নিঃসংশয় করিতে পারিব না। তখন যাহারা ছেলের পালের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া হীরার আয়ি বুড়ীর পশ্চাদ্ধাবন করিত, এখন তাঁহাদের অনেকের মাথায় পাকাচুল গজাইয়াছে, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ; কিন্তু বাঙ্লাদেশে বাঙালীসমাজে এত পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও বাঙ্লার ছেলের পালের স্বভাবে বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটে নাই, ইহাও

আপনারা প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন। হাঁরার আয়ি বুড়ী সম্ভবত এতদিন মরিয়া গিয়াছে, পাড়াগাঁয়ের পুলিসের জন্মমৃত্যুর রেজিষ্টরি-বহির অনুসন্ধান করিলে তাহার নির্ণয় হইতে পারে কি না, বঙ্গীয়সাহিত্যপরিষৎ তাহা গবেষণার বিষয় করিবেন, কিন্তু বাঙ্লার ছেলের পাল যে আজিও শাদারঙের বুড়া-বুড়ী দেখিলেই তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া "বন্দে মাতরম্" বলিয়া তাহার কর্ণতৃপ্তি সম্পাদন করিতেছে, তাহাতে এই উন্নতির যুগেও বালকচরিত্রের উৎকট স্থিতিশীলতারই পরিচয় পাইতেছি। আমি যদি অকপটে স্বীকার করি যে, এই বত্রিশবৎসর পরেও আমি বালকচরিত্রের এই রহস্যকে জগতের শ্রেষ্ঠ-কাব্যের অন্তর্গত বলিয়া আনন্দ অনুভব করিতেছি, তাহা হইলে আপনারা আমাকে ক্ষমা করিবেন।

ঔপন্যাসিক-বঙ্কিমচন্দ্র-সম্বন্ধে এত লোকে এত কথা কহিয়াছেন যে, আর সে বিষয়ে কোন কথিতব্য আছে কি না, আমি জানি না। কথিতব্য থাকিলেও আমি কোন কথা বলিতে সাহস করিব না। শ্রোতৃগণের মধ্যে অনেকেই হয় ত দাবি করিবেন যে আমি যখন বঙ্কিমচন্দ্রের সম্বন্ধে প্রবন্ধপাঠে উদ্যত হইয়াছি, তখন আমি সূর্য্যমুখীর ও ভ্রমরের চরিত্র আর একবার সূক্ষ্মরূপে বিশ্লেষণ করিয়া উভয় চরিত্রের তুলনামূলক সমালোচনে বাধ্য আছি। যদি কেহ এইরূপ দাবি রাখেন, তাঁহার নিকট আমি ক্ষমাভিক্ষা করিতেছি। মানবচরিত্র বা মানবীচরিত্র সমালোচনে আমার কিছুমাত্র শিক্ষা বা দক্ষতা নাই; কেন না, নবেলবর্ণিত-মানবচরিত্র বিশ্লেষণে নাইট্রিক্ এসিডের কিছুমাত্র উপযোগিতা নাই; ঐ মানবচরিত্র নমনীয়ও নহে, দ্রবণীয়ও নহে এবং জলে দ্রব করিয়া উত্তাপ-প্রয়োগে উহার ভাস্বরতাপাদনও অসম্ভব। আর আমার কাব্যরসগ্রাহিতার যে নমুনা দিয়াছি, তাহাতে আপনারাও আমার নিকট সে আশা রাখেন না।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসসম্বন্ধে একটা স্থূল কথা আমার বলিবার আছে, সেই কথাটা সংক্ষেপে বলিয়াই আমি আপনাদিগকে রেহাই দিব।

এক শ্রেণীর সমালোচক আছেন, তাঁহারা বলেন, মানবসমাজের সুখদুঃখ, রেষারেষি, দ্বেষাদ্বেষি এবং ভালবাসাবাসি যথাযথরূপেই চিত্রিত করাই নবেলের মুখ্য উদ্দেশ্য; উহাতে কল্পনার খেলার অবসর নাই। ইঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রের উপর সম্পূর্ণ প্রসন্ন নহেন। আর এক শ্রেণীর সমালোচক বলেন, পাপ-পুণ্যের ফলাফলের তারতম্য দেখাইয়া সমাজের নীতিশিক্ষার ও ধর্ম্মশিক্ষার বিধানই নবেলের মুখ্য উদ্দেশ্য হইবে এবং সেই উদ্দেশ্যসাধনে সফলতা দেখিয়াই নবেলের উৎকর্ষ বিচার করিতে হইবে। ইঁহারাও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি সম্পূর্ণ প্রসন্ন নহেন। ব্যাকরণশাস্ত্রে যেমন ভট্টিকাব্য, ইঁহাদের মতে ধর্ম্মনীতিশাস্ত্রে তেমনি নবেল; কাব্যের ছলনা করিয়া পাঠকগণকে কাঁদানই নবেলরচনার মুখ্য উদ্দেশ্য। মানবসমাজের যথাযথ চিত্র আঁকিতে নৈপুণ্যের প্রয়োজন, আর নীতিশাস্ত্র অতি সাধুশাস্ত্র, ইহা স্বীকার করিয়াও আমরা মনে করিয়া লইতে পারি—নবেল একরকমের কাব্য এবং সৌন্দর্য্যসৃষ্টিই কাব্যের প্রাণ।

কেবল নীতিশাস্ত্র কেন, যদি কেহ দর্শনশাস্ত্র বা রসায়নশাস্ত্রকেই নবেলের বিষয় করিতে চাহেন, তাহাতে আপত্তি করিব না। কিন্তু বিষয়টি যদি সুন্দর না হয়, তাহা হইলে তাহা কাব্য হয় না।

সৌন্দর্য্যেরও প্রকারভেদ আছে; গাছপালার ছবি সুন্দর হইতে পারে, গুপ্তকথার হরিদাসও সুন্দর হইতে পারেন, কিন্তু মানবজীবনের ও জগৎসংসারের গোড়ার কথাগুলি যিনি সুন্দর করিয়া দেখাইতে পারেন, তিনিই প্রথমশ্রেণীর কবি; গোড়ার কথা দেখাইলেই কবি হয় না; সেটা দার্শনিকের ও বৈজ্ঞানিকের ও ধর্ম্মতত্ত্ববিদের কাজ, কিন্তু তাহা সুন্দর করিয়া দেখাইতে পারিলেই কবি হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের নবেলের মধ্যে সেইরকম গোড়ার কথা দুইএকটা সুন্দর করিয়া দেখান হইয়াছে; এইজন্য কবির আসনে তাঁহার স্থান অতি উচ্চ।

মানবজীবনের একটা গোড়ার কথা এই যে, উহা আগাগোড়া একটা সামঞ্জস্যস্থাপনের চেষ্টামাত্র। শুধু মানবজীবনের কথাই বা বলি কেন, বহিঃপ্রকৃতির সহিত অন্তঃপ্রকৃতির নিরন্তর সামঞ্জস্যস্থাপনের নামই জীবন। যাঁহারা হার্বার্টস্পেন্সারপ্রদত্ত জীবনের এই পারিভাষিক সংজ্ঞা জানেন, তাঁহারা আমার কথায় সায় দিবেন। জীবনের উহা অপেক্ষা ব্যাপকতর সংজ্ঞা আমি দেখি নাই। যাহার জীবন আছে, তাহাকে দুই দিকের টানাটানির মধ্যে বাস করিতে হয়। ধবলগিরিপর্ব্বত বহুকাল হইতে বরফের বোঝা মাথায় করিয়া ভারতবর্ষের পুরুষপরম্পরা অবলোকন করিতেছেন, কিন্তু বিজ্ঞানশাস্ত্র তাঁহার সজীবতায় সন্দেহ করেন। ধবলগিরি এত মহান্ হইয়াও শীতাতপের ও জলবৃষ্টির ও তুষারবৃষ্টির উৎপাত অকাতরে সহিয়া আসিতেছেন, এবং শত স্রোতস্বিনীর সহস্র ধারা তাঁহার কলেবরকে শীর্ণ ও বিদীর্ণ ও ক্ষীণ করিয়া তাঁহার অভ্রভেদী মস্তককে সমভূমি করিবার চেষ্টা করিতেছে—সেই আপন্নিবারণের জন্য তাঁহার কোন চেষ্টাই নাই। কিন্তু সামান্য একটি পিপীলিকা ক্রমাগত আহারসংগ্রহ করিয়া আপনার ক্ষয়শীল দেহের পূরণ করিয়া থাকে এবং যদি কেহ তাহাকে দলিত করে, সে দংশন করিয়া আত্মরক্ষণে সাধ্যমত ত্রুটি করে না। একদিকে বহিঃপ্রকৃতি তাহাকে ক্রমাগত ধ্বংসের মুখে টানিতেছে; অন্যদিকে সে ধ্বংস হইতে আত্মরক্ষার জন্য কেবলই চেষ্টা করিতেছে। তাহার কীটজীবন এই চেষ্টার পরম্পরামাত্র। যেদিন সেই চেষ্টার বিরাম, সেইদিন তাহার মৃত্যু। মানুষও ঠিক পিপীড়ার মতই জীবন ব্যাপিয়া আপনাকে মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষার জন্য ব্যাপৃত। মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু অন্তঃপ্রকৃতিকে বহিঃপ্রকৃতির আক্রমণনিবারণে সমর্থ করিয়া মৃত্যুনিবারণের ধারাবাহিক চেষ্টাই তাহার জীবন। সর্ব্বনাশ সমুৎপন্ন হইলে পণ্ডিতলোকে অর্দ্ধত্যাগে বাধ্য হন; তাই মৃত্যু অনিবার্য্য জানিয়া পণ্ডিত-জীব আপনার অর্দ্ধেককে অপত্যরূপে রাখিয়া অপরার্দ্ধকে ত্যাগ করিয়া থাকেন। সর্ব্বনাশ সমুৎপন্ন হইলে জীবনের কিয়দংশরক্ষার জন্য এই অপত্যোৎপাদন। আহার, নিদ্রা, ভয়, আর চতুর্থ একটা প্রবৃত্তির একমাত্র উদ্দেশ্য যেন-তেন জীবনরক্ষা; এবং জীবনরক্ষার দুই উপায়, আত্মরক্ষা ও বংশরক্ষা। পশুর সহিত

নরের এই স্থলে সামান্য; কাজেই ঐ চারিটা প্রবৃত্তিকে আমরা পাশবপ্রবৃত্তি বলিয়া থাকি।

কিন্তু মানুষের একটু বৈশিষ্ট্য আছে। মানুষ অতি দুর্ব্বল পশু, সবল শত্রুর নিকট আত্মরক্ষার জন্য সে আর একটা কৌশল আশ্রয় করিয়াছে। মানুষ দল বাঁধিয়া বাস করে; সেই দলের নাম সমাজ। দল বাঁধিয়া থাকিতে হইলে স্বাধীনতাকে ও স্বাতন্ত্র্যকে সংযত করিতে হয়—নতুবা দল ভাঙিয়া যায়। যে পাশবপ্রবৃত্তি সমাজকে তুচ্ছ করিয়া মানুষকে কেবল আত্মরক্ষার দিকে প্রেরিত করে, দলের কল্যাণার্থ মানুষ সেই পাশবপ্রবৃত্তির সংযমে বাধ্য হয়। সহজাত সংস্কারের অভাবে অতীতের অভিজ্ঞতায় ভর দিয়া ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বুদ্ধিপূর্ব্বক পাশবপ্রবৃত্তিকে সংযত করিতে হয়। এইজন্য যে বুদ্ধি আবশ্যক, তাহার নাম ধর্ম্মবুদ্ধি; ইহা বিশিষ্টরূপে মানবধর্ম্ম। ইহা সমাজরক্ষার অনুকূল, ইহা লোকস্থিতির সহায়। মানুষের পশুজীবনই ত দুই টানাটানির ব্যাপার; উহার উপর এই সামাজিক জীবন আর একটা নূতন টানাটানির সৃষ্টি করে। আত্মরক্ষার ও বংশরক্ষার অভিমুখে যে সকল প্রবৃত্তি, তাহা মানুষকে এক পথে প্রেরণ করে, আর মানুষের ধর্ম্মবুদ্ধি, যাহা মুখ্যত সমাজরক্ষার অর্থাৎ লোকস্থিতির অনুকূল, গৌণত আত্মরক্ষার অনুকূলমাত্র, তাহা মানুষকে অন্যদিকে প্রেরণ করে। সামাজিক মানুষকে এই দুই টানাটানির মধ্যে পড়িয়া উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধানের জন্য কেবলই চেষ্টা করিতে হয়। এই সামঞ্জস্যস্থাপনের নিরন্তর চেষ্টাই মানুষের নৈতিকজীবন। প্রবৃত্তি তাহাকে উদ্দাম স্বাতন্ত্র্যের দিকে ঠেলে, আর ধর্ম্মবুদ্ধি তাহার অন্তরের অন্তর হইতে তাহাকে নিবৃত্তিমার্গে চালাইতে চেষ্টা করে। এই দুই টানাটানির মধ্যে পড়িয়া মনুষ্য কৃপার পাত্র। এইখানেই মানুষের Original sin; এইখানেই Origin of evil; মানবজীবনের উৎকট রহস্যে ইহাই গোড়ার কথা। খোদার সঙ্গে সয়তানের চিরন্তন বিবাদের মূল এইখানে। মনুষ্যের হৃদয় সেই জীবনব্যাপী মহাহবের কুরুক্ষেত্র;—ধর্ম্মের সহিত অধর্ম্মের মহাযুদ্ধ সেখানে নিরন্তর চলিতেছে। বঙ্কিমচন্দ্র চারিখানি উপন্যাসে এই গোড়ার কথাটার আলোচনা করিয়াছেন। সেই মহাযুদ্ধের ক্ষেত্র হইয়া মানবহৃদয় কিরূপ ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত হইয়া থাকে, তাহা তিনি সুন্দর করিয়া দেখাইয়াছেন, তাহাতেই তিনি উচ্চশ্রেণীর কবি।

বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর, রজনী, আর কৃষ্ণকান্তের উইল, এই চারিখানি উপন্যাসের কথা আমি বলিতেছি। এই চারিখানি গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় এক। বংশরক্ষার কৌশল আবিষ্কার করিয়া অনিবার্য্য মৃত্যু হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য একটা পাশবপ্রবৃত্তির উৎপত্তি হইয়াছে, পূর্ব্বে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। কোন্ তারিখে তাহার উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা ইতিহাসে লেখে না; ডারুইন এবং উইসমান ইহার তারিখ-অন্বেষণে চেষ্টা পাইয়াছেন। প্রজাপতির কাছারিতে দুইটা ডিপার্টমেণ্ট;—একটার অধিকার প্রজাসৃষ্টি, অন্যটার অধিকার লোকস্থিতি। প্রজাসৃষ্টির ডিপার্টমেণ্টের পোর্টফোলিয়ো প্রজাপতির মানসপুত্রের হস্তে; তিনি ফুলের ধনুতে ফুলের বাণ জুড়িয়া সংসারের নরনারীকে কেবলই

আঘাত করিতেছেন, তাহাতে প্রজাসৃষ্টির সুন্দর ব্যবস্থা হইলেও সময়ে সময়ে লোকস্থিতির ব্যাঘাত ঘটিতেছে। অন্য ডিপার্টমেণ্টের দপ্তর দক্ষিণদিক্‌পাল ধর্ম্মরাজের অধীন; পুষ্পবাণে বিদ্ধ হইয়া সমাজতন্ত্রের অবাধ্যতা করিয়া যাহারা লোকস্থিতিরব্যাঘাত জন্মাইতেছে, দপ্তরী চিত্রগুপ্ত তাহাদের নাম ব্ল্যাক্‌বুকে টুকিয়া লইতেছেন। দুইটা ডিপার্টমেণ্টে এইরূপ বিরোধের সৃষ্টি করিয়া প্রজাপতি কতটা ন্যায়ব্যবস্থা দেখাইয়াছেন, তাহা জানি না; কিন্তু মনুষ্য যে তাহার ফলে কৃপাপাত্র হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ করি না।

ধর্ম্মশাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্র যতই ভ্রূকুটিভঙ্গী করিয়া পথভ্রষ্ট মনুষ্যকে তিরস্কার করুন, মনুষ্য বস্তুতই কৃপার পাত্র। বঙ্কিমচন্দ্র সেই কৃপাপাত্র মনুষ্যের শোচনীয় অবস্থা তাঁহার চারিখানি উপন্যাসে সুন্দর করিয়া আঁকিয়া দেখাইয়াছেন;—প্রতাপ ও নগেন্দ্রনাথ, অমরনাথ ও গোবিন্দলাল, সকলেই সেই কুসুমসায়কের লক্ষ্য হইয়াছিলেন; ধর্ম্মবুদ্ধির দৃঢ়তা ও প্রবৃত্তির তীব্রতার তারতম্যানুসারে কেহ বা জয়লাভ করিয়াছিলেন, কেহ বা পারেন নাই। চিত্রগুপ্তের খাতায় সকলেরই কিন্তু নাম উঠিয়াছিল। বীর্য্যবন্ত প্রতাপ সারাজীবন প্রবৃত্তির সহিত যুদ্ধ করিয়া সম্পূর্ণ জয়লাভ করিয়াছিলেন, মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার অতি সংক্ষিপ্ত উক্তিতে তাঁহার জীবনব্যাপী কঠোর ও নীরব সাধনার বিষয় জগতের লোকে জানিতে পারিয়াছিল। মোহমুগ্ধ অমরনাথ আপনার পিঠের উপর আকস্মিক পদস্খলনের স্থায়ী চিহ্ন ধারণ করিয়া তাঁহার স্বাভাবিক দম্ভের বলে পরবর্ত্তী জীবনে সন্ন্যাসী সাজিয়া বেড়াইয়াছিলেন; পত্নীবৎসল নগেন্দ্রনাথ আপনার আত্মাকে ছিন্ন-ভিন্ন-বিদীর্ণ করিয়া অনাথা পিতৃহীনা বালিকার প্রতি দয়াপ্রকাশের ফলভোগ করিয়াছিলেন; আর সর্ব্বাপেক্ষা কৃপাপাত্র গোবিন্দলাল সর্ব্বতোভাবে আপনার অনধীন ঘটনাচক্রের নিষ্ঠুর পেষণে নিষ্পিষ্ট হইয়া আপনাকে কলঙ্কহ্রদে নিমগ্ন করিয়া অবশেষে অপমৃত্যুদ্বারা শান্তিলাভে বাধ্য হইয়াছিলেন।

এই চারিটি মনুষ্যের বিভিন্ন দশার চিত্র সম্মুখে রাখিয়া আমরা কখনও মানবচরিত্রের মহিমা দেখিয়া স্পর্দ্ধিত ও গর্ব্বিত হইতে পারি, কখনও বা জাগতিক শক্তির সম্মুখে মানবের দৌর্ব্বল্য দেখিয়া ভীত হইতে পারি। বঙ্কিমচন্দ্র মানবজীবনের ও জগদ্বিধানের এই সমস্যা—এই গোড়ার কথা—অতি সুন্দর চিত্রে চিত্রিত করিয়াছেন এবং এইজন্য তিনি উচ্চশ্রেণীর কবি।

আজিকার দিনে বঙ্কিমচন্দ্রের অদৃশ্য-হস্ত আমাদের জাতীয়জীবনকে যেরূপে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিতেছে, তাহাতে ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র যতই উচ্চস্থানে অবস্থান করুন, বঙ্কিমচন্দ্রের অন্য মূর্ত্তির পদপ্রান্তে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতে আজ ব্যগ্র হইব, ইহা স্বাভাবিক। বঙ্কিমচন্দ্র কতদিক্ হইতে আমাদের জীবনের উপর প্রভুত্ব করিতেছেন, তাহার গণনা দুষ্কর। ইংরেজিতে একটা বাক্য চলিত হইয়াছে, যাহার মূলে গ্রীক্ নাই, সে জিনিষ জগতে অচল। বলা বাহুল্য, পাশ্চাত্যজাতির জগৎ অর্থে কেবল পাশ্চাত্ত্যদেশ বুঝায়। আমরা যদি ঐ বাক্যকে ঈষৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া বলি যে, যাহার মূলে বঙ্কিমচন্দ্র নাই, সে জিনিষ বাঙ্‌লাদেশে

অচল, তাহা হইলে নিতান্ত অত্যুক্তি হইবে না। ইংরেজি গতিবিজ্ঞানে একটা শব্দ আছে, মোমেণ্টম্; বাঙ্‌লায় উহাকে ঝোঁক-শব্দে অনুবাদ করিতে পারি। বঙ্কিমচন্দ্র যে কয়টা জিনিষকে ঝোঁক দিয়া ঠেলিয়া দিয়া গিয়াছেন, সেই কয়টা জিনিষ বাঙ্‌লাদেশে চলিতেছে। সেই জিনিষগুলা গতি-উপার্জ্জনের জন্য যেন বঙ্কিমচন্দ্রের হস্তের প্রেরণার অপেক্ষায় ছিল; বঙ্কিমচন্দ্র হাত দিয়া ঠেলিয়া দিলেন, আর উহা চলিতে লাগিল, তাহার পর আর উহা থামে নাই।

দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রথমে নবেলের কথাটাই ধরা যাক্। বঙ্কিমবাবুর পূর্ব্বেও অনেকে বাঙ্‌লা নবেল লিখিয়াছিলেন; তাহাতে কিসের যেন অভাব ছিল। ইংরেজিনবিশ অনেক লেখক ইংরেজি নবেলের অনুকরণে বাঙ্‌লা নবেল লিখিয়াছিলেন; কিন্তু কি-একটা অভাবের জন্য উহা বাঙ্‌লাসাহিত্যে লাগে নাই। বঙ্কিমচন্দ্র নবেল লিখিলেন, আর একদিনেই বাঙ্‌লায় সাহিত্যের একটা নূতন-শাখার সৃষ্টি হইল। স্রোতস্বতীর যে ক্ষীণধারা প্রবাহিত হইতেছিল, এখনি উহা নূতন পথ পাইয়া বিপুল কায় গ্রহণ করিয়া শত উপশাখার সৃষ্টি করিয়া দেশ ভাসাইয়া জল-প্লাবন উপস্থিত করিল। সকলেই জানেন যে, এই জলপ্লাবনে সাহিত্যক্ষেত্র ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। বলা বাহুল্য, বাঙ্‌লার অধিকাংশ নবেলই অপেয়, অদেয় ও অগ্রাহ্য; কিন্তু ইহার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র দায়ী নহেন। ইহাতে দেশের দারিদ্র্যের ও দুরবস্থারই পরিচয় দেয়। বঙ্কিমচন্দ্রের কৃতিত্বের ইহাতে অঙ্গহানি হয় না। এখন হয় ত বাঁধ বাঁধিয়া দেশকে এই প্লাবন হইতে রক্ষা করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু এই মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার দিনে সেইরূপ বাঁধ বাঁধিবার কোন উপায় দেখি না। বঙ্কিমচন্দ্রের পর যাঁহারা নবেল লিখিয়াছেন, তাঁহারা যদি প্রকৃতপক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের অনুবর্ত্তী হইয়া সৌন্দর্য্যসৃষ্টিকেই কাব্যরচনার মুখ্য উদ্দেশ্য করিতেন, তাহা হইলে আমাদের এতটা আতঙ্কিত হইবার সম্ভাবনা থাকিত না।

বঙ্কিমচন্দ্রকেই আমরা এদেশে মাসিক-পত্রের প্রবর্ত্তক বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি। বঙ্গদর্শনের পূর্ব্বেও অনেক মাসিকপত্রিকা বাহির হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতেও কি-যেন-কি-একটার অভাব ছিল, তাই তাহারা সাহিত্য-সমাজে প্রভুত্ববিস্তার করিতে পারে নাই। বঙ্গদর্শনই প্রথমে ভবিষ্যতের মাসিকপত্রের রচনারীতি ও সঙ্কলনরীতি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিল; তদবধি সেই রীতি মাসিকপত্রের সম্পাদকগণকর্ত্তৃক অনুসৃত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে মাসিকপত্র দাঁড়াইয়া ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের হস্তের প্রেরণা পাইয়াই মাসিকপত্র বঙ্গসাহিত্যে চলিতে লাগিল।

নবেলের মত এই মাসিকসাহিত্যও বিদেশ হইতে এদেশে আমদানি। এক দেশের গাছের বীজ আনিয়া অন্য দেশে উহার চাষের চেষ্টা বহুদিন হইতে প্রচলিত আছে। আজ ক্ষুব্ধ ভারতবর্ষ বিদেশের দ্রব্য গ্রহণ করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছে, কিন্তু বিদেশী জিনিষকে স্বদেশে স্থান দিতে ভারতবর্ষের কোনকালে আপত্তি ছিল না। আলুর বীজ ও পেঁপের বীজ বিদেশ হইতেই এদেশে আসিয়াছিল; এবং আফিমের জন্য ও তামাকের জন্য ভারত-বাসী বিদেশের নিকট চিরঋণে আবদ্ধ আছেন।

অজ্ঞাতকুলশীল অতিথিকে আপন ঘরে স্থান দিতে ভারতবাসী কস্মিন্‌কালে কুণ্ঠাবোধ করে নাই। দক্ষিণ আফ্রিকাতে আমাদের যে সকল ইম্পিরিয়ালিষ্ট ভ্রাতা বাস করেন, ইম্পিরিয়াল্‌-যজ্ঞে আলম্ভনের জন্য ভারতবর্ষের পশু সংগ্রহ করিতে তাঁহাদের আপত্তি নাই, কিন্তু সেই পশুগুলির ঘাসজলের ব্যবস্থার জন্য দুইকাঠা জমি ছাড়িয়া দিতে তাঁহারা বড়ই কাতর। দক্ষিণ-আফ্রিকাবাসী ইংরেজেরা আমাদের কিরূপ সংবর্দ্ধনা করেন, তাহা আমরা সকলেই জানি। তাঁহাদের যে সকল মাস্‌তুত ভাই অষ্ট্রেলিয়ায় বাস করিতেছেন, তাঁহাদেরও কুটুম্বিতারীতি আমাদের অবিদিত নাই। ভারতবাসীর ব্যবহার এ বিষয়ে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। দিল্লীর বাদশাহ যদি সার্ টমাস্ রো'কে আতিথ্য-অনুগ্রহ-বিতরণে একটু কার্পণ্য করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার ভবিষ্যৎ বংশধরকে দিল্লীর রাজপথে হড্‌সনের পিস্তলের গুলিতে জীবনদান করিতে হইত না। সে যাহাই হউক্, বিদেশের সামগ্রী গ্রহণ করিতে আমাদের কোনকালেই ঔদার্য্যের অভাব ছিল না। বিদেশের সকল বীজ এদেশের ক্ষেতে ধরে না, কোন-কোনটা বেশ ধরিয়া যায়,—ইংলণ্ডেশ্বর প্রথম জেম্‌সের প্রেরিত বীজটা অত্যন্ত উৎকৃষ্টরূপে ধরিয়া গিয়াছে। কোন-কোন বীজ ফলাইবার জন্য চাষের প্রণালীকে ক্ষেতের অনুযায়ী করিয়া লইতে হয়। নবেলের বীজ ও মাসিকপত্রিকার বীজ বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ব্বেই আসিয়াছিল;—যাঁহারা উহার আমদানি করিয়াছিলেন, তাঁহারা উহা ফলাইতে পারেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র যেদিন চাষের ভার গ্রহণ করিলেন, সেইদিন উহা জমিতে লাগিয়া গেল; এখন উহার শস্যসম্পত্তিতে সুজলা সুফলা বঙ্গধরিত্রী ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। আফিম এবং তামাক, এই দুই উপাদেয় ফসল এদেশের জমিতে যেমন লাগিয়া গিয়াছে, নবেলের এবং মাসিকপত্রিকার শস্যসম্পৎ কিছুতেই তাঁহার নিকট ন্যূনতাস্বীকার করিবে না।

চারিটিদিন পরে যে বৎসর সমাপ্তিলাভ করিবে, সেই বৎসরটি বাঙ্‌লার ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে, এইরূপ আমরা আশা করি। এই বৎসরে আমরা একটা বিশেষ শিক্ষা লাভ করিলাম; এই বৎসর উচ্চকণ্ঠে আমাদিগকে আপন ঘরে ফিরিতে শিক্ষা দিয়াছে। বাঙ্‌লায় নবেলসাহিত্যের ও মাসিক-সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র যশস্বী হইয়া গিয়াছেন, কিন্তু তিনি তার অপেক্ষাও বড় কাজ করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্‌লাসাহিত্যে তাঁহার কোন্ কাজ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, তাহা জিজ্ঞাসা করিলে আমি বলিব, তিনি সাহিত্য উপলক্ষ্য করিয়া আমাদিগকে আপন ঘরে ফিরিতে বলিয়াছিলেন, এবং সে বিষয়ে তিনি যেমন কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, কেহই সেরূপ হন নাই। ইংরেজের ভাষা অবলম্বন করিয়া আমরা যে বড় হইতে পারিব না, বিদেশের ভাষার সাহায্যে সাহিত্যসৃষ্টি করিয়া বড় হইবার চেষ্টা যে অস্বাভাবিক ও উপহাস্য, তাহা বঙ্কিমচন্দ্রই আমাদিগকে বুঝাইয়া গিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের বহুপূর্ব্বে মহাত্মা রামমোহন রায় দেশের লোকের সঙ্গে কথা কহিবার জন্য দেশের ভাষারই আশ্রয় লইয়াছিলেন; তিনি বাঙ্‌লায় সাময়িকপত্র প্রচার করেন, বাঙ্‌লায় বেদান্তশাস্ত্র প্রকাশ করেন, দেশের লোকের মতিগতি ফিরাইবার জন্য

দেশের লোকের অবোধ্য ভাষায় দেশের লোককে সম্বোধনের অদ্ভুত প্রণালী তাঁহার স্থিরবুদ্ধি সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করে নাই। এমন কি, তিনিই বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বাঙ্‌লাভাষার প্রথম ও শেষ ব্যাকরণ লিখিয়া গিয়াছেন। রামমোহন রায় যাহা বুঝিয়াছিলেন, তাঁহার পরবর্ত্তী বাঙালীরা তাহা বুঝিতে পারেন নাই। হিন্দুকালেজ-প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিপন্ন হইয়া গেল যে, হিন্দুস্থানে হিন্দুসন্তানের আশ্রয় বা আলম্বন, হিন্দুসন্তানের জ্ঞাতব্য বা রক্ষিতব্য কিছুই নাই উমিচাঁদের সম্পৃক্ত দলীলে পরের নাম জাল করিয়া যিনি এদেশে সাম্রাজ্যপত্তন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার স্বদেশ হইতে হিন্দুস্থানের লোককে ধর্ম্মশিক্ষার প্রণালী পর্য্যন্ত আমদানি করিতে হইবে। এই বর্ব্বর দেশের বর্ব্বর জাতির প্রাচীন সাহিত্যে ক্ষীরসমুদ্র ও দধিসমুদ্রের কথা ভিন্ন আর কোন কথা নাই সিদ্ধান্ত করিয়া লর্ড মেকলে এদেশে পাশ্চাত্যশিক্ষা আনয়ন করিলেন। বিদেশের এই নূতন আমদানি শিক্ষাকে এদেশের লোকে সমাদরে গ্রহণ করিল ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত করিয়া বসিল, ইংরেজের মত মহাশয়পুরুষ যখন এ দেশকে বর্ব্বরের দেশ বলিয়াছে, তখন সেই বর্ব্বরের ভাষায় সাহিত্যসৃষ্টির চেষ্টা সম্পূর্ণ বৃথা হইবে। ইংরেজিশিক্ষার প্রথম ধাক্কায় আমাদিগকে ঘর হইতে বাহিরে লইয়া পরের দ্বারে ভিক্ষার্থিবেশে স্থাপিত করিয়াছিল, বঙ্কিমচন্দ্র আমাদিগকে আপন ঘরে ডাকিয়া আনেন। বিদ্যাসাগরমহাশয় বাঙ্‌লাভাষাকে সংস্কৃত করিয়া উহাকে সাহিত্যসৃষ্টির উপযোগী করিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র উহাকে পুনঃসংস্কৃত করিয়া বাঙ্‌লা-সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। ইংরেজি লিখিয়া যশস্বী হইবার অস্বাভাবিক দুরভিলাষের বন্ধন হইতে বঙ্কিমচন্দ্রই আমাদিগকে মুক্তি দিয়া গিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র যাহার মূলে নাই, সে জিনিষ বাঙ্‌লাদেশে চলে না। রামমোহন রায় বাঙ্‌লা-ভাষার সাহায্যে বাঙ্‌লাসাহিত্যের সৃষ্টির প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার চেষ্টা চলে নাই; তাঁহার পরবর্ত্তী শিক্ষিতবাঙালী সেই গতির রোধ করিয়াছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা-সাগর সংস্কৃতভাষার ও সংস্কৃতসাহিত্যের পুণ্য-তোয়ে বাঙ্‌লাভাষাকে স্নান করাইয়া তাহার দীপ্তকলেবর শিক্ষিতসমাজের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছিলেন; কিন্তু শিক্ষিতসমাজ তাহার প্রতি শ্রদ্ধাপ্রকাশ কর্ত্তব্য বোধ করে নাই। রামমোহন রায়ের ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দেবদেহের জ্যোতির্ম্মণ্ডিত শিরোভূষণ হইতে একখানি মাণিক্য অপসারণ না করিয়াও আমরা স্বীকার করিতে পারি যে, তাঁহারা যে কার্য্যে অসমর্থ হইয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা অবলীলাক্রমে সেইকার্য্যসম্পাদনে সমর্থ হইয়াছিল।

আপনাদের সকলের শ্রদ্ধাভাজন ও আমার প্রিয়সুহৃৎ শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহোদয় সেদিন রাগের মাথায় তাঁহার বহুপরিশ্রমে উপার্জ্জিত ইংরেজি বিশ্ববিদ্যালয়দত্ত 'ডিপ্লোমা-খানিকে চোতাকাগজ বলিয়া ফেলিয়াছিলেন। উপস্থিত প্রবন্ধলেখকেরও ঐরূপ একখানি কাগজ আছে; কিন্তু যখন উহার উপর নির্ভর করিয়াই জীবিকা অর্জ্জন করিতেছি এবং উহার বলেই আজি আপনাদের সম্মুখে দাঁড়াইতে সাহস করিতেছি, তখন ঐ কাগজখানির প্রতি ঐরূপ

অপভাষা প্রয়োগ করিতে চাহি না। কর্জ্জনের গুঁতায় আমরা লিবারপুলি নুন ছাড়িয়াছি, কিন্তু আমাদের রক্তবিন্দুর রাসায়নিক বিশ্লেষণে এখনও ঐ অস্পৃশ্যদ্রব্যের অস্তিত্ব ধরা পড়িবে। এতদিন ধরিয়া বিলাতী নুন হজম করিয়া তাহার গুণ গাহিব না পণ ধরিয়া বসিলে নিমকহারামি হইবে। আমাদের পাশ্চাত্য বন্ধুগণ বিধাতার প্রেরণায় আমাদের হিতের জন্যই এদেশে পদার্পণ করিয়াছেন, এরূপ নির্দ্দেশ করিয়া বিধাতার করুণাময়ত্বে লোকের সন্দেহ জন্মাইব না, কিন্তু পাশ্চাত্যশিক্ষা হইতে আমরা কোন উপকারই পাই নাই, সন্ধ্যাপত্রিকাখানি শিয়রে রাখিয়াও এ কথা পূরাদমে বলা যায় না। পাশ্চাত্যশিক্ষা হইতে কিছু লাভ করিয়াছি সত্য, কিন্তু পাশ্চাত্যশিক্ষা আমাদের সকলকেই অল্পবিস্তর মুগ্ধ ও অভিভূত করিয়াছিল, ইহাও ততোধিক সত্য। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনেতিহাস যাঁহারা অবগত আছেন, তাঁহারা জানেন, বঙ্কিমচন্দ্রও এই আক্রমণ হইতে নিস্তার পান নাই।

তবে বঙ্কিমের সহিত অন্যের এ বিষয়ে প্রভেদ আছে। নীর বর্জ্জন করিয়া ক্ষীরগ্রহণের ক্ষমতা একা রাজহাঁসেরই আছে। বঙ্কিমচন্দ্ররূপী রাজহংস পাশ্চাত্যনীর হইতে যেপরিমাণ ক্ষীর সংগ্রহ করিয়া স্বজাতিকে উপহার দিয়াছেন, আমাদের মত দাঁড়কাকের দ্বারা ততটার সম্ভাবনা নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের মাহাত্ম্য এই যে, তিনি কেবল ক্ষীরসংগ্রহেই নিরস্ত হন নাই, তিনি পাশ্চাত্যশিক্ষার আকর্ষণ ও মোহপাশ সবলে ছিন্ন করিয়া ডঙ্কা বাজাইয়া আপন ঘরে ফিরিয়াছিলেন ও মাতৃমন্দিরে আনন্দমঠের প্রতিষ্ঠা করিয়া "বন্দে মাতরম্" জয়ধ্বনি তুলিয়া আমাদিগকে সেই আনন্দমঠে আহ্বান করিয়াছিলেন।

বঙ্গদর্শনের বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্যশিক্ষার মোহবন্ধন সম্পূর্ণ কাটাইয়াছিলেন কি না, বলিতে পারি না, কিন্তু প্রচারের পশ্চাতে যে বঙ্কিমচন্দ্র দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁহাকে রাহুগ্রাসমুক্ত পূর্ণচন্দ্রের মত দীপ্তিমান্ দেখি। তিনি তখন গীতার উক্তির আশ্রয় লইয়া স্বদেশবাসীকে ভয়াবহ পরধর্ম্ম হইতে স্বধর্ম্মে প্রত্যাবৃত্ত হইতে আহ্বান করিতেছিলেন। ভয়াবহ অভিধান দিয়া পরধর্ম্মকে নিন্দা করা আমার অভিপ্রেত নহে; ধর্ম্মের একটা সার্ব্বভৌমিক এবং সনাতন অংশ আছে, তাহা সকল ধর্ম্মেই সমান; সে অংশটুকুতে কাহারও ভীত হইবার কোন কারণ নাই; কিন্তু ধর্ম্মের আর একটা অংশ আছে, তাহা দেশভেদে ও কালভেদে মূর্ত্ত্যন্তর গ্রহণ করে। ধর্ম্ম যখন লোকস্থিতির সহায়, এবং লোকস্থিতির নিয়ম বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন কালে যখন বিভিন্ন, তখন ধর্ম্মের এই অংশ দেশকালের অপেক্ষা না করিয়া থাকিতে পারে না। কোন দেশেই মানবসমাজের অবস্থা চিরদিন সমান থাকে না। একটা মানবসমাজ পার্শ্ববর্ত্তী মানবসমাজের সংস্পর্শে বা সংঘর্ষে আসিয়া তাহার সমাজব্যবস্থা পরিবর্ত্তিত করিতে বাধ্য হয়। কাজেই ধর্ম্মের এই অংশ দেশকালানুরূপ না হইলে উহা তদ্দেশে ও তৎকালে লোকস্থিতির অনুকূল হয় না। তত্তৎদেশে ধর্ম্মের এই অংশের সহিত তত্তৎদেশের প্রাচীন ইতিহাসের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ; প্রাচীনের সহিত সম্পর্ক একবারে বিচ্ছিন্ন করিয়া কোন সমাজব্যবস্থাই কোন দেশে লোকস্থিতির অনুকূল হয় না এবং যখন বিভিন্ন সমাজের ইতিহাস বিভিন্ন পথে চলিয়াছে, তখন

লোকস্থিতির অনুরোধে ধর্ম্মকেও আত্মসমাজের অনুকূলমূর্ত্তি গ্রহণ করিতে হয়। এইখানেই আত্মধর্ম্ম ও পরধর্ম্মে ভেদ আসিয়া পড়ে। যে ধর্ম্ম এক সমাজের লোকস্থিতির অনুকূল, সে ধর্ম্ম অন্য সমাজে অনুকূল না হইতে পারে। এইখানে এ কথাটা মনে রাখিতে হইবে যে, ধর্ম্মশব্দের লক্ষ্য কেবল রিলিজন্ নহে। আমাদের শাস্ত্রে ধর্ম্মশব্দের সংজ্ঞা আরও ব্যাপক; মানুষের অনুষ্ঠেয় প্রত্যেক কর্ম্ম,—দাঁতনকাঠির ব্যবহার হইতে ঈশ্বরোপাসনা পর্য্যন্ত সমস্তই ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত। এই হিসাবে যাহা ইংরেজের ধর্ম্ম, তাহা ভারতবাসীর ধর্ম্ম হইতেই পারে না। ইংরেজের প্রাচীন ইতিহাস ও ইংরেজের আধুনিক সমাজতন্ত্র যখন ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস ও ভারতবর্ষের আধুনিক সমাজতন্ত্রের সহিত এক নহে, তখন উহাদের ধর্ম্ম আমাদের পক্ষে পরধর্ম্ম। উহাদের খ্রীষ্টানির কথা বলিতেছি না, উহাদের আইনকানুন, আহারবিহার, চালচলন, আদব-কায়দা, সমস্তই আমাদের নিকট পরধর্ম্ম; আমাদের ধর্ম্মও তেমনি উহাদের নিকট পরধর্ম্ম; এবং বিনা বিচারে ও বিনা কারণে একের পক্ষে অন্যধর্ম্মগ্রহণ প্রকৃতপক্ষেই ভয়াবহ। স্বধর্ম্মে পক্ষপাতী ইংরেজ এ কথা ঠিক বুঝে, এবং উহারা সহজে পরধর্ম্ম গ্রহণ করিতে চাহে না; কিন্তু যাঁহারা নিজের শক্তির উপর নির্ভর না করিয়া নবাব সিরাজুদ্দৌলার খামখেয়ালির দমনের জন্য পরের শক্তির উপর নির্ভর করাই শ্রেষ্ঠ মনে করিয়াছিলেন, তাঁহাদের পৌত্রগণ ও প্রপৌত্রগণ যে পরধর্ম্মকে অবলম্বন করিতে আগ্রহ দেখাইবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? সৌভাগ্যক্রমে এই পরধর্ম্মবাৎসল্যের মোহ শীঘ্রই কাটিয়া গিয়াছিল, এবং বঙ্কিমচন্দ্র যখন তাঁহার স্বজাতিকে আপন ঘরে ফিরিবার জন্য ডাক দিলেন, তখন আমরা আগ্রহের সহিত সেই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম। আজি আমরা আপন ঘরে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য ব্যাকুল হইয়াছি, বিশবৎসর পূর্ব্বেই সেই প্রত্যাবর্ত্তনের ডাক পড়িয়াছিল; এবং বঙ্কিমচন্দ্রের পথভ্রষ্ট স্বদেশবাসী সেই ডাকে সাড়া দিতে ঔদাসীন্য দেখায় নাই। আজ সেই ডাক আরও উচ্চস্বরে পড়িয়াছে, এবং তপস্বী বঙ্কিমচন্দ্র মর্ত্ত্যলোকের তপস্যার সমাধান করিয়া অদৃশ্য তপোলোক হইতে আমাদিগকে সেই পরিচিতস্বরে আবার ডাকিতেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রকে কেহ কেহ apostle of culture বলিয়া থাকেন। ধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিক অংশের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া বঙ্কিমচন্দ্র সমুদয় বৃত্তির সর্ব্বাঙ্গীণ সামঞ্জস্যবিধানকে ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমরা ধর্ম্মের এই সংজ্ঞা স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করিতে পারি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বহিঃপ্রকৃতির সহিত অন্তঃপ্রকৃতির অবিরত সামঞ্জস্যসাধনচেষ্টার নামই জীবন, এবং যখন সমুদয় বৃত্তির সর্ব্বাঙ্গীণ সামঞ্জস্যবিধান না ঘটিলে বহিঃপ্রকৃতির সহিত অন্তঃপ্রকৃতির পূর্ণসামঞ্জস্য ঘটিবার সম্ভাবনা নাই, তখন ধর্ম্মই জীবনরক্ষার একমাত্র উপায়—"ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ"। ধর্ম্মই মানবজীবনকে রক্ষা করে, কেবল ব্যক্তির জীবন বা বংশের জীবন কেন, সমাজের জীবনও ধর্ম্মই রক্ষা করে; এবং যদি কেহ ঐহিক জীবনের উপর পারত্রিক জীবনের রক্ষাকেও ধর্ম্মের উদ্দেশ্য বলিতে চাহেন, তাঁহার সহিতও আমি আজ

বিবাদ করিতে প্রস্তুত নহি। বঙ্কিমচন্দ্র-প্রযুক্ত ধর্ম্মের এই বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা গ্রহণ করিলে উহা culture অপেক্ষাও ব্যাপক হইয়া উঠে; এবং এই ধর্ম্মের অন্বেষণের জন্য বঙ্কিমচন্দ্র আপন ঘরে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া গীতাশাস্ত্রের আশ্রয় লইয়াছিলেন। এই ব্যাপক অর্থে ধর্ম্মশব্দ প্রয়োগ করিলে সার্ব্বভৌমিক ও প্রাদেশিক উভয় ধর্ম্ম উহার অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া পড়ে; এবং বঙ্কিমচন্দ্র দেখাইতে চাহিয়াছিলেন, সেই সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের বা প্রাদেশিক যুগধর্ম্মের অন্বেষণের জন্যও আমাদিগকে পরের দ্বারে ভিক্ষার্থী হইয়া দাঁড়াইতে হইবে না। আজ গীতার সুলভ সংস্করণ লোকের পকেটে-পকেটে বিরাজ করিতেছে, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র যে সময়ে গীতার ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হন, তখন ইংরেজিশিক্ষিত লোকের মধ্যে উহা বিরলপ্রচার ছিল। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র যাহার মূলে, বাঙ্‌লাদেশে সে জিনিষ বসিয়া থাকে না, তাহা চলিয়া যায়; তাই বঙ্কিমচন্দ্র যেদিন নবজীবন ও প্রচার আশ্রয় করিয়া বঙ্গবাসীকে তাহার আপন শাস্ত্রের সহিত পরিচিত করিলেন, সেইদিন হইতে সেই শাস্ত্রকথা বাঙ্‌লাদেশের শিক্ষিত-সমাজে চলিতে লাগিল। তদবধি উহা আর থামে নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথমে শিক্ষিতবাঙালীর সম্মুখে স্বদেশের শাস্ত্র স্থাপন করিয়াছিলেন, এ কথা বলিলে ভুল হইবে। তাঁহার অনেক পূর্ব্বে বঙ্গজননীর আর এক সন্তান বিশ্বজগতের পুরাণকবির চতুর্ম্মুখনিঃসৃত এবং ভারতের প্রাচীন ঋষিগণের শ্রুতিপ্রবিষ্ট বাণীর মধ্যে সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের সন্ধান পাইয়া পুলকিত হইয়াছিলেন; এবং তাঁহার পরে বঙ্গজননীর আর একজন সন্তান ঈশোপনিষদ্-গ্রন্থের পরিত্যক্ত পাতার মধ্যে সেই ধর্ম্মের সন্ধান পাইয়া আপনাকে ধন্য মানিয়াছিলেন। মহাত্মা রামমোহন রায় ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রুতিবাক্যের যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা আমি গ্রহণ করিতে পারি নাই। কিন্তু তাঁহারা ভারতবর্ষকে স্বকীয় সামর্থ্যের উপর আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে আহ্বান করিয়া ভারতবাসীর যে অজ্ঞানান্ধতা অপনোদন করিয়া গিয়াছেন, তজ্জন্য আমি তাঁহাদের স্বদেশে জন্মিয়া ধন্য হইয়াছি। এ কথা গোপন করিবার প্রয়োজন নাই যে, ঐ দুই মহাপুরুষের অনুবর্ত্তীরা ধর্ম্মতত্ত্বের অনুসন্ধানের জন্য বিদেশে যাত্রা আবশ্যক বোধ করিয়াছিলেন এবং অন্য দেশের অন্য জাতির শাস্ত্র হইতে সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের সারসঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ধর্ম্মপিপাসুর পিপাসা যদি তাঁহাদিগকে পানীয়-অন্বেষণে পৃথিবীভ্রমণে বাধ্য করে, তাহাতে দুঃখিত হইবার কোনই কারণ নাই; বিশেষত ১৯০৫ অব্দের ৯ই আগষ্টের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিদেশের জিনিষ বর্জ্জন করিতে ভারতবাসী কখনও প্রতিজ্ঞা করিতে বসে নাই। এই বিদেশযাত্রীদিগের অনাবশ্যক পরিশ্রমের জন্য আমরা তত দুঃখিত নহি, কিন্তু বিদেশের আকর্ষণে তাঁহারা স্বদেশীসামগ্রীর প্রতি যদি উপেক্ষা বা অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তাহার জন্য ক্ষোভ করিবার হেতু আছে। যাহাই হউক, ধর্ম্মতত্ত্বের অনুসন্ধানে বিদেশপর্য্যটন অনাবশ্যক হইলেও আমরা ঐ অনাবশ্যক পরিশ্রমে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম; এমন সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র আমাদিগকে আপন ঘরে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য ডাক

দিলেন। শিক্ষিতবাঙালী সেই আহ্বান শুনিল ও মাতৃমন্দিরে আনন্দমঠে ফিরিয়া আসিতে সঙ্কোচবোধ করিল না।

গীতাশাস্ত্র ধর্ম্মের কেবল সার্ব্বভৌমিক সনাতন অংশের উপদেশ দিয়া নিরস্ত হন নাই, প্রাদেশিক ধর্ম্ম ও যুগধর্ম্মের তত্ত্বও ঐ শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য। কয়েকসহস্র বৎসর ধরিয়া ভারতবাসী গীতাশাস্ত্রে যে সহস্রশীর্ষা পুরুষের মুখনিঃসৃত অভয়বাণী শুনিয়া আসিতেছে, তাঁহার সহস্র অক্ষি সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ও ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্রতম অংশে যখন নিবদ্ধ আছে, তখন ঐ শাস্ত্রের উক্তির মধ্যে প্রাদেশিক ধর্ম্মের ও যুগধর্ম্মের মাহাত্ম্যকীর্ত্তন দেখিয়া বিস্মিত হইতে হইবে না। ক্ষমাধর্ম্ম সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম ও সর্ব্বজনীন ধর্ম্ম, কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে শত্রুকে ক্ষমা করিলে ক্লৈব্যপ্রদর্শন হয়। এই কথা পার্থকে বুঝাইবার জন্য পার্থসারথি গীতাশাস্ত্র কহিয়াছিলেন। এই উপলক্ষেই উহাতে পরধর্ম্মের ভয়াবহত্ব কথিত হইয়াছে ও ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে অবতারের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। পার্থকে উপলক্ষমাত্র করিয়া পার্থসারথি একদিকে সার্ব্বভৌমিক নিষ্কামধর্ম্মের উপদেশ দিয়া গিয়াছেন ও অন্যদিকে প্রাদেশিক যুগধর্ম্মের উপদেশ দিতেও ভুলেন নাই; এবং ভারতের প্রাচীন মহর্ষি ভারতের পুরুষপরম্পরার জন্য তাহা মহাভারতমধ্যে নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ফলকামনাবিবর্জ্জিত আসক্তিরহিত কর্ম্মানুষ্ঠান ধর্ম্ম হইলেও উহার উপদেশ ভারতবর্ষেই প্রদত্ত হইয়াছিল; অন্যদেশের শাস্ত্রে উহার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলে মরীচিকার অন্বেষণ হইবে। এই ধর্ম্মের প্রথম কথা ও শেষ কথা যিনি শুনিতে চাহেন, তাঁহাকে অকুতোভয়ে বলিতে পারা যায়, এজন্য বিদেশে পর্য্যটন করিবেন না, আপনার ঘরে ফিরিয়া আসুন। বঙ্কিমচন্দ্র ইহা যেমন স্পষ্টভাষায় বলিয়া গিয়াছেন, আর কেহ তেমন বলেন নাই।

যুগধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য যিনি যুগে যুগে সম্ভূত হন, তিনি ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের মহাহবের যুগে কোন্ মূর্ত্তিতে সম্ভূত হইয়াছিলেন, মহাভারতের মহাসাগর মন্থন করিয়া ভারতবাসীর নিকট লুপ্তপ্রায় সেই মূর্ত্তির উদ্ধারের জন্য বঙ্কিমচন্দ্র যত্নপর হইয়াছিলেন। লুপ্তপ্রায় বলিলাম, তাহার একটু তাৎপর্য্য আছে। ভারতবর্ষের বৈষ্ণবসম্প্রদায় ভগবানের যে মূর্ত্তিকে পূজার জন্য আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা কুরুক্ষেত্রে সংসপ্তকসেনার সম্মুখীন পার্থসারথির মূর্ত্তি নহে, তাহা বৃন্দাবনবিহারী গোপীজনবল্লভ বংশীবদনের মূর্ত্তি; তাহা নবনীতচোর উদূখলবদ্ধ বালগোপালের মূর্ত্তি; তাহা বৎসকুলের সহিত কেলিপর যমুনাপুলিনবিহারী গোপসখার মূর্ত্তি;—যে মূর্ত্তিতে ভগবান্ শ্রীকরধৃত মোহনমুরলীর প্রত্যেক রন্ধ্র শ্রীমুখমারুতে পূর্ণ করিয়া তদুদ্গত স্বরস্রোতে বিশ্বপ্রকৃতির মর্ম্মস্থলে আনন্দের ধারা সঞ্চার করেন, উহা সেই মূর্ত্তি। ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত মূর্ত্তি ভারতবর্ষের উপাসকসম্প্রদায়ের সম্পূর্ণ তৃপ্তি জন্মাইতে পারে নাই এবং যে ভারতবাসী পরজাতিকে আক্রমণ করা দূরে থাকুক, পরজাতির আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য আপনাকে জীবনসংগ্রামে সমর্থ করাও সম্পূর্ণ আবশ্যক বোধ করে নাই, সেই ভারতবাসী ঐশ্বর্য্যের অপেক্ষা মাধুর্য্যের

উপাসনায় পক্ষপাতিতা দেখাইবে, ইহাতেও বিস্মিত হইব না। বঙ্কিমচন্দ্র মহাভারতসাগর মন্থন করিয়া যে মূর্ত্তিকে স্বদেশবাসীর সম্মুখে স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের মূর্ত্তি; তাহা ধর্ম্মরাজ্যসংস্থাপকের মূর্ত্তি; ধর্ম্মের সহিত অধর্ম্মের সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে যে মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া তিনি সম্ভূত হন, উহা সেই মূর্ত্তি; রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত করিয়া যিনি রাষ্ট্র-রক্ষা করেন, উহা তাঁহার মূর্ত্তি; জীবন-সংগ্রামে জীবন ধ্বংস করিয়া যিনি জীবন রক্ষা করেন, উহা তাঁহার মূর্ত্তি; লোকস্থিতির অনুরোধে যিনি নির্ব্বিকার ও নিষ্করুণ হইয়া বসুন্ধরাকে শোণিতক্লিন্ন দেখিয়া থাকেন, উহা তাঁহারই মূর্ত্তি। যিনি বিশ্বজগতের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সঞ্চারিত করুণাপ্রবাহের একমাত্র উৎস, তিনি যে কি কারণে ও কি উদ্দেশ্যে এই নিষ্করুণমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া জীবরক্তে বসুধা সিক্ত দেখিতে বাধ্য হন, তাহা তিনিই জানেন; মনুষ্যের শাস্ত্র এখানে মূক; অথবা এই মূর্ত্তিগ্রহণ সেই সনাতনী মায়ার সহিত অভিন্ন,—যাহা হইতে এই বিশ্বজগতের জন্মাদি, যাহা হইতে জীবের জীবন, যাহা হইতে জীবনে বহিঃপ্রকৃতির সহিত অন্তঃপ্রকৃতির নিরন্তর সামঞ্জস্যস্থাপনের চেষ্টা ঘটিতেছে, যাহা হইতে মানবের সকল দুঃখের নিদান সেই খৃষ্টানকথিত পাপপ্রবণতার উৎপত্তি হইয়াছে; অথবা কবির ভাষায় বলিতে পারি,—ইহা সেই আধ-সত্য, জ্ঞানী যখন তাঁহার অন্তরের মধ্যে জগৎকারণের সন্ধান পাইবেন, যখন তিনি আপনাকেই এই জগদ্ভ্রান্তির কারণ বলিয়া জানিতে পারিবেন, যখন তাঁহার অপূর্ব্ব জগৎস্বপ্ন উদ্বোধনে বিলীন হইবে, তখন সেই মহাস্বপ্নভাঙা দিনে যে আধ-সত্য—

সত্যের সমুদ্রমাঝে হ'য়ে যাবে লীন।

আমাদের সময়ের উপযোগী ও অবস্থার উপযোগী যুগধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে, তাহা বঙ্কিমচন্দ্র স্পষ্ট বুঝিয়াছিলেন এবং তাহা আমরা এ বৎসর বেশ বুঝিতে পারিতেছি। আমাদের দেশে রাষ্ট্রশক্তি যাঁহাদের হস্তে ধৃত রহিয়াছে, তাঁহারা আমাদিগকে রাষ্ট্রযন্ত্রের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বলিয়া ভাবেন, কিন্তু আমাদের সজীবতাসম্বন্ধে তাঁহাদের কোনরূপ স্পষ্ট ধারণা নাই। বর্ত্তমানসময়ে রাষ্ট্রযন্ত্র যাঁহারা চালাইতেছেন, তাঁহারাই আমাদের ভাগ্যবিধাতা; আমাদের ভাগ্য-বিধানে আমাদের কোন কর্ত্তৃত্ব নাই; কিন্তু আমরা জড়পদার্থ কিংবা সজীবপদার্থ, সেটা নির্ণয় করা উভয় তরফেই আবশ্যক হইয়াছে। কল টিপিলেই কলের পুতুল হাতপা নাড়ে, চোখ ঘুরায় ও প্যাঁক্‌প্যাঁক্ করে; উহাকে যে নিয়মে চালান যায়, ক্ষুদ্র একটা পিঁপীড়াকে বা ছারপোকাকেও সে নিয়মে চালান যায় না। আমাদের রাষ্ট্রনিয়ন্তা আমাদিগকে এতাবৎ কলের পুতুল মনে করিয়া চালাইয়াছেন, এবং আমরা তৎকর্ত্তৃক চালিত হইয়া প্রচুরপরিমাণে হাতপা নাড়িয়াছি ও প্যাঁক্‌প্যাঁক্ করিয়াছি;—কখনও কিছুমাত্র আপত্তি করি নাই। এ বৎসর আমাদের মনে সন্দেহ জন্মিয়াছে যে, আমাদের হয় ত কিঞ্চিৎ জীবনীশক্তি রহিয়াছে এবং সেই সন্দেহের উপর নির্ভর করিয়া আমরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ঘাড় নাড়িতে আরম্ভ করিয়াছি। আমাদের অন্তরের মধ্যে যেন মান-অপমানের বোধ আছে, এইরূপ আমাদের অনুভব

জন্মিয়াছে। রাজপুরুষেরা মনে করিতেছেন, এ আবার কি উপসর্গ উপস্থিত; আমরা যে দিকে চালাইব, কলের পুতুল সেই দিকে চলিতে বাধ্য, তবে এ সকল লক্ষণের আবির্ভাব কেন? এ কি সজীবতার লক্ষণ, না কলটা ক্ষণেকের জন্য বিগ্‌ড়াইয়া গিয়াছে, তাহারই পরিচয়? আপাতত তাঁহারা কল বিগ্‌ড়াইয়াছে ঠাহর করিয়াই কলমেরামতের চেষ্টা করিতেছেন, বরিশালে দম দিতেছেন, সিরাজগঞ্জে হাতুড়ি ঠুকিতেছেন, ইত্যাদি। কলটা কিন্তু তাহাতেও সংশোধিত না হইয়া আরও বিচলিত হইতেছে। যাহাই হউক, উভয়পক্ষে একটু বোঝাপড়া আবশ্যক হইয়াছে। বস্তুতই যদি আমাদের সজীবতা থাকে, তাহা রাষ্ট্রচালককে বুঝাইয়া দিলে উভয়পক্ষেই মঙ্গল হইতে পারে।

এ বৎসর স্বদেশী আন্দোলনে আমরা খুবই যে একটা বীরত্ব দেখাইয়াছি, যাহা দেখিয়া পৃথিবীসুদ্ধ লোক স্তব্ধ হইয়া যাইবে, তাহা মনে করিয়া আস্ফালনের দরকার নাই। তবে ইহা অস্বীকারের উপায় নাই যে, এবার নির্দ্দয় রাষ্ট্রনিয়ন্তার গুপ্ত ছুরিকাপ্রয়োগে বঙ্গজননীর বেদনাবোধ হইয়াছে ও বঙ্গজননী কাতর হইয়া দীর্ঘ উষ্ণশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াছেন। সেই দীর্ঘশ্বাসের সম্মুখে কয়েকগাঁইট ম্যাঞ্চেষ্টারি কাপড় উড়িয়াছে ও পুড়িয়াছে, ও কয়েকবস্তা লিবারপুলের নুন নৌকাডুবিতে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আর বঙ্গজননীর দুগ্ধপোষ্য শিশুর পাল হীরার আয়ি বুড়ীকে রাজপথে দেখিয়াই তাহাকে খেপাইবার জন্য তাহার কানের কাছে "বন্দে মাতরম্" চীৎকার করিয়াছে। হীরার আয়ি বুড়ীর বাগিন্দ্রিয় বড় প্রখর ছিল, সে প্রত্যুত্তরে ছেলের পালের বাপান্ত করিত; কিন্তু এই বুড়ীটি ছদ্মবেশী, ইহার এক বগলে কোতোয়ালের রেগুলেশন্‌-লাঠি, আর অন্য বগলে গুর্খার ছুরি লুকান আছে; কাজেই ছেলের দলের পুরস্কারটা অন্যরূপ হইয়া পড়িয়াছে।

অন্য দেশের ইতিহাসে আমরা যে সকল ব্যাপার দেখিতে পাই, তাহার সহিত তুলনায় বঙ্গজননীর এই শ্বাসত্যাগ খুব একটা বৃহৎ ব্যাপার নহে। কিন্তু আমাদের পক্ষে ইহা তাচ্ছীল্য করিয়া উড়াইবার জিনিষ নহে। ইহাতে সপ্রমাণ করিল যে, আমরা জড়পদার্থ নহি, আমরা সজীবপদার্থ;—এমন কি, চেতনাবিশিষ্ট সজীবপদার্থ। জড়পদার্থের সহিত সজীবপদার্থের প্রভেদ এতটাই বেশী যে, বাঙ্‌লার ইতিহাসে এই ভেদপ্রতিপাদন বোধ করি অভূতপূর্ব্ব ঘটনা। আমাদের রাষ্ট্র-বিধাতারা আমাদিগকে কলের পুতুল ঠাহর করিয়া আমাদিগকে ঘরের বাহিরে টানিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, আমরা এ বৎসর স্থির করিয়াছি, আমরা যখন সজীবপদার্থ এবং ঘরের বাহিরে যাওয়ায় যখন আমাদের মঙ্গল নাই, তখন আমরা আপন ঘরে ফিরিয়া আসিব। আমাদের সজীবতা জানাইবার জন্যই আমরা আজ ঘরে ফিরিবার উপক্রম করিয়াছি। রাজপুরুষেরা আমাদের সজীবতা স্বীকার করিলেই আমরা কৃতার্থ হইব; তদপেক্ষা গুরু-তর দুরভিসন্ধি আমাদের নাই। তাঁহাদের শঙ্কিত বা চিন্তিত হইবার কোন কারণ নাই; কেন না, সজীব হইলেও আমরা পিঁপীড়া অপেক্ষাও অধম, এবং পিঁপীড়ার যে দংশন-সামর্থ্য আছে, আমাদের সেটুকুও নাই। আমা-দের রাজভক্তির কিছুমাত্র অভাব নাই, এমন

কি, রাজপুরুষভক্তিরও অভাব আছে, তাহা প্রমাণসাপেক্ষ। এই শেষোক্ত সামগ্রীটার অভাব-আশঙ্কায় কোন কোন রাজপুরুষ হয় ত বিচলিত হইয়াছেন; কিন্তু তাঁহারা নিশ্চিন্ত হউন, বর্দ্ধমানের ও শোভাবাজারের রাজভাণ্ডারে ঐ মহার্ঘ পদার্থ এত অধিকপরিমাণে সঞ্চিত আছে যে, কলসে কলসে বিলাইলেও উহা শীঘ্র নিঃশেষ হইবে না।

বাঙ্‌লাদেশে এককালে ন্যায়শাস্ত্রের আত্যন্তিক চর্চ্চা হইয়াছিল, সম্ভবত তাহার ফলে আমরা তার্কিকের জাতি হইয়া উঠিয়াছি। ইতিমধ্যেই আমাদের মধ্যে দুই দলে ঘোর তর্ক উপস্থিত হইয়াছে যে, আমাদের এই স্বদেশী আন্দোলনটা রাজনৈতিক আন্দোলন, না অর্থনীতিঘটিত আন্দোলন? ইহার মধ্যে যে দল সুশীল ও সুচরিত্র, তাঁহারা বলেন, ইহার সহিত রাজনীতির কোন সম্পর্ক নাই বা থাকা উচিত নহে। আমরা কেবল স্বদেশের আর্থিক উন্নতির জন্য স্বদেশের দ্রব্য ব্যবহার করিব, কিন্তু বয়কটের নাম পর্য্যন্ত মুখে আনিব না। এই দলের নেতাদিগের সুশীলতায় ও সচ্চরিত্রতায় আমার কিছুই সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহারা কম্‌লীকে ছাড়িতে প্রস্তুত থাকিলেও কম্‌লী তাঁহাদিগকে ছাড়িবে কি না, তাহা জানি না। আমরা তাঁতের কাপড় পরিয়া ম্যাঞ্চেষ্টারের ব্যবসায়ের হানি ঘটাইব অথচ ম্যাঞ্চেষ্টার বেদান্তবেদ্য প্রত্যগাত্মার মত নির্ব্বিকার ও নিষ্ক্রিয়ভাবে দেখিতে থাকিবেন এবং ইংরেজের শাসনচক্র ও ইংরেজের সঙীন অর্থশাস্ত্রের ও ধর্ম্মশাস্ত্রের দোহাই দিয়া নির্ব্বিকল্পসমাধিযোগে মগ্ন থাকিবে, ইহা কল্পনারও অগোচর।

আজিকার এই স্বদেশী আন্দোলনের সহিত অর্থনীতির বা রাজনীতির সম্পর্ক আছে বা না আছে, তাহার বিচারে আমি প্রবৃত্ত হইব না। উহাকে আমি আমাদের ধর্ম্মনীতির অঙ্গ বলিতে চাহি। উহাই এখন আমাদের সময়োচিত যুগধর্ম্ম। আত্মরক্ষার জন্য এই যুগধর্ম্মের প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে; এবং এই যে ১৩১২ সাল আর চারিদিন পরে মহাকালের কুক্ষিতে বিলীন হইবে, ইহা যদি এই যুগধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা দেখিয়া চলিয়া যায়, তাহা হইলে ইহা বাঙ্‌লার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় থাকিবে। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠে আর বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্রে আমরা এই যুগধর্ম্মপ্রতিষ্ঠার বিশিষ্ট চেষ্টা দেখিতে পাই। তাঁহার জীবনের শেষভাগের প্রত্যেক কার্য্যই বোধ করি এই উদ্দেশ্যের অভিমুখ। বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথমে আমাদিগের নিকট যুগধর্ম্মের আবশ্যকতা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন এবং যুগধর্ম্মের সংস্থাপনের জন্য যিনি যুগে যুগে সম্ভূত হন, তাঁহার মহৈশ্বর্য্যমণ্ডিত মূর্ত্তি আমাদের দেবমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তিনিই আমাদের জন্য মাতৃমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া এবং তাহাতে আনন্দমঠের প্রতিষ্ঠা করিয়া, সেই মঠের মধ্যে সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা, সুখদা বরদা সুস্মিতা ভূষিতা, জননীর মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। কুরুক্ষেত্রের মহাহবে যে পাঞ্চজন্য নিনাদিত হইয়াছিল, তাহার প্রতিধ্বনি আত্মহৃদয়ে অনুভব করিয়া তিনি স্বয়ং শঙ্খনাদ করিয়াছিলেন। সেই শঙ্খধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া আমরা আজ আনন্দমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মাতৃপূজায় উদ্যত হইয়াছি। এই মাতৃপূজাই আমাদিগের যুগধর্ম্ম। ইহুদিজাতি বহুবৎসর-

কাল পরগৃহে নির্ব্বাসনের পর যখন নিজগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছিল, তখন তাহাদের উপাস্য-দেবতা গিরিচূড়া হইতে তাহাদের নায়কের নিকট জাতীয়ধর্ম্মের ও যুগধর্ম্মের উপদেশ দিয়াছিলেন। সেই যুগধর্ম্মের উপদেশের পর তাহারা জাতীয়জীবনের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। তাহাদের উপাস্যদেবতা তাঁহার নির্ব্বাচিত জাতির জাতীয়জীবনকে সুখের জীবন করেন নাই; সহস্রবৎসর ধরিয়া নানা ক্লেশভোগের পর ইহুদিজাতি আবার স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত ও মেষপালের মত ধরাপৃষ্ঠে বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। কিন্তু আজি পর্য্যন্ত তাহারা জেহোবার উপদিষ্ট জাতিধর্ম্ম ও যুগধর্ম্ম পরিত্যাগ করে নাই। এখনও তাহারা প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছে, তাহাদের ভবিষ্যতে যিনি দায়ুদের ঘরে সম্ভূত হইয়া ইহুদিজাতির রাজা হইবেন, তিনি তাঁহাদের নষ্টপ্রায় জাতীয়জীবনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিবেন। আমাদের পুরাণ-শাস্ত্র আমাদিগকে যাঁহার প্রতীক্ষায় বসাইয়া রাখিয়াছেন, তিনি কখন্ কোন্ মূর্ত্তিতে সম্ভূত হইবেন, তাহা আমরা জানি না; তাঁহার হস্তে যে আয়ুধ থাকিবে, তাহা পার্থিবধাতুতে নির্ম্মিত হইবার প্রয়োজন নাই। তিনি যে সিংহাসনে বসিবেন, আমাদের হৃদয়ভূমিতে তাহার প্রতিষ্ঠা হইবে। বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারা আমাদিগকে নির্ব্বাসনের পর ঘরে ফিরিতে তিনি বলিয়া পাঠাইয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের শঙ্খধ্বনি আমাদিগকে মাতৃমন্দিরের আনন্দমঠে প্রত্যাবৃত্ত করাইয়া আমাদিগকে মাতৃপূজার ব্রত গ্রহণ করাইয়াছে। শ্রীবিষ্ণুতে কর্ম্মফল অর্পণ করিয়া যে-কোন ব্যক্তি এই ব্রত গ্রহণ করিবেন, তাঁহার গৃহেই বিষ্ণুযশার আবির্ভাব হইতে পারে। বিষ্ণুযশার গৃহে সেই ধর্ম্ম-সংস্থাপকের সম্ভবের জন্য আমরা অহর্নিশ প্রার্থনামন্ত্র উচ্চারণ করিব। ততদিন বঙ্গজননীর প্রত্যেক সন্তানের হৃদয়ভূমি মাতৃভক্তির জাহ্নবীজলে মার্জ্জিত করিয়া তাহাকে তাঁহার সিংহাসনস্থাপনের উপযোগী করিতে হইবে। তিনি যে পবিত্র আসনে উপবিষ্ট হইবেন, তাহা পুণ্যতোয়ে অভিষিক্ত করা আবশ্যক। অতএব তোমরা তোমাদের মাতৃপূজার অন্যতম প্রধান পুরোহিতের ভাষায় এই প্রার্থনামন্ত্র উচ্চারণ কর—

বাঙ্‌লার মাটি, বাঙ্‌লার জল,
বাঙ্‌লার বায়ু, বাঙ্‌লার ফল,
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক,
পুণ্য হউক, হে ভগবান্।
বন্দে মাতরম্।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

নববর্ষের প্রতি।

১

মঙ্গলমুহূর্ত্তে আজি তরুণ প্রভাতে
হে বর্ষ নূতন,
দেখিলাম কিবা রূপ মা আমার
সস্মিত-আনন।
চরণে অম্লান অর্ঘ্য— পূজিত কুসুম
শোভে থরে থর।
দুটি করে বরাভয়— দেখিলাম কিবা
মূরতি সুন্দর।

২

যুগান্তের দীর্ঘ— অমানিশা-পরে, তুমি
নূতন বরষ,
এনেছ কি এতদিনে পতিত জাতির
উজ্জ্বল দিবস?
তুমি কি মুছায়ে দিবে বহুবরষের
কলঙ্ককালিমা?
তুমি কি ঘুচায়ে দিবে অভাগ্য দেশের
মুখের ম্লানিমা?

৩

শুনাবে কি মাতৃমন্ত্র, শিখাবে তাহার
কঠোর সাধনা?
বলে' দিবে এ জগতে দুর্ব্বল জাতির
নিষ্ফল যাচনা?
বলে' দিবে কার্ লাগি' ত্রিশকোটি প্রাণী
সঁপিবে জীবন?
কোন্ দেবতার পদে হৃদয়রুধির
করিবে অর্পণ?

৪

এনেছ বারতা যদি, কহ আমাদের
সে অমৃতবাণী !
যে কর্ণে শুনেছি শুধু যুগ যুগ ধরি'
নিন্দা আর গ্লানি !
বলে' যাও, পূরবের মহিমাকিরণ
উদিবে আবার ?
অভিশপ্ত দেশে পুন শক্তি অভিনব
হইবে সঞ্চার।

৫

রাজরাজেশ্বরীরূপে হেরিব জননী—
স্বদেশ আমার।
তাঁরি লাগি সহি ক্লেশ, সুকঠোর ব্রত
লইব আবার।
যা' করিব, তাঁরি কাজ, তাঁরি গাথা গাই,
তাঁরি নাম মুখে;
তাঁরি পুণ্য পদধূলি শোভিবে মাথায়,
তাঁরি ব্যথা বুকে।

৬

দাও এই দীক্ষা, বর্ষ,— করি' প্রাণপণ
সাধি মাতৃব্রত !
গরীয়সী জননীর সেবায় জীবন
করি যেন গত।
বাহিরের বিঘ্ন যেন শক্তি অন্তরের
করে উদ্বোধন।
ক্ষুদ্র স্বার্থপদতলে নাহি করি যেন মোরা
আত্মবিসর্জ্জন।

শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়।

রাইবনী-দুর্গ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সুবর্ণরেখার তীরে তীরে নীলাচলের রাজপথ কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। দাঁতনের অনতিদূরে অকস্মাৎ নিবিড়-অরণ্য-মধ্যে যখন ইহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইত, সে প্রায় দুইশত বৎসরের কথা। সে জঙ্গল এখন আর নাই। তাহার স্থানে অশ্বত্থবটের ছায়া-স্নিগ্ধ সোনাকোণী নামে গ্রাম বসিয়াছে।

গ্রামখানির প্রায় তিনদিক্ বেড়িয়া স্বর্ণ-প্রসবিনী সুবর্ণরেখা সাগরসঙ্গমে চলিয়াছেন। তাঁহার প্রসাদে গ্রামবাসীদের অন্নবস্ত্রের ক্লেশ নাই, কিন্তু মাঝে মাঝে ঝারিখণ্ডপ্রদেশের এই শৈলসুতাটি সহসা বন্যাগর্ভ ভৈরবী মূর্ত্তিতে যখন দেখা দেন, তখন ধনপ্রাণ লইয়া টানা-টানি পড়িয়া যায়।

নদীতীরে অনেকগুলি প্রাচীন নিম্ব ও বিল্ব বৃক্ষের অন্তরালে জীর্ণ শিবমন্দির এবং তাহারই অনতিদূরে প্রকাণ্ডবটতরুমূলে অষ্ট-ধাতুময়ী ক্ষুদ্র কালিকামূর্ত্তি। জনশ্রুতি এই যে, এখানে অরণ্যমধ্যে ডাকাইতদের আড্ডা ছিল এবং দেবদেবীর এই যুগলমূর্ত্তি তাহাদেরই স্থাপিত। সেকালে ডাকাতেরা বিস্তর নরবলি দিয়া দেবীকে পরিতুষ্ট করিত, কিন্তু দেবাদি-দেব ভূতনাথ গৃহিণীর এই বীভৎস রুচির প্রতিবাদ করায় সে প্রথা সোনাকোণীর অভ্যু-দয়ের সঙ্গে সঙ্গে লোপ পাইয়াছে। এমন কি, কালিকাসতী পতির আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া লাউকুমড়ার বলি পর্য্যন্ত রহিত করিয়াছেন। শাক্তদের মুখে এই ইতিহাস শোনা যায়। বৈষ্ণবদের কাহিনী অন্যরূপ। তাঁহারা বলেন, দস্যুপতি এক ভক্ত গোঁসাইকে ধরিয়া লইয়া গিয়া তাঁহার প্রভাবে শেষে বৈরাগ্য অবলম্বন করে এবং যথাকালে সে শিবমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা ও বলি নিবারণ করিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিল।

কালক্রমে সুবর্ণরেখা এই দেবস্থানের এত কাছে সরিয়া আসিয়াছে যে, বর্ষাপ্রবাহ আজিও প্রাচীনকীর্ত্তি লোপ না করায় দৈবশক্তির অদ্ভুত মহিমা জনসাধারণের ভয়ভক্তি যুগপৎ উদ্রিক্ত করিয়া থাকে। এই জাগ্রত-জীবন্ত দেবতাদ্বয়ের বাৎসরিক উৎসব চৈত্রমাসের শেষভাগে আরম্ভ হইয়া সংক্রান্তির দিনে শেষ হয় এবং সেই উপলক্ষ্যে চিরদিন এখানে সমারোহে মেলা বসিয়া আসিতেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কিন্তু সেকালের মত জমাট উৎসব এখন আর হয় না। তখন দেবীর পূজা একদিনেই শেষ হইত বটে, কিন্তু মহাদেবের মস্তকে দুধ-গঙ্গাজল ঢালিবার জন্য পনরদিন ধরিয়া ক্রমাগত দূরদূরান্তর হইতে বস্ত্রালঙ্কারভূষিত এবং বেত্রগুচ্ছধারী গাজনের সন্ন্যাসিদল এই তীর্থে আগমন করিত। আর কত স্ত্রীপুরুষ মানুনা করিয়া যে ধর্ণা দিতে আসিত, তাহার সংখ্যা হয় না। এই একপক্ষকাল উত্তরে মেদিনী-পুর এবং দক্ষিণে বালেশ্বরের পথে অহোরাত্র দেখা যাইত, ভক্তেরা অর্ঘ্য লইয়া সাষ্টাঙ্গ ভূমিতে

প্রণত হইতে হইতে অভীষ্টদেবতার স্থানে অগ্রসর হইতেছে। জনপ্রবাহের তিলেক বিরাম নাই—শঙ্খঘণ্টাঢক্কানিনাদে এবং সহস্র সহস্র কণ্ঠের "জয় শিবশম্ভু" রবে দিগ্‌দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

সহস্র সহস্র সন্ন্যাসী ভূতনাথের নাম লইয়া যখন সুবর্ণরেখার শীতল প্রবাহে একসঙ্গে অবগাহন করিত, সে এক চমৎকার দৃশ্য। সন্ধ্যার পর কপোলে বাণ ফুঁড়িয়া তাহার অগ্রে মৃত্তিকালগ্ন প্রদীপে ঘৃতের আলো জ্বালিয়া যখন তাহারা ভক্তিভরে শিবশম্ভুর জয়োচ্চারণ করিত, সেও একটা দেখিবার জিনিস।

চৈত্রসংক্রান্তির পূর্ব্বরাত্রি হইতে এই মহাসমারোহের জাঁক আরো বাড়িয়া উঠিত। সন্ন্যাসীদের ভিতর অনেকে শ্মশানবাসী মহেশ্বরের ভূতপ্রেত সাজিয়া সমস্তরাত্রি সুবর্ণরেখার বিস্তৃত বেলাভূমে নরকপাল সংগ্রহ করিত। পরদিন তাহারা কৃত্রিম আগুলফ-লম্বিত কৃষ্ণকেশরাজি এবং ভূত বা রাক্ষসের মুখোস পরিয়া দলে দলে বামহস্তে নরমুণ্ড ও দক্ষিণে তীক্ষ্ণধার খড়্গ ধারণ করিয়া উল্লাসে উদ্দাম নৃত্য করিয়া বেড়াইত। ময়ূরভঞ্জ-প্রদেশের বন্যজাতিরা এইদিন সদলবলে মাদোল বাজাইয়া তাহাদের সমরাভিনয় এবং নৃত্যগীতের পরিচয় দিত। নারায়ণগড়-অঞ্চলের গৌড়গোয়ালা ও বাগ্‌দীরা বহু দলে সমবেত হইয়া লাঠি এবং তরবারি খেলার প্রতিযোগিতায় যোগ দিত। তাহাতে অনেক-সময় রাগারাগি-দ্বেষাদ্বেষি, এমন কি, রক্তপাতও হইতে দেখা গিয়াছে। ফলত হিমাচলের প্রেতগণ সেদিন যে সত্যসত্যই সন্ন্যাসী ও ভক্তদের স্কন্ধে অবতীর্ণ হইতেন, এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ আছে।

এই প্রেতাভিনয় শেষ হওয়ার পর চড়কগাছে পাকখেলার পর্য্যায় এবং ইহাই গাজনোৎসবের শেষ অঙ্ক। যেদিনকার কথা বলিতে বসিয়াছি, সেদিন অন্যান্য বৎসরের মত রাজপথের অনতিদূরে প্রকাণ্ড চড়কগাছ তাহার দোদুল্যমান রজ্জুবাহুযুগ লইয়া জনসমাগমের প্রতীক্ষা করিতেছিল। মেলার লোকে দেখিতে দেখিতে সে স্থান পূর্ণ করিয়া ফেলিল। তখন সন্ন্যাসীরা পৃষ্ঠে বিদ্ধবাণ সন্ন্যাসীকে প্রায় শূন্যে তুলিতে তুলিতে চড়কগাছে উঠাইয়া দিল। তার পর মহোৎসাহে চড়কের দোল সুরু হইল।

এমন সময়ে সহসা সে জনকোলাহল নিমজ্জিত করিয়া কিসের শব্দ আসিতে লাগিল। পলকে পলকে তাহার কল্লোল স্পষ্টতর হইতেছিল। কেহ ভাবিল,—সুবর্ণরেখার বন্যাগর্জ্জন, কেহ মনে করিল—প্রবল ঝটিকাবর্ত্ত। জনস্রোত ভয়চকিত কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া নীরবে ঔৎসুক্যের সহিত অপেক্ষা করিতেছিল। স্থিরকণ্ঠে কেহ বলিল—"পালাও পালাও, বর্গী আসিতেছে।" তখন সেই জনতাসমুদ্র অতিমাত্র সংক্ষুব্ধ এবং বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিল। বাঙ্‌লায় বর্গীর সেই প্রথম অভিযান হইলেও তাহাদের কথা লোকের শুনিতে বাকী ছিল না।

ক্রমশঃ।

পূজারী।

হে স্বদেশ, হে দেবতা, অভাজন জনে
দিলে তুমি শঙ্খঘণ্টা পূজা-উপচার,
তোমার মন্দিরে দিলে আরতির ভার,
পূজারী করিলে মোরে আজি পুণ্যক্ষণে।
ক্ষুদ্র আমি অতি দীন অভক্ত সন্তান,
তোমার প্রাঙ্গণতলে ভক্তপদধূলি
লভিবারে এসেছিনু, তুমি দিলে স্থান
তোমার চরণতলে, নিলে মোরে তুলি'
দুর্গতির গ্রাস হ'তে হে শিবসুন্দর।
পুণ্যনীরে ধুয়ে দিলে কলঙ্ককালিমা,
খুলি নিলে ছিন্ন বাস, দিলে শুক্লাম্বর,
শুভ্র উত্তরীয়, রক্তচন্দন-শোণিমা
তোমার স্বাক্ষরলিপি ভালে লিখি' দিলে,
নিষ্ফল জীবন মোর সার্থক করিলে।

শ্রী :—

জীর্ণতরী।

ওগো জীর্ণতরি, তোমারে ডুবাতে চায়
বিদেশী বণিকর্দল শত ছিদ্র করি,
আজি বক্ষ তব জলে উঠিয়াছে ভরি
অতল জলধিগর্ভে তুমি মগ্নপ্রায়।
ওগো কে আছিস্ তোরা আয় ত্বরা করি—
এখনও হয়নি নৌকাডুবি সর্ব্বনাশ—
রুদ্ধ করি ছিদ্রমুখ বক্ষে চাপি ধরি
জল সেঁচি রক্ষা কর্ অন্তিমনিশ্বাস।
হে তরণি ছিন্নপাল, ছিন্নরশারশি,
নবীন নাবিকদল নূতন কাণ্ডারী
এতদিন পরে আজি দলে দলে বসি
তোমারে করেছে পূর্ণ। হে নবসংসারি,
আবার বাঁধিয়া বুক ল'য়ে শত দাঁড়ী
ভরাপালে নবোৎসাহে দাও তবে পাড়ী।

শ্রী :—

পান্থপাদপ।

হে বিশাল লক্ষবাহু বিটপি মহান্
হে প্রাচীন মৃত্যুঞ্জয়, কত যুগ ধরি
একাকী দাঁড়ায়ে আছ নীরব প্রহরী
হেরিতেছ জগতের পতন-উত্থান!
কত ঝড়, কত ঝঞ্ঝা সহিয়াছ তুমি
হে সহিষ্ণু মহাশাখি! পাতি স্নিগ্ধ ছায়া
নিষ্ঠুর পথিকদলে বিশ্রামের ভূমি
করিয়াছ দান। তারা ভুলি স্নেহমায়া
অতিথিবৎসল বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া
মিটায়েছে রক্ততৃষা, কুঠারের ঘাতে
কেটেছে তোমার শাখা, লয়েছে লুঠিয়া
তোমার সোনার ফল। কি অভিসম্পাতে
শুষ্কপর্ণসমাচ্ছন্ন ওগো অনাহারি
তোমার মলিনচ্ছবি আজিকে নেহারি।

শ্রী :—

দুর্ভিক্ষপীড়িত ভারতে।

৬

উদয়পুরমন্দিরের ব্রাহ্মণ।

এই ভীষণ গুহা হইতে প্রায় ২২৫ক্রোশ দূরে, যে দিকে শুষ্কতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে—সেই উত্তরপশ্চিমাভিমুখে, মেওয়ারদেশের শুভ্রনগর উদয়পুর;—আমাদের যাত্রাপথে থামিবার একটি সুন্দর আড্ডা। এই মহাদুর্ভিক্ষের পথটি ধরিয়া আমি এখন চলিতেছি।

এইখানে পৌছিয়াই বহুদূর হইতে দেখা যায়—রাশীকৃত প্রাসাদ ও মন্দির ধব্‌ধব্‌ করিতেছে; চারিদিক্‌ পর্ব্বতে বেষ্টিত। বৃষ্টির অভাবে, সরস নবীন শাখাপল্লবের স্থলে, শুষ্ক মরা পাতা; অত্রত্য ধরণীর কি অস্বাভাবিক বিষণ্ণতা!—এই বসন্তকালেও বেশভূষা পরিহার করিয়া পীতবর্ণ ধারণ করিয়াছে। এ সমস্ত সত্ত্বেও, দূর হইতে মনে হয়—নগরটি, বনাচ্ছন্ন ঢালুদেশের পাদমূলে, তরুপুঞ্জের মধ্যে, রহস্যময় শান্তির নীড়ে বেশ আরামে রহিয়াছে।

কিন্তু যতই নিকটবর্ত্তী হইতেছি, দুঃখকষ্টের নিদর্শন চারিদিকে ক্রমশ প্রকাশ পাইতেছে! নগরতোরণ পর্য্যন্ত যে রাস্তাটি গিয়াছে, তাহার দুই ধারে সারি-সারি মরা-গাছ; রাস্তায় ভিক্ষুকেরা বিচরণ করিতেছে—সেরূপ জীব কেহ কখন চক্ষে দেখে নাই; উহাদের কঠিন প্রাণ যেন কিছুতেই বাহির হইতে চাহে না; কিন্তু এবার বোধ হয় শেষ হইয়া আসিয়াছে;—যেন কতকগুলা আরকে-রক্ষিত শব; কতকগুলা শুষ্ক চলন্ত অস্থিপঞ্জর; চক্ষু কোটরে ঢোকা; ভিক্ষা চাহিবার সময় মনে হয়, যেন উহাদের স্বর কণ্ঠের গভীরদেশ হইতে নিঃসৃত হইতেছে। ইহারা গ্রামপল্লির লোক, কিংবা ঐ সব লোকের ভগ্নাবশেষ বলিলেও হয়। ইহারা দেহভার কোনপ্রকারে বহন করিয়া সহরের দিকে চলিয়াছে। উহারা শুনিয়াছে, সেখানে এখনো একমুষ্টি আহার জুটিতে পারে। কিন্তু চলিতে চলিতে প্রায়ই উহারা পথের মাঝে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে; দেখা যায়, কতকগুলা লোক ঘননিবিড় ধূলা-রাশির উপর ইতস্তত শুইয়া আছে; ক্রমে যন্ত্রণার ছট্‌ফটানিতে তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ ধূলায় আচ্ছন্ন হইয়া যায়; তখন উহাদের নগ্নদেহ কঙ্কালের বর্ণ ধারণ করে। এই পথের ধারেই উদয়পুরমহারাজের প্রাসাদের ঘের—উদাস, বিষাদময়। কতকগুলা মস্‌জিদ্‌, মন্দিরের ভগ্নাবশেষ, মর্ম্মরপ্রস্তরের ও অন্যান্য প্রস্তরের চতুষ্ক (kiosque), মৃত মহারাজদিগের অগ্নিসংকারের স্থান—কতকগুলা গম্বুজওয়ালা ইমারৎ—কতকগুলা মরা-গাছ, যাহার শাখার উপর কতকগুলা বানর বসিয়া আছে;—এই সমস্ত প্রাচীর ছাড়াইয়া উঠিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়।

দ্বারদেশে—উচ্চ ধবল প্রাকারাবলীর দ্বারদেশে, যেখানে খোলা তলোয়ার হস্তে কতকগুলা সিপাহী পাহারা দিতেছে—দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট

হতভাগ্য লোকদিগের জনতা প্রবল বন্যার ন্যায় সবেগে আসিয়া যেন কল্‌কপাটের সম্মুখে আট্‌কাইয়া পড়িয়াছে। এইখানে উহারা সমবেত হইয়া হস্ত প্রসারিত করিয়া রহিয়াছে। কেহ যে উহাদের গতিরোধ করিতেছে, এরূপ নহে; কিন্তু, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় নগরের এই সব প্রবেশপথগুলিই ভিক্ষুকদিগের মনোমত স্থান।

তিন শতাব্দী হইল, উদয়পুরনগর স্থাপিত হয়। ইহারই পূর্ব্বদিকে কয়েকক্রোশ দূরে পুরাতন রাজধানী চিতোরের ধ্বংসাবশেষ অবস্থিত। এই উদয়পুর ইহারি মধ্যেই যেন জরাজীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে; সমস্ত চুনকাম-করা, —মনে হয় যেন শুভ্র শোকবস্ত্রে আচ্ছাদিত। ইহার অভ্যন্তরে কতকগুলি দেবমন্দির;— শাদা থাম, শাদা চূড়া; যেটি সর্ব্বাপেক্ষা বড় ও যাহার মাহাত্ম্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক—সেটি জগন্নাথরায়জির মন্দির। মহারাজের প্রাসাদগুলিও খুব শাদা,—একটি শৈলের উপর অধিষ্ঠিত; উহার এক পার্শ্ব হইতে সমস্ত সহর অবলোকন করা যায়। এই সকল প্রাসাদের ধবলপ্রভা একটা গভীর বৃহৎ সরোবরের উপর প্রতিফলিত,—চারিদিকে পর্ব্বত ও বনরাজি ঘিরিয়া আছে।

ঘটনাক্রমে প্রথম হইতেই দুইটি ব্রাহ্মণ-যুবকের সহিত আমার আলাপপরিচয় হয়। ইহারা দুই সহোদর এবং উভয়েই বৃহৎ মন্দিরের পুরোহিত; যে সময়ে আমার আবাসগৃহ হইতে আমি বাহির হই না,—সেই নিস্তব্ধতার সময়ে, সেই জ্বলন্ত উত্তাপের সময়ে—ইহারা বুঝিয়া-সুঝিয়াই আমার সহিত এই পান্থশালায় সাক্ষাৎ করিতে আইসে। এই দুই ভ্রায়ের একইরকম মুখ;—অতীব সুন্দর সূক্ষ্মাবয়ব মুখশ্রী; উভয়েরই বড়-বড় চোখ;—যোগিজনের মত একটু রহস্যময় (mystic)। ইহাদের বিশুদ্ধ কুল সাঙ্কর্য্যদোষে কলুষিত না হইয়া, তিনসহস্র বৎসর হইতে অক্ষুণ্ণভাবে চলিয়া আসিতেছে। ইহারা সেই সব ধ্যানপরায়ণ ঋষিদের বংশধর—যাহারা প্রথম হইতেই, আমাদের মত অধম মানবকুলের বাহিরে ও বহু ঊর্দ্ধে আপনাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে; যাহারা অপরিমিত পানাহারে, কিংবা বাণিজ্যে, কিংবা যুদ্ধে কখন লিপ্ত হয় নাই;—যাহারা একটি ক্ষুদ্র পশুকেও কখন হত্যা করে নাই; যাহারা আহারের জন্য কখন জীবহিংসা করে নাই। যে মাটির ছাঁচে ইহারা গঠিত, তাহা আমাদের হইতে ভিন্ন এবং আমাদের অপেক্ষা নির্ম্মল; মৃত্যুর পূর্ব্বেই ইহারা যেন একটু অশরীরী ভাব ধারণ করে; এবং ইহাদের ইন্দ্রিয়চেতনা এতটা স্থূলতাবর্জ্জিত যে, এই অস্থায়ী জীবনের পরপারস্থ জিনিষসকলও বেশ দিব্যচক্ষে দেখিতে পায়।

কিন্তু সে যাহাই হউক, আমি যে আশা করিয়াছিলাম উহাদের নিকট হইতে কিছু জ্ঞানালোক পাইব, এখন দেখিতেছি, আমার সে আশা আকাশকুসুমবৎ অলীক। অনুষ্ঠান-আড়ম্বরের অপব্যবহারপ্রযুক্ত পুরুষপুরুষানুক্রমে ইহাদের ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম তমসাবৃত হইয়া পড়িয়াছে;—সাঙ্কেতিক রূপকের মধ্যে যে অর্থ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহা এক্ষণে উহারা অবগত নহে।

"আমরা যে দেবতার পূজা করি, সেই দেবতার 'পরমভক্ত করণসিংহের পুত্র,—রাজশ্রী জগৎসিংহ। ১৬৮৪ সালে সিংহাসনে

আরোহণ করিয়াই তিনি এই বৃহৎ মন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ করাইয়া দেন। এই মহারাজা সরোবরের উপরে আরও দুইটি মন্দির নির্ম্মাণ করান। উহাদের নির্ম্মাণে ২৪বৎসর লাগে। উদ্ঘাটন-অনুষ্ঠানের সময়, যখন আমাদের দেবতার বিগ্রহ মন্দিরের মধ্যে স্থাপিত হয়, সেই ১৭০৮ সালে, পার্শ্ববর্ত্তী অনেক রাজারাজড়া অনুচরবর্গের সহিত মহা-সমারোহে এখানে আসিয়াছিলেন ;—তাঁহাদের সঙ্গে বিস্তর হাতী আসিয়াছিল।..."

ঐ দুই ভায়ের মধ্যে একজন এইরূপ আমার নিকট বর্ণনা করিল। তখন বেলা দ্বিপ্রহর,—সমস্ত নিস্তব্ধ ; পান্থশালার ভিতরে আধো-আধো অন্ধকার ; —সমস্ত দরজা-জান্‌লা বন্ধ ; রৌদ্র, মাছি, শুষ্ক বাতাস, দুর্ভিক্ষের বাতাস, কিছুই ভিতরে প্রবেশ করিবার জো নাই। উদয়পুরের মন্দিরাদিসম্বন্ধে, পৌরাণিক সমস্ত দেবদেবীর সম্বন্ধে, ইঁহাদের অগাধ পাণ্ডিত্য ; কিন্তু মনুষ্যের অনন্ত আশার কারণ কি—পরলোকসম্বন্ধে উহাদের আধ্যাত্মিক দৃষ্টি কিরূপ এ সমস্ত বিষয় প্রশ্ন করায় উহারা যে উত্তর করিল, তাহা হইতে আমার কিছুই বোধগম্য হইল না ; তৎক্ষণাৎ যেন আমাদের পরস্পরের মধ্যে সমস্ত সংস্রব চলিয়া গেল ; আমাদের আত্মা যে একজাতীয়, তাহা যেন আর অনুভব করিতে পারিলাম না। আমাদের মধ্যে যেন একটা তমিস্রা রজনীর যবনিকা পড়িয়া পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিল! পুরোহিতসম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোক যেরূপ সচরাচর হইয়া থাকে, উহারাও সেইরূপ দিব্যদর্শী, কিন্তু আবার সেইরূপ সরলমতি ; উহারা কোন রহস্যেরই ব্যাখ্যা করিতে পারে না।

এই দুই পুরোহিত প্রতিদিনই আমার জন্য কিছু-না-কিছু সাদাসিধা উপহার লইয়া আইসে,—কখন ফুল, কখন উহাদের ধরণে প্রস্তুত সামান্য মিষ্টান্ন। উহারা খুব ভদ্র ও মধুরপ্রকৃতি। তথাপি আমাদের মধ্যে যেন একটা আকাশ-পাতাল ব্যবধান। উহারা আমার প্রতি যথেষ্ট সম্মানপ্রদর্শন করে, কিন্তু সেই সঙ্গে বর্ণভেদগত অপরিহার্য্য একটু ঘৃণার ভাবও যেন মিশ্রিত। রক্তমাংসকলুষিত যে সব খাদ্যে আমি পুরুষানুক্রমে অভ্যস্ত, সেই কদর্য্য খাদ্যসামগ্রী উহারা প্রাণান্তেও ভক্ষণ করিবে না ; এমন কি, আমার হস্ত হইতে জলপাত্রও গ্রহণ করিবে না ; শুধু তাহা নহে, আমার সমক্ষে কোন-কিছু আহার করা কিংবা পান করাও উহারা কলঙ্কের বিষয় মনে করে ; —সে কলঙ্ক কিছুতেই ক্ষালিত হইবার নহে!

অন্যদিন যে সময়ে উহারা আইসে, আজ প্রাতে তাহার কিছু পূর্ব্বে আসিয়া আমার ঘরের দরজা খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল ;—সেই সঙ্গে সূর্য্যের জ্বলন্ত কিরণচ্ছটা, একরাশি উড়ন্ত ধূলা, অগ্নিকুণ্ডবৎ আগুনের একটা তপ্ত-নিশ্বাসও প্রবেশ করিল। আজ উহাদের একটা উৎসবদিন,—এই কথা আমাকে জানাইতে আসিয়াছে। আজ উহারা আমার নিকট আর আসিতে পারিবে না ; সূর্য্যাস্তের পর, ইচ্ছা করিলে আমি উহাদের নিকট যাইতে পারি ;—মন্দিরের প্রথম ঘেরটির মধ্যে গেলে উহাদের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইতে পারিবে, ইত্যাদি।

এখানে উৎসবাদির সময়ে যেরূপ মালা লোকে গলায় পরে, সেইরূপ মালা উহারা আমাকে দিয়া গেল ; এই মালা খাঁটি জুঁই-

ফুলের ;—এইজাতীয় জুঁইফুল দক্ষিণভারতে অপরিজ্ঞাত...এই ছোট-ছোট শাদা-ফুলের মালা, আমার শৈশবের পর, আর কখন দেখি নাই—এতদিনের পর আজ আবার দেখিলাম। আমার শৈশবদশায়, আমাদের পারিবারিক গৃহের প্রাঙ্গণে যূথী-অলঙ্কৃত প্রাচীরের ছায়ায় বসিয়া,—আমার বন্ধুদ্বয় আজ আমাকে যে ফুলের মালা উপহার দিয়াছেন—সেইরূপ মালা গাঁথিবার চেষ্টা করিতাম।...হঠাৎ আজ সেই সুদূর অতীতের স্মৃতি আমার মনে জাগিয়া উঠিল। সেই প্রাচীরের ধারে-ধারে,—বৃক্ষ-পত্রের পতন, সেই প্রাঙ্গণের তৃণগুল্ম, প্রস্ফুটিত কুসুমরাশি আমার মনে পড়িয়া গেল। তখন আমার চক্ষে আমাদের সেই গৃহপ্রাঙ্গণই আমার সমস্ত জগৎ ছিল। সেই অসীম অতীতে ফিরিয়া-গিয়া, ক্ষণেকের জন্য আমার মন হইতে এই ব্রাহ্মণ্যের দেশ মুছিয়া গেল ; উদয়পুরের সহর, উদয়পুরের দেববৃন্দ, উদয়-পুরের সূর্য্য, উদয়পুরের দুর্ভিক্ষও মুছিয়া গেল।...

যাহাই হউক, দিবাবসানে শ্রীজগন্নাথ-রায়জির উৎসবস্থলে আমি ঠিক আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

জগন্নাথরায়জির মন্দিরটি সদ্যঃপতিত-তুষারবৎ শুভ্র। ৩০।৪০ ধাপের একটা উঁচু সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে হয়। কতকগুলা পাথরের হাতী প্রহরিরূপে সোপান রক্ষা করিতেছে।

এই উত্তরভারতের মন্দিরচূড়াগুলিতে দাক্ষিণাত্যের স্থায় দেবমূর্ত্তি ও পশুমূর্ত্তির অসঙ্গত মিশ্রণ দেখা যায় না ; এই চূড়াগুলি বেশ প্রকৃতিস্থ ও শান্তধরণের ;—দূর হইতে মনে হয়, যেন সমাধিস্থানের "ইউ"-(ঝাউ)-বৃক্ষ। শ্রীজগন্নাথজির মন্দিরের এইরূপ অনেকগুলি চূড়া আছে ;—সমস্তই শুভ্র—সদ্যঃপতিততুষারবৎ শুভ্র।

আমি জানিতাম, হিন্দু ভিন্ন,—উচ্চবর্ণের লোক ভিন্ন এই মন্দিরের মধ্যে কেহ প্রবেশ করিতে পায় না। তাই আমি মন্দিরের প্রাঙ্গণে থাকিয়া আমার বন্ধুদ্বয়কে ডাকিয়া পাঠাইলাম।

তাহারা আসিল। কিন্তু আমার পান্থ-শালায় তাদের যেমনটি দেখিয়াছিলাম, এখন আর তারা সেরূপ নাই। আমাদের মধ্যে যেন আরও অতলস্পর্শ ব্যবধান পড়িয়া গিয়াছে। প্রথমেই উহারা অন্যদিনের মত আজ আমার হস্তস্পর্শ করিতে পারিবে না বলিয়া ক্ষমাপ্রার্থনা করিল, কারণ আজ তাহাদের পৌরোহিত্যকাজ করিতে হইবে, পবিত্র সামগ্রীসকল স্পর্শ করিতে হইবে।

আজ এই প্রথম উহাদিগকে প্রায়-নগ্ন অবস্থায় দেখিলাম ; উহাদের দেবতার সম্মুখে উহারা এইরূপ নগ্নভাবেই অবস্থিতি করে। তাম্রপ্রতিমূর্ত্তির বক্ষোদেশের ন্যায় উহাদের সুন্দর বক্ষের উপর যজ্ঞোপবীতটি তির্য্যগ্‌ভাবে লম্বমান ; উহাদের বিস্ফারিত নেত্রযুগলে কেমন-একটা অন্যমনস্কভাব, যাহা পূর্ব্বে আমি কখন দেখি নাই।

কিন্তু তবু উহাদের ভদ্রতার কোন ত্রুটি নাই। বিষ্ণুদেবের একটা তাম্রময় বিগ্রহের পাদতলে, এমন কি, মন্দিরদ্বারের ঠিক সম্মুখে, একটা সম্মানের আসনে উহারা আমাকে বসাইল।

বেশভূষায়, দোকানদারে, মন্দিরপ্রাঙ্গণ

আচ্ছন্ন; তাহাদের ঝুড়িগুলা শাদা জুঁই-ফুলের মালায় পূর্ণ। এই সমস্ত ফুলরাশির মধ্যে, দুর্ভিক্ষের প্রেতমূর্ত্তিগুলা—ভস্মবর্ণ-বিশিষ্ট কতকগুলা নরকঙ্কাল ইতস্তত বিচরণ করিতেছে;—উহাদের চোখ জ্বরবিকারগ্রস্ত রোগীর ন্যায়।

আমার সম্মুখে ব্রাহ্মণেরা মন্দিরের সোপান দিয়া ওঠানাবা করিতেছে,—সোপানের উপরে দুই পার্শ্বে বড়-বড় পাথরের হাতী আকাশের দিকে শুঁড় তুলিয়া রহিয়াছে। সকলেরই শুভ্র পরিচ্ছদ, কটিদেশে অসি, এবং বক্ষের উপর থাকে-থাকে অনেকগুলি মালার গোছা। বৃদ্ধদিগের তুষারশুভ্র শ্মশ্রুরাজি—রাজপুতের ধরণে দুই পাশে আঁচ্‌ড়াইয়া তোলা,—দেখিতে কতকটা শাদা বৃদ্ধ মার্জ্জারের মত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিশু;—পা এত ছোট যে, অতি কষ্টে ধাপের উপর উঠিতেছে; কিন্তু উহাদের মুখে একটা গাম্ভীর্য্যের ভাব ও তীক্ষ্ণদর্শিতা প্রকটিত;—মাথায় জরির কাজ-করা মখ্‌মলের টুপি। রমণীগণ দেখিতে চমৎকার;—পুরাতন গ্রীসীয়-ধরণে পরিচ্ছদ-পরিহিতা;—জরির নক্‌সা-কাটা বিবিধ বর্ণের মল্‌মল্‌বস্ত্র; অথবা, কালো রঙের মল্‌মল্‌-বস্ত্রের উপর রূপালি-চুম্‌কি-বসানো। তমসাচ্ছন্ন ও দুষ্প্রবেশ্য মন্দিরের অভ্যন্তরপ্রদেশ হইতে গুহাসমুত্থিত গভীর নাদের ন্যায় একপ্রকার সঙ্গীতধ্বনি,—মধ্যে-মধ্যে বৃহৎ ঢক্কার বজ্রবৎ গর্জ্জনধ্বনি, আমার কর্ণকুহরে আসিয়া পৌঁছিতেছে।

মন্দিরের উপরে উঠিবার পূর্ব্বে প্রত্যেকেই অবনত হইয়া সোপানের নিম্নতম ধাপটি চুম্বন করিতেছে এবং উপরে উঠিয়া পবিত্র মন্দিরচ্ছায়া হইতে বাহির হইবার পূর্ব্বেও, দ্বারদেশে ফিরিয়া-আসিয়া দ্বারদেশের মাটি চুম্বন করিতেছে—প্রণাম করিতেছে। দুর্ভিক্ষের প্রেতমূর্ত্তিরাও ক্রমশ আসিয়া জমা হইতেছে এবং উৎসবসাজে সজ্জিত জনতার গতিরোধ করিতেছে—উহাদের শুষ্ক হস্তের দ্বারা যাত্রীদিগকে আট্‌কাইতেছে; মল্‌মলের অবগুণ্ঠনবস্ত্রের মধ্যে অঙ্গুলী প্রবিষ্ট করিয়া দিতেছে; ভিক্ষালাভের উদ্দেশে, বানরের ন্যায় ক্ষিপ্রভাবে বিবিধ চেষ্টা, ও অসংযতভাবে,—অনায়ত্তভাবে নানাপ্রকার অঙ্গচালনা করিতেছে।...

তাহার পর, প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় যেরূপ হইয়া থাকে—হঠাৎ একটা বাতাস উঠিল; কিন্তু তাহাতে তপ্তনগর শীতল হইল না। ধূলার কুজ্ঝটিকার মধ্যে—পীতাভ, বিষণ্ণ ও ম্লান সূর্য্য অস্তমিত হইল।

এ সমস্ত সত্ত্বেও, রাস্তায় উৎসবঘটা সমস্ত-রাত্রি সমান চলিতে লাগিল। সুগন্ধি রঙিন-চূর্ণ মুঠামুঠা উঠাইয়া লোকেরা পরস্পরের উপর নিঃক্ষেপ করিতে লাগিল;—উহা লোকের মুখে ও পরিচ্ছদে লাগিয়া রহিল। এইরূপ ঝটাপটি করিয়া যখন উহারা বাহির হইল, তখন দেখা গেল, উহাদের মুখের অর্দ্ধভাগ নীল কিংবা বেগুনী কিংবা লাল রঙে রঞ্জিত;—উহাদের শুভ্র পরিচ্ছদে উজ্জ্বল-রং-মাখানো আর্দ্রহস্ত অঙ্কিত হইয়াছে;—গোলাপী কিংবা হল্‌দে কিংবা সবুজ-রং-মাখানো পাঁচ-আঙুলের দাগ পড়িয়াছে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সমাপ্তি।

বন্ধ হ'য়ে এল স্রোতের ধারা,
শৈবালেতে আটক্ প'ল তরি
নৌকা-বাওয়া এবার কর সারা,
নাই রে হাওয়া, পাল নিয়ে কি করি।
এখন তবে চল নদীর তটে,
গোধূলিতে আকাশ হ'ল রাঙা,
পশ্চিমেতে আঁকা আগুন-পটে
বাবলাবনে ঐ দেখা যায় ডাঙা।
ভেসো না আর, যেয়ো না আর ভেসে,
চল এখন, যাবে যে দূরদেশে।

এখন তোমায় তারার ক্ষীণালোকে
চল্‌তে হবে মাঠের পথে একা,
গিরিকানন পড়্‌বে কি আর চোখে,
কুটীরগুলি যাবে কি আর দেখা?
পিছন হ'তে দখিন-সমীরণে
ফুলের গন্ধ আস্‌বে আঁধার বেয়ে
অসময়ে হঠাৎ ক্ষণে ক্ষণে
আবেশেতে দিবে হৃদয় ছেয়ে।
চল এবার কোরো না আর দেরি—
মেঘের আভাস আকাশকোণে হেরি!

হাটের সাথে ঘাটের সাথে আজি
ব্যবসা তোর বন্ধ হ'য়ে গেল।
এখন ঘরে আয় রে ফিরে মাঝি,
আঙিনাতে আসনখানি মেল।
ভুলে যা রে দিনের আনাগোনা
জ্বাল্‌তে হবে সারারাতের আলো,
শ্রান্ত ওরে, রেখে দে জাল-বোনা,
গুটিয়ে ফেল সকল মন্দভালো।
ফিরিয়ে আন ছড়িয়ে-পড়া মন,
সফল হোক্ সকল সমাপন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বঙ্গদর্শন।

দেশনায়ক।*

এবারে বরিশাল প্রাদেশিকসমিতিতে বাঙালী খুব একটা আঘাত পাইয়াছে, সে কথা সকলেই জানেন। ভাতে মারার চেয়ে হাতে মারাটা উপস্থিতমত গুরুতর বলিয়াই মনে হয়। আইন কলের রোলারের মত নির্ম্মম-ভাবে আমাদের অনেক আশা দলন করিতে পারে, কিন্তু পুলিসের সাক্ষাৎ হস্তক্ষেপ বলিতে কি বুঝায়, সশরীরে তাহার অভিজ্ঞতালাভ সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকদের সদাসর্ব্বদা ঘটে না। এবারে অকস্মাৎ তাহার প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইয়া দেশের মান্যগণ্য লোকের চিত্ত উদ্ভ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে।

একটা প্রতিকারের পথ,—একটা কাজ করিবার ক্ষেত্র না পাইলে, বেদনা নিজের প্রতি উত্তেজনার সমস্ত বেগ আকর্ষণ করিয়া অসংযত হইয়া অপরিমিতরূপে বড় হইয়া উঠে। আমরা জানিতাম, ব্রিটিশরাজ্যে আইনজিনিষটা ধ্রুব—এইজন্য সকল উপদ্রবের উপর আইনের দোহাই পাড়িতাম- কিন্তু আইন স্বয়ং বিচলিত হইয়া উপদ্রবের আকার ধারণ করিলে ক্ষণকালের জন্যও মনকে শান্ত করিবার কোনো উপায় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। জলের মধ্যে তুফান উঠিলে লোকে ডাঙার দিকে ছোটে—কিন্তু ভূমিকম্পে ডাঙা যখন স্বয়ং দুলিতে আরম্ভ করে, যাহাকে অচল বলিয়া সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ছিলাম, সে যখন চঞ্চল হইতে থাকে, তখনি বিভীষিকা একেবারে বীভৎস হইয়া উঠে।

এইরূপ সাধারণ চঞ্চলতার সময় সৎ-পরামর্শের সময় নহে। আমিও এই দেশব্যাপী ক্ষোভের সময় স্থিরভাবে মন্ত্রণা দিতে অগ্রসর হইতাম না। কাল—যিনি নীরব, যিনি বিধাতার সুদৃঢ় দক্ষিণহস্ত, যিনি সকল ফলকে ধৈর্য্যের সহিত পাকাইতে থাকেন, আমিও নিষ্ঠার সহিত তাঁহারই নিগূঢ় নিয়মের প্রতি নির্ভর করিয়া প্রতীক্ষা করিব স্থির করিয়াছিলাম, কিন্তু একটি মহান্ আশ্বাস এই অসময়েও আমাকে উৎসাহিত করিয়াছে।

এবারে কর্ত্তৃপুরুষদের সহিত সংঘাতে বাঙালী জয়ী হইয়াছে। এই সঙ্কটকালে

---

* গত ১০ই বৈশাখ শনিবার রায় পশুপতিনাথ বসু বাহাদুরের সৌধপ্রাঙ্গণে আহূত মহাসভায় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কর্ত্তৃক পঠিত।

বাঙালী যে বলের পরিচয় দিয়াছে, সেই বলের দৃষ্টান্তই তাহার সম্মুখে স্থিরভাবে ধরিব বলিয়া এই সভাস্থলে আমি অদ্য উপস্থিত হইয়াছি।

সেদিনকার উপদ্রবে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই আমাদের ছাত্রদলের, যুবকগণের ও নায়কবর্গের অবিচলিত স্থৈর্য্য দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইয়াছেন। যে উৎপাত কোনোমতে আশা করা যায় না, তাহা সহসা মাথার উপরে ভাঙিয়া পড়িলে তখনি মানুষের গভীরতর প্রকৃতি আপনাকে অনাবৃতভাবে প্রকাশ করিয়া ফেলে। সেদিন বাঙালী নিজেকে যেরূপে ব্যক্ত করিয়াছে, তাহাতে আমাদের লজ্জার কোনো কারণ ঘটে নাই।

আপনারা সকলেই জানেন, সেদিন সভাপতিকে লইয়া যখন প্রতিনিধি ও সভ্যসদ্গণ মন্ত্রণাসভার পথে যাত্রা করিয়াছিলেন, তখন নায়কবর্গের আদেশ অনুসারে যাত্রিগণ কেহ একটি যষ্টিও গ্রহণ করেন নাই। এবং পুলিস যখন নিরস্ত্র-তাঁহাদের উপর পড়িয়া আঘাত-বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল, তখনো নায়কদের উপদেশ স্মরণ করিয়া তাঁহারা দৃঢ়তার সহিত সমস্ত সহ্য করিয়াছেন।

আমি জানি, এ সম্বন্ধে অবিচারের আশঙ্কা আছে।

"তেজস্বিত্বমহঙ্কারো বাগ্মিত্বং মুখরতা বক্তৃশক্তিঃ স্থিরে"

তেজস্বিতাকে অহঙ্কার, বাগ্মিতাকে মুখরতা এবং স্থৈর্য্যকে অশক্তি বলিয়া নিন্দুকে নিন্দা করে। সময়বিশেষে স্থৈর্য্য অশক্তির লক্ষণরূপে প্রকাশ পায় বটে, কিন্তু যখন তাহা বীর্য্য হইতে প্রসূত হয়, তখন তাহা বীর্য্যের শ্রেষ্ঠলক্ষণ বলিয়াই গণ্য হয়। বরিশালে কর্তৃপক্ষ অসংযমের দ্বারা হাস্যকর কাপুরুষতা এবং আমরা স্থৈর্য্যের দ্বারা শক্তির গাম্ভীর্য্য প্রকাশ করিয়াছি, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এই যে সাময়িক উৎপাতের দ্বারা আত্মবিস্মৃত না হইয়া সাধারণের মঙ্গলের উদ্দেশে আমরা উদ্বেল প্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণ শাসনে রাখিয়াছিলাম, ইহার দ্বারাই আশান্বিত হইয়া উত্তেজনাশান্তির পূর্ব্বেই অদ্যকার সভায় আমি দুইএকটি কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

দেশের হিতসাধন একটা বৃহৎ মঙ্গলের ব্যাপার, নিজের প্রবৃত্তির উপস্থিত চরিতার্থতাসাধন তাহার কাছে নিতান্তই তুচ্ছ। যদি এই বৃহৎ লক্ষ্যটাকে আমাদের হৃদয়ের সম্মুখে যথার্থভাবে ধরিয়া রাখিতে পারি, তবে ক্ষণিক উত্তেজনা,—ক্ষুদ্র অন্তর্দাহ আমাদিগকে পথভ্রষ্ট করিতে পারে না।

সৈন্যদল যখন রণক্ষেত্রে যাত্রা করে, তখন যদি পাশের গলি হইতে তাহাদিগকে কেহ গালি দেয় বা গায়ে ঢিল ছুঁড়িয়া মারে, তবে তখনি ছত্রভঙ্গ হইয়া অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য তাহারা পাশের গলিতে ছুটিয়া যায় না। এ অপমান তাহাদিগকে স্পর্শও করিতে পারে না—কারণ, তাহাদের সম্মুখে বৃহৎ সংগ্রাম, তাহাদের সম্মুখে মহৎ-মৃত্যু। তেমনি যদি আমরা যথার্থভাবে আমাদের এই বৃহৎ দেশের কাজ করিবার দিকে যাত্রা করি, তবে তাহারই মাহাত্ম্যে ছোট-বড় বহুতর বিক্ষোভ আমাদিগকে স্পর্শই করিতে পারে না—তবে ক্ষণে ক্ষণে একএকটা রাগারাগির ছুতা লইয়া ছুটাছুটি করিয়া বৃথা যাত্রাভঙ্গ করিতে প্রবৃত্তি হয় না।

আমাদের দেশে সম্প্রতি যে সঙ্কল্প

আন্দোলন-আলোচনার ঢেউ উঠিয়াছে, তাহার মধ্যে অনেকটা আছে,—যাহা কলহমাত্র। নিঃসন্দেহই দেশবৎসল লোকেরা এই কলহের জন্য অন্তরে-অন্তরে লজ্জা অনুভব করিতেছেন। কারণ, কলহ অক্ষমের উত্তেজনাপ্রকাশ, তাহা অকর্ম্মণ্যের একপ্রকার আত্মবিনোদন। আপনাদের কাছে আমি স্পষ্টই স্বীকার করিতেছি, বাঙালীর মুখে "বয়কট্"শব্দের আস্ফালনে আমি বারংবার মাথা হেঁট করিয়াছি। আমাদের পক্ষে এমন সঙ্কোচজনক কথা আর নাই। বয়কট্ দুর্ব্বলের প্রয়াস নহে, ইহা দুর্ব্বলের কলহ। আমরা নিজের মঙ্গলসাধনের উপলক্ষ্যে নিজের ভাল করিলাম না, আজ পরের মন্দ করিবার উৎসাহেই নিজের ভাল করিতে বসিয়াছি, এ কথা মুখে উচ্চারণ করিবার নহে। আমি অনেক বক্তাকে উচ্চৈস্বরে বলিতে শুনিয়াছি —"আমরা য়ুনিভর্সিটিকে বয়কট্ করিব?" কেন করিব? য়ুনিভর্সিটি যদি ভাল জিনিষ হয়, তবে তাহার সঙ্গে গায়ে পড়িয়া আড়ি করিয়া দেশের অহিত করিবার অধিকার আমাদের কাহারো নাই। যদি য়ুনিভর্সিটি অসম্পূর্ণ হয়, যদি তাহা আমাদিগকে অভীষ্টফল দান না করে, তবে তাহাকে বর্জ্জন করাকে বয়কট্ করা বলে না। যে মনিব বেতন দেয় না, তাহার কর্ম্ম ছাড়িয়া দেওয়াকে বয়কট্ করা বলে না। কচ দৈত্যগুরুর আশ্রমে আসিয়া দৈত্যদের উৎপীড়ন ও গুরুর অনিচ্ছাসত্ত্বেও ধৈর্য্য ও কৌশল অবলম্বনপূর্ব্বক বিদ্যালাভ করিয়া দেবগণকে জয়ী করিয়াছেন। জাপানও য়ুরোপের আশ্রম হইতে এইরূপ কচের মতই বিদ্যালাভ করিয়া আজ জয়যুক্ত হইয়াছেন। দেশের যাহাতে ইষ্ট, তাহা যেমন করিয়াই হউক্ সংগ্রহ করিতে হইবে, সেজন্য সমস্ত সহ্য করা পৌরুষেরই লক্ষণ—তাহার পর সংগ্রহকার্য্য শেষ হইলে স্বাতন্ত্র্যপ্রকাশ করিবার দিন আসিতে পারে। দেশের কাজে রাগারাগিটা কখনই লক্ষ্য হইতে পারে না। দেশের কাজের মাহাত্ম্য যদি আমরা মনের মধ্যে ধারণ করিয়া রাখিতে পারি, তবে তাহারই উদ্দেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উত্তেজনা আমরা উপেক্ষা করিয়া কর্ত্তব্যপথে স্থির থাকিতে পারিব।

আমাদের সৌভাগ্যক্রমে, দেশে স্বদেশী উদ্যোগ আজ যে এমন ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, বয়কট্ তাহার প্রাণ নহে। একটা তুচ্ছ কলহের ভাব কখনই দেশের অন্তঃকরণকে এমন করিয়া টানিতে পারিত না। এই যে স্বদেশী উদ্যোগের আহ্বানমাত্রে দেশ এক মুহূর্ত্তে সাড়া দিয়াছে, কার্জ্জনের সঙ্গে আড়ি তাহার কারণ হইতেই পারে না; জগতে কার্জ্জন এত-বড় লোক নহে; এই আহ্বান দেশের শুভবুদ্ধির সিংহদ্বারে আঘাত করিয়াছিল বলিয়াই আজ ইহা এত দ্রুত এমন সমাদর পাইয়াছে। আজ আমরা দেশের কাপড় পরিতেছি কেবল পরের উপর রাগ করিয়া, এই যদি সত্য হয়, তবে দেশের কাপড়ের এত-বড় অবমাননা আর হইতেই পারে না। আজ আমরা স্বায়ত্তভাবে দেশের শিক্ষার উন্নতিসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছি, রাগারাগিই যদি তাহার ভিত্তিভূমি হয়, তবে এই বিদ্যালয়ে আমরা জাতীয় অগৌরবের স্মরণস্তম্ভ রচনা করিতেছি।

আরো লজ্জার কারণ এই যে, বয়কটের মধ্যে আমরা যে স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিতেছি, সেই স্পর্দ্ধার শক্তিটা কোথায় অবস্থিত? সে কি আমাদের নিজের গায়ের জোরে, না ইংরেজ-

শাসনতন্ত্রের ক্ষমাগুণে! যখনি সেই ক্ষমাগুণের লেশমাত্র বৈলক্ষণ্য দেখি, এখনি মানবধর্ম্মবশত স্পর্দ্ধার বিরুদ্ধে ক্ষমতাশালীর আক্রোশ আইনের বেড়ার কোনো-একটা অংশ একটুমাত্র আল্‌গা করিয়া ফেলে, অমনি আমরা বিস্মিত ও উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠি এবং তৎক্ষণাৎ প্রমাণ করিয়া দিই যে, পরের ধৈর্য্যের প্রতি বিশ্বাসস্থাপন করিয়াই আমরা পরকে উত্তেজিত করিতেছিলাম। আমাদের স্পর্দ্ধা যদি যথার্থ আমাদেরই শক্তি হইতে উদ্ভূত হইত, তবে অপরপক্ষের স্বাভাবিক রোষ এবং শাসনের কাঠিন্য আমরা স্বীকার করিয়া লইতাম, তবে উদ্যতমুষ্টি দেখিবামাত্র তৎক্ষণাৎ আমরা মিণ্টো-মর্লির দোহাই পাড়িতে ও আদালতের আব্দার কাড়িতে ছুটিতাম না।

এ কথা মানিতেই হয় যে, স্বভাবের নিয়মে স্পর্দ্ধার বিরুদ্ধে ক্রোধ উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং সক্ষমের ক্রোধ কোনো-না-কোনো উপায়ে হিংসার আকার ধারণ করে। যদি আমরা ইংরেজকে বলি, "তোমাকে জব্দ করিবার জন্যই আমরা দেশের ভাল করিতেছি" এবং তার পরে ইংরেজ রক্তচক্ষু হইবামাত্র বলি, "বাঃ, আমরা দেশের ভাল করিতেছি, তোমরা রাগ করিতেছ কেন", তবে গাম্ভীর্য্যরক্ষা করা কঠিন হয়।

জব্দ করিতে পারার একটা সুখ আছে, সন্দেহ নাই—কিন্তু দেশের ভাল করিতে পারার সুখ যদি তাহার চেয়ে বড় হয়, তবে তাহারই খাতির রাখিতে হয়। আমরা বয়কট্ করিয়াই দেশীকাপড় চালাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, এ কথা বলিবামাত্র দেশীকাপড় চালানো বিঘ্নসঙ্কুল হইয়া উঠে, সুতরাং জব্দ করিবার সুখ ত্যাগ করিতে গিয়া ভাল করিবার সুখ খর্ব্ব করিতে হয়। দেশীকাপড় চালানো ইংরেজের বিরুদ্ধে আমাদের একটা লড়াই, এ কথা বলিলেই যাহা আমাদের চিরন্তন মঙ্গলের পবিত্র ব্যাপার, তাহাকে মল্লবেশ পরাইয়া পোলিটিকাল্ আখ্‌ড়ায় টানিয়া আনিতে হয়; ইংরেজ তখন এই উদ্যোগকে কেবল যে নিজের দেশের তাঁতীর লোকসান বলিয়া দেখে, তাহা নয়, এই হারজিতের ব্যাপারকে একটা পোলিটিকাল্ সংগ্রাম বলিয়া গণ্য করে। ইহাতে ফল হয় এই যে, নিজের দুর্ব্বল প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার উদ্দেশে আমরা স্বদেশের হিতকে ইচ্ছাপূর্ব্বক বিপদের মুখে ফেলিয়া দিই। আমাদের দেশে ত অন্তরে-বাহিরে, নিজের চরিত্রে ও পরের প্রতিকূলতায় বিঘ্ন ভূরিভূরি আছে, তাহার 'পরে আস্ফালন করিয়া নূতন বিঘ্নকে হাঁক দিয়া ডাকিয়া আনিব, এত-বড় অনাবশ্যক শক্তিক্ষয়ের উপযুক্ত সঞ্চয় যে আমাদের কোথায় আছে, তাহার সন্ধান ত আমি জানি না।

বড়-বড় স্বাধীনজাতিকেও বিবেচনা করিয়া চলিতে হয়— স্তব্ধ হইয়া থাকিতে হয়। স্বজাতির মঙ্গলসম্বন্ধে যাহাদের দায়িত্ববোধ আছে, তাহারা তেজস্বী হইলেও অনেক লাঙ্গুলমর্দ্দন বিনম্রফণায় নিঃশব্দে স্বীকার করে—ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জর্ম্মণিতে ইহার অনেক দৃষ্টান্ত দেখা গেছে। জাপান চীনের সঙ্গে লড়াইয়ে জয়ী হইয়াও রাশিয়ার চক্রান্তে লড়াইয়ের ফল যখন ভোগ করিতে পারে নাই, তখন চুপ করিয়া ছিল—আজ রাশিয়াকে পরাস্ত করিয়াও বন্ধুদের মধ্যস্থতায় যখন রক্তপাতের পুরামূল্য আদায় করিতে পারিল

না, তখন হাস্যমুখে বন্ধুগণকে ধন্যবাদ জানাইল। কেন? ইহার কারণ, অসহিষ্ণু হইয়া তেজ দেখাইতে যাওয়াই দুর্ব্বলতা, দেশের মঙ্গলকে শিরোধার্য্য করিয়া স্তব্ধ হইয়া থাকাই যথার্থ বীরত্ব। যদি ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জাপানের পক্ষে এ কথা সত্য হয়, যদি তাহারা ঔদ্ধত্যপ্রকাশ করিয়া উন্নতির যাত্রাপথে স্বজাতির বোঝা বাড়াইয়া তুলিতে সর্ব্বদাই কুণ্ঠিত হয়, তবে আমাদের এই অতি ক্ষুদ্র কর্ম্মক্ষেত্রে কেবল কথায়-কথায় সশব্দে তাল ঠুকিয়া বেড়ানই কি আমাদের পক্ষে সকলের চেয়ে বড় কাজ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে? যথসাধ্য মৌন থাকিয়া,—স্তব্ধ থাকিয়া আমাদের চলিবার পথের বিপুলকায় বিঘ্নদৈত্যগুলিকে নিদ্রিত রাখাই কি আমাদের কর্ত্তব্য হইবে না? অবশ্য, কারণ ঘটিলে ক্ষোভ অনুভব না করিয়া থাকা যায় না—কিন্তু অসময়ে অকিঞ্চিৎকরভাবে সেই ক্ষোভের অপব্যয় করা না করা আমাদের আয়ত্তাধীন হওয়া উচিত।

একবার দেশের চারিদিকে চাহিয়া দেখিবেন, এত দুঃখ এমন নিঃশব্দে বহন করিয়া চলিয়াছে, এরূপ করুণ দৃশ্য জগতের আর কোথাও নাই। নৈরাশ্য ও নিরানন্দ, অনশন ও মহামারী এই প্রাচীন ভারতবর্ষের মন্দিরভিত্তির প্রত্যেক গ্রন্থি বিদীর্ণ করিয়া শিকড় বিস্তার করিয়াছে। দুঃখের মত এমন কঠোর সত্য,—এমন নিদারুণ পরীক্ষা আর কি আছে! তাহার সঙ্গে খেলা চলে না—তাহাকে ফাঁকি দিবার জো কি, তাহার মধ্যে কৃত্রিম কাল্পনিকতার অবকাশমাত্র নাই—সে শত্রুমিত্র সকলকেই শক্ত করিয়া বাজাইয়া লয়। এই দেশব্যাপী ভীষণ দুঃখের সম্বন্ধে আমরা কিরূপ ব্যবহার করিলাম, তাহাতেই আমাদের মনুষ্যত্বের যথার্থ পরিচয়। এই দুঃখের কৃষ্ণ-কঠিন নিকষপাথরের উপরে আমাদের দেশানুরাগ যদি উজ্জ্বল রেখাপাত করিয়া না থাকে, তবে আপনারা নিশ্চয় জানিবেন, তাহা খাঁটি সোনা নহে। যাহা খাঁটি নহে, তাহার মূল্য আপনারা কাহার কাছে প্রত্যাশা করেন? ইংরেজজাত যে এ সম্বন্ধে জহরী, তাহাকে ফাঁকি দিবেন কি করিয়া? আমাদের দেশহিতৈষণার উদ্যোগ তাহাদের কাছে শ্রদ্ধা-লাভ করিবে কি উপায়ে? আমরা নিজে দান করিলে তবেই দাবী করিতে পারি। কিন্তু সত্য করিয়া বলুন, কে আমরা কি করিয়াছি? দেশের দারুণ দুর্যোগের দিনে আমাদের মধ্যে যাহাদের সুখের সম্বল আছে, তাহারা সুখেই আছি; যাহাদের অবকাশ আছে, তাহাদের আরামের লেশমাত্র ব্যাঘাত হয় নাই; ত্যাগ যেটুকু করিয়াছি, তাহা উল্লেখযোগ্যই নহে; কষ্ট যেটুকু সহিয়াছি, আর্ত্তনাদ তাহা অপেক্ষা অনেক বেশিমাত্রায় করা হইয়াছে।

ইহার কারণ কি? ইহার কারণ এই যে, এতকাল পরের দ্বারে আমরা মাথা কুটিয়া মরিবার চর্চ্চা করিয়া আসিয়াছি, স্বদেশ-সেবার চর্চ্চা করি নাই। দেশের দুঃখ দূর—হয় বিধাতা, নয় গবর্মেণ্ট, করিবেন, এই ধারণাকেই আমরা সর্ব্ব-উপায়ে প্রশ্রয় দিয়াছি। আমরা যে দলবদ্ধ,—প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া নিজে এই কার্য্যে ব্রতী হইতে পারি, এ কথা আমরা অকপটভাবে নিজের কাছেও স্বীকার করি নাই। ইহাতে দেশের লোকের সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের সম্বন্ধ থাকে না, দেশের দুঃখের

সঙ্গে আমাদের চেষ্টার যোগ থাকে না, দেশানুরাগ বাস্তবতার ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হয় না—সেইজন্যই চাঁদার খাতা মিথ্যা ঘুরিয়া মরে এবং কাজের দিনে কাহারো সাড়া পাওয়া যায় না।

আজ ঠিক কুড়িবৎসর হইল, প্রেসিডেন্সি-কলেজের তদানীন্তন অধ্যাপক ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার রায় মহাশয়ের বাড়ীতে ছাত্রসম্মিলন উপলক্ষ্যে যে গান রচিত হইয়াছিল, তাহার এক অংশ উদ্ধৃত করি—

মিছে—

কথার বাঁধুনি কাঁদুনির পালা,
চোখে নাই কারো নীর,
আবেদন আর নিবেদনের থালা
বহে' বহে' নতশির।
কাঁদিয়ে সোহাগ ছিছি একি লাজ,
জগতের মাঝে ভিখারীর সাজ,
আপনি করি নে আপনার কাজ,
পরের 'পরে অভিমান।

ওগো—

আপনি নামাও কলঙ্কপসরা,
যেয়ো না পরের দ্বার।
পরের পায়ে ধরে' মানভিক্ষা করা
সকল ভিক্ষার ছার।
দাও দাও বলে' পরের পিছু-পিছু
কাঁদিয়ে বেড়ালে মেলে না ত কিছু
যদি মান চাও যদি প্রাণ চাও
প্রাণ আগে কর দান।

সেদিন হইতে কুড়িবৎসরের পরবর্ত্তী ছাত্রগণ আজ নিঃসন্দেহ বলিবেন যে, এখন আমরা আবেদনের থালা নামাইয়া ত হাত খোলসা করিয়াছি, আজ ত আমরা নিজের কাজ নিজে করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি। যদি সত্যই হইয়া থাকি ত ভালই, কিন্তু পরের 'পরে অভিমানটুকু কেন রাখিয়াছি—যেখানে অভিমান আছে, সেইখানেই যে প্রচ্ছন্নভাবে দাবী রহিয়া গেছে। আমরা পুরুষের মত বলিষ্ঠভাবে স্বীকার করিয়া না লই কেন যে, আমরা বাধা পাইবই, আমাদিগকে প্রতিকূলতা অতিক্রম করিতে হইবেই; কথায়-কথায় আমাদের দুই চক্ষু এমন ছল্‌ছল্‌ করিয়া আসে কেন! আমরা কেন মনে করি, শত্রু-মিত্র সকলে মিলিয়া আমাদের পথ সুগম করিয়া দিবে। উন্নতির পথ যে সুদুস্তর, এ কথা জগতের ইতিহাসে সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ—

"ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।"

কেবল কি আমরাই—এই দুরত্যয় পথ যদি অপরে সহজ করিয়া, সমান করিয়া না দেয়—তবে নালিশ করিয়া দিন কাটাইব—এবং মুখ অন্ধকার করিয়া বলিব, তবে আমরা নিজের তাঁতের কাপড় নিজে পরিব, নিজের বিদ্যালয়ে নিজে অধ্যয়ন করিব! এ সমস্ত কি অভিমানের কথা!

আমি জিজ্ঞাসা করি, সর্ব্বনাশের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কাহারো কি অভিমান মনে আসে—মৃত্যুশয্যার শিয়রে বসিয়া কাহারো কি কলহ করিবার প্রবৃত্তি হইতে পারে! আমরা কি দেখিতেছি না, আমরা মরিতে সুরু করিয়াছি! আমি রূপকের ভাষায় কথা কহিতেছি না,—আমরা সত্যই মরিতেছি। যাহাকে বলে বিনাশ, যাহাকে বলে বিলোপ, তাহা নানা বেশ ধারণ করিয়া এই পুরাতন জাতির আবাসস্থলে আসিয়া দেখা দিয়াছে। ম্যালেরিয়ায় শতসহস্র লোক মরিতেছে এবং যাহারা মরিতেছে না, তাহারা জীবন্মৃত হইয়া

পৃথিবীর ভারবৃদ্ধি করিতেছে। এই ম্যালেরিয়া পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে, প্রদেশ হইতে প্রদেশান্তরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে। প্লেগ্ এক রাত্রির অতিথির মত আসিল, তার পরে বৎসরের পর বৎসর যায়, আজও তাহার নররক্তপিপাসার নিবৃত্তি হইল না। যে বাঘ একবার মনুষ্য-মাংসের স্বাদ পাইয়াছে, সে যেমন কোনোমতে সে প্রলোভন ছাড়িতে পারে না, দুর্ভিক্ষ তেম্‌নি করিয়া বারংবার ফিরিয়া-ফিরিয়া আমাদের লোকালয়কে জনশূন্য করিয়া দিতেছে। ইহাকে কি আমরা দৈবদুর্ঘটনা বলিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকিব? সমস্ত দেশের উপরে মৃত্যুর এই যে অবিচ্ছিন্ন জাল-নিক্ষেপ দেখিতেছি, ইহাকে কি আমরা আকস্মিক বলিতে পারি?

ইহা আকস্মিক নহে। ইহা বদ্ধমূল ব্যাধির আকার ধারণ করিতেছে। এম্‌নি করিয়া অনেক জাতি মারা পড়িয়াছে—আমরাও যে দেশব্যাপী মৃত্যুর আক্রমণ হইতে বিনা চেষ্টায় নিষ্কৃতি পাইব, এমন ত কোনো কারণ দেখি না। আমরা চক্ষের সমক্ষে দেখিতেছি যে, যে-সব জাতি সুস্থ-সবল, তাহারাও প্রাণরক্ষার জন্য প্রতিক্ষণে লড়াই করিতেছে—আর আমরা আমাদের জীর্ণতার উপরে মৃত্যুর পুনঃপুন নখরাঘাতসত্ত্বেও বিনা প্রয়াসে বাঁচিয়া থাকিব?

এ কথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে, ম্যালেরিয়া-প্লেগ-দুর্ভিক্ষ কেবল উপলক্ষ্যমাত্র, তাহারা বাহ্যলক্ষণমাত্র—মূল ব্যাধি দেশের মজ্জার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। আমরা এতদিন একভাবে চলিয়া আসিতেছিলাম—আমাদের হাটে, বাটে, গ্রামে, পল্লীতে আমরা একভাবে বাঁচিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলাম, আমাদের সে ব্যবস্থা বহুকালের পুরাতন। তাহার পরে আজ বাহিরের সংঘাতে আমাদের অবস্থান্তর ঘটিয়াছে। এই নূতন অবস্থার সহিত এখনো আমরা সম্পূর্ণ আপোস করিয়া লইতে পারি নাই—এক জায়গায় মিলাইয়া লইতে গিয়া আর-এক জায়গায় অঘটন ঘটিতেছে। যদি এই নূতনের সহিত আমরা কোনোদিন সামঞ্জস্য করিয়া লইতে না পারি, তবে আমাদিগকে মরিতেই হইবে। পৃথিবীতে যে সকল জাতি মরিয়াছে, তাহারা এম্‌নি করিয়াই মরিয়াছে।

ম্যালেরিয়ার কারণ দেশে নূতন হইয়াছে, এমন নহে। চিরদিনই আমাদের দেশ জলা-দেশ—বনজঙ্গল এখনকার চেয়ে বরং পূর্ব্বে বেশিই ছিল, এবং কোনোদিন এখানে মশার অভাব ছিল না। কিন্তু দেশ তখন সচ্ছল ছিল। যুদ্ধ করিতে গেলে রসদের দরকার হয়—সর্ব্বপ্রকার গুপ্ত মারীশক্তির সহিত লড়াইয়ে সেদিন আমাদের রসদের অভাব ছিল না। আমাদের পল্লীর অন্নপূর্ণা সেদিন নিজের সন্তানদিগকে অর্দ্ধভুক্ত রাখিয়া টাকার লোভে পরের ছেলেকে স্তন্য দিতে যাইতেন না। শুধু তাই নয়, তখনকার সমাজব্যবস্থায় পল্লীর জলাশয় খনন ও সংস্কারের জন্য কাহারো অপেক্ষা করিতে হইত না—পল্লীর ধর্ম্মবুদ্ধি পল্লীর অভাবমোচনে নিয়ত জাগ্রত ছিল। আজ বাংলার গ্রামে গ্রামে কেবল যে জলকষ্ট হইয়াছে, তাহা নহে, প্রাচীন জলাশয়গুলি দূষিত হইয়াছে। এইরূপে শরীর যখন অন্নাভাবে হীনবল, এবং পানীয়জল যখন শোধনাভাবে রোগের নিকেতন, তখন বাঁচিবার উপায় কি? এইরূপে প্লেগও

সহজেই আমাদের দেশ অধিকার করিয়াছে—কোথাও সে বাধা পাইতেছে না, কারণ পুষ্টি-অভাবে আমাদের শরীর অরক্ষিত।

পুষ্টির অভাব ঘটিবার প্রধান কারণ, নানা নূতন নূতন প্রণালীযোগে অন্ন বাহিরের দিকে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে—আমরা যাহা খাইয়া এতদিন মানুষ হইয়াছিলাম, তাহা যথেষ্ট-পরিমাণে পাইতেছি না। আজ পাড়াগাঁয়ে যান, সেখানে দুধ দুর্লভ, ঘি দুর্ম্মূল্য, তেল কলিকাতা হইতে আসে, তাহাকে পূর্ব্ব-অভ্যাস-বশত সরিষার তেল বলিয়া নিজেকে সান্ত্বনা দিই—তা ছাড়া, যেখানে জলকষ্ট, সেখানে মাছের প্রাচুর্য্য নাই, সে কথা বলা বাহুল্য। সস্তার মধ্যে সিঙ্কোনা সস্তা হইয়াছে। এইরূপে একদিনে নহে, দিনে দিনে সমস্তদেশের জীবনী শক্তির মূলসঞ্চয় ক্রমে ক্রমে ক্ষয় হইয়া যাইতেছে। যেমন মহাজনের কাছে যখন প্রথম দেনা করিতে আরম্ভ করা যায়, তখনো শোধ করিবার সম্বল ও সম্ভাবনা থাকে; কিন্তু সম্পত্তি যখন ক্ষীণ হইতে থাকে, তখন যে মহাজন একদা কেবল নৈমিত্তিক ছিল, সে নিত্য হইয়া উঠে—আমাদের দেশেও ম্যালেরিয়া, প্লেগ্, ওলাউঠা, দুর্ভিক্ষ একদিন আকস্মিক ছিল, কিন্তু এখন ক্রমে আর কোনোকালে তাহাদের দেনাশোধ করিবার উপায় দেখা যায় না, আমাদের মূলধন ক্ষয় হইয়া আসিয়াছে, এখন তাহারা আর কেবল ক্ষণে ক্ষণে তাগিদ করিতে আসে না, তাহারা আমাদের জমিজমাতে, আমাদের ঘরবাড়ীতে নিত্য হইয়া বসিয়াছে। বিনাশ যে এম্‌নি করিয়াই ঘটে, বৎসরে বৎসরে তাহার কি হিসাব পাওয়া যাইতেছে না?

এমন অবস্থায় রাজার মন্ত্রণাসভায় ছুটো প্রশ্ন উত্থাপন করিতে ইচ্ছা কর যদি ত কর, তাহাতে আমি আপত্তি করিব না। কিন্তু সেইখানেই কি শেষ? আমাদের গরজ কি তাহার চেয়ে অনেক বেশি নহে? ঘরে আগুন লাগিলে কি পুলিসের থানাতে খবর পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত থাকিবে? ইতিমধ্যে চোখের সাম্‌নে যখন স্ত্রীপুত্র পুড়িয়া মরিবে, তখন দারোগার শৈথিল্যসম্বন্ধে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে নালিশ করিবার জন্য বিরাট্ সভা আহ্বান করিয়া কি বিশেষ সান্ত্বনালাভ করা যায়? আমাদের গরজ যে অত্যন্ত বেশি! আমরা যে মরিতেছি! আমাদের অভিমান করিবার, কলহ করিবার, অপেক্ষা করিবার আর অবসর নাই। যাহা পারি, তাহাই করিবার জন্য এখনি আমাদিগকে কোমর বাঁধিতে হইবে। চেষ্টা করিলেই যে, সকল সময়েই সিদ্ধিলাভ হয়, তাহা না হইতেও পারে, কিন্তু কাপুরুষের নিষ্ফলতা যেন না ঘটিতে দিই—চেষ্টা না করিয়া যে ব্যর্থতা, তাহা পাপ, তাহা কলঙ্ক।

আমি বলিতেছি, আমাদের দেশে যে দুর্গতি ঘটিয়াছে, তাহার কারণ আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে এবং তাহার প্রতিকার আমাদের নিজের ছাড়া আর কাহারো দ্বারা কোনোদিন সাধ্য হইতে পারে না। আমরা পরের পাপের ফলভোগ করিতেছি, ইহা কখনই সত্য নহে এবং নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত সুকৌশলে পরকে দিয়া করাইয়া লইব, ইহাও কোনোমতে আশা করিতে পারি না।

সৌভাগ্যক্রমে আজ দেশের নানাস্থান হইতে এই প্রশ্ন উঠিতেছে—'কি করিব, কেমন

করিয়া করিব ?' আজ আমরা কর্ম্ম করিবার ইচ্ছা অনুভব করিতেছি, চেষ্টায়ও প্রবৃত্ত হইতেছি—এই ইচ্ছা যাহাতে নিরাশ্রয় না হয়, এই চেষ্টা যাহাতে বিক্ষিপ্ত হইয়া না পড়ে, প্রত্যেকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তি যাহাতে বিচ্ছিন্ন-কণা-আকারে বিলীন হইয়া না যায়, আজ আমাদিগকে সেই দিকে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে হইবে। রেলগাড়ির ইষ্টিম্ উচ্চস্বরে বাঁশী বাজাইবার জন্য হয় নাই, তাহা গাড়ি চালাইবার জন্যই হইয়াছে। বাঁশী বাজাইয়া তাহা সমস্তটা ফুঁকিয়া দিলে ঘোষণার কাজটা জমে বটে, কিন্তু অগ্রসর হইবার কাজটা বন্ধ হইয়া যায়। আজ দেশের মধ্যে যে উদ্যম উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাকে একটা বেষ্টনের মধ্যে না আনিতে পারিলে তাহা নিজের মধ্যে কেবল বিরোধ করিতে থাকিবে, নূতন নূতন দলের সৃষ্টি করিবে এবং নানা সাময়িক উদ্বেগের আকর্ষণে তুচ্ছ কাজকে বড় করিয়া তুলিয়া নিজের অপব্যয় সাধন করিবে।

দেশের সমস্ত উদ্যমকে বিক্ষেপের ব্যর্থতা হইতে একের দিকে ফিরাইয়া আনিবার একমাত্র উপায় আছে—কোনো একজনকে আমাদের অধিনায়ক বলিয়া স্বীকার করা। এ কথা পূর্ব্বেও একবার বলিয়াছি, সেও বেশিদিনের কথা নহে। সেই অল্পদিনের মধ্যে সময়ের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তখনো আমরা কার্য্যক্ষেত্রে নামিবার জন্য মনের মধ্যে প্রস্তুত ছিলাম না। এইজন্য তখনো আমরা তর্কবিতর্কের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারজাল ছেদন করিয়া প্রশস্ত কর্ম্মপথে মুক্তিলাভ করিবার জন্য কোনো অভাব অনুভব করি নাই। তখনো ডিবেটিং সোসাইটির দ্বারাতেই দেশের কাজ চালানো যায়, এইরূপ একটা বাল্যসংস্কার আমাদের মনে ছিল। আজ কার্য্যক্ষেত্রে নামিতে উদ্যত হইয়াছি; আজ এতক্ষণে নিশ্চয়ই অন্তত একটুও বুঝিয়াছি যে, দশে মিলিয়া যেমন করিয়া বাদবিবাদ করা যায়, দশে মিলিয়া ঠিক তেমন করিয়া কাজ করা চলে না। ঝগড়া করিতে গেলে হট্টগোল করা সাজে, কিন্তু যুদ্ধ করিতে গেলে সেনাপতি চাই। কথা চালাইতে গেলে নানা লোকে মিলিয়া স্বর কণ্ঠস্বরকে উচ্চ হইতে উচ্চতর সপ্তকে উৎক্ষিপ্ত করিবার চেষ্টা করা যায়, কিন্তু জাহাজ চালাইতে গেলে একজন কাপ্তেনের প্রয়োজন।

অল্পকাল পূর্ব্বে বাংলাদেশে স্বদেশী আন্দোলনের যখন প্রথম জোয়ার আসিয়াছিল, তখন ছাত্রদের মুখে এবং চারিদিকে "নেতা" "নেতা" "নেতা" রব উঠিয়াছিল। তখন এই নেতৃহীন দেশে অকস্মাৎ নেতা এতই অদ্ভুত সুলভ হইয়াছিল যে, আমাদের মত সাহিত্য-রসবিহ্বল অকর্ম্মণ্য লোকেরও নেতা হইবার সাংঘাতিক ফাঁড়া নিতান্তই অল্পের উপর দিয়া কাটিয়াছে। শান্তিপ্রিয় ভদ্রলোকদের তখন এমনি বিপদের দিন গেছে যে, "আমি নেতা নই" বলিয়া গলায় চাদর দিলেও সেই তাহার গলার চাদরটা ধরিয়াই তাহাকে নেতার কাঠ-গড়ায় টানিয়া আনিবার নির্দ্দয় চেষ্টা করা হইয়াছে।

হঠাৎ সমস্ত দেশের এইরূপ উৎকট 'নেতা'বায়ুগ্রস্ত হইবার কারণ এই যে, কাজের হাওয়া দিবামাত্রই স্বভাবের নিয়মে সবপ্রথমে নেতাকে ডাক পড়িবেই। সেই ডাকে প্রথম ধাক্কায় বাজারে ছোট-বড় ঝুঁটা-খাঁটি বহুবিধ

নেতার আমদানি হয় এবং লোকে প্রাণের গরজে বিচার করিবার সময় পায় না,—নেতা লইয়া টানাটানি-কাড়াকাড়ি করিতে থাকে। ইহাতে করিয়া অনেক মিথ্যার,—অনেক কৃত্রিমতার সৃষ্টি হয়, কিন্তু ইহার মধ্যে আসল সত্যটুকু এই যে, আমাদের নিতান্তই নেতা চাই—নহিলে আমাদের আশা-উদ্যম-আকাঙ্ক্ষা সমস্ত ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে।

যাহা হউক্, একদিন যখন নেতাকে ডাকি নাই, কেবল বক্তৃতাসভার সভাপতিকে খুঁজিয়াছিলাম, সেদিন গেছে; তার পরে একদিন যখন "নেতা নেতা" করিয়া উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিলাম, সেদিনও আজ নাই; অতএব আজ অপেক্ষাকৃত স্থিরচিত্তে আমাদের একজন দেশনায়ক বরণ করিয়া লইবার প্রস্তাব পুনর্ব্বার সর্ব্বসমক্ষে উত্থাপন করিবার সময় হইয়াছে বলিয়া অনুভব করিতেছি। এ সম্বন্ধে আজ কেবল যে আমাদের বোধশক্তি পরিষ্কার হইয়াছে, তাহা নহে, আমাদের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছে এবং দেশের হৃদয় নানা আন্দোলনের ও নানা পরিভ্রমণের পরেও অবশেষে যাঁহাকে নেতা বলিয়া স্বীকার করিতে চাহে, তাঁহার পরিচয় অদ্য যেন পরিস্ফুটতর হইয়া উঠিয়াছে।

আমি জানি, এই সভাস্থলে, দেশনায়ক বলিয়া আমি যাঁহার নাম লইতে উদ্যত হইয়াছি, তাঁহার নাম আজ কেবল বাংলাদেশে নহে, ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। আমি জানি, আজ বঙ্গলক্ষ্মী যদি স্বয়ম্বরা হইতেন, তবে তাঁহারই কণ্ঠে বরমাল্য পড়িত। ব্রাহ্মণের ধৈর্য্য ও ক্ষত্রিয়ের তেজ যাঁহাতে একত্রে মিলিত, যিনি সরস্বতীর নিকট হইতে বাণী পাইয়াছেন এবং যাঁহার অক্লান্ত কর্ম্মপটুতা স্বয়ং বিশ্বলক্ষ্মীর দান—আজ বাংলাদেশের দুর্য্যোগের দিনে যাঁহারা নেতা বলিয়া খ্যাত, সকলের উপরে যাঁহার মস্তক অভ্রভেদী গিরিশিখরের মত বজ্রগর্ভ মেঘপুঞ্জের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছে, সেই সুরেন্দ্রনাথকে সকলে মিলিয়া প্রকাশ্যভাবে দেশনায়করূপে বরণ করিয়া লইবার জন্য আমি সমস্ত বঙ্গবাসীকে আজ আহ্বান করিতেছি।

সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার নবযৌবনের জ্যোতিঃপ্রদীপ্ত প্রভাতে দেশহিতের জাহাজে হাল ধরিয়া যেদিন যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিলেন, সেদিন ইংরেজিশিক্ষাগ্রস্ত যুবকগণ একটিমাত্র বন্দরকেই আপনাদের গম্যস্থান বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন—সেই বন্দরের নাম রাজপ্রসাদ। সেখানে আছে সবই—লোকে যাহা-কিছু কামনা করিতে পারে, অন্নবস্ত্র-পদমান সমস্তই রাজভাণ্ডারে বোঝাই করা রহিয়াছে। আমরা ফর্দ্দ ধরিয়া-ধরিয়া উচ্চস্বরে চাহিতে আরম্ভ করিলাম—ডাঙা হইতে উত্তর আসিল, "এস না, তোমরা নামিয়া আসিয়া লইয়া যাও।" কিন্তু আমাদের নামিবার ঘাট নাই; আর-আর সমস্ত বড়-বড় জাহাজে পথ আটক করিয়া নোঙর ফেলিয়া বসিয়া আছে, তাহারা এক-ইঞ্চি নড়িতে চায় না। এদিকে ফর্দ্দ আওড়াইতে আওড়াইতে আমাদের গলা ভাঙিয়া গেল—দিন অবসান হইয়া আসিল। কখনো বা রাগ করিয়া যাহা মুখে আসে তাহাই বলি, কখনো বা চোখের জলে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসে। কেহ নিষেধও করে না, কেহ পথও ছাড়ে না; বাধাও নাই, সুবিধাও নাই। আর-আর সকলে দিব্য কেনাবেচা

করিয়া যাইতেছে, নিশান উড়িতেছে, আলো জ্বলিতেছে, ব্যাণ্ড্‌ বাজিতেছে। আমরা সন্ধ্যাকাশের অবিচলিত নক্ষত্ররাজি ও রাজ-বাতায়নের অনিমেষ দীপমালার প্রতি লক্ষ্য করিয়া সকলের পশ্চাৎ হইতে আমাদের "দরিদ্রাণাং মনোরথাঃ" অক্ষুণ্ণ অধ্যবসায়ের সহিত অবিশ্রাম নিবেদন করিয়া চলিলাম।

এইভাবে কত দিন, কত বৎসর কাটিত, তাহা বলিতে পারি না। এমন-সময় এই নিঃসহ নিশ্চলতার মধ্যে বিধাতার কৃপায় পশ্চিম-আকাশ হইতে হঠাৎ একটা বড়-রকম ঝড় উঠিল। আমাদের দেশহিতের জাহাজটাকে পূবের মুখে হুহু করিয়া ছুটাইয়া চলিল—অবশেষে যেখানে আসিয়া তীর পাইয়া বাঁচিয়া গেলাম, চাহিয়া দেখিলাম, সে যে আমাদের ঘরের ঘাট। সেখানে নিশান উড়ে না, ব্যাণ্ড্‌ বাজে না, কিন্তু পুরলক্ষ্মীরা যে হুলুধ্বনি দিতেছেন, দেবালয়ে যে মঙ্গলশঙ্খ বাজিয়া উঠিল। এতদিন অভুক্ত থাকিয়া পরের পাকশালা হইতে কেবল বড়-বড় ভোজের গন্ধটা পাইতেছিলাম, আজ যে দেখিতে দেখিতে সম্মুখে পাত পাড়িয়া দিল। আমরা জানিতাম না, এ যজ্ঞে আমাদের মাতা আমাদের জন্য এতদিন সজলচক্ষে অপেক্ষা করিয়া ছিলেন। তিনিই আজ দীর্ঘ বিচ্ছেদের পরে সুরেন্দ্রনাথের শিরশ্চুম্বন করিয়া তাঁহাকে আপন কোলের দিকে টানিয়াছেন। আমরা আজ সুরেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করি, তিনি সেই পশ্চিমবন্দরের শাদা-পাথরে বাঁধানো সোনার দীপে এমন সুস্নিগ্ধ সার্থকতা একদিনের জন্যও লাভ করিয়াছেন?—এমন আশাপরিপূর্ণ অমৃতবাণী স্বপ্নেও শুনিয়াছেন?

বিধাতার কৃপাঝড়ে সুরেন্দ্রনাথের সেই জাহাজকে যে ঘাটে আনিয়া ফেলিয়াছে, ইহার নাম আত্মশক্তি। এইখানে যদি আমরা কেনাবেচা করিতে পারিলাম, ত পারিলাম—নতুবা অতলস্পর্শ লবণাম্বুগর্ভে ডুবিয়া মরাই আমাদের পক্ষে শ্রেয় হইবে। কাপ্তেন্‌, এখানকার প্রত্যেক ঘাটে ঘাটে আমাদের বিস্তর লেনাদেনা করিবার আছে—শিক্ষাদীক্ষা, সুখস্বাস্থ্য, অন্নবস্ত্র, সমস্ত আমাদিগকে বোঝাই করিয়া লইতে হইবে—এবারে আর সেই রাজ-অট্টালিকার শূন্যগর্ভ গুম্বজটার দিকে একদৃষ্টিতে দূরবীণ কষিয়া নোঙর ফেলিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। আমরা আজ যে-যাহার ছোটখাট মূলধন হাতে করিয়া ছুটিয়া আসিয়াছি—এবারে আর বাঁধাবন্দরে পুনঃপুন বন্দনাগীত গাওয়া নয়,—এবার পাহাড় বাঁচাইয়া, ঝড় কাটাইয়া আমাদিগকে পার করিতে হইবে কাপ্তেন্‌!—তোমার উপরে অনেকের ভরসা আছে—হাল ধরিয়া তোমার হাত শক্ত, ঢেউ খাইয়া তোমার হাড় পাকিয়াছে। এতদিন যে নামের দোহাই পাড়িতে পাড়িতে দিন কাটিয়া গেল, সে নাম ছাড়িয়া আজ যথার্থ কাজের পথে পাড়ি দিবার বেলায় ঈশ্বরের নাম কর, আমরাও এককণ্ঠে তাঁহার জয়োচ্চারণ করিয়া সকলে তোমার চতুর্দ্দিকে সম্মিলিত হই।

আজ অনুনয়সহকারে আমার দেশবাসিগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছি, আপনারা ক্রোধের দ্বারা আত্মবিস্মৃত হইবেন না—কেবল বিরোধ করিয়া ক্ষোভ মিটাইবার চেষ্টা করিবেন না। ভিক্ষা করিতে গেলেও যেমন পরের মুখাপেক্ষা করিতে হয়, বিরোধ করিতে গেলেও সেইরূপ পরের দিকে সমস্ত

মন বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। জয়ের পন্থা ইহা নহে। এ সমস্ত সবলে উপেক্ষা করিয়া মঙ্গলসাধনের মহৎ গৌরব লইয়া আমরা জয়ী হইব।

আপনারা ভাবিয়া দেখুন, বাংলার পার্টিশন্‌টা আজ খুব একটা বড় ব্যাপার নহে। আমরা তাহাকে ছোট করিয়া ফেলিয়াছি। কেমন করিয়া ছোট করিয়াছি? এই পার্টিশনের আঘাত উপলক্ষ্যে আমরা সমস্ত বাঙালী মিলিয়া পরম বেদনার সহিত স্বদেশের দিকে যেম্‌নি ফিরিয়া চাহিলাম, অম্‌নি এই পার্টিশনের কৃত্রিম রেখা ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্র হইয়া গেল। আমরা যে আজ সমস্ত মোহ কাটাইয়া স্বহস্তে স্বদেশের সেবা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়াছি, ইহার কাছে পার্টিশনের আঁচড়টা কতই তুচ্ছ হইয়া গেছে! কিন্তু আমরা যদি কেবল পিটিশন্ ও প্রোটেষ্ট্, বয়কট্ ও বাচালতা লইয়াই থাকিতাম, তবে এই পার্টিশন্‌ই বৃহৎ হইয়া উঠিত,—আমরা ক্ষুদ্র হইতাম,—পরাভূত হইতাম। কার্লাইলের শিক্ষাসর্কুলর্ আজ কোথায় মিলাইয়া গেছে! আমরা তাহাকে নগণ্য করিয়া দিয়াছি। গালাগালি করিয়া নয়, হাতাহাতি করিয়াও নয়। গালাগালি-হাতাহাতি করিতে থাকিলে ত তাহাকে বড় করাই হইত। আজ আমরা নিজেদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে উদ্যত হইয়াছি—ইহাতে আমাদের অপমানের দাহ, আমাদের আঘাতের ক্ষতযন্ত্রণা একেবারে জুড়াইয়া গেছে। আমরা সকল ক্ষতি, সকল লাঞ্ছনার উপরে উঠিয়া গেছি। কিন্তু ঐ লইয়া যদি আজ পর্য্যন্ত কেবলি বিরাট্ সভার বিরাট্ ব্যর্থতায় দেশের এক প্রান্ত হইতে আর-এক প্রান্ত পর্য্যন্ত ছুটিয়া বেড়াইতাম, আমাদের সানুনাসিক নালিশকে সমুদ্রের এপার হইতে সমুদ্রের ওপার পর্য্যন্ত তরঙ্গিত করিয়া তুলিতাম, তবে ছোটকে ক্রমাগতই বড় করিয়া তুলিয়া নিজেরা তাহার কাছে নিতান্ত ছোট হইয়া যাইতাম। সম্প্রতি বরিশালের রাস্তায় আমাদের গোটাকতক মাথাও ভাঙিয়াছে এবং আমাদিগকে কিঞ্চিৎ দণ্ডও দিতে হইয়াছে। কিন্তু এই ব্যাপারটার উপরে বুক দিয়া পড়িয়া বেত্রাহত বালকের ন্যায় আর্ত্তনাদ করিতে থাকিলে আমাদের গৌরব নষ্ট হইবে। ইহার অনেক উপরে না উঠিতে পারিলে অশ্রুসেচনে কেবল লজ্জাই বাড়িয়া উঠিতে থাকিবে। উপরে উঠিবার একটা উপায়—আমাদের সুরেন্দ্রনাথকে রাজ-অট্টালিকার তোরণদ্বার হইতে ফিরাইয়া-আনিয়া তাঁহাকে আমাদের কুটীরপ্রাঙ্গণের পুণ্যবেদিকায় স্বদেশের ব্রতপতিরূপে অভিষিক্ত করা। ক্ষুদ্রের সঙ্গে হাতাহাতি করিয়া দিনযাপনকেই জয়লাভের উপায় বলে না—তাহার চেয়ে উপরে ওঠাই জয়। আমরা আজ আমাদের স্বদেশের কোনো মনস্বীর কর্ত্তৃত্ব যদি আনন্দের সহিত, গৌরবের সহিত স্বীকার করিতে পারি, তবে এমার্সন্ কবে আমাদের কার সহিত কি ব্যবহার করিয়াছে, কেম্পের আচরণ বেআইনি হইয়াছে কি না, তাহা তুচ্ছ হইতে তুচ্ছতর হইয়া সাময়িক ইতিহাসের ফলক হইতে একেবারে মুছিয়া যাইবে। বস্তুত এই ঘটনাকে অকিঞ্চিৎকর করিয়া না ফেলিলে আমাদের অপমান দূর হইবে না।

স্বদেশের হিতসাধনের অধিকার কেহ আমাদের নিকট হইতে কাড়িয়া লয় নাই—

তাহা ঈশ্বরদত্ত—স্বায়ত্তশাসন চিরদিনই আমাদের স্বায়ত্ত। ইংরেজ রাজা সৈন্য লইয়া পাহারা দিন, কৃষ্ণ বা রক্ত গাউন্ পরিয়া বিচার করুন, কখনো বা অনুকূল কখনো বা প্রতিকূল হউন, কিন্তু নিজের দেশের কল্যাণ নিজে করিবার যে স্বাভাবিক কর্ত্তৃত্ব-অধিকার, তাহা বিলুপ্ত করিবার শক্তি কাহারো নাই। সে অধিকার নষ্ট আমরা নিজেরাই করি। সে অধিকার গ্রহণ যদি না করি, তবেই তাহা হারাই। নিজের সেই স্বাভাবিক অধিকার হারাইয়া যদি কর্ত্তব্যশৈথিল্যের জন্য অপরের প্রতি দোষারোপ করি, তবে তাহা লজ্জার উপরে লজ্জা! মঙ্গল করিবার স্বাভাবিক সম্বন্ধ যাহাদের নাই, যাহারা দয়া করিতে পারে মাত্র, তাহাদের নিকটই সমস্ত মঙ্গল—সমস্ত স্বার্থসঙ্কোচ প্রত্যাশা করিব, আর নিজেরা ত্যাগ করিব না,—কাজ করিব না, এরূপ দীনতার ধিক্কার অনুভব করা কি এতই কঠিন!

তাই আমি বলিতেছি, স্বদেশের মঙ্গলসাধনের কর্ত্তৃত্বসিংহাসন আমাদের সম্মুখে শূন্য পড়িয়া আমাদিগকে প্রতিমুহূর্ত্তে লজ্জা দিতেছে। হে স্বদেশসেবকগণ, এই পবিত্র সিংহাসনকে ব্যর্থ করিয়ো না, ইহাকে পূর্ণ কর। রাজার শাসন অস্বীকার করিবার কোনো প্রয়োজন নাই—তাহা কখনো শুভ কখনো অশুভ, কখনো সুখের কখনো অসুখের আকারে আমাদের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া যাইবে, কিন্তু আমাদের নিজের প্রতি নিজের যে শাসন, তাহাই গভীর, তাহাই সত্য, তাহাই চিরস্থায়ী। সেই শাসনেই জাতি যথার্থ ভাঙে-গড়ে, বাহিরের শাসনে নহে। সেই শাসন অদ্য আমরা শান্তসমাহিত পবিত্রচিত্তে গ্রহণ করিব।

যদি তাহা গ্রহণ করি, তবে প্রত্যেকে স্বস্ব-প্রধান হইয়া অসংযত হইয়া উঠিলে চলিবে না। একজনকে মানিয়া আমরা যথার্থভাবে আপনাকে মানিব। একজনের মধ্যে আমাদের সকলকে স্বীকার করিব। একজনের দক্ষিণ-হস্তকে আমাদের সকলের শক্তিতে বলিষ্ঠ করিয়া প্রত্যেকের হস্ত করিয়া তুলিব। আমাদের সকলের চিন্তা তাঁহার মন্ত্রণাগারে মিলিত হইবে এবং তাঁহার আদেশ আমাদের সকলের আদেশরূপে বাংলাদেশের ঘরে ঘরে ধ্বনিত হইয়া উঠিবে।

আপনাদের যদি অভিমত হয়, তবে আর কালবিলম্বমাত্র না করিয়া বঙ্গদেশের এই মঙ্গল-মহাসনে সুরেন্দ্রনাথের অভিষেক করি। জানি, এরূপ কোনো প্রস্তাব কখনই সর্ব্ববাদিসম্মত হইতেই পারে না, কিন্তু তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিলে চিরদিন কেবল অপেক্ষা করিয়াই থাকা হইবে, তাহার বেশি আর কিছুই হইবে না। যাঁহারা প্রস্তুত আছেন, যাঁহারা সম্মত আছেন, তাঁহারা এই কাজ আরম্ভ করিয়া দিন। তাঁহারা সুরেন্দ্রনাথকে সমস্ত ক্ষুদ্রবন্ধন হইতে মুক্ত করুন, তাঁহাকে দেশনায়কের উপযুক্ত গৌরবরক্ষার সামর্থ্য দিন, সকলের যোগ্যতা মিলিত করিয়া তাঁহাকে এই পদের যোগ্য করিয়া তুলুন।

যাঁহারা পিটিশন্ বা প্রোটেষ্ট্, প্রণয় বা কলহ করিবার জন্য রাজবাড়ীর বাঁধা-রাস্তাটাতেই ঘনঘন দৌড়াদৌড়ি করাকেই দেশের প্রধান কাজ বলিয়া গণ্য করেন, আমি সে দলের লোক নই, সে কথা পুনশ্চ বলা

বাহুল্য। সুরেন্দ্রনাথও তাঁহার জীবনের দীর্ঘকাল রাজপথের শুষ্কবালুকায় অশ্রু ও ঘর্ম্ম সেচন করিয়া তাহাকে উর্ব্বরা করিবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন, তাহাও জানি। ইহাও দেখিয়াছি, মৎস্যবিরল জলে যাহারা ছিপ ফেলিয়া প্রত্যহ বসিয়া থাকে, অবশেষে তাহাদের, মাছ পাওয়া নয়, ঐ আশা করিয়া থাকাই, একটা নেশা হইয়া যায়, ইহাকে নিঃস্বার্থ নিষ্ফলতার নেশা বলা যাইতে পারে, মানবস্বভাবে ইহারও একটা স্থান আছে। কিন্তু এজন্য সুরেন্দ্রনাথকে আমি দোষ দিতে পারি না, ইহা আমাদের ভাগ্যেরই দোষ। সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার দেশের প্রতিনিধি; দেশের অভিপ্রায় অনুসারেই তিনি দেশকে চালনা করিয়াছেন। দেশের যদি মোহ ভাঙিত, দেশের আকাঙ্ক্ষা যদি মরীচিকার দিকে না ছুটিয়া জলাশয়ের দিকেই ছুটিত, তবে তিনিও নিশ্চয় তাহাকে সেই দিকে বহন করিয়া লইয়া যাইতেন, তাহার বিরুদ্ধপথে চলিতে পারিতেন না।

তবে নায়ক হইবার সার্থকতা কি, এ প্রশ্ন উঠিতে পারে। নায়কের কর্ত্তব্য চালনা করা,—ভ্রমের পথেই হউক্, আর ভ্রমসংশোধনের পথেই হউক্। অভ্রান্ত তত্ত্বদর্শীর জন্য দেশকে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতে বলা কোনো কাজের কথা নহে। দেশকে চলিতে হইবে; কারণ, চলা স্বাস্থ্যকর,—বলকর। এতদিন আমরা যে পোলিটিকাল্ অ্যাজিটেশনের পথে চলিয়াছি, তাহাতে অন্য ফললাভ যতই সামান্য হউক, নিশ্চয়ই বললাভ করিয়াছি—নিশ্চয়ই ইহাতে আমাদের চিত্ত সজাগ হইয়াছে, আমাদের জড়ত্বমোচন হইয়াছে। কখনই উপদেশের দ্বারা ভ্রমের মূল উৎপাটিত হয় না, তাহা বারংবার অঙ্কুরিত হইয়া উঠিতে থাকে। ভোগের দ্বারাই কর্ম্মক্ষয় হয়, তেম্নি ভ্রম করিতে দিলেই যথার্থভাবে ভ্রমের সংশোধন হইতে পারে, নহিলে তাহার জড় মরিতে পারে না। ভুল্ করাকে আমি ভয় করি না, ভুলের আশঙ্কায় নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকাকেই আমি ভয় করি। দেশের বিধাতা দেশকে বারংবার অপথে ফেলিয়াই তাহাকে পথ চিনাইয়া দেন—গুরুমহাশয় পাঠশালায় বসিয়া তাহাকে পথ চিনাইতে পারেন না। রাজপথে ছুটাছুটি করিয়া যতটা ফল পাওয়া যায়, সেই সময়টা নিজের মাঠ চষিয়া অনেক বেশি লাভের সম্ভাবনা, এই কথাটা সম্পূর্ণ বুঝিবার জন্য বহুদিনের বিফলতা গুরুর মত কাজ করে। সেই গুরুর শিক্ষা যখন হৃদয়ঙ্গম হইবে, তখন যাহারা পথে ছুটিয়াছিল, তাহারাই মাঠে চলিবে—আর যাহারা ঘরে পড়িয়া থাকে, তাহারা বাটেরও নয় মাঠেরও নয়, তাহারা অবিচলিত প্রাজ্ঞতার ভড়ং করিলেও, সকল আশার,—সকল সদ্গতির বাহিরে।

অতএব দেশকে চলিতে হইবে। চলিলেই তাহার সকল শক্তি আপনি জাগিবে, আপনি খেলিবে। কিন্তু রীতিমত চলিতে গেলে চালক চাই। পথের সমস্ত বিঘ্ন অতিক্রম করিবার জন্য বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিদিগকে দল বাঁধিতে হইবে, স্বতন্ত্র পাথেয়গুলিকে একত্র করিতে হইবে, একজনের বাধ্যতা স্বীকার করিয়া দৃঢ় নিয়মের অধীনে নিজেদের মতবিভিন্নতাকে যথাসম্ভব সংযত করিতে হইবে,—নতুবা আমাদের সার্থকতা-অন্বেষণের এই মহাযাত্রা দীর্ঘকাল কেবল ছুটাছুটি-দৌড়াদৌড়ি, ডাকাডাকিহাঁকাহাঁকিতেই নষ্ট হইতে থাকিবে।

যাঁহারা সাধক, যাঁহারা দেশের গুরু, তাঁহারা খ্যাতিপ্রতিপত্তির অপেক্ষা না রাখিয়া, বিরোধ-অবমাননার আশঙ্কা স্বীকার করিয়াও দেশের মতি ফিরাইতে চেষ্টা করিবেন—আর যাঁহারা দেশের নায়ক, তাঁহারা দেশকে গতিদান করিবেন। যে সকল জাতি স্থির হইয়া বসিয়া নাই, যাহারা চলিতেছে, তাহারা এই-ভাবেই চলিতেছে। এক দল উপর হইতে তাহাদের শুভবুদ্ধিকে নিয়মিত করিতেছে, আর-এক দল বক্ষের মধ্যে থাকিয়া তাহাদের প্রাণ-শক্তি-গতিশক্তিকে প্রবর্ত্তিত করিতেছে। এই উভয় দলের পরস্পরে অনেক সময়েই এক মত হয় না, কিন্তু তাই বলিয়া যাহারা চালাইতেছে, তাহাদের বসিয়া থাকিলে চলে না। কারণ, শিক্ষা শুধু উপদেশে নহে, চলার মধ্যেই শিক্ষা আছে।

অতএব এতদিন যে সুরেন্দ্রনাথ বিনা নিয়োগে নিজের ক্ষমতাবলেই দেশকে সাধারণ-হিতের পথে চালনা করিয়া আসিয়াছেন, আজ তাঁহাকে নিয়োগপত্র দিয়া নায়কপদে অভি-ষিক্ত করিবার প্রস্তাব আমি উত্থাপন করিতেছি। নিয়োগপত্র দিলে তাঁহার ক্ষমতা সুনিশ্চিত এবং তাঁহার দায়িত্ব গভীরতর হইবে এবং তিনি কেবলমাত্র শিক্ষিতসম্প্রদায়ের ইংরেজি-বিদ্যার অভ্যস্ত বুলির প্রতি কর্ণপাত না করিয়া আমাদের এই পুরাতন দেশের চিরন্তন প্রকৃতির প্রতি মনোযোগ করিবেন—যে সকল পদার্থ পরদেশের সজীব কলেবরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, যথাস্থান হইতে ভ্রষ্ট হইলে এদেশে যাহা অসঙ্গত-আবর্জ্জনা-রূপে গণ্য হইবে, অনুকরণের মোহে তাহাকে তিনি আদর করিবেন না,—বিরোধমূলক যে সংগ্রামশীলতা য়ুরোপীয় সভ্যতার স্বভাবগত, যাহা কখনই এদেশের মৃত্তিকায় মূলবিস্তার করিয়া ফলবান্ হইবে না, তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যে মঙ্গলময় মিলনপরতা, যে অবিচলিত ধর্ম্মনিষ্ঠা ভারতবর্ষের চিরকালীন সাধনা, তাহাকেই বর্ত্তমানকালের অবস্থান্তরের সহিত তিনি সঙ্গত করিয়া লইবার চেষ্টা করিবেন। কিন্তু তিনি কি করিবেন না করিবেন, এস্থলে তাহা অনুমান ও আলোচনা করা বৃথা—কেবল ইহাই সত্য যে, তাঁহার করার মধ্যে আমাদেরই কর্ম্ম প্রকাশ পাইবে, দেশ তাঁহারই মধ্য দিয়া নিজেকে ব্যক্ত করিবে, তাঁহারই এক হস্ত দ্বারা নিজের প্রাপ্য গ্রহণ করিবে ও তাঁহারই অন্য হস্ত দ্বারা নিজের দান বিতরণ করিবে—ধর্ম্মবিরুদ্ধ না হইলে, সত্যকে লঙ্ঘন না করিলে ইঁহার বিরুদ্ধে আমরা বিদ্রোহ করিব না এবং এই নিয়ম ও নিয়ন্তাকে স্বেচ্ছাকৃত সুতরাং অলঙ্ঘ্য বাধ্যতা-সহকারে মান্য করাই আমাদের প্রত্যেকের পক্ষে আত্মসম্মান বলিয়া গণ্য হইবে। এইরূপে সমস্ত বলক্ষয়কর দ্বিধা ও সমস্ত আত্মাভি-মানের কুশকণ্টক সবলে উৎপাটিত করিয়া যদি একের মধ্যে আমরা আমাদিগকে নিবিড়-ভাবে একত্র করিতে পারি, তবে আর আমা-দিগকে নিজের শক্তির অহঙ্কার করিবার জন্য সর্ব্বদা আস্ফালন করিতে হইবে না, পরের বিমুখতাকে ফিরাইবার জন্য প্রাণপণে অত্যুক্তির সৃষ্টি করিতে হইবে না—তবেই আমরা শান্তভাবে, বলিষ্ঠ ও ধীরভাবে মহৎ হইতে পারিব এবং নিজের দেশের মধ্যে নিজের যথার্থ স্থানটি অধিকার করিয়া কর্ম্মগৌরবের মধ্যে সার্থকতা প্রাপ্ত হইয়া পোলিটিকাল্ ধনুষ্টঙ্কারের অত্যুগ্র আক্ষেপ হইতে রক্ষা

পাইব—আমরা সুস্থ হইব, স্বাভাবিক হইব, সংযত-আত্মসংবৃত হইব এবং নিজের চাপল্য-বিহীন মর্য্যাদার মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠ হইয়া পরের উপেক্ষাকে অকাতরে উপেক্ষা করিতে পারিব।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জিজ্ঞাসা

চৈত্রের বঙ্গদর্শনে যে প্রবন্ধগুলি বাহির হইয়াছে, তাহার মধ্যে একটির নাম 'স্বদেশী বা পেট্রিয়টিজ্‌ম্'। এ প্রবন্ধে (১) অঙ্ক দেওয়া আছে; ইহাতে বোধ হইতেছে যে, এই বিষয়ের আরও প্রবন্ধ বাহির হইবে। প্রবন্ধটি পড়িয়া আমার যে জিজ্ঞাসার উদয় হইয়াছে, তাহা এখন বলাই ভাল।

বুঝিবার মতন যে সব কথা এ প্রবন্ধে আছে, তাহা আমার বিবেচনা অনুসারে প্রথমেই উদ্ধৃত করিতেছি। "যে ভাব ও আদর্শকে আমরা এখন স্বদেশী নামে নির্দ্দেশ করিতেছি—ইংরেজিতে ইহাকে 'পেট্রিয়টিজ্‌ম্' বলে। এ বস্তু পূর্ব্বে আমাদের দেশে ছিল না; আমাদের ভাষায় ইহার নাম নাই। আমাদের সমাজ আছে, সমাজ ছিল। কিন্তু নেশন্ পূর্ব্বে কখনো ছিল না। এইজন্য আমাদের ধর্ম্ম ছিল, কিন্তু পেট্রিয়টিজ্‌ম্ ছিল না।"

"ইংরেজের শক্তি ও প্রভাব আমাদিগকে আবিষ্ট ও অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে। মুসলমান কর লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিত, তাহার শিক্ষা-সাধনার দ্বারা আমাদিগের চিত্তকে একেবারে অভিভূত করিবার চেষ্টাও করে নাই; ইংরেজ এই দেড়শতবৎসর কাল ক্রমাগতই সেই চেষ্টা করিতেছে। মুসলমান আমাদের রাজা ছিল, গুরু হইবার এমন আকাঙ্ক্ষা রাখে নাই। ইংরেজ রাজা ত আছেই, তাহার উপরে গুরু হইবার জন্যও লালায়িত। মুসলমানরাজত্বে, মুসলমানের প্রভাবে, হিন্দুর সমাজ-মধ্যে যে বিপ্লব হয় নাই, ইংরেজের রাজত্বে, ইংরেজের প্রভাবে, তাহা হইয়াছে ও হইতেছে। কেবল ইংরেজের শিক্ষায় যে এ সকল বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে, তাহা নহে। ইংরেজের শিক্ষা যাহারা পায় নাই, তাহারাও ইংরেজের প্রভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া উঠিতেছে। ইংরেজের আইন-আদালত আমাদের প্রাচীন বর্ণাশ্রমের উপরে এমন আঘাত করিয়াছে যে, তাহা আর রক্ষা করা আদৌ সম্ভবপর নহে। ইংরেজের ব্যবসা-বাণিজ্য, ইংরেজের আমদানী-রপ্তানী, ইংরেজের শাসন-সংরক্ষণ, সকলই আমাদের চিন্তাকে, আমাদের ভাবকে, আমাদের আদর্শকে, আমাদের সামাজিক গঠনকে প্রতিদিন বিপর্য্যস্ত করিয়া দিতেছে। এ অবস্থায় ইংরেজের কার্য্যাকার্য্যে, প্রতি উদাসীন হইয়া সামাজিক জীবনের স্বাতন্ত্র্য ও সুপ্রতিষ্ঠা রক্ষা করা তো দূরের কথা, জীবনরক্ষা করা যায় কি না, তাহাই সন্দেহের বিষয়।"

আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার উপরি-উদ্ধৃত

বর্ণনার পর জীবনরক্ষা করিবার উপায়-স্বরূপ প্রবন্ধলেখক নিম্নলিখিত পরামর্শ দিয়াছেন।

"ইংরেজ রাজা, আমরা প্রজা। রাজার সঙ্গে প্রজার যে সম্বন্ধ, তাহা লইয়াই রাজনীতি রচিত হয়। এই রাজনীতিকে বর্জ্জন করা আর আমাদের পক্ষে সম্ভবপরও নহে, কল্যাণ-করও নহে। এই রাজনীতির আলোচনা, এই রাজনীতির আন্দোলন, এই রাজনীতি-ক্ষেত্রে আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা আমাদিগকে করিতেই হইবে। রাজনীতক্ষেত্রেই পেট্রিয়-টিজ্‌মের উৎপত্তি।"

রোগীর অবস্থা, চিকিৎসার ব্যবস্থা শুনিলাম, কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। প্রবন্ধলেখক বলিতেছেন যে, আমাদের সমাজ ছিল, এইজন্য আমাদের ধর্ম্ম ছিল; আমাদের নেশন্ কখনও ছিল না, এইজন্য পেট্রিয়-টিজ্‌ম্‌ও ছিল না। ইহাতে বুঝিতেছি যে, সমাজ রাখিতে হইলে ধর্ম্ম রাখিতে হইবে, পেট্রিয়টিজ্‌ম্ বা স্বদেশী গ্রহণ করা হইবে না; আর, নেশন্ করিতে হইলে ধর্ম্ম ছাড়িতে হইবে, পেট্রিয়টিজ্‌ম্ বা স্বদেশী ধরিতে হইবে। প্রবন্ধলেখকের মত যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে বর্ণাশ্রমসমাজ আর রক্ষা করা আদৌ সম্ভবপর নহে। অতএব আমাদিগকে রাজ-নীতির আলোচনা, রাজনীতির আন্দোলন এবং রাজনীতিক্ষেত্রে আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতে হইবে। কিসের চেষ্টা করিতে হইবে? বর্ণাশ্রমসমাজ যদি আর রক্ষাই না পায়, তবে আবার চেষ্টা কিসের? শীঘ্র শীঘ্র মরিবার চেষ্টা নাকি?

সংবাদপত্রে দেখিতেছি যে,—

"In a Parliamentary Bill, submitted to the state assembly of Iowa Dr. R. H. Gregory proposes a legalised compulsory murder to end the misery of those in great physical pain whose disease or injuries must prove fatal eventually and to prevent the rearing of children hideously deformed or hopelessly idiotic."

অর্থাৎ মার্কিণমুলুকের আয়োবারাজ্যে ডাক্তার গ্রেগরী এইরূপ আইন করাইতে উদ্যত হইয়াছেন যে, যে সব লোকের বেয়ারাম কি জখম এমনই সাংঘাতিক যে, আর সারিবার আশা নাই, তাহাদের যন্ত্রণানিবারণের জন্যে তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিলে কোনই অপরাধ হইবে না।

বঙ্গদর্শনের প্রবন্ধলেখকের রাজনীতির আলোচনার, আর রাজনীতির আন্দোলনের প্রস্তাব কি ডাক্তার গ্রেগরীর প্রস্তাবের মতন? আমাদের বর্ণাশ্রমসমাজ এখনও আছে, সুতরাং ধর্ম্মও আছে, কিন্তু আর রক্ষা পাইবে না। এখন এ সমাজের থাকা কেবল অসহ্য যাতনাভোগ মাত্র। অতএব রাজনীতি-রূপ বিষ খাওয়াইয়া সমাজকে মারিয়া ফ্যালো। ইহাই কি প্রবন্ধলেখকের অভিপ্রায়? অতিস্নেহে, অত্যধিক মমতার বশে প্রবন্ধলেখক এইভাবে আর্ত্তনাদ করিয়াছেন কি না, ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। প্রবন্ধলেখক বর্ণাশ্রমসমাজের ধ্বংস-কামনা করেন, এমন ত কিছুতেই মনে হয় না; বরং বর্ণাশ্রমসমাজের উপর তাঁহার

অনুরাগেরই পরিচয় প্রবন্ধমধ্যে পাওয়া যায়। তাহা হইলে, ' রাজনীতির আলোচনার পরামর্শের অর্থ কি? সমাজদ্রোহী রাজনীতিখোরদের উপর ব্যঙ্গকটাক্ষ নহে ত?

প্রবন্ধলেখক লিখিয়াছেন যে, "গ্রীকের সমাজতত্ত্ব, গ্রীকের রাজনীতি, গ্রীকের ললিতকলা প্রভৃতি যেমন মানবীয় সাধনার অমূল্যরত্ন, সেইরূপ হিন্দুর তত্ত্ববিদ্যা ও ব্রহ্মজ্ঞানও জগতে আর এক অমূল্য বস্তু। এই উভয়বিধ সাধনারই লক্ষ্য এক,—সেই অদ্বৈত, অখণ্ড, সচ্চিদানন্দ পুরুষ। ব্যাবহারিক জগতে হিন্দু ভেদকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহারই উপরে ব্রহ্মসাধনের পূর্ব্ববৃত্ত আচার-অনুষ্ঠানাদি প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল। সাধনার নিম্নস্তরে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিয়া, ভেদকে হিন্দু স্বীকার করিয়াছে। মূলে সম্ভবত গুণকর্ম্মবিভাগের উপরেই এই বর্ণবিভাগ ও বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, ক্রমে তাহা কুলগত হইয়া পড়িয়াছে। সমাজশাসন, সমাজরক্ষা ও সামাজিক উন্নতিবিধানের জন্য য়ুরোপে পেট্রিয়টিজ্‌ম্ যে কার্য্য করিয়াছে, আমাদের মধ্যে সে কার্য্য এতাবৎকাল মোটামুটি বর্ণবিভাগ ও আশ্রমধর্ম্মের দ্বারাই সাধিত হইয়া আসিতেছে। মুসলমান আসিয়া যখন ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইল, তখনও এই বর্ণাশ্রমনিবন্ধনই নূতন রাজশক্তি ও রাজনীতি বিধর্ম্মী ও স্বেচ্ছাচারী হইয়াও হিন্দুর চিরাগত ভাব ও আদর্শকে অভিভূত করিতে পারে নাই।"

প্রবন্ধলেখকের অভিপ্রায় বুঝা যাইতেছে যে; "সমাজ নিঃশব্দে আপনার নিয়মে আপনাকে নিয়ন্ত্রিত করিলে, আপনার আদর্শ আপনি অনুসরণ করিয়া চলিলে, শাসনের তরঙ্গ সমাজপ্রাচীরকে কখনো উল্লঙ্ঘন করিতে পারে না।" প্রবন্ধলেখকের অভিপ্রায় বুঝিতেছি যে, 'অদ্বৈত, অখণ্ড, সচ্চিদানন্দ পুরুষই মানুষের "সাধনার লক্ষ্য"'। আর্য্যসাধনা দুইপ্রকার,——দুইই অমূল্য রত্ন'। ইহার এক সাধনা—ধর্ম্মমূলক সমাজবন্ধন অর্থাৎ বর্ণাচার সমাজবন্ধন; অপর সাধনা—পেট্রিয়টিজ্‌ম্‌মূলক নেশন্‌বন্ধন। "গ্রীক্ ও হিন্দু উভয়েই একই বিশাল আর্য্যবংশের বিভিন্ন শাখা। গ্রীকেরা পেট্রিয়টিজ্‌মের আদিগুরু ছিলেন। গ্রীসে জড়বিজ্ঞান প্রাচীনকালেই বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। হিন্দু জড়কে অগ্রাহ্য ও উপেক্ষা করিয়া, জড়বিজ্ঞানের যাহা-কিছু অবশ্যম্ভাবী বিকাশ এদেশে হইয়াছিল, তাহাও রক্ষা করিতে পারে নাই।" কিন্তু "হিন্দু অন্যদিকে শুদ্ধ, অখণ্ড, নির্ব্বিশেষ, নিরাকার, নির্গুণ চৈতন্যবস্তুকে লাভ করিবার জন্য লালায়িত হইয়া, জগতের সকল সম্বন্ধ, সকল বিশেষত্ব, সকল বিচিত্রতাকে ঔপাধিক, মায়িক ও পারমার্থিক দৃষ্টিতে অলীক বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছে এবং সেই মায়াতীত শুদ্ধসত্তাকে প্রত্যক্ষ করিবার আশায় কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগাদির প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।"

বুঝিতেছি যে, নেশনের লক্ষ্য যাহা হইবে হউক, নেশন্ কখনও জড়পদার্থকে ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই; জড়পদার্থকে ছাড়াইয়া উঠিবার চেষ্টাও করে নাই। এখনও "আমাদের সমাজ আছে", এবং এই সমাজ "মায়াতীত শুদ্ধসত্তাকে প্রত্যক্ষ করিবার আশায় কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ,ভক্তিযোগাদির প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।" রাজনীতিপ্রসূত পেট্রিয়টিজ্‌ম্ ' হইতেছে

নেশনের অঙ্গ, আর তত্ত্ববিদ্যাপ্রসূত ধর্ম্মই হইতেছে বর্ণাশ্রমসমাজের অঙ্গ। পেট্রিয়টিজ্‌মের সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়াও,—পেট্রিয়টিজ্‌মের গুরু হইয়াও গ্রীস্ এবং গ্রীক্‌জাতি কোন্‌কালে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে, কতকাল হইল বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, হিন্দু এবং হিন্দুসমাজ আজিও বর্ত্তমান রহিয়াছে। বর্ণাশ্রমসমাজ যে শুধু বর্ত্তমান আছে, তাহাই নহে; কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ আছে বলিয়া বর্ণাশ্রমী, ধর্ম্মের সাহায্যে "মায়াতীত শুদ্ধসত্ত্বাকে প্রত্যক্ষ করিবার আশা" আজিও করিতে পারে। তবু, ধর্ম্মকে ছাড়িয়া, পেট্রিয়টিজ্‌ম্ বা স্বদেশীকে ধরিয়া, বর্ণাশ্রমসমাজ নষ্ট করিয়া রাজনৈতিক নেশন্ গড়িতে প্রবন্ধলেখক পরামর্শ দিতেছেন, ইহা কেমন করিয়া মনে করিব?

সত্যসত্যই বঙ্গদর্শনের প্রবন্ধটি বুঝিতে পারিতেছি না। ইহাতে অতি তীব্র, মর্ম্মভেদী কিন্তু অতি প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ আছে বলিয়াই মনে হইতেছে। দ্বিতীয় প্রবন্ধের প্রতীক্ষায় ব্যগ্র হইয়া রহিব। এবার যেন সন্দেহের দোলায় আর দুলিতে না হয়।

দুইএকটি অবান্তর কথা আছে, এই যোগে শুধাইয়া রাখি।

"গ্রীক্ ও হিন্দু উভয়েই একই বিশাল আর্য্যবংশের বিভিন্ন শাখা।" "বর্ত্তমান হিন্দুজাতি যে আর্য্য-অনার্য্য বহুজাতির মিশ্রণে উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা এখন একরূপ সকলেই স্বীকার করেন।" "হিন্দু আর্য্য ভারতবর্ষে আপনার উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে,"—এ সব ম্লেচ্ছমত, বর্ণাশ্রমী কোনও পণ্ডিতের এমন মত আছে বলিয়া আমার জানা নাই। ফিরিঙ্গীমতের পরীক্ষাও আমি কখনও করি নাই। জানিতে ইচ্ছা করি যে, বঙ্গদর্শনের প্রবন্ধলেখক ঐ ম্লেচ্ছসিদ্ধান্তগুলিকে বিনা পরীক্ষায় সুসিদ্ধান্ত বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন?—না কি, যে যে প্রমাণের উপর ঐ সকল সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত, প্রবন্ধলেখক সেই সকল প্রমাণের পরীক্ষা নিজে করিয়াছেন এবং তাহার পরে ঐ সিদ্ধান্তে নিজেও উপনীত হইয়াছেন?

"গ্রীক্ ও হিন্দু উভয়েই একই বিশাল আর্য্যবংশের বিভিন্ন শাখা" হইলেও এমন হইতে পারে নাকি যে, ভারতভূমির বর্ণাশ্রমী অনাদিকাল হইতেই ভারতভূমেই আছেন, অন্যস্থান হইতে আসিয়া উপনিবেশস্থাপন করেন নাই; এবং এই বর্ণাশ্রমীদের ভিতর কতকগুলি লোক ধর্ম্মভ্রষ্ট হওয়াতে ভারতবর্ষ হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিল এবং গ্রীস্ প্রভৃতি নানাদেশে গিয়া বাস করিয়াছিল?

প্রবন্ধলেখক লিখিয়াছেন যে, "মূলে সম্ভবত গুণকর্ম্মবিভাগের উপরেই এই বর্ণবিভাগ ও বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, ক্রমে তাহা কুলগত হইয়া পড়িয়াছে।" এ কথার অর্থ কি? প্রবন্ধলেখক "সম্ভবত"শব্দের প্রয়োগ করিয়া একটা সামান্য কল্পনা করিয়াছেন মাত্র, নিশ্চয় করিয়া কিছু বলেন নাই; তথাপি এমন সম্ভাবনার কল্পনা তিনি কেন করেন, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। আগে গুণের বিকাশ,—কর্ম্মের পরিচয়, তাহার পর বর্ণের নিরূপণ এবং বর্ণাশ্রমধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা, এমন ত হইতেই পারে না। একটা উদাহরণ দেখুন;—ব্রাহ্মণের আশ্রমধর্ম্মের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যই প্রথম আশ্রম। আটবৎসর বয়সে ব্রহ্মচর্য্যের আরম্ভ হইতে পারে; তৎপূর্ব্ব হইতেই ব্রহ্মচারীর আশ্রমধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে, আবার তাহারও পূর্ব্বে, এমন কি, ব্রহ্ম-

চারী মাতৃগর্ভে আসিবার পূর্ব্বেও সেই ভাবী ব্রহ্মচারীর স্ববর্ণোচিত সংস্কারসকল করা হইতেছে। এদিকে ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচর্য্য সমাপন করিয়া প্রথমে স্নাতক, তাহার পরে গৃহস্থ হইল, তখনও আরও দুই আশ্রম বাকী। তবে গুণকর্ম্মবিভাগের উপরে বর্ণবিভাগ ও বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা কেমন করিয়া হইতে পারে? বর্ণবিভাগ ও বর্ণাশ্রমধর্ম্ম কোনকালে কুলগত ছিল না, ইহা মানিতে হইলে অবশ্যই মানিতে হয় যে, সেকালে মানুষটা না মরিলে তাহার বর্ণ এবং তাহার আশ্রমধর্ম্ম নিরূপিত হইত না।

প্রবন্ধলেখক বলেন, "বর্ণাশ্রম গার্হস্থ্যের অঙ্গীভূত।" ইহার এই অর্থ হয় যে, বর্ণাশ্রম প্রথমে গার্হস্থ্যের অঙ্গ ছিল না, পরে অঙ্গ হইয়াছে; কিন্তু বর্ণাশ্রম কোনকালেই গার্হস্থ্যের অঙ্গ ছিল না এবং অদ্যাপি গার্হস্থ্যের অঙ্গ নহে। বরং গার্হস্থ্যই বর্ণাশ্রমের অঙ্গ,' এমন বলা চলে। বর্ণাশ্রমই ব্যাপক, গার্হস্থ্য ব্যাপ্য। চারিটি আশ্রমের মধ্যে গার্হস্থ্য অন্যতম আশ্রমমাত্র।

প্রবন্ধলেখক অপরাধ গ্রহণ না করিলে আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করিয়াই বিরত হইব। "সন্ন্যাসধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবে সংসারধর্ম্ম মলিন হইয়া গেলে সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নতির পথ প্রায় অবরুদ্ধ হইয়া যায়।" ইহা যদি মানিয়াই লওয়া যায়, তাহা হইলেই বা ক্ষতি কি? পিষ্টক-পরমান্নে পেট ভরিয়া গেলে শাকান্ন খাইতে পারা যায় না, ইহাতে খেদের কিছু কারণ হয় কি?

শ্রীইন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা।

চা-পান।

আজকাল আমাদের দেশে, বিশেষত সহরে, যেরূপ চা-পানের বহুলপ্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়, কয়েকবৎসর পূর্ব্বে তাহার শতাংশের একাংশও ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এখন প্রায় প্রতি গৃহস্থবাড়ীতেই চা, সহরে রাস্তায় রাস্তায় চা'এর দোকান, বন্ধুবান্ধব বাড়ীতে আসিলে তামাকের পরিবর্ত্তে চা দিয়াই তাঁহাদের প্রথম অভ্যর্থনা হয়। ধনবান্ হইতে গরিব কেরাণী পর্য্যন্ত দিনান্তে একপেয়ালা চা পান করিয়া থাকেন। এরূপ স্থলে চা-পানের উপকার ও অপকার সম্বন্ধে দুচারি কথা আশা করি অসাময়িক হইবে না।

চা যে বিদেশীয় সামগ্রী, তাহা কেহ মনে করিবেন না। এই ভারতবর্ষই চা'র আদিম-স্থান। সত্য বটে, চীনদেশে চা'র প্রচলন প্রথম সুরু হইয়াছিল, কিন্তু ভারতবর্ষ হইতেই চা সর্ব্বপ্রথমে সেখানে প্রেরিত হয়। ইংরেজী ১৮২০ শতাব্দীতে আসাম-উপত্যকায় মিশমি ও নাগা পর্ব্বতে প্রথমে বন্য চা আবিষ্কৃত হয়। তাহার পর ইষ্টইণ্ডিয়াকোম্পানী-

কর্ত্তৃক আসামের নানাস্থানে চা'র আবাদ আরম্ভ হইল। আজ যে চা বিলাতে চারি পেনিতে ১পৌণ্ড বিক্রয় হইতেছে, প্রথমে তাহারই মূল্য ১০পৌণ্ড ছিল। যুগযুগান্তর ধরিয়া মানবজাতি এমন অনেক সামগ্রী ব্যবহার করিয়া আসিতেছে, যাহার সম্যক্ কারণ নির্দ্দেশ করিতে আজ এই বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের দিনেও আমরা অক্ষম। এই সমস্ত দ্রব্যাদির মধ্যে উদ্ভিজ্জপানীয় একটি। যে সকল স্থানের জল অস্বাস্থ্যকর, তথায় শীতল জলের পরিবর্ত্তে জল গরম করিয়া ব্যবহার করা স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকর, এই অভিজ্ঞতার ফলে অনেকস্থানেই এইরূপ পানীয়ের প্রচলন দেখা যায়। ইউরোপে মধ্যযুগে যখন লোকের মন কুসংস্কারে পূর্ণ ছিল, তখন কোনস্থানে কোনরূপ মহামারী উপস্থিত হইলেই লোকে সন্দেহ করিত যে, কূপসমূহে কেহ বিষ প্রক্ষেপ করিয়াছে। সেই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া ইহুদীদের প্রতি কতই-না অত্যাচার হইয়াছে। কূপের জল সত্যসত্যই বিষাক্ত হইত, কিন্তু তখন কেহই জানিত না যে, সে বিষ উপর হইতে প্রক্ষিপ্ত হয় নাই,—কূপের মধ্যেই রোগ বীজাণু (microbes) দ্বারা জন্মিয়াছে, অথবা কূপের নিম্নস্তর হইতে অপরিষ্কৃত জল আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এ কথা আমরা আজ কয়বৎসরমাত্র শিখিয়াছি। আজ আমরা শিখিয়াছি, জল গরম করিলে রোগের জীবাণুগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, সেইজন্য গরমজল স্বাস্থ্যকর। এই সত্য মানবজাতি বহুপূর্ব্বেই জানিত, কিন্তু তখন ইহার কারণ-নির্দ্দেশ করিতে পারিত না। তিব্বত, তরাই, কাশ্মীর, নেপাল প্রভৃতি প্রদেশে বহুদিন হইতেই চা'র প্রচলন আছে। অনেক বৌদ্ধ-মঠে অতিথির প্রথম অভ্যর্থনায় একপেয়ালা গরম চা প্রদত্ত হয়। রুশিয়াপ্রদেশে অনেক রেলওয়ে-ষ্টেশনে পিপা করিয়া তৈয়ারি চা রাখা হয়—তাহাকে সামোভার (Samover) কহে—যাত্রীরা যথেচ্ছ পান করে। কিন্তু তাহা নামে-মাত্র চা, অতি সামান্য চা দ্বারা প্রস্তুত হয়। জলের দোষনিবারণকল্পেই যে উদ্ভিজ্জ-পানীয় ব্যবহৃত হয়, তাহা নহে—কারণ গরম-জল ব্যবহার করিলেই ত সে উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে। কিন্তু গরমজল আস্বাদহীন; ইহাকে সুস্বাদু করিবার জন্য নানাপ্রকার দ্রব্য সিদ্ধ করার ব্যবস্থা হইয়াছে। সেই সকলের মধ্যে চা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। ইহার প্রধান কারণ চা উত্তেজক। এস্থলে খাদ্যদ্রব্য ও উত্তেজকপদার্থের প্রভেদ ভাল করিয়া বুঝা উচিত। যেমন ষ্টীম্-এঞ্জিনের পক্ষে কয়লা, দেহযন্ত্রের পক্ষে খাদ্য সেইরূপ। খাদ্যের দ্বারা দেহের বলাধান ও পরিপোষণ হয়, উত্তেজকপদার্থদ্বারা শরীরের পুষ্টিসাধন আদৌ হয় না। তবে উত্তেজকপদার্থের গুণ এই যে, যে বল শরীরে সঞ্চিত আছে, মনুষ্য কার্য্য-কালে তাহা সমগ্র প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়। হঠাৎ কোন বিষয়ে বল বা সাহস আবশ্যক হইলে, উত্তেজকপদার্থ তাহাতে সহায়তা করে—যতটুকু বল আছে, অথচ সাধারণত প্রকাশ পায় না, উত্তেজকপদার্থ সেইটুকু প্রকাশ করিবার শক্তি দেয় মাত্র, নূতন বল দেয় না। কিন্তু যেমন জমার অতিরিক্ত খরচ করিলে শীঘ্রই দেউলিয়া হইতে হয়, সেইরূপ উত্তেজকপদার্থের অপরিমিত ব্যবহারে শরীরের ঘোর অমঙ্গল ঘটে এবং অচিরেই

শারীরিক ও মানসিক এরূপ দৈন্য ও অবনতি উপস্থিত হয়, যাহার আর কিছুতেই পূরণ হয় না।

উত্তেজকপদার্থ দুইপ্রকার--শারীরিক ও মানসিক। শেষোক্তগুলির মধ্যে প্রেম, অহঙ্কার ও উচ্চাভিলাষ প্রধান। মনুষ্যের জীবনসংগ্রামে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বড় বেশী; সেই কারণে, স্বভাবতই আমরা এমন সকল পদার্থের অন্বেষণ করি, যাহা দ্বারা শক্তির অতিরিক্ত কার্য্য করিতে সমর্থ হই। পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই উত্তেজকপদার্থের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। যে দেশে দ্রাক্ষা জন্মে, তথায় মদিরার প্রচলন; যথায় জন্মে না, সে সমস্ত স্থানে নানাবিধ ফুল, ফল, মূল, রস, শস্য পচাইয়া উত্তেজকক্রিয়াবিশিষ্ট পানীয় প্রস্তুত ও ব্যবহৃত হয়। ভারতবর্ষের অনেকস্থানে অহিফেন, কোথাও গাঁজা বা সিদ্ধি, কোথাও তাড়ি ও পচুইর চলন আছে। কামাস্কট্কা প্রদেশে একরূপ ফঙ্গস্ (Fungus) ব্যবহৃত হয়। এ দেশের লোকেও অনেকটা এইরূপ উদ্দেশ্যে সুপারি ব্যবহার করে। এইরূপ চীনদেশে চা, আরেবিয়ায় কফি, ব্রেজিলে গোয়ারানা, প্যারাগেয়েতে মাটে (mate) এবং মধ্য-আমেরিকায় কেকেও বা কোকোর প্রচলন আছে। রাসায়নিক গুণে ও শরীরের উপর ক্রিয়াহিসাবে উপরি-উক্ত সকল দ্রব্যেরই গুণ প্রায় একইপ্রকার। পেরুপ্রদেশের কোকা-পাতা রাসায়নিক গুণে চা-পাতা হইতে পৃথক্ হইলেও শরীরবিধানসম্বন্ধে একইরূপ ক্রিয়া প্রকাশ করে। না জানি, যুগযুগান্তর ধরিয়া মনুষ্য কত দ্রব্যই পরীক্ষা করিয়া শেষে কয়েকটিমাত্র বাছিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছে। উপরে যে কয়েকটি দ্রব্য উল্লিখিত হইল, তাহাদের সকলের ক্রিয়া একইরূপ অর্থাৎ উত্তেজক। কিপ্রকারে এই সমস্ত উত্তেজক-পদার্থ শরীরে ক্রিয়াপ্রকাশ করে, তাহা সম্যক্ বুঝিতে হইলে শরীরতত্ত্বসম্বন্ধে দুচারিটি কথা জানা আবশ্যক। শরীরকে আঘাত হইতে রক্ষা করা মস্তিষ্কের একটি প্রধান কার্য্য। উত্তপ্ত লৌহখণ্ডে যদি আমাদের হাত পড়ে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সেই বেদনা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্নায়ুদ্বারা মস্তিষ্কে অনুভূত হয়, এবং আঘাত গুরুতর হইবার পূর্ব্বেই আমরা হাত সরাইয়া লই। কিন্তু যদি অহিফেন, মদ্য বা ক্লোরোফরম্ দ্বারা মস্তিষ্ক অবশ হইয়া পড়ে, তাহা হইলে কোন বেদনাই অনুভূত হয় না, হাত পুড়িয়া ভস্ম হইয়া গেলেও আর সরিয়া আসে না। মস্তিষ্কের এই আশু অনুভূতিই শরীরকে বাহ্যিক বিপদ্ হইতে রক্ষা করে। সেইরূপ এই অনুভূতির দ্বারাই আভ্যন্তরীণ বিপদ্ হইতেও শরীর রক্ষা পায়। মনে করুন, কোন ব্যক্তি কুস্তি করিতেছে। নিজের কৃতিত্ব দেখাইবার জন্য পেশীসকলের এত অধিক ক্রিয়া প্রকাশ করিতেছে যে, সে যদি বেদনাবোধ না করে, হয় ত সেগুলি ছিঁড়িয়া যায়। কিন্তু বেদনা অনুভূত হওয়ায় সে কখনই ততদূর করিতে সমর্থ হয় না। এই-রূপে মনুষ্য উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া ক্ষমতার অতিরিক্ত অনেক কার্য্য করিতে থাকে, পরে অবসাদ আসিয়া তাহা হইতে তাহাকে বিরত করে।

চা, কফি, কোকো শরীরে তিনপ্রকারে ক্রিয়াপ্রকাশ করে—প্রথমত রক্তসঞ্চালক যন্ত্রের উপর, দ্বিতীয়ত মেরুদণ্ডের উপর, তৃতীয়ত মস্তিষ্কের উপর। রক্তসঞ্চালক

যন্ত্রের উপর ক্রিয়াধিক্যবশত মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য হয় এবং সেজন্য চিন্তা ও বিচার-শক্তি বর্দ্ধিত হয়, বুদ্ধির প্রাখর্য্য জন্মে ও অধিক কথা কহিবার স্পৃহা হয়। অপর-পক্ষে, নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মে—যে নিদ্রা অবসন্ন শরীর ও মনকে সুস্থ করে, সেই নিদ্রার অল্পতা ঘটে। ইহা ব্যতীত চা-পানের পর প্রয়োজন না থাকিলেও মস্তিষ্কের ক্রিয়াধিক্য হইতেই থাকে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা ইহার অপকারক ক্রিয়া এই যে, ইহার দ্বারা মেরুদণ্ড ও স্নায়ুর অপ্রিয় অনুভূতিগুলি লোপ পায় বা হ্রাস-প্রাপ্ত হয়। ইহার ফলে মস্তিষ্কের বেদনা-অনুভূতিশক্তি কমিয়া যায়, ক্ষুধা থাকিলেও ক্ষুধাবোধ হয় না, শরীরে বেদনাসত্ত্বেও কষ্ট-বোধ হয় না, পরিশ্রমের পর ক্লান্তি-অনুভব হয় না। শরীরে এই সমস্ত অস্বাভাবিক পরিবর্ত্তন সংঘটন করা ইহাদের কার্য্য। এই কারণে চা বা কফি পানের পর মানুষের মনে একটা ভ্রান্ত স্বচ্ছন্দতার ভাব আসে, আপনাকে বড় সুখী মনে করে। কিন্তু ইহা একটা ভ্রমমাত্র। এইরূপ উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া যে যে কার্য্য করিতে সম্পূর্ণ আপারগ, সেও সে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় ও কখন-কখন করিয়াও ফেলে। কিন্তু তাহার ফলে নিজ সামর্থ্যের অতিরিক্ত কার্য্য করায়, শরীর ক্রমশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। যদিও উত্তেজনা-বশত সেসময় শরীরে ক্লান্তি অনুভূত হইল না, কিন্তু শ্রমজনিত শারীরিক ও মানসিক ক্ষয় ত হইতে লাগিল। ইহাতে পরিশেষে এমন শারীরিক ও মানসিক অবসাদ জন্মে যে, চেষ্টা-সত্ত্বেও কোনপ্রকার কার্য্যে প্রবৃত্তি হয় না। আত্মসংযম লোপ পায়, মনুষ্য ভীত, উগ্র-স্বভাব ও ভাবপ্রবণ হইয়া পড়ে। চা'র সদ্‌গুণ-সম্বন্ধে ইহার অবসাদ-অপহারক গুণ চাপায়ি-মাত্রেই অবগত আছেন। চা-পানের পর মনে স্ফূর্ত্তি হয়, ক্লান্তি ও নিদ্রালুতা দূর হয় ও মানসিক শক্তির বিকাশ হয়। ক্ষীণ ও বৃদ্ধ ব্যক্তি চা'র অধিক প্রিয় হইয়া পড়েন। সুতরাং এতগুলি গুণ থাকিতে "যে পেয়ালা স্ফূর্ত্তি আনে, অথচ মাতাল করে না" সভ্য-জগতে তাহার যে এত আদর হইবে, ইহা কিছু বিচিত্র নহে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত চা ও তজ্জাতীয় দ্রব্যগুলির অপরিমিত ব্যবহারে মহানিষ্টকর ফল দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, চার অন্যতম কার্য্য বেদনা-অনুভূতি-শক্তির হ্রাস করা। সেইজন্য ইহা যেমন ক্লান্তিনাশ করে, সেইরূপ অগ্নিমান্দ্য জন্মায়। চাপায়ী ক্ষুধা-অনুভূতি-শক্তি হ্রাস হওয়ায় শরীররক্ষার্থ পরিমিত আহার করে না, সুতরাং প্রতিদিন শরীর ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। চা যতই উৎকৃষ্ট হউক না, সকল শ্রেণীর চা-ই এই অপকার করে। বিশেষ যে সকল চা'তে অধিকপরিমাণে ট্যানিন্ আছে, তাহারা সেই পরিমাণে অপকারী। মাংসের সহিত চা-পান নিষিদ্ধ, কেন না, চার ট্যানিন্ দ্বারা মাংস কঠিন ও দুষ্পাচ্য হয়, এবং তাহা হইতে অজীর্ণ ও উদরাময় রোগ জন্মে। মাংস ব্যতীত অপর খাদ্যসামগ্রীর উপর চা'র এরূপ অপকারক ক্রিয়া নাই। অতিরিক্ত চা-পানে পাকস্থলীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহ জন্মে, তাহা হইতে পরিপাকশক্তি কমিয়া যায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অত্যধিক চা-পান করিলে অনিদ্রা জন্মে। ইহা ব্যতীত স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, হৃৎপিণ্ডের কম্পন ও শরীরের নানা স্থানের

কম্পন উপস্থিত হয়। কখন-কখন মাথা-ঘোরা, শিরোবেদনা ও মস্তিষ্কের অন্যান্য কঠিন রোগও ইহা হইতে উৎপন্ন হয়।

কেহ কেহ বলেন, চীনদেশীয় চা ভারতবর্ষীয় ও সিলোনের চা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় চার গুণাগুণ ইহার প্রস্তুতপ্রণালীর উপর অধিক নির্ভর করে। চার উপর গরমজল ঢালিয়া অল্পক্ষণ রাখিয়াই যদি সেবন করা যায়, তাহা হইলে ট্যানিনের অংশ অল্পই আসে, কিন্তু তাহা না করিয়া যদি চা জলে সিদ্ধ করা যায়, অথবা অধিকক্ষণ ভিজাইয়া রাখা হয়, তাহা হইলে অধিক-পরিমাণে ট্যানিন্‌ নির্গত হইয়া থাকে ও অজীর্ণরোগ উৎপাদন করে।

উপসংহারে চাপ্রস্তুতপ্রণালীসম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিতে চাই। ইংরেজগৃহস্থের বাড়ী নিয়ম এই যে, প্রত্যেক পেয়ালার জন্য একচামচ ও পাত্রের জন্য আর-এক চামচ, এই হিসাবে চা দিতে হয়। টিপট্‌ শুষ্ক ও গরম হইলে ভাল হয়। জল কেবল গরম করিলেই যথেষ্ট হয় না, আবৃত পাত্রে কিছুক্ষণ ধরিয়া ফুটিতে থাকা চাই। জল লৌহপাত্রে গরম করিলে চা কালো হইয়া যায়। গরম জল ঢালিবার পর তিনমিনিটের উর্দ্ধে ভিজিতে দেওয়া উচিত নয়। অধিকক্ষারবিশিষ্ট জলে অথবা যে জলে লৌহের অংশ আছে, তাহাতে চা'র আস্বাদ ভাল হয় না। দুইবার গরম-করা জলে প্রস্তুত চা বিস্বাদ হয়। যাঁহাদের অজীর্ণরোগ আছে, তাঁহাদের পক্ষে চায়না-টি শ্রেষ্ঠ।

শ্রীমনোমোহন গুপ্ত।

অক্ষরের উৎপত্তি।

ইউরোপের যে সকল জাতি এখন সর্ব্বাপেক্ষা সুসভ্য বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, এক-হাজার বৎসর পূর্ব্বে তাঁহাদের বর্ব্বরতা অত্যন্ত অধিক ছিল। রোমানদিগের নিকট হইতে তাঁহারা ধর্ম্ম, সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতি সকল সম্পদ্‌ লাভ করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন। গ্রীকেরা যখন রোমানদিগেরও গুরু, তখন এই ইউরোপীয়েরা গ্রীকসভ্যতার মাহাত্ম্য বিশেষভাবে অনুভব করিয়া থাকেন।

ভারতবর্ষের সভ্যতা যে গ্রীকসভ্যতার পূর্ব্ববর্ত্তী, এবং গ্রীকজাতির নিকট ঋণগ্রস্ত না হইয়া যে ভারতবর্ষ উন্নতিলাভ করিতে পারিয়াছিল, এ কথা ইংরেজ প্রভৃতি একালের ইউরোপীয়েরা বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারেন না। ভারতবর্ষ যাঁহার পদানত, অতএব ভারতবর্ষ অপেক্ষা যিনি শ্রেষ্ঠ, তিনি কদাপি ভারতবর্ষের গৌরব লক্ষ্য করিতে পারেন না। যে নীচ এবং হেয়, তাহাকে কেহ সম্মান করিতে পারে না। ইহাই মনুষ্যপ্রকৃতি। অলক্ষ্যে অনেক ইউরোপীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌ পণ্ডিতেরা এই ভাব লইয়া ভারতবর্ষের ইতি-হাস পর্য্যালোচনা করিতে গিয়া, হিন্দুসভ্যতার

মূলে গ্রীক্‌ভাব টানিয়া আনেন। বিন্‌সেণ্ট-স্মিথ্‌ ইঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—"European students, whose attention has been directed almost exclusively to the Græco-Roman foundation of Modern Civilization, may be disposed to agree with the German philosopher in the belief that *Chinese, Indian and Egyptian antiquities are never more than curiosities.*" এস্থলে সুপ্রসিদ্ধ গেটের বচনের প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে।

ইংরেজের মনের ভাবটুকু সম্ভবত এইরূপ—"আমরা যাহাদের প্রভু, তাহারা ত নিঃসন্দেহ আমাদের অপেক্ষা নীচজাতি। আমরা উচ্চ; অথচ আমাদের সভ্যতার মূলভিত্তি গ্রীক্‌ ও রোমান্‌ সভ্যতার উপর। খৃষ্টানধর্ম্ম পাইবার পূর্ব্বে আমাদের মধ্যে ধর্ম্মের উচ্চভাব যখন ছিল না, তখন হিন্দুধর্ম্মের উচ্চভাবগুলি নিশ্চয়ই খৃষ্টাব্দের পরবর্ত্তী সময়ে পশ্চিম হইতে আসিয়াছে। আমরা যখন রোমানদিগের নিকট বর্ণমালা পাইয়াছি, তখন ভারতবর্ষীয়েরাও নিশ্চয়ই এমন কোন পাশ্চাত্য-জাতির নিকট হইতে উহা লাভ করিয়াছে, যাহাদের নিকট হইতে গ্রীক্‌ ও রোমানেরা অক্ষর ধার করিয়া লইয়াছিল।"

পণ্ডিতেরা যদি এইপ্রকার ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া অনুসন্ধান না করিতেন, তাহা হইলে এই প্রশ্নই উঠিত না যে, ভারতবর্ষের বর্ণমালা কোথা হইতে আসিল। প্রথমে যখন এই পণ্ডিতেরা দেখিলেন যে, অশোকের সময়ের পূর্ব্বের লিপি পাওয়া যায় না, তখন একেবারে বলিয়া বসিলেন যে, ঐ সময়েই ভারতবর্ষে প্রথম অক্ষরের সৃষ্টি। তাহার পরে যখন দেখিলেন যে, বুদ্ধদেবের সময়েও লিপি প্রচলিত ছিল, তখন ভারতবর্ষের অক্ষরের উৎপত্তিটা অনেক কষ্টে খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ-শতাব্দীতে স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু সে সময়েও এ কথা বলিতে ভুলেন নাই যে, অক্ষরের উৎপত্তি হইয়া থাকিলেও তখন পর্য্যন্ত গ্রন্থরচনা হয় নাই। সুবিজ্ঞ রীস্‌ ডেভিস্‌ পর্য্যন্ত বলিয়াছেন যে, যখন বৌদ্ধ শ্রমণেরা বর্ষাকালে ত্রিপিটক আবৃত্তি করিত, কিন্তু লিখিত না, তখন নিশ্চয়ই সেই যুগে গ্রন্থ-রচনার সূত্রপাত হয় নাই। এখনো ত এদেশের পণ্ডিতেরা গ্রন্থের উপর বড় নির্ভর না করিয়া অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিয়া থাকেন; তাহা দ্বারা কি একালেও গ্রন্থের অস্তিত্বে অবিশ্বাস করিতে হইবে?

প্রত্নতত্ত্ববিদেরা স্বীকার করেন যে, বৃহদ্দেবতাগ্রন্থ ন্যূনকল্পে গোতমবুদ্ধের সাম-সময়িক। ঐ বৃহদ্দেবতার প্রারম্ভের দ্বিতীয় অংশের ৯০ শ্লোকে আছে—

> "ঊনানাং পূরণার্থা বা পাদানামপরে কচিৎ।
> মিতাক্ষরেষু গ্রন্থেষু পূরণার্থাস্ত্বনর্থকাঃ॥"

গ্রন্থের এমন সুস্পষ্ট উল্লেখ উপেক্ষিত হয় কেন? বৃহদ্দেবতাগ্রন্থ যখন নিরুক্তের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, তখন নিরুক্তকে ইউরোপীয়েরা খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠশতাব্দীর পরবর্ত্তী নহে বলিয়া বিচার করিয়াছেন। ঐ নিরুক্তের প্রথমভাগের নবম শ্লোকে আছে—

> "অথ যে প্রবৃত্তে—অর্থে—অমিতাক্ষরেষু গ্রন্থেষু বাক্য-পূরণা আগচ্ছন্তি……ইত্যাদি।"

তাহা হইলে খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠশতাব্দীতেও গ্রন্থের

অস্তিত্ব প্রমাণিত হইল। নিরুক্তরচনার বহু-পূর্ব্বে গদ্য (অমিতাক্ষর) এবং পদ্য (মিতাক্ষর) গ্রন্থ লিখিত না হইলে এই দৃষ্টান্ত কদাচ প্রদত্ত হইতে পারিত না। গ্রন্থ-উৎপত্তির সমালোচনায় কোন ইউরোপীয় পণ্ডিতের লেখায় নিরুক্ত এবং বৃহদ্দেবতার এই উল্লেখ উদ্ধৃত দেখি নাই।

লিপি-আবিষ্কারের কত পরে যে কোন-প্রকার ফলকে বা কিয়ৎকালস্থায়ী পত্রে ঐ লিপি রক্ষিত হইতে পারিয়া, উহার অক্ষর (অক্ষয় বা স্থায়ী) নাম হইয়াছিল, তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত। অক্ষরনাম প্রাপ্ত হইয়াও যে অনেক পরে স্থায়ী পত্রে লিপি সুরক্ষিত হইয়া গ্রন্থের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। তবুও নাকি খৃঃ পূঃ ৮০০ বৎসরে আমাদের পিতৃপুরুষেরা বিদেশ হইতে লিপির আমদানি করিয়াছিলেন! এ সকল কেবল গায়ের জোরের কথা। যে সময়ে অধ্যায়ে অধ্যায়ে ব্রাহ্মণ রচিত,—মণ্ডলে মণ্ডলে বেদ বিভক্ত হইতেছিল, তখন যে গ্রন্থরচনা অজ্ঞাত ছিল, এ কথা সহস্র চেষ্টা করিয়াও বুঝিয়া উঠিতে পারি না। বেদ মুখস্থ করিত, এখনো করে ; কেবল সেই প্রমাণের উপর যে কেমন করিয়া লিপি এবং গ্রন্থের অনস্তিত্বের প্রমাণ হয়, তাহা রোমীয় জ্ঞানালোক না পাইলে কদাচ বুঝিতে পারা যায় না।

বর্ব্বরেরাও ঠারেঠোরে কথা কহিতে জানে এবং নানাপ্রকার মনের ভাব কেবলমাত্র ইঙ্গিতে প্রকাশ করিয়া থাকে। বৈদিকসভ্যতায় যখন চিত্রবিদ্যার সুস্পষ্ট নিদর্শন আছে, বহুবিধ সামাজিক সভ্যতার অক্ষয় প্রমাণ রহিয়াছে, তখন যে ভাবসম্পদে ধনী এবং চিত্রবিদ্যায় নিপুণ আর্য্যেরা লিপি আবিষ্কার করিতে পারেন নাই, এ কথা বুদ্ধির অগম্য। নিজেরা নিতান্ত বর্ব্বর অবস্থায় পরের কাছে লিপিপ্রথা এবং বর্ণমালা শিখিয়াছিলেন বলিয়া ইংরেজেরা মনে করেন যে, লিপি-আবিষ্কার অতি দুরূহ ব্যাপার। বৈদিক-সভ্যতাসম্পন্ন আর্য্যদিগের নিকটেও উহা দুরূহ ব্যাপার ছিল কি? হীন, নীচ এবং পদদলিত জাতির ইতিহাস এইরূপেই রচিত হয়।

বর্ণমালা বা অক্ষরগুলির যখন প্রথম আবিষ্কার হয়, তখন কোন্ ভাবটি কি প্রকারে চিত্রে প্রকাশিত হইয়া কোন্ অক্ষরের কি প্রকারের রূপ হইয়াছিল, তাহা আমরা ভাবিয়া উঠিতে পারি না। একটি ছোট শিশু যে কেমন করিয়া একটি কাঠিকে ঘোড়া বলিয়া কল্পনা করিয়া লয়, তাহা আবার শিশু না হইলে বুঝিতে পারিব না। রাশিচক্রের যে সকল মূর্ত্তির কল্পনা আছে, সেই মূর্ত্তিগুলির সহিত নক্ষত্রমালার কোন মিল দেখিতে পাওয়া যায় না। যে কল্পনায় সেই মূর্ত্তি কল্পিত হইয়াছিল, আমরা আর তাহা লাভ করিতে পারিব না। গতবর্ষের চৈত্রমাসের বঙ্গদর্শনে অক্ষরের উৎপত্তির যে ছবি প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা না দিলেই ভাল হইত। যে নাগরী এবং বঙ্গীয় অক্ষরের সহিত শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশের চিত্রের মিল দেখান হইয়াছে, ঐ অক্ষরগুলির পূর্ব্ববর্ত্তী আরও প্রায় ৪।৫ রকমের অক্ষর প্রচলিত ছিল। ঐ অক্ষরগুলি ত নবম-শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী নহে। খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয়-শতাব্দীর 'ক' নবম শতাব্দীর নাগরী 'ক'-অক্ষরের জনক বটে, কিন্তু শেষটির যেমন

কানের সহিত মিল আছে, প্রথমটির তেমন নাই। 'ক'সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, 'গ' ব্যতীত, চিত্রে প্রদর্শিত সকল অক্ষরের সম্বন্ধেই ঐ কথা প্রযোজ্য। তন্ত্রের অক্ষর-বর্ণনার প্রতি ত আদৌ লক্ষ্য করা চলে না। কারণ তন্ত্রের অক্ষরবর্ণনা খাঁটি-বঙ্গাক্ষর-সৃষ্টির পরবর্ত্তী। এ কথা তন্ত্রসমালোচনায় কিয়ৎ-পরিমাণে সাহিত্যপত্রে লিখিয়াছি।

প্রাচীন ব্রাহ্মী লিপি বিকশিত হইবারও পূর্ব্বে ঐ ব্রাহ্মী লিপির জনকস্বরূপ অক্ষরগুলির অবয়ব কিরূপ ছিল, তাহা জানিতে পারা যায় না। এরূপ স্থলে ভারতবর্ষের আদিম অক্ষরের উৎপত্তি কিপ্রকার চিত্র হইতে হইয়াছিল, তাহার বিচার করা অসম্ভব। একালের সকল অক্ষরই যখন অতি প্রাচীন অক্ষরের ক্রম-বিকাশে উৎপন্ন, তখন একালের অক্ষর লইয়া কোন কল্পনা করা চলে না।

এইপ্রকার কল্পনার ফলেই অশোকের সময়ের কয়েকটি অক্ষরের সহিত আসীরিয় অক্ষরের কিঞ্চিৎ মিল দেখিয়া, ওয়েবরসাহেব ভারতলিপির অত্যাশ্চর্য্য আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছিলেন। সুবুদ্ধি বুলার্ যখন ১৮৯৬ সালে ওয়েবরের ঐ অসার কথার অনুবর্ত্তন করিয়া Indische Paleographie লিখিয়া-ছিলেন, তখন সত্যসত্যই ক্লেশ অনুভব করিয়াছিলাম। আর্য্যেরা যে ইউফ্রেটিস্নদীর উপত্যকাভূমি হইতে খৃষ্টপূর্ব্ব ৭ম বা ৮ম শতাব্দীতে অক্ষর সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার যুক্তি কি, তাহা বলিতেছি। ১৮৯৮ সালের রয়াল্ এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রে কেনেডি-সাহেব ঐ মত বিশেষভাবে নানা যুক্তিদ্বারা প্রচার করিয়াছেন।

১ম যুক্তি। – খৃঃ পূঃ ৭ম শতাব্দীর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে যে লিপি প্রচলিত ছিল, তাহা জানা যায় না। নিরুক্ত কিন্তু অন্তত ষষ্ঠ শতাব্দীর, এবং সে সময়ে গ্রন্থ পর্য্যন্ত রচিত হইত; উপরন্তু, এখনো ঐ নিরুক্তের সময় যথার্থভাবে নিরূপিত হয় নাই।

২য় যুক্তি।—দেখিতে পাওয়া যায় যে, খৃষ্ট-পূর্ব্ব সপ্তমশতাব্দীতে ভারতের পশ্চিম উপকূলে বাবিলন্ প্রভৃতি দেশের সহিত বাণিজ্য চলিতেছিল। এই প্রসঙ্গে এ কথাও উল্লেখ-যোগ্য যে, এই বাণিজ্য আর্য্যদিগের সহিত হইত না। "These merchants were Dravidians and not Aryans." পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাই বলিতেছেন যে, তখন আর্য্যেরা দক্ষিণাপথে রাজ্যবিস্তার করেন নাই, এবং মলবর প্রভৃতি উপকূলে দ্রাবিড়ীয় জাতিরা বিদেশীয়দিগের সহিত বাণিজ্য করিত। আর্য্যেরা যে দক্ষিণপ্রদেশের এই দ্রবিড়জাতীয় লোকদিগের সহিত অশোকের সময়ের পূর্ব্বে কোন সংস্রবে আসেন নাই, তাহাও ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের কথা। কথাটি যে ঠিক, তাহা বৌদ্ধদিগের প্রাচীন প্রাকৃতভাষায় রচিত গ্রন্থের সাহায্যে স্পষ্ট জানিতে পারা যায়। এখন দেখা যাউক যে, বাবিলন্-বাণিজ্যে দ্রাবিড়ী লোকেরা বিদেশের অক্ষর আনিয়া আর্য্যের হাটে বেচিয়াছিল কি না। অনার্য্য দ্রাবিড়ী লোকদিগের যে সকল অক্ষর আছে (কানাড়ী, তেলেগু, তামিল প্রভৃতি), তাহা আর্য্যদিগের অক্ষর হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। অনার্য্যেরা নিজ ব্যবহারের জন্য নূতন অক্ষর আবিষ্কার করিয়া ব্যবহার করিয়াছিল এবং অপরিচিত উত্তরপ্রদেশবাসী আর্য্যদিগের জন্য

বিদেশী অক্ষর কিনিয়া-আনিয়া আর্য্যের হাটে বেচিয়া গিয়াছিল, এ কথা বুঝিবার শক্তি আমাদের নাই।

দৈবাধীন কয়েকটি অক্ষরের রূপসাদৃশ্য কল্পনা করিয়া এত-বড় একটা মত স্থাপন করা ইংরেজিরকম সাহসেই চলিতে পারে। ঐ মিলটুকু আবার কি রকমের, তাহাও দেখিয়া লওয়া উচিত। কেনেডি এবং বুলার সাহেবের উক্ত প্রবন্ধদুইটিতে যাহা পাওয়া যায়, তাহাতে ত ইংরেজি 'I' হইতে আমাদের 'ই'কারের উৎপত্তি স্বীকার করা চলে। মিলস্থাপনের জন্য কি-যে কষ্টকল্পনা করিতে হইয়াছে, তাহা পাঠকেরা ঐ সকল প্রবন্ধ পড়িলেই বুঝিতে পারিবেন। যাঁহারা টানিয়া-বুনিয়া বাহ্যিক মিলনের সৃষ্টি করেন, তাঁহারা যদি মনস্তত্ত্বের দিক্ হইতে সহজ মিলনের ভূমির প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেন, তাহা হইলে অনেক কষ্ট বাঁচাইয়া বুঝিতে পারিতেন যে, যেপ্রকার প্রাকৃতিক উন্নতির ফলে অন্যত্র অক্ষরের সৃষ্টি, সেই প্রাকৃতিক নিয়মেই জ্ঞানোন্নত সুসভ্য আর্য্যদিগের সমাজে লিপির উৎপত্তি হইয়াছিল। প্রাচীনকালে জাতিতে জাতিতে যত বিরোধ ছিল, তাহাতে সহসা কেহ পরের অনুকরণ করিত না। কাজেই প্রায় সকল সমাজেই যে স্বতন্ত্র এবং স্বাধীনভাবে শিল্প-সাহিত্য প্রভৃতি বিকশিত হইয়াছিল, এ কথা বুঝিতে গোল হয় কেন? বৈদিকসাহিত্যে যে সভ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে অক্ষরসৃষ্টিটা একটা অত্যাশ্চর্য্য দুরূহব্যাপার বলিয়া কল্পনা করিবার পথ কোথায়?

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

বাঙ্গলার চিত্র।*

প্রথম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কলিকাতা-সিমলা বংশী মিত্রের গলি ১৭ নম্বর বাড়ী একটি মেস্ বা ছাত্রাবাস। বাড়ীটি ত্রিতল, বড় রাস্তার ধারে। সম্প্রতি বাহিরে লাল রঙ্ ও ভিতরে চূনের পোছ দেওয়াতে ইহার জীর্ণতা কতকটা ঢাকা পড়িয়াছে; কিন্তু ভিতরের কয়েকটি স্খলিত বরগা ও ভগ্ন খড়্খড়ি ইহার প্রাচীনতার পরিচয় প্রদান করিতেছে। বাড়ীটির তিন তলে দশটি ঘর—একএকটি ঘর যেন একএকটি পায়রার খোপ। গৃহস্বামী শ্রীস্বরূপচন্দ্র লাহা ইহাকে মেসের জন্য ভাড়া দিবেন বলিয়াই নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন এবং বিগত বিংশবৎসর যাবৎ ইহা মেসরূপেই ব্যবহৃত হইয়া

* 'উড়িষ্যার চিত্র' প্রণেতা শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রমোহন সিংহ মহাশয়ের '[illegible]' নামে একখানি উপন্যাস বাহির হইবার পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে। চিত্রহিসাবে তাহার কয়েকটি পরিচ্ছেদ বঙ্গদর্শনে বাহির হইতেছে। বঃ সঃ

আসিতেছে। অথচ প্রতি বৎসর গ্রীষ্মাবকাশের পর যখন ছাত্রগণ এই বাড়ী ভাড়া করিতে আসে, তখন তিনি বলেন—"না, আমার এ বাড়ীতে মেস্ কর্ত্তে দেব না। দেখ না, মেসের ছেলেরা বাড়ীটাকে কেমন খারাপ কোরে ফেলেছে!" পরে ছেলেরা নিরুপায় হইয়া ৩০৲ টাকার স্থলে ৩৫৲টাকা ভাড়া স্বীকার করিলে তিনি চাবিনাড়ার শব্দ শুনিয়া একবার অন্দরে প্রবেশ করেন এবং আসিয়া বলেন—"আচ্ছা, তোমরা যে কয়টি পার, বন্ধুবান্ধব একত্র হইয়া আমার বাড়ীতে থাক, কিন্তু সাবধান—মেস্ কোরো না!"

এইরূপে বৎসর-বৎসর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে বাড়ীটির ভাড়াও বৃদ্ধি পাইয়া এবার ৫৩৲টাকায় দাঁড়াইয়াছে। রাখাল, নগেন্দ্র, কুমুদ, উপেন্দ্র প্রভৃতি কয়েকটি ছেলে এবার পাঁচদিন হোটেলে খাইয়া আষাঢ়মাসের প্রচণ্ড রৌদ্রে হাঁটাহাঁটি-ছুটোছুটি করিয়া এবং দুইতিনদিন হেদোর বাগানে বেঞ্চের উপর রাত্রিযাপন করিয়া অনেক কষ্টে এই বাড়ী হস্তগত করিয়াছে। এ বাড়ীতে তাহারা বিশটি ছাত্র থাকে, সকলেই পূর্ব্ববঙ্গবাসী। কাহারও বাড়ী ঢাকা, কাহারও বাড়ী ফরিদপুর, কাহারও বাড়ী বরিশাল, কাহারও বাড়ী যশোর, কাহারও বাড়ী খুলনা। সুতরাং এটি "বাঙাল মেস্"! আমি যশোর ও খুলনার লোকদিগকে পূর্ব্ববঙ্গবাসী বলিলাম, ইহাতে তাঁহারা লাঠি লইয়া আমাকে মারিতে উঠিবেন না ত?

শ্রাবণমাস—প্রাতঃকাল। বেলা ৯টা বাজিয়াছে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, ভোরে এক-পস্‌লা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। তরল মেঘ ভেদ করিয়া একটু একটু রৌদ্রের আভা ফুটিয়া বাহির হইতেছে। কলিকাতাসহরে প্রাতঃকালে বিনা মেঘেও আকাশ অন্ধকারময়, কলের চিম্‌নিসমুদ্গীর্ণ ধূমরাশি সূর্য্যদেবকে বড় আমল দিতে চায় না। প্রভাতে বৃষ্টি হওয়াতে রাস্তা কর্দ্দমাক্ত হইয়াছে। ছেকড়া-গাড়ির ছ্যাড়্‌ছ্যাড়্‌শব্দ কোচোয়ানের তালুর সহিত আঘাতপ্রাপ্ত জিহ্বার টক্‌টক্ শব্দের সহিত মিলিত হইয়া শ্রুতিসুখোৎপাদন করিতেছে। থাকিয়া থাকিয়া ট্র্যামগাড়ির ঝন্‌ঝন্-হস্‌হস্-শব্দ যেন কর্ণ বধির করিতেছে। তাহার উপর আবার দ্রুতগামী যান ফিটন্-ব্রাউহাম্ প্রভৃতি গাড়িসকলের হড়্‌হড়্-ঘড়্‌ঘড়্‌শব্দ রাস্তা ও তাহার উভয়পার্শ্বস্থ ভূমি কম্পিত করিয়া এবং উচ্চ অট্টালিকাশ্রেণীর গাত্রে প্রতিধ্বনি তুলিয়া দূরে লীন হইতেছে। থাকিয়া-থাকিয়া সেই কম্পনের তরঙ্গ আসিয়া আমাদের সেই ১৭নম্বর বাড়ীটির ভাঙা খড়্-খড়িগুলিকে ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপাইতেছে। গাড়ির শব্দের অন্তরালে ফেরিওয়ালাগণের বিবিধ ডাক বিবিধ সুরে ও বিবিধ ভঙ্গিতে শুনা যাইতেছে; যেমন—"ভাল আঁব—চাই ভাল আঁব"—"সেলাই জুতিয়ে-যে-য়ে"—"ঘিয়-ঘিয়"—"ভাঙা ছাতা সারাবে"—"চাই আলু-পটোল"—"চাই বড়া-বড়া সরপুরিয়ে" ইত্যাদি। মাঝে একজন নেড়ামাথা, কৌপীনপরা, তিলক-ছাপে ডেড্‌লেটার আফিসের চিঠির ন্যায় সিল্-মারা বৈরাগী মন্দিরা বাজাইতে বাজাইতে দন্তশূন্যবদনে "হরি বল' গৌর নাচে নিতাই নাচে রে" গাইতে গাইতে আড়নয়নে রাস্তার দুই ধারে গবাক্ষশ্রেণীর পানে মিটিমিটি তাকাইতে তাকাইতে অন্তর্হিত হইলেন। বেলাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাস্তায় লোকচলাচল

এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে লোককোলাহলও বাড়িতে লাগিল। ১৭নম্বর বাড়ীতেও এখন খুব কোলাহল আরম্ভ হইয়াছে।

সেই বাড়ীটায় ঢুকিতে বামদিকে দোতলার সিঁড়ি ও সম্মুখে একটি ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণ। বাড়ীটা দক্ষিণমুখ। প্রাঙ্গণের পশ্চিমপার্শ্বে রন্ধুইঘর, তাহার সম্মুখে একটি থামের গায় জলের কল এবং তাহার নীচে একটি বড় চৌবাচ্চা। প্রাঙ্গণের উত্তরধারে একটি বড় লম্বা ঘর। এখানে ছেলেরা আহার করে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ বড় কবি, কি শেলি বড় কবি—রোসাহেব ভাল ইংরেজি পড়ান, না উইলসন্‌সাহেব ভাল পড়ান—"বঙ্গবাসী"র লেখা ভাল, কি "সঞ্জীবনী"র লেখা ভাল—ইত্যাদি অনেক বিষয়ে তর্কবিতর্ক করে। পূর্ব্বদিকে দুইটি ঘর,—তাহা দুইটি ছেলে অল্প ভাড়া দিয়া দখল করিতেছে।

উপর তলায় চারি দিকে আটটি ঘর—তাহাতে ১৬টি সিট্‌ পড়িয়াছে। ছাদের উপর মাত্র একটি ঘর, সেখানে দুইটি ছেলে থাকে। নীচেকার দুইটি সিটের ভাড়া তিনটাকা, আর তেতলার দুইটি সিটের ভাড়া সাতটাকা। মোট বাড়ীভাড়ার বাকী ৪৩৲টাকা দোতলার ১৬টি সিটের উপর সুবিধা-অসুবিধা-বিবেচনায় বেশী-কমি করিয়া ধরা হইয়াছে। তাহাতে সিট্‌গুলির ভাড়া ২।০ হইতে আরম্ভ করিয়া ২৸০ পর্য্যন্ত পড়িয়াছে। অবশ্য এই ছোট বাড়ীটায় ২০জন ছেলে থাকায় খুব বেশী জনতা হইয়াছে, কিন্তু বাড়ীভাড়াও যে আবার খুব বেশী; ইহাতে বেশী লোক না থাকিলে ভাড়া উঠিবে কিরূপে? যে হিসাবে ভাড়া ধরা হইয়াছে, মফস্বলের কয়জন ছেলে ইহার অধিক ভাড়া দিয়া কলিকাতায় বাস করিতে পারে? সম্প্রতি যে সকল কর্ত্তৃপক্ষ মেসের জনতানিবারণের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, তাঁহাদের এ কথাটা স্মরণ রাখা আবশ্যক।

এখন যাহা বলিতেছিলাম, তাই বলি। মেসের গোলমাল বাড়িয়াছে। ছাত্রগণ স্নানাদি করিবার জন্য নীচে নামিয়া আসিয়াছে। সিঁড়ির রেলিঙের উপর সারিসারি তাহাদের শুষ্কবস্ত্র রাখা হইয়াছে। পাইপ্‌ হইতে সবেগে কলকলধ্বনিতে টবের মধ্যে জল পড়িতেছে। ছেলেদের মধ্যে কেহ সিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া তেল মাখিতেছে, কেহ টবের নিকট দাঁড়াইয়া মগে করিয়া জল তুলিয়া মাথায় ঢালিতেছে, কেহ পাইপের আর একটা মুখ খুলিয়া দিয়া তাহার নীচে বসিয়া আরামে স্নান করিতেছে। একটি ছেলে তাহার ঘোর কৃষ্ণবর্ণের উপর সাহেবী-রঙ্‌-ফলানোর আশায় দৃঢ় অধ্যবসায়ের সহিত সাবান মাখিতেছে। আর একটি ছেলে তাহা দেখিয়া বলিল—"নরেনবাবু, এ তো আর চুল-কাটান নয় যে, নাপিতকে পয়সা দিলেই ঘাড়ের দিকে ছোট, কপালের দিকে বড় করিয়া কাটিয়া দিবে। এ যে স্বয়ং বিধাতার হাতের তুলির পোঁচ, সাবান ঘষিলে কি হবে?" ইহা শুনিয়া, যে যেখানে ছিল, সকলে হাসিয়া উঠিল।

একটি ঝি বাজার হইতে আসিয়া রন্ধুই-ঘরের সম্মুখে তাহার চুপড়ি নামাইল। বামুন-ঠাকুর নিতান্ত গরম হইয়া বলিল—"ঝি, তোমার কিরকম আক্কেল বল ত? এত

দেরি কোরে এলে কেন? বাবুদের মাছের ঝোল কখন্ রেঁধে দেব বল দেখি?" ঝিও ক্রোধভরে বলিল—"মিন্‌সে বলে কি? আমি কি বাজারে গিয়ে শুয়ে ঘুমুচ্ছিলুম? রাস্তা যেমন পিছিল হয়েছে—চলা যায় না। একবার পা ফস্‌কে পড়ে' গিয়ে দ্যাকো আমার কি দশা হয়েছে।" এই বলিয়া ঝি বামুন-ঠাকুরের কারুণ্যলাভের প্রত্যাশায় তাহার কাদামাখা কাপড় দেখাইল। বামুনঠাকুর কিন্তু কিছুমাত্র সমবেদনা প্রকাশ না করিয়া একটু হাসিল। কারণ ঝিটি স্থূলাঙ্গী বলিয়া ঠাকুর তাহাকে অনেকসময়ে উপহাস করিয়া থাকে। উত্তপ্ত কড়াতে তেলের ছিটা পড়ার ন্যায় ঝি অমনি রাগে জ্বলিয়া-উঠিয়া বলিল—"ড্যাক্‌রা—অলপ্পেয়ে—আবার দাঁত বের কোরে হাঁসে!" এই বলিয়া তাহাকে অধঃপাতে পাঠাইল।

এই সময়ে বীরেন্দ্রনামক মস্তকের বাম-পার্শ্বে টেরিকাটা, শার্টপরা, চস্‌মাধারী একটি ছেলে বামহস্তে হ্যাম্‌লেট্ খুলিয়া পড়িতে পড়িতে নীচে নামিয়া আসিল এবং "আমার ল-ক্লাসের বেলা হোলো—বামুনঠাকুর, ভাত বাড়ো—ঝি, জায়গা কর" বলিয়া আদেশ-প্রচার করিল। সেই বৃদ্ধা ঝি বলিল, "বাবা, একটু দেরি কর। ঠাকুর, বীরেনবাবুর মাছখানা চট্ কোরে ভেজে দাও। উনি শুধু ডালভাত খেয়ে কি কোরে কালেজে যাবেন।" এই বলিয়া ঝি তাড়াতাড়ি মাছ কুটিয়া দিল এবং ঠাকুর উনুনে কড়া চড়াইল।

ঠিক এই সময়ে ডাকপিয়ন্‌মহাশয় "বাবু, চিঠ্‌ঠি" বলিয়া সিঁড়ির নীচে আসিয়া দাঁড়াইলেন। অমনি ছেলের দলে এক মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। তাহারা যে যেখানে ছিল, সকলে আসিয়া পিয়ন্‌কে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। পূর্ব্বে মেসে পিয়নের আগমন একটি বিশেষ উত্তেজনাজনক ঘটনা ছিল। এখন ঘণ্টায়-ঘণ্টায় চিঠি বিলি করার নিয়ম হওয়ায় ডাকওয়ালা কখন্ চোরের মত আসিয়া একআধখানা চিঠি জানালা দিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া যায়, তাহার কেহ খোঁজও রাখে না। কিন্তু পূর্ব্বে প্রাতঃকালে যখন একবারমাত্র চিঠিবিলির ব্যবস্থা ছিল, তখন পিয়ন্‌মহাশয়ের আবির্ভাবটি Review of Reviews পত্রিকার দৈনিক ঘটনালিপিতে উল্লিখিত ঘটনাবলীর ন্যায় একটি গুরুতর ঘটনা বলিয়া পরিগণিত হইত।

বীরেন সর্ব্বাগ্রে আসিয়া চিঠিগুলি হস্তগত করিয়াছিল। সে এক এক জনের নাম পড়িয়া চিঠিগুলি বিলি করিতে লাগিল। একখানা চিঠির খামের উপর "শ্রীযুক্ত বাবু বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সমীপেষু" এইরূপ লেখা ছিল। বীরেন সে চিঠিখানি অমনি পকেটে পূরিল। তাহার সহপাঠী রাখাল বলিল—"কি হে বীরেন, তোমার 'সমীপেষু' চিঠি বুঝি?" ইহা বলিতে বলিতে বীরেন অবশিষ্ট চিঠিগুলি অন্যের হাতে দিয়া এক-লম্ফে উপরে উঠিয়া গেল। রাখাল সেই চিঠি কাড়িয়া লইবার জন্য তাহার পশ্চাৎ ধাবমান হইল। বলা বাহুল্য, এ চিঠিখানি বীরেনের প্রণয়িনীর করকমলাঙ্কিত।

শরৎ একখানা পোষ্টকার্ড পড়িয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—"উপেনের বিয়ে!—উপেনের বিয়ে! এই ২৫শে শ্রাবণ।"

এই কথা শুনিয়া দুইতিনজনে তাহার

হাত হইতে চিঠিখানি কাড়িয়া লইবার জন্য হাতাহাতি আরম্ভ করিল ও একজন তাহা কাড়িয়া লইয়া পড়িতে লাগিল। চিঠিপড়া শেষ হইলে সকলের মধ্যে এক তুমুল আনন্দ-কোলাহল উত্থিত হইল। "উপেনের বিয়ে — উপেনের বিয়ে" এই চীৎকারধ্বনিতে সমগ্র বাড়ীটি প্রতিধ্বনিত হইল। উপেন সিঁড়ির নীচে দাঁড়াইয়া তেল মাখিতেছিল। ছাত্রগণ যে যেখানে ছিল, সকলে আসিয়া উপেনকে সপ্তরথীর ন্যায় বেষ্টন করিয়া ফেলিল এবং উচ্চহাসি, উলুধ্বনি, সস্নেহ চপেটাঘাত প্রভৃতি প্রথমযৌবনসুলভ-স্ফূর্ত্তি-যুক্ত আনন্দব্যঞ্জক ব্যাপারদ্বারা তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। একটি ছেলে রন্ধনশালা হইতে কিঞ্চিৎ বাটাহলুদ আনিয়া তাহা একটা মগের মধ্যে গুলিয়া উপেনের গায় ঢালিয়া দিল। বীরেনবাবু এতক্ষণ দরজা বন্ধ করিয়া সেই "সমীপের" চিঠি পাঠ করিতেছিলেন, তিনিও স্থির থাকিতে না পারিয়া একদোয়াত লালকালী হাতে করিয়া নীচে নামিয়া আসিলেন এবং উপেনের গায় তাহা ঢালিয়া দিলেন। উপেন হাসিয়া বলিল—"এ বুঝি তোমার 'সমীপের' চিঠিপড়ার ফল?" ইহা শুনিয়া সকলে উচ্চ-হাস্য করিয়া উঠিল। এইরূপে মেসের সব ছেলে মিলিয়া উপেনের "গায় হলুদে"র কাজ তৎক্ষণাৎ শেষ করিয়া ফেলিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ক্ষুদ্র ফরিদপুরসহরটিকে একটি বৃহৎ পল্লী বলিলেই ঠিক হয়। তাহার অবিরল-সন্নিবিষ্ট স্নিগ্ধচ্ছায়াবহুল বটবৃক্ষশ্রেণী এবং শ্যামল-শষ্পমণ্ডিত প্রান্তরের শোভা অতুলনীয়। ফরিদপুরের ঠিক দক্ষিণে "ঢোলসমুদ্র"নামক একটি প্রকাণ্ড বিল ছিল। এই দশপনর বৎসরের মধ্যে পদ্মার বালী পড়িয়া তাহা ভরিয়া গিয়াছে। এক সময়ে যে তরঙ্গসঙ্কুল বিশাল হ্রদ পাড়ি দিতে মাঝিগণ নৌকার "আগা "গলুই"তে "দুধপানি" দিয়া পীরের নামে সিন্নী মানস করিত, আজ সেখানে গ্রাম বসিয়াছে। ইহা বিচিত্রলীলাময়ী পদ্মার একটি অদ্ভুত লীলা।

এই ঢোলসমুদ্রের দক্ষিণ পাড়ে ফরিদপুর হইতে প্রায় তিনমাইল দূরে কাজলপুর গ্রাম অবস্থিত। গ্রামটি খুব প্রাচীন। প্রাচীন বলিয়া আম-বাঁশ-তাল-তেঁতুল-বট-প্রভৃতি-তরুময় নিবিড়বন-সমাকীর্ণ। এ গ্রামে ভদ্রলোকের বাস নিতান্ত অল্প। কেবল কাজলপুর বলিয়া নয়, বাঙ্গলার সর্ব্বত্রই এই একই দশা। অনেক পুরাতন গ্রামে বনজঙ্গলের যে পরিমাণে বৃদ্ধি, প্রাচীন সম্ভ্রান্তবংশসকলের সেই অনুপাতে ক্ষয়। এ গ্রামের অধিকাংশ লোকই মুসলমান ও নমঃশূদ্র কৃষিজীবী। কায়স্থবংশসম্ভূত রমানাথ দত্তই একমাত্র সম্পন্ন গৃহস্থ। তিনি এ গ্রামের তালুকদার। তাঁহারা চারি সহোদর ছিলেন—দ্বারকানাথ, রমানাথ, হরিনাথ ও যদুনাথ। ইঁহাদের মধ্যে কেবল রমানাথই জীবিত আছেন, আর তিন ভাই অকালে মরিয়া গিয়াছেন। জ্যেষ্ঠ দ্বারকানাথ ফরিদপুরে মোক্তারি করিতেন, এখন তাঁহার বিধবা স্ত্রী জয়দুর্গা ও তিনটি কন্যা বর্ত্তমান। হরিনাথ ফরিদপুরে কালেক্টরির পেস্কার ছিলেন, তাঁহার বিধবা স্ত্রী, তিনটি পুত্র ও দুইটি কন্যা জীবিত। যদুনাথ অল্পবয়সে কালগ্রাসে পতিত হন; তাঁহার বিধবা স্ত্রীও

একটি সন্তান রাখিয়া মারা গিয়াছেন। রমানাথই এখন সংসারের কর্ত্তা। তাঁহার বয়স ৬৭বৎসর হইবে। তাঁহার দুইটি পুত্র— মহেন্দ্র ও উপেন্দ্র। মহেন্দ্র ফরিদপুর জজকোর্টে ৫০৲টাকা মাহিয়ানায় কেরাণীগিরি করেন। উপেন্দ্র এবার ফরিদপুর জেলাস্কুল হইতে এন্ট্রান্‌স্‌পরীক্ষায় ২০৲টাকা বৃত্তি লইয়া কলিকাতা প্রেসিডেন্‌সি কলেজে পড়িতেছে। হরিনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র দেবেন্দ্র উপেন্দ্রের বড় ছিল;—একটি শিশুসন্তান ও বিধবা স্ত্রী শরৎশশীকে রাখিয়া তিনবৎসর হইল কলিকাতায় কলেরারোগে মারা গিয়াছে। তাহার ছোটটি জ্ঞানেন্দ্র এবার ফরিদপুরস্কুলে দ্বিতীয়শ্রেণীতে পড়িতেছে।

দুইটি কারণে এই দত্তপরিবার এতদ্দেশে যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। ইঁহাদের অতিথিসৎকারবিষয়ে উদারতা দেশ-প্রসিদ্ধ। রমানাথের পিতা ৺ রাধামাধব দত্ত মহাশয়ের মৃত্যুকালে পুত্রগণের প্রতি আদেশ ছিল—"বাবারা, দেখিও যেন অতিথি কখন আমার বাড়ী হইতে ফিরিয়া না যায়!" তাঁহার এই আদেশ পুত্রগণ এযাবৎ কায়-মনোবাক্যে প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন। জ্যেষ্ঠ দ্বারকানাথ ফরিদপুরে মোক্তারি করিয়া অনেক টাকা উপার্জ্জন করিতেন। তাহার সমস্তই তিনি নানাপ্রকার পুণ্যকার্য্যে ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর পর হইতে সংসারে অনাটন আরম্ভ হইয়াছে। তাঁহাদের ভূসম্পত্তিতে বার্ষিক ১২০০৲ টাকা আয়, এতদ্ভিন্ন খামার জমিতে বিস্তর ধান পাওয়া যায়। এই আয়দ্বারা সংসারের সম্পূর্ণ খরচনির্ব্বাহ হয় না। পরিবারে লোকসংখ্যা বিশটি, ইহা ছাড়া অতিথি-অভ্যাগত ও কুটুম্ব প্রায় লাগিয়াই আছে। এই গ্রামটি ফরিদপুর যাওয়ার পথে পড়ে বলিয়া অনেক মামলামোকদ্দমাকারী লোক সন্ধ্যার পর তাঁহাদের বাড়ীতে আসিয়া রাত্রি-বাস করে। এখানে আসিলে কেহ বিমুখ হইয়া প্রত্যাগত হইবে না, জানিয়া অনেকে তাঁহাদের আতিথ্যধর্ম্মের অপব্যবহার করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হয় না। এই অতিথিসৎকার ভিন্ন দুর্গোৎসব, দীপান্বিতা, দোল প্রভৃতি "বারমাসের তেরপার্ব্বণ", ব্রত-নিয়ম, ব্রাহ্মণভোজনাদি যথানিয়মে অনুষ্ঠিত হয়। এই সকল ব্যয়ের জন্য দত্তমহাশয়ের বিস্তর টাকা ঋণ হইয়াছে। মহেন্দ্র কেরাণী-গিরি করিয়া যে মাহিয়ানা পান, তাহাতে তাঁহার বাসাখরচ চলা কঠিন। তাঁহার দ্বারা সংসারের বিশেষ কোন আনুকূল্য হয় না, তবে তাঁহার বাসায় থাকিয়া অনেকগুলি ছেলে লেখাপড়া শিক্ষা করিতেছে, ইহাই লাভ।

অতিথিসৎকার ভিন্ন দত্তপরিবারের সুখ্যাতির আরও একটি বিশেষ কারণ আছে। তাহা এই পরিবারস্থ সকলের নিরবচ্ছিন্ন একতা ও হৃদয়ের প্রীতিস্নিগ্ধ ভদ্রতা। এজন্য এই পরিবারটিকে আদর্শ হিন্দুপরিবার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দত্তমহাশয়েরা চারি সহোদর চারি দেহে এক আত্মা ছিলেন। তাঁহাদের সহধর্ম্মিণীগণও যেন চারিটি সহোদরা ভগিনী। এই পরিবারে কেহ কখন স্বার্থপরতা-হিংসা-দ্বেষ-কলহ দেখে নাই। পুত্রকন্যাবধূগণের চরিত্রও সেই একই ছাঁচে ঢালা। দ্বারকানাথের জীব-

দেশান্তেও রমানাথই সংসারের কর্ত্তৃত্ব করিতেন, কারণ দ্বারকানাথ অধিকাংশ সময়ই কর্ম্মস্থলে থাকিতেন। কিন্তু রমানাথ কর্ত্তা হইলেও দ্বারকানাথের সহধর্ম্মিণী জয়দুর্গাই প্রকৃতপক্ষে এ সংসারের কর্ত্রী ও গৃহিণী। রমানাথ অনেক বিষয়েই তাঁহার পরামর্শ লইয়া কাজ করেন। অন্তঃপুরেও অবশ্য সকলেই তাঁহার মতে চলেন, কিন্তু তিনি স্নেহের ডোরে সকলকে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার নিজের কোন পুত্র নাই,—রমানাথ ও হরিনাথের পুত্রগণই তাঁহার পুত্রস্থানীয়। সেই পুত্রগণও তাঁহাকে নিজ নিজ গর্ভধারিণী জননীর মত দেখেন। তিনি সকলেরই "বড়-মা"। এমন কি, বাড়ীর ভৃত্যগণেরও তিনি "বড়-মা"। আমরা তাঁহাকে "বড়গিন্নী" বলিয়া ডাকিব।

গৃহিণীপনাতে জয়দুর্গা বিশেষ নিপুণা। তাঁহার কার্য্যকুশলতায় এই স্বল্প আয় ও বহুব্যয়ের সংসার বিনাক্লেশে একরূপ চলিয়া যাইতেছে। "পাইলাম না, খাইলাম না" বলিয়া কাহাকেও কখন আক্ষেপ করিতে শুনা যায় না। যখন যে জিনিষটির প্রয়োজন হয়, তাহা তিনি অনায়াসে বাহির করিয়া দিতে পারেন। রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় দশজন অতিথি আসিয়া উপস্থিত হইল; রমানাথ ভাবিয়া আকুল হইলেন, ঘরে হয় ত চাল-ডাল যথেষ্টপরিমাণে নাই; কারণ বড়গিন্নী পূর্ব্বদিন তাঁহাকে অনেক বিষয়ের অভাব জানাইয়াছিলেন। কিন্তু অতিথি আসিবামাত্র বড়গিন্নী প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী সমস্ত বাহির করিয়া দিলেন। এইজন্য রমানাথ তাঁহার ভাণ্ডারকে আদর করিয়া "অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার" বলেন।

দত্তদিগের বাড়ীটি উত্তরদক্ষিণে লম্বা—তিন খণ্ডে বিভক্ত। "বাড়ী" বলিতে পাকা কোঠা নহে—অনেকগুলি মাটির ভিটি, দরমার বেড়া ও খড়ের চালযুক্ত ঘরের সমষ্টি। দক্ষিণের খণ্ডে চারিখানি ঘর—তাহার উত্তরের খানি চণ্ডীমণ্ডপ, দক্ষিণের খানি বৈঠকখানা, অন্য দুইখানি খুব লম্বা ঘর,—অতিথিশালারূপে ব্যবহৃত হয়; তাহাদের নাম "নাকারি ঘর"। এই গৃহচতুষ্টয়ের মধ্যস্থলে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ; পূর্ব্বে এখানে একখানা বড় নাটমন্দির ছিল—কয়েকবৎসর হইল, তাহা পড়িয়া গিয়াছে, আর তোলা হয় নাই। বাড়ীর মধ্যখণ্ডের মধ্যস্থলেও বিস্তৃত উঠান; তাহার চারিদিকে চারিখানি বড়-বড় ঘর। সেগুলি বাসগৃহরূপে ব্যবহার করা হয়। উঠানের উত্তরপশ্চিম ও পূর্ব্বদক্ষিণ কোণে আর দুইখানা ছোট ঘর আছে; তাহা আবশ্যকমত শয়নগৃহরূপে ব্যবহৃত হয়।

উত্তরের খণ্ডে দুইখানা রন্ধনশালা, ঢেঁকিশালা, এবং আরও ২।৩খানা ছোট ছোট ঘর আছে। বাড়ীর উত্তরে ও পশ্চিমে আম-কাঁঠাল-নারিকেল-সুপারি-বাঁশ-প্রভৃতি-বৃক্ষপরিপূর্ণ বাগান। অন্দরখণ্ডের পূর্ব্বদিকে একটি ছোট পুষ্করিণী, তাহার জল দুর্গন্ধময় এবং পানায় পরিপূর্ণ। বহির্ব্বাটীর দক্ষিণে একটি বড় পুষ্করিণী আছে, তাহার জল একসময়ে খুব ভাল ছিল, এখন সংস্কারাভাবে কিছু খারাপ হইয়াছে, তবে এই জলই গ্রামবাসিগণের একমাত্র সম্বল। এই পুকুরের উত্তর পাড়ে ও বৈঠকখানার দক্ষিণে একটি ফুলবাগান। তাহাতে জবা, টগর, কাঁঠালিচাঁপা, মল্লিকা, রজনীগন্ধা, অপরাজিতা, রক্তকরবীর প্রভৃতি ফুল ফুটিয়া আছে।

সমগ্র বাড়ীটি খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, ঘরের দাওয়াগুলি সুমার্জ্জিত, শাদা ধব্‌ধবে। বাড়ীটি দেখিলেই বোধ হয়, যেন এখানে লক্ষ্মীর দৃষ্টি আছে। আর তাহা না থাকিবেই বা কেন? যেখানে কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, সর্ব্বজনপ্রীতি ও চিত্ত-প্রসাদ, সেখানেই কমলার কৃপা দেদীপ্যমান। যিনি কমলাকে কেবল ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী বলিয়া জানেন, তিনি ভ্রান্ত। লক্ষ্মীর আর একটি নাম "চঞ্চলা"। এ নামটি কেবল তিনি বিদ্যুতের ন্যায় চঞ্চল বলিয়া নহে। যেখানে চঞ্চলতা অর্থাৎ উদ্যম ও কর্ম্মশীলতা এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও শান্তি আছে, সেখানেই তিনি বিরাজমানা বুঝিতে হইবে। আর যেখানে জড়তা ও আলস্য এবং তাহার অনুচর স্বার্থপরতা ও অশান্তি, কমলা তাহার ত্রিসীমায়ও পদার্পণ করেন না একদিন কর্ম্মশীল ও শান্তিসুখময় ভারত তাঁহার পীঠস্থান ছিল। কিন্তু হায়! আজ তাহা নিরবচ্ছিন্ন জড়তার ক্রোড়ে সুষুপ্তিমগ্ন!

অপরাহ্ণ।

জীবনের অপরাহ্ণে খেয়া পরিহরি,
ঘাটে এনে বাঁধিয়াছি জীর্ণ মোর তরি।
দাঁড় তুলে, পাল খুলে, বসেছি নীরবে;
প্রতীক্ষা করিয়া আছি কবে সন্ধ্যা হবে।
এতবার খেয়াঘাটে করি আনাগোনা,
কাঠের তরণী মোর নাহি হ'লো সোনা।
তরি বেয়ে কেটে গেল কতই বরষ,
সোনা-করা চরণের পাই নি পরশ।
আজি এই দিনশেষে আঁধারের মাঝে,
কার মৃদু আহ্বানের সুর কানে বাজে।
আমার এ ভাঙা নায়ে কে হইবে পার!
যদিই বা ডুবে তরি; জান ত সাঁতার?
নাই যদি জান, তরি যায় ডুবে যদি—
নিতল শীতল কোল পেতে দিবে নদী।

শ্রীজঃ—

ছাত্রদিগের অভিভাষণ।*

সমবেত ছাত্রমণ্ডলি, আমি আপনাদিগকে মাতৃভাষার ও মাতৃভাষার সাহিত্যের সেবা করিতে আহ্বান করিতেছি। কিন্তু এ সম্বন্ধে আপনাদিগের নিকট অনুরোধ বা অনুযোগ করিবার পূর্ব্বে একটা বিষয়ে জবাবদিহি আবশ্যক। শুনিয়াছি, সেন্‌সস্ রিপোর্টে একবার একজন লিখিয়াছিলেন, দুগ্ধপোষ্য শিশুর বৃত্তি বা ব্যবসায় 'মাতার স্তন্যপান'। সেইরূপ অনেক ছাত্রের বিশ্বাস যে, তাঁহাদের বৃত্তি বা ব্যবসায় স্কুলের পড়া মুখস্থ করা। অনেক পাকা শিক্ষক ও বিজ্ঞ অভিভাবকও এই মতে সায় দেন। অবশ্য, ছাত্রগণ যদি এই সংক্ষিপ্ত অথচ সাঙ্ঘাতিক যুক্তি দেন যে, তাঁহারা পড়াশুনা করেন পাস্ করিবার জন্য এবং পাস্ করেন চাকরী পাইবার জন্য, ইহার অতিরিক্ত আর তাঁহারা কিছুই করিতে প্রস্তুত নহেন, তাহা হইলে আমরা কাজে-কাজেই নিরুত্তর। এইরূপে সংসারী লোকও বলিতে পারেন যে, তাঁহাদের কাজ জীবিকা অর্জ্জন করা, সংসারধর্ম্ম প্রতিপালন করা এবং পুত্রকন্যার বিবাহ দেওয়া। স্ত্রীলোকেরা বলিতে পারেন, তাঁহাদের কাজ সংসারের গোছগাছ করা এবং সন্তানধারণ ও সন্তান-পালন করা। এইভাবে সকলেই সংক্ষেপে স্ব কর্ত্তব্য শেষ করিতে পারেন। কিন্তু আমরা জানি, ছাত্রগণ অষ্টপ্রহর নবধার-নিষিদ্ধবৃত্তি হইয়া পড়াশুনায় নিবিষ্ট থাকেন না, তাঁহাদের আমোদপ্রমোদ, ও অন্যান্য কাজের জন্য অবসরের অভাব নাই। এ অবস্থায় আমাদের আহ্বান নিতান্ত অন্যায় আব্দার নহে।

এ স্থলে হয় ত কোন ব্যঙ্গরসিক বলিয়া উঠিবেন, ছাত্রদিগের চারিদিক্ হইতে আহ্বান, তাহারা কোন্‌দিকে যায়? তিনি হয় ত একটি ছবি আঁকিবেন, সম্মুখে অজাতশ্মশ্রু বালক, মস্তকে স্তরে-স্তরে ন্যস্ত পাঠ্যপুস্তক ও অর্থপুস্তকের বৃহৎ বোঝার ভারে প্রপীড়িত; একদিকে ধর্ম্মপ্রচারক তাহার দক্ষিণকর্ণে সত্যধর্ম্মের অমৃতমন্ত্র ঢালিতেছেন, অপরদিকে রাজনীতিবিশারদ তাহার বামকর্ণের পটহ বিদীর্ণ করিয়া তারস্বরে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিতে আহ্বান করিতেছেন, আবার অপরদিকে সমাজসংস্কারক তাহার চোখে আঙুল দিয়া সামাজিক কুপ্রথা-কদাচার দেখাইয়া দিতেছেন, এবং আর-এক দিকে স্বদেশী-আন্দোলনকারী তাহার হৃদয়ে স্বদেশ-প্রীতি জাগাইবার জন্য বিধিমত চেষ্টা করিতেছেন; সর্ব্বশেষে আবার সাহিত্য-পরিষদ্ তাহার হাতে কলম গুঁজিয়া দিয়া বলিতেছেন, 'বৎস, সাহিত্যের সেবা কর।' এখন বেচারা কোন্ পথে যাইবে?

ইহার দুইটা উত্তর হইতে পারে। প্রথম

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের উদ্যোগে গত বৎসর হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাতে ছাত্রদিগের কলিকাতা হইতে গৃহে ফিরিবার সময় তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া একটি সভা হয়। এই সভায় প্রদত্ত বক্তৃতা প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হইল।

উত্তর, যাহার যেদিকে রুচিপ্রবৃত্তি, সে সেই দিকে যাক্। যাহার ধর্ম্মভাব প্রবল, সে ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনা করুক্, যাহার সমাজ-সংস্কারের দিকে ঝোঁক, সে সেই দিকেই শক্তিনিয়োগ করুক্; যাহার সাহিত্যরচনার ক্ষমতা আছে, সে সেই দিকে মনঃসংযোগ করুক্, ইত্যাদি। কিন্তু আমরা এ উত্তরে সন্তুষ্ট নহি। আমরা বলি, সকলকেই অল্প-বিস্তর সব কাজই করিতে হইবে। কেন না, মানসিক বৃত্তিসকলের সমবিকাশ (harmonious development) না হইলে প্রকৃত শিক্ষা বা চরিত্রগঠন হয় না। রাশীকৃত পুস্তক আয়ত্ত করার নাম প্রকৃত শিক্ষা নহে। ছাত্রজীবনে পুস্তক পাঠ করিয়া জ্ঞানলাভ করাই ছাত্রগণের মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, সন্দেহ নাই; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দেশের, সমাজের, সাহিত্যের প্রতিও কর্ত্তব্যপালন করিতে হইবে। নতুবা প্রকৃত মনুষ্যত্বলাভ অসম্ভব। পাঠাভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে এ সমস্ত কার্য্য করার কোন বাধা নাই; ছাত্রগণের অবসরের নিতান্ত অভাব নাই।

বোধ হয়, এতক্ষণে পূর্ব্বোল্লিখিত আপত্তির খণ্ডন করিতে সমর্থ হইয়াছি। এখন আপনাদিগকে সাহিত্যের তরফ হইতে গোটাকতক কথা বলিতে চাহি।

আপনারা অনেকেই ইংরেজজাতির ইতিহাস পড়িয়াছেন, কিন্তু বোধ হয় অনেকের ভাগ্যে ইংরেজিসাহিত্যের ইতিহাস পড়া ঘটে নাই। আপনারা জানেন, ইংরেজ বাহুবলে পৃথিবীর সব-কয়টি মহাদেশে প্রভুত্ববিস্তার করিয়াছে, তবে কোথাও অল্প, কোথাও বেশী। কিন্তু আপনারা ইহা জানেন কি যে, ইংরেজ লেখনীর জোরে পৃথিবীর সর্ব্বস্থানে অধিকারস্থাপন করিয়াছে? আজ আমরা যে ইংরেজের অধীন বলিয়া ইংরেজের ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়ন করিতেছি, তাহা নহে; পৃথিবীর এমন কোন সভ্যদেশ নাই, যেখানে ইংরেজের ভাষা ও সাহিত্য সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত। বোধ হয় ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, ফ্রান্স, জর্ম্মণী, আমেরিকা, রুশিয়া প্রভৃতি সভ্যদেশে এমন কোন বিদ্বান্ ব্যক্তি নাই, যিনি ইংরেজের ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ। আপনারা কখন ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি, কেমন করিয়া ইংরেজের সাহিত্য এত বড় হইল? ইংরেজিসাহিত্যের ইতিহাস পড়িলে আমরা এই উত্তর পাই যে, ইংরেজজাতি সভ্যতর জাতির সংস্পর্শে আসিয়া তাহাদিগের সাহিত্যের এতাদৃশ উন্নতি করিতে পারিয়াছে। এমন এক সময় ছিল, যখন ইংরেজজাতি সভ্যতাহিসাবে অনেক নীচে ছিল, সে সময়ে তাহারা সভ্যতার কেন্দ্র ইতালী ও ফ্রান্স হইতে সাহিত্যের আদর্শ লাভ করিয়াছে,— ইতালীয় সভ্যতার ভিতর দিয়া প্রাচীন গ্রীক্ ও রোমক সাহিত্যে প্রবেশাধিকার পাইয়াছে। চশারের আমলেও এইরূপ ঘটিয়াছে, শেক্‌স্‌পীয়র্-মিল্‌টনের আমলেও এইরূপ ঘটিয়াছে। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে ইংরেজের সাহিত্য এত বিত্তবশালী হইয়াছে, কিন্তু এখনও ফ্রান্স্ ও জর্ম্মণী হইতে সাহিত্যের আদর্শগ্রহণ চলিতেছে, তবে এখন ইংরেজি-সাহিত্য হইতেও তত্তৎসাহিত্যে আদর্শগ্রহণ না হইতেছে, এমন নহে।

তিন প্রকারে সাহিত্যের পরিপুষ্টি ঘটে—অনুবাদ, অনুকরণ ও মৌলিকতা। সাধারণত ভাষার ও সাহিত্যের হীনাবস্থায় অনুবাদ ও অনুকরণের বিশেষ প্রয়োজন। আমি এক-প্রকার আশৈশব ইংরেজিসাহিত্য চর্চ্চা করিয়াছি এবং গত পনরবৎসর ধরিয়া ইংরেজি-সাহিত্যের অধ্যাপনা করিতেছি। সুতরাং ইংরেজিসাহিত্যের ইতিহাস হইতে কি শিক্ষা পাওয়া যায়, তাহাই আপনাদের সমক্ষে বলিব। আপনাদের বোধ হয় অবিদিত নাই যে,প্রাচীন-কালে ইংলণ্ডের বিখ্যাত রাজা অ্যাল্‌ফ্রেড্ (Alfred the Great) ল্যাটিন্‌ভাষা হইতে কয়েকখানি গ্রন্থ অনুবাদ করেন। ইংরেজি-ভাষার হীনাবস্থায় আদিকবিগণ ফরাসী ও ইতালীয় ভাষা হইতে কাব্যাদির অনুবাদ বা অনুকরণ করিয়া বর্ত্তমান বিরাট্‌সাহিত্যের ভিত্তিস্থাপন করিয়াছেন। কুইন্ এলিজাবেথের ও কুইন্ অ্যানের রাজত্বসময়েও অনেক উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ল্যাটিন্ ও গ্রীক্ গ্রন্থের ইংরেজিভাষায় অনুবাদ হইয়াছে। এইরূপে জর্ম্মান্‌সাহিত্যের আধুনিক গৌরবের সূত্রপাতকালে অনেক ইংরেজি ও ফরাসী নাটক ও কাব্য ঐ ভাষায় ভাষান্তরিত হইয়াছিল। আমাদের দেশে ইংরেজিপ্রভাবের পূর্ব্বে যে সাহিত্য ছিল, সে সাহিত্যেও দেখিতে পাই, সংস্কৃতসাহিত্যের উৎকৃষ্ট গ্রন্থগুলির অনুবাদ বা অনুকরণ বহুল-পরিমাণে রহিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীরামদাসের মহাভারতের উল্লেখ করিতে পারি। কবিকঙ্কণ চণ্ডী ও ঘনরামপ্রণীত শ্রীধর্ম্মমঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থও আমার বিবেচনায় পুরাণগুলির আদর্শে রচিত, যদিও সেগুলি কোন গ্রন্থবিশেষের অনুবাদ নহে। তাহার পর, ইংরেজ-আগমনের পরে যে আধুনিক বাঙ্‌লাসাহিত্যের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহারও ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিতে গেলে দেখা যায় যে, আধুনিক বাঙ্‌লা-সাহিত্যের জন্মদাতা বিদ্যাসাগরমহাশয় ও তাঁহার সম্প্রদায় অনেক ইংরেজি ও সংস্কৃতগ্রন্থ মাতৃভাষায় অনুবাদ করিয়া নবীনসাহিত্যের সূচনা করেন। ইহাতে অল্পকালেই ভাষা ও সাহিত্যের পুষ্টি হইয়াছে।

কিন্তু ভাষার হীনাবস্থাতেই যে অনুবাদ ও অনুকরণের প্রয়োজন থাকে, উন্নত অবস্থায় থাকে না, ইহা বিবেচনা করা ভুল। যদিও এখন ইংরেজি, জর্ম্মান্, ফরাসী প্রভৃতি ভাষার সাহিত্য উন্নতির উচ্চসোপানে উঠিয়াছে, তথাপি এখনও পর্য্যন্ত প্রাচীন গ্রীক্ ও ল্যাটিন্ ভাষা হইতে উৎকৃষ্ট গ্রন্থের অনুবাদের চেষ্টা সমভাবে চলিতেছে। তদ্ভিন্ন যখনই কোন ভাষার একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক নবপ্রকাশিত হয়, তাহার তৎক্ষণাৎ য়ুরোপীয় অপরাপর ভাষায় অনুবাদের বন্দোবস্ত হয়। এইরূপে সভ্যজগতের সকল জাতিই স্বস্ব সাহিত্যের পরিপুষ্টিসাধনে যত্নশীল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজকাল আমাদের ভাষার লেখকেরা মৌলিকশক্তির প্রভাবে নানারূপ গ্রন্থ রচনা করিতে সমর্থ হইতেছেন বলিয়া অনুবাদের দিকে আর তত ঝোঁক দেখা যায় না। শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র দাস রঘুবংশের উৎকৃষ্ট পদ্যানুবাদ করিয়াছেন এবং প্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবী শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর অনেকগুলি সংস্কৃত ও বৈদেশিক নাটকের সুপাঠ্য অনুবাদ করিয়া-ছেন। ইহা ছাড়া আর বড় উল্লেখযোগ্য অনুবাদ দেখিতে পাই না। অতএব বলা

যাইতে পারে, এক হিসাবে বঙ্গভাষা ও সাহিত্য দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে। জগতের যাবতীয় উন্নতভাষার উৎকৃষ্ট গ্রন্থগুলি ভাষান্তরিত হইয়া বঙ্গসাহিত্যের কলেবর পুষ্টি করিতে পারিতেছে না। ছাত্রবৃন্দ, আমি আপনাদিগকে এইদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতে বলি। ইংলণ্ডে অনেকসময়ে দেখা যায়, ছাত্রগণ গ্রীক্‌ বা রোমক সাহিত্য হইতে কোন-একটি কবিতা বা কাব্যাংশ লইয়া ইংরেজি ছন্দে অনুবাদ করেন বা তাহার ছায়া-অবলম্বনে একটু নূতনতর কবিতা রচনা করেন। উচ্চশিক্ষার ফলে আপনারাও দুইটি অতুল-বিভবশালী সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হইয়াছেন,—সংস্কৃত ও ইংরেজি। এই দুই সাহিত্যের অমূল্য গ্রন্থগুলির অনুবাদ ও অনুকরণ করিয়া দেশের ও সাহিত্যের মুখ উজ্জ্বল করুন। অবশ্য, সাহিত্যক্ষেত্রে অনুবাদ ও অনুকরণ অপেক্ষা মৌলিকতার আদর বেশী। কিন্তু অনুবাদ বা অনুকরণকার্য্যেও মৌলিকতার অবসর আছে, এ সকল কার্য্যেও প্রতিভার প্রয়োজন, এ কথাটি আপনারা ভুলিবেন না। আক্ষরিক অনুবাদ বা মাছি-মারা কেরাণীর মত নকল করিয়া সাহিত্য-সৃষ্টি করা চলে না, সেরূপ গ্রন্থ অপাঠ্য ও স্থানে স্থানে অবোধ্য হইয়া পড়ে। অতএব অনুবাদ বা অনুকরণ নিতান্ত নীচকার্য্য মনে করিয়া অবজ্ঞা করিবেন না। বিদ্যাসাগর-মহাশয়ের 'সীতার বনবাস' ধরিতে গেলে ভবভূতির উত্তরচরিতনাটকের অনুবাদ, কিন্তু তথাপি ইহা মৌলিকরচনা অপেক্ষা হীন নহে। বাঙ্গলাসাহিত্যে ইহার স্থান অতি উচ্চ। আমার স্বগ্রামবাসী ৺তারাশঙ্কর তর্করত্নের কাদম্বরীও একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। ইংরেজিসাহিত্যে পোপের হোমারের অনুবাদ প্রসিদ্ধনামা। টেনিসনের অনেকগুলি কবিতা (Œnone, Demeter and Persephone ইত্যাদি) গ্রীককবিতার ছায়া-অবলম্বনে লিখিত, অথচ সেগুলিতে মৌলিকতার অভাব নাই।

অনেকের ধারণা, কবিতা ও নভেল লিখিয়াই কেবল প্রতিভার পরিচয় দেওয়া যায়। ইহার ফলে বঙ্গীয়সাহিত্যে কবিতা ও নভেলের ছড়াছড়ি হইতেছে। অথচ ভবিষ্যতে স্থায়িত্ব-লাভ করিবে,এরূপ কবিতা ও নভেল অতি অল্প। মাসিক পত্রিকাগুলি খুলিলেই অজস্র প্রেমের কবিতা দেখিতে পাই। সেগুলির পনর-আনা একজন প্রসিদ্ধ কবির ক্ষীণ অনুকরণ, সুর-গুলিরই এক ছাঁদ,—সেই বসন্তের বাতাস আর পূর্ণিমার জোছনা, সেই আকাঙ্ক্ষা ও অতৃপ্তি। আমার এক-এক সময়ে মনে হয়, লর্ড কর্জ্জন্‌ আমাদের উপকারের জন্য এত করিয়া গেলেন, যদি আইন করিয়া অন্তত একশত বৎসরের জন্য প্রেমের কবিতা লেখা বন্ধ করিয়া যাইতেন, তাহা হইলে বাঙালী পাঠকসমাজ তাঁহাকে দুইহাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিত।

আমি আপনাদিগকে সানুনয়ে বলিতেছি, এখন দিনকতক কবিতা-লেখা বন্ধ রাখুন এবং তাহার পরিবর্ত্তে কতকগুলি ক্ষুদ্র অথচ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় প্রীতিপ্রদ কার্য্যের দিকে মনোযোগ করুন। যথা—(১) পল্লীকথা—নিজ বাসগ্রামের ইতিহাসসংগ্রহ; গ্রামের নামের উৎপত্তিসম্বন্ধে কি কিংবদন্তী আছে, গ্রামখানি কতদিনের, গ্রামের পুরাতন অধি-বাসী কাহারা, গ্রামে কোন বিখ্যাত লোক

জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কি না, গ্রামদেবতার বিবরণ ও তৎসম্বন্ধীয় জনপ্রবাদ, গ্রাম্য উৎসব, গ্রামবাসীদিগের দৈনন্দিন কার্য্য, গ্রামে প্রচলিত ব্রতনিয়ম-পূজাপার্ব্বণের বিবরণ। (২) প্রাদেশিক ভাষায় ব্যবহৃত শব্দসংগ্রহ; ইহা ভবিষ্যতে ভাষাতত্ত্ব-আলোচনায় বা অভিধান-সঙ্কলনে কাজে লাগিবে। আপনারা নিজে নিজেও এই সকল গ্রাম্যশব্দ কোন্ সংস্কৃত মূলশব্দের অপভ্রংশ, তাহা স্থির করিতে চেষ্টা করিলে বিলক্ষণ আমোদ ও শিক্ষা পাইবেন। তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নহে, উপরন্তু সখের কাজ বলিয়া প্রীতিপ্রদ।

যাঁহার প্রতিভা আছে, তাঁহার প্রতিভা এ সকল কার্য্যে ভাল খুলিবে না, এরূপ আশঙ্কা করিবেন না। ইংরেজিসাহিত্যে Izaak Walton প্রণীত Complete Angler এবং Gilbert White প্রণীত Natural History of Selborne নামধেয় দুইখানি পুস্তক আছে। এগুলি কিরূপ সামান্য বিষয় লইয়া লিখিত, শুনিলে আপনারা অবাক্ হইবেন। প্রথমখানিতে ছিপ্ দিয়া মাছ-ধরার কথা আছে এবং দ্বিতীয়খানিতে সেল্‌বোর্‌ন্‌নামক একটি ক্ষুদ্রগ্রামে পরিদৃষ্ট পশুপক্ষী ও তরুলতার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা আছে। অথচ পুস্তকদুইখানি এমন সুন্দরভাবে লিখিত যে, নভেল ফেলিয়া পড়িতে ইচ্ছা করে। অতএব দেখা যাইতেছে, প্রতিভাশালী ব্যক্তি সামান্য বিষয়ে গ্রন্থ লিখিলেও, তাহা সাহিত্যে স্থায়িত্বলাভ করে। পক্ষান্তরে, সকলেই যে প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এমন নহে; যাঁহাদিগের প্রতিভা নাই, তাঁহাদিগেরও এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে বাধা কি আছে? এইরূপ বিনা আড়ম্বরে বিনা আয়াসে উপকরণ সংগ্রহ করিলেও তাহা ভবিষ্যৎ ভাষাতত্ত্ববিৎ বা সমাজতত্ত্ববিৎ, ঐতিহাসিক বা ঔপন্যাসিকের কাজে আসিতে পারে। ইংরেজিসাহিত্যে যে এইরূপ ‘বাজে’ জিনিষের উপর ‘বাজে’ বই কত রহিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। আপনারা ইংরেজিসাহিত্যের ইতিহাস হইতে শিখুন, কিপ্রকারে সাহিত্যক্ষেত্রে নিজের শক্তি খাটাইতে হয়। এইরূপ শিক্ষালাভ করিয়া সেই দৃষ্টান্তে কাজ করিলে তবে বলিব, আপনাদের ইংরেজিশিক্ষা প্রকৃতরূপে ফলপ্রদ হইয়াছে। নতুবা ইংরেজগ্রন্থকারদিগের জন্মমৃত্যুর সনতারিখ মুখস্থ করা, তাঁহাদিগের চৌদ্দপুরুষের খবর রাখা, তাঁহাদিগের গ্রন্থপ্রণয়নের দণ্ডমুহূর্ত্ত স্থির করা বা তাঁহাদিগের রচনারীতির সমালোচনা বা তাঁহাদিগের সৃষ্ট পাত্রগণের চরিত্রবিশ্লেষণ প্রভৃতি বিষয়ে পাণ্ডিত্যপ্রদর্শনে কোন স্থায়ী ফল নাই। ইংরেজিসাহিত্যের আদর্শে যদি মাতৃভাষার সাহিত্যের উন্নতি ও পরিপুষ্টি করিতে আপনারা অগ্রসর হন, তবেই বুঝিব, আপনাদিগের ইংরেজিশিক্ষা সার্থক। নতুবা এই বিদ্যার বোঝা ধোপার গাধার পিঠে শাল, রুমাল, রেশমী, পশমী বস্ত্রের বস্তার ন্যায় নিতান্তই অশোভন ও হাস্যাস্পদ।

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

খেয়া।

তুমি এপার-ওপার কর কে গো
ওগো খেয়ার নেয়ে!
আমি ঘরের দ্বারে বসে বসে
দেখি যে তাই চেয়ে
ওগো খেয়ার নেয়ে।
ভাঙিলে হাট দলে দলে
সবাই যবে ঘাটে চলে
আমি তখন মনে করি
আমিও যাই ধেয়ে
ওগো খেয়ার নেয়ে।

তুমি সন্ধ্যাবেলা ওপার-পানে
তরণী যাও বেয়ে
দেখে মন আমার কেমন সুরে
ওঠে যে গান গেয়ে
ওগো খেয়ার নেয়ে।
কালো জলের কলকলে
আঁখি আমার ছলছলে,
ওপার হ'তে সোনার আভা
পরাণ ফ্যালে ছেয়ে
ওগো খেয়ার নেয়ে।

দেখি তোমার মুখে কথাটি নেই
ওগো খেয়ার নেয়ে।
কি-যে তোমার চোখে লেখা আছে
দেখি যে তাই চেয়ে
ওগো খেয়ার নেয়ে।
আমার মুখে ক্ষণতরে
যদি তোমার আঁখি পড়ে
আমি তখন মনে করি
আমিও যাই ধেয়ে
ওগো খেয়ার নেয়ে!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রাইবনীদুর্গ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সেই লোকসমুদ্রমধ্যে অন্তত এমন এক ব্যক্তি ছিলেন, যিনি আপনা ভুলিয়া এই আকস্মিক-আপত্তীতি-বিহ্বল মনুষ্যমণ্ডলীতে নিরর্থক-প্রাণিহত্যা-আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হইতেছিলেন। এই ব্যক্তি রাজপথের কিছু দূরে ক্ষুদ্র আম্রবাটিকায় দিনমান কাটাইয়া গৃহে ফিরিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন এবং স্নেহাস্পদের প্রত্যাগমনপ্রত্যাশায় জলেশ্বরের পথ চাহিতেছিলেন। তিনি দেখিলেন, সেই ভয়ার্ত্ত স্ত্রীপুরুষদের বিশৃঙ্খলভাবে ইতস্তত পালাইতে দিলে বিস্তর লোক জনতাপ্রবাহে পরস্পর পরস্পরের পদতলে পিষ্ট হইয়া যাইবে, বিশেষত স্ত্রীলোক ও বালকবালিকাদের বাঁচান ভার হইবে। কিছুমাত্র পূর্ব্বে তিনি বিশ্বস্ত সঙ্গীটিকে অশ্বারোহণের শব্দের দিকে রওনা করিয়াছিলেন। এক্ষণে চকিতে নিজের ঘোটক সজ্জিত করাইয়া তাহাতে সওয়ার হইলেন এবং সেই ভিড়ের চারিদিকে তীব্রবেগে ঘুরিয়া-ঘুরিয়া সকলকে বজ্রগম্ভীরস্বরে আশ্বাসবাণী শুনাইতে লাগিলেন। তাঁহার কথায় অনেকে বুঝিল যে, অতটা ভয় পাওয়ার কারণ নাই। বর্গীরা যাই হোক্—তাহারা হিন্দু, ধর্ম্মার্থ সমাগত হিন্দুদের প্রতি তাহারা কেন অত্যাচার করিবে? অতএব কতক লোক ভাঙিয়া গেলেও অধিকাংশ এই পরামর্শে রহিয়া গেল। বক্তা তখন বলিলেন, "এস ভাইসকল, প্রথমে আমরা মেয়ে-ছেলেদের একটু তফাতে রাখিবার ব্যবস্থা করি। তার-পর এস, পুরুষেরা দলবদ্ধ হইয়া দাঁড়াই।"

নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের লোকেরা সবিস্ময়ে চিনিল, উপদেষ্টা স্বয়ং শিবাপ্রসন্ন দাস। যাহারা তাঁহাকে পূর্ব্বে কখন দেখে নাই, দূরদূরান্তরের এমন অনেক লোক তাঁহার নাম শুনিয়াই আশ্বস্ত হইল। দাসমহাশয়ের হুকুমে দেখিতে দেখিতে স্ত্রীলোক ও বালকবালিকারা গাজনতলায় মহাদেবমন্দিরসম্মুখে আশ্রয় লইল। বাগ্‌দী এবং গৌড়গোয়ালাদের কতক তাহাদের রক্ষার্থ নিকটে নিকটে সজ্জিত রহিল। নিজে শিবাপ্রসন্ন অবশিষ্ট লোকজন, খেলোয়াড় ও বুনো তীরধনুধারীদের কৌশলে এরূপ শ্রেণীবদ্ধ করিয়া প্রস্তুত রহিলেন যে, সহসা তাহাদের দেখিতে কেবলমাত্র দর্শকবৃন্দ বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও কার্য্যকালে আত্মরক্ষায় বলাভাব না ঘটে। তাঁহার শিক্ষামত সন্ন্যাসীরা পূর্ব্ববৎ চড়কগাছ ঘিরিয়া দাঁড়াইল এবং মুহুর্মুহু "জয় শিবশম্ভু" রবে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল।

কিন্তু দূরের শত অসংখ্য অশ্বপদশব্দ স্পষ্টতর হইতে হইতে সহসা যেন থামিয়া গেল এবং কিছুক্ষণ পরে নবীভূত হইলেও আর উত্তরদিকে অগ্রসর হইল না।

দাসমহাশয় বুঝিলেন, তাহারা রাইবনীদুর্গাভিমুখে চলিয়া গেল। তিনি বিষণ্ণ হইয়া কর্ত্তব্যাবধারণ করিতেছেন, এমন সময়ে দুইজন অশ্বারোহীকে জলেশ্বরের পথে লক্ষ্য করিয়া

জনস্রোত সেইদিকে উন্মুখ হইল। চড়কের দোল পুরামাত্রায় চলিতেছিল এবং দেবাদিদেব মহাদেবের জয়গীতির বিরাম ছিল না। তথাপি দর্শকেরা অধিকাংশ অন্যমনস্ক হইয়া সেইদিকে চাহিয়া রহিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

রাইবনীদুর্গ ঠিক কতকালের, বলা শক্ত। বাঙ্লার কোন ইতিহাসে ইহার উল্লেখ নাই। অথচ মোগলমারি ও জলেশ্বর রণভূমির মধ্যস্থলে সুবর্ণরেখার পরপারে উৎকলবর্ম্মের সিংহদ্বারস্বরূপ এই দুর্জ্জয় দুর্গ আজিও বিরাজ করিতেছে। ইহার প্রাকারসকল এখনও অনেকস্থলে এরূপ নূতন যে, দেখিলে মনে হয়, অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে দুইএকবার সংস্কৃত হইয়া থাকিবে।

সৈকতভূমির নিদর্শন ধরিলে সন্দেহমাত্র থাকে না যে, একদিন তটিনীকুলরাজ্ঞী সুবর্ণরেখা এই দুর্গপাদমূল ধৌত করিয়া প্রবাহিত হইতেন। এই নদীপুলিনবাসীরা বলিয়া থাকে, কমলার মতই ইনি চঞ্চলা, কবে বাস্তভূমি ছাড়িয়া কোন্ জনপদকে অনুগৃহীত করিবেন, বলা যায় না। ফলত দেখা যাইতেছে, সুবর্ণরেখা ক্রমশ যত দূরে সরিয়া পড়িয়াছেন, রাইবনীদুর্গও ততই শ্রীসম্পদ্‌ভ্রষ্ট হইয়াছে।

বর্গীর হাঙ্গামার সময় এই দুর্গের ভগ্নদশা এখনকার মত সম্পূর্ণ হয় নাই। তখনও কৃত্রিম-খাতে নদীর জল দেখিতে দেখিতে ইহার পরিখাগুলিকে পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিত। রাজপ্রাসাদ জনমানবশূন্য হইলেও পুরাতন রাজবংশের সহিত একেবারে সম্বন্ধশূন্য হয় নাই। কিন্তু সে রাজবংশের পূর্ব্বগৌরবস্মৃতি ছাড়া আর বড় কিছু ছিল না।

ক্রমশ।

জ্যোৎস্নারাত্রি।

সহসা কেন ঘুমের পরশন
চক্ষে মোর লাগে;
সারাদিনের অশ্রুবরষণ
চিত্তে নাহি জাগে!
স্বপ্নে-দেখা অফুট-স্মৃতিপ্রায়
অতীত ব্যথা কোথায় মিলে যায়,
আকাশ জুড়ি' পরাণ ভরি' আজ
উদয় নবরাগে;
সারাদিনের অশ্রুবরষণ
চিত্তে নাহি জাগে!

মগন দিক্ জোছনা-সুমধুর
তরল সুধাধারে,
পরাণ ছাপি' হয়েছে ভরপূর
রাখিতে নাহি পারে!
চাঁদের পাশে মেঘেরা চলে ছুটি,
সোহাগে করে আলোকে লুটোপুটি,
ধ্বনিয়া ফিরে সব নীরব গীত
আমার গৃহদ্বারে ;
পরাণ ছাপি' হয়েছে ভরপূর
রাখিতে নাহি পারে!
জগৎমাঝে একাকী কেগো বসি
এ কোন রাজবালা!
মাথার 'পরে জাগে শুক্লশশী
হেরিছে মেঘমালা।
কোমল হাতে বীণার তারগুলি
বাঁধিয়া তারে বক্ষে নেছে তুলি',
গুমরি তাই গাহিছে মৃদুতানে
রুদ্ধ কত জ্বালা ;
মাথার 'পরে জাগে শুক্লশশী
হেরিছে মেঘমালা।
আমার সাথে যেন গো পরিচয়
হয়েছে কতদিন!
আজিকে হেরি' সে বাহুকিশলয়
বক্ষ'পরে লীন।
বসন্তের মৃদুল-বায়ু-ভরে
চমকি তার অঙ্গ থরথরে
পুলকে মোর কাঁপিয়া উঠে হিয়া
বাজিয়া উঠে বীণ
আজিকে হেরি' সে বাহুকিশলয়.
বক্ষ'পরে লীন।
সহসা যবে ভাঙিবে ঘুমঘোর
পাব না তার দেখা,

রাঙিয়া রবে কেবলি বুকে মোর
কর-পরশ-রেখা।
নয়ন'পরে রবে বিরহ-লোর,
স্বপন যাবে রহিবে শুধু ঘোর
সঙ্গিহারা রহিবে হেথা পড়ি'
ছিন্নবীণা একা ;
রাঙিয়া রবে কেবলি বুকে মোর
কর-পরশ-রেখা।

শ্রীদীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

রাজতপস্বিনী।

[জীবনীপ্রসঙ্গ]

২

মহারাণীমাতার সহিত আমার বাঙ্‌লা সাহিত্য ও ভাষা সম্বন্ধে সময়ে সময়ে অনেক কথাবার্ত্তা হইত। বাল্যকালে পণ্ডিত-কৃষ্ণকমল-ভট্টাচার্য্য-সম্পাদিত "অবোধবন্ধু"নামক মাসিকপত্রের নিয়মিত পাঠক ছিলাম এবং ইহাতে প্রকাশিত পল্লীচিত্র এবং পিতৃবন্ধু কবিবর বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কবিতাগুলি আমার বড় ভাল লাগিত। বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" এবং "বিবিধার্থ-সংগ্রহে"র পর "অবোধবন্ধু"র স্থান নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত। টেকচাঁদ ঠাকুরের গ্রাম্যশব্দবহুল ভাষা বাঙ্‌লাকে অনুস্বরবিসর্গবিহীন সংস্কৃত-পরিচ্ছদ হইতে অনেকপরিমাণে রক্ষা করিয়াছিল, ইহা অস্বীকার করিবার জো নাই। কিন্তু অবোধবন্ধুর প্রবন্ধাবলীতে যে খাঁটি সরস বাঙ্‌লার উন্মেষ দেখা দিত, বঙ্গদর্শনযুগে তাহার বিকাশ হইয়াছিল, ইহা সচরাচর কেন উক্ত হয় না, বলিতে পারি না। সে যাহা হউক, বঙ্গদর্শনের অভ্যুদয়ে যে ভাব ও ভাষাপ্রবাহ তখনকার শিক্ষিতসমাজকে আন্দোলিত করিয়াছিল, ১২৭৯ সালে নিম্নস্তরের ছাত্র হইলেও আমরা তাহার প্রভাব অনুভব করিয়াছিলাম। সোমপ্রকাশের সম্পাদকীয় বক্তব্যে এবং পত্র-প্রেরকদের স্তম্ভে বঙ্গদর্শনের প্রবর্ত্তিত ভাষার প্রতি যে সকল দোষারোপ হইত, আমি তাহা শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতাম না। আমার মতামত অকপটে আমি মাতৃসমীপে ব্যক্ত করিতাম।

কলিকাতায় আমাদের ছাত্রাবস্থায় একবৎসর শীতকালে মহারাণীমাতা গঙ্গাসাগরস্নানোপলক্ষে সেখানে গিয়া কয়মাস ছিলেন। কলের

জল আদৌ তিনি ব্যবহার করিতেন না। সেজন্য কলিকাতাসহরের ভিতর, বিস্তর লোকজন, বিশেষত তাঁহার আশ্রিতা ব্রহ্মচারিণী বিধবার দল লইয়া বেশীদিন বাস করা সম্ভব হয় নাই। কয়লাঘাটার গঙ্গাতীরে একটি বৃহৎ বাটী তাঁহার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। আমি পুটিয়া-অঞ্চলের কয়জন আত্মীয় ছাত্রসহ মাঝে মাঝে তাঁহাকে প্রণাম করিতে যাইতাম। নানাশ্রেণীর লোক সর্ব্বদা তাঁহার প্রবাসগৃহ সরগরম রাখিত। ইহার ভিতর দানপ্রার্থীর সংখ্যাই বিস্তর, বলা বাহুল্য। তাঁহার অধিকাংশ দান কোথাও সহজে সাধারণের গোচর হইতে পাইত না, কিন্তু কলিকাতায় দেশহিতকর কার্য্যের নামে দানগ্রহণের এক অপূর্ব্ব কৌশল তাঁহাকে বিস্মিত করিয়াছিল। তিনি যদি দান করিতেন পাঁচশত, খবরের কাগজে উঠিত পনরশত এবং যদি প্রতিশ্রুত হইতেন হাজার, তিনগুণের কথা নিনাদিত হইত। দানপ্রার্থীরা শেষে খবরের কাগজে প্রকাশিত অর্থটারই দাবি করিয়া বসিতেন। যে-কোন শ্রেণীর লোক কোন প্রার্থনা লইয়া কয়লাঘাটায় তাঁহার দ্বারস্থ হইত, তাহাকে রিক্তহস্তে ফিরিতে হইত না। কেহ গাড়িতে গেলে যাতায়াতের খরচ পর্য্যন্ত পাইত। গঙ্গাতীরে তিনি কাহারও কোন উপহার লইতে অসমর্থ, ইহা সম্ভবত না জানিয়া কোন কোন পদস্থ ব্যক্তি উপঢৌকন পাঠাইয়া তাঁহাকে বিলক্ষণ বিপদে ফেলিতেন। একদিকে তাহা লইলে গঙ্গাতীরে দানগ্রহণের প্রত্যবায়-ভাগিনী হইতে হয়, অন্যদিকে তাঁহার কোন কার্য্যে কেহ মনে ক্লেশ না পান, ইহাও দেখিতে হইবে। শেষে আমলাদের কেহ সে-সব দ্রব্য-সম্ভার গ্রহণ করিয়া তৎক্ষণাৎ দুঃখীলোকদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিতেন, উপহারবাহক ও বাহিকার দল রাজসংসার হইতে প্রচুর পুরস্কার লাভ করিয়া ফিরিয়া যাইত। অবশ্য, ভিতরের কথা তাহারা বুঝিয়া না যাইত, এমন নহে।

কলিকাতায় তাঁহার নিজের স্বাস্থ্য মন্দ ছিল না। কিন্তু গঙ্গাসাগরে স্নানের পর এবং তদুপলক্ষে নিয়মাতিরিক্ত কৃচ্ছ্রসাধন জন্য তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন। সেই যে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙিয়া গেল, আর কখন তাহা সম্পূর্ণ সারিল না। মুরশীদাবাদের বিখ্যাত কবিরাজ গঙ্গাধর সেন মহাশয় কয়মাস ধরিয়া তাঁহার চিকিৎসা করিয়াছিলেন। আমরা সে-বার গ্রীষ্মাবকাশের সময় গিয়া দেখি, কবিরাজপ্রবর বেশ আসর জম্‌কাইয়া বসিয়াছেন, রাজবাটীতে ঔষধপ্রস্তুতের ধুম পড়িয়া গিয়াছে। লোকে বলিত, তাঁর তেমন হাতযশ ছিল না। পাণ্ডিত্যে তিনি দিগ্বিজয়ী ছিলেন, সর্ব্বশাস্ত্রে তাঁহার দৃষ্টি ছিল। পড়াশুনার অভ্যাস প্রবীণ-বয়সেও যেরূপ ছিল, মনে করিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। তাঁহার স্পষ্টবাদিতা এবং চরিত্রের স্বাধীনতা দেশের সর্ব্বত্র পরিচিত ছিল। অল্প-দিনের ভিতর পুটিয়াতেও সে পরিচয়ের অভাব হয় নাই। রাজবাটীর কোন কোন সরিকের রাজারা ভদ্রলোককে "আপনি" বলিতে জানিতেন না। কবিরাজমহাশয় দেখা করিতে গিয়াছেন। তিনি দেশবিখ্যাত চিকিৎসক এবং লোক সোজা নন। তাঁহাকে "তুমি" বলা যায় না, কিন্তু "আপনি"ই বা বলা হয় কিরূপে? রাজা কৌশলে আলাপ করিতে লাগিলেন, কর্ত্তা উহ্য রাখিয়া কেবল কর্ম্ম ও ক্রিয়ার গ্রন্থিবন্ধন! নমুনা এইরূপ :—"কবিরাজের কবে আসা হইয়াছে?"—"কোথায় বাসা লওয়া

হইল?” ইত্যাদি। রাজকৌশলটা বুঝিতে অবশ্য কবিরাজের বেশীক্ষণ লাগিল না। হাসিয়া তিনি বলিলেন, “হুজুরের অত কষ্ট করার দরকার নাই। আমায় না হয় ‘তুমি’ই বলুন!” তাঁহার চিকিৎসায় মহারাণীমাতার কিছু উপকার হইলে কবিরাজমহাশয় তাঁহার একজন সুশিক্ষিত ছাত্রকে রাখিয়া প্টিয়া ত্যাগ করিলেন। একজন ডাক্তারের সহিত পরামর্শ করিয়া শেষে তিনিই ঔষধপত্র দিতেন। এই চিকিৎসকেরা মহারাণীমাতার বেতনভুক্ হইলেও, পুরস্কার ছাড়া, বাহিরের কোন লোকের সামান্য চিকিৎসার প্রয়োজনে তিনি তাঁহাদের পৃথক্ “দর্শনী”র ব্যবস্থা করিতেন। একদিন দেখি, বেলা ৯টার আমলে একটি ব্রাহ্মণকন্যা কোন দরিদ্র পরিবারের খবর লইয়া আসিলেন,—কাহারও জ্বর হইয়াছে, চিকিৎসা হইতেছে না। মাতা সাগু-মিছরি প্রভৃতি রোগীর পথ্য তৎক্ষণাৎ পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া কয়টি টাকা ব্রাহ্মণকন্যাকে আনাইয়া দিলেন এবং গোপনে উপদেশ করিলেন, রাজবাটীর চিকিৎসকদের লইয়া-গিয়া যেন “ভিজিট্” দেওয়া হয়। এইরূপ বিবেচনার সহিত তিনি আপনা হইতে সকলের ন্যায্যপ্রাপ্য বণ্টন করিয়া দিতেন। কিন্তু কেবল দরিদ্র পরিবারের জন্যই এ ব্যবস্থা নহে। সম্পন্ন মধ্যশ্রেণীর ভদ্রলোকদেরও এইভাবে তিনি কত সাহায্য করিতেন। রাজবাটীর অন্যান্য সরিকের গৃহেও তাঁহার মহত্বের,—স্নেহশীল হৃদয়ের স্নিগ্ধরশ্মি সর্ব্বদা বিকীর্ণ হইত।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার।

পাষাণদেবতা।

পাষাণমন্দিরে তব নিত্য আসি-যাই,
শত আহ্বানেও তব সাড়া নাহি পাই।
প্রথম প্রত্যূষে উঠি’ শুদ্ধশান্ত মনে,
করজোড়ে আসি নাথ তোমার অঙ্গনে।
বেদনাব্যাকুল প্রাণে তোমা-পানে চাই,
করুণার কোন চিহ্ন নাহি কোন ঠাঁই।
তোমারে সাজাতে নিত্য আনি ফুলডালা,
পাষাণহৃয়ারে গেঁথে রেখে যাই মালা।
সাধ করে’ মালাগাছি কণ্ঠে তুলে’ দিতে,
বাক্যহীন মৌন দেখে ভয় পাই চিতে।

নিত্য এসে ফিরে যাই সুখহীন ঘরে,
বিফল বাসনারাশি কেঁদে কেঁদে মরে।
ব্যথিত পীড়িত হিয়া, বেদনাবিহ্বল,
পাষাণদেবতা, শুধু তুমি অচঞ্চল।

শ্রীজঃ—

দুর্ভিক্ষপীড়িত ভারতে।

৭

উদয়পুরের সুরম্য বনভূমি।

যাত্রাপথের ধারে, একটি রমণীয় বনে, গিরিপাদমূলে, দর্পণবৎ প্রশান্ত সরোবরের সম্মুখস্থ একটি কুটীরে, তিনজন সন্ন্যাসীর বাস। ইহারা যুবাপুরুষ, সুঠাম-সুশ্রী, নগ্নকায়, দীর্ঘকুন্তল—পাথরের ন্যায় পাংশুবর্ণ একপ্রকার চূর্ণে উহাদের আপাদমস্তক আচ্ছন্ন।

প্রতিদিন সকল সময়েই- যখনই ঐদিক্ দিয়া যাইবে—তখনি দেখিতে পাইবে,—ঐ তিনজন সন্ন্যাসী, ঐ অনাবৃত কুটীরে, বৌদ্ধধরণে আসনবদ্ধ হইয়া, স্থিরভাবে সরোবরের সম্মুখে বসিয়া আছে। সরোবরের জলে পর্ব্বতের ছায়া,—ঘনঘোর অরণ্যের ছায়া,—উদয়পুর-রাজপ্রাসাদের ছায়া বিপরীতভাবে প্রতিবিম্বিত।

শুভ্রনগরের পশ্চাদ্ভাগে,—গবাক্ষবিশিষ্ট সিংহদ্বার পার হইবামাত্র,—সহসা এই নিস্তব্ধ বনভূমির আরম্ভ হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়;—চতুর্দ্দিকস্থ শৈলচূড়ার উপর দিয়া চলিয়া অবশেষে সুদূর অরণ্যে,—ব্যাঘ্রসঙ্কুল জঙ্গলে উহা মিশিয়া গিয়াছে।

মধ্যবনের গাছগুলা, লঘুশাখাবিশিষ্ট গুল্মতরুগুলা, কতকটা আমাদের দেশের মত। আমাদের শরতের শেষভাগে যেরূপ ফুল ফুটিয়া থাকে,—সেইরূপ খুব ফুল ফুটিয়াছে; যদিও এখানে এখন বসন্তকাল, গ্রীষ্মপ্রধান দেশের বসন্তকাল;—বাতাস আগুনের মত। কিন্তু ভারতের অন্যান্য অংশের ন্যায় এখানকার সুন্দর বনভূমিটিও নিশ্চল-নিস্পন্দ এবং এই বসন্তকালেও সমস্তই যেন মৃতকল্প। তিনবৎসর ধরিয়া এইরূপ চলিতেছে।

নগরদ্বারের এত নিকটে থাকিয়াও এই ছায়াময় স্থানটি যে এমন নিস্তব্ধ ও শান্ত রহিয়াছে, ইহাই আশ্চর্য্য। নগরের অপরপার্শ্বেই সমস্ত গতিবিধি ও লোকের চলাচল; ধ্যানমগ্ন তিনজন সন্ন্যাসীর সম্মুখ দিয়া এ রাস্তায় কেহ প্রায় যাতায়াত করে না।

এই বনে কৃষ্ণসার আছে, বার্দ্দর আছে, ঘুঘু ও টিয়াজাতীয় হরেকরকম পাখী আছে। বড়-বড় জাঁকাল ময়ূর দলে-দলে বিচরণ করিতেছে। মরাগাছের মধ্যবর্ত্তী স্থানে,

শাদাটে ঝোপ্‌ঝাড়ের তলায়, ভস্মাভ মৃত্তিকার উপর, এই ময়ূরগুলা সারীবন্দি হইয়া দৌড়িতেছে দেখা যায়;—পুচ্ছের কি চমৎকার উজ্জ্বল প্রভা! হরিদ্বর্ণ ধাতুখণ্ডের যেন এক-একটা সমষ্টি। এই সব পশুপক্ষী ছাড়া রহিয়াছে—কিন্তু ইহাদিগকে ঠিক "বুনো" বলা যায় না; কেন না, এদেশে মানুষেরা ইহাদিগকে হত্যা করে না, তাই আমাদের দেশের মত, ইহারা মানুষ দেখিয়া পালায় না। পর্ব্বতের অপরপার্শ্বে ব্যাঘ্রাদি আছে বটে, কিন্তু এই সুরম্য বনে উহাদিগকে বিচরণ করিতে কস্মিন্‌কালেও কেহ দেখে নাই।

সরোবর প্রদক্ষিণ করিয়া যখন এখানে পৌঁছিলাম, ঠিক রাস্তার ধারে নিস্পন্দ-নিশ্চল, প্রস্তরবর্ণ এই তিনজন অদ্ভুত সন্ন্যাসীর প্রথম-দর্শনেই, আমার অন্তরে এক-প্রকার অস্পষ্ট অতিপ্রাকৃতিক ভয়ের সঞ্চার হইল। পাষাণপ্রতিমার সহিত প্রভেদ এই যে, ইহাদের লম্বা চুল, গোঁপ, ভুরু, সমস্তই কালো; উহাদের নেত্রের অচল স্থিরদৃষ্টি দেখিয়াই যেন একটু ভয় হয়, তা ছাড়া, আর কিছুই জানা যায় না।

বয়ঃক্রম ২০বৎসর; ইহারা সন্ন্যাসধর্ম্মে নবব্রতী। তপশ্চর্য্যা ও ব্রত-উপবাস সত্বেও, উহাদের সুন্দর দেহগঠনে কোনপ্রকার পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয় নাই। আসনপীঁড়ি হইয়া বহুকাল একভাবে বসিয়া থাকিলে, পা শুকাইয়া শীর্ণ হইবার কথা, কিন্তু এখনও তাহা হয় নাই—পা এখনও বেশ স্থূল ও একটু মেয়েলী-ধরণের। চূর্ণলিপ্ত ললাটের উপর শৈবচিহ্ন লালরঙে অঙ্কিত; হঠাৎ রাস্তার সং বলিয়া মনে হইতে পারিত, কিন্তু উহাদের চোখের দৃষ্টি এম্‌নি, স্নিগ্ধগম্ভীর যে, সে ভাব একটুও মনে আইসে না।

উহাদের পশ্চাতে, কুটীরের মধ্যে, কতকগুলি তাম্রসামগ্রী,—বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন—সুশৃঙ্খলরূপে সজ্জিত রহিয়াছে। উহাদের প্রাত্যহিক প্রাতঃস্নানে ও মিতাহারে এই সমস্ত সামগ্রী ব্যবহৃত হয়। উহাদের মাথার উপর গাছের মরা-ডালপালা প্রসারিত এবং ইহা পাখীদের একটা জটলার স্থান। চারিদিক্‌কার শুষ্কতায় অতিষ্ঠ হইয়া,—টিয়া, ঘুঘু, বড়-বড় ময়ূর, ছোট-ছোট গায়কবিহঙ্গ এই খানে আসিয়া জড় হইয়াছে এবং এই সন্ন্যাসীরা আহারের পর যে অন্ন উহাদের জন্য রাখিয়া দেয়, তাহাই উহারা খুঁটিয়া-খুঁটিয়া খায়।

যদি, কোন পথিক সন্ন্যাসিত্রয়ের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায় এবং উহাদের সহিত কথা কহে—সন্ন্যাসীরা কখন-কখন ইঙ্গিতের দ্বারা ও একপ্রকার অমনস্ক স্মিতহাস্যসহকারে কুটীরচ্ছায়াতলে বসিবার জন্য তাহাকে আহ্বান করে। কিন্তু সেই ভূমিখণ্ডটি এরূপ সযত্নে সম্মার্জ্জিত,—পাছে আবার অপরিষ্কার হয়, এইজন্য উহারা পথিককে দূরে জুতা রাখিয়া আসিতে অনুরোধ করে। পরক্ষণেই আবার তাহাদের স্তিমিতনেত্র ধ্যানে নিমগ্ন হয়; তাহার পর,যখন ইচ্ছা তুমি চলিয়া যাও,—আর উহারা তোমার সহিত কথা কহিবে না—তোমার দিকে একবার চাহিয়াও দেখিবে না।

এই বনমধ্যস্থ সরোবরটি উদয়পুরমহারাজের। কেবল তাঁহার প্রাসাদগুলি এবং চিরশুভ্র কতকগুলি পুরাতন মন্দির এই সরোবরে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। সরোবরের মধ্যস্থলে দুইটি ছোটো-ছোটো দ্বীপ এবং সেই

দ্বীপের উপর আরও কতকগুলি প্রাসাদ ও প্রাচীরবেষ্টিত উদ্যান রহিয়াছে। তীরভূমির সর্ব্বত্রই ঝোপ্‌ঝাড় ও গাছে-গাছে জড়াজড়ি। চারিধারে উচ্চ খাড়া পাহাড়—মরা-বনের গালিচা যেন তাহাতে বিছানো রহিয়াছে; ইতস্তত, কোন কোন সূক্ষ্মাগ্র চূড়ার উপর পুরাকালের কোন-একটি ধবলপ্রভ দুর্গপ্রাসাদ, কোন-একটি ক্ষুদ্র দেবমন্দির ইগল্‌পক্ষীর ন্যায় খুব উচ্চে বিরাজমান। গাছের যে-সব ডালপালা একেবারে জলের ধারে নুইয়া পড়িয়াছে, সেই সব ডালপালা এখনো সবুজ; তা ছাড়া, যে দিকে দৃষ্টিপাত কর, সর্ব্বত্রই অকালশরতের "ছ্যাত্‌লা" অথবা শীতের একঘেয়ে ছাই-রং।

আজ সর্ব্বপ্রথমে সন্ন্যাসিত্রয়ের একটু বাস্তবিক নড়াচড়া দেখিলাম।

আজ সূর্য্যাস্তের সময় এই সুরম্য বনে প্রবেশ করিয়াছিলাম। এই সময়ে, মহারাজার একটা পোড়ো বাড়ীর উপর দিয়া ঘন ধূমরাশি নিয়ত সমুত্থিত হয়। (ইহা শুধু চতুর্দ্দিকস্থ হরিণদিগের পাদোত্থিত ধূলারাশির আবর্ত্ত; জঙ্গল শুকাইয়া যাইবার পর হইতে, মহারাজা স্বকীয় প্রাসাদের গবাক্ষ হইতে নীচে ভুট্টা নিক্ষেপ করেন; ইহাই খাইবার জন্য হরিণেরা এখানে প্রতিদিন সায়াহ্নে সবেগে দৌড়িয়া আইসে...)

দেখিলাম, একজন সন্ন্যাসী তাহার পশ্চাতে অবস্থিত দর্পণ, চূর্ণ ও লাল-রং আনিবার জন্য আসন হইতে উঠিয়াছে; তাহার পর, আবার সেই সোনাসনে উপবিষ্ট হইয়া, শাদা চূর্ণে মুখমণ্ডল ধবলীকৃত করিয়া ললাটের উপর শৈব-চিহ্ন সযত্নে অঙ্কিত করিতেছে। সায়াহ্ন-ভোজের জন্য ময়ূর ও ঘুঘু চারিদিক্ হইতে আসিয়া জড় হইয়াছে। ইহারা ছাড়া সেখানে আর কেহই নাই। সন্ধ্যাগমে, তবে কাহার জন্য এত সাজসজ্জা!...

সে যাহাই হোক্, তরুশাখার মধ্য দিয়া একদল অশ্ব খুব ছুটিয়া আসিতেছে, তাহারই পদশব্দ শুনা যাইতেছে। দরবারের ত্রিশজন সর্দ্দার সমভিব্যাহারে রাজা চলিয়াছেন। অশ্বগুলা বিচিত্রবর্ণ সাজে সজ্জিত। ছিপ্‌ছিপে-গঠন অশ্বারোহীরা সুদীর্ঘ শুভ্রপরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছে। উদয়পুরী-ধরণে গুম্ফ-রাজি আঁচড়াইয়া উপরদিকে তোলা; ইহাদের দেহগঠন সুন্দর ও পুরুষোচিত, ফিঁকা তাম্র-বর্ণ, এবং এই উত্তোলিত গুম্ফের দরুণ মুখে কেমন-একটু মার্জ্জারভাব প্রকটিত।

মহারাজাও অনুচরবর্গের সহিত ছুটিয়া চলিয়াছেন; তাঁহারও মার্জ্জারবৎ শ্মশ্রুরাজি; তাঁহারও মুখমণ্ডল, সাজসজ্জা অতীব সুন্দর এবং আর-পর-নাই বিশিষ্টধরণের।

পত্রশূন্য একটা তরুবীথির মধ্য দিয়া তাঁহারা চলিয়া গেলেন। তাঁহাদের দেখিয়া, আমাদের মধ্যযুগের পাশ্চাত্য অশ্বারোহীদিগকে মনে পড়িল। মনে হইল, যেন সেই অতীত-যুগে কোন য়ুরোপীয় "প্রিন্‌স্", কিংবা "ডিউক্" অশ্বারোহী অনুচরবর্গ ও "ব্যারন্"গণ সমভি-ব্যাহারে, সুন্দর শরৎসায়াহ্নে, মৃগয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন।...

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আষাঢ়। তৃতীয় সংখ্যা।

[নব পর্য্যায়]

ষষ্ঠ বর্ষ।

সূচী।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।	বিষয়।	পৃষ্ঠা।
আনন্দমঠ ও স্বদেশপ্রেম ...	৯৯	রাজতপস্বিনী	১৩১
নেশন্ বা জাতি	১০৫	জিজ্ঞাসায় নিবেদন	১৩৪
শুভবিবাহ	১১১	রাইবনীদুর্গ	১৩৭
বর্ত্তমানযুগের স্বাধীনচিন্তা ...	১১৪	বৈজনাথ	১৪০
সার্থক (শ্রীজঃ—)	১২৪	শিক্ষাসমস্যা	১৪৩
দুর্ভিক্ষপীড়িত ভারতে	১২৫	প্রাচীন সামাজিক চিত্র	১৫৮

এস্, মজুমদার কর্ত্তৃক প্রকাশিত

ও

২০নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ দিনময়ী প্রেসে,

শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১৩

বঙ্গদর্শন।

আনন্দমঠ ও স্বদেশপ্রেম।

প্রায় চব্বিশ বৎসর হইল, আমি একদিন স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। তখন তিনি বৌবাজারের বাসায় থাকিতেন। রাত্রি প্রায় আটটা। বঙ্কিমবাবু, স্বর্গীয় কবি হেমচন্দ্র, স্বর্গীয় ডাক্তার বেহারিলাল ভাদুড়ী, স্বর্গীয় সঞ্জীবচন্দ্র বসিয়া আছেন। একটু পরে গরম-গরম লুচি ও তপসীমাছভাজা আসিল। খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, মনখোলাখুলি করিয়া বেশ কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। এ-কথা সে-কথার পরে, কবি হেমবাবু বলিলেন—"বর্ত্তমানসময় যে-সকল স্বদেশপ্রেমঘটিত কবিতা বাহির হইতেছে, তাহা বাহির না হইলেই ভাল হয়।"

বঙ্কিমবাবু—"কেন ?"

হেমবাবু—"যে স্বদেশপ্রেম, যে বীরত্ব বাক্যে পর্য্যবসিত, তাহা ঘৃণার বস্তু, তাহা একরকম ভণ্ডামি।"

বঙ্কিমবাবু—"তবে তুমি তোমার 'ভারত-সঙ্গীত', 'ভারতবিলাপ' লিখিয়াছিলে কেন ?"

হেমচন্দ্র—"আমি লিখিয়া অতি অন্যায় কাজ করিয়াছি, আমি তাহার জন্য অনুতপ্ত। হায়, বঙ্গদেশে একটা লোক নাই, যে কার্য্যে বীরত্ব দেখাইতে পারে, একটা লোক নাই, যে প্রয়োজন হইলে দেশের জন্য নিজের জীবনটা দিতে পারে। যে দেশের লোকের অবস্থা এইরূপ, সে দেশের লোক 'জাতীয় সঙ্গীত' লেখে কেন, স্বদেশপ্রেমের বিষয় দীর্ঘ বক্তৃতা করে কেন ? শোচনীয়!"

বঙ্কিমবাবু—"তুমি কি বলিতে চাও, সাহিত্যদ্বারা কার্য্যত দেশের কোন মঙ্গল হয় না ? যদি তা বল, তাহা হইলে আমি তোমার কথা কখন অনুমোদন করিতে পারি না। যদি সাহিত্যদ্বারা স্বদেশের মঙ্গলসাধন করা যায় না মনে করিতাম, তাহা হইলে আমি আনন্দমঠ লিখিতাম না। আমার বিশ্বাস, আমার আনন্দমঠে স্বদেশের একদিন উপকার হইবে।" বঙ্কিমবাবু এই কথাগুলি যেন ভবিষ্যদ্বক্তার গম্ভীরস্বরে বলিলেন। আমি যখন এই পুস্তকখানি প্রথমে পাঠ করিয়াছিলাম, তখন সত্যানন্দ, ভবানন্দ, জীবানন্দ, ধীরানন্দ ইত্যাদি আনন্দের ছড়াছড়ির ভিতর যে বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম, তাহা বলিতে পারি না। বঙ্কিমবাবুর প্রথম বয়সের উপন্যাসাবলীর প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের

চরিত্রগুলি যেমন জীবন্ত, পরিস্ফুট হইয়াছে,—আমার্দিগের জীবনের চিরসহচর-সহচরীর ন্যায় হইয়া গিয়াছে, আনন্দমঠে বর্ণিত চরিত্রগুলি তেমন হয় নাই—আমার এইরূপ বোধ হইয়াছিল। যেন একদিক্ রক্ষা করিতে গিয়া, বঙ্কিমবাবু অপরদিক্ রক্ষা করিতে পারেন নাই; যেন উপন্যাসে রাজনৈতিক তথ্য ব্যাখ্যা করিতে গিয়া তাঁহার উপন্যাসের অতুলনীয় মনোহারিতা হারাইয়াছেন; যেন তাঁহার কল্যাণী ও শান্তি বাস্তবিক জগতের লোক নহে; যেন সত্যানন্দ, ভবানন্দ ইত্যাদি অপূর্ণ ছবি। প্রথমে এইরূপ বোধ হইয়াছিল। কিন্তু অনেক বৎসর পরে আমি আবার আনন্দমঠ পাঠ করিলাম। তখন এই গ্রন্থের প্রকৃত অর্থ আমার মানসনেত্রে বিদ্যুতের ন্যায় চমকিল। যাহা পূর্ব্বে দেখিতে পাই নাই, তাহা দেখিলাম। দেখিলাম, গ্রন্থকারের বিশাল হৃদয়ের গভীর স্বদেশপ্রেম এই গ্রন্থে স্পন্দিত হইতেছে। দেখিলাম—গ্রন্থকারের চিন্তা, স্বদেশহিতৈষিতা ও দূরদর্শিতা বর্ত্তমান লোকের শিক্ষার জন্য, অতীতকালের মধ্যে, ভবিষ্যতের দর্পণ রচনা করিয়া রাখিয়াছে। বুঝিলাম, আনন্দমঠ মাতৃপূজার মন্ত্র—সমুদয় গ্রন্থখানি "বন্দে মাতরম্"।

বঙ্কিমবাবু একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন যে, চাকুরী তাঁহার জীবনের একটি প্রধান দুর্ভাগ্য। কিন্তু চাকুরীর শৃঙ্খল তাঁহার স্বদেশপ্রেমকে, তাঁহার প্রতিভাকে আবদ্ধ করিতে পারে নাই। স্বদেশহিতৈষী প্রতিভাশালী বঙ্কিম, সমুদয় দিবস আপিসে খাটিয়া, বাসায় আসিয়া নির্জ্জনে বসিয়া, দেশের অধঃপতন ভাবিয়া অশ্রুমোচন করিতেন। একদিকে রাজভক্তি, আর একদিকে স্বদেশপ্রেম। রাজা যে বিদেশী। স্বদেশপ্রেম যদি অতিমাত্রায় প্রকাশ পায়, তাহা হইলে গবর্মেণ্ট রাগ করিতে পারেন। উভয়সঙ্কট। কিন্তু উভয়সঙ্কট ও কঠিন সমস্যাতেই প্রতিভার পূর্ণপরীক্ষা হয়। বঙ্কিমের প্রতিভা "লয়াল্‌টি" ও স্বদেশপ্রেমের সামঞ্জস্য করিল; ইংরেজের ও ভারতবাসীর মঙ্গল, অন্তত বর্ত্তমানকালে, পরস্পর বিরোধী নহে, তাহা দেখাইয়া দিল। বঙ্কিম, একদিকে যেমন অশান্তি বা ইংরেজবিদ্বেষ ভারতবাসীর পক্ষে নিতান্ত অমঙ্গলজনক বলিয়া দিলেন, অন্যদিকে স্বদেশীর হৃদয়ে একটা মহতী আশা জ্বালিয়া দিলেন। বলিলেন—"যোগ্য হও, পরে আকাঙ্ক্ষা করিও; মনুষ্য হও, অধিকার পাইবে; ইংরেজ গুরু, তুমি ছাত্র, ছাত্র হইয়া গুরুর সহিত বিবাদ করিও না।"

এই কথা সুন্দররূপে বলিবার জন্য তিনি কল্পনারাজ্যে প্রবেশ করিলেন। নিজের যাহা বলিবার ছিল,—তাহা রমণীর কমনীয় মধুরতার মধ্যে, সতীর পবিত্র প্রেমের মধ্যে, কখন বা শান্তির সারঙ্গনিক্বণের সঙ্গে, কখন বা তোপের গুড়ুম্-গুড়ুম্ গর্জ্জনের সঙ্গে, কখন বা মহেন্দ্রের ব্রতধারণের মধ্যে, কখন বা সত্যানন্দের ব্রত-উদ্যাপনের ভিতর, কখন বা জ্যোৎস্নাস্নাত কাননে,কখন তাপদগ্ধ প্রান্তরে, কখন বা জয়দেবের কোমলকান্ত পদাবলীতে, কখন বা ভগবদ্গীতার মহীয়ান্ শ্লোকের প্রতিধ্বনিতে—বঙ্কিমবাবুর যাহা স্বদেশকে বলিবার ছিল, তাহা আনন্দমঠে বলিয়া লইয়াছেন্। এই গ্রন্থে সকল স্থানেই তিনি স্বদেশীকে "বন্দে মাতরং" গাহিতে শিখাইয়াছেন।

তাই, অন্য নগরে ও গ্রামে, রাজপথে ও নদীতটে অহরহ "বন্দে মাতরং" নিনাদিত হইতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই "বন্দে মাতরং" ব্যাপারে এক্ষণ একটা দোষ আসিয়া পড়িয়াছে। বঙ্কিমবাবু জ্ঞানী। তিনি বিশেষ করিয়া আনন্দমঠে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন যে, যতদিন জ্ঞানে ও বলে ইংরেজের সহিত সমান হইতে না পার, ততদিন ইংরেজের সহিত বিবাদ করিও না;—বিবাদ করা দূরে থাকুক্, তাঁহাদিগকে শিক্ষাগুরু বলিয়া মানিয়া, তাঁহাদিগের নিকট জ্ঞানলাভ করিবে,—বলসংগ্রহ করিবে। কিন্তু বঙ্গদেশের দুরদৃষ্টক্রমে, বঙ্গচ্ছেদের দারুণ ব্যথা পাইয়া বঙ্গবাসী অদ্য যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া, বঙ্কিম যাহা করিতে নিষেধ করিয়াছেন, অধুনা বঙ্কিমের "বন্দে মাতরং" গাহিতে গাহিতে বঙ্গবাসিগণ তাহাই করিতেছেন;—ইংরেজের সহিত যাহাতে অসদ্ভাব হইবার বিশেষ আশঙ্কা, তাহাই নানাবিধ অনিষ্টজনক আড়ম্বরের সহিত ঘোষণা করিতেছেন;—নিজেদের নিতান্ত দুর্ব্বল জানিয়াও মর্ম্মাহত নৈরাশ্যের উদ্‌ভ্রান্ত তাড়নায় আত্মনিগ্রহ ডাকিয়া আনিতেছেন। আনন্দমঠের শিক্ষা এই যে, বর্ত্তমান রাজনৈতিক আন্দোলনের কথা দূরে থাকুক্, সত্যানন্দের ন্যায় আত্মোৎসর্গ এবং সন্তানগণের ন্যায় প্রাণপণ সংগ্রামও অকালে হওয়ায় স্বদেশকে উদ্ধার করিতে পারিল না ও পারিবে না। বর্ত্তমান আন্দোলনপ্রণালীসম্বন্ধে আনন্দমঠে বঙ্কিমবাবু নীরব। তাহাতে কি বুঝিতে হইবে? তিনি মনে করিতেন, ইহা গভীরা ভ্রান্তি, মর্ম্মন্তুদ মৃগতৃষ্ণিকা। তিনি আনন্দমঠে বলিতেছেন—"ও পথ ছাড়। মাতাকে পূজা করিতে শেখ, এক মায়ের সন্তান বলিয়া স্বদেশীগণকে ভাই মনে করিয়া ভালবাসিতে শেখ। ধনের গর্ব্ব, বিদ্যার গর্ব্ব, বর্ণভেদের গর্ব্ব ছাড়িয়া সকলে এক হও, এক হ'য়ে মাকে পূজা কর। আত্মোৎসর্গ শিক্ষা কর, কিন্তু যতদিন সাহেবদিগের সমকক্ষ না হও, সাহেবদিগের সহিত বিবাদ করিও না। যখন ইংরেজের সমকক্ষ হইবে, তখনকার আনন্দমঠ তখনকার গ্রন্থকার রচনা করিবেন।" তিনি আরও বলেন—"যাহাই কর, স্বদেশের মঙ্গলের জন্য প্রীতি চাই, ঐক্য চাই, আত্মোৎসর্গ চাই, আর সর্ব্বোপরি চাই ধর্ম্ম। এক্ষণ অশান্তি ও বিবাদ কেবল অমঙ্গল। এক্ষণ বিবাদের সময় নহে, এক্ষণ শিক্ষার সময়, এক্ষণ তপস্যার সময়, এখন বরপ্রার্থনার সময় নহে। ব্রত অবলম্বন কর, সন্ন্যাসী হও, জ্ঞানী হও, শক্তিশালী হও। সকলে—জমিদার ও কৃষক, ইতর আর ভদ্রলোক নরনারী,—সকলে মাকে পূজা কর। দেখিবে, মা প্রসন্ন হইবেন, ভগবান্ দয়া করিবেন,—স্বর্গ হইতে নামিয়া হাত ধরিয়া তোমাকে তুলিবেন। তখন ইংরেজ তোমাকে ভাই বলিবে, দাস বা 'নিগার্' বলিবে না।" যে আনন্দমঠের "বন্দে মাতরম্" আপনারা দলে দলে গাহিয়া আনন্দিত হইতেছেন, উল্লসিত হইতেছেন, হৃদয়শোণিত পাত করিতেছেন, তাহার প্রধান উপদেশ এই।

আপনাদিগের মহত্ত্ব, আন্তরিকতা, স্বদেশপ্রেম ভক্তিপ্রণত মস্তকে আমি স্বীকার করি। কিন্তু আমার বিশ্বাস, বিদেশীয় দ্রব্যের বর্জ্জনদ্বারা ইংরেজদিগকে জব্দ করিব অথবা ইংরেজদিগকে সৎপ্রবৃত্তি দিব, এই যে একটা ভাব

আপনারা "বয়কট্" ইত্যাদি দ্বারা ঘোষণা করিতেছেন, তাহা নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক। অন্তত বর্ত্তমান সময়ে ইংরেজবিদ্বেষ অথবা ইংরেজ-বিদ্বেষের অভিনয় স্বদেশের পক্ষে নিতান্ত ক্ষতিজনক। যেমন গরল হইতে কখন অমৃত উৎপন্ন হয় না, তেম্নি বিদ্বেষ হইতে কখন স্বদেশপ্রীতি জন্মায় না।

স্বদেশীর প্রতি আমাদের প্রীতির এক্ষণও বিলক্ষণ অভাব আছে। এই যে পরাধীনতা, এই যে সহানুভূতিশূন্য শাসন, যাহার দারুণ আঘাত মাঝে মাঝে আমাদের দেহে ও মনে বড়ই লাগে, তাহার মূলে দেখিবেন—স্বদেশপ্রীতির অভাব। জীবের শত্রু জীব, স্বদেশীর শত্রু স্বদেশী। দুঃখে বা রাগে কেবল বক্তৃতা, শোভাযাত্রা, ছুটাছুটী, লাফালাফি না করিয়া আমরা যদি একটু স্থির হইয়া বিবেচনা করি, তাহা হইলে বুঝিতে পারিব, আমরা যে প্লেগে মরিতেছি, সে "প্লেগ্" আমাদিগের স্বার্থপরতামলপূর্ণ হৃদয়ে। আমরা যদি আমাদিগের নিজের হৃদয়, আমাদিগের ভাইভগ্নীগণের হৃদয় পরিষ্কার করিতে পারি, যদি জাতীয়হৃদয়ে সর্ব্বত্র জ্ঞান ও ধর্ম্মের আলো ও বায়ু সঞ্চার করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদিগের ভিতর আর প্লেগ্ থাকিতে পারে না;—অধঃপতনের মৃত্যু হইতে আমরা রক্ষা পাইতে পারি। যতদিন ভাই ভাইয়ের গলায় ছুরি বসাইবে, যতদিন পোড়া ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য ভাই ভাইয়ের বুকে হাঁটু দিবে, যতদিন ভাই ভাইকে জ্ঞানান্ধ রাখিয়া ভগবদ্দত্ত অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখিবে, তত.িন দেশের কোন মঙ্গলের আশা নাই।

আর কিছু বলিবার পূর্ব্বে, আনন্দমঠের ..ল ঘটনা অতি সংক্ষেপে এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক।—১২৭৬ সালে ভীষণ দুর্ভিক্ষে অসংখ্য লোক মরিল। দেশে অরাজকতা উপস্থিত হইল। দস্যুগণ নগর ও গ্রাম লুণ্ঠন করিতে লাগিল। ইংরেজ তাহা নিবারণের চেষ্টা করিলেন না, কেবল রাজস্ব-আদায়ে ব্যস্ত থাকিলেন। এই সুযোগে সত্যানন্দ নামে একজন স্বদেশপ্রেমিক সন্ন্যাসী বঙ্গদেশে আবার হিন্দুরাজ্য সংস্থাপন করিবার সঙ্কল্প করিলেন এবং দস্যুগণকে সন্ন্যাসিদলে ভুক্ত করিলেন। সত্যানন্দের শিক্ষাগুণে এই দস্যুগণ উৎকৃষ্ট যোদ্ধা হইল। ভবানন্দ, জীবানন্দ, জ্ঞানানন্দ—সত্যানন্দের দৃষ্টান্তে ও উপদেশে সুদক্ষ সেনাপতি হইলেন। স্বদেশ, এই সকল যোদ্ধা সন্ন্যাসীর মাতা: সন্ন্যাসিগণ সেই মাতার "সন্তান"। সন্তানব্রত লইতে হইলে যাবৎ মার অর্থাৎ স্বদেশের উদ্ধার না হয়, তাবৎ দারাপুত্র-গৃহ সকলই ত্যাগ করিতে হয়। মহেন্দ্রনামক একজন জমিদারকে সত্যানন্দ সন্তানব্রতে দীক্ষিত করিলেন। ঐ জমিদারের গৃহে কামান-বন্দুক গোপনে প্রস্তুত করাইলেন,—অবশেষে ঘোরতর যুদ্ধে ইংরেজকে পরাজিত করিলেন। কিন্তু তাঁহার গুরু (চিকিৎসক) সত্যানন্দকে যে উপদেশ দিলেন, তাহাতে সত্যানন্দ হিন্দু-রাজত্বসংস্থাপনের চেষ্টা হইতে নিরস্ত হইলেন। ইংরেজের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হইল।

এক্ষণে আনন্দমঠের সূত্রকয়েকটি সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করিব—

১। আনন্দমঠের প্রথম সূত্র প্রীতি। এতৎসম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, এখানে তাহার অধিক বলিবার স্থান নাই।

২। দ্বিতীয় সূত্র ঐক্য। যখন সকলেরই একই উদ্দেশ্য, একই বিশ্বাস সঞ্জাত হয়, তখন

ঐক্য স্থাপিত হয়। ঐক্য বল; অনৈক্য দুর্ব্বলতা। ঐক্য বলের সহিত বলের যোগ; অনৈক্য বল হইতে বলের বিয়োগ,—পরস্পরের আঘাতে বলের নাশ। ঐক্য সমন্বয়, অনৈক্য বিভ্রাট। প্রীতি হইতে ঐক্য জন্মে। বিদ্বেষ হইতে অনৈক্য প্রসূত হয়। ঐক্য সাধারণ মঙ্গলের জন্য নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করে। অনৈক্য মানুষকে নিজ-নিজ স্বার্থে বিব্রত করিয়া সাধারণ মঙ্গল নষ্ট করে। ঐক্য ক্ষুদ্র আমিকে বৃহৎ আমির সহিত একীভূত করে।

৩। আনন্দমঠের তৃতীয় সূত্র আত্মোৎসর্গ। যেখানে ঐক্য দেখিবেন, সেখানে আত্মোৎসর্গ থাকিবে। কেন না, আত্মোৎসর্গ ব্যতীত সাধারণ মঙ্গলের জন্য ঐক্য সহ কার্য্য করা অসম্ভব। যাহাকে আমরা আত্মোৎসর্গ বা আত্মবিসর্জ্জন বলি, তাহা আত্মপ্রতিষ্ঠা। ভগবান্ মানুষকে এমন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন যে, আপনাকে বিসর্জ্জন করিলেই আপনাকে লাভ করা যায়। যে মরিতে জানে, সে-ই বাঁচিতে জানে। ধারাবাহিক সাহস, আত্মার স্থায়ী উচ্চভাব—রিপুগণের উপর বিবেকের রাজত্ব—পার্থিব জড়দেহের উপর স্বর্গীয় আত্মার প্রভুত্ব আত্মবিসর্জ্জনরূপে পরিণত হয়। আনন্দমঠের সন্তানগণ স্বদেশের জন্য জগতের সকল সুখভোগলালসা বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, এমন কি, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-গৃহ, যাহার মায়াতে সাংসারিক লোকে মুগ্ধ, তাহা সমস্ত ত্যাগ করিয়াছিলেন। যতদিন স্বদেশের উদ্ধার না হইবে, ততদিন তাঁহারা স্ত্রীর মুখ দেখিবেন না, এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, এবং যদি কখন এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন, তাহা হইলে মরণান্তিক প্রায়শ্চিত্ত করিবেন, ইহাও প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। সন্তানগণ সকলেই সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। একজন মহাপুরুষ বলিয়াছেন—প্রতিভা ও প্রীতি ও পূজা সন্ন্যাসাত্মক। সুতরাং স্বদেশপ্রীতি সন্ন্যাসাত্মক। যে সকল স্বদেশ-প্রেমিক বিলাসে মগ্ন,—সৌখীন দ্রব্যে আসক্ত থাকিয়া তাঁহাদিগের অনুচরগণকে আত্মবিসর্জ্জনের জন্য শিক্ষা দেন, তাঁহাদের স্বদেশপ্রেম সহসা বিশ্বাস করিবেন না। স্বদেশপ্রেমের নেতা সর্ব্বাপেক্ষা ত্যাগশীল হইবেন। কঠোর সন্ন্যাস তাঁহার জীবনের গৌরব,—চরিত্রের মুকুট। দেখুন সত্যানন্দকে অরণ্যে, মঠে, বিজয়লাভের পরে। সত্যানন্দ যখন ইংরেজকে ঘোরতর যুদ্ধে পরাজিত করিলেন, সন্তানগণ তাঁহার মস্তকে রাজমুকুট বসাইতে চাহিলেন, বঙ্গদেশের সিংহাসনে আরোহণ করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু সত্যানন্দ রাজাগিরি চাহেন না,—স্বদেশের উদ্ধার চাহেন।

আবার ওদিকে দেখুন, ঐ বীর ও ঋষি ম্যাট্‌সিনি,—স্বদেশের জন্য সর্ব্বস্বান্ত, নির্ব্বাসিত, শীর্ণ ম্যাট্‌সিনি অন্নাভাবে নিজের সামান্য পরিচ্ছদ বন্ধক দিবার জন্য দোকানে ধীরে ধীরে গমন করিতেছেন; আবার দেখুন, ঐ ঋষি স্বদেশপ্রেমিক সামান্য সৈনিকপুরুষের ন্যায় স্কন্ধে বন্দুক ধারণ করিয়া ক্লান্ত-শীর্ণ-দুর্ব্বল দেহে টলিতে টলিতে সেনাদলের সহিত পদব্রজে স্বদেশ-উদ্ধারকল্পে যুদ্ধযাত্রা করিতেছেন, কিন্তু বহুবৎসর স্বদেশের চিন্তায়, রাত্রি-জাগরণে, নির্ব্বাসনে, কারাবাসে দেহ বড়ই অবসন্ন; তাই ঐ দেখুন, ম্যাট্‌সিনি মূর্চ্ছিত হইয়া ধরাতলে পতিত হইলেন। সত্যই "মন্ত্রের সাধন না শরীরের পতন।" আবার

ম্যাট্‌সিনি উঠিলেন, এবার শরীরের পতন হইল না, মন্ত্রের সাধন হইল। আমাদের শাস্ত্রে আছে, হরিনাম করিলে পাপী পাপমুক্ত হয়। বলিতে কি, ইতালীর ম্যাট্‌সিনির এবং আনন্দমঠের সত্যানন্দের নাম উচ্চারণ করিলে, স্বার্থপরতাকলুষ প্রভৃতি হৃদয়ের মলমালিন্য বিধৌত হইয়া, হৃদয় পবিত্র হয়। কেন না, এবংবিধ পবিত্র মহাপুরুষগণ ভগবানের অংশাবতার—তাঁহারা জাতিবিশেষের উদ্ধারের জন্য, ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য সময়-সময় অবতীর্ণ হন।

৪। আনন্দমঠের চতুর্থ সূত্র ধর্ম্ম। পবিত্র স্বদেশপ্রেম দীপশিখার ন্যায় স্বর্গের দিকে, ভগবানের দিকে উত্থিত হয় এবং ধর্ম্মরূপে পরিণত হয়। ধর্ম্ম আত্মবিসর্জ্জনের অবিরামবাহী নির্ঝর, মানবচিন্তাসাগর-মথনপ্রসূত অমৃত—যাহা পান করিয়া নরদেবগণ অমরত্ব লাভ করেন। স্বদেশপ্রেম স্বদেশীর সঙ্গে মানুষকে একীভূত করে। ধর্ম্ম ভগবানের সহিত মানুষকে সংযুক্ত করে। একদিকে স্বদেশের উদ্দেশে সন্তানগণ যেমন—

"বন্দে মাতরং সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং শস্যশ্যামলাং মাতরং"

গাহিতেছেন, তেমনি অন্যদিকে গাহিতেছেন—

হরে মুরারে মধুকৈটভারে
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সৌরে।

সত্যানন্দ ও সন্তানগণ স্বদেশকে ঈশ্বরের সহিত সমন্বিত করিয়াছিলেন। সন্তানগণ যুদ্ধের সময় যখন গান করিতেছেন, তখন স্মরণ হয় যে, ক্রম্‌ওয়েল্‌-চালিত "পিউরিটান্‌গণ" (puritan) স্তোত্র গাহিতে গাহিতে যুদ্ধে প্রবেশ করিয়া রাজার সেনাদলকে ছিন্নভিন্ন করিতেছে। ধর্ম্ম ব্যতীত আমাদিগের দেশের কখন প্রকৃত উন্নতি হইবে না,—কখন অভ্যুত্থান হইবে না, ইহাই আনন্দমঠের চতুর্থ মন্ত্র।

বঙ্কিমবাবু আনন্দমঠে আর একটি কথা স্বদেশীকে বিশেষ করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। যত্র মতি তত্র গতি। প্রথমে সত্যানন্দের ধনবল বা লোকবল কোন সম্বলই ছিল না। ছিল ভক্তি, ছিল স্বদেশপ্রেম। তাই সেই অসহায় ব্রহ্মচারী একক একটা মস্ত সেনাদল প্রস্তুত করিলেন, স্বদেশ-উদ্ধারে তাহাদিগকে নিযোজিত করিলেন, ইংরেজকে পরাজিত করিলেন। কিন্তু সেই জয়লাভে হিন্দুরাজত্ব স্থাপিত হইল না। ইহাতে বঙ্কিমবাবু আমাদিগকে কি শিক্ষা দিতেছেন? বঙ্কিম আনন্দমঠে ও কবি হেম বৃত্রসংহারে বলিতেছেন—"ফলভোগ করিবার পূর্ব্বে বৃক্ষরোপণ কর—বীজবপন করিবার পূর্ব্বে ক্ষেত্র উপযুক্তরূপে কর্ষণ কর।" অন্য দেশে জাতীয়ভাবের উচ্ছ্বাস দেখা যাইতেছে: কিন্তু ভাই সাবধান, ভাবের তরঙ্গে ধীর বিবেককে হারাইও না। ক্ষেত্রকর্ষণ করিবার মুখ্য সময় আগত। ভগবানের কৃষাণগণ! শান্তি সহ ক্ষেত্রকর্ষণ করুন—গম্ভীরভাবে, নীরবে। অধীর হইয়া আত্মঘাতী হইবেন না। "বন্দে মাতরং" রচয়িতার উপদেশ ভুলিবেন না—"সমাজবিপ্লব অনেকসময় আত্মপীড়ন মাত্র।"

আনন্দমঠের শেষে বঙ্কিমবাবু চিকিৎসকের মুখ দিয়া যে কথা বলিয়াছেন, তাহা অবহিতচিত্তে প্রণিধান করুন।

চিকিৎসক বলিলেন "সত্যানন্দ, কাতর হইও না। তুমি বুদ্ধির ভ্রমক্রমে দস্যুবৃত্তির দ্বারা ধন সংগ্রহ করিয়া রণজয় করিয়াছ।

পাপের কখন পবিত্র ফল হয় না। অতএব তোমরা দেশ উদ্ধার করিতে পারিবে না। আর যাহা হইবে, তাহা ভালই হইবে। ইংরেজ রাজা না হইলে সনাতন ধর্ম্মের পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা নাই। * * প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম জ্ঞানাত্মক—কর্ম্মাত্মক নহে। সেই জ্ঞান দুইপ্রকার—বহির্ব্বিষয়ক ও অন্তর্ব্বিষয়ক। অন্তর্ব্বিষয়ক যে জ্ঞান, সেই সনাতনধর্ম্মের প্রধান ভাগ। কিন্তু বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞান আগে না জন্মিলে অন্তর্ব্বিষয়ক জ্ঞান জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। স্থূল কি, তাহা না জানিলে, সূক্ষ্ম কি, তাহা জানা যায় না। এখন এদেশে অনেকদিন হইতে বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। * * ইংরেজিশিক্ষায়—এদেশীয় লোক বহিস্তত্ত্বে সুশিক্ষিত হইয়া অন্তস্তত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম হইবে * * যতদিন না হিন্দু আবার জ্ঞানবান্, গুণবান্ আর বলবান্ হয়, ততদিন ইংরেজরাজ্য অক্ষয় থাকিবে।"

বর্ত্তমান আন্দোলনকারীদিগকে বঙ্কিমবাবু এই সার কথা বলিতেছেন, যদি দেশের মঙ্গল চাও, ইংরেজের সহিত বৃথা বৈরপোষণ না করিয়া যাহাতে স্বদেশীগণ সকলে জ্ঞানী, গুণী ও বলীয়ান্ হইতে পার, সকলে স্বদেশব্রত ধারণ করে, তাহারই চেষ্টা কর। স্বদেশকে মা মনে করিয়া, স্বদেশীকে নিজের ভাই মনে করিয়া একপ্রাণে আত্মোৎসর্গ করিয়া, ভগবানে মন রাখিয়া, তাঁহাতে সমুদয় কর্ম্ম ন্যস্ত করিয়া, স্বদেশী ক্ষেত্রে কার্য্য কর। স্বর্ণফসল ফলিবে। স্বদেশপ্রেম ও ভগবদ্ভক্তি এক হইয়া যাইবে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায়।

নেশন্ বা জাতি।

[স্বদেশী বা পেট্রিয়টিজম্ প্রবন্ধের অনুবৃত্তি]

নেশন্ হইতে গেলেই জগতের অপরাপর মানবসমষ্টি হইতে পৃথক্ হইয়া দাঁড়াইতে হয়। এই পার্থক্য, এই পরিচ্ছিন্নতা, এই স্বাতন্ত্র্য ব্যতীত নেশনের উৎপত্তি অসম্ভব। কিন্তু কেবল স্বাতন্ত্র্যই স্বপ্রতিষ্ঠা নহে। নেশন্ হইতে গেলে যেমন একদিকে অপর নেশন্ হইতে দেশে, ইতিহাসে, আদর্শে, চরিত্রে, বিবিধ জাগতিক স্বার্থসম্বন্ধে পৃথক্ হওয়া আবশ্যক, সেইরূপ আবার এই সকল ক্ষেত্রেই আপনার মধ্যে বিবিধ ব্যক্তি ও সম্প্রদায়কে বিশেষভাবে সম্মিলিত, পরস্পরের সঙ্গে বিবিধ স্বার্থ ও সাধনার ডোরে আবদ্ধ ও প্রীতির পুটে পাক করিয়া, তাহাদের ঘননিবিষ্টতা সম্পাদন করিতে হয়। অপর নেশনের সঙ্গে ভেদ, আর নিজের নেশনে বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে যথাসম্ভব অভেদ ও একাত্মতার প্রতিষ্ঠা নেশন্‌গঠনের মূলমন্ত্র। বাহিরে যে পরিমাণে বৈষম্য,

ভিতরে সেই পরিমাণে যখন সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইতে আরম্ভ করে,তখনই নেশন্-আদর্শ প্রবল হইতে থাকে ও জাতীয়জীবন অচল প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে বলা যায়।

আমাদের মধ্যে এই সাম্য ও অভেদ প্রতিষ্ঠার উপকরণ বিদ্যমান নাই বলিয়া, কোনোপ্রকারেই যে আমরা আশু-ভবিষ্যতে নেশন্‌রূপে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে পারিব, একদল লোক কিছুতেই এ বিশ্বাস অবলম্বন করিতে পারেন না। এইজন্য তাঁহারা আমাদের বর্ত্তমান স্বদেশচর্য্যে যোগদান করিতে পারিতেছেন না।

ইঁহারা ইংরেজিশিক্ষিত। ইংরেজের ইতিহাস, য়ুরোপীয় সমাজবিজ্ঞান, পাশ্চাত্য-জগতের সঙ্কীর্ণ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অভিজ্ঞতা, ইঁহাদিগকে এমনই অভিভূত করিয়া রাখিয়াছে যে, য়ুরোপ ও মার্কিণে যাহা সম্ভব হয় নাই, জগতের অন্যত্র যে তাহা কদাপি সম্ভব হইতে পারে, এ কথা ইঁহারা কিছুতেই বুঝেন না ও মানেন না। য়ুরোপের বর্ত্তমান প্রতাপশালী নেশন্‌সকল যেভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে, আমরা আজ পর্য্যন্ত সে ভাবের পাকে পতিত হই নাই। য়ুরোপের আধুনিক নেশন্‌সকলে জনমণ্ডলীমধ্যে ভাষাগত, ধর্ম্মগত, সামাজিক রীতিনীতি ও আচার-অনুষ্ঠানগত যে ঐক্য-বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হইয়া, তাহাদিগকে প্রবল ও ঘননিবিষ্ট করিয়া তুলিয়াছে, আমাদের মধ্যে সে সকল ঐক্য তো নাই, কখনো যে সেরূপ সমতা প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহার সম্ভাবনাও দূরপরাহত। ভারতের জনগণের মধ্যে ভাষার বিভিন্নতা, ধর্ম্মের বিভিন্নতা, প্রাচীন ইতিহাস ও কিংবদন্তির বিভিন্নতা, সামাজিক আচার-ব্যবহারের বিভিন্নতা, এই সকল শত প্রকারের ভেদবিরোধ রহিয়াছে। এই ভেদবিরোধের মধ্যে নেশন্‌প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা কোথায়?—ইঁহারা এই প্রশ্নই উত্থাপিত করেন।

এই আপত্তির মূলে নেশনের মূলপ্রকৃতি-সম্বন্ধে দুইএকটা অতি স্থূল ভ্রান্তি বিদ্যমান আছে বলিয়া মনে হয়। য়ুরোপের নেশন্-সকলের মধ্যে এক অর্থে ধর্ম্মের একতা আছে সত্য। তুরস্ক ব্যতীত, আর সমুদায় য়ুরোপীয় সমাজেই কোনো-না-কোনো আকারে খৃষ্টধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু মধ্যযুগে রোমান্‌ক্যাথলিক্ ও প্রোটেষ্টেণ্ট্ খৃষ্টীয়ান্‌সম্প্রদায়দ্বয়ের মধ্যে যে তীব্র বৈরিতা দৃষ্ট হইয়াছে, জগতের ধর্ম্মদ্বন্দ্বের ইতিহাসে তদপেক্ষা তীব্রতর বৈরভাব কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। আজ সে বৈর সর্ব্বত্রই প্রশমিত এবং কোনো কোনো দেশে নিঃশেষ নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছে, অথচ প্রোটেষ্টেণ্ট্ বা রোমান্‌ক্যাথলিক্ কেহই আপনার মত বা সম্প্রদায়কে পরিত্যাগ করেন নাই।

ফলত য়ুরোপের নেশন্-অভিমান কখনো ধর্ম্মের উপরে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, ধর্ম্মাভিমানের দ্বারা পরিপুষ্টও হয় নাই। খৃষ্টপ্রেম যদি য়ুরোপকে সত্যসত্যই অধিকার করিতে পারিত, তবে কদাপি বিভিন্ন খৃষ্টীয়ান্ নেশন্-সকলের মধ্যে বিগত অষ্টাদশশত বর্ষ ধরিয়া এমন হিংসাদ্বেষ, এমন বিরোধ ও শত্রুতা দেখা যাইত না। ইংরেজ—ফরাশী, রুশীয়া এবং জর্ম্মান্‌কে যেরূপ ঘৃণা করে, ফরাশী, রুশীয় ও জর্ম্মান্ ইংরেজকে যেরূপ বিষচক্ষে দর্শন করে,—ভারতে হিন্দুমুসলমানের মধ্যে সে ভাব কখনো দৃষ্ট বা শ্রুত হয় নাই।

প্রাচীনকালে হিন্দু-বৌদ্ধে প্রভূত মত-বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল এবং এক সময়ে ইহারা পরস্পরকে যথেষ্ট ঘৃণা করিত, ইহাও সত্য; কিন্তু য়ুরোপ খৃষ্টানে-খৃষ্টানে যে বৈরিতা প্রদর্শন করিয়াছে, ভারতবর্ষ বৌদ্ধে ও হিন্দুতে সেরূপ কখনো প্রত্যক্ষ করে নাই। এক দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে, আমাদের ধর্ম্মবিশ্বাস ও ধর্ম্মভাব খৃষ্টীয়ান্-সাধনার ভাব ও বিশ্বাস অপেক্ষা বলবত্তর, সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের দেশে স্বধর্ম্ম-নিষ্ঠার সঙ্গে পরধর্ম্মহিংসা এমন অচ্ছেদ্যসূত্রে কখনো আবদ্ধ হয় নাই, যেমন খৃষ্টীয়জগতে বা ইস্‌লামে হইয়াছিল। প্রত্যুত আপনাদিগের ধর্ম্মে, আপনাদিগের আচারে, আপনাদিগের সাধনে ও আদর্শে যে পরিমাণে এদেশের লোক নিষ্ঠাবান্ হইয়াছে, সেই পরিমাণেই তাহারা অপরের ধর্ম্ম, অপরের আচার, অপরের সাধনা ও আদর্শকে উদারচক্ষে দেখিয়াছে। হিন্দুধর্ম্ম সামাজিক ধর্ম্ম,—যে অর্থে খৃষ্টীয়ান্ বা ইস্‌লাম্ সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম, হিন্দুধর্ম্মে সে আকারের সার্ব্বভৌমিকতা প্রকাশিত হয় নাই,—এবং সর্ব্বত্রই সামাজিক ধর্ম্মসকলের মধ্যে পরসমাজের ধর্ম্মের প্রতি যেমন একটা উদাসীন-ঔদার্য্য বিদ্যমান থাকে, হিন্দুধর্ম্মেও সর্ব্বদাই সেইরূপ-উদাসীন্য-সংবলিত একটা মহোদার ভাব রহিয়াছে। আর এই মৌলিক ঔদার্য্যই ক্রমে অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্বের ও নিখিল ভক্তিতত্ত্বের মধ্যে পূর্ণতর ও স্ফুটতর হইয়া, হিন্দুধর্ম্মকে এরূপ একটা সর্ব্বজনীন আদর্শ প্রদান করিয়াছে, যাহা খৃষ্টীয়ান্‌ধর্ম্মের বা ইস্‌লামের মতগত ও মতবদ্ধ সার্ব্বভৌমিকতা দ্বারা আজ পর্য্যন্ত আয়ত্ত হয় নাই, কখনো, মতবন্ধন বিদ্যমান থাকিতে, আয়ত্ত হইবেও না।*

* আধুনিক য়ুরোপীয় ধর্ম্মবিজ্ঞানে একমাত্র মতবদ্ধ ধর্ম্মকেই সার্ব্বিভৌমিক ধর্ম্ম বলা হয়। খৃষ্টানধর্ম্ম, ইস্‌লাম্, বৌদ্ধধর্ম্ম, এই তিনটিই মতবদ্ধ ধর্ম্ম বা credal religion—খৃষ্টের মত, বুদ্ধের মত বা মোহম্মদের মত যেই গ্রহণ করিবে, সে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে খৃষ্টীয়ান্, বৌদ্ধ বা মুসলমান হইতে পারিবে। খৃষ্টীয়ধর্ম্ম বা বৌদ্ধধর্ম্ম বা মোহম্মদীয় ধর্ম্ম কোনো দেশে বা সমাজে আবদ্ধ নহে বলিয়া, এ সকলকে সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম বা universal religion বলা যায়। য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ এই তিনটি ধর্ম্মকেই আজ পর্য্যন্ত সার্ব্বভৌমিক আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। আর যত ধর্ম্ম, সে সকল সামাজিক ধর্ম্ম—ethnic religion; কিংবা জাতীয় ধর্ম্ম বা নেশান্যাল্ রিলিজন্। কিন্তু এ সার্ব্বভৌমিকতা প্রকৃত সার্ব্বভৌমিকতা নহে। যাহা সকলকে অধিকার করিয়া আছে, তাহাই সার্ব্বভৌমিক, তাহার বহির্ভূতে কিছু থাকে না, কিছু থাকিতে পারে না। বিশ্বমানবের সার্ব্বভৌমিকতা যেমন ছোট-বড়, শ্বেতকৃষ্ণ, সভ্যাসভ্য, ভালমন্দ, সকল মনুষ্যকে আলিঙ্গন ও অবলম্বন করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, বিশ্বধর্ম্ম বা সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মও সেইরূপ সকল ধর্ম্মকে, সকল মতকে, সকল সাধনাকে আলিঙ্গন ও অবলম্বন করিয়া আছে, কোনো ধর্ম্ম, কোনো মত তাহার বহির্ভূতে থাকিতে পারে না। ধর্ম্মের ভেদে এই সার্ব্বভৌমিকতা কিছুতেই বিনষ্ট করে না, কিন্তু এই সকল ভেদবিরোধের মধ্যেই ধর্ম্ম আপনার অভেদ ও একাত্মতার প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকে। ঋজুকুটিল বিবিধ প্রণালী অবলম্বনে প্রবাহিত হইয়া জগতের অসংখ্য নদনদী যেমন এক সাগরজলেই গিয়া পতিত হয়, সেইরূপ জগতের অসংখ্য ধর্ম্মমত, ধর্ম্মকর্ম্ম, ধর্ম্মবিশ্বাস ও ধর্ম্মসাধন, ঋজুকুটিল বহু পন্থা অবলম্বনে একই সত্য-বস্তুকে অন্বেষণ করে,—একই সত্যপুরুষের দ্বারা পরিচালিত হয়। সকলের আদিতে, সকলের মধ্যে ও সকলের অন্তে সেই এক সত্যই বিদ্যমান;—ইহাই প্রকৃত সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের তত্ত্ব। এই অর্থে খৃষ্টীয়ান্, বৌদ্ধ, মোহম্মদীয় প্রভৃতি মতবদ্ধ ধর্ম্মসকল অপেক্ষা সামাজিক বা এথ্‌নিক্ যে হিন্দুধর্ম্ম, তাহাই বেদান্তে ও ভক্তিপন্থাতে এক বিশালতর সার্ব্বভৌমিকত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

ধর্ম্মের বন্ধন অত্যন্ত দৃঢ়, স্বীকার করি; কিন্তু ধর্ম্মবন্ধনের এ দৃঢ়তা কোথা হইতে উৎপন্ন হয়, লোকে এ বিচার করে না। যে-খানে ধর্ম্ম কেবলমাত্র একটা মানসিক ব্যাপার,—কতিপয় আন্তরিক ভাবাদিতেই আবদ্ধ,—সেখানে ধর্ম্মের বন্ধনে নেশন্ গড়িয়া উঠে না, আজ পর্য্যন্ত কোথাও গড়িয়া উঠে নাই। পঞ্চনদে ও সিন্ধুদেশে মোহম্মদীয় স্থফি-ধর্ম্মের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হয়। কিন্তু এই স্থফিসাধনায় কাহাকেও কোনোপ্রকারের সমাজবন্ধনে আবদ্ধ করে না। হিন্দুসমাজে অনেক স্থফি আছেন, কেহ কেহ আপনাদিগের সাধনমণ্ডলীমধ্যে গুরুর পদে পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন; হিন্দু-স্থফির মোসলমান-শিষ্য পর্য্যন্ত আছে। এখানে স্থফিধর্ম্ম কেবল-মাত্র একটা মানসিক সাধন বলিয়া, সামাজিক ঐক্যবন্ধনের কোনোই বিশেষ সাহায্য করিতে পারে নাই। খৃষ্টীয়ানধর্ম্মেও সেইরূপ কোথাও নেশন্ গড়িয়া তোলে নাই। ইস্লামে ধর্ম্মত এক হইয়াও, নেশনত্ববিষয়ে, পরস্পর-বিরোধী অনেক জাতি বহুকালাবধিই এই পৃথিবীতে বিদ্যমান রহিয়াছে।

ফলত ধর্ম্মের বন্ধনের দৃঢ়তা কেবল ধর্ম্মে নহে, কিন্তু ধর্ম্মের সঙ্গে, ধর্ম্মের মধ্যে, সর্ব্বত্রই মানবের যে সকল সামাজিক, সাংসারিক ও রাষ্ট্রসম্বন্ধীয় স্বার্থ ও সুখানুসন্ধান জড়িত ও নিহিত থাকে, তাহাতে। এ সকল স্বার্থসন্ধান হইতেই ধর্ম্মবন্ধনের অসাধারণ শক্তি ও দৃঢ়তা উৎপন্ন হইয়া থাকে। যেখানে ইহলোকে স্বার্থ ক্ষীণ, সেখানেও ধর্ম্মে পারলৌকিক স্বার্থ জড়িত হইয়া থাকে। সেই স্বার্থের জন্যই লোকে ধর্ম্মার্থে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে কিঞ্চিন্মাত্রও কুণ্ঠিত হয় না।

মোহম্মদের এবং তাঁহার অব্যবহিত নিকটবর্ত্তী শিষ্যগণের বিষয়ে বীতস্পৃহা জগতে বৈরাগ্যের অত্যদ্ভুত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছে, সত্য; কিন্তু যে শক্তিসহায়ে ইস্লাম্ আপনার জয়পতাকা অর্দ্ধপৃথিবী জুড়িয়া উড়াইতে পারিয়াছিল, সে শক্তি যে মোহম্মদীয় সম্প্রদায়ের সাংসারিক স্বার্থ ও সুখলিপ্সার দ্বারাই পরিপুষ্ট হইয়াছিল, ইহা অস্বীকার করা অসম্ভব। খৃষ্টীয়ধর্ম্মের যে শক্তি য়ুরোপকে অভিভূত করিয়াছিল, তাহাও কদাপি শুদ্ধ পরমার্থের উপরে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, কিন্তু লৌকিক ও সাংসারিক স্বার্থ ও সুখসন্ধানের দ্বারাই চিরদিন পরিপুষ্ট হইয়াছে।

এইরূপ যেখানেই রাষ্ট্রীয়ব্যাপারে বা নেশন্প্রতিষ্ঠায় ধর্ম্মের শক্তি প্রকাশিত হইয়াছে, সেইখানেই সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিচার ও বিশ্লেষণে তাহার মূলে ধর্ম্মমত, ধর্ম্মবিশ্বাস বা ধর্ম্মভাব অপেক্ষা সাংসারিক ও লৌকিক সুখ-স্বার্থের সন্ধানই প্রবলতর ছিল বলিয়া প্রমাণিত হইবে। এই সকল সুখ ও স্বার্থের বন্ধন যেখানে থাকে, সেখানে যখনই ধর্ম্মবিরোধ এই সুখস্বার্থের ব্যাঘাত উৎপাদন করিবে, তখনই তাহা আপনা হইতে প্রশমিত ও নিরস্ত হইয়া যাইবে।

এই ভারতবর্ষেই হিন্দু ও মুসলমানে এরূপ মিল হইয়াছে। মোগলসাম্রাজ্যের অন্তিম-দশায় বঙ্গে ও মহারাষ্ট্রে হিন্দুমুসলমানের বিরোধ জাগিয়া, কখনো শুদ্ধ ধর্ম্মের খাতিরে, রাষ্ট্রীয়-ব্যাপারে কোনো উৎপাত উপস্থিত করে নাই। বাংলার বার ভুঁইয়াদের মধ্যে হিন্দুও ছিলেন,

মুসলমানও ছিলেন; এবং ইঁহারা আপন-আপন স্বার্থরক্ষার জন্য কখন-কখন দিল্লীর মুসলমান পাদিশার বিরুদ্ধে পরস্পরের সঙ্গে সম্মিলিতও হইতেন। এ তো গেল নরপতি-সমাজের কথা; সাধারণজনমণ্ডলীমধ্যেও যে স্বার্থের সমতা হইতে ধর্ম্মবন্ধন অতিক্রান্ত হইয়া এক দৃঢ়তর ঐক্যবন্ধন প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে,—ইংরেজাধিকারে সিপাহীবিপ্লবের ইতিহাসে তাহাও সুন্দররূপে প্রমাণিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ এবং শিখসেনা পাঠান ও রাজপুতের পাশাপাশি দাঁড়াইয়া, সকলের সাধারণ শত্রু ব্রিটিশের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া,আপন-আপন ধর্ম্ম ও স্বার্থকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছে।

বস্তুত ধর্ম্মের বন্ধন নহে, স্বার্থের বন্ধনই জগতে সর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়বন্ধন। ধর্ম্মও এই স্বার্থকে চরিতার্থ করিবার আশ্বাস দিয়াই জনমণ্ডলীর চিত্ত হরণ করিয়া থাকে। এই স্বার্থের বন্ধন যেখানে আছে, সেখানে মতামতের প্রভেদ বা সামাজিক আচারব্যবহারের বিভিন্নতানিবন্ধন নেশন্‌গঠনের কোনো সাংঘাতিক অন্তরায় উপস্থিত হইতে পারে না।

যাঁহারা বলেন যে, ধর্ম্মের বিরোধ ও সামাজিক রীতিনীতির বিভিন্নতা আছে বলিয়া ভারতবর্ষের হিন্দুমুসলমানকে কখনো নেশন-রূপে গড়িয়া তোলা যাইবে না,তাঁহারা যে বন্ধন-রজ্জুতে নেশন্ গড়িয়া উঠে, তাহার মূলপ্রকৃতি কি, ইহা অনুধাবন করিয়া দেখিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। আর ভারতবর্ষে যে নেশন্ গড়িয়া উঠিতেছে, তাহার অভূতপূর্ব্ব চরিত্রও পর্য্যালোচনা করেন নাই। তাঁহারা এ সামান্য কথাটা ভুলিয়া যান যে, এক জাতি বা দশটা জাতি যেভাবে গঠিত হইয়াছে, অপর জাতি-সকলও যে সেইভাবেই গড়িয়া উঠিবে, ইহার কোনো স্থিরতা নাই। মানবচরিত্র এক, এবং এই সাধারণ মানবচরিত্রের ও মানবপ্রকৃতির ঐক্যনিবন্ধন, মানবীয় ইতিহাসের মধ্যেও একটা সামান্য ভাব ও আদর্শ দৃষ্ট হয়। কিন্তু এই ভাব ও আদর্শের ভিতরে বিভিন্ন মানবসমাজের গঠন, তাহাদের বিবর্ত্তনের ইতিহাস, তাহাদের গতি ও নিয়তির মধ্যে কত বিশাল বিভেদ রহিয়াছে। য়ুরোপ যেভাবে নেশন্ গড়িয়াছে, আশিয়াও যে সেই-ভাবেই নেশন্ গড়িবে, এমন কোনো কথা নাই। য়ুরোপে যে বিশালতর, উন্নততর, উদার-তর ও মহত্তর রাষ্ট্রীয়-আদর্শ ফেডারেশন্, বা যুক্তরাজ্যের আকারে ঈষৎ ফুটিয়া উঠিতেছে, কে জানে, আশিয়ায় এবং বিশেষভাবে আমাদের এই ভারতবর্ষেই সেই আদর্শ সত্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবে না। য়ুরোপ নেশন্ গড়িয়া, তাহার উপরে, বিবিধ নেশনের সংযোগে বিশ্ব-নেশনের প্রতিষ্ঠার আশায় চলিয়াছে। ভারতে বহুদিন সমাজ ও সম্প্রদায় গঠিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; কে জানে যে, আমরা য়ুরোপে নেশন্‌গত বৈরিতা নিরস্ত হইবার পূর্ব্বেই, এই সকল সমাজের ও সম্প্রদায়ের স্বাধীন-সংযোগে, ভারতে বিশ্বনেশনের প্রতিষ্ঠা করিয়া বিশ্বপতির কল্যাণবন্ধনে প্রত্যক্ষভাবে জগৎকে আবদ্ধ করিব না? য়ুরোপের সঙ্কীর্ণ অভিজ্ঞতা ও সামান্য জ্ঞানের দ্বারা বিচার করিলে, হয় ত ভারতে নেশন্‌গঠনের উপযোগী সমুদায় উপ-করণ সংগৃহীত হইয়াছে কি না, এ বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইবে। কিন্তু য়ুরোপীয় অভিজ্ঞতাই একমাত্র মানবীয় অভিজ্ঞতা নহে।

য়ুরোপীয় সাধনার উপরে একটা সার্ব্বভৌমিক মানবীয় সাধনা, য়ুরোপের ইতিহাসের বহির্ভূতে একটা সাধারণ ও সর্ব্বজনীন মানবীয় ইতিহাস, য়ুরোপীয় সমাজবিজ্ঞানের উর্দ্ধে ও অতীতে, সমগ্র মানবসমাজের প্রকৃতি ও বিবর্ত্তনের প্রণালীর উপরে প্রতিষ্ঠিত একটা বিশাল বিশ্বব্যাপী সমাজবিজ্ঞান আছে,—তাহার দ্বারা বিচার করিলে, তাহার ইঙ্গিতের প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখিলে, ভারতবর্ষে যে অভিনব প্রণালীতে এক শক্তিশালী বহুশাখ বিশ্বনেশনের উৎপত্তি হইতে পারে, এ বিষয়ে আর সন্দেহ থাকে না।

আমাদের দেশ এক। আমাদের ধর্ম্ম বিভিন্ন হইলেও উদার এবং বহুশতাব্দীকাল একত্র বসবাস করিয়া বহুলপরিমাণে পরস্পরে পরস্পরের ভাব ও আদর্শকে স্বল্পবিস্তর আত্মসাৎ করিয়াছে। আমাদের কুল বিভিন্ন হইলেও বহুশতাব্দীর একত্র বাসে অশেষপ্রকারের সঙ্করবর্ণের সৃষ্টি হইয়া, বহুলপরিমাণে সর্ব্বত্রই কৌলিক প্রভেদের তীব্রতা প্রায় বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছে। আমাদের ভাষা বিভিন্ন, কিন্তু তাহাতে একপ্রদেশবাসীর সঙ্গে অপরপ্রদেশবাসীর ব্যবসাবাণিজ্যাদির কোনো ব্যাঘাত উৎপন্ন হয় নাই। আর যাঁহারা দেশের অগ্রণী, তাঁহাদের মধ্যে—যেমন মুসলমানাধিকারে পারস্য ও আরবী ভাষার চর্চ্চানিবন্ধন, সেইরূপ আজকাল ইংরেজির বহুলপ্রচলনে—ভাববিনিময়ের একটা প্রকৃষ্ট উপায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অতি অল্প আয়াসেই সাধারণ লোকের মধ্যেও ভাষাবিরোধকে কার্য্যত অতিক্রম করিতে পারা যায়। এখনি এক তামিল, কানাড়া, মালাবার প্রভৃতি মান্দ্রাজের দক্ষিণাংশ ব্যতীত, ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই মোটামুটি লোকে ভাঙা-হিন্দি বলিতে পারে,—কাজের কথা বুঝিতে পারে।

একদিকে যেমন নেশন্‌গঠনের অন্তরায়সকল একেবারে দুর্লঙ্ঘ্য নহে, সেইরূপ অন্যদিকে ইংরেজশাসনাধীনে সমগ্র ভারতবর্ষ এমন এক সাধারণ সুখদুঃখের,—এমন এক বিশাল ও জটিল রাষ্ট্রীয়স্বার্থের বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছে যে, ইহাতে যদি আমাদের নেশন্ গড়িয়া না উঠে, তাহা হইলে মানবচরিত্রের ও মানবীয় ইতিহাসের সমুদায় শিক্ষা ও সমুদায় সত্য—মিথ্যা ও নিষ্ফল হইয়া যায়।

আমরা যে নেশন্ হইব, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই; তবে কোন্ পথে গেলে এ বিষয়ে আশু ফললাভের সম্ভাবনা আছে, তাহা বিচার ও বিবেচনাসাপেক্ষ, সন্দেহ নাই।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

শুভবিবাহ।*

রাস্কিন্ এক জায়গায় বলিয়াছেন, মহৎ আর্ট্-মাত্রই স্তব। সেই সঙ্গেই তাঁহাকে বলিতে হইয়াছে, কোনো বড় জিনিষকে সংজ্ঞার দ্বারা বাঁধা সহজ নহে—অতএব, আর্ট্ ব্যাপারটা যে স্তব, সেটা খোলসা করিয়া বোঝানো আবশ্যক।

মানুষ বিশ্বসংসারে যাহা ভালবাসে, আর্টের দ্বারা তাহার স্তব করে। সুন্দর গড়ন দিয়া মানুষ যখন একটা সামান্য ঘট প্রস্তুত করে, তখন সে কি করে? না, রেখার যে মনোহর রহস্য আমরা ফুলের পাপ্‌ড়ির মধ্যে, ফলের পূর্ণতার মধ্যে, পাতার ভঙ্গিমায়, জীবশরীরের লাবণ্যে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি, মানুষ ঘটের গঠনে বিশ্বের সেই রেখাবিন্যাসচাতুরীর প্রশংসা প্রকাশ করে। বলে যে, জগতে চোখ মেলিয়া রেখার এই সকল বিচিত্র সুষমা আমার ভাল লাগিয়াছে।

এইখানে একটা কথা ভাবিবার আছে। বিশ্বপ্রকৃতি বা মানবপ্রকৃতির মধ্যে যাহা-কিছু মহৎ বা সুন্দর, তাহাই আমাদের স্তবের যোগ্য, সুতরাং তাহাই আর্টের বিষয়, এ কথা বলিলে সমস্ত কথা বলা হয় না।

প্রাণের প্রতি প্রাণের, মনের প্রতি মনের, হৃদয়ের প্রতি হৃদয়ের একটা স্বাভাবিক টান আছে। ইহাকে বিশেষভাবে সৌন্দর্য্য বা ঔদার্য্যের আকর্ষণ বলিতে পারি না। ইহাকে ঐক্যের আকর্ষণ বলা যাইতে পারে। আমি মানুষ, কেবল এইজন্যই মানুষের সকল বিষয়েই আমার মনের একটা ঔৎসুক্য আছে। আমি বাঙালী, এইজন্য বাঙালীর তুচ্ছ বিষয়টিতেও আমার মনের মধ্যে একটা সাড়া পাওয়া যায়। গ্রামের দীঘির ভাঙাঘাটটি আমার ভাল লাগে —সুন্দর বলিয়া নয়, গ্রামকে ভালবাসি বলিয়া। গ্রামকে কেন ভালবাসি? না, গ্রামের লোক-জনদের প্রতি আমার মনের একটা টান আছে। কিন্তু গ্রামের লোকেরা যে রামচন্দ্র-যুধিষ্ঠির, সীতা-সাবিত্রীর দল, তাহা নহে—তাহারা নিতান্তই সাধারণ লোক—তাহাদের মধ্যে স্তব করিবার যোগ্য কোনো বিশেষত্বই দেখা যায় না।

যদি কোনো কবি এই ঘাটটির প্রতি তাঁহার অনুরাগ ঠিকমত ব্যক্ত করিয়া কবিতা লিখিতে পারেন, তবে সেই কবিতা কেবল যে এই গ্রামের লোকেরই মনে লাগিবে, তাহা নহে—সকল দেশেরই সহৃদয় পাঠক এই কবিতার রস উপভোগ করিতে পারিবে। কারণ, যে ভাবটি লইয়া এই কবিতা রচিত, তাহা সকল দেশের মানুষেরই পক্ষেই সমান।

এ কথা সত্য যে, অনেক আর্টই, যাহা উদার, যাহা সুন্দর, তাহার প্রতি আমাদের ভক্তি বা প্রীতির প্রকাশ। কিন্তু যাহা সুন্দর নহে, উদার নহে, যাহা সাধারণ,—তাহার প্রতি আমাদের মনের সহজ আনন্দ, ইহাও

---

* মূল্য ৷৹ বার আনা। ২০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, মজুমদার লাইব্রেরি হইতে প্রকাশিত।

আর্টের বিষয়। যদি তাহা না হইত, তবে আর্ট্ আমাদের ক্ষতিই করিত।

কারণ, কেবলমাত্র বাছাই করিয়া জগতের যাহা-কিছু বিশেষভাবে সুন্দর,—বিশেষভাবে মহৎ, তাহারই প্রতি আমাদের রুচিকে বারংবার প্রবর্ত্তিত করিতে থাকিলে আমাদের একটা রসের বিলাসিতা জন্মায়। যাহা প্রতিদিনের, যাহা চারিদিকের, যাহা হাতের কাছে আছে, তাহা আমাদের কাছে বিস্বাদ হইয়া আসে; ইহাতে সঙ্কীর্ণসীমার মধ্যে আমাদের অনুভবশক্তির আতিশয্য ঘটাইয়া আর-সর্ব্বত্র তাহার জড়ত্ব উৎপাদন করা হয়। এইরূপ আর্ট্-সম্বন্ধীয় বাবুয়ানার দুর্গতির কথা টেনিসন্ তাঁহার কোনো কাব্যে বর্ণনা করিয়াছেন, সকলেই তাহা জানেন।

আমরা যে গ্রন্থখানির সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, পাঠকের সহিত তাহার পরিচয়সাধন করাইবার আরম্ভে ভূমিকাস্বরূপ উপরের কয়েকটি কথা বলা গেল।

রাস্কিনের সংজ্ঞা অনুসারে "শুভবিবাহ" বইখানি কিসের স্তব? ইহার মধ্যে সৌন্দর্য্যের ছবি, মহত্ত্বের আদর্শ, কি প্রকাশ পাইয়াছে? ইহার উত্তরে বলিব, এমন করিয়া হিসাব খতাইয়া দেখা চলে না। আপিস হইতে ফিরিয়া আসিলে ঘরের লোক জিজ্ঞাসা করিতে পারে, আজ তুমি কি রোজগার করিয়া আনিলে? লাভের পরিমাণ তখনি তাহাকে গুণিয়া দেখানো যাইতে পারে। কিন্তু বন্ধুবান্ধবের বাড়ী ঘুরিয়া আসিলে যদি প্রশ্ন ওঠে, আজ তুমি কি লাভ করিলে, তবে থলি ঝাড়িয়া তাহা হাতে-হাতে দেখানো সম্ভবপর হইতে পারে না।

সাহিত্যেও কোনো কোনো বিশেষ গ্রন্থে কি পাওয়া গেল, তাহা বেশ স্পষ্ট করিয়া দেখানো যাইতে পারে। কিন্তু এমন গ্রন্থও আছে, যাহার লাভ অমন করিয়া হিসাবের মধ্যে আনা যায় না—যাহা নূতন শিক্ষা নহে, যাহা মহান্ উপদেশ নহে, যাহা অপরূপ সৃষ্টি নহে। যাহা কেবল পরিচিতের সঙ্গে পরিচয়, আলাপীর সঙ্গে আলাপ, বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুত্বমাত্র।

কিন্তু জীবনের আনন্দের অধিকাংশই এইরূপ অত্যন্ত সহজ এবং সামান্য জিনিষ লইয়াই তৈরি। আকস্মিক, অদ্ভুত, অপূর্ব্ব আমাদের জীবনের পথে দৈবাৎ আসিয়া জোটে; তাহার জন্যে যে বসিয়া থাকে বা খুজিয়া বেড়ায়, তাহাকে প্রায়ই বঞ্চিত হইতে হয়।

"শুভবিবাহ" একটি গল্পের বই, স্ত্রীলোকের লেখা, ইহার গল্পের ক্ষেত্রটি কলিকাতা কায়স্থ-সমাজের অন্তঃপুর। এটুকু বলিতে পারি, মেয়ের কথা মেয়েতে যেমন করিয়া লিখিয়াছে, এমন কোনো পুরুষ গ্রন্থকার লিখিতে পারিত না।

পরিচয় থাকিলেই তাহার বিষয়ে যে সহজে লেখা যায়, এ কথা ঠিক নহে। নিত্য-পরিচয়ে আমাদের দৃষ্টিশক্তির জড়তা আনে—মনকে যাহা নূতন করিয়া, বিশেষ করিয়া আঘাত না করে, মন তাহাকে জানিয়াও জানে না। যাহা সুপরিচিত, তাহার প্রতিও মনের নবীন ঔৎসুক্য থাকা একটি দুর্লভ ক্ষমতা।

শুভবিবাহে লেখিকা সেই ক্ষমতা প্রচুর-পরিমাণে প্রকাশ করিয়াছেন। এমন সজীব সত্য চিত্র বাংলা কোনো গল্পের বইয়ে আমরা দেখি নাই। গ্রন্থে বর্ণিত অন্তঃপুর ও অন্তঃ-

পুরিকাগণ যে লেখিকার বানানো, এ কথা আমরা কোনো জায়গাতেই মনে করিতে পারি নাই। তাহারাই দেদীপ্যমান সত্য এবং লেখিকা উপলক্ষ্যমাত্র।

এই বইখানির মধ্যে সামান্য একটুখানি-মাত্র গল্প আছে, এবং নায়কনায়িকার উপসর্গ একেবারেই নাই। অথচ প্রথম খানত্রিশেক পাতা পড়া হইয়া গেলেই মনের ঔৎসুক্য শেষছত্র পর্য্যন্ত সমান সজাগ হইয়া থাকে। অথচ সমস্ত গ্রন্থে কলাকৌশল বা ভাষার ছটা একেবারেই নাই—কেবল জীবন এবং সত্য আছে। যাহা-কিছু আছে, সমস্তই সহজেই প্রত্যক্ষ এবং অনায়াসেই প্রত্যয়যোগ্য।

গ্রন্থে বর্ণিত নারীগুলিকে অসামান্যভাবে চিত্র করিবার চেষ্টামাত্র করা হয় নাই- অথচ তাহাদের চরিত্রে আমাদের মনকে পাইয়া বসিয়াছে, তাহাদের সুখদুঃখে আমরা কিছুমাত্র উদাসীন নই। যিনি ঘরের গৃহিণী, এই গ্রন্থের যিনি "দিদি"—তিনি মোটাসোটা, সাদাসিধা, প্রৌঢ় স্ত্রীলোক, ছেলের উপার্জ্জিত নূতনলব্ধ ঐশ্বর্য্যে অহঙ্কৃত; অথচ তাঁহার অন্তঃকরণে যে স্বাভাবিক স্নেহরস সঞ্চিত আছে, তাহা বিকৃত হইতে পায় নাই; তিনি উপরে ধনিঘরের কর্ত্রী, কিন্তু ভিতরে সরলহৃদয় সহজ স্ত্রীলোক। তাঁহার বিধবা কন্যা "রাণী" কল্যাণের প্রতিমা। অথচ ইঁহার চিত্রে সচেষ্টভাবে বেশি করিয়া রং ফলাইবার প্রয়াস কোনো জায়গাতেই দেখা যায় না। অতি সহজেই ইনি ইঁহার স্থান লইয়া আছেন। নিতান্ত সামান্য ব্যাপারের মধ্যেই ইনি আপনার অসামান্যতাকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন। লেখিকা ইঁহাকে আমাদের সম্মুখে খাড়া করিয়া দিয়া বাহবা লইবার জন্য কোথাও আমাদের মুখের দিকে তাকান নাই। আর সেই "পিসিমা"—অনাথা, সন্তানহীনা,—জনশূন্য বৃহৎঘরে অনাবশ্যক ঐশ্বর্য্যের মধ্যে শ্যামসুন্দরের বিগ্রহটিকে লইয়া যিনি নারীহৃদয়ের সমস্ত অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা প্রশান্ত ধৈর্য্যের সহিত মিটাইতেছেন, তাঁহার চরিত্রে শুভ্র পবিত্রতার সহিত স্নিগ্ধ করুণার, বঞ্চিত স্নেহবৃত্তির সহিত সংযত নিষ্ঠার সুন্দর সমবায় যেন অনায়াসে ফুটিয়া উঠিয়াছে। হঠাৎ পিতৃহীন ভ্রাতুষ্পুত্রটিকে কাছে পাইয়া যখন এই তপস্বিনীর স্ত্রীপ্রকৃতি সুধারসে উচ্ছ্বসিত হইয়া তাহার দেবসেবার নিত্যকর্ম্মকেও যেন ক্ষণকালের জন্য ভুলিয়া গেল, তখন আন্তরিক অশ্রুজলে পাঠকের হৃদয় যেন সুস্নিগ্ধ হইয়া যায়।

রোমান্টিক্ উপন্যাস বাংলাসাহিত্যে আছে, কিন্তু বাস্তবচিত্রের অত্যন্ত অভাব। এজন্যও এই গ্রন্থকে আমরা সাহিত্যের একটি বিশেষ লাভ বলিয়া গণ্য করিলাম। য়ুরোপীয় সাহিত্যে কোথাও কোথাও দেখিতে পাই, মানবচরিত্রের দীনতা ও জঘন্যতাকেই বাস্তবিকতা বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। আমাদের আলোচ্য বাংলা গ্রন্থটিতে পঙ্কিলতার নামগন্ধমাত্র নাই, অথচ বইটির আগাগোড়ায় এমন কিছু নাই, যাহা সাধারণ নহে, স্বাভাবিক নহে, বাস্তব নহে।

বইয়ের মধ্যে যে দুটিএকটি ত্রুটি আমাদের চোখে পড়িয়াছে, তাহাতে আমরা আশ্চর্য্য হইয়াছি। আশ্চর্য্য হইবার কারণ এই যে, মোটের উপর সমস্ত বইয়ের মধ্যে বানাইবার কোনো প্রয়াস দেখা যায় না, এইজন্য তাহার ব্যতিক্রম যদি কোথাও ঘটিয়া থাকে, তবে সেটা আঘাত করে। বিন্দিদাসীর ভাষা লেখিকা

ঠিকমত প্রকাশ করেন নাই, তাহা তিনি বানাইতে গেছেন এবং ভুল করিয়াছেন। এই ভাষায় রাঢ়দেশ এবং পূর্ব্ববঙ্গের খিচুড়ি পাকাইয়া গেছে। মেয়েদের মুখে কোনো কোনো জায়গায় হঠাৎ সাধুভাষা এবং ইংরেজি কথা চলিয়া গেছে। এ সম্বন্ধে পুরুষ সমালোচকের পক্ষে জোর করিয়া কিছু বলা চলে না। আজকালকার বাংলা-বই-পড়ার দিনে মেয়েদের মুখে হয় ত অনেক সংস্কৃত কথা চলিয়া গেছে—হয় ত তাহারা কখন-কখন "বদল" না বলিয়া "পরিবর্ত্তন" বলিলে আশ্চর্য্য হইবার কারণ নাই, কিন্তু "অ্যাপ্রেন্টিস্" ইংরেজিকথাটা যে প্রচলিত হইয়াছে, ইহা আমার বিশ্বাস হয় না। অবশ্য দৈবাৎ কোনো একজন ইংরেজি-না-জানা মেয়ের পক্ষে এ কথাটা জানা সম্ভব, কিন্তু সাধারণ মেয়েদের সঙ্গে কথায়-বাত্রায় এমন অপ্রচলিত কথাটা ব্যবহার করা কি স্বাভাবিক?

সর্ব্বশেষে "মধুরেণ সমাপয়েৎ" করিবার রীতি থাকিলেও প্রকাশককে আমরা মিষ্ট-কথা বলিয়া লেখা শেষ করিতে পারিলাম না। বড়ই অযত্নের সঙ্গে এ বই ছাপা হইয়াছে। এই গ্রন্থে লেখিকা যেমন নিজের আশ্চর্য্য ক্ষমতা, প্রকাশক তেম্নি নিজের অসামান্য অক্ষমতাই প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা ইহা ক্ষমা করিতে পারিলাম না।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বর্ত্তমানযুগের স্বাধীনচিন্তা।

বঙ্গসাহিত্যজগতে আমি পরিচিত নহি, কোন-কালে সেখানে পরিচিত হইবার আশাও আমার খুবই কম। সাহিত্যে প্রতিষ্ঠালাভের কোন আকাঙ্ক্ষা হইতে এই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উৎপত্তি নয়। কিন্তু এই বর্ত্তমান আন্দোলনের ভিতর কার্ না মন শত চিন্তা, শত আবেগে পূর্ণ? সেই আবেগের বশবর্ত্তী হইয়াই এই দুইএকটা কথা লিখিতেছি।

বৈশাখের বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত রামেন্দ্র-বাবুর "বঙ্কিমচন্দ্র"শীর্ষক প্রবন্ধটি পড়িয়াই এই দুইএকটা কথা বলিবার বিশেষ আগ্রহ হয়। সুতরাং যাহা বলিবার, ঐ প্রবন্ধটিকে উপলক্ষ্য করিয়াই বলিব।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার "অনুশীলন"নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"অতি তরুণ অবস্থা হইতে আমার মনে এই প্রশ্ন উদিত হইত, 'এ জীবন লইয়া কি করিব? লইয়া কি করিতে হয়?' সমস্ত জীবন ইহারই উত্তর খুঁজিয়াছি। উত্তর খুঁজিতে খুঁজিতে জীবন প্রায় কাটিয়া গিয়াছে। অনেকপ্রকার লোকপ্রচলিত উত্তর পাইয়াছি, তাহার সত্যাসত্যনিরূপণ জন্য অনেক ভোগ ভুগিয়াছি, অনেক কষ্ট পাইয়াছি। যথাসাধ্য পড়িয়াছি, অনেক লিখিয়াছি; অনেক লোকের সঙ্গে কথোপ-কথন করিয়াছি, এবং কার্য্যক্ষেত্রে মিলিত

হইয়াছি। সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, দেশী-বিদেশী শাস্ত্র যথাসাধ্য অধ্যয়ন করিয়াছি। জীবনের সার্থকতাসম্পাদন জন্য প্রাণপাত করিয়া পরিশ্রম করিয়াছি। এই পরিশ্রম, এই কষ্টভোগের ফলে এইটুকু শিখিয়াছি যে, সকল বৃত্তির ঈশ্বরানুবর্ত্তিতাই ভক্তি, এবং সেই ভক্তি ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই। 'জীবন লইয়া কি করিব?' এ প্রশ্নের এই উত্তর পাইয়াছি। ইহাই যথার্থ উত্তর, আর সকল উত্তর অযথার্থ। লোকের সমস্ত জীবনের পরিশ্রমের এই শেষ ফল; এই একমাত্র সুফল। তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছিলে, আমি এ তত্ত্ব কোথায় পাইলাম? সমস্ত জীবন ধরিয়া, আমার প্রশ্নের উত্তর খুঁজিয়া এতদিনে পাইয়াছি। তুমি একদিনে ইহার কি বুঝিবে?"

এই কথাগুলির ভিতর আমরা এই কয়টি বিষয় পরিষ্কার দেখিতে পাই—

১। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনে অতি "তরুণ বয়সেই" এক গভীর জীবনসমস্যা আসিয়াছিল।

২। কোন "লোকপ্রচলিত উত্তরে" তিনি সন্তুষ্ট হন নাই, "তাহার সত্যাসত্য-নিরূপণ জন্য অনেক ভোগ ভুগিয়াছেন, অনেক কষ্ট পাইয়াছেন।"

৩। এই সকল কষ্টের ভিতর একটি—সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, দেশী-বিদেশী শাস্ত্র যথাসাধ্য অধ্যয়ন করা।

৪। প্রশ্নের যে উত্তর পাইয়াছিলেন, তাহা সমস্তজীবনব্যাপী অন্বেষণের ফল।

৫। এই উত্তর—সকল বৃত্তির ঈশ্বরানুবর্ত্তিতাই ভক্তি, এবং সেই ভক্তি ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই।

৬। এই উত্তরের যাহাই অর্থ হউক না কেন, কেহ একদিনে তাহা বুঝিতে পারে না।

আজ আমাদের দেশের চিন্তাশীল, ভাবুক, সুপণ্ডিত "দেশনায়কেরা" এক গভীর আন্দোলনের ভিতর ডুবিয়াছেন। মানুষের শরীর, মন ও আত্মা কতদূর "নমনীয় ও দ্রবণীয়" এবং তাহার বিশ্লেষণে নাইট্রিক্ এসিডেরই বা কতদূর উপযোগিতা, তাহা আমার জানা নাই,—কিন্তু তাহাদিগের একটা আমূল বিশ্লেষণপূর্ব্বক সমস্ত উপকরণগুলিকে পৃথক্ করিয়া, তাহাদিগের মধ্যে যেগুলি "বিদেশী"মার্কা, সেগুলি কেন আসিল, কবে আসিল, তাহা স্থির করিয়া, সেই বিদেশী ঋণকে একেবারে সমস্ত সংস্পর্শ হইতে ঝাড়িয়া-ফেলিয়া দিবার যেন একটা চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। এখন যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, বঙ্কিমচন্দ্রের ভিতর এ জীবন-সমস্যা কোথা হইতে আসিল?—"লোক-প্রচলিত উত্তরে" সন্তুষ্ট না হইতেই বা কে তাঁহাকে শিক্ষা দিল? যেখানে শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় স্বপ্রতিষ্ঠ প্রতিভাশালী ধর্ম্মজিজ্ঞাসুও "বেদান্ত-বাক্যমীমাংসা তদবিরোধিততর্কোপকরণা" আপনার জন্য এই বিধি বাঁধিয়া-লইয়া তবে তাঁহার ভাষ্যপ্রণয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সেখানে আপনার "জীবনপাতকে" প্রধান অবলম্বন করিয়া জীবনসমস্যার মীমাংসা খুঁজিতে বঙ্কিমচন্দ্রকে কে পরামর্শ দিল? এই সকল প্রশ্নের উত্তর কে কিরূপ দিবেন, জানিতে বড়ই কৌতূহল হয়।

আমাদের বর্ত্তমান আন্দোলনে একটা স্থানে, আমার মনে হয়, বড় একটা শূন্য ও অন্ধকার থাকিয়া গেছে, সেদিকে বড়

কেহ মনোযোগ করেন নাই। এই উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সমস্ত ইতিহাসের মূলে একটা ভাব আছে,—যাহা পশ্চিমেরও নয়, পূর্ব্বেরও নয়, যাহা বিদেশী নয়, স্বদেশীও নয়, কিন্তু যাহা এই যুগের,—সে ভাব—এই বর্ত্তমান যুগের স্বাধীনচিন্তা।

উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সমস্ত ইতিহাসে,—তাহার বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, রাজনীতি,সামাজিক ব্যবস্থা, ধর্ম্মবিশ্বাসের ভিতর—এই স্বাধীনচিন্তার ক্রমবিকাশ বর্ণনা করিবার আমার এখানে অবকাশ নাই। আমি কেবল একটা কথা এইখানে পরিষ্কার করিয়া বলিতে চাই—এই স্বাধীনচিন্তা কোন দেশ বা ভূভাগ, বা সম্প্রদায়বিশেষের সম্পত্তি নয়। শুধু তাহা নয়, সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ অথবা অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া, নানা জটিল, বন্ধুর, প্রস্তরসঙ্কুল পথে কত-সময় বিপরীত-পথাবলম্বী অথচ সকল-সময় অপ্রতিহতগতি এই স্বাধীনচিন্তার স্রোত ঠিক এই বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্যজগতে যেখানে আসিয়া পৌছাইয়াছে, তাহার ভিতর পূর্ব্বজগতের চিন্তা, বিশেষত ভারতবাসী, বঙ্গবাসীর চিন্তার প্রভাব কতদূর পর্য্যন্ত মিশ্রিত আছে, সে বিষয়ে কয়জনের ধারণা পরিষ্কার, তাহা আমি সন্দেহ করি।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে, এই স্বাধীনচিন্তার স্রোত দুইটি বিপরীত গতিতে চলিয়া আসিয়াছে,—একটি ভাঙিবার পথ, আর একটি গড়িবার পথ। অথচ দুইটিকে লইয়া একই পথ,—একটির ভিতর দিয়া না আসিলে আর একটিতে আসিবার উপায় ছিল না। যেমন ভারতবর্ষে, ঠিক তেমনই পশ্চিমজগতে গুটিকয়েক জিনিষ মানুষের সমস্ত উন্নতির পথকে অবরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল,—তাহাদের নাম,—অভ্রান্ত ধর্ম্মশাস্ত্র, দেশাচার ও পুরোহিতবর্গ। এখানে যেমন শঙ্করাচার্য্যের "বেদান্তবাক্যমীমাংসা তদবিরোধিতর্কোপকরণা", সেখানে তেমনি Anselmএর "Credo ut intelligam"—"বিশ্বাস করি, পরে বুঝিতে পারিব" এই মূলমন্ত্রকে অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মাচার্য্যের মানুষের সমস্ত মনুষ্যত্বনাশকারী একাধিপত্য, দেশাচারের হৃদয়শূন্য পেষণ, পূর্ব্বপ্রচলিত সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার অপরিবর্ত্তনীয় লৌহশাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। মানবপ্রকৃতি ও সমাজের এই লৌহশৃঙ্খল ভাঙিবার কাজ যখন আরম্ভ হয়, তখন স্বাধীনচিন্তার নাম ছিল—প্রতিবাদ, উপহাস, ব্যক্তিগত জ্ঞান, ব্যক্তিত্বের প্রাধান্য, শাস্ত্রশূন্য ধর্ম্ম, দর্শন, বিজ্ঞান ও সমাজ। পাশ্চাত্যজগতেই ইহার আরম্ভ।

এই অগ্নিময়, বিপ্লবপূর্ণ, কঠোর, অথচ মঙ্গলপূর্ণ পথ অতিবাহিত করিয়া স্বাধীনচিন্তা যখন গড়িবার পথে প্রবেশ করিলেন, তখন তাঁহার নাম হইল—গবেষণা, স্বাধীন অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ উচ্চতর শাস্ত্রবিবেক (Higher Criticism), অভ্রান্তবুদ্ধিতে নয়, কিন্তু ভক্তিসম্মার্জ্জিত জ্ঞানে শাস্ত্র-আলোচনা। সমস্ত পাশ্চাত্যজগতের চিন্তা অনন্যমনা হইয়া এখন এই পথে চলিয়াছে; কিন্তু এ পথে প্রথম পথপ্রদর্শক, জগতের শিক্ষাগুরু একজন বাঙালী। তাঁর নাম রাজা রামমোহন রায়।

য়ুরোপ, আমেরিকা এ ঋণ অস্বীকার করে না। কিন্তু য়ুরোপ, আমেরিকা ভারত

বর্থ নয়। সেখানে একটি চিন্তার বীজ পড়িতে না পড়িতে, চিন্তায়, দর্শনে, সাহিত্যে, সমাজে তাহা অসংখ্য আকারে পল্লবিত হইয়া কতই ফুলফল প্রসব করে। রামমোহন রায়ের মূলমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, য়ুরোপ ও আমেরিকা আজ সেই মন্ত্রে অনুপ্রাণিত রাশিরাশি সাহিত্য ও দর্শন জমা করিয়াছে; আপনাকে হারাইয়া ফেলিব, এ ভয় না রাখিয়া সকল ভূভাগের সকল বিদেশী জাতির শাস্ত্র ও সমাজতত্ত্ব যথাসাধ্য অধ্যয়ন করিতে চেষ্টা করিয়াছে; এই নবীন স্বাধীনতার নবীনোজ্জ্বল দৃষ্টিতে পুরাতন সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মতত্ত্ব ও আপনাদের স্বদেশী শাস্ত্র ও সমাজতত্ত্বকে নূতন করিয়া পড়িতে শিখিয়াছে, এবং তাহার ফলে নূতন উদ্যমে সমস্ত সমাজের ভিতর এক নূতন উদারজীবনের সূত্রপাত করিবার জন্য আজ প্রস্তুত। অবশ্য এ পথে সকল বাধা এখনও তিরোহিত হয় নাই, কিন্তু ভাবী ফলের সম্বন্ধে এখন আর কেহই সন্দেহ করিতে পারে না। আমেরিকার সম্বন্ধে এখন কিছু বলিব না, কিন্তু ইংলণ্ডের সম্বন্ধেই বলি। Mr. Birrellএর Education Bill লইয়া আজ ইংলণ্ডে তুমুল আন্দোলন। বড় বড় Bishopএরা অগ্নিশর্ম্মা হইয়াছেন, Catholic ধর্ম্মযাজকেরা Civil warএর পর্য্যন্ত ভয় দেখাইতেছেন। কিন্তু ইংরেজজাতির মন আজ প্রস্তুত। Act of Uniformity ও Test Act উঠাইয়া দেওয়া, Catholic Emancipation, Universities হইতে religious tests উঠাইয়া দেওয়া,—এই সব দৃষ্টান্ত সেই জাতির সম্মুখে। প্রয়োজন হইলে আজ Liberal Government নূতন করিয়া General election করিয়া সমস্ত ইংরেজজাতির হস্তে এই গভীর সুদূরব্যাপী শিক্ষাসমস্যার মীমাংসার ভার দিতে প্রস্তুত।

বাস্তবিক আসল প্রশ্ন এই, ধর্ম্মবিশ্বাস বা ধর্ম্মজ্ঞান কাহাকে বলি? হয় ত অসম্ভব নয়, এমন কেহ থাকিতেও পারেন, যিনি বলিবেন—

"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ",
"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন,"

ইত্যাদি বচনগুলি কণ্ঠস্থ করার নামই ধর্ম্মজ্ঞান। কেহ বলিবেন, না, তাহার সঙ্গে শঙ্করাচার্য্যের ব্যাখ্যাটি জানা চাই, সাবধান, আর কাহারও ব্যাখ্যা শিখিও না। কেহ বলিবেন, না, তাহাও না, শঙ্করাচার্য্য কবে কোন্ কালের লোক ছিলেন, এখন তোমার গ্রামের বা পাড়ার ভক্তিবিনোদমহাশয়, সাবধান বেদান্তবাগীশমহাশয় নয়, যা বোঝান, সেইটি বোঝা চাই। কেহ বলিবেন, না, উদার হওয়া চাই, শুধু গীতা পড়িলে হইবে না, তাহার সঙ্গে বেদান্ত পড়, বাইবেল্ পড়, বৌদ্ধ ও মুসলমান শাস্ত্রকেই বা বাদ দাও কেন? এরূপ অবস্থায় যদি কেহ বলেন, ধর্ম্মজ্ঞান তাহারই নাম, যাহা ভিতরে থাকিলে ঐ কথাগুলির অর্থ বোঝা যায়,—কোন্‌টি আপনার ধর্ম্ম ও আপনার শাস্ত্র, তাহা চেনা যায় এবং তাহা আপনার জীবনে প্রয়োগ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে কথাটা কি নিতান্তই অসঙ্গত হইবে? ইহারই নাম স্বাধীনচিন্তা। এবং যে শিক্ষা ও সাধনে, যে "অনুশীলনে" এই স্বাধীনচিন্তার স্ফুরণ হয়, তাহাই যথার্থ ধর্ম্মশিক্ষা ও সাধন, তাহাই অনুশীলনধর্ম্ম।

আত্মজ্ঞান, আত্মসম্মান, আত্মনির্ভরের গভীর সুদৃঢ় ভিত্তির উপর এই স্বাধীনচিন্তা

প্রতিষ্ঠিত; জগৎসংসার কেবল সেই এক, অখণ্ড অচিন্ত্য জ্ঞানেরই বিকাশ, এই সত্যকে অবলম্বন করিয়া ইহার দিগন্তব্যাপী, অপ্রতিহত প্রসার। ইহা যথেচ্ছাচারী বা অসংযতবুদ্ধি নয়; সহজ মানবপ্রকৃতিতে ইহার মূল থাকিলেও, ইহা কঠোর সাধন, শিক্ষা ও অনুশীলন সাপেক্ষ। নির্ভীকতা ইহার প্রকৃতি, বিশ্বরূপদর্শন ইহার আকাঙ্ক্ষা, বিভূতিযোগ ইহার সাধনের সামগ্রী। রাজা রামমোহন রায় ইহাকে শুধু যে শাস্ত্রানুশীলনোন্মুখী করিয়াছিলেন,তাহা নয়; কিন্তু ইহার নির্ভীক-চিত্ততা এবং দেশী-বিদেশী সকল শাস্ত্রচর্চ্চার মধ্যে ইহার সুদৃঢ় আত্মপ্রতিষ্ঠার শক্তির জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন। মহর্ষিও অভ্রান্ত শাস্ত্রবাদকে পরিহার করিয়া গভীর ভক্তিপূর্ণ জীবনগত শাস্ত্রানুশীলন কি, নিজজীবনে তাহা শিখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের পরবর্ত্তী আর একজন শাস্ত্রে পাণ্ডিত্যাভিমানশূন্য হইয়াও, সকল শাস্ত্রে ও সকল মহাপুরুষে বিভূতিযোগের গভীর মন্ত্র নিজজীবনে উপলব্ধি করিয়া তাহারই কথা বলিয়া গিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে এ প্রবন্ধে আমি নীরব থাকিব। বঙ্কিমচন্দ্রেরও জীবনের ও শিক্ষার মূলমন্ত্র এই নির্ভীক, অপ্রতিহত, দিগন্তব্যাপী স্বাধীনচিন্তা। তাঁহারও শাস্ত্রালোচনার মূলে এই ভাব, শাস্ত্রালোচনার উপায় ও উদ্দেশ্য এই ভাবেরই অনুশীলন ও উৎকর্ষ। "অনেক ভোগ ভুগিয়াছি, অনেক কষ্ট পাইয়াছি। সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, দেশী-বিদেশী শাস্ত্র যথাসাধ্য অধ্যয়ন করিয়াছি। জীবনের সার্থকতাসম্পাদন জন্য প্রাণপাত করিয়া পরিশ্রম করিয়াছি। এই পরিশ্রম, এই কষ্টভোগের ফলে এইটুকু শিখিয়াছি যে, সকল বৃত্তির ঈশ্বরানুবর্ত্তিতাই ভক্তি, এবং সেই ভক্তি ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই।"

রামেন্দ্রবাবু কিন্তু তাঁহার "বিশ্লেষণের" ফলে বলিতেছেন—"বঙ্গদর্শনের বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্য-শিক্ষার মোহবন্ধন সম্পূর্ণ কাটাইয়াছিলেন কি.না, বলিতে পারি না; কিন্তু প্রচারের পশ্চাতে যে বঙ্কিমচন্দ্র দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁহাকে রাহুগ্রাসমুক্ত পূর্ণচন্দ্রের মত দীপ্তিমান্ দেখি।" জানি না, আমি যাহাকে স্বাধীনচিন্তা বলিলাম, রামেন্দ্রবাবু তাহাকেই "পাশ্চাত্যশিক্ষার মোহবন্ধন" ও "রাহুগ্রাস" বলিয়া ভাবেন কি না, কিন্তু তাহা না ভাবিলে নিম্নলিখিত কথাগুলিরই বা উপযোগিতা [illegible]? "ধর্ম্মতত্ত্বের অনুসন্ধানে [illegible] অনাবশ্যক হইলেও আমরা [illegible] পরিশ্রমে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম; এমন সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র আমাদি[illegible] আপন ঘরে প্রত্যাবর্ত্তনের [illegible] দিলেন।" অবশ্য এই উত্তাপক্লিষ্ট দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশে আপনার অর্দ্ধশীতল অর্দ্ধ-অন্ধকার গৃহকোণে যে সুখে শয়ান আছে, তাহাকে পর্য্যটনের পরিশ্রমের ভিতর আহ্বান করাতে, অথবা সে কথা শুনাইতেও একটা নিষ্ঠুরতা আছে, তাহা স্বীকার করি। কিন্তু আবার এ কথাও বলিতে হয়, এই পরিশ্রমে যিনি বিমুখ, পর্য্যটনের অনন্য-উপায়-লভ্য আনন্দ, শিক্ষা, অর্জ্জন ও সময়ে-সময়ে গভীর জয়োল্লাস হইতেও তিনি বঞ্চিত।

এ বিষয়ে আর একটি ছোট কথা আছে। সেটি ইতিহাসের বিষয়। রামেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন—"এ কথা গোপন করিবার

প্রয়োজন নাই যে,ঐ দুই মহাপুরুষের (মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের) অনুবর্ত্তীরা ধর্ম্মতত্ত্বের অনুসন্ধানের জন্য বিদেশে যাত্রা আবশ্যক বোধ করিয়াছিলেন এবং অন্য দেশের অন্য জাতির শাস্ত্র হইতে সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের সারসঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।" রামেন্দ্রবাবুর মত লোকের লেখনী হইতে ঐ দুই মহাপুরুষের সম্বন্ধে এই অতি "অনাবশ্যক" ঐতিহাসিক অবিচারটুকু কেন? মহর্ষি অবশ্য কখন পশ্চিমসাগরে তাঁহার প্রিয় "বোট্"কে ভাসান নাই; কিন্তু পূর্ব্বসাগরে তাহা খেয়া দিয়াছিল; এবং তাঁহার নিজের মুখ হইতে চীন, বৌদ্ধ, শিখেদের কথা যে শুনিয়াছে, সে কি কোনদিন তাহা ভুলিবে? আর, রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে কি বিশেষ করিয়া কিছু বলিতে হইবে?

বঙ্কিমচন্দ্রের সম্বন্ধে কিন্তু একটু কথা আছে। বিদেশীশাস্ত্রের আলোচনাকে রাজা রামমোহন রায় যেরকম করিয়া দেখিয়াছিলেন, তিনি ঠিক সেরকম করিয়া দেখেন নাই। তাঁহার নিজের স্বাধীনচিন্তার অনুশীলনে তিনি বিদেশীশাস্ত্র পড়িয়াছিলেন, এ কথা তিনি নিজেই বলিয়াছেন, কিন্তু অন্যের জন্য তিনি যে অনুশীলনের পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে বিদেশীশাস্ত্রের উল্লেখ নাই। এ বিষয়ে তাঁহার শিক্ষা এই—

গুরু। জ্ঞানের দ্বারা সমুদায় ভূতকে আপনাতে এবং ঈশ্বরে দেখিতে পাওয়া যায়, ইতিবাক্যে কাহার কাহার পরস্পর সম্বন্ধ জ্ঞেয় বলিয়া কথিত হইয়াছে?

শিষ্য। ভূত, আমি, এবং ঈশ্বর।

গুরু। ভূতকে জানিবে কোন্ শাস্ত্রে?

শিষ্য। বহির্বিজ্ঞানে।

গুরু। অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীতে কোম্তের প্রথম চারি:—Mathematics, Astronomy, Physics, Chemistry, গণিত, জ্যোতিষ, পদার্থতত্ত্ব, এবং রসায়ন। এই জ্ঞানের জন্য আজিকার দিনে পাশ্চাত্যদিগকে গুরু করিবে। তার পর আপনাকে জানিবে কোন্ শাস্ত্রে?

শিষ্য। বহির্বিজ্ঞানে এবং অন্তর্বিজ্ঞানে।

গুরু। অর্থাৎ কোম্তের শেষ দুই—Biology, Sociology। এ জ্ঞানও পাশ্চাত্যের নিকট যাচ্ঞা করিবে।

শিষ্য। তার পর ঈশ্বর জানিব কিসে?

গুরু। হিন্দুশাস্ত্রে। উপনিষদে, দর্শনে, পুরাণে, ইতিহাসে, প্রধানতঃ গীতায়।

যিনি মানুষের সমুদায় বৃত্তিরই ঈশ্বরানুবর্ত্তিতাকে ভক্তি বলিয়াছেন, এবং যাঁহার কাছে ধর্ম্ম অর্থে কেবল রিলিজন্ নয়, তাঁহার পক্ষে ঈশ্বরজ্ঞানের উপায়কে এইরূপে সঙ্কীর্ণ করিয়া দেওয়া কতদূর সঙ্গত হইল, সে বিচারে আমি এখন প্রবৃত্ত হইব না।

মূল কথাটা কিন্তু এই। পৃথিবীর প্রধান প্রধান ধর্ম্মের ভিতর একই সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মতত্ত্ব নিহিত আছে, এ বিষয়ে—এখন যেমন দুইমত হওয়া একরূপ অসম্ভব; তেমনি প্রত্যেক জাতীয়ধর্ম্মের একটি বিশেষত্ব আছে, এবং যতদিন জাতীয়জীবনের বিশেষত্ব থাকিবে, ততদিন সেই ধর্ম্মের বিশেষত্বও থাকিবে, এ বিষয়েও এখন দুইমত হওয়া একরূপ অসম্ভব। কিন্তু সেই জাতীয়ধর্ম্মের রক্ষা, উন্নতি, চিরজীবন্ত ভাবের জন্য, জাতীয় শাস্ত্র ও সমাজতত্ত্বের আলোচনা, কোন অভ্রান্ত-

বুদ্ধিতে না করিয়া যদি স্বাধীনচিন্তাদ্বারা করিতে হয়, তাহা হইলে সেই স্বাধীনচিন্তাকে বর্দ্ধিত, পুষ্ট, 'সম্মার্জ্জিত,' সুতীক্ষ্ণ, উজ্জ্বল ও ফলপ্রসূ করিতে হইলে, তাহাকে কেবল সেই জাতীয়শাস্ত্রেরই গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ রাখা শ্রেয়, না তাহাকে নির্ভীকচিত্তে সকল শাস্ত্র ও সমাজতন্ত্রের আলোচনাতেই অধিকার দেওয়া অধিকতর অনুকূল?

'বিদেশী'নামমাত্রেই একটা আতঙ্ক থাকিলে তাহা কি স্বদেশীভাবের গৌরব না দুর্ব্বলতা প্রকাশ করে? শুধু আতঙ্ক নয়, শিক্ষাসম্বন্ধেও বিদেশীর সংস্পর্শে যেন কোন অলক্ষিত অপমান বা কলঙ্ক সেই জ্ঞানকে চিরদুষ্ট করিয়া দিতে পারে—এইরূপ একটা ভাব যেন কাহারও কাহারও মনে প্রবেশ করিয়াছে। "বাঙালীর মুখে 'বয়কট্'শব্দের আস্ফালনে আমি বারংবার মাথা হেঁট করিয়াছি" এ কথা বলিতে গিয়াও, রবীন্দ্রবাবু তাঁহার "দেশনায়ক"শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—"কচ দৈত্যগুরুর আশ্রমে আসিয়া দৈত্যদের উৎপীড়ন ও গুরুর অনিচ্ছা সত্ত্বেও ধৈর্য্য ও কৌশল অবলম্বনপূর্ব্বক বিদ্যালাভ করিয়া দেবগণকে জয়ী করিয়াছেন। জাপানও য়ুরোপের আশ্রম হইতে এইরূপ কচের মতই বিদ্যালাভ করিয়া আজ জয়যুক্ত হইয়াছেন। দেশের যাহাতে ইষ্ট, তাহা যেমন করিয়াই হউক, সংগ্রহ করিতে হইবে, সেজন্য সমস্ত সহ্য করা পৌরুষেরই লক্ষণ—তাহার পর সংগ্রহকার্য্য শেষ হইলে স্বাতন্ত্র্যপ্রকাশ করিবার দিন আসিতে পারে।" সঙ্কোচ ও অপমানবোধের ভিতর, কেবল প্রয়োজনসাধনের কঠোর পেষণে শত্রুপক্ষ হইতে সেই শত্রুহস্ত হইতে উদ্ধারেরই উপায়স্বরূপ—জ্ঞানসংগ্রহের নীতি সমর্থনের এই প্রয়াস পড়িয়া—ভট্টপাদের কাশীধামে শঙ্করাচার্য্যের সম্মুখে অগ্নিপ্রবেশের কথা মনে হয়। গুপ্তবেশে বৌদ্ধগুরুর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিয়া, বৌদ্ধসম্প্রদায়েরই বিরুদ্ধে অভিযানরূপ পাপের তিনি অগ্নিপ্রবেশ ভিন্ন অন্য প্রায়শ্চিত্ত দেখিতে পান নাই। বাস্তবিক গুরুকে যদি কেবল শত্রুজ্ঞানই থাকে, তবে সেই শত্রুকেই দমনের জন্য তাঁহার নিকট শিক্ষা কখন কি সম্ভব, অথবা সঙ্গত, অথবা নীতিশাস্ত্রের অনুমোদিত হইতে পারে? কিন্তু আমাদের অবস্থা কি বাস্তবিকই এইরূপ?

বর্ত্তমানযুগে শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে জাতীয়জীবনের কি সম্বন্ধ, তাহা যদি আমরা ভাবিয়া দেখি, তাহা হইলে এ বিষয়টা কতকটা পরিষ্কার হইতে পারে এবং এই সমস্ত অমূলক ও অনর্থকারী দ্বিধা আসিয়া আমাদের মনকে উদ্বিগ্ন ও মলিন করিতে পারে না। এখন জার্ম্মণি ইংলণ্ডের নিকট শিক্ষা করে, ইংলণ্ড জার্ম্মণির নিকট শিক্ষা করে, তাই বলিয়া কি ইংলণ্ড ও জার্ম্মণি নিজ নিজ জাতীয় অধিকার ভুলিয়া যায়? কাল যদি Morocco কি Egypt লইয়া ইংলণ্ড ও জার্ম্মণির ভিতর যুদ্ধ বাধে, তাহা হইলে কি ইহারা পরস্পরের বিদ্যা, বিজ্ঞান, শাস্ত্রকে তুচ্ছ করিবে? শুধু তাহাই নয়; জাতীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা ত আর ব্যক্তিগত বিদ্বেষ বা শত্রুতার সঙ্গে এক জিনিষ নয়। যুদ্ধক্ষেত্রেও ত যুদ্ধাবসানে শত্রু শত্রুকে সম্মান করে, সহানুভূতি করে। অবশ্য ইংলণ্ডের সঙ্গে জার্ম্মণির যে সম্বন্ধ, আমাদের সে সম্বন্ধ নয়, এ কথা স্বীকার

করি, হাড়ে-হাড়ে অনুভব করি। কিন্তু তবুও জাতীয়জীবন ও জাতীয় উদ্দেশ্যের জন্য প্রাণপাত করিতে প্রস্তুত থাকিয়া, সমস্ত ব্যক্তিগত সম্বন্ধে মনকে সকল ক্ষুদ্রতা, সকল মলিনতা, সকল পাপচিন্তা হইতে অনেক উর্দ্ধে রাখিতে আমাদের ধর্ম্ম কি আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবেন না? ইহা ভিন্ন নিষ্কামধর্ম্মের আর কি অর্থ, তাহা আমি জানি না। এ প্রসঙ্গে কচ-দৈত্যগুরুর কথা না ভাবিয়া অর্জ্জুন ও ভীষ্মদ্রোণের সঙ্গে কি সম্বন্ধ, সকলে একবার ভাবিয়া দেখুন।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা বলিতে ইচ্ছা করে। কিছুদিন হইতে কাহারও কাহারও মুখে শুনিয়া আসিতেছি যে, রাজনৈতিক আন্দোলন—একটা ভিক্ষা; যাঁহারা এ কথার প্রতিবাদ করিবেন ভাবিয়াছিলাম, অল্পে অল্পে তাঁহাদের ভিতরেও যেন এই ভাবের অল্পাধিক সঞ্চার হইতেছে বলিয়া মনে হয়; কিন্তু আমার আজও কথাটা হৃদয়ঙ্গম হইল না। অবশ্য ভিক্ষাবৃত্তি যদি আমাদের মনে থাকে,—আমাদের প্রকৃতিগত হয়, তবে আমাদের রাজসিংহাসনে বসাইয়া দিলেও আমরা ভিক্ষাই করিব। নতুবা রাজনৈতিক আন্দোলন ভিক্ষা নয়। ইহা নিরস্ত্র সংগ্রাম। ইহাতে রাজশক্তি ও প্রজাশক্তির সমস্ত অথবা অংশবিশেষের সহিত যুক্তিবলের সংঘর্ষে দেশের রাজনৈতিক-ব্যবস্থা-সম্বন্ধে যাহা ন্যায়সঙ্গত, তাহাকে পরিস্ফুট করিয়া তোলে; অবস্থাবিশেষে ইহাতে কোন দৃশ্যমান সদ্যোলাভ না থাকিলেও ইহাতে লোকশিক্ষাবিস্তারের সহায়তা করিয়া প্রজাপুঞ্জের চিন্তাশক্তিকে আপনার অনুরূপে গঠিত করিয়া তুলিয়া ন্যায় ও সত্যের দিক্‌কে পরিপুষ্ট করে; এবং অবশেষে স্বাধীনচিন্তাশীল বিস্তীর্ণ প্রজাপুঞ্জের চিন্তা ও ভাবের সহিত রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে আপনার সামঞ্জস্য করিয়া লইতে বাধ্য করে। যে ইহার মর্ম্ম বোঝে, শত পরাজয়ে তাহার আগ্রহকে ঘনীভূত করিয়া দেয় অথবা তাহাকে নিরাশ করিতে পারে, কিন্তু কখন অভিমান আনিয়া দেয় না। যোদ্ধা যেমন যোদ্ধার উপর অভিমান করিতে পারে না, রাজনৈতিক-আন্দোলনকারীর তেমনি অভিমান অসম্ভব। নিষ্কামকর্ম্মে যে ব্রতী, তার আবার অভিমান কি? পাশ্চাত্যজাতিরা গীতা পড়ে নাই, কিন্তু তাহাদের জাতীয়ভাব তাহাদিগকে নিষ্কামধর্ম্মের এক অংশের অধিকারী করিয়াছে। রাজনৈতিক অধিকার লক্ষ্য হইলে, শত পরাজয়েও রাজনৈতিক আন্দোলন ভিন্ন অন্য উপায় নাই। অবশ্য রাজনৈতিক অধিকার একেবারে ছাড়িয়া-দিয়া, বর্ত্তমান সময়ে জাতীয় জীবন ও উন্নতি সম্ভব কি না, এ বিচার কেহ কেহ করিতে পারেন। আর যদি সিদ্ধান্ত হয় যে, তাহা সম্ভব নয়, তবে যাঁহারা রাজনৈতিক আন্দোলনের মর্ম্ম বোঝেন না, তাঁহারা আপনার আপনার জীবনের বিশেষ ব্রতকে অতিক্রম করিয়া, যাঁহারা এ মর্ম্ম বোঝেন, তাঁদের মনে কেবল সন্দেহ ও দ্বিধা উৎপাদনের প্রয়াস করিলে, দেশের কিং কোন কল্যাণ হইবে?

সকল সমস্যার ভিতরের কথা এই, বিদ্বেষ, ঘৃণা, ক্ষোভকে প্রশ্রয় না দিয়া তপস্বীর ধর্ম্ম সম্ভব, কিন্তু ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম কি সম্ভব? ইহারই উত্তর দিবার জন্য গীতাশাস্ত্র। কিন্তু কেবল গীতা পড়িয়া কেহ কোনদিন এই উত্তর বুঝে

নাই, কেহ কোনদিন বুঝিবে না। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন—"একদিনে তুমি ইহার কি বুঝিবে?" ইহা বুঝিবার একমাত্র উপায়—জীবনপাত। রামেন্দ্রবাবুর সুন্দর ভাষায় বলিতে গেলে—"মানবজীবনের একটা গোড়ার কথা এই যে, উহা আগাগোড়া একটা সামঞ্জস্যস্থাপনের চেষ্টামাত্র। বহিঃপ্রকৃতির সহিত অন্তঃপ্রকৃতির নিরন্তর সামঞ্জস্যস্থাপনের নামই জীবন।" আমাদের এই হিন্দুজাতির অতীতের জাতীয়জীবন হয় ত ধবলগিরির মত মহৎ, শীতাতপের ও জলবৃষ্টির ও তুষারবৃষ্টির উৎপাত এতদিন তিনি অকাতরে সহিয়া আসিতেছেন। অথবা আর একটু পরিচিত ভাষায় বলিতে গেলে আমাদের বিশেষ গৌরব যে, আমরা এতদিন টিকিয়া আছি। কিন্তু বিজ্ঞানশাস্ত্র যদি "তাঁহার সজীবতায় সন্দেহ করেন," তবে অন্তত রামেন্দ্রবাবুর বোধ হয় তাহাতে আপত্তি করিবার কোন উপায় নাই। এদিকে "শত স্রোতস্বিনীর সহস্রধারা তাঁহার 'কলেবরকে শীর্ণ ও বিদীর্ণ ও ক্ষীণ করিয়া তাঁহার অভ্রভেদী মস্তককে সমভূমি করিবার" উদ্যোগ করিয়াছে। এখন যদি এই দৈবদুর্ব্বিপাকে পড়িয়া তিনি সুপ্তোত্থিতের ন্যায় কোন স্বাধীনচেষ্টার দ্বারা এই স-ল ভ্রমান্ধ সন্দিগ্ধচিত্তদিগের মস্তকে জ্বলন্ত-ইন্ধনরূপী লজ্জা বর্ষণ করিতে থাকেন এবং দেখাইতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন যে, তিনি জীবন্ত "দেবতাত্মা নগাধিরাজঃ," তবে তাঁহাকে ভালবাসিয়াও তাঁহার সেই স্বাধীনচেষ্টা ও স্বাধীনচিন্তাকে কোন এক ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ রাখিতে কে প্রয়াসী হইবে?

বর্ত্তমান সময়ে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বহিঃপ্রকৃতির সহিত অন্তঃপ্রকৃতির সামঞ্জস্য নূতন করিয়া রাখিয়া চলিতে না পারিলে, কোন জাতীয়জীবনেরই স্থায়িত্বের আশা নাই। যে জাতির স্বাধীনচিন্তা যত উজ্জ্বল, যত গভীর, যত নির্ভীক, ভবিষ্যতে সেই জাতির জীবন সেই পরিমাণে সবলতা ও পূর্ণতা লাভ করিবে।

আমি কেবল শূন্য আলোচনা করিবার জন্য এ প্রবন্ধ লিখিতে বসি নাই। নির্ভীক স্বাধীনচিন্তার ভূমির উপর দাঁড়াইয়া স্বদেশী-বিদেশী সকল ধর্ম্মশাস্ত্র ও সমাজতত্ত্বের প্রসঙ্গ করিবার জন্য আমি আমার পরিচিত-অপরিচিত সকল চিন্তাশীল বন্ধুগণকে অন্তরের সহিত আহ্বান করিতেছি। এই প্রসঙ্গ হইতে আমি কত জিনিষের আশা করি, তাহা আমি বলিতে পারি না। বিদেশপর্য্যটনের সময় আমি এই বুঝিলাম, বিদেশীরা আমাদের শাস্ত্র, আমাদের জীবনের বিষয় জানিতে চায়, কিন্তু বড়ই অসম্পূর্ণরূপে, বড়ই ভুল করিয়া জানে। আমরা কিন্তু এতকাল কেবল বিদেশীদের ভুলেরই সমালোচনা করিলাম, সেইখানেই কি আমাদের কাজের শেষ? আমাদের শিক্ষিতেরা যে সংস্কৃতভাষায় হর্ষচরিত ও রঘুবংশ ভিন্ন আর কোন গ্রন্থ আছে, তাহা জানিলই না, ইহা কি কেবল য়ুনিভার্সিটিরই দোষ? সংস্কৃতের কথাই বা বলি কেন, বঙ্কিমচন্দ্রেরই বিষবৃক্ষ ও দুর্গেশনন্দিনী যত লোকে পড়ে, তার তুলনায় অনুশীলনধর্ম্ম কয়জনে পড়ে?— অথবা পড়িয়া স্থিরভাবে তাহা বুঝিতে চেষ্টা করে?— অথবা বুঝিবার জন্য যে সকল উপকরণের প্রয়োজন, তাদের জীবনে তাহা আছে? ইহার জন্য কি কেবল বিদেশীরাই দায়ী? আমাদের

সমাজ স্বাধীনপ্রসঙ্গে উৎসাহ না দিলে এই স্বাধীনচিন্তার স্ফুরণ কোনদিন হইবে না। দেশের চিন্তাশীল ধর্ম্মজিজ্ঞাসুগণ এ বিষয়ে পথ না দেখাইলে এ দিক্ই খুলিবে না। এ পথে সঙ্কীর্ণত্ব রাখিলে চলিবে না। হিন্দুশাস্ত্র, বৌদ্ধ-শাস্ত্র, ইহুদী ও খৃষ্টীয় শাস্ত্র, মুসলমানিশাস্ত্র, সকলের জন্য স্থান রাখিতে হইবে। শুধু পাণ্ডিত্যের দিক্ দিয়া নয়, ধর্ম্মজিজ্ঞাসুর প্রবৃত্তিতে সকলের আলোচনা করিতে হইবে,—জ্ঞান ও ভাবকে মিশাইতে হইবে। ইহাতে কোনই ভাবনার কারণ নাই। গীতারও কথা, খালি গীতাই পড়িলে, পরিষ্কার হয় না, তাহার অর্থের সজীবতা থাকে না, তাহা পুরাতন হইয়া যায়। ইংরেজীতে দর্শনশাস্ত্রের চর্চ্চা করিলে, সংস্কৃতদর্শন বুঝিবার সহায়তা করে বই বিঘ্ন উৎপাদন করে না। কথা বাড়িয়া যায়, কিন্তু না বলিয়াও থাকিতে পারি না। কেবল যশস্বী হইবার জন্য যিনি ইংরেজী লেখেন, তাঁহার ইংরেজীবিদ্যার ন্যায় যশও যে অতলজলে ডুবিবে, তাহা আর আশ্চর্য্য কি? তথাপি এই বর্ত্তমান সময়েও কোন লজ্জা না রাখিয়া আমি বলি, ভারতবাসীর ইংরেজীভাষায় শুধু বিজ্ঞান, রাজনীতি, অর্থ-নীতি নয়, কিন্তু দর্শন ও ধর্ম্মশাস্ত্রেরও আলো-চনা করিবার অনেক প্রয়োজন আছে। যাহা স্বদেশীভাষায় লেখা হয়, তাহারও অনুবাদ আবশ্যক। শুধু "আত্মসম্মান কর, আত্মসম্মান কর" বলিলেই আকাশ হইতে আত্মসম্মান আসিয়া ভারতবাসীর মনে অবতীর্ণ হইবে না। বিদেশীর লাঞ্ছনায় আপনার ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া বসিয়া থাকিলেও আত্মসম্মান আসিবে না। সম্মানের যোগ্য বিষয়ের প্রসঙ্গ কর, জগদ্বাসীকে তাহার অংশ দাও, তবে আত্ম-সম্মান আসিবে। জাপানীরা যদি ইংরেজী না লিখিত, আজ আমরা তাহাদের সম্বন্ধে কি জানিতাম? প্রত্যেক বিষয়ে কেবল হঠিয়া-গিয়া নিজেদের ভিতর নিজেদের সঙ্কুচিত করিলে, আপনাদের চিরজীবনের মত হীনতা আমরা আপনারা মাথায় পাতিয়া স্বীকার করিয়া লইলাম। বাস্তবিক দৈবপ্রসাদদত্ত কোন গৌরবের জিনিষ যদি এখনও আমাদের থাকে, তবে জগতের সম্মুখে তাহাকে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে, তাহার উৎকর্ষ করিতে দেবতার নিকট আমরা দায়ী। তবেই বিদেশীদের সঙ্গে সমভূমিতে দাঁড়াইয়া, নিরস্ত্র হইয়াও আমরা আমাদের জাতীয়জীবনের গৌরব রক্ষা করিতে পারিব। নতুবা কেবল বিষাক্ত অপমানক্ষত বুকে বহিয়া, আত্মসঙ্কোচের ভিতর তাহার আরোগ্যের বৃথা আশা রাখিয়া, জগতের বর্ব্বর জাতিদিগের দশা অনুধ্যান করিতে করিতে অলক্ষিত প্রাকৃতিক নিয়মে আমাদিগকে তাহাদেরই সমভাবাপন্ন হইয়া যাইতে হইবে, এবং তাহাদিগেরই দশার ভিতর ডুবিতে হইবে। সে দশা যদি আমাদের কোন-দিন হয়, তবে সে ইংরেজের অত্যাচার নয়, সে সাক্ষাৎ বিধাতার দণ্ড। বিধাতা যাহাকে তাঁহার অতুল আশীর্ব্বাদ দিয়া গড়িয়াছেন, ইংরেজের সাধ্য নাই যে, সে বর্ব্বরজাতিদিগের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়াছে, তাহারও সহিত সেই ব্যবহার করিবে। জগতের মধ্যে চিহ্নিত করিয়া কেবল ভারতবর্ষের মধ্যে বিধাতা সকল ধর্ম্মকে মিলিত করিয়াছেন, তাহাদের প্রসঙ্গে ভারতের মধ্যে যে ধর্ম্ম-

জ্যোতি বিকীর্ণ হইবে, সমস্ত জগৎকে তাহার কাছে মাথা নোয়াইতে হইবে। বিধাতার এ আশীর্ব্বাদ আমরা কি রাখিতে পারিব না?

শ্রীবিনয়েন্দ্রনাথ সেন।

সার্থক।

জনম ভরে' এপার-ওপার
　　করলি আনাগোনা
আজকে তরি ধন্য জীবন
　　হ'য়ে গেলি সোনা।
স্রোতের টানে সাগরপানে
　　কতই গেছিস্ ছুটে',
দেশবিদেশের কত মাণিক
　　এনেছিস্ রে লুটে'।
কত সুখের বন্দরেতে
　　নেমেছে তোর পাল,
কত তুফান কাটিয়ে যেতে
　　ভেঙেছে তোর হাল।
হট্টরোলে গণ্ডগোলে
　　সাগর হ'তে এসে,
কত জোয়ার লেগেছে তোর
　　বুকের পাঁজর ঘেঁসে'।
শান্ত গাঁয়ে, বটের ছায়ে,
　　নদীর কলকথা,
জাগিয়েছিল বুকের মাঝে
　　কত করুণ ব্যথা।
গ্রামের অন্তে, দিবসান্তে,
　　সূর্য্য গেলে পাটে,
কক্ষে কলস অলসগতি
　　বধূরা সব ঘাটে,

ভাসিয়ে ঘড়া, শান্ত জলে,
তুলি লহরলীলা,
সাঁতার কেটে', খেলেছে যে
কত সুখের খেলা।
কোনদিন বা একলা বধূ
এসে নদীর তীরে,
চোখের জলে কলস ভরে'
গেছে ঘরে ফিরে'।
সুখের দুখের কত হাওয়া
লেগেছে তোর গায়,
দ্রুত-মন্দে কতই ছন্দে
ভেসে গেছিস্ তায়!
কখনো বা মাটির দরে
পেয়েছিস্ রে সোনা,
কখনো বা পাস্‌নি কিছু
মিথ্যা সে সব গোণা।
আজ্‌কে যাহা পেলি তাহা
সবার চেয়ে সরস,
ভবের জনম সফল, পেয়ে
রাঙা-চরণ-পরশ।

শ্রীঃ—

দুর্ভিক্ষপীড়িত ভারতে।

৮

রাজপুতরাজার গৃহে।

আমাকে পান্থশালায় লইয়া যাইবার জন্য উদয়পুর-মহারাজার আদেশক্রমে একটা "ল্যাণ্ডো"-গাড়ি আসিয়া হাজির হইল। অশ্বযুগল নিখুঁৎ সাজসজ্জায় সজ্জিত। বালুকাময় ঢালুভূমির উপর দিয়া ঘোড়ারা ছুটিয়া চলিল। ঢালু-ভূমির ধারে-ধারে ক্ষুদ্র স্তম্ভশ্রেণী ও গোলাপী-রঙের একটা প্রকাণ্ড অট্টালিকা। একটি সরোবরের তীরে—শৈলভূমির উপর—

প্রাসাদ-সৌধাবলী অর্দ্ধচন্দ্রাকারে সজ্জিত। পুষ্পপল্লবের মধ্য হইতে কতকগুলা পাথরের হাতী ইতস্তত দেখা যাইতেছে। এই ঢালু-ভূমির উপর দিয়া বলিষ্ঠ অশ্বযুগল বেগভরে অবলীলাক্রমে উঠিতেছে, আমি বেশ অনুভব করিতেছি। শীঘ্রই, আমাদের দৃষ্টিক্ষেত্র প্রসারিত হইল। শীঘ্রই, সেই সুরম্য বনভূমি, সেই নীল সরোবর, সেই-সব ছোট-ছোট দ্বীপ, সেই-সব দ্বীপস্থ প্রাসাদ আমার নেত্রসমক্ষে প্রসারিত হইল। আমরা যেমন উপরে উঠিতেছি—চতুর্দ্দিকের পর্ব্বতপ্রাচীরটিও আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই যেন উঠিতেছে, এইরূপ মনে হইতে লাগিল। উদয়পুরের সব জিনিষেরই পশ্চাতে, এই পর্ব্বত-অরণ্যের রহস্যময় চিত্রপটটি চিরবিদ্যমান।

এই মহারাজা মেওয়ারদেশের অধিপতি। ইঁহারই সহিত আজ আমি সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছি। রাজস্থানে যত রাজবংশ আছে, তন্মধ্যে ইঁহারই বংশ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং মানসম্ভ্রমেও ইনি সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ। ইনি সূর্য্যবংশীয়। বহু-বহু শতাব্দী পূর্ব্বে—যখন য়ুরোপের প্রাচীনতম রাজবংশাবলীর অস্তিত্বমাত্র ছিল না—তখন ইঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ দিগ্‌বিজয়ার্থ, অথবা বন্দীকৃত রাণীদের উদ্ধারার্থ বিপুল সৈন্য সংগ্রহ করিতেছিলেন *।

বিষ্ণুর অবতার মহাবীর রাম সূর্য্যবংশীয় রাজাদের আদিপুরুষ—এইরূপ রামায়ণে বর্ণিত হইয়াছে। ইঁহার দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ লাহোর-নগর প্রতিষ্ঠা করেন; কনিষ্ঠের কোন উত্তর-পুরুষ ...দশ শতাব্দীতে রাজপুতদিগের উপর আধিপত্য বিস্তার করেন। যাহাই হউক, ৫২৪ খৃষ্টাব্দে, যখন উত্তরদেশীয় বর্ব্বরগণ দেশ আক্রমণ করিয়া লুঠপাট করে, তখন এই বংশের সমস্ত রাজাই নিহত হন; কেবল একজন রাণী—যিনি তীর্থযাত্রায় বহির্গত হইয়াছিলেন—তিনিই রক্ষা পান। তিনি গর্ভবতী হইয়া একটা গুহার মধ্যে লুকাইয়া ছিলেন। তিনি সেই গুহার মধ্যেই একটি পুত্র প্রসব করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। পুরোহিতেরা এই শিশুটিকে কুড়াইয়া আনে। কিন্তু ইহাকে আগ্‌লাইয়া রাখা কঠিন হইল; উষ্ণ রাজশোণিতের প্রভাবে, শিশুটি পর্ব্বতবাসী ভীলদিগের বর্ব্বর ব্যায়ামক্রিয়ামোদে লিপ্ত হইল। ভীলেরা উহাকেই সর্দ্দাররূপে বরণ করিল। পরে এই সকল ভীলবীরদিগের মধ্যে একজন,—রাজচিহ্নস্বরূপ, নিজের আঙুল কাটিয়া সেই রক্তে তাহার ললাট চিহ্নিত করিল। অবশেষে, ৭২৩ খৃষ্টাব্দে, এই গুহা-কুমারের বংশধরেরাই এখানকার অধিপতিরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। সেই অবধি এই রাজবংশ অবিচ্ছেদে চলিয়া আসিতেছে। ১৩শত বৎসর পরে এখনো সেই অভিষেক প্রথাটি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে;—প্রত্যেক নূতন রাজার অভিষেক-সময়ে,—সেই আদিমঘটনার স্মরণার্থে,—এখনো নবভূপতির ললাটদেশ ভীলহস্তে রক্তের দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।

ল্যাণ্ডৌ-গাড়ি একটা অন্তঃপ্রাঙ্গণে আসিয়া থামিল। এই প্রাঙ্গণটি তাল ও ঝাউগাছে সুশোভিত। শুভ্রপরিচ্ছদধারী, রাজবাটীর একজন কর্ম্মচারী এইখানে আমাকে অভ্যর্থনা করিলেন।

ভারতের অন্যান্য রাজাদিগের ন্যায় এই

* রামায়ণে বর্ণিত লঙ্কা-আক্রমণ।

মহারাজারও অনেকগুলি প্রাসাদ। সর্ব্বপ্রথমে যে প্রাসাদটি আমি দেখিলাম, উহা আধুনিক ধরণের; য়ুরোপীয়-ধরণের বৈঠকখানা-ঘর; বড়-বড় আয়না; রৌপ্যসামগ্রীতে ভারাক্রান্ত সজ্জা-টেবিল; বিলিয়ার্ড-টেবিল;—ভারতের একটি নগরে, এই সমস্ত অপ্রত্যাশিত দ্রব্যসামগ্রী দেখিয়া বিস্ময়বিহ্বল হইতে হয়।

কিন্তু মহারাজা নিজে, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের পুরাতন আবাসগৃহটিই বেশী পছন্দ করেন। সেইখানেই তিনি আমাকে দর্শন দিবেন; সেইখানেই এখন আমায় যাইতে হইবে।

প্রথমেই, কতকগুলি ছোট-ছোট বাগান-বাগিচা ও কতকগুলি নিস্তব্ধ সুঁড়িপথ পার হইলাম। পরে, কোণালু খিলান ও তাম্রকপাট-বিশিষ্ট একটা দ্বার পার হইয়াই হঠাৎ দেখি—সম্মুখে জনতা। জনকোলাহল ও কর্ণরোধী উৎকট বাদ্য। আমরা একটা বিশাল প্রাঙ্গণে আসিয়া পড়িয়াছি। এইখানে হস্তিগণের যুদ্ধক্রীড়া প্রদর্শিত হয়। ইহারই এক পার্শ্বে, শুভ্রমুখচ্ছবি পুরাতন প্রাসাদ পূর্ণ-মহিমায় বিরাজমান; প্রাচীনধরণের খোদাই-কাজে, নীলবর্ণ মৃন্ময় ঘটে, সোনালি সূর্য্যের নক্সায় প্রাসাদের সম্মুখভাগ বিভূষিত। প্রাঙ্গণের অপর পার্শ্বে,—প্রাচীরের গায়ে সারি-সারি ঘর। সেইখানে শৃঙ্খলবদ্ধ হস্তিগণ, গা দোলা-ইতে দোলাইতে তৃণচর্ব্বণ করিতেছে। মধ্য-স্থলে, ভীষণ সাজে সজ্জিত তিনচারিশত লোক;—দেবোৎসব-উপলক্ষে সমাগত পর্ব্বত-বাসী ভীল; ইহারা যষ্টির দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করিতে করিতে একপ্রকার যুদ্ধনৃত্য করিতেছে এবং সেই সঙ্গে স্নানাই, শিঙা, প্রকাণ্ড ঢাকঢোল ও কাংস্যকর্ত্তালের বাদ্য চলিতেছে। একটা ছাদের উপর, শতশত রমণী উহাদের নৃত্য দেখিবার জন্য ঝুঁকিয়া রহিয়াছে। আহা! যেন রূপের হাট বসিয়া গিয়াছে;—মল্‌মল্‌বস্ত্রে ঢাকা কি অনিন্দ্য-সুন্দর বক্ষোদেশ!

মহারাজ পর্য্যন্ত পৌঁছিতে, আরো কত সুঁড়িপথ, আরো কত প্রাঙ্গণ পার হইতে হইল—যেখানে, শাদা মার্ব্বেলের খিলানবীথির মধ্যে, বড়-বড় নারাঙ্গিগাছে ফুল ফুটিয়া আছে এবং তাহার গন্ধে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত। কত প্রবেশ-দালান নাগ্‌রাজুতার ভারে ভারাক্রান্ত! প্রত্যেক কোণে, দীর্ঘ-অসিধারী কত লোক! ইঁদুরকলের মত কত সুঁড়িপথ; কত পুরাতন অন্ধকেরে সিঁড়ি—যাহার ধাপগুলা দুরারোহ ও পিছল;—এরূপ খাড়া যে, উঠিতে ভয় হয়;—উহা পুরু দেয়ালগাঁথুনির মধ্য হইতে কাটিয়া বাহির করা অথবা আদৎ প্রস্তরে গঠিত। ছায়ান্ধকারের মধ্যে যেখানে-সেখানে রক্ষিপুরুষ;—যেখানে-সেখানে নাগ্‌রাজুতার ছড়াছড়ি। কুলুঙ্গির গভীর দেশ হইতে কত দেবতা আমাদিগকে নিরীক্ষণ করিতেছেন। কত শৈলমঞ্চের উপর দিয়া, উপর্য্যুপরি-বিন্যস্ত কত ঘরের উপর দিয়া, খুব উচ্চে উঠিয়া, অবশেষে একটা দ্বারদেশে আসিয়া উপনীত হই-লাম। যে কর্ম্মচারী আমাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতেছিল, সে এইখানে আসিয়া সসম্ভ্রমে থামিল এবং মৃদুস্বরে আমাকে বলিল—"এইখানে মহারাজ আছেন।" আমি একাকীই প্রবেশ করিলাম।

মার্ব্বেল-খিলান-সমূহের উপর একটা শুভ্র

অলিন্দ প্রসারিত;—তলদেশে শুভ্র বিশাল ছাদ; সেই জমির উপর, তুষারশুভ্র একটা চাদর পাতা। রক্ষিপুরুষ কেহ নাই, আস্‌বাব্‌-আদিও নাই। অন্তরীক্ষবৎ এই বিমল নিস্তব্ধতার মধ্যে—দুইটিমাত্র সোনালি-গিল্‌টি-করা একইরকমের কেদারা পাশাপাশি স্থাপিত। যিনি একাকী দণ্ডায়মান হইয়া হস্ত প্রসারিত করিয়া আছেন, তাঁহাকে দেখিয়াই চিনিলাম;—তিনি সেই অশ্বারোহী পুরুষ, যাঁহার উদ্দেশে সেদিন সায়াহ্নে, বনের সন্ন্যাসিত্রয়, স্বকীয় মুখরাগ সম্পাদন করিতেছিল। ইঁহার পরিচ্ছদ শুভ্র ও সাদাসিধা; কণ্ঠে নীলমণির হার।

এক্ষণে সেই গিল্‌টিকরা হাল্‌কা চৌকির উপর আমরা উপবেশন করিলাম। দস্তুরমত আদবকায়দার সহিত একজন দোভাষী নিঃশব্দে আমাদের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল। পাছে তাহার নিশ্বাসবায়ু মহারাজের দিকে যায়, এইজন্য যখনই সে কথা কহিতেছে, অম্‌নি একটা শাদা রেশমের রুমাল নিজের মুখের সম্মুখে ধারণ করিতেছে। এই সতর্কতার কোন প্রয়োজন দেখি না; কেন না, তাহার দন্তপংক্তি বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও তাহার নিশ্বাস বেশ বিশুদ্ধ।

মহারাজা স্বল্পভাষী; সহজে কেহ ইঁহার দর্শন পায় না; তথাপি, ইঁহাতে কেমন-একটু "মোহিনী" আছে—কেমন-একটি লালিত্য আছে;—অতীব মার্জ্জিত শিষ্টতার সহিত কেমন-একটা সঙ্কোচের ভাব মিশ্রিত—যাহা বড়-বড় লাটদিগের মধ্যেই প্রায় দেখা যায়। প্রথমেই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার দেশে আসিয়া আমি যথোচিত আদর-যত্ন পাইয়াছি কি না;—যে গাড়িঘোড়া তিনি আমার জন্য পাঠাইয়াছেন, তাহা আমার মনোমত হইয়াছে কি না। এইরূপ নিতান্ত সাধারণ-ধরণের সাদামাটা কথা দিয়া আমাদের কথোপকথন আরম্ভ হইল;—মাঝে-মাঝে থামিয়া যাইতে লাগিল—বাধিয়া যাইতে লাগিল। কেন না, আমাদের উভয়ের স্বাভাবিক ও কৌলিক সংস্কারের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। কিন্তু তাহার পর, যখন য়ুরোপের কথা উপস্থিত হইল, যে দেশ হইতে আমি আসিয়াছি তাহার কথা উপস্থিত হইল, যে দেশে আমি শীঘ্রই যাইব সেই পারস্যদেশের কথা উপস্থিত হইল,—তখন আমি দেখিতে পাইলাম—যদি আমাদের মধ্যে এই সমস্ত বাধা না থাকিত, তাহা হইলে আমাদের পরস্পরের মধ্যে কত কৌতূহলজনক নূতন-নূতন কথার বিনিময় হইতে পারিত।...

এই সময়ে একজন আসিয়া মহারাজকে জানাইল,—যেখানে তিন সন্ন্যাসীর বাস, সেই রমণীয় বনে সান্ধ্যভ্রমণার্থ অশ্বারোহণে বাহির হইবার সময় হইয়াছে। আজ সরোবর প্রদক্ষিণ করিয়া, যেখানে হরিণেরা আসিয়া জড় হয়, সেই বাড়ী পর্য্যন্ত যাইবার কথা। এই ছাদের উপর যে-সকল ভৃত্য বড়-বড় প্রাচ্য-ধরণের বৃহৎ ছত্র মহারাজার মাথার উপর ধরিয়াছিল, তাহারা নীচে গিয়াও সেই সব ছত্র ধরিয়া মহারাজকে ছায়ায়-ছায়ায় রাখিতে লাগিল। নীচে অশ্বারোহী অনুচরবর্গ মহারাজার সহিত যাইবার জন্য প্রস্তুত।

আমাকে বিদায় দিবার পূর্ব্বেই, তিনি যে নূতন প্রাসাদটি নির্ম্মাণ করাইতেছেন এবং যাহা এখনো শেষ হয় নাই, তাহা আমাকে দেখাইবার জন্য তাঁহার লোকজনকে আদেশ করি-

লেন ; এবং সেই দ্বীপস্থ পুরাতন প্রাসাদগুলিও দেখাইবার জন্য নৌকা প্রস্তুত রাখিতে বলিলেন।

আমাদের এই যুগে, পুরাতন জিনিষ সমস্তই লোপ পাইতেছে। সৌভাগ্যের বিষয়, এই ভারতে এখনো এমন কতকগুলি রাজা আছেন, যাঁহারা খাঁটি ভারতীয় ধরণের গৃহাদি-নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত ;—সেইরূপ ধরণের গৃহ, যাহা তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা সেই গৌরবান্বিত পুরাকালে উদ্ভাবিত করিয়াছিলেন।

একটি চক্রাকৃতি ভূমিখণ্ড অন্তরীপের মত সরোবরের অভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। এই ভূমিখণ্ডের উপর, খুব উচ্চদেশে, নূতন প্রাসাদটি প্রতিষ্ঠিত ;—কতকগুলা শাদাশাদা দালানঘর, কতকগুলা শাদাশাদা চতুষ্কগৃহ ;—সমস্তই মাল্যাকৃতি কারুকার্য্যে ভূষিত ;—শাদাটে পাথর কিংবা মার্ব্বেলের সান বসানো। প্রাসাদটি এরূপভাবে নির্ম্মিত ও সংস্থাপিত যে, সেখান হইতে সরোবরের বিভিন্নভাগ বেশ দৃষ্টিগোচর হয় ; একটা প্রকাণ্ড সোপান সরোবর পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছে ; তাহার দুই ধারে পাথরের হাতী। সরোবরটি অরণ্য-সমাচ্ছন্ন পর্ব্বতমালায় পরিবেষ্টিত। প্রাসাদের অভ্যন্তরে,—দেয়ালের গায়ে, কাচ ও চীনে-মাটির (mosaic) বিচিত্র নক্সা। অমুক ঘরে দেখিবে—শুধু গোলাপেরই শাখাপল্লব ; প্রত্যেক গোলাপটি ২০রকমের বিভিন্ন চীনে-মাটির দ্বারা রচিত। আর-এক ঘরে গিয়া দেখিবে—জলের গাছপালা ; পদ্মের গাছ ; সেই সঙ্গে বক ও মাছরাঙা পাখী। এইরূপ বিচিত্র নক্সা-কাজের ধৈর্য্যশালী কারিকরেরা এখনো সেইখানে রহিয়াছে। উহারা মাটির উপর উবু হইয়া বসিয়া, হাজার-হাজার রঙিন টুক্‌রা-কাচ হইতে, পল্লব ও পাপ্‌ড়ি খুদিয়া বাহির করিতেছে। সম্প্রতি একটা ঘর শেষ হইয়াছে ;—শেয়ালা-সবুজ দেয়ালের গায়ে, বড়-বড় লাল গোলাপের নক্‌সা ছাড়া সেখানে আর কিছুই নাই। এই ঘরটিতে, প্রাচীন-ধরণের সাজসজ্জা যেরূপভাবে বিন্যস্ত, তাহাতে আমাদের দেশে যাহাকে "নূতন শিল্পকলা" বলে, তাহাই মনে করাইয়া দেয় ;—মধ্যস্থলে একটি স্ফটিকের খাট ; দেয়ালে যেপ্রকার সবুজ রং—সেই রঙের মশারি ; এবং পদ্ম-নক্‌সাগুলির যেরূপ লাল রং,—সেই রঙের মখ্‌মলের গদী।

একটি ক্ষুদ্র পুরাতন দেবমন্দির ;—এরূপ জীর্ণ যে, সরোবরের জলে এখনি ধসিয়া পড়িবে বলিয়া মনে হয়। এই মন্দিরের পাদদেশে, একখানা নৌকা আমার জন্য অপেক্ষা করি-তেছে। আমি সেই নৌকায় উঠিলাম। মাঝিমাল্লারা আমাকে ক্ষুদ্র দ্বীপটির অভিমুখে লইয়া গেল। একটা জোর-বাতাস উঠিল। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময়, এইরূপ বাতাস উঠিয়া থাকে। ধূলারাশি ও মৃত্যু বিকীর্ণ করিয়া এই বাতাস সমস্ত রাজস্থানে ঘুরিয়া বেড়াই-তেছে ; কিন্তু এই সরোবরে আসিয়া এই বাতাস বেশ শীতল ও বিমল ভাব ধারণ করি-য়াছে ; এবং আমাদের চারিধারে অতীব ক্ষুদ্র নীল লহরীলীলা উঠাইয়াছে।

দুইটি দ্বীপের মধ্যে যেটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, সেই দ্বীপের প্রাসাদটি একশত বৎসরের হইবে ; উহা সুগভীর সরোবরের মধ্যস্থলে অবস্থিত ; সুতরাং এম্‌নিই ত লোকালয় হইতে বিচ্ছিন্ন,—তাতে আবার প্রাচীরবদ্ধ হওয়ায়,

আরো নিভৃতভাব ধারণ করিয়াছে। ছোট-ছোট উদ্যানগুলিও প্রাচীরবদ্ধ ;—সমাধিভূমি-সুলভ একপ্রকার উদ্ভিজ্জের দ্বারা আক্রান্ত ;—কাঁটাগাছের ঝোপ্‌ঝাড়, লম্বা-লম্বা উদ্দাম তৃণ-রাশি, চর্‌কার পাঁইজের মত বড়-বড় Holly-hock,—এই সব তৃণগুল্মে আচ্ছন্ন। প্রাসাদের অভ্যন্তরে,গোলোকধাঁধার মত কতকগুলা অদ্ভুত-ধরণের ঘর ;—নীচু, অন্ধকেরে, বিচিত্র নক্‌সার কাজে কিংবা চিত্রে বিভূষিত ; কিন্তু এই সব নক্‌সাদি এখন অনেকটা ক্ষয় হইয়া গিয়াছে। প্রাসাদটি এরূপভাবে নির্ম্মিত যে, দিবসের প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই, ছায়া ও শৈত্য সকল দিকেই সমান উপভোগ করা যাইতে পারে ; ইচ্ছা করিলে, এই প্রাসাদেই,কখন তুমি বিষণ্ণ ফুলের কেয়ারীর সম্মুখে, কখন দুরস্থ ব্যাঘ্রসঙ্কুল অরণ্যের সম্মুখে, কখন বা নিকটবর্ত্তী সরোবর-তীরস্থ শুভ্র পরীপ্রাসাদের সম্মুখে, আপন কল্পনায় বিভোর হইতে পার। এই দ্বীপের ছোট-ছোট ঘরগুলিতে—এখানকার এই সব "পোড়ো" ঘরগুলিতে,—একসময় না জানি কত জীবননাট্য অভিনীত হইয়াছে,—দীর্ঘ-কাল ধরিয়া কত লোকে কত কষ্টযন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে! এক্ষণে এই ঘরগুলি,—সরোবরের আর্দ্রতা, শৈবাল, ও যবক্ষারের প্রভাবে ধীরে-ধীরে বিনষ্ট-হওয়া-প্রযুক্তই কি পরিত্যক্ত হই-য়াছে?...প্রাচীরের কুলুঙ্গিতে,—সমাধিস্থানের আধো অন্ধকারের মধ্যে—কতকগুলা ছোট-খাটো খেলনাসামগ্রী শার্শি-দরজার মধ্যে রুদ্ধ। প্রায় একশত বৎসর হইল,এই সব দ্রব্য য়ুরোপ হইতে আইসে, সুতরাং মহামূল্য হইবারই কথা!—পুরাতন চীনেমাটির পাত্রাদি, ষোড়শ লুইর আমলের পোষাকপরা পুতুল, ছোট-ছোট ঘটে বসানো কৃত্রিম পুষ্পাদি।...না জানি কত রাণী, কত রাজকুমারী এই সকল ক্ষণভঙ্গুর উপঢৌকন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন! তাঁহারা চলিয়া গিয়াছেন—তাঁহাদের জিনিষগুলি এইখানেই রহিয়া গিয়াছে।...

ইহার পরেই, বড় দ্বীপটিতে নামিলাম। এখানকার প্রাসাদগুলি, প্রায় তিনশত বৎসর হইল, একজন-প্রবলপ্রতাপ-নৃপতি-কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। এই প্রাসাদগুলি অপেক্ষাকৃত আরো বিশাল, আরো ভগ্নদশাপন্ন। ঘাটের সিঁড়ি প্রকাণ্ড ;—ধাপগুলি শাদা ধপ্‌ধপে—জলে অর্দ্ধনিমজ্জিত; সরোবরের সমরেখাপাতে, সোপানের ধারে-ধারে বড়-বড় পাথরের হাতী সারি-সারি সজ্জিত ;—মনে হয় যেন তাহারা নৌকার আগমন নিরীক্ষণ করিতেছে। পার্শ্ববর্ত্তী ছোট দ্বীপটির ন্যায়, এখানকার বিষণ্ণ উদ্যানগুলিও প্রাচীরবদ্ধ ; কিন্তু এই সকল প্রাচীরে, নক্‌সা-কাজের খুঁটিনাটি আরো বেশী ;—কারিকরদিগের ধৈর্য্যের পরিচয় আরো বেশী পাওয়া যায়। দাক্ষিণা-ত্যের বড়-বড় তালগাছ এখানে আছে ; এই সব তালগাছ এখানে বন্য-অবস্থায় বর্দ্ধিত হয় না ;—রাজপ্রাসাদেরই চতুর্দ্দিকে বিলাস-সামগ্রীরূপে সংরক্ষিত। নারাঙ্গিকুঞ্জের উদ্গিরিত সৌরভে চারিদিক্ আমোদিত; মরাপাতার উপর নারাঙ্গিফুলের পাপ্‌ড়ি ঝরিয়া-পড়িয়া গাছের তলদেশ ছাইয়া গিয়াছে; —মনে হয় যেন জমাট শিশিরবিন্দুর একটা স্তর পড়িয়াছে। আমরা যখন প্রবেশ করি-লাম, তখন একটু বেশী বেলা হইয়া গিয়াছে ; —উচ্চ ও খাড়া পর্ব্বতগুলার পশ্চাতে সূর্য্য অনেকটা ঢলিয়া পড়িয়াছে ; তাই সরোবরের

উপরে যেন একটু আগেভাগেই সন্ধ্যা দেখা দিয়াছে। ইহা টিয়াপাখীদের শয়নকাল। এই সব প্রাচীরবদ্ধ সুরক্ষিত নারাঙ্গিগাছের মধ্যেই উহাদের সাধের বাসা। সুরম্য বনভূমি হইতে, সবুজ মেঘের মত উহারা দলে-দলে উড়িয়া আসিতেছে, দেখিতে পাওয়া যায়। এখানকার ম্রিয়মাণ গাছের পাতাগুলি অপেক্ষা উহারা বেশী সবুজ। চতুর্দ্দিকৃস্থ বনরাজি শীতঋতুসুলভ ধূসরবর্ণ ধারণ করিয়াছে; এমন কি, জলের ধারেও, সমস্ত উদ্ভিজ্জ "হলুদে মারিয়া" যাইতেছে। শুষ্ক বায়ু—দুর্ভিক্ষের বায়ু—সোঁসোঁ করিয়া বহিতেছে;—ইহার জোর যেন ক্রমেই বাড়িতেছে। এই দ্বীপে, এই ধ্বংসাবশেষের মধ্যে, সন্ধ্যার বিষাদচ্ছায়া আরো যেন ঘনীভূত হইয়া, ভয় ও উদ্বেগ বর্দ্ধিত করিতেছে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

রাজতপস্বিনী।

[জীবনীপ্রসঙ্গ]

৩

আমাদের বাল্য ও কৈশোরকালে পুটিয়া-সমাজে যে গোঁড়া হিন্দুয়ানির আদর্শ দেখিতে পাইতাম, বঙ্গদেশের কোন স্থানে আজিকার দিনে তাহা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। ছাত্রজীবনের প্রথমভাগে যে কঠোর নিয়ম আহারাদিসম্বন্ধে মানিয়া চলিতে আমরা অভ্যস্ত হইয়াছিলাম, কলিকাতার "মেসে" থাকিতে থাকিতে তাহার কতক-কতক শিথিল হইয়া গেল। এই সম্বন্ধে একটি গল্প মনে পড়িতেছে। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিদায়গ্রহণের পর পুটিয়ায় যখন ছিলাম, একদিন দশটার আমলে মহারাণীমাতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অন্দরের বাহিরে আসিয়াছি, সম্মুখে দেখি, দ্বিতল বৈঠকখানার মুক্ত বাতায়নে দাঁড়াইয়া রাজকুমার। ইনি মহারাণীর পোষ্যপুত্র, আমাদের চেয়ে বয়সে কিছু ছোট, তখনও বয়ঃপ্রাপ্ত হন নাই। আমায় দেখিয়া কুমার বলিলেন, "শ্রীশদাদা, রোজ মাকে দেখিয়া চলিয়া যান, আমার কাছে আসেন না। আজ এইখানে আহার করতে হবে।" বাসায় একটু প্রয়োজন ছিল, বিশেষ কুমারবাহাদুরের মধ্যাহ্ন-কৃত্য কিছু বিলম্বে ঘটিয়া থাকে জানিয়া স্নানাদির পর প্রায় ১২টার সময় রাজবাটীতে ফিরিয়া গেলাম। আহারাদির পর কুমারের সঙ্গে গল্প করিতে করিতে বেলা পড়িয়া আসিল। তখন মাতার হবিষ্যান্নগ্রহণ শেষ হইয়াছে সংবাদ লইয়া অন্দরে গেলাম। দেখি, তিনি বসিবার ঘরে অনাবৃত হর্ম্ম্যতলে (যেমন সচরাচর বসিতেন), কতকগুলি-ব্রাহ্মণবিধবা-পরিবৃত হইয়া বসিয়া আছেন। নিজে কোন আসন গ্রহণ করিতেন না, কিন্তু আমরা প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেই দাসীদের প্রতি আদেশ

হইত, "বসিতে দাও।" ছেলেবেলা হইতে ইহাই নিয়ম দেখিতাম। আমি অবশ্য চিরদিনই আসন সরাইয়া বসিয়া পড়িতাম। মা আজ প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ ত তোমার আহারের বড় কষ্ট হয়েচে?" "কেন?" "শুনলাম খোকার ওখানে আজ তোমার নিমন্ত্রণ ছিল। আমি একবার মনে করলাম যে, তরকারী পাঠাইয়া দিই। কিন্তু খোকা কি ভাবিবে বলিয়া পাঠাইলাম না। ওখানে পেঁয়াজের রান্না হয়, তুমি ত খাবে না!" আমি চুপ করিয়া গেলে মাতৃসমীপে কৈশোরের সেই নিষ্ঠাচারিরূপে পরিচিত থাকিতাম, কিন্তু ইহা আমার অসহ বোধ হইল। চক্ষু নত করিয়া বলিলাম—"এখন পেঁয়াজ খাই, কলিকাতার মেসে থাকিয়া শিখিতে হয়েচে!" ব্রাহ্মণবিধবার দল একযোগে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। মা অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন—"ও ছেলে ত মিছা বলিবে না!"

আধুনিক ইংরেজীনবিশদের সর্ব্ববিষয়িণী উচ্ছৃঙ্খলতা তিনি অবশ্য শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন না; কিন্তু কতকগুলি বিষয়ে তাঁহাদের প্রশংসা করিতেন। সাধারণত শিক্ষিতদলের সত্যপ্রিয়তা এবং উৎকোচগ্রহণে বিরাগ সেকালের লোকের অনুকরণীয়,ইহা একাধিকবার তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি। পুলিসবিভাগে সৎলোকের কথা শুনিলে তিনি তাঁহাকে সম্মানিত করিয়া উৎসাহ দিতেন। বিশেষভাবে একজন পুলিস সব্-ইন্‌স্পেক্টরের কথা এখানে উল্লেখযোগ্য। ইনি প্রায় সমগ্র চাকরীর কাল রাজশাহীর নানাস্থানে কাটাইয়াছিলেন এবং পুটিয়ায় দীর্ঘকাল ছিলেন। সেখানে ভিন্ন ভিন্ন সরিকদের স্বার্থের ঘাতপ্রতিঘাতে অবিশ্রান্ত যে বিবাদাগ্নি জ্বলিত, দারোগা কেবল নিজের চরিত্রবলে তাহা থামাইয়া রাখিতেন। এই সজ্জন অথচ কঠোর কর্ত্তব্যপরায়ণ পুলিসকর্ম্মচারীকে চিরদিন মহারাণীমাতা সম্মান ও শ্রদ্ধা করিতেন।

প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মে তিনি অনন্ত বিশ্বাসবতী ছিলেন এবং তাহার সকল অনুষ্ঠান পরম নিষ্ঠার সহিত তাঁহার রাজসংসারে ও পিতৃগৃহে আচরিত হইত। ফলত পিত্রালয়ে পিতামহী ও পিতাঠাকুরের কাছে শৈশবে ভক্তিভাবের যে শিক্ষা তিনি পাইয়াছিলেন, কালে তাহাই পূর্ণতালাভ করিয়াছিল। তাঁহাদের দর্শন আমার অদৃষ্টে ঘটে নাই, কিন্তু মহারাণীমাতার মাতৃদেবীর যে পবিত্রতা, সহিষ্ণুতা ও করুণার ছবি বাল্যকাল হইতে আমি দেখিয়াছি, তাহাতে নিত্য মনে হইয়াছে, মাতাই তাঁর সকল মহত্ত্বের মূল। বাল্যে মহারাণী হাঁস ও পায়রা পুষিতে বড় ভালবাসিতেন বটে, কিন্তু ফুল ও ঠাকুরপূজাই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় খেলা ছিল। একদিন পিতা তাঁহার নিত্য-দেবার্চ্চনা শেষ করিয়া উঠিয়া গিয়াছেন, এমন সময়ে বালিকা ক্রীড়াচ্ছলে সেখানে পূজায় বসিলেন। কিন্তু আসনের নিকট প্রদীপ জ্বলিতেছিল, তাহা তাঁহার লক্ষ্য হয় নাই। পরিধানের বস্ত্রাঞ্চল দীপশিখায় পড়িয়া ধুধু করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। কোন কোলাহল কি চাঞ্চল্য প্রকাশ না করিয়া সে বস্ত্র তিনি তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করিলেন এবং নির্ম্মাল্যের জলে ডুবাইয়া ধরিলেন। পরে আগুন নিবিলে ভিজা কাপড় পরিয়া পিতামাতার নিকটে গিয়া বলিলেন, "এমন সুন্দর কাপড়খানা পুড়ে গেল!"

বালবিধবা মহারাণীমাতা, পরজন্মে আর বৈধব্য ঘটিবে না, হিন্দুমহিলাদের এই বিশ্বাস-মত প্রতিবৎসর সমারোহের সহিত জগদ্ধাত্রী-পূজা করিতেন। সেজন্য 'জগদ্ধাত্রীপূজার বাড়ী' নাম দিয়া রাজবাটীর অনতিদূরে তিনি একখানি মাটীর বাড়ী প্রস্তুত করাইয়াছিলেন এবং পূজা উপলক্ষ্যে কয়দিন আত্মীয় ও আশ্রিতগণ সহ সেখানে বাস করিতেন। মনে পড়িতেছে, সেই সময়ে সে গৃহে শ্বেতকৌশিক-বস্ত্রপরিহিতা তাঁহার গৌরাঙ্গী. সুদীর্ঘ মাতৃমূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে কতবার আমাদের মনে হইয়াছে, এই ত জীবন্ত জগদ্ধাত্রীমূর্ত্তি! আবার পৃথক্ পূজা কেন?

এই সকল পূজা এবং ব্রতাদি উপলক্ষে তিনি যে কঠোর সংযম অবলম্বন করিতেন, উত্তরকালে সম্ভবত তাহাই তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গের অন্যতম কারণ। ৩।৪টা নির্জ্জলা উপবাস বৎসরের মধ্যে কতবার তিনি করিতেন এবং তাহাতে এরূপ অভ্যস্ত ছিলেন যে, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। একদিন বর্ষার শেষদিকে আমরা সকলে তাঁহার কাছে বসিয়া আছি, এমন সময়ে খবর আসিল যে, পুরোহিতঠাকুর আসিয়াছেন। মহারাণীমাতা খুব মৃদুস্বরে কথা কহিতে লাগিলেন এবং দাসদাসীদের দ্বারা পুরোহিতকে জানাইলেন, তাঁহার ইচ্ছা, রাধাষ্টমীর ব্রত গ্রহণ করেন। পুরোহিত-ঠাকুর মাতার পীড়া ও শারীরিক দৌর্ব্বল্যের উল্লেখ করিয়া বারণ করিলেন, কিন্তু মহারাণী বলাইলেন, এক-আধটা উপবাস উপবাসই নহে, অতএব সে ব্রত তিনি গ্রহণ করিবেন। সহাস্যমুখে আমাদের সমক্ষে বারংবার হাত-জোড় করিলেন, অন্নদাসী প্রকোষ্ঠান্তরে উপবিষ্ট পুরোহিতঠাকুরকে সে কথা জানাইলে তিনি বলিলেন, নিজের শরীরসম্বন্ধে এরূপ ছেলেমানুষী করা মার কর্ত্তব্য হয় না। যাহা হউক, পুরোহিত আর আপত্তি করিলেন না।

সচরাচর সোনারূপা নিজে স্পর্শ করিতেন না, কেবল গুরুকুলের কেহ আসিলে প্রণামী দিবার সময় টাকা হাতে করিতে দেখিতাম। তখন গলবস্ত্রে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেন। একদিন শ্রীবৃন্দাবনধাম হইতে তাঁহার গুরুপত্নী কিছু টাকা চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন। টাকা সেইদিনই পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হইল। সেদিন নানা অসুবিধা, পরদিন পাঠাইলেই ভাল হয়, কিন্তু মা তাহা শুনিলেন না। বলিলেন, "গুরুর আজ্ঞা, আজই পাঠাইতে হইবে।" একদিন তাঁহার আশ্রিত আমাদের এক আত্মীয় মহারাণীমাতাকে জিজ্ঞাসা করিতে-ছিলেন, তাঁর গুরুদেব আসিয়াছেন, মন্ত্র দিতে চাহিতেছেন, মন্ত্র লওয়া কর্ত্তব্য কি না? মা বলিলেন, "গুরু নিজে আদেশ করিলে কালাকাল নাই।"

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার।

জিজ্ঞাসায় নিবেদন।

গত বৎসরের চৈত্রমাসের বঙ্গদর্শনে 'স্বদেশী বা পেট্রিয়টিজ্‌ম্' নামক প্রবন্ধসম্বন্ধে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথবাবু কতকগুলি প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। প্রশ্নের উত্তর, যিনি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, আশা করি, তিনিই দিবেন; আমি কেবল সেই আলোচনাসম্বন্ধে গোটা-কতক কথা নিবেদন করিতে চাই। কারণ, যে বিষয়টি লইয়া আলোচনা উঠিয়াছে, সেটিকে আমি নিতান্ত গুরুতর বলিয়া মনে করি।

আমাদের প্রাচীনসমাজ যখন গঠিত হইয়া উঠে, তখন বাহিরে বিশ্বজগতে তাহার স্থান কি, তাহা তাহাকে ভাবিতে হয় নাই। সে আপনার উপায়ে আপনি ধর্ম্মে, কর্ম্মে, বিধি-বিধানে একটা সামঞ্জস্য রচনা করিয়া চলিতে-ছিল। আজ ঐতিহাসিকের পক্ষে অন্যান্য-দেশের চিন্তা ও সাধনার সহিত তাহার তুলনা টানা পরম আনন্দের ব্যাপার, সন্দেহ নাই। বিচিত্র ভৌগোলিক সংস্থানের মধ্যে বিচিত্র সভ্যতা কিরূপে গড়িয়া উঠে,—গ্রীস্ কেন ষ্টেট্‌প্রধান সভ্যতাকে ও ভারতবর্ষ মঙ্গল-প্রধান সামাজিক সভ্যতাকে জন্ম দিল, তাহা তিনি আলোচনা করিয়া দেখিতে পারেন,—কিন্তু সে সকল দেখার কথা এখানে হইতেছে না।

কথা এই যে, এক্ষণে ইউরোপীয় সভ্যতা তাহার বিচিত্র-আয়োজন-উপকরণ লইয়া আমাদের ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। ইংলণ্ড আমাদের রাজা, তাহার রাজনীতির বিধিবিধানে ভারতশাসনচক্র অবিরাম ঘুরিয়া চলিয়াছে। এই শাসনচক্রে আমরা পাক খাইয়া কোথায় গিয়া পড়িব, তাহার ঠিকানা নাই।

আমাদের দেশে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ছিল বলিয়াই বিদেশের সংঘাতে আমরা কখনো মরি নাই। শাসনসূর্য্য উদিত হোক্ বা অস্তমিত হোক্, আমাদের অবস্থার তারতম্য তাহাতে বিশেষ ঘটে নাই, বরং নব নব জাতিকে আমরা আমাদের অন্তর্গত করিয়া লইয়া হিন্দুর সামাজিক সভ্যতাকে উত্তরোত্তর বিচিত্র করিয়াছি। হিন্দুধর্ম্ম বলিতে যেমন একটি ধর্ম্ম বুঝায় না, তেম্‌নি হিন্দুজাতি বলিতেও একটি জাতি বুঝায় না, তাহা অনেকের সমবায়।

কিন্তু ইংরেজের আমলে সেই প্রাচীন শান্তি স্পষ্টই ভঙ্গ হইয়াছে, ইহাও দেখিতেছি। তাই ইউরোপীয় সভ্যতা কি, তাহার প্রাণ-শক্তি কোথায়, কিরূপে সেই শক্তিকে আমরা আয়ত্ত করিতে পারি, শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রকেই আজ সেইদিকে চিন্তিত হইতে হইতেছে।

ইউরোপীয় জাতিদের আমরা বলি 'নেশন্'—ফ্রান্স, জর্ম্মাণি, ইংলণ্ড, সকলেই নেশন্।

কিসে নেশন্ হয় বলা শক্ত; কারণ, ইউরোপীয় সভ্যতার যেদিকেই দৃষ্টিনিক্ষেপ করা যায়, সেদিকেই বিরোধ ও বৈচিত্র্যের

অন্ত নাই। পুরোহিততন্ত্র, রাজতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র, সাধারণতন্ত্র, কত দল, কত মত তাহার মধ্যে বিদ্যমান,—এই বিচিত্র শক্তিজাল লইয়া ইউরোপ নেশন্। এইজন্য ইউরোপীয় পলিটিক্স্-জিনিষটা এমন দুরূহ, তাহাকে ব্যাপক করিয়া দেখা এমন শক্ত। অথচ এ সকল বিরোধ সত্ত্বেও ইউরোপের একটা ঐক্য আছে,—বুঝা যায় যে,সকলের চেষ্টা এক জায়গায় এক। সে চেষ্টাকে এক কথায় বলা যায়, ব্যক্তিকে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন করা, অথচ বিচিত্রের ফলদান করা। সেই চেষ্টার বশবর্ত্তী বলিয়াই ইউরোপীয় সভ্যতা এমন প্রাণবান্ ও সচেতন পদার্থ।

ইউরোপীয় শাসনচক্রে যে-শান্তি ভঙ্গ হয় নাই, ইউরোপীয় এই উন্মাদকর বৈচিত্র্যমূলক সভ্যতায় সেই শান্তি ভঙ্গ হইয়াছে। প্রাচীন সভ্যতার সরল একমুখিতা, যাহা জটিলতামাত্রকে বর্জ্জন করিয়া সর্ব্বত্র শান্তি ও কল্যাণকে অবারিত করিয়া দিবার জন্য ব্যস্ত। ছিল, সেই সরলতায় আঘাত পড়িয়াছে। এক্ষণে এই বিচিত্রকে না স্বীকার করিয়া উপায় নাই, ইহাকে ছাড়িয়া ঐক্যস্বীকার কোনমতেই সম্ভবে না, ইহার মধ্যে ঐক্যকে প্রতিষ্ঠা দিতেই হইবে।

পেট্রিয়টিজ্‌ম্ শুনিলেই আমাদের ভয় হয় মনে হয়, বুঝি সেটা স্বার্থপরতারই নামান্তর। তাহার কারণ, আজকাল ইউরোপীয় পেট্রিয়টিজ্‌মের সেই চেহারাই দেখিতেছি। তাহা মঙ্গলকে,—ঈশ্বরকে পরিহাস করিতে কুণ্ঠাবোধ করিতেছে না। কিন্তু ইংলণ্ড কি অন্যান্য কোন দেশের এই বিকৃতি দেখিয়া তাহাকে বিচার করা মূঢ়তা হইবে। ইউরোপ চিরকাল এইরূপ ভদ্রনামধারী বর্ব্বরতাকে আশ্রয় করিয়া ছিল না। এক সময়ে ইউরোপীয় নেশনেরা জানিত যে, নিজের দেশকে বিশ্বমানবের অঙ্গ করিতে পারাই সার্থকতা, সুতরাং নিজের দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শের মহিমাকে অন্যান্য দেশেও উজ্জ্বলরূপে দেখিবার জন্য ইউরোপ জগতের গুরুর আসন গ্রহণ করিবার চেষ্টা পাইয়াছিল। তখন দুর্ব্বলকে আশ্রয়দান করিয়া তাহাকে শিক্ষায়-দীক্ষায় নিজের সমান করিয়া তুলিবার চেষ্টা তাহার পক্ষে কি স্বাভাবিক ছিল, ইতিহাসপাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। সে উদারনীতি আজ তাহার নাই, কিন্তু সেই সাধনার মূলে যে বীজ-সত্য ছিল, তাহারই বলে ইউরোপ্ এত বড়। সেই সত্যের প্রতি আমাদের অন্ধ হওয়া চলিবে না।

এখন আমরা যে বিশ্বের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি,—আর ক্ষুদ্র দেশটুকুর মধ্যে আবদ্ধ নাই, এ কথাটি প্রতি মুহূর্ত্তে এই ইউরোপই স্মরণ করাইয়া দিতেছে। সুতরাং প্রাচীন যতই বড় হৌক্, তাহার দোহাই পাড়িয়া চুপ করিয়া আমরা বসিয়া থাকিতে পারি না। নূতনকে নিজের বলে আত্মসাৎ করিতেই হইবে। তাহাতেই প্রাচীন বাঁচিবে, নহিলে মরিবে।

নব্যহিন্দুদলের মধ্যে অনেকে এ কথা অস্বীকার করেন, জানি। তাঁহারা বলিবেন—'স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ', কিন্তু পরধর্ম্ম মানে পরানুকরণ নহে, পরধর্ম্মকে স্বধর্ম্ম করিতে পারিলেই ভয় ও নিধন উভয়ের হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

আমাদের সামাজিক ইতিহাস আজও রচিত হয় নাই ; হইলে দেখিতাম, এই ভারত-

বর্ষে যে আজ আচার, বর্ণ ও প্রথার এত বৈচিত্র্য, অথচ এক হিন্দুনামে সকলেই পরিচিত, তাহার মূলে কোন বিরোধ নাই। আমরা মনে করি যে, আমাদের দেশ কেবলি পার্থক্যের পর পার্থক্য রচনা করিয়া চলিয়াছিল, কোনদিন ঐক্যকে স্বীকার করে নাই। সেই পার্থক্যের প্রাচীরগুলি আজই দেখা দিয়াছে;—নিশ্চয়ই এমন সময় ছিল, যখন বিরোধের মধ্যেও একটা মিলন বিচিত্র সুরের সংযোগে রাগিণীর মত শুনা যাইত। নহিলে জ্ঞানে ও চিন্তায় আমাদের দেশ কখনো বড় হইতে পারিত না, ইহা আমার দৃঢ়বিশ্বাস।

কিন্তু এ সকল কথা প্রামাণিক নয় বলিয়া অনেকের কাছে পরিহাসের বিষয় হইয়া দাঁড়ায়, জানি। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই, নূতন ভাবের স্রোতকে ঠেকাইবে কি উপায়ে? চোখ বন্ধ করিয়া বসিয়া থাকিলেই চলিবে কি? যখন মুসলমান আসিয়াছিল, তখন যদিও আমরাই জ্ঞানে ও ধর্ম্মে প্রবলতর জাতি, তথাপি কি সমস্ত ভারতবর্ষে আভ্যন্তমধ্যে একটা ধর্ম্মের বিপ্লব উপস্থিত হয় নাই? তাহা বিপ্লব নহে, তাহা সমন্বয়চেষ্টা। মুক্তমরুবাসী আরব যেমন বিশ্বেশ্বরের সম্মুখে খোলাখুলি দাঁড়ায়,—কোন প্রথায়, আচারে, বিচারে মানুষকে খণ্ড করিয়া রাখে না,—সকলকেই সেই একের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্বন্ধে সংযুক্ত দেখে, নিশ্চয় তেমন একটি ভাব আমাদের মধ্যে তখন প্রবল ছিল না। অথচ তাহাই আমাদের দেশের বিশেষ সম্পত্তি। সমস্ত মানুষকে তাই ঈশ্বরের নিকটে সমান করিয়া দেখিবার জন্য নানক, কবীর, দাদু, চৈতন্য, তুকারাম, রামদাস প্রভৃতির আবির্ভাব ও নবযুগধর্ম্মের প্রবর্ত্তন। ইহাতে কি স্পষ্টই এই কথার সাক্ষ্য দেয় না যে, মুসলমানকে ভারতবর্ষ পৃথক্‌ভাবে দেখিতে আর পারিল না, তাহাকেও আপনার বৃহৎ ভাবরাজ্যের অন্তর্গত করিয়া লইল?

মহারাজ শিবাজীর 'ধর্ম্মরাজ্য'সংস্থাপনও সেই বৃহৎ চেষ্টার অন্তর্ভূত। এ কথা স্বীকার করি না যে, সেই যুগে 'সন্ন্যাসধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবে সংসারধর্ম্ম মলিন হইয়াছিল ও সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নতির পথ বন্ধ হইয়াছিল', বরং বলি, প্রশস্ত হইয়াছিল। সংসার ও সন্ন্যাসের প্রাচীন বিরোধ রাজা শিবাজীই মিটাইয়া দিতেছিলেন। কখনোই মহাগ্রন্থের পুণ্য 'ভাগোয়াজেন্দা'র [illegible] হৌক

আমি জানি না, আমি যে কথাগুলি লিখিয়া যাইতেছি, 'স্বদেশী বা পেট্রিয়টিজ্‌ম্‌' লেখক ঠিক্ সেই কথারই অনুমোদন করিবেন কি না। তাঁহার লেখা পড়িয়া আমার যাহা মনে হয়, আমি তাহাই লিখিলাম। যদি কোন জায়গায় তাঁহার সহিত না মিলিয়া থাকি, তবে তিনি যেন আমায় মার্জ্জনা করেন।

ইউরোপীয় ভাব ও সাধনাকে গ্রহণ করিতে হইবে, এবং এইরূপ গ্রহণের দ্বারাই সমস্ত সভ্যতাই চিরকাল বললাভ করে, সকল সভ্যতারই শ্রেষ্ঠজিনিষ বিশ্বমানবের সম্পত্তি। এ সকল কথা যখন লিখিতেছি, তখন জানি, আমার সহিত কোন সুহৃদয় ব্যক্তির অমিল নাই। কিন্তু একটি কথা জিজ্ঞাসা করি। কিরূপে যে এ সকল সম্ভব হইবে, তাহা কি কেহ বলিয়া দিতে পারেন? রাজনৈতিক আন্দোলনে, না সামাজিক হিতচেষ্টায়,—কোথায়, কখন্, কিভাবে যে আমরা জাগিব, তাহা কেহই জানেন না। সুতরাং বর্ণাশ্রম-

ধর্ম্ম বাঁচিবে কি মরিবে, সে সম্বন্ধে কোন-কথা-উত্থাপনই মিথ্যা।

লেখক লিখিয়াছেন—"অতি প্রাচীনকাল হইতেই হিন্দু অংশাংশী ও অঙ্গাঙ্গী ভাবে ব্যক্তির সঙ্গে পরিবারের সম্বন্ধপ্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা পাইয়াছে। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ইহার মূল ও ফল উভয়ই।" তাই আমরাও এইটুকু জানি যে, অংশাংশী ও অঙ্গাঙ্গী ভাবটিকে ব্যাপক করিতে হইবে, যাহাতে দেশের প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিসম্বন্ধে সম্বদ্ধ, এ কথা আমাদের মনে আসিতে পারে।

"সর্ব্বভূতে ব্রহ্মদৃষ্টির প্রাচীন আদর্শ ভক্তি-রসাপ্লুত হইয়া জীবমাত্রকেই এদেশে যদি নরনারায়ণের বিগ্রহরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকে, নরসেবাকেই ভগবৎসেবা, মানব-প্রেমকেই ভগবৎপ্রেমের প্রতিরূপে সাধনা করিয়া থাকে", তবে যে সেই আদর্শ 'পরিবার ও সমাজের গণ্ডী' অতিক্রম করিয়া ক্রমে আমাদের সকলকে এক বৃহৎ জাতিরূপে জাগ্রত করিবে না, এ কথা আমি বিশ্বাস করিতে পারি না। নিশ্চয়ই সমস্ত বিশ্ব-মহাজাতির মধ্যে আমরাও আমাদের স্থান করিয়া লইব, "স্বদেশ" বলিয়া একটি অখণ্ড মঙ্গলবস্তু আমাদের মধ্যেও গড়িয়া উঠিবে।

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

রাইবনীদুর্গ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রাইবনীদুর্গের ইতিহাস ঘোরতমসাচ্ছন্ন হইলেও ইহার অপেক্ষাকৃত আধুনিক কাহিনী তেমন অস্পষ্ট নহে। ইদানীন্তনকালে তমলুক এবং ময়নাচৌরীর কৈবর্ত্তরাজগণ মেদিনীপুর ও তৎসন্নিহিত জনপদ অধিকৃত করিলে শিখি-বংশীয় ক্ষত্রিয় ভূস্বামিগণ তাঁহাদের শেষ নরপাল নিঃশঙ্কনারায়ণের তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে ময়ূরভঞ্জ এবং বামনঘাটির পাহাড়জঙ্গল-প্রদেশ আশ্রয় করিলেন। ময়ূরভঞ্জের রাজ-কুলের মূলে শিখিপূজা,—তাঁহারাও শিখিবংশীয়। অতএব চিরদিন তাঁহারা সে রাজ্যের হিতাকাঙ্ক্ষা করিবেন, এইরূপ প্রতিশ্রুতির বলে ভূস্বামিগণ তথায় বসবাসের অনুমতি লাভ করিলেন। কিন্তু বসিতে পাইলে শয়নের ব্যবস্থা করিয়া লওয়া স্বভাবসিদ্ধ। এই স্বতঃসিদ্ধ পরম সত্যের প্রতি ময়ূরভঞ্জরাজের দৃষ্টি যখন আকৃষ্ট হইল, হাতের চেয়ে আম তখন বড় হইয়া উঠিয়াছে। ভূস্বামিগণের মুখ্য শশাঙ্কনারায়ণ এক বিচক্ষণ উৎকল-ব্রাহ্মণের সহায়ে দীর্ঘকাল ধরিয়া সঙ্গোপনে বলসঞ্চয় করিতেছিলেন। ক্রমে আবাদের ছল করিয়া তিনি জীর্ণ-প্রাচীন রাইবনীদুর্গ সুসংস্কৃত এবং মেদিনীপুরজেলাসুলভ কাঁটা-বাঁশের ঘনবিন্যস্ত বেষ্টনে তাহার বহিরঙ্গণ দুর্ভেদ্যতর করিয়া লইলেন।

প্রধানত যে উৎকলব্রাহ্মণের মন্ত্রণাবলে শশাঙ্কনারায়ণ রাজ্যের ভিত্তিস্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহার নাম উমাপ্রসন্ন দাস। দাঁতনের অনতিদূরস্থ যে নিবিড় বনানীর কথা প্রথমেই আমরা বলিয়াছি, কিছুকাল্ সেখানে তপস্যা করিয়া তিনি মহাদেব ও ভগবতী মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বাগ্‌দী এবং কৈবর্ত্ত জাতি তখন শৌর্য্যবীর্য্যের জন্য উড়িষ্যার পথে বড় প্রবল; উমাপ্রসন্ন সহজেই তাহাদের উপর সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা স্থাপন করিয়া লুপ্ত-হিন্দুগৌরব-উদ্ধারের স্বপ্ন কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিলেন। শিকারপ্রিয় শশাঙ্কনারায়ণের সঙ্গে ইতিপূর্ব্বে তাঁহার সাক্ষাৎ ও পরিচয় হইয়াছিল। তিনি এই তেজস্বী ও ধর্ম্মনিরত ব্রাহ্মণের নানা গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা হইলে শশাঙ্ককে পূর্ব্বগুরু ত্যাগ করিতে হয় বলিয়া দাসমহাশয় ইহাতে সম্মত হন নাই। যাহা হউক, উভয়ের মিলনের ফলে শিখিবংশের নির্ব্বাণোন্মুখ সৌভাগ্যদীপ আর একবার জ্বলিয়া উঠিয়াছিল।

উমাপ্রসন্ন দাস যে ধার্ম্মিক ও সুপণ্ডিত বংশের স্থাপয়িতা, শিবাপ্রসন্ন সেই কুল উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। তাঁহার অভ্যুদয়ের দিনে শিখিবংশের ভগ্নদশা। ময়ূরভঞ্জের রাজারা সে বংশের উচ্ছেদসাধন সঙ্কল্প করিয়া বসিয়াছিলেন। পুরুষপরম্পরায় এই দ্বন্দ্ব উভয় পক্ষেরই ন্যূনাধিক বলক্ষয় করিয়া আসিতেছিল, কিন্তু শেষে শিখিবংশেরই পরাজয় সম্পূর্ণ হইল।

উমাপ্রসন্ন দাঁতনের বনে যোগসিদ্ধ হইয়া পরে আবার সংসারী হইয়াছিলেন, এজন্য তাঁহার পদস্খলনের নিন্দা রটিয়াছিল। তিনি বাগ্‌দী এবং কৈবর্ত্তজাতির জোয়ানদিগকে লইয়া পদাতিক সেনাদল গঠন করিয়াছিলেন এবং সাধারণত তাহাদের সহায়তায় সুবর্ণরেখার তীরে তীরে বিস্তর জমি আবাদ করিয়া প্রচুর ধনসঞ্চয় করেন। ইহাতে তিনি ডাকাইতদলের সর্দ্দার বলিয়া সেকালের কোন কোন শ্রেণীতে পরিচিত ছিলেন। শশাঙ্কনারায়ণকে অবলম্বন করিয়া উৎকলে আবার হিন্দুগৌরব পুনর্জ্জীবিত করিতে তিনি যে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তাহা জয়যুক্ত হয় নাই। অন্তিমশয্যায় পুত্রকে প্রতিশ্রুত করাইয়া যান, চিরদিন তাঁহার বংশ শিখী রাজাদের আনুগত্য করিয়া তাঁহার জীবনস্বপ্ন সফল করিতে নিরত থাকিবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

শিবাপ্রসন্ন অনুদিন তাঁহার আদিপুরুষের ভাবে অনুপ্রাণিত ছিলেন। কিন্তু সে মন্ত্র গোপন রাখিয়া সচরাচর লোকহিতে এবং শাস্ত্রালোচনায় তাঁহার দিন কাটিত। তাঁহার যৌবনকালে শিখিরাজবংশের এরূপ অভাবনীয় অধঃপাত ঘটিয়াছিল যে, তদীয় সর্ব্বপ্রকার সাহায্য ব্যতিরেকে বিধবা রাণী ও অপোগণ্ড রাজকুমারের একদিনও চলিবার উপায় ছিল না। দাসমহাশয় রাইবনীদুর্গের বিস্তৃত বহির্দ্দেশে ক্রমশ তাঁহার অনুগত কৈবর্ত্ত ও বাগ্‌দীদের বসবাস করাইয়া পরিখার ধারে বিস্তর জমি আবাদ করাইলেন। সকল ব্যয়ভার নিজেই বহন করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহার এইরূপ ব্যবস্থায় দুঃস্থ রাজপরিবারের সম্ভ্রম-

হানির কথা বাহিরের লোকে জানিতে-বুঝিতে পারিত না। এইরূপে কয়-বৎসর-মধ্যে দেখিতে দেখিতে যে ধন ও শস্য সঞ্চয় হইল, তাহা নিতান্ত অল্প নহে। কিন্তু দাসমহাশয় ইহার কিছুই খরচ হইতে দিতেন না। নিত্য-ব্যবহার্য্য সকল দ্রব্য তাঁহার ভাণ্ডার হইতে আসিত।

মেদিনীপুর ও বালেশ্বর জেলায় নানাস্থানে শিবাপ্রসন্নের ভূসম্পত্তি এবং কৃষিকার্য্যের জন্য ভাণ্ডার ছিল। রাজপরিবারের তত্ত্বাবধানের সুবিধার জন্য ইদানীং তিনি দেবতা-স্থানের অপরপারে একটি বাটী নির্ম্মাণ করিয়া তথায় সপরিবারে বাস করিতেন। এখানে সদাব্রত ও টোল স্থাপন করিয়া বংশের আদি-পুরুষের নামে স্থানটির নামকরণ করিয়াছিলেন — উমাপুর।

আদিপুরুষের অনেকগুলি গুণ শিবাপ্রসন্নে বর্ত্তিয়াছিল। তাঁহার ন্যায় তিনিও যোগযুক্ত অথচ সংসারী ছিলেন। আত্মোন্নতি যে স্বদেশের ও স্বজাতির উন্নয়নের প্রথম সোপান-মাত্র, ইহা মহাপুরুষের ন্যায় তাঁহারও মজ্জাগত বিশ্বাস ছিল। কিন্তু প্রধানত যে গুণে উমাপ্রসন্ন অপেক্ষাকৃত আদিমকালে হীনতর জাতিদের মুগ্ধ করিয়া ভাবি-হিন্দুসাম্রাজ্য-স্থাপনের স্বপ্ন প্রত্যক্ষ করিতে বসিয়াছিলেন, সে মহদ্‌গুণ—আন্তরিকতা বা প্রেম—শিবা-প্রসন্নে অধিকতর স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াছিল। এই প্রেম শুধু তাঁহার জীবনকে মধুময় করিয়া নিরস্ত হয় নাই,—তাঁহার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত জড় বা জীব যে-কিছু—সর্ব্বত্র অমৃতবর্ষণ করিত।

শিখিবংশধর রাজকুমারকে মানুষ করিয়া তুলিয়া তাহার দ্বারা পূর্ব্বপুরুষের ও নিজের আদর্শ সফল করিবেন, অপুত্রক শিবাপ্রসন্ন প্রথম হইতে ইহাই সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। তাঁহার ক্ষত্রিয়োচিত ব্যায়াম ও শাস্ত্রানুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে মানসিক এবং নৈতিক শিক্ষা যাহাতে যুগপৎ দৃঢ়ভিত্তির উপর স্থাপিত হয়, সেদিকে তাঁর প্রখর দৃষ্টি ছিল। দাসমহা-শয়ের ব্যবস্থায় কুমার পদাঙ্কনারায়ণকে প্রায় প্রত্যহ দুইবেলা রাইবনীদুর্গপ্রাসাদ হইতে উমাপুরে আসিয়া অন্যান্য শিক্ষার্থীদের মত টোলে পাঠগ্রহণ করিতে হইত। কুমার সচরাচর অশ্বারোহণে আসিতেন বটে, কিন্তু মাঝে মাঝে ভ্রমণের অভ্যাস জন্য পদব্রজেও তাঁর গমনাগমন নিয়মবদ্ধ ছিল। এইরূপে কুমারের কৈশোরকাল উপস্থিত হইল। শিবাপ্রসন্ন প্রৌঢ়বয়স্ক হইলেও কুমারের সঙ্গে ক্রীড়ায় এবং আমোদে বালক বনিয়া যাইতেন। আর পুরুষপরম্পরাসম্বন্ধে তিনি পদাঙ্ক-নারায়ণের ঠাকুরদাদা বলিয়া পরিচিত। মাতারাণী কৃষ্ণপ্রিয়া শ্বশুরের মত তাঁহাকে শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন।

শিবাপ্রসন্ন স্বয়ং সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন এবং তাঁহার সৌন্দর্য্যজ্ঞান এতটা উৎকর্ষলাভ করিয়াছিল যে, সেকালের লোকে সেজন্য কখন-কখন তাঁহাকে ভূতাবিষ্ট মনে করিত। তিনি বিশ্বাস করিতেন, আমাদের সুকুমার বৃত্তিগুলি অনুশীলনে যত স্ফূর্ত্তিলাভ করিবে, ততই আমরা সর্ব্ববিধ পাপ এবং প্রলোভনের উপর জয়লাভ করিব। এ বিষয়ে তিনি নিজে যেমন শিক্ষা পাইয়াছিলেন, রাজকুমারের জন্যও সেইরূপ যোজনা করিলেন। কিন্তু এ শিক্ষা তাঁহার সমক্ষেই হইত। সঙ্গীতে শিবাপ্রসন্ন

এরূপ মুগ্ধ ছিলেন যে, তাঁহার সামান্য ভৃত্যটি পর্য্যন্ত সুকণ্ঠ হইলে প্রভুর কাছে রীতিমত শিক্ষা পাইত। এমন দেখা গিয়াছে, গৃহ-কার্য্যরত ভৃত্য অন্যমনে শ্যামা কি কৃষ্ণবিষয়ক গান গাহিতেছে, ভক্ত প্রভু শুনিতে শুনিতে নীরবে অশ্রুমোচন করিতেছেন।

ক্রমশ।

বৈজনাথ।*

যখন আগ্রায় পৌঁছিলাম,—মালাবারি তাঁহার বন্ধু বৈজনাথের সহিত আমার পরিচয় করিয়া দিলেন।

ব্রাহ্মণ্য-বর্ণাশ্রমের অন্তর্ভূত ইনি একজন উচ্চশ্রেণীর হিন্দু। কি ইংরেজিবিদ্যা, কি হিন্দুশাস্ত্র—উভয়েই ইনি উৎকৃষ্ট শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। ইনি এলাহাবাদ-বিশ্ববিদ্যালয়ের "ফেলো"; ইনি আগ্রা-আদালতের জজ্। দর্শনশাস্ত্রে ইঁহার বিশেষ অনুরাগ। ইঁহার পুস্তকাগারে শপেন্‌হোয়েরের (Schopenhauer) ও ওগুস্ত্-কোঁতের (Auguste Comte) ইংরেজি-অনুবাদগ্রন্থগুলি আছে। এ সমস্ত তিনি পাঠ করিয়াছেন বলিলেন। ইহা সত্ত্বেও, তিনি প্রাচীন ধর্ম্মবিশ্বাসের সারাংশগুলি বজায় রাখিয়াছেন; গাভীদিগকে পবিত্রপশুর মধ্যে গণ্য করেন। তিনি বিলাতযাত্রা করিয়াছেন; বিশেষ ঔৎসুক্যের সহিত আমাদের সভ্যতার ব্যাপারসকল দর্শন করিয়াছেন। ভারতকে "আধুনিক"ভাবে অনুপ্রাণিত করাই তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা। কিন্তু, যখন আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তাঁহার কয়টি সন্তান, তখন তিনি অন্য হিন্দুদিগেরই ন্যায়, তাঁহার পুত্রসন্তানদিগেরই উল্লেখ করিলেন, কন্যাসন্তানের কথা কিছুই বলিলেন না। কেন না, হিন্দুর নিকট কন্যাসন্তান ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে।

আমাকে, তাঁহার আর-দুইটি ফরাসী-বন্ধুকে ও ম্যালাবারিকে ভোজনে নিমন্ত্রণ করিয়া তিনি সাহসের পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু আমাদের সহিত একত্র বসিয়া আহার করিতে তাঁহার সাহসে কুলায় নাই। তিনি একটা পাশের ঘরে, ভূমির উপর আসনপিঁড়ি হইয়া আহার করিতে বসিলেন। এই অবসরে, ভৃত্যেরা ডাল-চাপ্‌াটি প্রভৃতি প্রচুর নিরামিষ খাদ্য আমাদের নিকট লইয়া আসিল। আহারান্তে আমাদিগকে হিন্দুসঙ্গীত শুনাইলেন! দুইপ্রকার সেতার, একটা বাঁয়া, একজন গায়ক। প্রেমের গান ও ধর্ম্মের গান আমরা পর্য্যায়ক্রমে শুনিতে লাগিলাম, কিন্তু উহাদের পার্থক্য কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। কেন না, এই সঙ্গীত আমাদের নিকট একেবারেই অপরিচিত।

বৈজনাথকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—ভারতসমস্যার মীমাংসা কি?" তিনি উত্তর করিলেন,—কৃষ্ণধর্ম্মে ফিরিয়া যাওয়া। এই উত্তর শুনিয়া আমি স্তম্ভিত হইলাম। বিষ্ণুর

---

* ফরাসী-পর্য্যটক ফেলিসিয়াঁ-স্থালের "ভারতবর্ষ—কতিপয় লোক ও নগর" নামক ফরাসীগ্রন্থ হইতে অনুদিত।

অবতার কৃষ্ণ, ভারতের খুব লোকপ্রিয় দেবতা—চিত্তাকর্ষক দেবতা, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই আধুনিককালে, কোন জাতির উদ্ধারকর্ত্তা বলিয়া ইঁহাকে কি করিয়া মনে করা যাইতে পারে?

কৃষ্ণ! তাঁহার প্রতিমা ভারতের দেবালয়ে,—তাঁহার ছোট-ছোট প্রতিমূর্ত্তি পূজাসামগ্রীর দোকানে সর্ব্বদাই দেখা যায়। ইনি নীলবর্ণ, ইঁহার দীর্ঘায়ত চক্ষু, ইনি রাখালদের সমক্ষে বাঁশী বাজান। ইনি অশ্বশালার মধ্যে, কুমারীগর্ভে অলৌকিকভাবে জন্মগ্রহণ করেন *। ইনি একজন-দুর্বৃত্ত-নৃপতি-কর্ত্তৃক নিপীড়িত হন। সেই নৃপতি ইঁহাকে বিনাশ করিবার জন্য অনেকগুলি শিশু হত্যা করে। কৃষ্ণ প্রথমে, দৈবক্রমে রাখালবৃত্তি অবলম্বন করেন; পরে, একবার কোন দেবালয়ে নীত হইলে, তাঁহার গভীর জ্ঞানের পরিচয় দিয়া তিনি মন্দিরের পুরোহিতগণকে বিস্ময়মুগ্ধ করেন *। তিনি অনেক অদ্ভুত অলৌকিক কাণ্ড করিয়াছেন। একবার একটি কদাকার কুব্জা রমণী আসিয়া তাঁহার পদতলে লুটাইয়া পড়িল; তিনি যখন তাহাকে তুলিলেন, সে সোজা হইয়া গেল,—রাণীর মত রূপসী হইল। তখন, কৃষ্ণ অদ্ভুতরকমের জীবনযাত্রা আরম্ভ করিলেন;—চূড়ান্ত বিলাসলীলায় প্রবৃত্ত হইয়া, উচ্চ-অঙ্গের নীতি-উপদেশ দিতে লাগিলেন। ইনি একপ্রকার "খৃষ্ট-ডন্-জুয়ান্" বলিলেও হয়। কৃষ্ণের ১৬হাজার প্রণয়িনী ছিল। তাহাদের নিকট তিনি আত্মোৎসর্গের, স্বার্থত্যাগের, সতীত্বের উপদেশ দিতেন। কখন-কখন তাহাদের সহিত একটু দুষ্টামিভর ভাবে রঙ্‌তামাসা করিয়া আমোদ অনুভব করিতেন। কখন, কোন গোপীর প্রেমে মত্ত হইয়া তাহার সাধ্যসাধনায় প্রবৃত্ত হইতেন, আবার তাহার পরেই, তাহার মাখন চুরি করিতেন। আবার কোনদিন, কতক-গুলি যুবতী নদীতে স্নান করিতেছে দেখিয়া, তাহাদের বস্ত্রাদি হরণ করিয়া গাছের ডালে ঝুলাইয়া রাখিতেন, এবং স্নান করিয়া উহারা কি করে—সেই মজা দেখিবার জন্য তিনি নিজেও লুকাইয়া থাকিতেন। (তাঞ্জো-রের কোন মন্দিরের দ্বারপ্রকোষ্ঠের গায়ে এই দৃশ্যটির প্রতিকৃতি আছে)...এই কৃষ্ণ-ধর্ম্মে ফিরিয়া গেলে, ভারতের কিরূপে নব-জীবনলাভ হইবে—কিরূপে ভারতের উদ্ধার হইবে?

এই গুরুতর-সমস্যা-সম্বন্ধে বৈজনাথ তাঁহার নিজের মতামত একটি পুস্তিকায় ব্যক্ত করিয়া-ছেন; এবং সেই পুস্তিকার এক খণ্ড তিনি আমার নিকট পাঠাইয়াছেন। পুস্তিকাটি ইংরেজিভাষায় লিখিত,—নাম—"Hinduism—Ancient and Modern"। গ্রন্থকার, রাওবাহাদুর লালা বৈজনাথ, তাঁহার এই হিন্দুনামের শেষে, ইংরেজি সরকারী পদবী (B. A. and member of Judicial Service) জুড়িয়া দিয়াছেন। পুস্তিকার মুখাবরণের উপর পবিত্র গঙ্গানদী চিত্রিত; এবং বারাণসীর লোকপূজ্য ভাস্করানন্দস্বামীর নামে পুস্তিকাখানি তিনি উৎসর্গ করিয়াছেন।

বৈজনাথ যাহা বলিয়াছেন, তাহার সারাংশটি এই:—হিন্দুধর্ম্মের সুদূর অতীতের ঐতিহ্যে ফিরিয়া গেলে, ভারতের যেরূপ

* এই নূতন তত্ত্ব ফরাসী-পর্য্যটক কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন?—অনুবাদক।

নৈতিক বিপ্লব সংঘটিত হইতে পারে, এমন আর কিছুতে নহে। পূর্ব্বপুরুষদিগের সংস্কার ও ভাবাদি সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করা অসম্ভব। বৈজনাথ বলেন,—ফ্রান্সে একবার সেইরূপ চেষ্টা হইয়াছিল; তাহা হইতেই ফ্রান্সের অধোগতির সূত্রপাত হইয়াছে। পক্ষান্তরে, জাতীয়জীবনকে অচল করিয়া রাখাও অসম্ভব,—সমস্ত অতীতকে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করাও অসম্ভব। অতীতের শুধু সেই-সব কথাই গ্রহণ করিতে হইবে, যাহা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে—আমাদের ধর্ম্মবুদ্ধিকে আঘাত করে না।

ভারতের জন্য পুত্তলিকার প্রয়োজন নাই;—প্রয়োজন আদর্শপুরুষের। এই আদর্শপুরুষ অতীতের মধ্যেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই আদর্শপুরুষ—রাম, বিশেষত কৃষ্ণ; এই কৃষ্ণেই আমাদের মানস-আদর্শ বাস্তবে পরিণত হইয়াছে। সৌন্দর্য্য, উদারতা, প্রখরবুদ্ধি, বেদজ্ঞান, সাহস, লজ্জা, নম্রতা, সন্তোষ। বৈজনাথ আরো বলেন—অবশ্য তাঁহার জীবনে এমন কতকগুলি ঘটনা আছে, যাহা আমাদের নিকট সুনীতিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু তাঁহার উচ্চচরিত্রের সহিত এ সমস্ত কথার কোন সঙ্গতি দেখা যায় না। এই সমস্ত পৌরাণিক কথা প্রক্ষিপ্ত, সন্দেহ নাই। বৈজনাথ মূলশ্লোকের উপর সমালোচনার ভিত্তি স্থাপন করিয়া এই কথা সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার প্রাচীন ধর্ম্মবিশ্বাসকে সমর্থন করিবার জন্য তিনি যেরূপ উৎসাহের সহিত আধুনিক বৈজ্ঞানিকপদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছেন, তাহা একটু হাস্যোদ্দীপক। যিশুখৃষ্টের যে-সব কথা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মবুদ্ধিকে আঘাত করে, কোন-কোন প্রটেষ্টাণ্ট-সম্প্রদায়ের ধর্ম্মতত্ত্ববেত্তারাও উহাকে এইরূপ অপ্রামাণিক বলিয়া দাঁড় করাইবার চেষ্টা পাইয়াছেন। *

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

* সম্প্রতি বৈজনাথ, ভারতের উদ্ধারকর্ত্তা-হিসাবে, রাম ও কৃষ্ণের সহিত শাক্যমুনি বুদ্ধের নামও যোগ করিয়া দিয়াছেন। তিনি দেখাইতে চাহেন, হিন্দুধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্মের একই উৎপত্তিস্থান।

"হিন্দুদের মধ্যে বুদ্ধদেব একজন মহাপুরুষ, মহাজ্ঞানী, সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন,—এ কথা বলা যাইতে পারে। রাম ও কৃষ্ণচরিত্রের ন্যায়, বুদ্ধচরিত্রেও প্রকৃত ধর্ম্মভাব অন্বেষণ করা ভারতের কর্ত্তব্য'।

(Communication au Premier Congres International des etudes d'Extreme Orient. Hanoi, 1902)

শিক্ষাসমস্যা।*

জাতীয় শিক্ষাপরিষদের সভ্য আমার কয়েকজন শ্রদ্ধেয় সুহৃদ্ এই পরিষদের ইস্কুলবিভাগের একটি গঠনপত্রিকা তৈরি করিবার জন্য আমার উপরে ভার দিয়াছিলেন।

তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করিতে বসিয়া দেখিলাম, কাজটি সহজ নহে। কেন না, গোড়ায় জানা উচিত, এই সঙ্কল্পিত বিদ্যালয়ের কারণবীজটি কি, ইহার মূলে কোন্ ভাব আছে। আমার তাহা জানা নাই।

আমাদের শাস্ত্রে বলে, বাসনাই জন্ম-প্রবাহের কারণ—বস্তুপুঞ্জের আকস্মিক সংঘটনই জন্মের হেতু নহে। যদি বাসনার ছেদ হয়, তবে গোড়া কাটা পড়িয়া জন্মমৃত্যুর অবসান হইয়া যায়।

তেম্‌নি বলা যাইতে পারে, ভাব-জিনিষ-টাই সকল অনুষ্ঠানের গোড়ায়। যদি ভাব না থাকে, তবে নিয়ম থাকিতে পারে, টাকা থাকিতে পারে, কমিটি থাকিতে পারে—কিন্তু কর্ম্মের শিকড় কাটা পড়িয়া তাহা শুকাইয়া যায়।

তাই গোড়াতেই মনে প্রশ্ন উদয় হয় যে, জাতীয় শিক্ষাপরিষৎটি কোন্ ভাবের প্রেরণায় জন্মগ্রহণ করিতেছে? দেশে সম্প্রতি যে সকল বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা আছে, তাহার মধ্যে কোন্ ভাবের অভাব ছিল,—যাহাতে সেই শিক্ষা সম্পূর্ণ হইতেছিল না এবং প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ে সেই ভাবটিকে কোথায় স্থান দেওয়া হইতেছে?

জাতীয় শিক্ষাপরিষৎ শুধু যদি কারু-বিদ্যালয়স্থাপনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইত, তাহা হইলে বুঝিতাম যে, একটা বিশেষ সঙ্কীর্ণ প্রয়োজন সাধন করাই ইহার উদ্দেশ্য। কিন্তু যখন দেখা যাইতেছে, সাধারণত দেশের সমস্ত শিক্ষার প্রতি পরিষৎ দৃষ্টি রাখিতে চান, তখন এই জিজ্ঞাসা মনে উঠে যে, কোন্ ভাবে এই শিক্ষাকার্য্য চলিবে। কোন্ নিয়মে চলিবে এবং কি কি বই পড়ান হইবে, সে সমস্ত বাহিরের কথা।

ইহার উত্তরে যদি কেহ বলেন, "জাতীয়"-ভাবে শিক্ষা দেওয়া হইবে—তবে প্রশ্ন উঠিবে, শিক্ষাসম্বন্ধে জাতীয়ভাব বলিতে কি বুঝায়? "জাতীয়"শব্দটার কোনো সীমানির্দ্দেশ হয় নাই—হওয়াও শক্ত। কোন্‌টা জাতীয় এবং কোন্‌টা জাতীয় নহে, শিক্ষা, সুবিধা ও সংস্কার অনুসারে ভিন্ন লোকে তাহা ভিন্নরকমে স্থির করেন।

অতএব শিক্ষাপরিষদের মূলভাবটিসম্বন্ধে গোড়াতেই দেশের লোকে সকলে মিলিয়া একটা বোঝাপড়া হওয়া দরকার। ইংরেজ-সরকারের প্রতি রাগ করিয়া আমরা এই কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছি, এ কথা এক মুহূর্ত্তের জন্য মনে স্থান দিতে পারি না। দেশের

---

* গত ২৩শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার ওভারটুন্ হলে আহুত সভায় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কর্ত্তৃক পঠিত।

অন্তঃকরণ একটা-কিছু অভাব বোধ করিয়াছিল,—একটা-কিছু চায়, সেইজন্যই আমরা দেশের সেই ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতে একত্র হইয়াছি, এই কথাই সত্য।

আমরা চাই—কিন্তু কি চাই, তাহা বাহির করা যে সহজ, তাহা মনে করি না। এই সম্বন্ধে সত্য-আবিষ্কারের 'পরেই আমাদের উদ্ধার নির্ভর করে। যদি ভুল করি, যেটা হাতের কাছেই আছে,—আমরা যেটাতে অভ্যস্ত, জড়ত্ববশত যদি সেইটেকেই সত্য মনে করি, তবে বড়-বড় নাম আমাদিগকে বিফলতা হইতে রক্ষা করিতে পারিবেন না।

এইজন্য শিক্ষাপরিষদের প্রতিষ্ঠাতাগণ যখন উদ্যোগে প্রবৃত্ত আছেন, তখন দেশের সর্ব্বসাধারণের তরফ হইতে নিজের চিত্ত,—নিজের অভাব বুঝিবার জন্য একটা আলোচনা হওয়া উচিত।

সেই আলোচনাকে জাগাইয়া তোলাই আমার এই রচনার প্রধান উদ্দেশ্য। এই উপলক্ষ্যে, যে ভাবটি আমার মনের সম্মুখে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাকে দেশের দরবারে উপস্থিত করা আমার কর্ত্তব্য। যদি শিক্ষিতসমাজের প্রচলিত সংস্কারের সঙ্গে ইহার বিরোধ বাধে, তবে ইহা গ্রাহ্য হইবে না, জানি। যদি গ্রাহ্য না হয়, তবে আপনাদের একটা সুবিধা আছে—আপনারা সমস্তটাকে কবিকল্পনার আকাশকুসুম বলিয়া অতি সংক্ষেপেই বর্জ্জন করিতে পারিবেন এবং আমিও ব্যর্থ কবিদের সান্ত্বনাস্থল "পষ্টারিটি" অর্থাৎ কোনো-একটা অনির্দ্দিষ্ট উত্তরকালের মধ্যে আমার অনাদৃত প্রস্তাবটির ভাবী সদ্গতি কল্পনা করিয়া আশ্বাসলাভের চেষ্টা করিব। কিন্তু তৎপূর্ব্বে আজ আপনাদের নিকটে বহুল-পরিমাণে ধৈর্য্য ও ক্ষমা সানুনয়ে প্রার্থনা করি।

ইস্কুল বলিতে আমরা যাহা বুঝি, সে একটা শিক্ষা দিবার কল। মাষ্টার এই কারখানার একটা অংশ। সাড়েদশটার সময় ঘণ্টা বাজাইয়া কারখানা খোলে।—কল চলিতে আরম্ভ হয়, মাষ্টারেরও মুখ চলিতে থাকে। চারটের সময় কারখানা বন্ধ হয়, মাষ্টার-কলও তখন মুখ বন্ধ করেন; ছাত্রেরা দুইচার-পাত কলে-ছাঁটা বিদ্যা লইয়া বাড়ী ফেরে। তার পর পরীক্ষার সময় এই বিদ্যার যাচাই হইয়া তাহার উপরে মার্কা পড়িয়া যায়।

কলের একটা সুবিধা, ঠিক মাপে ঠিক ফরমাস দেওয়া জিনিষটা পাওয়া যায়—এক কলের সঙ্গে আর-এক কলের উৎপন্ন সামগ্রীর বড়-একটা তফাৎ থাকে না, মার্কা দিবার সুবিধা হয়।

কিন্তু এক মানুষের সঙ্গে আর-এক মানুষের অনেক তফাৎ। এমন কি, একই মানুষের এক দিনের সঙ্গে আর-এক দিনের ইতরবিশেষ ঘটে।

তবু, মানুষের কাছ হইতে মানুষ যাহা পায়, কলের কাছ হইতে তাহা পাইতে পারে না। কল সম্মুখে উপস্থিত করে, কিন্তু দান করে না—তাহা তেল দিতে পারে, কিন্তু আলো জ্বালাইবার সাধ্য তাহার নাই।

য়ুরোপে মানুষ সমাজের ভিতরে থাকিয়া মানুষ হইতেছে, ইস্কুল তাহার কথঞ্চিৎ সাহায্য করিতেছে। লোকে যে বিদ্যা লাভ করে, সে বিদ্যাটা সেখানকার মানুষ হইতে বিচ্ছিন্ন নহে—সেইখানেই তাহার চর্চ্চা হইতেছে,

সেইখানেই তাহার বিকাশ হইতেছে—সমাজের মধ্যে নানা আকারে নানা ভাবে তাহার সঞ্চার হইতেছে—লেখাপড়ায়, কথায়-বার্ত্তায়, কাজে-কর্ম্মে তাহা অহরহ প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতেছে। সেখানে জনসমাজ যাহা কালে-কালে নানা ঘটনায় নানা লোকের দ্বারায় লাভ করিয়াছে, সঞ্চয় করিয়াছে এবং ভোগ করিতেছে, তাহাই বিদ্যালয়ের ভিতর দিয়া বালকদিগকে পরিবেষণের একটা উপায় করিয়াছে মাত্র।

এইজন্য সেখানকার বিদ্যালয় সমাজের সঙ্গে মিশিয়া আছে, তাহা সমাজের মাটি হইতেই রস টানিতেছে এবং সমাজকেই ফলদান করিতেছে।

কিন্তু বিদ্যালয় যেখানে চারিদিকের সমাজের সঙ্গে এমন এক হইয়া মিশিতে পারে নাই, যাহা বাহির হইতে সমাজের উপরে চাপাইয়া দেওয়া, তাহা শুষ্ক, তাহা নির্জ্জীব। তাহার কাছ হইতে যাহা পাই, তাহা কষ্টে পাই, এবং সে বিদ্যা প্রয়োগ করিবার বেলা কোনো সুবিধা করিয়া উঠিতে পারি না। দশটা হইতে চারটে পর্য্যন্ত যাহা মুখস্থ করি, জীবনের সঙ্গে, চারিদিকের মানুষের সঙ্গে, ঘরের সঙ্গে তাহার মিল দেখিতে পাই না। বাড়ীতে বাপমা-ভাইবন্ধুরা যাহা আলোচনা করেন, বিদ্যালয়ের শিক্ষার সঙ্গে তাহার যোগ নাই, বরঞ্চ অনেক সময়ে বিরোধ আছে। এমন অবস্থায় বিদ্যালয় একটা এঞ্জিন্‌মাত্র হইয়া থাকে—তাহা বস্তু জোগায়, প্রাণ জোগায় না।

এইজন্য বলিতেছি, য়ুরোপের বিদ্যালয়ের অবিকল বাহ্য নকল করিলেই আমরা যে সেই একই জিনিষ পাইব, এমন নহে। এই নকলে সেই বেঞ্চি, সেই টেবিল, সেইপ্রকার কার্য্যপ্রণালী সমস্তই ঠিক মিলাইয়া পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা আমাদের পক্ষে বোঝা হইয়া উঠে।

পূর্ব্বে যখন আমরা গুরুর কাছে বিদ্যা পাইতাম,—শিক্ষকের কাছে নহে, মানুষের কাছে জ্ঞান চাহিতাম,—কলের কাছে নয়, তখন আমাদের শিক্ষার বিষয় এত বিচিত্র ও বিস্তৃত ছিল না এবং তখন আমাদের সমাজে প্রচলিত ভাব ও মতের সঙ্গে পুঁথির শিক্ষার কোনো বিরোধ ছিল না। ঠিক সেদিনকে আজ ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিলে সেও একটা নকল হইবে মাত্র, তাহার বাহ্য আয়োজন বোঝা হইয়া উঠিবে, কোনো কাজেই লাগিবে না।

অতএব আমাদের এখনকার প্রয়োজন যদি আমরা ঠিক বুঝি, তবে এমন ব্যবস্থা করিতে হইবে, যাহাতে বিদ্যালয় ঘরের কাজ করিতে পারে; যাহাতে পাঠ্যবিষয়ের বিচিত্রতার সঙ্গে অধ্যাপনার সজীবতা মিশিতে পারে; যাহাতে পুঁথির শিক্ষাদান এবং হৃদয়-মনকে গড়িয়া-তোলা, দুই ভারই বিদ্যালয় গ্রহণ করে। দেখিতে হইবে, আমাদের দেশে বিদ্যালয়ের সঙ্গে বিদ্যালয়ের চতুর্দ্দিকের যে বিচ্ছেদ, এমন কি, বিরোধ আছে, তাহার দ্বারা যেন ছাত্রদের মন বিক্ষিপ্ত হইয়া না যায় ও এইরূপে বিদ্যাশিক্ষাটা যেন কেবল দিনের মধ্যে কয়েকঘণ্টামাত্র সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইয়া উঠিয়া বাস্তবিকতাসম্পর্কশূন্য একটা অত্যন্ত গুরুপাক অ্যাব্‌ষ্ট্রাক্ট্‌ ব্যাপার হইয়া না দাঁড়ায়।

বিদ্যালয়ে ঘর বানাইলে তাহা বোর্ডিং-ইস্কুল-আকার ধারণ করে। এই বোর্ডিং-ইস্কুল বলিতে যে ছবি মনে জাগিয়া উঠে, তাহা মনোহর নয়—তাহা বারিক্, পাগলাগারদ, হাঁসপাতাল বা জেলেরই এক-গোষ্ঠীভুক্ত।

অতএব বিলাতের নজির একেবারে ছাড়িতে হইবে, কারণ, বিলাতের ইতিহাস, বিলাতের সমাজ আমাদের নহে। আমাদের দেশের লোকের মনকে কোন্ আদর্শ বহুদিন মুগ্ধ করিয়াছে, আমাদের দেশের হৃদয়ে রস-সঞ্চার হয় কিসে, তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে।

বুঝিবার বাধা যথেষ্ট আছে। আমরা ইংরেজি-ইস্কুলে পড়িয়াছি, যেদিকে তাকাই, ইংরেজের দৃষ্টান্ত আমাদের চোখের সাম্‌নে প্রত্যক্ষ। ইহার আড়ালে, আমাদের দেশের ইতিহাস, আমাদের স্বজাতির হৃদয়, অস্পষ্ট হইয়া আছে। আমরা ন্যাশনাল্ পতাকাটাকে উচ্চে তুলিয়া যখন স্বাধীনচেষ্টায় কাজ করিব বলিয়া কোমর বাঁধিয়া বসি, তখনো বিলাতের বেড়ি কোমরবন্ধ হইয়া আমাদিগকে বাঁধিয়া ফেলে, আমাদিগকে নজিরের বাহিরে নড়িতে দেয় না।

আমাদের একটা মুস্কিল এই যে, আমরা ইংরেজি বিদ্যা ও বিদ্যালয়ের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি সমাজকে অর্থাৎ সেই বিদ্যা ও বিদ্যালয়কে তাহার যথাস্থানে দেখিতে পাই না। আমরা ইহাকে সজীব লোকালয়ের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া জানি না। এইজন্য সেই বিদ্যালয়ের এদেশী প্রতিরূপটিকে কেমন করিয়া আমাদের জীবনের সঙ্গে মিলাইয়া লইতে হইবে, তাহাই জানি না, অথচ ইহাই জানা সব চেয়ে প্রয়োজনীয়। বিলাতের কোন্ কলেজে কোন্ বই পড়ানো হয় এবং তাহার নিয়ম কি, ইহা লইয়া তর্কবিতর্কে কালক্ষেপ করা সময়ের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার নহে।

এ সম্বন্ধে আমাদের হাড়ের মধ্যে একটা অন্ধসংস্কার প্রবেশ করিয়াছে। যেমন তিব্বতী মনে করে যে, লোক ভাড়া করিয়া তাহাকে দিয়া একটা মন্ত্রলেখা চাকা চালাইলেই পুণ্যলাভ হয়, তেম্‌নি আমরাও মনে করি, কোনোমতে একটা সভাস্থাপন করিয়া কমিটির দ্বারা যদি সেটা চালাইয়া যাই, তবেই আমরা ফললাভ করিব। বস্তুত সেই স্থাপন করাটাই যেন লাভ। আমরা অনেকদিন হইল একটা বিজ্ঞানসভা স্থাপন করিয়াছি, তাহার পরে বৎসরে বৎসরে বিলাপ করিয়া আসিয়াছি, দেশের লোকে বিজ্ঞান-শিক্ষায় উদাসীন। কিন্তু একটা বিজ্ঞানসভা স্থাপন করা এক, আর দেশের লোকের চিত্তকে বিজ্ঞানশিক্ষায় নিবিষ্ট করা আর। সভা ফাঁদিলেই তাহার পরে দেশের লোক বিজ্ঞানী হইয়া উঠিবে, এরূপ মনে করা ঘোর কলিযুগের কল-নিষ্ঠার পরিচয়।

আসল কথা, মানুষের মন পাইতে হইবে, তাহা হইলে যেটুকু আয়োজন করা যায়, সেইটুকুই পুরা ফল দেয়। ভারতবর্ষ যখন শিক্ষা দিত, তখন মন পাইয়াছিল কি করিয়া, সে কথাটা ভাবিয়া দেখা চাই—বিদেশী য়ুনিভার্সিটির ক্যালেণ্ডার্ খুলিয়া তাহার রস বাহির করিবার জন্য তাহাতে পেন্সিলের দাগ দিতে নিষেধ করিব না, কিন্তু সঙ্গে

সঙ্গে এই বিচারটাও উপেক্ষার বিষয় নহে। কি শিখাইব, তাহা ভাবিবার বটে—কিন্তু যাহাকে শিখাইব, তাহার সমস্ত মনটা কি করিয়া পাওয়া যাইতে পারে, সেও কম কথা নয়।

একদিন তপোবনে ভারতবর্ষের গুরুগৃহ ছিল, এইরূপ একটা পুরাণ-কথা আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। অবশ্য তপোবনের যে একটা পরিষ্কার ছবি আমাদের মনে আছে, তাহা নহে এবং তাহা অনেক অলৌকিকতার কুহেলিকায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

যেকালে এই সকল আশ্রম সত্য ছিল, সেকালে তাহারা ঠিক কিরূপ ছিল, তাহা লইয়া তর্ক করিব না, করিতে পারিব না। কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, এই সকল আশ্রমে যাঁহারা বাস করিতেন, তাঁহারা গৃহী ছিলেন এবং শিষ্যগণ সন্তানের মত তাঁহাদের সেবা করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে বিদ্যাগ্রহণ করিতেন। এই ভাবটাই আমাদের দেশের টোলেও আজ কতকটা-পরিমাণে চলিয়া আসিয়াছে।

এই টোলের প্রতি লক্ষ্য করিলেও দেখা যাইবে, চতুষ্পাঠীতে কেবলমাত্র পুঁথির পড়াটাই সব চেয়ে বড় জিনিষ নয়, সেখানে চারিদিকেই অধ্যয়ন-অধ্যাপনার হাওয়া বহিতেছে। গুরু নিজেও ঐ পড়া লইয়াই আছেন ; শুধু তাই নয়, সেখানে জীবনযাত্রা নিতান্ত সাদাসিধা ; বৈষয়িকতা, বিলাসিতা মনকে টানাছেঁড়া করিতে পারে না, সুতরাং শিক্ষাটা একেবারে স্বভাবের সঙ্গে মিশ খাইবার সময় ও সুবিধা পায়। য়ুরোপের বড়-বড় শিক্ষাগারেও যে এই ভাবটি নাই, সে কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নহে।

প্রাচীন ভারতবর্ষের মতে, যতদিন অধ্যয়নের কাল, ততদিন ব্রহ্মচর্য্যপালন এবং গুরুগৃহে বাস আবশ্যক।

ব্রহ্মচর্য্যপালন বলিতে যে কৃচ্ছ্রসাধন বুঝায়, তাহা নহে। সংসারের মাঝখানে যাহারা থাকে, তাহারা ঠিক স্বভাবের পথে চলিতে পারে না। নানা লোকের সংঘাতে নানা দিক্ হইতে নানা ঢেউ আসিয়া অনেক-সময়ে অনাবশ্যকরূপে তাহাদিগকে চঞ্চল করিতে থাকে—যে সময়ে যে সকল হৃদয়বৃত্তি ভ্রূণ-অবস্থায় থাকিবার কথা, তাহারা কৃত্রিম আঘাতে অকালে জন্মগ্রহণ করে ; ইহাতে কেবলি শক্তির অপব্যয় হয় এবং মন দুর্ব্বল ও লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়ে।

অথচ জীবনের আরম্ভকালে বিকৃতির সমস্ত কৃত্রিম কারণ হইতে স্বভাবকে প্রকৃতিস্থ রাখা নিতান্তই আবশ্যক। প্রবৃত্তির অকাল-বোধন এবং বিলাসিতার উগ্র উত্তেজনা হইতে মনুষ্যত্বের নবোদ্গমের অবস্থাকে স্নিগ্ধ করিয়া রক্ষা করাই ব্রহ্মচর্য্যপালনের উদ্দেশ্য।

বস্তুত এই স্বভাবের নিয়মের মধ্যে থাকা বালকদের পক্ষে সুখের অবস্থা। ইহাতে তাহাদের পূর্ণবিকাশের সহায়তা করে, ইহাতেই তাহারা যথার্থভাবে স্বাধীনতার আনন্দলাভ করিতে পায়। ইহাতে তাহাদের নবাঙ্কুরিত নির্ম্মল সতেজ মন সমস্ত শরীরের মধ্যে দীপ্তির সঞ্চার করে।

ব্রহ্মচর্য্যপালনের পরিবর্ত্তে আজকাল নীতিপাঠের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। যে-কোনো উপলক্ষ্যে ছাত্রদিগকে নীতি-উপদেশ দিতে হইবে, দেশের অভিভাবকদের এইরূপ অভিপ্রায়।

ইহাও ঐ কলের ব্যাপার। নিয়মিত প্রত্যহ খানিকটা করিয়া সালসা-খাওয়ানর মত খানিকটা নীতি-উপদেশ—ইহা একটা বরাদ্দ; —শিশুকে ভাল করিয়া তুলিবার এই একটা বাঁধা উপায়।

নীতি-উপদেশ জিনিষটা একটা বিরোধ। ইহা কোনোমতেই মনোরম হইতে পারে না। যাহাকে উপদেশ দেওয়া হয়, তাহাকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়। উপদেশ, হয় তাহার মাথা ডিঙাইয়া চলিয়া যায়, নয় তাহাকে আঘাত করে। ইহাতে যে কেবল চেষ্টা ব্যর্থ হয়, তাহা নয়, অনেকসময় অনিষ্ট করে। সৎকথাকে বিরস ও বিফল করিয়া তোলা মনুষ্যসমাজের যেমন ক্ষতিকর, এমন আর কিছুই নয়—অথচ অনেক ভাল-লোক এই কাজে উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছেন, ইহা দেখিয়া মনে আশঙ্কা হয়।

সংসারে কৃত্রিম জীবনযাত্রায় হাজার-রকমের অসত্য ও বিকৃতি যেখানে প্রতি মুহূর্ত্তে রুচি নষ্ট করিয়া দিতেছে, সেখানে ইস্কুলে দশটা-চারটের মধ্যে গোটাকতক পুঁথির বচনে সমস্ত সংশোধন করিয়া দিবে, ইহা আশাই করা যায় না। ইহাতে কেবল ভূরি-ভূরি ভাণের সৃষ্টি হয় এবং নৈতিক জ্যাঠামি, যাহা সকল জ্যাঠামির অধম তাহা সুবুদ্ধির স্বাভাবিকতা ও সৌকুমার্য্য নষ্ট করিয়া দেয়।

ব্রহ্মচর্য্যপালনের দ্বারা ধর্ম্মসম্বন্ধে সুরুচিকে স্বাভাবিক করিয়া দেওয়া হয়। উপদেশ দেওয়া নহে, শক্তি দেওয়া হয়। নীতি-কথাকে বাহ্যভূষণের মত জীবনের উপরে চাপাইয়া দেওয়া নহে, জীবনকেই ধর্ম্মের সঙ্গে গড়িয়া তোলা এবং এইরূপে ধর্ম্মকে বিরুদ্ধপক্ষে দাঁড় না করাইয়া তাহাকে অন্তরঙ্গ করিয়া দেওয়া হয়। অতএব জীবনের আরম্ভে মনকে,—চরিত্রকে গড়িয়া তুলিবার সময় উপদেশ নহে, অনুকূল অবস্থা এবং অনুকূল নিয়মই সকলের চেয়ে বেশি আবশ্যক।

শুধু এই ব্রহ্মচর্য্যপালন নয়, তাহার সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির আনুকূল্য থাকা চাই। সহর-ব্যাপারটা মানুষের কাজের প্রয়োজনেই তৈরি হইয়াছে; তাহা আমাদের স্বাভাবিক আবাস নয়। ইঁট-কাঠ-পাথরের কোলে ভূমিষ্ঠ হইয়া আমরা মানুষ হইব, বিধাতার এমন বিধান ছিল না। আপিসের কাছে এবং এই আপিসের সহরের কাছে পুষ্পপল্লব-চন্দ্রসূর্য্যের কোনো দাবী নাই—তাহা সজীব সরস বিশ্বপ্রকৃতির বক্ষ হইতে ছিনাইয়া-লইয়া আমাদিগকে তাহার উত্তপ্ত জঠরের মধ্যে গিলিয়া পরিপাক করিয়া ফেলে। যাহারা ইহাতেই অভ্যস্ত, এবং যাহারা কাজের নেশায় বিহ্বল, তাহারা এসম্বন্ধে কোনো অভাবই অনুভব করে না—তাহারা স্বভাব হইতে ভ্রষ্ট হইয়া বৃহৎ জগতের সংস্রব হইতে প্রতিদিনই দূরে চলিয়া যায়।

কিন্তু কাজের ঘূর্ণির মধ্যে ঘাড়মুড় ভাঙিয়া পড়িবার পূর্ব্বে, শিখিবার কালে, বাড়িয়া উঠিবার সময়ে, প্রকৃতির সহায়তা নিতান্তই চাই। গাছপালা, স্বচ্ছ আকাশ, মুক্তবায়ু, নির্ম্মল জলাশয়, উদার দৃশ্য, ইহারা বেঞ্চি এবং বোর্ড, পুঁথি এবং পরীক্ষার চেয়ে কম আবশ্যক নয়।

চিরদিন উদার বিশ্বপ্রকৃতির ঘনিষ্ঠসংস্রবে থাকিয়াই ভারতবর্ষের মন গড়িয়া উঠিয়াছে। জগতের জড়-উদ্ভিদ্-চেতনের সঙ্গে নিজেকে

একাত্মভাবে ব্যাপ্ত করিয়া দেওয়া ভারতবর্ষের স্বভাবসিদ্ধ হইয়াছে। ভারতবর্ষের তপোবনে দ্বিজবটুগণ এই মন্ত্র আবৃত্তি করিয়াছেন—

যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বভুবনমাবিবেশ।
য ওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ॥

যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলে, যিনি বিশ্বভুবনে আবিষ্ট হইয়া আছেন—যিনি ওষধিতে, যিনি বনস্পতিতে, সেই দেবতাকে নমস্কার করি—নমস্কার করি।

অগ্নি, বায়ু, জলস্থল, বিশ্বকে বিশ্বাত্মা দ্বারা সহজে পরিপূর্ণ করিয়া দেখিতে শেখাই যথার্থ শেখা। এই শিক্ষা সহরের ইস্কুলে ঠিকমত সম্ভবে না; সেখানে বিদ্যাশিক্ষার কারখানাঘরে জগৎকে আমরা একটা যন্ত্র বলিয়াই শিখিতে পারি।

কিন্তু এখনকার দিনের কাজের লোকেরা এ সকল কথা মিষ্টিসিজ্‌ম্ বা ভাবকুহেলিকা বলিয়া উড়াইয়া দিবেন, অতএব ইহা লইয়া সমস্ত আলোচনাটাকে অশ্রদ্ধাভাজন করিবার প্রয়োজন নাই।

তথাপি, খোলা আকাশ, খোলা বাতাস এবং গাছপালা মানবসন্তানের শরীরমনের সুপরিণতির জন্যে যে অত্যন্ত দরকার, এ কথা বোধ হয় কেজো লোকেরাও একেবারেই উড়াইয়া দিতে পারিবেন না। বয়স যখন বাড়িবে, আপিস যখন টানিবে, লোকের ভিড় যখন ঠেলিয়া লইয়া বেড়াইবে, মন যখন নানা মৎলবে নানা দিকে ফিরিবে, তখন বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ হৃদয়ের যোগ অনেকটা বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। তাহার পূর্ব্বে যে জল-স্থল-আকাশ-বায়ুর চিরন্তন ধাত্রীক্রোড়ের মধ্যে জন্মিয়াছি, তাহার সঙ্গে যথার্থভাবে পরিচয় হইয়া যাক্, মাতৃস্তন্যের মত তাহার অমৃতরস আকর্ষণ করিয়া লই, তাহার উদার মন্ত্র গ্রহণ করি, তবেই সম্পূর্ণরূপে মানুষ হইতে পারিব। বালকদের হৃদয় যখন নবীন আছে, কৌতূহল যখন সজীব এবং সমুদয় ইন্দ্রিয়শক্তি যখন সতেজ, তখনি তাহাদিগকে মেঘ ও রৌদ্রের লীলাভূমি অবারিত আকাশের তলে খেলা করিতে দাও—তাহাদিগকে এই ভূমার আলিঙ্গন হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়ো না। স্নিগ্ধ-নির্ম্মল প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয় তাহাদের প্রত্যেক দিনকে জ্যোতির্ম্ময় অঙ্গুলির দ্বারা উদ্ঘাটিত করুক্ এবং সূর্য্যাস্তদীপ্ত সৌম্য-গম্ভীর সায়াহ্ন তাহাদের দিবাবসানকে নক্ষত্র-খচিত অন্ধকারের মধ্যে নিঃশব্দে নিমীলিত করিয়া দিক্! তরুলতার শাখাপল্লবিত নাট্যশালায় ছয় অঙ্কে ছয় ঋতুর নানারস-বিচিত্র গীতিনাট্যাভিনয় তাহাদের সম্মুখে ঘটিতে দাও! তাহারা গাছের তলায় দাঁড়াইয়া দেখুক্, নববর্ষা প্রথমযৌবরাজ্যে অভিষিক্ত রাজপুত্রের মত তাহার পুঞ্জ-পুঞ্জ সজলনিবিড় মেঘ লইয়া আনন্দগর্জ্জনে চিরপ্রত্যাশী বনভূমির উপরে আসন্নবর্ষণের ছায়া ঘনাইয়া তুলিতেছে;—এবং শরতে অন্নপূর্ণা ধরিত্রীর বক্ষে শিশিরে সিঞ্চিত, বাতাসে চঞ্চল, নানাবর্ণে বিচিত্র দিগন্তব্যাপ্ত শ্যামল সফলতার অপর্য্যাপ্ত বিস্তার স্বচক্ষে দেখিয়া তাহাদিগকে ধন্য হইতে দাও! হে প্রবীণ অভিভাবক, হে বিষয়ি, তুমি কল্পনাবৃত্তিকে যতই নির্জ্জীব, হৃদয়কে যতই কঠিন করিয়া থাক, দোহাই তোমার, এ কথা অন্তত লজ্জাতেও বলিয়ো না যে, ইহার কোনো প্রয়োজন নাই—তোমার

বালকদিগকে বিশাল বিশ্বের মধ্য দিয়া বিশ্বজননীর প্রত্যক্ষলীলাস্পর্শ অনুভব করিতে দাও—তাহা তোমার ইন্‌স্পেক্টরের তদন্ত এবং পরীক্ষকের প্রশ্নপত্রিকার চেয়ে যে কত বেশি কাজ করে, তাহা অন্তরে অনুভব কর না বলিয়াই তাহাকে নিতান্ত উপেক্ষা করিয়ো না।

মন যখন বাড়িতে থাকে, তখন তাহার চারিদিকে একটা বৃহৎ অবকাশ থাকা চাই। বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে সেই অবকাশ বিশালভাবে, বিচিত্রভাবে, সুন্দরভাবে বিরাজমান। কোনোমতে সাড়েনয়টা-দশটার মধ্যে তাড়াতাড়ি অন্ন গিলিয়া বিদ্যাশিক্ষার হরিণবাড়ীর মধ্যে হাজিরা দিয়া কখনই ছেলেদের প্রকৃতি সুস্থভাবে বিকাশলাভ করিতে পারে না। শিক্ষাকে দেয়াল দিয়া ঘিরিয়া, গেট্ দিয়া রুদ্ধ করিয়া, দরোয়ান দিয়া পাহারা বসাইয়া, শাস্তিদ্বারা কণ্টকিত করিয়া, ঘণ্টাদ্বারা তাড়া দিয়া মানবজীবনের আরম্ভে এ কি নিরানন্দের সৃষ্টি করা হইয়াছে। শিশু যে অ্যাল্‌জেব্রা না কষিয়াই, ইতিহাসের তারিখ না মুখস্থ করিয়াই মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, সেজন্য সে কি অপরাধী? তাই সে-হতভাগ্যদের নিকট হইতে তাহাদের আকাশবাতাস, তাহাদের আনন্দ-অবকাশ সমস্ত কাড়িয়া-লইয়া শিক্ষাকে সর্ব্বপ্রকারেই তাহাদের পক্ষে শাস্তি করিয়া তুলিতে হইবে? না-জানা হইতে ক্রমে ক্রমে জানিবার আনন্দ পাইবে বলিয়াই কি শিশুরা অশিক্ষিত হইয়া জন্মগ্রহণ করে না! আমাদের অক্ষমতা ও বর্ব্বরতাবশত জ্ঞানশিক্ষা যদি আমরা আনন্দজনক করিয়া না তুলিতে পারি, তবু চেষ্টা করিয়া, ইচ্ছা করিয়া, নিতান্ত নিষ্ঠুরতাপূর্ব্বক নিরপরাধ শিশুদের বিদ্যাগারকে কেন আমরা কারাগারের আকৃতি দিই? শিশুদের জ্ঞানশিক্ষাকে বিশ্বপ্রকৃতির উদাররমণীয় অবকাশের মধ্য দিয়া উন্মেষিত করিয়া তোলাই বিধাতার অভিপ্রায় ছিল—সেই অভিপ্রায় আমরা যে পরিমাণে ব্যর্থ করিতেছি, সেই পরিমাণেই ব্যর্থ হইতেছি, হরিণবাড়ীর প্রাচীর ভাঙিয়া ফেল,—মাতৃগর্ভের দশমাসে পণ্ডিত হইয়া উঠে নাই বলিয়া শিশুদের প্রতি সশ্রম কারাদণ্ডের বিধান করিয়ো না—তাহাদিগকে দয়া কর।

তাই আমি বলিতেছি, শিক্ষার জন্য এখনো আমাদের বনের প্রয়োজন আছে এবং গুরুগৃহও চাই। বন আমাদের সজীব বাসস্থান এবং গুরু আমাদের সহৃদয় শিক্ষক। এই বনে, এই গুরুগৃহে আজও বালকদিগকে ব্রহ্মচর্য্যপালন করিয়া শিক্ষা সমাধা করিতে হইবে। কালে আমাদের অবস্থার যতই পরিবর্ত্তন হইয়া থাক্, এই শিক্ষানিয়মের উপযোগিতার কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই, কারণ, এ নিয়ম মানবচরিত্রের নিত্যসত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত।

অতএব, আদর্শবিদ্যালয় যদি স্থাপন করিতে হয়, তবে লোকালয় হইতে দূরে নির্জ্জনে মুক্ত আকাশ ও উদার প্রান্তরে গাছপালার মধ্যে তাহার ব্যবস্থা করা চাই। সেখানে অধ্যাপকগণ নিভৃতে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় নিযুক্ত থাকিবেন এবং ছাত্রগণ সেই জ্ঞানচর্চ্চার যজ্ঞক্ষেত্রের মধ্যেই বাড়িয়া উঠিতে থাকিবে।

যদি সম্ভব হয়, তবে এই বিদ্যালয়ের সঙ্গে খানিকটা ফসলের জমি থাকা আবশ্যক;—এই জমি হইতে বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় আহার্য্যসংগ্রহ হইবে, ছাত্ররা চাষের কাজে

সহায়তা করিবে। দুধ-ঘি প্রভৃতির জন্য গোরু থাকিবে এবং গোপালনে ছাত্রদিগকে যোগ দিতে হইবে। পাঠের বিশ্রামকালে তাহারা স্বহস্তে বাগান করিবে, গাছের গোড়া খুঁড়িবে, গাছে জল দিবে, বেড়া বাঁধিবে। এইরূপে তাহারা প্রকৃতির সঙ্গে, কেবল ভাবের নহে, কাজের সম্বন্ধও পাতাইতে থাকিবে।

অনুকূল ঋতুতে বড়-বড় ছায়াময় গাছের তলায় ছাত্রদের ক্লাস্ বসিবে। তাহাদের শিক্ষার কতক অংশ অধ্যাপকের সহিত তরু-শ্রেণীর মধ্যে বেড়াইতে বেড়াইতে সমাধা হইবে। সন্ধ্যার অবকাশ তাহারা নক্ষত্র-পরিচয়ে, সঙ্গীতচর্চ্চায়, পুরাণকথা ও ইতিহাসের গল্প শুনিয়া যাপন করিবে।

অপরাধ করিলে ছাত্রগণ আমাদের প্রাচীন প্রথা অনুসারে প্রায়শ্চিত্ত পালন করিবে। শাস্তি পরের নিকট হইতে অপরাধের প্রতিফল, প্রায়শ্চিত্ত নিজের দ্বারা অপরাধের সংশোধন। দণ্ডস্বীকার করা যে নিজেরই কর্ত্তব্য এবং না করিলে যে গ্লানিমোচন হয় না, এই শিক্ষা বাল্যকাল হইতেই হওয়া চাই—পরের নিকটে নিজেকে দণ্ডনীয় করিবার হীনতা মনুষ্যোচিত নহে।

যদি অভয় পাই, তবে এই প্রসঙ্গে সাহসে ভর করিয়া আর-একটা কথা বলিয়া রাখি। এই বিদ্যালয়ে বেঞ্চি-টেবিল-চৌকির প্রয়োজন নাই। আমি ইংরেজিসামগ্রীর বিরুদ্ধে গোঁড়ামি করিয়া এই কথা বলিতেছি, এমন কেহ যেন না মনে করেন। আমার বক্তব্য এই যে, আমাদের বিদ্যালয়ে অনাবশ্যককে খর্ব্ব করিবার একটা আদর্শ সর্ব্বপ্রকারে স্পষ্ট করিয়া তুলিতে হইবে। চৌকি-টেবিল-ডেস্ক সকল মানুষের সকল সময়ে জোটা সহজ নহে, কিন্তু ভূমিতল কেহ কাড়িয়া লইবে না। চৌকি-টেবিলে সত্যসত্যই ভূমিতলকে কাড়িয়া লয়। এমন দশা ঘটে যে, ভূমিতল ব্যবহার করিতে বাধ্য হইলে সুখ পাই না, সুবিধা হয় না। ইহা একটা প্রকাণ্ড ক্ষতি। আমাদের দেশ শীতের দেশ নহে, আমাদের বেশভূষা এমন নয় যে, আমরা নীচে বসিতে পারি না, অথচ পরদেশের অভ্যাসে আমরা আস্বাবের বাহুল্য সৃষ্টি করিয়া কষ্ট বাড়াইতেছি। অনাবশ্যককে যে পরিমাণে অত্যাবশ্যক করিয়া তুলিব, সেই পরিমাণে আমাদের শক্তির অপব্যয় ঘটিবে। অথচ ধনী য়ুরোপের মত আমাদের সম্বল নাই; তাহার পক্ষে যাহা সহজ, আমাদের পক্ষে তাহা ভার। কোনো-একটা সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে গেলেই গোড়াতে ঘরবাড়ী ও আস্বাব্পত্রের হিসাব খতাইয়া চক্ষে অন্ধকার দেখিতে হয়। এই হিসাবের মধ্যে অনাবশ্যকের দৌরাত্ম্য বারো-আনা। আমরা কেহ সাহস করিয়া বলিতে পারি না, আমরা মাটির ঘরে কাজ আরম্ভ করিব, আমরা নীচে আসন পাতিয়া সভা করিব। এ কথা বলিতে পারিলে আমাদের অর্দ্ধেক ভারলাঘব হইয়া যায়, অথচ কাজের বিশেষ তারতম্য হয় না। কিন্তু যে দেশে শক্তির সীমা নাই, যে দেশে ধন কানায়-কানায় ভরিয়া উপ্‌চিয়া পড়িতেছে, সেই দেশের আদর্শে সমস্ত কাজের পত্তন না করিলে আমাদের লজ্জা দূর হয় না, আমাদের কল্পনা তৃপ্ত হয় না। ইহাতে আমাদের ক্ষুদ্র শক্তির অধিকাংশই আয়োজনে নিঃশেষিত হইয়া যায়, আসল জিনিষকে খোরাক জোগাইতে পারি না। যতদিন মেঝেতে খড়ি

পাড়িয়া হাত প্যাকাইয়াছি, ততদিন পাঠশালা স্থাপন করিতে আমাদের ভাবনা ছিল না, এখন বাজারে শ্লেট্-পেন্সিলের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, কিন্তু পাঠশালা হওয়াই মুস্কিল। সকল দিকেই ইহা দেখা যাইতেছে। পূর্ব্বে আয়োজন যখন অল্প ছিল, সামাজিকতা অধিক ছিল; এখন অয়োজন বাড়িয়া চলিয়াছে এবং সামাজিকতায় ভাটা পড়িতেছে। আমাদের দেশে একদিন ছিল, যখন আস্‌বাব্‌কে আমরা ঐশ্বর্য্য বলিতাম, কিন্তু সভ্যতা বলিতাম না; কারণ, তখন দেশে যাঁহারা সভ্যতার ভাণ্ডারী ছিলেন, তাঁহাদের ভাণ্ডারে আস্‌বাবের প্রাচুর্য্য ছিল না। তাঁহারা দারিদ্র্যকে সুভদ্র করিয়া সমস্ত দেশকে সুস্থ-স্নিগ্ধ রাখিয়াছিলেন। অন্তত শিক্ষার দিনে যদি আমরা এই আদর্শে মানুষ হইতে পারি—তবে আর-কিছু না হউক, হাতে আমরা কতকগুলি ক্ষমতা লাভ করি—মাটিতে বসিবার ক্ষমতা, মোটা পরিবার,—মোটা খাইবার ক্ষমতা, যথাসম্ভব অল্প আয়োজনে যথাসম্ভব বেশি কাজ চালাইবার ক্ষমতা—এগুলি কম ক্ষমতা নহে, এবং ইহা সাধনার অপেক্ষা রাখে। সুগমতা, সরলতা, সহজতাই যথার্থ সভ্যতা,—বহু আয়োজনের জটিলতা বর্ব্বরতা, বস্তুত তাহা গলদ্‌ঘর্ম্ম অক্ষমতার স্তূপাকার জঞ্জাল! কতকগুলা জড়বস্তুর অভাবে মনুষ্যত্বের সম্ভ্রম যে নষ্ট হয় না, বরঞ্চ অধিকাংশস্থলেই স্বাভাবিক দীপ্তিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠে, এ শিক্ষা শিশুকাল হইতে বিদ্যালয়ে লাভ করিতে হইবে—নিষ্ফল উপদেশের দ্বারা নহে, প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দ্বারা। এই নিতান্ত সহজ কথাকে সকলপ্রকারে সাক্ষাৎভাবে ছেলেদের কাছে স্বাভাবিক করিয়া দিতে হইবে। এ শিক্ষা নহিলে শুধু যে আমরা নিজের হাতকে-পাকে, ঘরের মেঝেকে-মাটিকে অবজ্ঞা করিতে অভ্যস্ত হইব, তাহা নহে, আমাদের পিতা-পিতামহকে ঘৃণা করিব এবং প্রাচীন ভারতবর্ষের সাধনার মাহাত্ম্য যথার্থভাবে অনুভব করিতেই পারিব না।

এইখানে কথা উঠিবে, বাহিরের চিকণ-চাকণকে যদি তুমি খাতির করিতে না চাও, তবে ভিতরের জিনিষটাকে বিশেষভাবে মূল্যবান্ করিয়া তুলিতে হইবে—সে মূল্য দিবার সাধ্য কি আমাদের আছে? প্রথমেই জ্ঞান-শিক্ষার আশ্রম স্থাপন করিতে হইলে গুরুর প্রয়োজন। শিক্ষক কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেই জোটে, কিন্তু গুরু ত ফরমাস দিলেই পাওয়া যায় না।

এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, আমাদের সঙ্গতি যাহা আছে, তাহার চেয়ে বেশি আমরা দাবী করিতে পারি না, এ কথা সত্য। অত্যন্ত প্রয়োজন হইলেও সহসা আমাদের পাঠশালায় গুরুমহাশয়ের আসনে যাজ্ঞবল্ক্য-ঋষির আমদানি করা কাহারো আয়ত্তাধীন নহে। কিন্তু এ কথাও বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে, আমাদের যে সঙ্গতি আছে, অবস্থাদোষে তাহার পুরাটা দাবী না করিয়া আমরা সম্পূর্ণ মূলধন খাটাইতে পারি না, এমন ঘটনাও ঘটে। ডাকের টিকিট লেফাফায় আঁটিবার জন্যই যদি জলের ঘড়া ব্যবহার করি, তবে তাহার অধিকাংশ জলই অনাবশ্যক হয়; আবার, স্নান করিতে হইলে সেই ঘড়ার জলই সম্পূর্ণ নিঃশেষ করা যায়;—একই ঘড়ার উপযোগিতা ব্যবহারের গুণে কমে-বাড়ে। আমরা

যাঁহাকে ইস্কুলের শিক্ষক করি, তাঁহাকে এমন করিয়া ব্যবহার করি, যাহাতে তাঁহার হৃদয়-মনের অতি অল্প অংশই কাজে খাটে—ফোনোগ্রাফযন্ত্রের সঙ্গে একখানা বেত এবং কতকটা-পরিমাণ মগজ জুড়িয়া দিলেই ইস্কুলের শিক্ষক তৈরি করা যাইতে পারে। কিন্তু এই শিক্ষককেই যদি গুরুর আসনে বসাইয়া দাও, তবে স্বভাবতই তাঁহার হৃদয়মনের শক্তি সমগ্রভাবে শিষ্যের প্রতি ধাবিত হইবে। অবশ্য, তাঁহার যাহা সাধ্য, তাহার চেয়ে বেশি তিনি দিতে পারিবেন না, কিন্তু তাহার চেয়ে কম দেওয়াও তাঁহার পক্ষে লজ্জাকর হইবে। একপক্ষ হইতে যথার্থভাবে দাবী না উত্থাপিত হইলে অন্যপক্ষে সম্পূর্ণ শক্তির উদ্বোধন হয় না। আজ ইস্কুলের শিক্ষকরূপে দেশের যেটুকু শক্তি কাজ করিতেছে, দেশ যদি অন্তরের সঙ্গে প্রার্থনা করে, তবে গুরুরূপে তাহার চেয়ে অনেক বেশি শক্তি খাটিতে থাকিবে।

আজকাল প্রয়োজনের নিয়মে শিক্ষকের গরজ ছাত্রের কাছে আসা, কিন্তু স্বভাবের নিয়মে শিষ্যের গরজ গুরুকে লাভ করা। শিক্ষক দোকানদার, বিদ্যাদান তাঁহার ব্যবসায়। তিনি খরিদদারের সন্ধানে ফেরেন। ব্যবসাদারের কাছে লোকে বস্তু কিনিতে পারে, কিন্তু তাহার পণ্যতালিকার মধ্যে স্নেহ, শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা প্রভৃতি হৃদয়ের সামগ্রী থাকিবে, এমন কেহ প্রত্যাশা করিতে পারে না। এই প্রত্যাশা অনুসারেই শিক্ষক বেতন গ্রহণ করেন ও বিদ্যাবস্তু বিক্রয় করেন—এইখানেই ছাত্রের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক শেষ। এইরূপ প্রতিকূল অবস্থাতেও অনেক শিক্ষক দেনা-পাওনার সম্বন্ধ ছাড়াইয়া উঠেন—সে তাঁহাদের বিশেষ মাহাত্ম্যগুণে। এই শিক্ষকই যদি জানেন যে, তিনি গুরুর আসনে বসিয়াছেন; যদি তাঁহার জীবনের দ্বারা ছাত্রের মধ্যে জীবনসঞ্চার করিতে হয়, তাঁহার জ্ঞানের দ্বারা তাহার জ্ঞানের বাতি জ্বালিতে হয়, তাঁহার স্নেহের দ্বারা তাহার কল্যাণসাধন করিতে হয়, তবেই তিনি গৌরবলাভ করিতে পারেন—তবে তিনি এমন জিনিষ দান করিতে বসেন, যাহা পণ্যদ্রব্য নহে, যাহা মূল্যের অতীত, সুতরাং ছাত্রের নিকট হইতে শাসনের দ্বারা নহে, ধর্ম্মের বিধানে, স্বভাবের নিয়মে তিনি ভক্তিগ্রহণের যোগ্য হইতে পারেন। তিনি জীবিকার অনুরোধে বেতন লইলেও তাহার চেয়ে অনেক বেশি দিয়া আপন কর্ত্তব্যকে মহিমান্বিত করেন। এবারে বাংলাদেশের বিদ্যালয়গুলির 'পরে রাজচক্রের শনির দৃষ্টি পড়িবামাত্র কত প্রবীণ এবং নবীন শিক্ষক জীবিকালুব্ধ শিক্ষকবৃত্তির কলঙ্ককালিমা নির্লজ্জভাবে সমস্ত দেশের সম্মুখে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা কাহারো অগোচর নাই। তাঁহারা যদি গুরুর আসনে থাকিতেন, তবে পদগৌরবের খাতিরে এবং হৃদয়ের অভ্যাস-বশতই ছোট-ছোট ছেলেদের উপরে কনষ্টেবলি করিয়া নিজের ব্যবসায়কে এরূপ ঘৃণ্য করিয়া তুলিতে পারিতেন না। এই শিক্ষা-দোকানদারির নীচতা হইতে দেশের শিক্ষককে ও ছাত্রগণকে কি আমরা রক্ষা করিব না?

কিন্তু এ সকল বিস্তারিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া বোধ করি বৃথা হইতেছে। বোধ হয়, গোড়ার কথাতেই অনেকের

আপত্তি আছে। আমি জানি, অনেকের মত এই যে, লেখাপড়া শিখাইবার জন্য ঘর হইতে ছাত্রদিগকে দূরে পাঠানো তাহাদের পক্ষে হিতকর নহে।

এ সম্বন্ধে প্রথম বক্তব্য কথা এই যে, লেখাপড়া শেখানো বলিতে আমরা আজকাল যাহা বুঝি, তাহার জন্য বাড়ীর গলির কাছে যে-কোনো-একটা সুবিধামত ইস্কুল এবং তাহার সঙ্গে বড়-জোর একটা প্রাইভেট্ টিউটার্ রাখিলেই যথেষ্ট। কিন্তু এইরূপ "লেখাপড়া-করে-যেই-গাড়ি-ঘোড়া-চড়ে-সেই"-শিক্ষার দীনতা ও কার্পণ্য মানবসন্তানের পক্ষে যে অযোগ্য, তাহা আমি একপ্রকার ব্যক্ত করিয়াছি।

দ্বিতীয় কথা এই, শিক্ষার জন্য বালকদিগকে ঘর হইতে দূরে পাঠানো উচিত নহে, এ কথা মানিতে পারি, যদি ঘর তেম্নি ঘর হয়। কামার-কুমার-তাঁতী প্রভৃতি শিল্পিগণ ছেলেদিগকে নিজের কাছে রাখিয়াই মানুষ করে—তাহার কারণ, তাহারা যেটুকু শিক্ষা দিতে চায়, তাহা ঘরে রাখিয়াই ভালরূপে চলিতে পারে। শিক্ষার আদর্শ আর-একটু উন্নত হইলে ইস্কুলে পাঠাইতে হয়—তখন এ কথা কেহ বলে না যে, বাপমায়ের কাছে শেখানোই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়; কেন না, নানা কারণে তাহা সম্ভবপর হয় না। শিক্ষার আদর্শকে আরো যদি উচ্চে তুলিতে পারি, যদি কেবল পরীক্ষাফললোলুপ পুঁথির শিক্ষার দিকেই না তাকাইয়া থাকি, যদি সর্ব্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের ভিত্তিস্থাপনকেই শিক্ষার লক্ষ্য বলিয়া স্থির করি, তবে তাহার ব্যবস্থা ঘরে এবং ইস্কুলে করা সম্ভবই হয় না।

সংসারে কেহ বা বণিক্, কেহ বা উকিল, কেহ বা ধনী জমিদার, কেহ বা আর-কিছু। ইঁহাদের প্রত্যেকের ঘরের রকমসকম, আব্‌হাওয়া স্বতন্ত্র। ইঁহাদের ঘরে ছেলেরা শিশুকাল হইতে বিশেষ-একটা ছাপ পাইতে থাকে।

জীবনযাত্রার বৈচিত্র্যে মানুষের আপনি যে একটা বিশেষত্ব ঘটে, তাহা অনিবার্য্য এবং এইরূপে একএকটা ব্যবসায়ের বিশেষ আকারপ্রকার লইয়া মানুষ একএকটা কোঠায় বিভক্ত হইয়া যায়, কিন্তু বালকেরা সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে অজ্ঞাতসারে তাহাদের অভিভাবকদের ছাঁচে তৈরি হইতে থাকা তাহাদের পক্ষে কল্যাণকর নহে।

উদাহরণস্বরূপ দেখা যাক্ ধনীর ছেলে। ধনীর ঘরে ছেলে জন্মগ্রহণ করে বটে, কিন্তু ধনীর ছেলে বলিয়া বিশেষ-একটা-কিছু হইয়া কেহ জন্মায় না। ধনীর ছেলে এবং দরিদ্রের ছেলে কোনো প্রভেদ লইয়া আসে না। জন্মের পরদিন হইতে মানুষ সেই প্রভেদ নিজের হাতে তৈরি করিয়া তুলিতে থাকে।

এমন অবস্থায় বাপমায়ের উচিত ছিল, গোড়ায় সাধারণ মনুষ্যত্বে পাকা করিয়া তাহার পরে আবশ্যকমতে ছেলেকে ধনীর সন্তান করিয়া তোলা। কিন্তু তাহা ঘটে না, সে সম্পূর্ণরূপে মানবসন্তান হইতে শিখিবার পূর্ব্বেই ধনীর সন্তান হইয়া উঠে—ইহাতে দুর্লভ মানবজন্মের অনেকটাই তাহার অদৃষ্টে বাদ পড়িয়া যায়—জীবনধারণের অনেক রসাস্বাদের ক্ষমতাই তাহার বিলুপ্ত হয়।

প্রথমেই ত বদ্ধডানা খাঁচার পাখীর মত বাপ-মা, ধনীর ছেলেকে হাত-পা-সত্ত্বেও একেবারে পঙ্গু করিয়া ফেলেন। তাহার চলিবার জো নাই, গাড়ি চাই; সামান্য বোঝাটুকু বহিবার জো নাই, মুটে চাই; নিজের কাজ চালাইবার জো নাই, চাকর চাই। শুধু যে শারীরিক ক্ষমতার অভাবে এরূপ ঘটে, তাহা নহে, লোকলজ্জায় সে হতভাগ্য সুস্থ-অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-সত্ত্বেও পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া থাকে। যাহা সহজ, তাহা তাহার পক্ষে কষ্টকর,—যাহা স্বাভাবিক, তাহা তাহার পক্ষে লজ্জাকর হইয়া উঠে। দলের লোকের মুখ চাহিয়া তাহাকে যে সকল অনাবশ্যক শাসনে বদ্ধ হইতে হয়, তাহাতে সে সহজ মনুষ্যের বহুতর অধিকার হইতে বঞ্চিত হয়। পাছে তাহাকে কেহ ধনী না মনে করে, এইটুকু লজ্জা সে সহিতে পারে না, ইহার জন্য পর্ব্বত-প্রমাণ ভার তাহাকে বহন করিতে হয় এবং এই ভারে পৃথিবীতে সে পদে পদে আবদ্ধ হইয়া থাকে। তাহাকে কর্ত্তব্য করিতে হইলেও এই সকল ভার বহিয়া করিতে হয়—আরাম করিতে হইলেও এই সকল ভার লইয়া করিতে হয়—ভ্রমণ করিতে হইলে সঙ্গে সঙ্গে এই সকল ভার টানিয়া বেড়াইতে হয়। সুখ যে মনে, আয়োজনে নহে—এই সরল সত্যটুকু তাহাকে সর্ব্বপ্রকার চেষ্টার দ্বারা ভুলিতে দিয়া তাহাকে সহস্রবিধ জড়পদার্থের দাসানুদাস করিয়া তোলা হয়। নিজের সামান্য প্রয়োজনগুলিকে সে এত বাড়াইয়া তোলে যে, তাহার পক্ষে ত্যাগস্বীকার অসাধ্য হয়,—কষ্টস্বীকার করা অসম্ভব হইয়া উঠে। জগতে এতবড় বন্দী, এতবড় পঙ্গু আর কেহ নাই।

তবু কি বলিতে হইবে—এই সকল অভিভাবক, যাহারা কৃত্রিম অক্ষমতাকে গর্ব্বের সামগ্রী করিয়া দাঁড় করাইয়া পৃথিবীর শস্যক্ষেত্রগুলিকে কাঁটার গাছে ছাইয়া ফেলিল, তাহারাই সন্তানদের হিতৈষী! যাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বিলাসিতাকে বরণ করিয়া লয়, তাহাদিগকে বাধা দেওয়া কাহারো সাধ্য নয়,—কিন্তু শিশুরা, যাহারা ধূলামাটিকে ঘৃণা করে না, যাহারা রৌদ্রবৃষ্টিবায়ুকে প্রার্থনা করে, যাহারা সাজসজ্জা করাইতে গেলে পীড়াবোধ করে, নিজের সমস্ত ইন্দ্রিয় চালনা করিয়া জগৎকে প্রত্যক্ষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখাতেই যাহাদের সুখ, নিজের স্বভাবে স্থিতি করিয়া যাহাদের লজ্জা নাই, সঙ্কোচ নাই, অভিমান নাই, তাহাদিগকে চেষ্টার দ্বারা বিকৃত করিয়া দিয়া চিরদিনের মত অকর্ম্মণ্য করিয়া দেওয়া কেবল পিতামাতার দ্বারাই সম্ভব—সেই পিতামাতার হাত হইতে এই নিরপরাধগণকে রক্ষা কর।

আমরা জানি, অনেকের ঘরে বালকবালিকা সাহেবিয়ানায় অভ্যস্ত হইতেছে। তাহারা আয়ার হাতে মানুষ হয়, বিকৃত হিন্দুস্থানী শেখে, বাংলা ভুলিয়া যায় এবং বাঙালির ছেলে বাংলাসমাজ হইতে যে শতসহস্র ভাবসূত্রে আজন্মকাল বিচিত্র রস আকর্ষণ করিয়া পরিপুষ্ট হয়, সেই সকল স্বজাতীয় নাড়ির যোগ হইতে তাহারা বিচ্ছিন্ন হয়—অথচ ইংরেজি-সমাজের সঙ্গে তাহাদের সম্বন্ধ থাকে না। তাহারা অরণ্য হইতে উৎপাটিত হইয়া বিলাতী টিনের টবের মধ্যে বড় হইতেছে। আমি স্বকর্ণে শুনিয়াছি, এই শ্রেণীর একটি ছেলে দূর হইতে কয়েকজন দেশীভাবাপন্ন আত্মীয়কে

দেখিয়া তাহার মাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছে—Mamma, Mamma, look, lots of Babus are coming! বাঙালীর ছেলের এমন দুর্গতি আর কি হইতে পারে! বড় হইয়া স্বাধীন রুচি ও প্রবৃত্তি বশত যাহারা সাহেবিচাল অবলম্বন করে, তাহারা করুক্, কিন্তু তাহাদের শিশু-অবস্থায় যে সকল বাপমা বহু অপব্যয়ে ও বহু অপচেষ্টায় সন্তানদিগকে সকল সমাজের বাহির করিয়া দিয়া স্বদেশে অযোগ্য এবং বিদেশে অগ্রাহ্য করিয়া তুলিতেছে, সন্তানদিগকে কেবলমাত্র কিছুকাল নিজের উপার্জ্জনের নিতান্ত অনিশ্চিত আশ্রয়ের মধ্যে বেষ্টন করিয়া রাখিয়া ভবিষ্যৎ দুর্গতির জন্য বিধিমতে প্রস্তুত করিতেছে, এই সকল অভিভাবকদের নিকট হইতে বালকগণ দূরে থাকিলেই কি অত্যন্ত দুশ্চিন্তার কারণ ঘটিবে?

আমি শেষোক্ত দৃষ্টান্তটি যে দিলাম, তাহার একটু কারণ আছে। সাহেবিয়ানায় যাঁহারা অভ্যস্ত নন, এই দৃষ্টান্ত তাঁহাদিগকে প্রবলভাবে আঘাত করিবে। তাঁহারা নিশ্চয়ই মনে মনে বলিবেন, লোকে কেন এটুকু বুঝিতে পারে না—কেন সমস্ত ভবিষ্যৎ ভুলিয়া কেবল নিজের কতকগুলা বিকৃত অভ্যাসের অন্ধতায় ছেলেদের এমন সর্ব্বনাশ করিতে বসে!

কিন্তু মনে রাখিবেন, যাঁহারা সাহেবিয়ানায় অভ্যস্ত, তাঁহারা এই কাণ্ড অতি সহজেই করিয়া থাকেন, তাঁহারা সন্তানদের যে কোনোপ্রকার অভ্যাসদোষ ঘটাইতেছেন, তাহা মনেও করিতে পারেন না। ইহাতে এইটুকু বোঝা উচিত, আমাদের নিজেদের মধ্যে যে সকল বিশেষ বিকৃতি আছে, তাহার সম্বন্ধে আমরা অনেকটা অচেতন—তাহা আমাদিগকে এত বেশি পাইয়া বসিয়াছে যে, তাহাতে করিয়া আর কাহারো অনিষ্ট-অসুবিধা হইলেও আমরা উদাসীন থাকি। আমরা মনে করি, পরিবারের মধ্যে নানাপ্রকার রোষ-দ্বেষ, অন্যায় পক্ষপাত, বিবাদ-বিরোধ, নিন্দা-গ্লানি, কুঅভ্যাস-কুসংস্কারের প্রাদুর্ভাব থাকিলেও পরিবার হইতে দূরে থাকাই ছেলেদের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা বিপদ্। আমরা যাহার মধ্যে মানুষ হইয়াছি, তাহারি মধ্যে আর-কেহ মানুষ হইলে ক্ষতি আছে, এ কথা আমাদের মনেও আসে না। কিন্তু মানুষ করিবার আদর্শ যদি খাঁটি হয়, যদি ছেলেকে আমাদের মতই চলনসই কাজের লোক করাকেই আমরা যথেষ্ট না মনে করি, তবে এ কথা আমাদের মনে উদয় হইবেই যে, ছেলেদিগকে শিক্ষাকালে এমন জায়গায় রাখা কর্ত্তব্য, যেখানে তাহারা স্বভাবের নিয়মে বিশ্বপ্রকৃতির সহিত ঘনিষ্ঠ হইয়া ব্রহ্মচর্য্য পালনপূর্ব্বক গুরুর সহবাসে জ্ঞানলাভ করিয়া মানুষ হইয়া উঠিতে পারে।

ভ্রূণকে গর্ভের মধ্যে এবং বীজকে মাটির মধ্যে নিজের উপযুক্ত খাদ্যের দ্বারা পরিবৃত হইয়া গোপনে থাকিতে হয়। তখন দিনরাত্রি তাহার একমাত্র কাজ খাদ্যশোষণ করিয়া নিজেকে আকাশের জন্য, আলোকের জন্য প্রস্তুত করা। তখন সে আহরণ করে না, চারিদিক্ হইতে শোষণ করে। প্রকৃতি তাহাকে অনুকূল অন্তরালের মধ্যে আহার দিয়া বেষ্টন করিয়া রাখে—বাহিরের নানা আঘাত-অপঘাত তাহার নাগাল পায় না, এবং নানা

আকর্ষণে তাহার শক্তি বিভক্ত হইয়া পড়ে না।

ছাত্রদের শিক্ষাকালও তাহাদের পক্ষে এইরূপ মানসিক ভ্রূণ-অবস্থা। এই সময়ে তাহারা জ্ঞানের একটি সজীব বেষ্টনের মধ্যে দিনরাত্রি মনের খোরাকের মধ্যেই বাস করিয়া বাহিরের সমস্ত বিভ্রান্তি হইতে দূরে গোপনে যাপন করিবে, ইহাই স্বাভাবিক বিধান। এই সময়ে চতুর্দ্দিকে সমস্তই তাহাদের অনুকূল হওয়া চাই, যাহাতে তাহাদের মনের একমাত্র কাজ হয়—জানিয়া এবং না জানিয়া খাদ্যশোষণ, শক্তিসঞ্চয় এবং নিজের পুষ্টিসাধন করা।

সংসার কাজের জায়গা এবং নানা প্রবৃত্তির লীলাভূমি—সেখানে এমন অনুকূল অবস্থার সংঘটন হওয়া বড় কঠিন, যাহাতে শিক্ষাকালে অক্ষুব্ধভাবে ছেলেরা শক্তিলাভ এবং পরিপূর্ণ-জীবনের মূলপত্তন করিতে পারে। শিক্ষা সমাধা হইলে গৃহী হইবার যথার্থ ক্ষমতা তাহাদের জন্মিবে—কিন্তু সংসারের সমস্ত প্রবৃত্তিসংঘাতের মধ্যে যথেচ্ছ মানুষ হইলে গৃহস্থ হইবার উপযুক্ত মনুষ্যত্ব লাভ করা যায় না—বিষয়ী হওয়া যায়, ব্যবসায়ী হওয়া যায়, কিন্তু মানুষ হওয়া কঠিন হয়। একদিন গৃহধর্ম্মের আদর্শ আমাদের দেশে অত্যন্ত উচ্চ ছিল বলিয়াই সমাজে তিন বর্ণকে সংসারপ্রবেশের পূর্ব্বে ব্রহ্মচর্য্যপালনের দ্বারা নিজেকে প্রস্তুত করিবার উপদেশ ও ব্যবস্থা ছিল। অনেকদিন হইতেই সে আদর্শ হীন হইয়াছে এবং তাহার স্থলে কোনো মহান্ আদর্শই গ্রহণ করি নাই বলিয়া আজ আমরা কেরাণী, সেরেস্তাদার, দারোগা, ডেপুটিম্যাজিষ্ট্রেট্ হইয়াই সন্তুষ্ট থাকি—তাহার বেশি হওয়াকে মন্দ বলি না, তবে বাহুল্য বলি।

কিন্তু তাহার অনেক বেশিও বাহুল্য নয়। —আমি কেবল হিন্দুর তরফে বলিতেছি না— কোনো দেশেই, কোনো সমাজেই বাহুল্য নয়। অন্যদেশে ঠিক এইরূপ শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বিত হয় নাই, অথচ তাহারা লড়াই করিতেছে, বাণিজ্য করিতেছে, টেলিগ্রাফের তার খাটাইতেছে, রেলগাড়ির এঞ্জিন্ চালাইতেছে—এ দেখিয়া আমরা ভুলিয়াছি;—এ ভুল যে সভাস্থলে কোনো-একটা প্রবন্ধের আলোচনা করিয়াই ভাঙিবে, এমন আশা করিতে পারি না। অতএব আশঙ্কা হয়, আজ আমরা "জাতীয়" শিক্ষাপরিষৎ রচনা করিবার সময় নিজের দেশ, নিজের ইতিহাস ছাড়া সর্ব্বত্রই নজির খুঁজিয়া ঘুরিয়া-ফিরিয়া আরো একটা ছাঁচে-ঢালা কলের ইস্কুল তৈরি করিয়া বসিব। আমরা প্রকৃতিকে বিশ্বাস করি না, মানুষের প্রতি ভরসা রাখি না, কল বই আমাদের গতি নাই। আমরা মনে বুঝিয়াছি, নীতিপাঠের কল পাতিলেই মানুষ সাধু হইয়া উঠিবে এবং পুঁথি পড়াইবার বড় ফাঁদ পাতিলেই মানুষের তৃতীয়চক্ষু যে জ্ঞাননেত্র, তাহা আপনি উদ্ঘাটিত হইয়া যাইবে।

দস্তুরমত একটা ইস্কুল ফাঁদার চেয়ে জ্ঞানদানের উপযুক্ত আশ্রমস্থাপন কঠিন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই কঠিনকে সহজ করাই ভারতবর্ষের কাজ হইবে। কারণ, এই আশ্রমের আদর্শ আমাদের কল্পনা হইতে এখনো যায় নাই এবং য়ুরোপের নানাপ্রকার বিদ্যাও আমাদের গোচর হইয়াছে। বিদ্যালাভ ও জ্ঞানলাভের প্রণালীর মধ্যে আমাদিগকে সামঞ্জস্যস্থাপন করিতে হইবে। ইহাই যদি না পারিলাম, তবে কেবলি নকলের দিকে

মন রাখিয়া আমরা সর্ব্বপ্রকারে ব্যর্থ হইব। অধিকারলাভ করিতে গেলেই আমরা পরের কাছে হাত পাতি এবং গড়িয়া তুলিতে গেলেই আমরা নকল করিতে বসিয়া যাই—নিজের শক্তি এবং নিজের মনের দিকে, দেশের প্রকৃতি ও দেশের যথার্থ প্রয়োজনের দিকে তাকাই না, তাকাইতে সাহসই হয় না। যে শিক্ষার ফলে আমাদের এই দশা হইতেছে, সেই শিক্ষাকেই নূতন একটা নাম দিয়া স্থাপন করিলেই যে তাহা নূতন ফল প্রসব করিতে থাকিবে, এরূপ আশা করিয়া নূতন আর-একটা নৈরাশ্যের মুখে অগ্রসর হইতে প্রবৃত্তি হয় না। এ কথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে, যেখানে মুষলধারায় চাঁদার টাকা আসিয়া পড়ে, সেইখানেই যে শিক্ষা বেশি করিয়া জমা হইতে থাকে, তাহা নহে, মনুষ্যত্ব টাকায় কেনা যায় না; যেখানে কমিটির নিয়মধারা অহরহ বর্ষিত হয়, সেইখানেই যে শিক্ষাকল্পলতা তাড়াতাড়ি বাড়িয়া উঠে, তাহাও নহে, শুদ্ধমাত্র নিয়মাবলী অতি উত্তম হইলেও তাহা মানুষের মনকে খাদ্যদান করে না; বহুবিধ-বিষয়-পাঠনার ব্যবস্থা করিলেই যে শিক্ষায় লাভের অঙ্ক অগ্রসর হয়, তাহা নহে, মানুষ যে বাড়ে, সে "ন মেধয়া ন বহুধা শ্রুতেন।" যেখানে নিভৃতে তপস্যা হয়, সেখানেই আমরা শিখিতে পারি; যেখানে গোপনে ত্যাগ, যেখানে একান্তে সাধনা, সেইখানেই আমরা শক্তিলাভ করি; যেখানে সম্পূর্ণভাবে দান, সেইখানেই সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ সম্ভবপর; যেখানে অধ্যাপকগণ জ্ঞানের চর্চ্চায় স্বয়ং প্রবৃত্ত, সেইখানেই ছাত্রগণ বিদ্যাকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পায়; বাহিরে বিশ্বপ্রকৃতির আবির্ভাব যেখানে বাধাবিহীন, অন্তরে সেইখানেই মন সম্পূর্ণ বিকশিত; ব্রহ্মচর্য্যের সাধনায় চরিত্র যেখানে সুস্থ এবং আত্মবশ, ধর্ম্মশিক্ষা সেখানেই সরল ও স্বাভাবিক; আর যেখানে কেবল পুঁথি ও মাষ্টার, সেনেট্ ও সিণ্ডিকেট্, ইঁটের কোঠা ও কাঠের আস্‌বাব্, সেখানে আজও আমরা যত বড় হইয়া উঠিয়াছি, কালও আমরা তত বড়টা হইয়াই বাহির হইব।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রাচীন সামাজিক চিত্র।

১

সেবক

পুরাকালে আর্য্যসমাজে সেবক বা ভৃত্য কি কি উপায়ে সংগৃহীত হইত ও তাহারা কতপ্রকার ছিল, ইত্যাদি সম্বন্ধে বর্ত্তমান প্রবন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইবে।

নারদকৃত স্মৃতিতে দেখা যায়, পূর্ব্বকালে 'শুশ্রূষক' বা সেবক প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত হইত; যথা—প্রথম 'কর্ম্মকর', দ্বিতীয় 'দাস'। 'কর্ম্মকর' চতুর্বিধ; যথা—১ শিষ্য,

২ অন্তেবাসী, ৩ ভৃতক, ও ৪ অধিকর্ম্মকর বা কৌটুম্বিক।

শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, এয়ীবিদ্যা-উপার্জ্জনের জন্য শিষ্য গুরুশুশ্রূষা করিবে। এইহেতু শিষ্য বিদ্যার জন্য গুরুর 'শুশ্রূষক' বা সেবক হইতেন। নৃত্যাদি ও স্বর্ণরজত শিল্পের নাম 'বিজ্ঞান'। শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন, শিল্প-শিক্ষার্থী সঙ্কল্পিত সময় পর্য্যন্ত গুরুসমীপে অবস্থান করিবে ও তাঁহার কর্ম্ম সম্পাদন করিবে। বলা বাহুল্য, আচার্য্য শিষ্যকে যা'-তা' কার্য্য করাইয়া তাহার সময় বৃথা নষ্ট করিয়া কষ্ট দিতেন না; প্রত্যুত তিনি তাহাকে পুত্রের ন্যায় অবলোকন করিতেন। পুত্রে যেরূপ পিতার কার্য্য করে, অন্তেবাসীও সেইরূপ করিত।* এইজন্যই কাত্যায়ন বলিয়াছেন যে, যদি কোন আচার্য্য অন্তেবাসীকে শিল্প না শিখাইয়া তাহার দ্বারা কার্য্যান্তর করান, তবে তিনি 'প্রথমসাহস'-নামক অপরাধে দণ্ডিত হইবেন।† অন্তেবাসীরা যখন আচার্য্যের নিকট শিক্ষালাভের জন্য আসিতেন, তখন কতকাল তিনি সেই আচার্য্যের নিকট থাকিবেন, ঠিক করিয়া লইতে হইত। নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই শিক্ষালাভ সম্পূর্ণ হইলেও, (নারদের মতে) অন্তেবাসীকে আচার্য্যগৃহে সেই সঙ্কল্পিত-কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইত। এই সময়ের মধ্যে অন্তেবাসী কোন কর্ম্ম করিলে তাহার দ্বারা আচার্য্যই ফলবান্ হইতেন।

'ভৃতক' সামান্যত দ্বিবিধ—'অন্নভৃত' ও 'ভাগভৃত'। যাহারা অন্নদ্বারা পোষিত হইয়া প্রভুর কার্য্য করে, তাহারা 'অন্নভৃত', আর যাহারা স্বকৃত কর্ম্মের দ্বারা উৎপাদিত শস্যাদিফলের অংশবিশেষ গ্রহণ করিয়া কার্য্য করে, তাহারা 'ভাগভৃত'। ইহাদের অবান্তর-ভেদ অনেক আছে; যেমন, কেহ 'দিনভৃত' অর্থাৎ একদিনের জন্য সে প্রভুর নিকট হইতে অন্ন বা স্বকৃত কার্য্যফলের অংশবিশেষ গ্রহণ করিয়া কার্য্য করিবে। এইরূপ 'মাস-ভৃত', 'দ্বিমাসভৃত' 'ষণ্মাসভৃত', 'অব্দভৃত' ইত্যাদি।

কার্য্যানুসারে 'ভৃতক'নামক সেবকেরা তিন ভাগে বিভক্ত; যথা—উত্তম, মধ্যম ও অধম। উত্তম আয়ুধীয় অর্থাৎ যাহারা অস্ত্রগ্রহণ করিয়া গৃহাদি রক্ষা করিত; মধ্যম কৃষীবল—যাহারা প্রভুর কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত থাকিত; অধম ভারবাহী। কাহারও কাহারও মতে অধমশ্রেণীস্থ ভৃতক গৃহকার্য্যেও নিযুক্ত হইত।

যিনি সাংসারিক কার্য্যসমূহ ও 'কুটুম্ব'-(পরিবার)-গণের পর্য্যবেক্ষণে অধিকার প্রাপ্ত হইতেন, তাঁহাকে 'অধিকর্ম্মকর' বা 'কৌটুম্বিক' বলা যাইত।

সংসারে দ্বিবিধ কর্ম্ম আছে—'শুভ' ও 'অশুভ'। পূর্ব্বোক্ত শিষ্য, অন্তেবাসী, ভৃতক ও অধিকর্ম্মকর, এই চতুর্বিধ কর্ম্মকর 'শুভ'-কার্য্যে নিযুক্ত হইত; 'দাসেরা' 'অশুভ'কার্য্য করিত। নারদস্মৃতিতে এই সমস্ত কার্য্য

* "স্বং শিল্পমিচ্ছন্নাহর্ত্তুং বান্ধবানামনুজ্ঞয়া। আচার্য্যস্য বসেদন্তে কালং কৃত্বা সুনিশ্চিতম্॥
আচার্য্যঃ শিক্ষয়েদেনং স্বগৃহে দত্তজীবনম্। ন চান্যৎ কারয়েৎ কর্ম্ম পুত্রবচ্চৈনমাচরেৎ॥ নারদ।

† "যস্তু ন গ্রাহয়েচ্ছিল্পং কর্ম্মাণ্যন্যানি কারয়েৎ। প্রাপ্নুয়াৎ সাহসং পূর্ব্বং তস্মাচ্ছিষ্যো নিবর্ত্ততে॥
কাত্যায়ন।

'অশুভ' বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে—গৃহ, দ্বার, অপবিত্র স্থান, পথ ও আবর্জ্জনধূল্যাদির শোধন; উচ্ছিষ্ট, মল ও মূত্রের গ্রহণপূর্ব্বক পরিত্যাগ এবং স্বামী ইচ্ছা করিলে তাঁহার শরীরের সংবাহন। এতদ্ভিন্ন অপর কর্ম্ম 'শুভ'।

অশুভ কার্য্যগুলি দাসেরা সম্পাদন করিত বলা হইয়াছে। এই দাস পঞ্চদশপ্রকার; যথা—১ 'গৃহজাত'—স্বগৃহস্থিত দাসীর দ্বারা প্রসূত; ২ 'ক্রীত'—মূল্যদ্বারা যাহাকে গ্রহণ করা হইয়াছে; ৩ 'লব্ধ'- কোনস্থানে প্রতিগ্রহদ্বারা যাহাকে পাওয়া গিয়াছে; ৪ 'দায়াদাগত'—উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত; ৫ "অন্নাকালভৃত"—দুর্ভিক্ষসময়ে অন্নদানে যাহার প্রাণরক্ষা করা হইয়াছে; ৬ 'আহিত'—যাহাকে কেহ 'বন্ধক'স্বরূপ রাখিয়াছে; ৭ 'দণ্ডদাস'—যাহাকে দুর্ভর ঋণভার প্রভৃতি গুরুদণ্ড হইতে মুক্ত করা হইয়াছে; ৮ 'যুদ্ধ-প্রাপ্ত'—যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া যাহাকে পাওয়া গিয়াছে; ৯ 'দ্যূতজিত'—'যদি হারি, তবে তোমার দাস হইব' এই বলিয়া যে ব্যক্তি দ্যূতে পরাজিত হইয়া দাসত্বস্বীকার করে; ১০ 'স্বেচ্ছাগত'—যে নিজের ইচ্ছায় আসিয়া দাসত্বগ্রহণ করে; ১১ 'প্রব্রজ্যাবসিত'—সন্ন্যাসধর্ম্মভ্রষ্ট; ১২ 'কৃত'—'এতকাল আমি তোমার দাস', এই বলিয়া যে দাসত্ব অঙ্গীকার করে; 'ভক্তদাস'—কেবল অন্নের জন্য দাস্যাঙ্গী-কারী; ১৪ 'বড়বাকৃত'—স্বগৃহস্থিত দাসীর প্রতি কামাকৃষ্ট হইয়া যে ব্যক্তি সেই দাসীর প্রভুর দাসত্বস্বীকার করে; * ১৫ 'আত্ম-বিক্রেতা'—যে মূল্যগ্রহণ করিয়া স্বয়ং আপনাকে বিক্রয় করে। †

পূর্ব্বোল্লিখিত পঞ্চদশ দাসের মধ্যে 'প্রব্রজ্যাবসিত'—সন্ন্যাসভ্রষ্ট কোন রাজারই দাস হইত, অপর কাহারও নহে; এবং তাহার দাস্য হইতে আর মুক্তি হইত না, কেন না, তাহার কোনরূপেই বিশুদ্ধি হয় না। ব্রাহ্মণ 'প্রব্রজ্যাবসিত' হইলে তাহার নির্ব্বাসনদণ্ড হইত; এবং ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য ঐপ্রকার হইলে রাজা তাঁহাদিগকে নিজের দাস করিতেন।

গৃহজাত, ক্রীত, লব্ধ, দায়াদাগত ও আত্ম-বিক্রেতা, এই পঞ্চবিধ দাসের কখন মুক্তি হইত না। প্রভু প্রসন্ন হইলে অপরাপর দাসেরা মুক্তি পাইতে পারিত। কিন্তু প্রভু প্রসন্ন হইলেও পঞ্চদশপ্রকারের অন্যতম শূদ্র-জাতীয় দাসের দাসত্বমুক্তি হইত না।‡

প্রভু শূদ্রদাসকে মুক্তি দিলেও শূদ্র ধর্ম্ম-

---

* বৃহস্পতি বলিয়াছেন—যে ব্যক্তি পরদাসীকে উপভোগ করে, তাহাকে 'বনিতাভৃত' বলিয়া জানিবে, সে ব্যক্তি 'অন্নভৃত'-ভৃতকের ন্যায় ঐ দাসীর স্বামীর কার্য্য করিবে—

"যো ভুংক্তে পরদাসীন্তু স জ্ঞেয়ো বনিতাভৃতঃ। কর্ম্ম তৎস্বামিনঃ কুর্য্যাদ্যথান্নেন ভৃতো নরঃ॥"

† গৃহজাতস্তথা ক্রীতো লব্ধো দায়াদুপাগতঃ। অন্নাকালভৃতস্তদ্বদাহিতঃ স্বামিনা চ যঃ॥
মোক্ষিতো মহতশ্চর্ণাদ্যুদ্ধে প্রাপ্তঃ পণে জিতঃ। তবাহমিত্যুপগতঃ প্রব্রজ্যাবসিতঃ কৃতঃ॥
ভক্তদাসশ্চ বিজ্ঞেয়স্তথৈব বড়বাকৃতঃ। বিক্রেতা চাত্মনঃ শাস্ত্রে দাসাঃ পঞ্চদশ স্মৃতাঃ॥
নারদ।

* মনু কিন্তু সপ্তপ্রকার বলিয়াছেন, যথা—
"ধ্বজাহৃতো ভক্তদাসো গৃহজঃ ক্রীতদত্রিমৌ। পৈত্রিকো দণ্ডদাসশ্চ সপ্তৈতে দাসযোনয়ঃ॥"

‡ মনু বলিয়াছেন যে, শূদ্রের দাসত্ব নৈসর্গিক, তাহা কেহ নিবারণ করিতে পারে না:—
"ন স্বামিনা নিসৃষ্টোঽপি শূদ্রো দাস্যাৎ প্রমুচ্যতে।
নিসর্গজং হি তৎ তস্য কস্তস্মাৎ তদপোহতি॥"

বৃদ্ধিতেও অবশ্য ব্রাহ্মণাদির সেবা করিত (কুল্লূকভট্ট)। শাস্ত্রকারগণের অনুশাসন আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, যদি কোন প্রভু দয়া করিয়া কোন শূদ্রদাসকে মুক্তি-প্রদান করিতেন, তবে সেই শূদ্র পূর্ব্বপ্রভুর সেবা না করিলেও তাহাকে অপর প্রভুর সেবা করিতে হইত। শূদ্রদাসসম্বন্ধে আরও উক্ত হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণ বিস্রব্ধচিত্তে তাহার ধনগ্রহণ করিতে পারিতেন, কেন না, তাহার নিজের কিছুই নাই, উহার সমস্তই প্রভু-হার্য্য।* এই প্রসঙ্গেই বলা হইয়াছে যে, ভার্য্যা, দাস ও পুত্র, ইহারা তিনজন অধীন, ইহারা যাহা-কিছু পায়, তাহা ইহাদের নিজের নহে,—ইহারা যাহার অধীনে থাকে, তিনিই তাহার অধিকারী।† তবে দাস নিজের মূল্য-রূপে যে ধন প্রাপ্ত হইত বা স্বামী সন্তুষ্ট হইয়া যাহা তাহাকে প্রদান করিতেন, তাহাতে স্বামীর কোন অধিকার থাকিত না। গৃহস্থিত দাস যদি কোন অদাসী স্ত্রীলোককে বিবাহ করে, তবে সেই স্ত্রীলোক গৃহস্বামীর দাসী হইত।

যদি কোন পরাধীন দাস পূর্ব্বপ্রভুকে পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার কোন নূতন প্রভুর নিকট দাসত্বস্বীকার করিত, তবে রাজানু-শাসনে পূর্ব্বপ্রভুই ঐ দাসকে পাইতেন। দস্যুরা বলপূর্ব্বক অপহরণ করিয়া দাসরূপে যাহাদিগকে বিক্রয় করিত, রাজা তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া দিতেন। ক্রীতদাসগণের মধ্যে যদি কেহ কখন স্বপ্রভুকে প্রাণসংশয় বিপদ্ হইতে রক্ষা করিত, তবে তাহার দাসত্বমুক্তি হইত এবং প্রভুর নিকট পুত্রের অংশ লাভ করিত। দুর্ভিক্ষকালে অন্নপ্রদানে প্রাণরক্ষা করায় যাহারা দাসত্বস্বীকার করিত, তাহারা মুক্তি ইচ্ছা করিলে প্রভুকে দুইটি গরু প্রদান করিতে হইত। যে ব্যক্তি নিজের দাসকে বন্ধকস্বরূপ রাখিয়া অপরের নিকট অর্থগ্রহণ করিতেন, তিনি ঐ গৃহীত অর্থ পরিশোধ করিলে বন্ধকীভূত (আহিত) দাসের মুক্তি হইত; আর যদি ঐ অর্থ প্রদান করিতে তিনি অসমর্থ হইয়া ঋণদাতাকে বলিতেন যে, 'এই ব্যক্তি তোমার দাস হইল', তবে ঐ হতভাগ্য ক্রীতদাসের ন্যায় গণ্য হইত। ঋণ-গ্রহণ করিয়া দাস্যস্বীকারস্থলে ঐ ঋণ পরিশোধ করিলেই সেই দাস মুক্তি পাইত। 'কৃতক'-ভৃত্য অর্থাৎ যাহারা নিজের ইচ্ছায় কোন নির্দ্দিষ্টকালের জন্য দাসত্বগ্রহণ করিত, কথিতকাল পূর্ণ হইলেই তাহারা মুক্ত হইত। 'স্বেচ্ছাগত', 'যুদ্ধপ্রাপ্ত' ও 'দ্যূতজিত' দাসগণ যতদিন নিজের প্রতিনিধিরূপে অপর এক-জনকে উপস্থিত করিতে না পারিত, ততদিন তাহাদের মুক্তি হইত না। 'ভক্তদাস' প্রভুর ভক্ত বা অন্ন পরিত্যাগ করিলেই মুক্ত হইত। 'বড়বাকৃত' দাসেরা বড়বা বা দাসীর মুক্তিতে মুক্তিলাভ করিত। বলপূর্ব্বক কেহ দাসীকৃত হইলে রাজানুশাসনে তৎক্ষণাৎ তাহাকে পরি-ত্যাগ করিতে হইত। যদি কোন প্রভু নিজের দাসীকে উপভোগ করিতেন ও তাহাতে

"বিস্রব্ধং ব্রাহ্মণঃ শূদ্রাদ্দ্রব্যোপাদানমাচরেৎ।
ন হি তস্যাস্তি কিঞ্চিৎ স্বং ভর্ত্তৃহার্য্যধনো হি সঃ॥" মনু ও দেবল।
"দাসস্য হি ধনং যৎ স্যাৎ স্বামী তত্র প্রভুঃ স্মৃতঃ।" কাত্যায়ন।

"অধনাস্ত্রয় এবৈতে ভার্য্যা দাসস্তথা সুতঃ।
যত্তে সমধিগচ্ছন্তি যস্যৈতে তস্য তদ্ধনম্॥ মনু ও নারদ॥

পুত্রাদির উৎপত্তি হইত, তবে সেই দাসীর অপর পুত্র না থাকিলে, প্রভুকে ঐ উৎপন্ন পুত্রের সহিত দাসীকে মুক্তিপ্রদান করিতে হইত। অবিপন্নাবস্থায় প্রভু স্বোপভুক্ত দাসীকে তাহার অনিচ্ছায় অপর কাহারও নিকট বিক্রয় করিতে পারিতেন না।

যখন কোন প্রভু সন্তুষ্ট হইয়া নিজের দাসকে মুক্তি দিতেন, তখন তাঁহাকে এই অনুষ্ঠান করিতে হইত :—দাস একটি জলপূর্ণ কুম্ভ স্কন্ধে বহন করিয়া আনিবে; প্রভু ঐ কুম্ভ তাহার স্কন্ধ হইতে গ্রহণ করিয়া ভগ্ন করিয়া ফেলিবেন। তাহার পর তিনি দাসের মস্তকে সাক্ষত পুষ্প বিকীর্ণ করিয়া 'এই ব্যক্তি অদাস হইল' এই কথা তিনবার উচ্চারণ করিয়া পূর্ব্বমুখে তাহাকে ছাড়িয়া দিবেন। এইরূপে মুক্তিপ্রাপ্ত দাস 'স্বাম্যনুগ্রহপালিত' বলিয়া অভিহিত ও সমাজে তাহার পর আদৃত হইত।

পারস্কর প্রভৃতি বিবিধ গৃহ্যসূত্রে দাসগণের বশীকরণসম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিধি দেখিতে পাওয়া যায়; যথা—দুর্বিনীত দাস সুপ্ত হইলে, নিজের মূত্র কোন পশুর শৃঙ্গে * নিক্ষেপ করিয়া তাহা দ্বারা ঐ দাসকে সেচন করিতে করিতে তিনবার বামাবর্ত্তে তাহার নিকট ঘুরিতে হইবে। তাহার মন্ত্র এই :—† "হে দুর্বিনীত দাস, যেস্থানেই তুমি যাও না কেন, পর্ব্বত হইতে, তোমার পিতার নিকট হইতে, মাতার নিকট হইতে, ভগিনীর নিকট হইতে, ভ্রাতার নিকট হইতে বা বন্ধুজনের নিকট হইতে তোমাকে আকর্ষণ করিয়া আনিব; তুমি মন্ত্রপ্রভাবে সেচনরূপ পাশের দ্বারা আবদ্ধ হইয়াছ, তুমি এখন কোথায় যাইবে'। ‡ ইহাতেও যদি দাস বশীভূত না হইয়া পলায়ন করিত, তবে নিম্নলিখিত উপায় কর্ত্তব্য বলিয়া ঐ সকল সূত্রে উক্ত হইয়াছে। যথা—যে পথ দিয়া ভৃত্য পলায়ন করিয়াছে, সেই পথে দাবাগ্নি স্থাপন করিয়া ঘৃতাক্ত কুশকুণ্ডলসমূহ হোম করিবে। তাহার মন্ত্র—'হে চঞ্চল দাস, ইন্দ্রলতা (বীরুধ্) হইতে সম্যক্ নির্গত এই অগ্নি অন্যকে পরিত্যাগ করাইয়া তোমাকে ইন্দ্রপাশে বন্ধনপূর্ব্বক আমার নিকটে লইয়া আসিবেন।' এই অনুষ্ঠান করিলে সেই দাস নিশ্চয়ই প্রভু-বশবর্ত্তী হইবে—"ক্ষেম্যো হৈব ভবতীতি।"

হলবাহী ভৃত্য পলায়ন করিলে তাহাকে দণ্ডের দ্বারা তাড়িত হইতে হইত; পশুপাল

* "জীববিষাণে"—ভাষ্য ও টীকাকারগণ 'জীবতঃ পশোঃ শৃঙ্গে' এই অর্থ করিয়াছেন। পারস্করগৃহ্যসূত্র তৃতীয়কাণ্ড, "উতূলপরিমেহ," হরিহরভাষ্য প্রভৃতি দ্রষ্টব্য। আপস্তম্বগৃহ্যসূত্রে সুদর্শনাচার্য্য টীকাকার বলেন—"জীবন্ত্যা গোর্বিষাণে বলাৎ পাতিতে।" ২৩,৭

† সংস্কৃতমন্ত্রটি এই—

"পরি ত্বা গিরেরহং পরিমাতুঃ পরিস্বসুঃ
পরিপিত্রোশ্চ ভ্রাত্রোশ্চ সখ্যেভ্যো বিসৃজাম্যহম্।
উতূল, পরিমীঢ়োঽসি, পরিমীঢ়ঃ ক গমিষ্যসি॥"

‡ আপস্তম্বগৃহ্যসূত্রের টীকাকার সুদর্শনাচার্য্য বলিয়াছেন যে, যে স্ত্রী নিজ পতিকে বশীভূত করিতে ইচ্ছা করে, সে এই অনুষ্ঠান করিবে। পক্ষান্তরে, তিনি পূর্ব্বোক্ত বিনিয়োগও বলিয়াছেন। স্ত্রীলোকেরা স্বামীকে যে বশীভূত করিত, তাহার পরিচয় ঋগ্বেদে বহুল পাওয়া যায়। সেগুলি নিতান্ত হৃদয়ঙ্গম, প্রবন্ধান্তরে তাহা পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত করিবার ইচ্ছা থাকিল।

ভৃত্য সেই অবস্থায় দণ্ডতাড়িত এবং তাহার পশুগুলি অবরুদ্ধ হইত। (আপস্তম্ব)

কর্ম্মস্বামী ভৃত্যকে নিশ্চিত বেতন কর্ম্মের আদি, মধ্য ও অবসান, এই তিন বারে ক্রমশ অধিক পরিমাণে প্রদান করিতেন। বেতন নিশ্চয় না করিয়া যদি কোন প্রভু ভৃত্যকে দিয়া কাজ করাইতেন, তবে বাণিজ্য-কর্ম্মে নিযুক্ত ভৃত্য বাণিজ্যের লাভের, গোপালনে নিযুক্ত ভৃত্য গোদুগ্ধের ও কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত ভৃত্য শস্যের দশমভাগ বেতনস্বরূপ পাইত। যে ভৃত্য দেশ ও কালকে অতিক্রম করিয়া কার্য্য সম্পন্ন করে বা যে কার্য্য যথোচিত না করিয়া অন্যথাভাবে করে, স্বামী নিজ ইচ্ছানুসারে তাহাকে বেতন-প্রদান করিতেন। ভৃত্য কাজ বেশী করিলে বেশী বেতন পাইত। অন্ন ও বস্ত্রদ্বারা পালিত ভৃত্যগণ কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত হইলে উৎপন্ন শস্যের পঞ্চমভাগ লাভ করিত। ফলাংশলাভেচ্ছু ভৃত্যগণ কৃষিজাত শস্যের তৃতীয়ভাগ প্রাপ্ত হইত। পূর্ব্বে যদি বেতন নির্দ্ধারিত না হইত, তবে 'সমুদ্রযানকুশল'— বাণিজ্যবিজ্ঞ, দেশকালার্থদর্শী পুরুষগণ, যাহা ব্যবস্থা করিয়া দিতেন, প্রভুকে তাহাই দিতে হইত। ভৃত্য বেতনগ্রহণ করিয়া কার্য্য-ত্যাগ করিলে তাহাকে দ্বিগুণ বেতন প্রভুকে দিতে হইত; বেতনগ্রহণ না করিয়া কার্য্য-ত্যাগ করিলে সমবেতন দিতে হইত। প্রতিশ্রুত হইয়া কার্য্য না করিলে প্রভু বলপূর্ব্বক ভৃত্যকে কার্য্য করাইতেন এবং বেতনও দিতেন না। বেতনগ্রহণ করিয়া সম্পূর্ণ কার্য্য না করিলেও ভৃত্যকে বলপূর্ব্বক তাহা করাইতে বাধ্য করা হইত; তাহা না করিলে অষ্ট-কৃষ্ণল-(কুচ)-পরিমিত স্বর্ণদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইত। যথাকথিত কর্ম্ম ভৃত্য নিজে অথবা অপর কাহারও দ্বারা সম্পন্ন করিয়া না দিলে, ঐ কর্ম্ম সম্পন্নপ্রায় হইলেও, প্রভু বেতন দিতেন না। স্বামীর দোষে ভৃত্য যথোচিত কার্য্য না করিলে, সে সম্পূর্ণ বেতনই পাইত; কিন্তু নির্দ্দিষ্টকালের মধ্যে নিজের দোষে কার্য্যত্যাগ করিলে কিছুই পাইত না। নির্দ্দিষ্টকালের মধ্যে স্বামীর দোষ না থাকিলে ভৃত্য কার্য্যত্যাগ করিলে স্বামীর নিকট হইতে কর্ম্মমূল্য বেতন ত পাইতই না, প্রত্যুত রাজাকে শতপণ কড়ি দণ্ডপ্রদান করিতে হইত; রাজোপদ্রব ও দৈববিপত্তি ভিন্ন অন্যত্র তাহার দোষে প্রভুর যাহা নষ্ট হয়, তাহা সে প্রভুকে দিতে বাধ্য। এইরূপ স্বামীও যদি দৈবোপদ্রব বিনা নির্দ্দিষ্ট-কালের মধ্যে ভৃত্যকে ত্যাগ করেন, তবে তিনি ভৃত্যকে সম্পূর্ণ বেতন দিতে বাধ্য হইতেন, এবং রাজাকে শতপণ দণ্ডস্বরূপ দিতে হইত। স্বামী কার্য্য করাইয়া ভৃত্যকে বেতনপ্রদান না করিলে রাজা যথোচিত দণ্ডবিধান করিয়া ঐ বেতন প্রদান করাইতে বাধ্য করিতেন। যে স্বামী পথিমধ্যে শ্রান্ত বা রোগার্ত্ত ভৃত্যকে পরিত্যাগ করিতেন, অথবা যিনি গৃহস্থিত তাদৃশ ভৃত্যকে দিনত্রয় পালন না করিতেন, তিনি রাজার নিকট দণ্ডনীয় হইতেন।

স্বধর্ম্মত্যাগী ভিন্ন অন্যত্র বিবাহের ন্যায় প্রতিলোমদাসত্ব ছিল না। ব্রাহ্মণেরা অন্য বর্ণের ন্যায় সবর্ণমধ্যেও দাসত্ব করিতেন না। শীলাধ্যয়নসম্পন্ন ভিন্ন ব্রাহ্মণ সজাতিমধ্যে কর্ম্ম করিতেন; কিন্তু প্রাগুক্ত 'অশুভ'কর্ম্মে

তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করা হইত না। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রেরা কখন-কখন স্ব স্ব সবর্ণকেও দাসকর্ম্মে নিযুক্ত করিতেন। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বৃত্তিকর্ষিত হইলে ব্রাহ্মণ অনৃশংসভাবে তাহাদিগকে স্বস্বজাত্যুক্ত কর্ম্মই করাইতেন। যদি কেহ মোহে বা প্রভাবে অনিচ্ছু সংস্কৃত-ব্রাহ্মণকে দাস্য করাইত, তবে রাজা তাঁহাকে ছয়শত পণ দণ্ড করিতেন। ক্রীত বা অক্রীত হউক, শূদ্রদিগকে দাস্য করিতেই হইত।* আমার বোধ হয়, এই সকল বচন প্রাচীন অনার্য্য বর্ব্বরজাতির সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে। বর্ত্তমানকালের ন্যায় তখন ঐ সকল শূদ্র উন্নতিলাভ করিতে পারে নাই। পূর্ব্বকালে আর্য্য ও অনার্য্যের সংঘর্ষে আর্য্যগণের অনার্য্যগণের প্রতি একটা নিগ্রহেচ্ছা স্বাভাবিক। তথাপি আর্য্যেরা অনার্য্যগণকে নিজসমাজে স্থান দিয়া কতদূর উদারতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সুসভ্যজাতির ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় না। আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে অধিকারস্থাপনের পূর্ব্বাবস্থায় সেই সকল স্থানের আদিমনিবাসীর সহিত গর্ব্বান্ধ য়ুরোপীয়গণ কতদূর নিষ্ঠুরাচরণ করিয়াছে ও এখনও কোন কোন স্থানে করিতেছে, তাহা প্রচ্ছন্ন রাখিবার উপায় নাই। ইহা অপেক্ষা আর্য্যগণ অনার্য্য শূদ্রগণের প্রতি সহস্রাংশে সদয় ব্যবহার করিয়াছেন। প্রথমাবস্থায় শূদ্রগণকে আয়ত্ত রাখিবার জন্য আর্য্যগণ ঐ সকল বিধি প্রণয়ন করিয়াছিলেন, পরে যখন তাহার আর ততদূর আবশ্যকতা বোধ হইল না, তখন তাঁহারা তাহাদিগকে নিজেদের মধ্যে বিবিধ-উচ্চাধিকার-প্রদানের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃতসাহিত্য আলোচনা করিলে ইহার প্রমাণের অভাব উপলব্ধি হইবে না।

শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী।

* শূদ্রন্তু কারয়েদ্দাস্যং ক্রীতমক্রীতমেব বা।
দাস্যায়ৈব হি সৃষ্টোহসৌ ব্রাহ্মণস্য স্বয়ম্ভুবা।

বঙ্গদর্শন।

মোহিতচন্দ্র সেন।

মোহিতচন্দ্র সেনের সহিত আমার পরিচয় অল্পদিনের।

বাল্যকালের বন্ধুত্বের সহিত অধিকবয়সের বন্ধুত্বের একটা প্রভেদ আছে। একসঙ্গে পড়া, একসঙ্গে খেলা, একসঙ্গে বাড়িয়া ওঠার গতিকে কাঁচাবয়সে পরস্পরের মধ্যে সহজেই মিশ খাইয়া যায়। অল্পবয়সে মিল সহজ, কেন না, অল্পবয়সে মানুষের স্বাভাবিক প্রভেদগুলি কড়া হইয়া ওঠে না। যত বয়স হইতে থাকে, আমাদের প্রত্যেকের সীমানা ততই নির্দ্দিষ্ট হইতে থাকে—ঈশ্বর প্রত্যেক মানুষকে যে একটি পার্থক্যের অধিকার দিয়াছেন, তাহা উত্তরোত্তর পাকা হইতে থাকে। ছেলেবেলায় যে সকল প্রভেদ অনায়াসে উল্লঙ্ঘন করিতে পারা যায়, বড়বয়সে তাহা পারা যায় না।

কিন্তু এই পার্থক্যজিনিষটা যে কেবল পরস্পরকে প্রতিরোধ করিবার জন্য, তাহা নহে। ইহা ধাতুপাত্রের মত—ইহার সীমাবদ্ধতাদ্বারাই আমরা যাহা পাই, তাহাকে গ্রহণ করি,—তাহাকে আপনার করি; ইহার কাঠিন্যদ্বারা আমরা যাহা পাই, তাহাকে ধারণ করি,—তাহাকে রক্ষা করি। যখন আমরা ছোট থাকি, তখন নিখিল আমাদিগকে ধারণ করে, এইজন্য সকলের সঙ্গেই আমাদের প্রায় সমান সম্বন্ধ। তখন আমরা কিছুই ত্যাগ করি না,—যাহাই কাছে আসে, তাহারই সঙ্গে আমাদের সংস্রব ঘটে।

বয়স হইলে আমরা বুঝি যে, ত্যাগ করিতে না জানিলে গ্রহণ করা যায় না। যেখানে সমস্তই আমার কাছে আছে, সেখানে বস্তুত কিছুই আমার কাছে নাই। সমস্তের মধ্য হইতে আমরা যাহা বাছিয়া লই, তাহাই যথার্থ আমাদের। এই কারণে যে বয়সে আমাদের পার্থক্য দৃঢ় হয়, সেই বয়সেই আমাদের বন্ধুত্ব যথার্থ হয়। তখন অবারিত কেহ আমাদের নিকটে আসিয়া পড়িতে পারে না—আমরা যাহাকে বাছিয়া লই, আমরা যাহাকে আসিতে দিই, সে-ই আসে। ইহাতে অভ্যাসের কোনো হাত নাই, ইহা স্বয়ং আমাদের অন্তরপ্রকৃতির কর্ম্ম।

এই অন্তরপ্রকৃতির উপরে যে আমাদের কোনো জোর খাটে, তাহাও বলিতে পারি না। সে যে কি বুঝিয়া কি নিয়মে আপনার দ্বার উদ্ঘাটন করে, তাহা সে-ই জানে। আমরা হিসাব করিয়া, সুবিধা বিচার করিয়া তাহাকে হুকুম করিলেই যে সে হুকুম মানে, তাহা নহে।

সে কি বুঝিয়া আপনার নিমন্ত্রণপত্র বিলি করে, তাহা আমরা ভাল করিয়া বুঝিতেই পারি না।

এইজন্য বেশিবয়সের বন্ধুত্বের মধ্যে একটি অভাবনীয় রহস্য দেখিতে পাই। যে বয়সে আমাদের পুরাতন অনেক জিনিষ ঝরিয়া যাইতে থাকে এবং নূতন কোনো জিনিষকে আমরা নির্ব্বিচারে গ্রহণ করিতে পারি না, সেই বয়সে কেমন করিয়া হঠাৎ একদা এক-রাত্রির অতিথি দেখিতে দেখিতে চিরদিনের আত্মীয় হইয়া উঠে, তাহা বুঝিয়া উঠা যায় না।

মনে হয়, আমাদের অন্তরলক্ষ্মী,—যিনি আমাদের জীবনযজ্ঞ নির্ব্বাহ করিবার ভার লইয়াছেন, তিনিই বুঝিতে পারেন, এই যজ্ঞে কাহাকে তাঁহার কি প্রয়োজন, কে না আসিলে তাঁহার উৎসব সম্পূর্ণ হইবে না। তিনি কাহার ললাটে কি লক্ষণ দেখিতে পান,—তাহাকে আপনার বলিয়া চিনিতে পারেন, তাহার রহস্য আমাদের কাছে ভেদ করেন নাই।

যেদিন মোহিতচন্দ্র প্রথম আমার কাছে আসিয়াছিলেন, সেদিন শিক্ষাসম্বন্ধে তাঁহার সঙ্গে আমার আলোচনা হইয়াছিল। আমি সহর হইতে দূরে বোলপুরের নিভৃত প্রান্তরে এক বিদ্যালয়স্থাপনের ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। এই বিদ্যালয়সম্বন্ধে আমার মনে যে একটি আদর্শ ছিল, তাহাই তাঁহার সম্মুখে ধরিবার চেষ্টা করিলাম।

তাহার পরে তিনি অবকাশ বা উৎসব উপলক্ষ্যে মাঝে মাঝে বোলপুরে আসিতে লাগিলেন। ভারতবর্ষ বহুকাল ধরিয়া তাহার তীব্র-আলোক-দীপ্ত এই আকাশের নীচে দূর-দিগন্তব্যাপী প্রান্তরের মধ্যে একাকী বসিয়া কি ধ্যান করিয়াছে, কি কথা বলিয়াছে, কি ব্যবস্থা করিয়াছে, কি পরিণামের জন্য সে অপেক্ষা করিতেছে, বিধাতা তাহার সম্মুখে কি সমস্যা আনিয়া উপস্থিত করিয়াছেন, এই কথা লইয়া কতদিন গোধূলির ধূসর আলোকে বোলপুরের শস্যহীন জনশূন্য প্রান্তরের প্রান্ত-বর্ত্তী রক্তবর্ণ সুদীর্ঘ পথের উপর দিয়া আমরা দুইজনে পদচারণ করিয়াছি। আমি এই সকল নানা কথা ভাবের দিক্ দিয়াই ভাবিয়াছি; আমি পণ্ডিত নহি; বিচিত্র মানব-সংসারের বৃত্তান্তসম্বন্ধে আমি অনভিজ্ঞ। কিন্তু রাজপথ যেমন সকল যাত্রীরই যাতায়াত অনায়াসে সহ্য করে, সেইরূপ মোহিতচন্দ্রের যুক্তিশাস্ত্রে সুপরিণত সর্ব্বসহিষ্ণু পাণ্ডিত্য আমার নিঃসহায় ভাবগুলির গতিবিধিকে অকালে তর্কের দ্বারা রোধ করিত না—তাহারা কোন্ পর্য্যন্ত গিয়া পৌঁছে, তাহা অবধান-পূর্ব্বক লক্ষ্য করিতে চেষ্টা করিত। যুক্তি-নামক সংহত-আলোকের লণ্ঠন এবং কল্পনা-নামক জ্যোতিষ্কের ব্যাপকদীপ্তি, দু-ই তিনি ব্যবহারে লাগাইতেন; সেইজন্য অন্যে যাহা বলিত, নিজের মধ্য হইতে তাহা পূরণ করিয়া লইবার শক্তি তাঁহার ছিল; সেইজন্য পাণ্ডি-ত্যের কঠিন বেষ্টনে তাঁহার মন সঙ্কীর্ণ ছিল না, কল্পনাযোগে সর্ব্বত্র তাঁহার সহজ প্রবেশা-ধিকার তিনি রক্ষা করিয়াছিলেন।

মনের আদর্শের সঙ্গে বাস্তব আয়োজনের প্রভেদ অনেক। তীক্ষ্ণদৃষ্টির সঙ্গে উদার কল্পনাশক্তি যাঁহাদের আছে, তাঁহারা প্রথম উদ্যোগের অনিবার্য্য ছোটখাট ত্রুটিকে সঙ্কীর্ণ অধৈর্য্যদ্বারা বড় করিয়া তুলিয়া সমগ্রকে

বিকৃত করিয়া দেখেন না। আমার নূতন-স্থাপিত বিদ্যালয়ের সমস্ত দুর্ব্বলতা-বিচ্ছিন্নতা অতিক্রম করিয়া মোহিতচন্দ্র ইহার অনতিগোচর সম্পূর্ণতাকে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। তখন আমার পক্ষে এমন সহায়তা আর কিছুই হইতে পারিত না। যাহা আমার প্রয়াসের মধ্যে আছে, তাহা আর একজনের উপলব্ধির নিকট সত্য হইয়া উঠিয়াছে, উদ্যোগকর্ত্তার পক্ষে এমন বল,—এমন আনন্দ আর কিছুই হইতে পারে না। বিশেষত তখন কেবল আমার দুইএকজনমাত্র সহায়কারী সুহৃৎ ছিলেন; তখন অশ্রদ্ধা, অবজ্ঞা এবং বিঘ্নে আমার এই কর্ম্মের ভার আমার পক্ষে অত্যন্ত দুর্ব্বহ হইয়া উঠিয়াছিল।

একদিন কলিকাতা হইতে চিঠি পাইলাম, আমার কাছে তাঁহার একটু বিশেষ প্রয়োজন আছে, তিনি বোলপুরে আসিতে চান। সন্ধ্যার গাড়িতে আসিলেন। আহারে বসিবার পূর্ব্বে আমাকে কোণে ডাকিয়া-লইয়া কাজের কথাটা শেষ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। নিভৃতে আসিয়া কুণ্ঠিতভাবে কহিলেন—"আমি মনে করিয়াছিলাম, এবারে পরীক্ষকের পারিশ্রমিক যাহা পাইব, তাহা নিজে রাখিব না। এই বিদ্যালয়ে আমি নিজে যখন খাটিবার সুযোগ পাইতেছি না, তখন আমার সাধ্যমত কিছু দান করিয়া আমি তৃপ্তিলাভ করিতে ইচ্ছা করি।" এই বলিয়া সলজ্জভাবে আমার হাতে একখানি নোট গুঁজিয়া দিলেন। নোট খুলিয়া দেখিলাম, হাজারটাকা।

এই হাজারটাকার মত দুর্লভ দুর্ম্মূল্য হাজারটাকা ইহার পূর্ব্বে এবং পরে আমার হাতে আর পড়ে নাই। টাকায় যাহা পাওয়া যায় না, এই হাজারটাকায় তাহা পাইলাম। আমার সমস্ত বিদ্যালয় একটা নূতন শক্তির আনন্দে সজীব হইয়া উঠিল। বিশ্বের মঙ্গলশক্তি যে কিরূপ অভাবনীয়রূপে কাজ করে, তাহা এমনিই আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ হইল যে, আমাদের মাথার উপর হইতে বিঘ্নবাধার ভার লঘু হইয়া গেল। ঠিক তাহার পরেই পারিবারিক সঙ্কটে আমাকে দীর্ঘকাল প্রবাসে যাপন করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল এবং যে আত্মীয়ের উপর নির্ভর করিবার প্রয়োজন ছিল, সে এম্‌নি অকারণে বিমুখ হইল যে, সেই সময়ের আঘাত আমার পক্ষে একেবারে অসহ্য হইতে পারিত। এমন সময়ে নোটের আকারে মোহিতচন্দ্র যখন অকস্মাৎ কল্যাণবর্ষণ করিলেন, তখন স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম যে, আমিই যে কেবল আমার সঙ্কল্পটুকুকে লইয়া জাগিবার চেষ্টা করিতেছি, তাহা নহে—মঙ্গল জাগিয়া আছে। আমার দুর্ব্বলতা, আমার আশঙ্কা, সমস্ত চলিয়া গেল।

ইহার কিছুকাল পরে মোহিতচন্দ্র বোলপুর-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কঠিনপীড়াগ্রস্ত হইয়া ডাক্তারের পরামর্শক্রমে ইঁহাকে পুনরায় কলিকাতায় আশ্রয়গ্রহণ করিতে হইল।

যাহারা মানবজীবনের ভিতরের দিকে তাকায় না, যাহারা বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে শুভদৃষ্টিবিনিময় না করিয়া ব্যস্তভাবে ব্যবসায় চালাইয়া যায় বা অলসভাবে দিনক্ষয় করিতে থাকে, পৃথিবীর সঙ্গে তাহাদের সম্বন্ধসূত্র কতই ক্ষীণ। তাহারা চলিয়া গেলে কতটুকু স্থানেই বা শূন্যতা ঘটে! কিন্তু

মোহিতচন্দ্র বালকের মত নবীনদৃষ্টিতে, তাপসের মত গভীর ধ্যানযোগে এবং কবির মত সরস সহৃদয়তার সঙ্গে বিশ্বকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাই আষাঢ় যখন এই নব-তৃণশ্যামল মাঠের উপরে ঘনীভূত হইয়া উঠে এবং মেঘমুক্ত প্রাতঃকাল যখন শালতরু-শ্রেণীর ছায়াবিচিত্র বীথিকার মধ্যে আবির্ভূত হয়, তখন মনে বলিতে থাকে, পৃথিবী হইতে একজন গেছে, যে তোমাদের বর্ষে বর্ষে অভ্যর্থনা করিয়াছে, যে তোমাদের ভাষা জানিত, তোমাদের বার্ত্তা বুঝিত; তোমাদের লীলাক্ষেত্রে তাহার শূন্য আসনের দিকে চাহিয়া তোমরা তাহাকে আর খুঁজিয়া পাইবে না—সে যে তোমাদের দিকে আজ তাহার প্রীতি-কোমল ভক্তিরসার্দ্র অন্তঃকরণকে অগ্রসর করিয়া ধরে নাই, এ বিষাদ যেন সমস্ত আলোকের বিষাদ, সমস্ত আকাশের বিষাদ। সকলপ্রকার সৌন্দর্য্য, ঔদার্য্য ও মহত্ত্ব যে হৃদয়কে বারংবার স্পন্দিত-উদ্বোধিত করিয়াছে, সাম্প্রদায়িকতা যাহাকে সঙ্কীর্ণ করে নাই এবং সাময়িক উত্তেজনার মধ্যে চিরন্তনের দিকে যে লক্ষ্য স্থির রাখিয়াছে, আমাদের সকল সৎসঙ্কল্পে, সকল মঙ্গল-উৎসবে, সকল শুভপরামর্শে আজ হইতে তাহার অভাব দৈন্যস্বরূপে আমাদিগ ক আঘাত করিবে। উৎসাহের শক্তি যাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক, আনুকূল্য যাহাদের :নিকট হইতে সহজে প্রবাহিত হয়, যাহারা উদার নিষ্ঠার দ্বারা ভূমার প্রতি আমাদের চেষ্টাকে অগ্রসর করিয়া দেয় এবং সংসারপথের ক্ষুদ্রতা উত্তীর্ণ করিয়া দিবার যাহারা সহায় হইতে পারে—এমন বন্ধু কয়জনই বা আছে!

দুইবৎসর হইল, ১২ই ডিসেম্বরে মোহিত-চন্দ্র তাঁহার জন্মদিনের পরদিনে আমাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহারই এক অংশ উদ্ধৃত করিয়া এ লেখা সমাপ্তি করি।—

"আজকাল সকালে-সন্ধ্যায় রাস্তার উপর আর বাড়ীর গায়ে যে আলো পড়ে, সেটা খুব চমৎকার দেখায়। আমি কাল আপনাদের বাড়ীর পথে চল্‌তে চল্‌তে স্পষ্ট অনুভব কর্‌ছিলাম যে, বিশ্বকে যদি জ্ঞানের সৃষ্টি বলা যায়, তবে সৌন্দর্য্যকে প্রেমের সৃষ্টি বল্‌লে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। আমাদের পাঁচটা ইন্দ্রিয় দিয়ে যে ভাবগুলো মনের ভিতর প্রবেশ করে, আমাদের প্রজ্ঞাজাত সংস্কারগুলি সেগুলোকে কুড়িয়ে-নিয়ে এই বিচিত্র সুসংহত বিশ্বরূপে বেঁধে দেয়। এ যদি সত্য হয়, তবে যে-সৌন্দর্য্য আমাদের কাছে উদ্ভাসিত, সেটা কত-না ক্ষুদ্র-বৃহৎ নিঃস্বার্থ-নির্ম্মল সুখের সমবেতসৃষ্টি! association কথাটার বাংলা মনে আস্‌চে না, কিন্তু একমাত্র প্রেমই যে এই associationএর মূল, একমাত্র প্রেমই যে আমাদের সুখের মুহূর্ত্তগুলোকে যথার্থভাবে বাঁধ্‌তে পারে, আর তা থেকে অমর সৌন্দর্য্য উৎপাদন করে, তাতে সন্দেহ হয় না। আর যদি সৌন্দর্য্য প্রেমেরই সৃষ্টি হ'ল, তবে আনন্দও তাই—প্রেমিক না হ'লে কেই বা যথার্থ আনন্দিত হয়!

এই সৌন্দর্য্য যে আমারই প্রেমের সৃষ্টি, আমার শুষ্কতা যে একে নষ্ট করে—এই চিন্তার ভিতর আমার জীবনের গৌরব, আর দায়িত্বের গুরুত্ব একসঙ্গে অনুভব করি। যিনি ভালবাসার অধিকার দিয়ে আমার কাছে বিশ্বের সৌন্দর্য্য, আর বন্ধুর প্রীতি এনে

দিয়েছেন, তাঁকে ধন্যবাদ দিই; আর শুধু আমারই শুষ্কতা-অপরাধের দরুণ আমি যে আনন্দ হ'তে বঞ্চিত হই, এ কথা নতমস্তকে স্বীকার করি।"

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নেশন্ বা জাতি।

[স্বদেশী বা পেট্রিয়টিজ্‌ম্ প্রবন্ধের অনুবৃত্তি]

২

নেশন্-অভিমান হইতেই দেশচর্য্যা বা পেট্রিয়টিজ্‌মের উৎপত্তি হয়। 'আমার নেশন্' বলিয়া একটা সত্যবস্তু আছে, এই নেশন্ জগতের অপরাপর নেশন্ হইতে স্বতন্ত্র, অপরাপর নেশন্ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ না হইলেও অন্তত তাহাদের সম্পূর্ণ সমকক্ষ, আর এখন সম্পূর্ণ সমকক্ষ না হইলেও তাহার ভিতরে এমন শক্তি আছে,—যাহাতে কালে যথোপযুক্ত অবসর প্রাপ্ত হইলে আমার নেশন্ও জগতের প্রবলতম ও উন্নততম নেশনের তুল্য হইয়া উঠিতে পারিবে। এ সকল ভাব না থাকিলে স্বদেশপ্রেমের উৎপত্তিই হইতে পারে না।

দুই দল লোক এই দেশচর্য্যের বিরোধী; এক দল স্বদেশপ্রেমকে বিশ্বমানবের উদার প্রেমের বিরোধী বলিয়া মনে করে; অপর দল যে সকল উপকরণে নেশন্ গঠিত হয়, আমাদের মধ্যে সে সকল উপকরণ আছে, ইহা বিশ্বাস করে না।

প্রথমত বিশ্বপ্রেমিকের কথা। ইহারা একপ্রকার নিতান্ত নিরাকার মানবপ্রেমের ভাণ করিয়া থাকে। ইহাদের প্রাণে, পেট্রিয়টিজ্‌ম্ বলিতে যে উদ্বেল, উচ্ছ্বসিত, জীবনাভিরাম স্বদেশপ্রীতি ও স্বদেশচর্য্যা বোঝায়, তাহা কদাপি জাগ্রত হয় নাই। আমার নেশন্, আমার জাতি, আমার স্বদেশ বলিতে যে মুখভরা উল্লাস, বুকভরা আশা, প্রাণভরা উত্তম, যে আশিষ, আনন্দ ও গৌরবভাব স্ফুরিত হইয়া উঠে,—ইহাদের সে ভাবের কোনোই আস্বাদন ও অভিজ্ঞতা নাই। ইহারা মানুষকে ব্যষ্টিভাবেই জানে, চিরদিন ব্যষ্টিভাবেই দেখিয়া থাকে। মানবসমষ্টিকেই ইহারা সমাজ বলিয়া মনে করে। জনতামাত্রেই সমাজ নহে, এ জ্ঞান ইহাদের নাই। সমাজবস্তু যে নিগূঢ়ভাবে স্বপ্রতিষ্ঠিত বস্তু, সমাজের যে একটা নিজস্ব জীবন, একটা নিজস্ব আদর্শ আছে; সমাজের প্রত্যেক নরনারীর জীবন ও আদর্শ যাহাকে অংশত প্রকাশ করে মাত্র, কিন্তু সম্যক্ ও সম্পূর্ণরূপে পর্য্যবসিত করিতে পারে না; এই সমাজ অঙ্গী হইয়া প্রত্যেক ব্যক্তিকে আপনার অঙ্গরূপে আপনার মধ্যে ধারণ করিয়া রহিয়াছে; —এ সকল তত্ত্ব ইহারা জানে না, এ সকল কথা

ইহারা বোঝে না। এইজন্য ইহাদের চক্ষে সকল মানুষই এক, সকল নেশন্ই সমান। নেশন্-অভিমান ইহাদের মতে বিশ্বপ্রেমের অন্তরায় হইয়া থাকে।

এইরূপ একান্ত অভেদাত্মক বিশ্বপ্রেম বা মানবপ্রেম সত্যই হউক আর কল্পিতই হউক, সর্ব্বথাই দেশচর্য্য বা পেট্রিয়টিজ্‌মের সম্পূর্ণ বিরোধী। সত্য হইলেও ইহা নিতান্ত নিরাকার, ভাব ও আদর্শে কেবলমাত্র শূন্যমার্গ-চারী হইয়াই বিহার করে, জীবনে ও চরিত্রে, সামাজিক অনুষ্ঠানে বা প্রতিষ্ঠানে কখনো নিবদ্ধ হইতে পারে না। কল্পিত হইলে ইহা ঘোরতর তামসিক ভাবের আশ্রয়স্বরূপ হইয়া সাংঘাতিক হইয়া পড়ে।

সকল মানুষই সমান—এক অর্থে ইহা অত্যন্ত সত্য। আর প্রত্যেক মানুষেরই এমন একটা অবস্থা হইতে পারে, যখন সত্য-সত্যই জাতিগত, বর্ণগত, দেশগত, নেশন্গত প্রভৃতি যাবতীয় ভেদজ্ঞান একেবারে বিলোপ-প্রাপ্ত হয়। সে অনাবিল, সে উদার বিশ্বপ্রেম সাধন না করিলে মানবজন্ম সার্থক হয় না, স্বীকার করি; কিন্তু প্রত্যক্ষ ভেদাভেদকে উপেক্ষা করিয়া এই অভেদজ্ঞান লাভ হয় না। সত্য অভেদজ্ঞান ভেদের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়; প্রকৃত উদার বিশ্বজনীন মৈত্রীও সেইরূপ ভেদপ্রাণ স্বদেশচর্য্যের মধ্য দিয়াই সাধিত হয়, অন্য উপায়ে নহে।

এই জগতে মানবমাত্রেই মূলত এক ও অভিন্ন, সকলেই এক চিদংশসম্ভূত। চৈতন্যবস্তুও এক ও অখণ্ড। কিন্তু এই এক ও অদ্বিতীয় চৈতন্যেই বিবিধ-উপাধি-সংযোগে যেমন জীবাভিমানের বা ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি হয়, সেইরূপ মানবজাতি মূলত এক সত্য, কিন্তু এই বিশাল ও অদ্বৈত বিশ্বমানবেই উপাধিসংযোগে নেশন্-অভিমান বা জাতীয়ত্বের উৎপত্তি হইয়া থাকে। আর, জীবের জীবত্বের মধ্য দিয়া এই জীবত্বকে ফুটাইয়া তুলিয়াই যেমন তাহার অন্তর্নিহিত প্রচ্ছন্ন শিবত্বকে প্রকাশিত করিয়া ব্রহ্মাত্মৈকত্ব প্রতিষ্ঠিত ও প্রত্যক্ষ করিতে হয়; সেইরূপ মানবসমষ্টি সকলের নেশন্-অভিমানকে জাগ্রত ও সৎপথে পরিচালিত করিয়া তাহাদের নেশন্ত্বের যথাযোগ্য প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠার দ্বারাই বিশ্বমানবের অঙ্গপুষ্টি সাধন করিতে হয়, অন্যথা নহে। ব্রহ্মচৈতন্য যেমন জীব-চৈতন্যে উপহিত হইয়া আছেন, বিশ্বমানবও সেইরূপ পরিচ্ছিন্ন নেশন্-অভিমানী মানবসমষ্টির মধ্যে উপহিত ও প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছেন। জীব আত্মহত্যা করিয়া নহে, কিন্তু যথাযোগ্য আত্মবিকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার দ্বারাই যেমন আপনার অন্তরোপহিত ব্রহ্মচৈতন্যকে জাগ্রত ও প্রকাশিত করিয়া জীবনের সফলতালাভ করে, নেশন্ও সেইরূপ আত্মবিলোপ করিয়া নহে, কিন্তু যথাযোগ্য আত্মপ্রতিষ্ঠারই দ্বারা, অন্তরোপহিত বিশ্বমানবকে জাগ্রত ও প্রকাশিত করিয়া নেশন্ত্বের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া থাকে।

বিশ্বমানবের সঙ্গে বিশিষ্ট নেশন্সকলের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। একটি নেশন্ও যদি আপনার সনাতন আদর্শ প্রকাশ করিয়া জীবনের সম্পূর্ণ সার্থকতা লাভ করিবার পূর্ব্বে ভূপৃষ্ঠ হইতে একেবারে বিলোপপ্রাপ্ত হয়, তবে বিশ্বমানব অঙ্গহীন হইয়া পড়েন। বিশ্বমানবের প্রতি কাল্পনিক প্রেমের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া যাহারা স্বদেশপ্রেম বা স্বদেশচর্য্যকে উপেক্ষা

করে, তাহারা এইজন্যই আত্মঘাতী বলিয়া আখ্যাত হয়। বিশ্বমানবের প্রতি অলীক অনুরাগের অনুরোধে ইহারা বিশ্বমানবেরই চরিতার্থতাসাধনে ব্যাঘাত উৎপন্ন করিতে চায়। স্বদেশদ্রোহিতা এইজন্য বিশ্বমানবের প্রতিও দ্রোহাচরণ করিয়া থাকে। স্বদেশদ্রোহী, বিশ্বমানবদ্রোহী ও ভগবদ্দ্রোহী, একই-পর্য্যায়ভুক্ত।

যে সকল উপাধির সাহায্যে বিশ্বমানবের একত্ব পরিচ্ছিন্ন হইয়া নেশনের সৃষ্টি করে, দেশগত বিচ্ছিন্নতা ও নৈসর্গিক বা ভৌগোলিক বিশেষত্ব তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান। দেশাভিমান নেশন্-অভিমানের মূল। ভিন্ন ভিন্ন মানবসমষ্টি বহুকালাবধি জগতের বিভিন্ন ভূভাগ অধিকার করিয়া তাহাতে বসবাস করিতেছে। এই সকল ভূভাগকে ইহারা নিজস্ব বলিয়া অপরাপর ভূভাগ হইতে পৃথক্ করিয়া লয়; এবং এই পার্থক্যনিবন্ধন অপরাপর ভূভাগের অধিবাসী হইতে আপনাদিগের একটা স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকে। এই দেশাভিমানেই সর্ব্বপ্রথম নেশনের সূত্রপাত হয়। এদেশ আমাদের, আমরা এদেশের;—ইত্যাকার যে অভিমান, ইহাই জাতীয়ত্বের বা নেশনত্বের মূলগত ভাব। ইহারই চতুর্দ্দিকে অন্যান্য ভাব ও আদর্শ সংলগ্ন হইয়া নেশনত্বকে পরিচ্ছিন্ন ও পরিপুষ্ট করিয়া তোলে।

যাহাদের দেশাভিমান নাই, তাহাদের নেশনত্ব বিলোপ পাইয়াছে। যাহাদের স্বদেশ বলিতে, অপরাপর দেশ হইতে স্বতন্ত্র, অপরাপর দেশ হইতে প্রিয়তর, প্রিয়তম কোনো ভূভাগ নাই, তাহারা মানুষ বটে, কিন্তু নেশন্ নহে। তাহাদের কুলাভিমান থাকিতে পারে, বর্ণাভিমান থাকিতে পারে, সাধনায় বা সভ্যতায়, ধর্ম্মে বা চরিত্রে তাহারা আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতে পারে, কিন্তু নেশন্-অভিমান তাহাদের জন্মিতে পারে না।

বহুশতাব্দী হইতে আপনার বলিতে ইহুদীদিগের কোনো দেশ নাই। এই প্রাচীন জাতি খণ্ডীকৃত সতীদেহের ন্যায় জগতের চারিদিকে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে, জর্ম্মাণীতে, রুশে, মার্কিণে, কাফ্রিভূমে, তুরস্কে, পারস্যে, এইরূপে ইহারা বহুশতাব্দী ধরিয়া বিভিন্ন দেশে প্রবাসী হইয়া রহিয়াছে। কুত্রাপি ইহারা সম্যক্‌রূপে এই-সকল-দেশবাসী হইয়া যায় নাই। এই-সকল-দেশবাসী সাধারণ প্রকৃতিপুঞ্জ হইতে ইহারা সর্ব্বপ্রযত্নে আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াও চলিয়া আসিয়াছে। এই সুদীর্ঘ প্রবাসে ইহাদের জাত্যভিমান কিঞ্চিন্মাত্রও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। ইহাদের সমাজ নষ্ট হয় নাই; কিন্তু দেশগত-মৌলিক-উপাধিবর্জ্জিত হইয়া, ইহারা কিছুতেই আপনাদিগকে কুত্রাপি নেশন্‌রূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিতেছে না। ইহুদীতন্ত্র বলিয়া একটা বিরাট্ সমাজতন্ত্র সভ্যজগতে বিদ্যমান রহিয়াছে, কিন্তু মাতৃভূমির কোমলাঙ্কচ্যুত হইয়া ইহাদের নেশনত্ব বহুকাল লোপ পাইয়াছে।

সর্ব্বত্রই দেশগত এই উপাধির উপরে নেশনের প্রতিষ্ঠা হয়। মূলে একই নেশনের অন্তর্ভূত যাহারা ছিল, তাহাঁরাও শুদ্ধ দেশগত পার্থক্য ও পরিচ্ছিন্নতা নিবন্ধন প্রতিদ্বন্দ্বী নেশনে পরিণত হইয়া থাকে। ভাষাগত কিংবা ধর্ম্মগত, সভ্যতা বা সাধনাগত, প্রাচীন ইতিহাস বা কিংবদন্তিগত, কোনোই পার্থক্য

ব্রিটিশ ও মার্কিণের মধ্যে নাই। অথচ কেবলমাত্র নৈসর্গিক ও ভৌগোলিক স্বাতন্ত্র্য ও স্বপ্রতিষ্ঠা নিবন্ধন, ইহাদের মধ্যে প্রবল দেশাভিমান জাগ্রত হইয়া ইহাদিগকে বিভিন্ন ও বিরোধী নেশন্‌রূপে গড়িয়া তুলিয়াছে।

নৈসর্গিক ও ভৌগোলিক অবস্থার তারতম্য অনুসারে দেশাভিমানের এবং নেশন্‌ভাবের বিকাশের বিলক্ষণ তারতম্য ঘটিয়া থাকে। কোথাও বা নৈসর্গিক অবস্থা নেশন্‌গঠনের বিশেষ উপযোগী হয়, কোথাও বা তেমন হয় না। প্রকৃতি যেখানে জলধিপরিখা কিংবা পর্ব্বতপ্রাচীরের দ্বারা আবেষ্টন করিয়া কোনো বিশেষ জনসমষ্টিকে সুরক্ষিত করেন, সেখানে নেশন্‌ভাব সত্বরেই অতিশয় প্রবল হইয়া উঠে। ভৌগোলিক-বিচ্ছিন্নতা-নিবন্ধন জাতীয়জীবন এ সকল স্থলে সহজেই আত্মস্থ ও আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়া দাঁড়ায়। ব্রিটিশের ও নবাভ্যুদিত জাপানের ঘননিবিষ্টতার অনেক কারণ আছে, কিন্তু তন্মধ্যে তাহাদের নৈসর্গিক আধার ও আবেষ্টন যে মুখ্যতম না হইলেও মুখ্যতর, এ বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নাই। জলধিপরিখাজনিত এই দ্বীপদ্বয়ের দুর্লঙ্ঘ্য পরিচ্ছিন্নতা বহুলপরিমাণে তাহাদের বর্ত্তমান সম্পদৈশ্বর্য্যের মূলকারণ, ইহাও অস্বীকার করা যায় না। প্রাচীনকালে গ্রীসে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নেশনের উৎপত্তি হইয়া গ্রীক্‌চরিত্রে ও গ্রীক্‌সাধনায় অত্যদ্ভুত স্বদেশচর্য্যের আদর্শ ফুটাইয়া তুলিয়াছিল, তাহাও গ্রীসের নৈসর্গিক ও ভৌগোলিক বিশেষত্ব হইতেই উৎপন্ন হইয়াছিল। ভারতে রাজপুত-ইতিহাসে যে স্বদেশপ্রেমের দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই, তাহাও রাজপুতানার বিভিন্ন *রাজ্যসকলের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাকৃতিক বিচ্ছিন্নতা* দ্বারাই বিশেষভাবে পরিপুষ্ট হইয়াছিল। অপেক্ষাকৃত আরো নিকটবর্ত্তী কালে মহারাষ্ট্রের নৈসর্গিক ও ভৌগোলিক বিশেষত্ব যে বহুলপরিমাণে মারাঠা-নেশনের গঠনকার্য্যে বিশেষ সাহায্য করিয়াছে, ইহাও অস্বীকার করা অসম্ভব। ঘাটশৈলরাজির কঠোরায়ত অঙ্কে যে শৌর্য্যবীর্য্য, যে স্বজাতিবাৎসল্য ও যে অভিনব নেশন্‌-অভিমান বিকশিত হইয়াছিল, সুজলা, সুফলা, সমতলা, মৃৎকোমলা বাংলার ক্রোড়ে তাহার উদ্ভব কদাপি সহজ হইত না;—আদৌ সম্ভব হইত কি না, তাহাই সন্দেহের কথা।

দেশগত স্বাতন্ত্র্য ও পরিচ্ছিন্নতা যেমন নেশন্‌-অভিমানের মূল উপাদান, এমন আর কিছুই নহে। তবে দেশগত এই স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে সঙ্গে যেখানে ধর্ম্মগত, সামাজিক-রীতি-নীতিগত এবং সর্ব্বোপরি যেখানে রাজনৈতিক সম্বন্ধ ও স্বার্থগত স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান থাকে, সেখানে নেশন্‌-অভিমান আরো পরিস্ফুট ও দীর্ঘকালস্থায়ী হয়। আমার আপনার দেশ বলিয়া একটা দেশ আছে, যাহা অপর দেশ অপেক্ষা স্বতন্ত্র ও শ্রেষ্ঠ; তেমনি আমার আপনার একটা ধর্ম্ম আছে, যাহা অপরদেশীয় লোকের ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; আমার একটা সভ্যতা ও সাধনা,—একটা ভাষা ও সাহিত্য আছে, যাহা অপরের সভ্যতা ও সাধনা, অপরের ভাষা ও সাহিত্য হইতে স্বতন্ত্র ও শ্রেষ্ঠ;—এই ত্রিবিধ স্বাতন্ত্র্য ও এই ত্রিবিধ পরিচ্ছিন্নতা যেখানে পরিস্ফুট হয়, সেখানে নেশন্‌-অভিমান সহজেই প্রবল হইয়া স্বদেশচর্য্যা বা পেট্রিয়টিজ্‌মের অদ্ভুত স্ফূর্ত্তি সাধন

করিয়া থাকে। কিন্তু দেশগত পরিচ্ছিন্নতা এবং রাজনৈতিক স্বার্থের বন্ধন যে-পরিমাণে নেশন্‌-অভিমানকে পরিপুষ্ট করে, এমন আর কিছুতেই করে বলিয়া মনে হয় না।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

বাঙ্‌লার চিত্র।*

বড়মা।

বিদ্যানিধিঠাকুরকে স্নান করিতে পাঠাইয়া-দিয়া বড়গিন্নী অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

অন্তঃপুরের গোময়লিপ্ত বৃহৎ প্রাঙ্গণে কয়েকখানা বড়-বড় চাটাইয়ের উপর ধান শুকাইতে দেওয়া হইয়াছে। বাড়ীর মেয়ে-ছেলেরা সকলে নিজ নিজ কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। বড় রন্ধনশালায় মহেন্দ্রের স্ত্রী কাদম্বিনী রন্ধন করিতেছেন। সেই ঘরের বারান্দায় রমানাথের স্ত্রী মেজগিন্নী তরকারি কুটিতেছেন। নিরামিষ রন্ধনশালায় দেবেন্দ্রের বিধবা স্ত্রী শরৎশশী রাঁধিতেছেন। এ বাড়ীর রন্ধনকার্য্যটা বধূগণই করিয়া থাকেন, বৃদ্ধা শাশুড়ীদিগের স্কন্ধে চাপাইয়া-দিয়া তাঁহারা নবেল পড়েন না। ছোটগিন্নী অর্থাৎ হরিনাথের স্ত্রী উত্তরের ঘরের বারান্দায় বসিয়া বিবাহের পীড়ি চিত্র করিতেছেন। বড়গিন্নীর একটি সধবা কন্যা নীরদাসুন্দরী সেখানে বসিয়া একখানা কাঁথা সেলাই করিতেছেন। বধূগণ পিত্রালয়ে আসিলে তাঁহাদের একরূপ ছুটি, ইনিও সেই ফার্লোসুখ ভোগ করিতেছেন। মেজগিন্নীর একটি বিধবা কন্যা যামিনী উঠানের এককোণে বসিয়া বাসন মাজিতেছেন। এতদ্ভিন্ন আরও ২।৩টি স্ত্রীলোক নানাবিধ কার্য্যে নিযুক্ত আছেন।

বড়গিন্নী অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াই বলিলেন, "বড় বৌ, রহিম আসিয়াছে। উহাকে ভাত দাও। কাল রাত্রে ও এখানে খায় নাই; উহার যে মাছখানা রাখিয়া দিয়াছ, তাহা ওকে দিতে ভুলিও না।"

রহিম উঠানে একখানা কলার পাতা লইয়া বসিল, বড়বৌ তাহাকে ভাত ও ব্যঞ্জন দিয়া গেলেন। রহিম কলার পাতার উল্টা পিঠে ভাত খাইতে লাগিল। হিন্দুরা যাহা করেন, মুসলমানভ্রাতারা বোধ হয় তাহার উল্টা করিতে ভালবাসেন।

বড়গিন্নী আবার বলিলেন, "মেজবৌ, বিদ্যানিধিঠাকুরের সিধা তৈয়েরি কর। ওলো যামিনি, আগে পূজার বাসনগুলা মাজিয়া পূজার ঘরে রাখিয়া আয়। উমার মা, একটা বেশী করিয়া শিব গড়িও।"

* শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ মহাশয়ের "ধ্রুবতারা" নামক উপন্যাসের একটি পরিচ্ছেদ। ধ্রুবতারা যন্ত্রস্থ।

উঠানে ৫।৬টি শিশু বড়গিন্নীর খাস তত্ত্বাবধানে বসিয়া আলুভাতে "ফেনাভাত" খাইতেছিল। তিনি উঠিয়া যাওয়াতে তাহারা অন্যমনস্ক হইয়া এদিক্-ওদিক্ করিতেছিল। একটি ছেলে উঠিয়া-গিয়া একটা বিড়ালের লেজ ধরিয়া টানিতেছিল। বড়গিন্নী তাহাদিগকে ধমক দিয়া বলিলেন, "কিরে! তোরা খাচ্ছিস্ না? ভাত দেখি নড়ে না।" ধমক খাইয়া তাহারা আবার ভাত খাইতে আরম্ভ করিল। একটি মেয়ে গালের মধ্যে ভাত পূরিয়া মুখ ভার করিয়া বলিল, "বড় মা, তার পর সে কুমীর কি করিল, বল না?"

বড়গিন্নী ভাত খাওয়াইতে খাওয়াইতে একটা ঢেঁকি কিরূপে কুমীরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই গল্প জুড়িয়া দিয়াছিলেন। তিনি গল্প বন্ধ করিয়া উঠিয়া যাওয়াতে, ছেলেরাও অন্যদিকে মন দিয়াছিল। সুতরাং তাহাদের ভাত না খাওয়ার খুব সন্তোষজনক ওজোর ছিল। তিনি কিন্তু সেই ওজোর একেবারে অগ্রাহ্য করিয়া কড়া হুকুম দিলেন—"না, এখন বেলা হইয়াছে, এখন আর কুমীরটুমীরের কথা হবে না। খা, তোরা শীগ্‌গির শীগ্‌গির খেয়ে ওঠ্।"

একটি ছেলে বলিল—"টুমীর আবার কি?" ইহাতে সকলে হাসিয়া উঠিল। বড়গিন্নীও হাসিয়া বলিলেন—"টুমীর তোর শ্বশুর।" বড়বৌ কাদম্বিনীর একটি নবমবর্ষীয়া কন্যা সরলা বাঁশী প্রস্তুত করিবার জন্য একটি আমের আঁটি শেড়ার উপর ঘষিতেছিল, আর গানের সুরে—

> "কালো কালো ভোম্‌রা কালো ঘাস খায়।
> রাত হ'লে ভোম্‌রা খোঁয়াড়ে যায়॥"

বলিতেছিল। তাহার বাঁশী বাজিতে আরম্ভ করিল এবং সে আহ্লাদে অন্যান্য শিশুদিগের নিকট আসিয়া বাজাইতে লাগিল।

এই সময়ে একটি মুসলমানকে বাড়ীর ভিতরে আসিতে দেখিয়া সরলা বলিল—"বড়-মা, ঐ দেখ, তোমার ভাই আসিতেছে।"

এই কথা শুনিয়া অন্যান্য রমণীগণের মধ্যে একটা হাসির রোল পড়িয়া গেল। বড়গিন্নীও হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ভাই না ত কিলো? মাগি, তোর সব কথাতেই ঠাট্টা। নামের নাম ধর্ম্মসম্পর্কটা বুঝি একেবারে তুচ্ছ?"

বড়গিন্নীর ভ্রাতার নাম গোপাল, সেইজন্য এই গোপাল সেখ তাঁহাকে "দিদিঠাকুইণ" বলিয়া ডাকে। তিনিও তাহাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন। গোপাল নিকটে আসিলে তিনি বলিলেন—"কিরে গোপাল, তুই কি মনে করিয়া?"

গোপাল সেলাম করিয়া বলিল "দিদিঠাকুইণ, মাজ্জা কর্‌তা খাজনা তলব কর্‌ছেন, তাই আইছি। কিন্তু আমার হাল ত জানেন। আপনি আমারে দুইডা টাহা কর্জ্জ না দিলি আমি পারি না। আমি কোষ্ঠা জাগ দিছি, ৪।৫দিনির মধ্যি সেই কোষ্ঠা বেইচ্যা আপনার টাহা দিব।"

বড়গিন্নী। আমার কাছে বুঝি টাকার গাছ আছে, তোরা আস্‌বি, আর আমি ছিঁড়ে ছিঁড়ে দিব?

এই কথা শুনিয়া যামিনী বলিলেন—"বড়মা, তোমার কাছে টাকার গাছ আছে বৈকি? তা না থাকিলে তুমি এত টাকা কোথায় পাও? আরে গোপাল, আমি জ্যেঠিমার বাক্সের মধ্যে সেই গাছটা দেখিয়াছি।"

এই কথায় সকলে হাসিয়া উঠিলেন।

বড়গিন্নী। হাঁ, তুমি আবার এইরকম সাক্ষ্য দাও, আর আমার প্রাণটা একেবারেই যাক্! আমার যে ২১৪টা টাকা ছিল, তাহা এইরকম করিয়াই উড়িয়া গেল। যে নেয়, সে আর দিতে জানে না।

গোপাল। দিদিঠারুইণ, আমারে টাহা দিলি তা' যাবে না। আমারে ত জানেন?

বড়গিন্নী। আচ্ছা, তুই বৈকালে আসিস্, একজন টাকা দিবে কথা আছে; যদি পাই, তবে তোকে দিব। চাট্টে জলখাবার নিয়ে যা। ওলো নীরো, গোপালকে চাট্টে খৈ দে।

নীরদা একখানা ডালায় করিয়া কিছু মুড়কি আনিয়া গোপালের কাপড়ে ঢালিয়া দিল। গোপাল আর-এক সেলাম করিয়া প্রস্থান করিল।

মাণিক আসিয়া খবর দিল—"ছয়জন অতিথ্ আসিয়াছে, তাদের জলখাবার ও সিধা দিতে হবে।"

বড়গিন্নী বলিলেন—"ওরে নস্থ, তুই এতগুলি ভাত পাতে রাখিয়া উঠ্‌লি যে? মেজবৌ, আর ৬জনের সিধা সাজাইয়া দাও। নীরো, মা, একজোড়া নারিকেল বাহির করিয়া মাণিককে দে ত; মাণিক, নারিকেল-দুটা ছাড়াইয়া দে, কুরিতে হইবে।"

বড়বৌ কাদম্বিনী আসিয়া বলিলেন—"বড়মা, এবেলা কয়সের চাল রাঁধিব? কতজন খাবে, তা' ত জানি না।"

বড়গিন্নী। ওমা! আমি কতদিক্ দেখিব?

এই বলিয়া তিনি মনে মনে হিসাব করিয়া বলিলেন—"এককুড়ি তিনজন।"

এই সময়ে "জয় রাধে কৃষ্ণচৈতন্য" বলিয়া তিলকপরা, ঘটী হাতে, ঝোলা কাঁধে এক বৈষ্ণবী আসিয়া উপস্থিত হইল।

একটি বালক তাহার ভোজন পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবীর নিকট দৌড়াইয়া-গিয়া তাহার প্রতি কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল, যেন সেই বৈষ্ণবী ত বৈষ্ণবী নহে,—একটা গরিলা কি সিম্পাঞ্জী।

বড়গিন্নী বলিলেন—"ওমা নীরো, বোষ্টুমঠাকরুণকে চারিটা চাল দাও। বোষ্টুমঠাকরুণ, তুমি ঐ ছেলেটাকে তোমার ঝোলার মধ্যে ভরিয়া নিয়া যাও। ও বড় দুষ্টুমি করে—এই দেখ, ভাত খায় না।"

ইহা শুনিয়া সেই ছেলেটি একদৌড়ে বড়গিন্নীর কোলে আসিয়া বসিল। বৈষ্ণবী একটু হাসিয়া ভিক্ষা লইয়া প্রস্থান করিল।

নীরদা বৈষ্ণবীকে ভিক্ষা দিয়া বারান্দায় গিয়া বসিলেন এবং ছোটগিন্নীকে বলিলেন—"খুড়িমা, ও কি ফুল আঁকিতেছ?"

ছোটগিন্নী। ফুল নয় লো,—এগুলি পদ্মপাতা।

নীরদা। পদ্মপাতার বুঝি এত গাঢ় রঙ্? পাতার রঙ্ এত নীল হবে কেন? আর একটু পাতলা করিয়া দাও। ঐ পদ্মের কুঁড়িটি বেশ হইয়াছে।

বড়গিন্নী। ছোটবৌকে আর তোমার শেখাতে হবে না। ওর হাত খুব ভাল। তুই আমাকে একখান কুলা আনিয়া দে ত, আমি এই চালগুলা ঝাড়ি। আজও ভোলার মা আসিল না। আহা, তা'র ছেলেটি যেন কেমন আছে? ও গুরু!

ভোলার মা এ বাড়ীর চাকরাণী। তাহার পুত্রের অসুখ বলিয়া কাজে আসে নাই।

বড়গিন্নী চাউল ঝাড়িতে বসিলেন। এই সময়ে বলাই-কারিকের-নামক একজন বৃদ্ধ মুসলমান আসিয়া তাঁহাকে সেলাম করিল। তিনি বলিলেন—"কি বলাই, আমার টাকা আনিয়াছ?"

বলাই-কারিকর ভাল কাপড় বুনিতে পারে। বড়গিন্নীর পরামর্শে সে তাঁহার নিকট হইতে আজ দুইবৎসর হইল ২৫৲ টাকা কর্জ্জ করিয়া লইয়া ভাল সূতা কিনিয়া ছিট বুনিতে আরম্ভ করে। উপেন তাহাকে কতকগুলি ভাল নমুনা আনিয়া দিয়াছিল। তাহার বোনা ছিট ফরিদপুরে এখন অনেক দামে বিক্রীত হয়। ফরিদপুরমেলায় সে একটা পুরস্কারও পাইয়াছে। এখন তাহার অনেক টাকার কারবার। তাহার যখন যে টাকার দরকার হয়, তাহা বড়গিন্নী দিয়া থাকেন। তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে সে বলিল—"মাঠাকুইণ, আজ ক্যাবল সুদের দশটাহা আন্‌ছি। আসল টাহা আরও একমাস পরে দিব।"

"আচ্ছা, তাই দিয়া যাও। আর আমার উপেন ও জ্ঞানের জন্য যে একটা ভাল ছিট তৈয়ারি করিতে বলিয়াছিলাম?"

"আজ্ঞে, তা' তেনারা বাড়ী আস্‌লিই পাবেন।"

"আর আমার নতুনবৌ আসিবে—তার জন্যে খুব ভাল একখান চারখানার গামছা চাই। ওলো নীরো, এই টাকা-কয়টা তুলিয়া রাখ্।"

বলাই গামছা দিবে স্বীকার করিয়া প্রস্থান করিল।

তিনটি শিশুসন্তান সহ একটি বিধবাকে আসিতে দেখিয়া বড়গিন্নী বলিলেন—"ওলো মোনার মা, তোকে যে আর এখন দেখি না?"

মোনার মা নিকটে আসিয়া বলিল—"মাঠাকুইণ, যে বায্যা হইছে, এখন আর ঘরের বাহির হওয়া যায় না—চারিদিকে জল। তোমাগো বাড়ী আস্‌তি কাপড় বাচে না। আজ একটু জল কম্‌ছে, তাই এই কয়ডী কাচ্চাবাচ্চা নিয়া আইছি। বড়ঠাকুইণ, আমার দুক্ষির কথা আর কি কবো? আজ দুইদিন ঘরে দানাডা নাই। ক্যাবল নাইল* সিদ্ধ কর্যা ইহাগো খাওয়াইছি। আপনি যে টাহাডা দিছিলেন, তা'তে কয়দিন একবেলা কর্যা ভাত খাইছিলাম। কিন্তু তা' কবে ফুরায়্যা গেছে। এহন ত আর বাচি না। আপনি দয়া না কর্‌লি এরা দানা বিনি মর্যা যাবে।"

ইহা বলিতে বলিতে তাহার চক্ষে জল আসিল। বড়গিন্নী তাহার তিনটি ছেলেকে ভাল করিয়া দেখিতেছিলেন। তাহাদের শরীর শীর্ণ—বুকের হাড় বাহির হইয়া পড়িয়াছে। তিনি কাতর হইয়া বলিলেন—"তা' ইহাদের নিয়ে এসেছিস্, ভাল হইয়াছে। ও বড়বৌমা! ঘরে পান্তাভাত যদি থাকে ত ইহাদের চারিজনের জন্য বাড়িয়া দাও। তা' মা, আমি আর এইরকম কয়দিন তোদের বাঁচাইতে পারিব? আমার বেশী টাকাকড়ি নাই। আচ্ছা, তোর ত এখন কাঁচা বয়েস, চেহারাও ভাল, তুই নিকা বসিস্ না কেন? নিকা বসিলে

* কুমুদফুলের নাল।

তোর খাওয়াপরার কোন কষ্ট থাকিবে না।”

মোনার মা চক্ষু মুছিয়া বলিল—“বড় ঠাইরুণ, সকলে ত আমারে নিকা বস্‌তি কয়। কিন্তু আমি তা'তে নারাজ। খোদা-তাল্লার কছম করা্যা কই, আমার আর সে সাধ নাই। আমার এ জীবনের যে সুখ, তা' সেই একজনের সাতে গেছে। এখন আমার এই কয়ডী নাবাল্লক মানুষ কর্‌তি পার্‌লি, আমি তারগো কামাই খায়্যা বাচ্‌তি পার্‌ব। এখন আবার কোন্ গোলামের কাছে যাব, সে আমার সোনার চাঁদগো খেদায়্যা দিবে। আর দুইখান-বছর কোনো-মোতো আপনাগো ভিটাডা কাম্‌ড়ায়্যা থাক্‌তি পার্‌লি আমার বড় ছাল্যা মোনা কিছু-কিছু রোজগার কর্ত্তি পার্‌বে। আমিও বার-দুয়ারে বারাকুটা বান্ধ্যা একরকম চালাতি পার্‌বো। কিন্তু এই বায্যার তিনডা মাস—যে দইগণ্ডী বায্যা—কোনোমোতো চালাতি পার্‌লিই আমি বাচি। আপনার দয়া না হলি আমরা এই কয়ডা মানুষ ঘরে দাপাইয়া মর্‌বো! ও আল্লা!”

বড়গিন্নী বলিলেন—“আচ্ছা,তুই এক কাজ কর্। আমাদের ভোলার মা কয়দিন বাড়ী গেছে। তার ছেলেটার বড় ব্যারাম--বাঁচে কি মরে। সে না আসা পর্য্যন্ত আমাদের বাড়ীতে থাকিয়া কাজকর্ম্ম কর্, তোরা কয়টি তিনবেলা খেতে পাবি। পরে আমি তোকে দুইটা টাকা দিব। তুই ত ধান ভান্‌তে পারিস্, সেই টাকা দিয়া হাটে ধান কিনিয়া চাল তৈয়ারি করিয়া বেচিস্। সেই চাল বেচিলে তোর অবিশ্যি কিছু লাভ থাকিবে। এইরকম করিয়া কোনক্রমে কিছুদিন চালাইতে পার্‌বি। যদি ভালভাবে কাজ চালাস্, কাউকে না ঠকাস্,আর চাল না খেয়ে ফেলিস্, তবে আমি আর পাঁচটাকা দিব। গোপালকে বলিস্, সে ধান কিনিয়া দিবে।”

মোনার মা এই প্রস্তাবে সম্মত হইল। বড়বৌ একখানা পাথরে করিয়া পান্তাভাত বাড়িয়া দিলেন, তাহারা চারিজনে খাইতে বসিল।

বড়বৌ তাহাদিগকে খাইতে দিয়া আসিয়া বলিলেন—“বড়মা, ছয়জন অতিথ্ এসেছেন, পণ্ডিতঠাকুর আছেন, দুধে ত কুলাইবে না। দুধ আরও চাই।”

বড়গিন্নী দুধের কথা বলিবার জন্য সরলাকে দত্তমহাশয়ের নিকট পাঠাইলেন। দত্তমহাশয় অন্দরে আসিয়া বলিলেন—“এবেলা আর দুধ ঘটিবে না। ওবেলা হাট আছে, হাটে দুধ কেনা যাবে। যে দুধ পাওয়া গিয়াছে, তাহা অতিথিদিগকে দিতে বলুন। আমাদের এবেলা দুধের দরকার নাই।”

কাব্যের প্রকাশ।

বর্ত্তমান কবিগণের সম্বন্ধে জনসাধারণ একটা দোষ দেয় যে, তাঁহাদিগকে বুঝা যায় না। সে বলে—সোজা কথাটা এত ঘুরপ্যাচের মধ্য হইতে বুঝিবার প্রয়োজন কি? কবিরা কি আরও একটু খোলসা করিয়া কথাগুলা লিখিতে পারেন না?

কাব্যসম্বন্ধে এই ধরণের সমালোচনা করিয়া অনেকে বাহাদুরী লইবার চেষ্টা করিয়াছে; কিন্তু রুশদেশীয় সাহিত্যিক টল্‌স্‌টয়ের ন্যায় বোধ হয় কেহই কবিসমাজকে এমন করিয়া নিন্দা করে নাই। টল্‌স্‌টয় নিজের লেখায় ক্রিশ্চান্ নীতি ভিন্ন আর কোন নীতি অথবা সৌন্দর্য্যের স্থান দেন নাই—তাঁহার নিকট হইতে রহস্য চিরদিনের জন্য বিদায় লইয়াছে। দুঃখের বিষয়, তিনি কবি নন। কবি হইলে কবির দরদ বুঝিতেন।

কাব্যের প্রকাশ এরূপ ধোঁয়াল কেন? তাহার কতকটা ছবি, কতকটা সুর, কতকটা আইডিয়া—এইরূপে স্পষ্ট ও অস্পষ্ট মিলাইয়া তাহার একটা সৌন্দর্য্য কাহারও কাহারও কাছে লাগে, আর কেহ কেহ নিতান্তই বিরক্ত ও বিপর্য্যস্ত হয় কেন?

অনেকে বলিবেন, সৃষ্টির নানারূপ খেয়াল আছে। পূর্ব্বে পৃথিবীতে ডাইনোসর, ব্রণ্টোসিরস্, ম্যামথ্, ম্যাস্‌টোডন্ প্রভৃতি অনেক অদ্ভুত জানোয়ার ছিল, তাহাদের কঙ্কাল দেখিলে এখন বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া যাইতে হয়—সেইরূপ আইডিয়াকেও মানুষ যে কতপ্রকারেই বলে, কত চেহারাই দেয়, তাহারও কি কোথাও সুনির্দ্দিষ্ট সীমা রচিত হইয়াছে?

কথাটা সত্য শোনায় বটে, কিন্তু সত্য আদবেই নয়। আসলে পদ্য গদ্য-ছাড়া এক-স্বতন্ত্র জিনিষ। গদ্যের প্রকাশের ন্যায় তাহার প্রকাশ হইতেই পারে না—তাহার প্রকাশ চিরকালই তাহার মত, তাহাতে কোন ভুল নাই।

মনে কর, যেন আমাদের চেতনা (consciousness) একটা মন্দির। তাহার বাহিরে গাছপালা, পথঘাট, লোকজনের অবিরাম যাতায়াত তুমি সুস্পষ্ট দেখিতে পাইতেছ, কিন্তু তাহার ভিতরে কি চলিতেছে, সে সম্বন্ধে তুমি সচেতন নও। দৈবাৎ দুটো-একটা শব্দ কি একটা ঘণ্টার শব্দে কিংবা একটা আলোর ক্ষণিক রশ্মিপাতে তুমি চম্‌কিয়া উঠিতেছ—অনেকগুলো অজানা জিনিষের ছবি যেন চোখের নিমিষে তোমার সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইতেছে। তখন যদি সেই ক্ষণিক উপলব্ধিগুলোর কথা তোমায় ভাষায় ফুটাইয়া তুলিতে হয়, তুমি কি কর? কেবল আভাসে-ইঙ্গিতে, তোমার কিরূপ লাগিয়াছে, এইটুকু জানান ছাড়া তোমার আর উপায় নাই। আমরা যাহা জানি, স্পষ্টই জানি, তাহার ভাষা গদ্য—কিন্তু আমরা যাহা জানি, অথচ সম্পূর্ণরূপে

জানি না, যাহাকে অনুভূতির মধ্য দিয়া হাতড়াইয়া বলিতে হয়, তাহার ভাষা পদ্য।

পদ্যে এইজন্য যে সকল আইডিয়া প্রকাশ করিতে হয়, সে সকল আইডিয়া আমাদের বুদ্ধি দিয়া আমরা পূর্ব্ব হইতেই উজ্জ্বল করিয়া রাখি নাই—সেগুলি আমাদের অজ্ঞাতে আমাদের গানে প্রকাশ পায়—গান রচিত হইয়া গেলে দেখি যে, একটা-কি কথা বলিবার জন্য যেন অনেক ছবির জাল বোনা হইয়াছে। এমন কি, নিতান্ত সাদা অনুভূতি, যেমন ভালবাসা কি সৌন্দর্য্যের অনুভূতির মধ্যেও একটা এমন দূরত্ব, এমন বিরলতা প্রচ্ছন্ন থাকে যে, তাহাকেও সম্পূর্ণরূপে বলা চলে না, কেবল তাহার দুটি-একটি স্পন্দনাভাস ফুটাইয়া তুলিতে হয়।

এইজন্য কবিতাকে কেবল সাদাকথা, খেলোকথা মনে করিলে চলিবে না। তাহার মধ্যে একটা বৃহৎ আইডিয়ার প্রকাশ আছে। সেই আইডিয়াটি দু-এক কথায় বুঝাইবার মত নহে—তাহা অনেকাংশেই কবির নিকটেই প্রচ্ছন্ন—অথচ তাহারি প্রকাশ ইন্দ্রধনুবিচ্ছুরিত বর্ণের ন্যায় নানা সময়ে নানা আকার ধারণ করিয়া পাঠকের চিত্তের সম্মুখে ঝরিয়া পড়ে।

যদি সেই বৃহৎ ভাব মনের অচেতন কোণে স্তূপীকৃত হইয়া না থাকে, তবে কোনমতেই কোন অনুভূতি কবির চিত্তকে অমন প্রবল, অমন সহজ সঙ্গীতের আকর্ষণে টানিয়া-লইয়া যাইতে পারে না।

এইজন্য আমি যে-কোন কথা লিখিতে যাই, যে-কোন ছবি আঁকিতে যাই, যে কোন অনুভূতিকে সঙ্গীতে প্রকাশ করিতে যাই, সে সকলেরি মধ্যে আর-একটা জিনিষ লাগিয়া থাকে—একটা ভাব—যে এই সমস্ত অনুভূতি-জালকে, চিন্তাজালকে আঁকিয়া তুলিতেছে, যাহার কাছে কিছুই অগোচর নাই—যাহা হইয়াছে ও যাহা হইতে সমস্তই যেন তাহারি হস্তের মুঠার মধ্যে লুক্কায়িত।

কাব্যের প্রকাশ আসলে ঐ ভাবের প্রকাশ এবং ঐ ভাব আমাদের এক গভীর সচেতনতার মধ্য হইতে তিলে তিলে ফুটিয়া উঠে, প্রতিদিনের কর্ম্মক্ষেত্রে মনুষ্যাবাসে উপস্থিত হয়। হঠাৎ একদিন মন্দির খোলা হইয়া যায়—আমরা অনেকদিনের অনেক অপেক্ষা, অনেক ব্যথা, অনেক আনন্দ, অনেক ইঙ্গিতের অর্থ একমুহূর্ত্তেই সুস্পষ্টরূপে বুঝি।

বহুদিন ধরিয়া, সমস্ত জীবন ধরিয়া যে জিনিষটা আমার মধ্য দিয়া গড়িয়া উঠে, তাহাকে একমুহূর্তে পরিষ্কার করিয়া কি করিয়াই বা বলা যাইবে এবং কি করিয়াই বা বুঝা যাইবে? তাহার শেষ কথা হয় ত এই—

O the world! as God has made it
all and is beauty
Knowing this is love, and love is
duty.

কিন্তু সে কথাটুকু যে সেখানে কিছুই নহে—কথাটুকু যে জীবনের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে, সেই জীবনের গভীরতায় প্রবেশ করিতে হইবে, তাহার সুখদুঃখ-হর্ষশোকের বিচিত্র লীলার মধ্যে কথাটুকুর গাম্ভীর্য্য প্রত্যক্ষ করিতে হইবে।

কাব্যের সত্য এইজন্যই এমন অখণ্ড, এমন পরমরহস্যময়। কারণ, সেই সত্যসমুদ্রের মধ্যে অজ্ঞাতে বাস করিয়া কবি নানা রত্নরাজি তাহার ঘর হইতে তুলিতেছেন, বুদ্ধিদ্বারা, বিচারবিতর্কদ্বারা বাহিরের সত্যকে তিনি

সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। তিনি জানেনও না; তাঁহার মধ্যে কোন্ সত্যের প্রকাশ অহরহ কম্পিত।

এ কথা আমি মানি যে, আমাদের ক্ষণিক জীবনে যে সকল কথা ওঠে এবং মিলাইয়া যায়, যাহাদের পূর্ব্বাপরের কোন সম্বন্ধই নাই—যদি কাব্য সেই সকল কথার অব্যক্ততাকে ব্যক্ত করিতে যাইত, তবে যথাসম্ভব পরিস্ফুট করিয়া তোলাই তাহার উচিত ছিল। কিন্তু যেখানে আমি জানি না, আমি কি বলিতে যাইতেছি—যেখানে কেবল অনুভূতির তাড়নে, ভাবের তাড়নে কতগুলি কথা আমায় বলিয়া যাইতে হয়—যাহার মধ্যে কতকগুলি চেতনার এলাকায় এবং কতকগুলি নয়—সেখানে আমি যে এক অন্ধ ভবিষ্যতের হস্তে—আমি আমার কর্ত্তা নহি, সুতরাং সেখানে আমার ভাবের যে অস্পষ্টতা, তাহা যদি কেহ কল্পনার আলোকে স্পষ্ট করিয়া লইতে পারেন, তবেই পারিলেন—নচেৎ আমার কাব্য তাঁহার নিকটে চিরদিনের মত রুদ্ধ রহিল।

এখানে এ কথা কবুল করিতেই হইবে যে, সকল কবিই এপ্রকার 'miraculous' অত্যদ্ভুত নহেন। অনেকেই সাদাকথা ছন্দ মিলাইয়া মিলাইয়া বয়ন করেন—ইঁহাদের 'বর্ণিমে' খুব চমৎকার। কিন্তু পৃথিবীতে ইঁহাদিগের স্পষ্টতাসত্ত্বেও কেহই ইঁহাদিগকে আজও বড় বলিল না। বরং যে সকল কবি 'আলোক', 'সত্য', 'সৌন্দর্য্য' প্রভৃতি কতগুলি অর্থহীন কথা লিখিয়া গিয়াছেন, যাঁহাদের গানে-ছবিতে, অর্থে-সৌন্দর্য্যে এক কল্পলোক কাব্যে সৃজিত হইয়া উঠিয়াছে, আজও তাঁহারাই আদৃত; অথচ তাঁহারা স্পষ্টে-অস্পষ্টে মিলাইয়া সেই মায়ালোকটি নির্ম্মাণ করিয়াছেন, কোন কথাই অত্যুজ্জ্বল করেন নাই।

শ্রীঃ—

পত্রালী।*

জনসাধারণমধ্যে বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি দুরূহ বিষয়াদির বহুলপ্রচার জাতীয়জীবনের উন্নতির পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যক, এ কথা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। আমাদের দেশে রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক প্রভৃতি আন্দোলন একাধিক কারণে আশানুরূপ ফলপ্রকাশ করিতেছে না ও সর্ব্বসাধারণমধ্যে শিক্ষার অভাব এই কারণগুলির অন্যতম। সম্প্রতি জাতীয়বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি লইয়া অনেক বাদানুবাদ চলিতেছে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, যে সাধারণ শিক্ষার উপরে আমাদের দেশের ভবিষ্যজীবন সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে, সে সম্বন্ধে আমাদের নেতৃবর্গ একেবারে উদাসীন। সুতরাং আমাদের দেশে সাধারণ জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য যে-কোন উদ্যমই হউক না কেন, তাহাই প্রশংসনীয়।

* পত্রালী—শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় সম্পাদিত। মূল্য ১৲ এক টাকা।

শ্রীযুক্ত বাবু যোগেশচন্দ্র রায় সাহিত্য-জগতে সুপরিচিত। দেশে সাধারণ-জ্ঞান-বিস্তারসম্বন্ধে তাঁহার কোন পণ্ডিত বন্ধুর সহিত কথাবার্ত্তা হয় ও উক্ত বন্ধু 'পত্রচ্ছলে' সাধারণ পাঠকপাঠিকার উপযোগী কতকগুলি প্রবন্ধ যোগেশবাবুকে লিখিয়া পাঠান। 'তন্মধ্যে ২০খানি পত্র যথাসম্ভব সম্পূর্ণ করিয়া পত্রালী নামে' প্রকাশিত হইয়াছে। পত্রচ্ছলে দার্শনিক গভীর তত্ত্ব প্রভৃতির আলোচনা বাঙ্‌লা-সাহিত্যে বোধ হয় এই নূতন এবং ইহা অনেক ভবিষ্য উদ্যমের পথপরিদর্শক হইবে বলিয়া আশা করিতে পারা যায়। যোগেশবাবুর সম্পাদিত প্রবন্ধগুলি সুরম্য ও সুপাঠ্য হইয়াছে। আলোচ্য বিষয়গুলি বৈজ্ঞানিক বটে, কিন্তু সেজন্য কোন পাঠকপাঠিকার বিজ্ঞানের বিভীষিকায় ভীত হইবার কারণ নাই। প্রবন্ধগুলি উপন্যাসের মত সরস ও চিত্তবিনোদক। প্রকৃতি সৌন্দর্য্যময়ী—তাঁহার সৌন্দর্য্যের তিনিই তুলনা। সেই সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে হইলে অনেক তপস্যা আবশ্যক। প্রকৃতি রহস্যময়ী—গোলাপের দলের ন্যায় স্তরে স্তরে তাঁহার মাধুর্য্য লুক্কায়িত। বিনা আরাধনায় সেই রমণীয়তা অনুভূত হয় না। তুমি-আমি একখানা প্রস্তরখণ্ড ঘৃণার সহিত দূরে নিক্ষেপ করিতে পারি, কিন্তু অপর কোন সৌভাগ্যবান্ সেই প্রস্তরখণ্ড হইতে কতকালের সংগুপ্ত কত তথ্য আবিষ্কার করিবেন। আমাদের চতুর্দ্দিকে কত বৃক্ষলতা, আকাশে অসংখ্য তারকারাজি প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিয়া প্রকৃতির অশেষ ধন ও সৌন্দর্য্যের সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে—কিন্তু আমরা কয়জন এই বিপুল ঐশ্বর্য্য ও রূপ উপভোগে সমর্থ হই? এ রূপ যে অফুরন্ত, এ ধন যে অসীম! কিন্তু বিনা সাধনায় এই উপভোগ সম্ভবপর নহে। সেই সাধনা যাঁহার আছে, তিনিই যথার্থ চক্ষুষ্মান্, অপর সকলে চক্ষু থাকিতেও অন্ধ। কর্ণ সকলেরই আছে বটে, কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গীতশ্রবণ কয়জনের অদৃষ্টে ঘটিয়া থাকে? পঞ্চেন্দ্রিয় সকলেরই আছে, কিন্তু 'প্রকৃতিবৈচিত্র্য' প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতে হইলে সেই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের যথার্থ বিকাশ আবশ্যক। প্রবন্ধলেখক ভাগ্যবান্,—তিনি প্রকৃতির রসাস্বাদে সমর্থ। তাই তিনি গ্রন্থের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন—"শুনিবে কি, এখন আমি কি করিয়া দিন কাটাই? আমি এখন সৌন্দর্য্যধ্যানে নিরন্তর ডুবিয়া আছি। বিধাতা এত সৌন্দর্য্য আমাদের জন্য চারিদিকে সাজাইয়া রাখিয়াছেন, পূর্ব্বে দেখিতে পাই নাই! এমন সুন্দর জগৎ, এমন মনোমোহন বেশ পরিয়া আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে! প্রকৃতি এখন মধুর হাসিতে মধুরতর বোধ হইতেছে!...সৃষ্টি কি প্রেমময়!"

আজ বাসন্তী পূর্ণিমার রাত্রি—আকাশে চাঁদ হাসিতেছে। চাঁদের জ্যোৎস্নামাখা হাসিতে উদাস প্রাণে কত অতীতের স্মৃতি, কত ভবিষ্যতের আশা জাগাইয়া দিতেছে। পিতামহী পৌত্রপৌত্রীদিগকে প্রবুদ্ধ রাখিবার জন্য চাঁদসম্বন্ধে কত রূপকথা বলিতেছেন, আর বালকবালিকারা হাঁ করিয়া সেই সমস্ত কথা শ্রবণ করিতেছে। স্নেহময়ী জননী সন্তানকে নিদ্রিত করিবার জন্য চাঁদের মা বুড়ীকে বারবার আহ্বান করিতেছেন। কিন্তু "এ পাশে বসিয়া বুড়ী চিরদিন সুতা কাটিতেছে, আদৌ নড়ে না, চর্কাটিও নড়ে

না। আজ যেখানে বুড়ীকে দেখিতেছি, কালও সেইখানে দেখিয়াছি, পূর্ব্বকালের লোকেরাও সেইখানে দেখিত, ভবিষ্য লোকেরাও, বোধ করি, সেইখানেই দেখিবে। এ কিরকম বুড়ী, নলিনি?" এই দুরূহ প্রশ্নের উত্তর প্রবন্ধকার যেরূপ প্রাঞ্জল ও সুবোধ্য ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে চমৎকৃত হইতে হয়। নিউটনের আবিষ্কার, চাঁদে জল, বায়ু, বাষ্প, বৃক্ষ প্রভৃতির অভাব, পর্ব্বতে চাঁদের গাত্র পরিপূর্ণ, এই সমস্ত বিষয়ের অবতারণা পাঠক এই গ্রন্থে দেখিতে পাইবেন।

"তুমি কোথায় ছিলে, আমি কোথায় ছিলাম। দুদিনের তরে আসিয়া আবার কোথায় চলিয়া যাইব। তেম্‌নি কত তারা একসময়ে ছিল না, পূর্ব্বে সেগুলাকে কেহ কখন দেখিতে পায় নাই; কোথা হইতে আসিয়া গগনমাঝে দেখা দিয়া আবার চলিয়া গেল। উহাদের রহস্য কি?" তারাব্যাপ্ত গগনে সূর্য্যের অবস্থিতি, সৌরকলঙ্কের উৎপত্তির কারণ, গ্রহদিগের আপেক্ষিক পরিমাণ, ধূমকেতু ও উল্কার গতি প্রভৃতি বিষয়ের অবতারণা পাঠক এই গ্রন্থে দেখিতে পাইবেন। দূরবীণ, বর্ণবীক্ষণ প্রভৃতি যন্ত্র-দ্বারা বিজ্ঞানের মাথা কত উঁচু হইয়া গিয়াছে, তাহার একটি সুন্দর ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ "শুকতারা"প্রবন্ধে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

"গ্রীষ্মদেশে, আর্দ্রবায়ুতে বাস করিয়া আমাদের বল গিয়াছে; আমরা বাল্যকালে বিবাহ করি; আমরা আরও কত-কি করি, তাই ত আমরা দুর্ব্বল।" মানুষ দেশের বায়ু পরিবর্ত্তন করিতে পারে না। সমাজ বাল্যবিবাহ নিবারণ করিতে পারে ও যত শীঘ্র তাহা করে, দেশের পক্ষে তত মঙ্গল। কিন্তু এই "আরও কত-কি"র মধ্যে খাদ্যদ্রব্যে অমনোযোগ আমাদের প্রাণহীনতা ও অকাল-মৃত্যুর এক অতি প্রধান কারণ। খাদ্যদ্রব্যের আপেক্ষিক গুণাদিসম্বন্ধে এরূপ অধীত অজ্ঞতা ও উদাসীনতা বোধ হয় আর কোন সভ্যদেশে নাই। আমাদিগকে বাঁচিবার জন্য খাইতে হইবে, কিন্তু খাইবার জন্য বাঁচিতে হইবে না—এই "কথাটা সামান্য বটে; কিন্তু কাজের বেলায় আমরা সামান্য কথাগুলি ভুলে যাই।" শক্তিসঞ্চয়ের জন্য কি-পরিমাণ মাংসদ ও তাপদ পদার্থের আবশ্যকতা, তাহা আমাদের দেশে কয়জন জানেন অথবা জানিলেই সেই জ্ঞান অনুসারে কার্য্য করিয়া থাকেন? ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরক্ষণ হইতেই আমরা দুগ্ধপান করিতে আরম্ভ করি এবং মাতৃস্তন্য ও গোদুগ্ধ এতদুভয়ের ন্যায় সুলভ ও পুষ্টিকর পানীয় জগতে আর নাই। দুগ্ধ, দধি, ছানা, মাখন, ঘৃত প্রভৃতির মধ্যে কি সম্পর্ক, তৎসম্বন্ধে আমাদের ধারণা অত্যন্ত অস্পষ্ট। "পত্রালী"র এই অংশ পাঠে সুগৃহিণী পাঠিকা অনেক বিষয়ে অতি সহজে জ্ঞানলাভ করিবেন।

বৈদেশিক অনুকরণ অধুনা আমাদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতেছে এবং অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, যাঁহারা আমাদের সমাজে সভ্য ও শিক্ষিত বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাঁহারাই এই অবৈধ অনুকরণে ললনাদিগকে উৎসাহিত করিয়া থাকেন। ভিন্ন দেশের ভিন্ন রুচি। পাশ্চাত্যপ্রদেশে রমণীগণ স্থিরযুবতি বলিয়া খ্যাত হইবার জন্য অনেক

কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করেন। "তাঁহাদের পাদপদ্ম বিকশিত করিলে কুরুচির একশেষ হয়"—কিন্তু তাঁহারা দেহের উপরার্দ্ধ যেরূপ বস্ত্রাদিতে আবৃত করিয়া প্রকাশ্যস্থানে বাহির হন, তাহা কিছুতেই ভারতবাসীর চক্ষে সংস্কৃতরুচির পরিচায়ক নহে। যে সমাজে অথবা পরিবারে এই অনুকরণপ্রথা প্রচলিত হইয়াছে, সময় থাকিতে সেই সমাজ অথবা পরিবার হইতে সেই অভ্যাস উঠাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। আমাদের দেশের রমণীগণ কিঞ্চিৎ অলঙ্কারপ্রিয়, এ কথা বহুকাল হইতে প্রচলিত এবং "টাকা থাকিলে কমনে খরচ হ'য়ে যায়" এই যুক্তিতে অনেক সীমন্তিনী নিজেদের ভোগবিলাস প্রভৃতিতে ঔদাসীন্য দেখাইয়া গহনা গড়াইয়া থাকেন। প্রমদাসুন্দরীও এই কারণ দর্শাইয়া বেচারী শশিভূষণের সদসত্পায়ে অর্জ্জিত টাকার অনেকাংশ সেক্‌রার দোকানে পাঠাইয়াছিলেন। "আমি বুঝি না, সোনার উপরে কে আবার সোনা বসাইতে যায়। বুঝি না, তেমন স্বচ্ছ ঢলঢলে হীরাদুখান থাকিতে কে আবার কয়লার কঠোর হীরা খুঁজিয়া বেড়ায়। পদ্মরাগের বিমল ছবি যে রাতদিন পরিয়া আছে, সে কেন আবার মাটির পদ্মরাগের নিমিত্ত ভাবনা করে? ইচ্ছা করিলেই যে শত মুক্তা ছড়াইয়া দিতে পারে; তার আবার ঝিনুকের মুক্তার সাধ হয় কেন?" বসনভূষণের প্রতি একটু বিশেষ অনুরাগের ফলে জননী ঈভ্ পৃথিবীতে মৃত্যু আনয়ন করিয়াছিলেন। প্রাকৃপ্রস্তর, প্রত্নপ্রস্তর, মধ্যপ্রস্তর, নবপ্রস্তর যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান ঐতিহাসিক কাল পর্য্যন্ত আদিমমাতা হইতে প্রাপ্ত বসনভূষণাকাঙ্ক্ষা অঙ্গনাগণ অতি সযত্নে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। হীরকমাণিক্য-খচিত গাত্রালঙ্কারের বিরুদ্ধে বিশেষ কিছু বলিয়া আমি সুন্দরী পাঠিকার বিরাগভাজন বা অভিশাপগ্রস্ত হইতে অভিলাষী নহি; কিন্তু কেবলমাত্র বলিতে চাই যে, "যোষিতেরা রত্নসমূহকে ভূষিত করেন, কিন্তু রত্নের কান্তি তাহাদিগকে ভূষিতা করে না। কারণ, রত্ন-বিবর্জ্জিতা হইলেও বনিতা মন হরণ করেন, কিন্তু রত্নসকল অঙ্গনাঙ্গসঙ্গ বিনা মন হরণ করিতে পারে না।"

প্রবাসীর 'জগৎ কি আঁধার' প্রবন্ধটি অত্যন্ত মনোরম ও শিক্ষাপ্রদ। সুন্দরি, আপনি রূপের গরবে গরবিণী—রূপের মোহে আপনার প্রিয়জন আত্মহারা—কিন্তু আপনার এই রূপ কি? সুগায়িকে, আপনি আপনার সুমিষ্ট স্বরের বড়াই করিয়া থাকেন—সেই সুমিষ্ট স্বরই কি আপনার নিজস্ব? সূর্য্যকণা সর্ব্বদা নড়িতেছে—এই আন্দোলনে আকাশে একটি তরঙ্গ উত্থাপিত হয়; সেই তরঙ্গ আমাদের স্নায়ুবিশেষে আঘাত করিলে আমরা সূর্য্যের আলো দেখিতে পাই। শাদা আলো মিশ্র—ভিন্ন ভিন্ন সপ্ত মৌলিকবর্ণের সমষ্টিমাত্র। আমরা কোন বস্তু রক্তবর্ণ দেখিতে পাই—ইহার কারণ এই যে, উক্ত দ্রব্যটি রক্তবর্ণ ব্যতিরেকে অপর সমস্ত বর্ণ আত্মসাৎ করে ও কেবলমাত্র রক্তবর্ণ আমাদিগকে দেখিতে দেয়। শাদা বস্তু ভালমানুষের মত নিজে কিছুই রাখে না; কিন্তু কালো দ্রব্য বড়ই স্বার্থপর—সমস্ত আলোটা নিজের জন্য রাখিয়া দেয়, এইজন্যই বোধ হয় কালো রূপ মানুষের অপ্রীতিকর।

"হায় নলিনি, তোমার তবে রূপ কোথায়? তুমি পরের আঘাত খাইয়া কতকগুলা আমার দিকে চালাইয়া দিতেছ। সেই আঘাতে আমার যে সুখ হয়, সেগুলা তোমার নিজের নয়, পরের আঘাতই তোমার সম্বল। তুমি কতকগুলা আত্মসাৎ করিয়া যেগুলা আমার মনে আঘাত লাগে, সেইগুলা বাছাই করিয়া আমার প্রতি নিক্ষেপ কর। এই বাছাই করিবার শক্তি ভিন্ন তোমার আর কিছুই নাই। নলিনি, তুমি বৃথাভিমানিনী, নইলে সূর্য্যের আঘাত খাইয়া এত গরবিণী হইতে না।" শব্দ কি? শব্দ বায়ুকম্পন ভিন্ন আর কিছু নহে। বায়ুকম্পনদ্বারা আমাদের স্নায়ুবিশেষ আলোড়িত হয় এবং সেই আলোড়ন আমাদের মস্তিষ্কের স্থানবিশেষে কি-এক বিপ্লব ঘটায়—তাহাতেই আমাদের বোধ হয় আমরা শব্দ শুনিতেছি। "হায় নলিনি, তোমার কণ্ঠে শব্দ কই? তুমি আবার কি কথা শুনাবে? তুমি ত বায়ুটাকে এদিকে-ওদিকে নাড়িয়া দাও, তুমি আবার শব্দ কোথায় পাবে? শব্দটা আমার মনে। তোমাতে নাই, বায়ুতে নাই, আমার কানেও নাই।"

অনেকের দৃঢ় বিশ্বাস যে, বৈজ্ঞানিকের জীবন অত্যন্ত নীরস। অনেকে মনে করেন যে, যাহার জীবন প্রকৃতির আরাধনায় উৎসর্গীকৃত, তাহার হৃদয় শাহারা-মরুভূমির ন্যায় শুষ্ক। কবিত্ব ও বিজ্ঞানের মধ্যে কোন বিপরীত সম্বন্ধ নাই—কবি ও বৈজ্ঞানিক উভয়েই প্রকৃতির আরাধনা করেন ও উভয়ের প্রাণই এক উন্মত্ত মাদকতায় বিভোর—তবে এতদুভয়ের মধ্যে প্রভেদ পূজার প্রণালীতে। কবি ও বৈজ্ঞানিক উভয়কেই কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়—"কিন্তু কবি কল্পনা করেন মিথ্যাসৃষ্টি করিতে, বৈজ্ঞানিক করেন প্রকৃতির রাজ্যে প্রবেশ করিতে।" রাসায়নিক, জড়বিজ্ঞানবিদ্, উদ্ভিদ্‌বেত্তা প্রভৃতি সকলেই প্রকৃতির গূঢ়রহস্য প্রকাশ করিতে নিযুক্ত। প্রকৃতির অভ্যন্তরে কি অপূর্ব্ব মধুরতাময় কবিত্ব লুক্কায়িত আছে, তাহা লোকসমক্ষে প্রচার করিবার জন্য বৈজ্ঞানিক জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন ও কত স্থানে ব্যর্থমনোরথ হইয়াছেন। প্রকৃতি অত্যন্ত মায়াময়ী—অথচ যে সৌভাগ্যবান্ একবার তাঁহার অনুগ্রহের কণিকামাত্র পাইয়াছে, সে কিছুতেই তাহার সঙ্গ ছাড়িবে না। বৈজ্ঞানিকের জীবন নীরস নহে—অনেকসময় কবির তুলনায় বৈজ্ঞানিকের জীবন অধিকতর সরসতাপূর্ণ বলিয়া প্রতীত হয়—তবে সেই সরসতা প্রণিধান করিতে হইলে কিঞ্চিৎ সুকৃতি আবশ্যক।

জগতে প্রকৃত বন্ধু অত্যন্ত বিরল। চুম্বকের ও লৌহের মধ্যে যেরূপ আকর্ষণী শক্তি আছে, প্রকৃত বন্ধুদের মধ্যে সেইরূপ প্রাণের টান থাকা চাই। "চুম্বকের এমনই গুণ, তার কাছে থাকিলেই লোহা চুম্বক হইয়া পড়ে। কিন্তু লোহায় ঘা দেওয়া চাই, পেটা চাই। এইজন্যই জাহাজগুলা কারখানায় ঘা খাইয়া বলশালী প্রকাণ্ড চুম্বক হইয়া বাহির হয়। দুই মিত্রের মধ্যে একজন চুম্বক, অপরজন লোহা। কিন্তু জেনো, সংসারের জ্বালারূপ আঘাত না পাইলে চুম্বকের গুণ প্রকাশিত হয় না, কিংবা হইলেও তাহা স্থায়ী হয় না।"

সমালোচনা কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হইয়া পড়িল, সুতরাং আর একটিমাত্র প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া এই প্রবন্ধের পরিসমাপ্তি করিব। "তুমি কেন,—সংসারে কেউ কারও কথা শুনিতে চায় না, সবাই শোনাতে চায়; সবাই কথক, শ্রোতা কেহ নাই।" এই মন্তব্যটি অন্য কোন দেশে প্রযোজ্য কি না, তাহা জানি না—তবে আমাদের এই হতভাগ্য দেশে এই কথাটি প্রতি অক্ষরে সত্য। অনেকদিন পূর্ব্বে কবি বলিয়াছিলেন—

"জলে বাসা বাঁধিয়াছি
ডেঙায় বড় কিচিমিচি
যেথা সবাই গলা জাহির করে
সবাই চেঁচায় মিছামিছি।"

সেদিন কোন রঙ্গমঞ্চে শুনিলাম যে, একজন অভিনেতা অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিতেছেন, তিনজন বাঙালীর দুইটি মত হইতে পারে না; তাহারা প্রত্যেকেই স্বীয় স্বাতন্ত্র্যরক্ষার জন্য ব্যস্ত; সুতরাং তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন তিনটি মত হইবে। আমাদের দেশে যেরূপ ব্যক্তিগত বাদবিসংবাদ, এরূপ বোধ হয় অন্য কোন দেশে নাই। নিরক্ষর পল্লিবাসীদের সমাজ-শাসন হইতে আরম্ভ করিয়া জাতীয় মহা-সমিতি, জাতীয় শিক্ষাসমিতি প্রভৃতি সমস্ত বিষয়েই আমাদের দেশে দলাদলি—সকলেই নিজের মত জাহির করিতে ব্যগ্র—প্রত্যেকেই ভাবে যে, তাহার মত পণ্ডিত বোধ হয় আর কেহ নাই। একজন সমাজপতি অথবা দলপতির আদেশবাণী শিরোধার্য্য করিয়া কাজ করিতে আমরা এখনও শিক্ষা পাই নাই এবং সেই কারণেই আমাদের এত দুর্গতি। আমাদের দেশে কথক অনেক হইয়াছেন, কথাও ঢের হইয়াছে—কিন্তু কথা অনুসারে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লোক কোথায়?

নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও যোগেশবাবু এই প্রবন্ধগুলি সম্পাদন করিয়া দেশের ও ভাষার প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছেন। আশা করি, প্রবন্ধলেখকের অপর পত্রগুলিও অতি শীঘ্র যোগেশবাবুকর্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইবে।

শ্রীহেমচন্দ্র দাস গুপ্ত।

প্রাচীন সামাজিক চিত্র।

২

গ্রাম্যস্থিতি।

রাজার কর্ত্তব্য হইতেছে যে,তিনি নগরে গৃহাদি-নির্ম্মাণ করাইয়া ও যথোচিত বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া বেদবিদ্যাবিৎ অগ্নিহোত্রী শ্রোত্রিয় বিপ্রগণকে স্থাপিত করিবেন ও বলিবেন যে, আপনার "স্বধর্ম্ম" পালন করুন। তাঁহাদের নিকট হইতে কর গৃহীত হইত না, প্রত্যুত নরপতি ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারিগণের অব-বোধের জন্য তাম্রশাসনাদিতে লিখিয়া তাঁহা-

দিগকে গৃহভূমি প্রভৃতি প্রদান করিতেন (যাজ্ঞবল্ক্য ও বৃহস্পতি)। তাঁহারা পৌরগণের নিত্যনৈমিত্তিক, শান্তিক ও পৌষ্টিক কর্ম্ম-সকল সম্পন্ন করিতেন ও সন্দিগ্ধ বিষয়ের নির্ণয় করিয়া দিতেন।

গ্রামনগরাদিতে যখন কোন সাধারণ বিপত্তি উপস্থিত হইত বা কোন সাধারণ ধর্ম্ম-কার্য্য আসিত, তখন যাহাতে সকলেই ঐকমত্য অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিতে পারে, তজ্জন্য পূর্ব্বেই সকলে মিলিত হইয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেন। প্রতিজ্ঞা সময়ে-সময়ে পত্রে লিখিত হইত, অথবা মৌখিক থাকিত। এই সমস্ত কার্য্য রাজা করিতেন না; গ্রাম বা নগরে এজন্য শুচি, দক্ষ, ক্ষান্ত, বেদধর্ম্মজ্ঞ, সৎকুলজ, সর্ব্বকার্য্যপ্রবীণ মহত্তম লোকেরা ঐ সকল কার্য্যে অধিকৃত হইতেন। বিদ্বেষী, ব্যসনী, শালীন (লজ্জাশীল), অলস, ভীরু, লুব্ধ, অতিবৃদ্ধ ও অতিবালককে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করা হইত না এতাদৃশ লোক দুই, তিন বা পাঁচ জন থাকিতেন। ইঁহারা 'সমূহহিতবাদী' (বৃহস্পতি)। সাধারণ ধর্ম্ম ও বিপত্তি ভিন্ন অন্যত্র গ্রামবাসি-গণের পরস্পর বিবাদস্থলেও ইঁহারা বিবাদ-মীমাংসা করিতেন। গ্রামবাসিগণকে ইঁহাদের কথা অবশ্য শুনিতে হইত; তাহা না হইলে রাজদ্বারে 'প্রথমসাহস'দণ্ডে * দণ্ডিত হইতে হইত। † কার্য্যচিন্তক সমূহহিতবাদীর যুক্তি-যুক্ত বচন গ্রহণ না করিয়া যে ব্যক্তি তাঁহাকে বাধা প্রদান করিত বা নিজে অযুক্তবচন বলিত, তবে তাহাকেও ঐ প্রথমসাহসদণ্ড গ্রহণ করিতে হইত (কাত্যায়ন)। গ্রামবাসিগণ যাহাতে স্বকৃত সময় (নিয়ম) হইতে পরিভ্রষ্ট না হয়, রাজাকে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইত। পারম্পরিক যাহার যে আচার থাকে, বা যাহার যাদৃশ জীবিকা, রাজা তাহাই অনুমোদন করিতেন।

সকলকেই স্বধর্ম্মে অবস্থান করিয়া 'সমূহ'-নিয়ত অর্থাৎ সমূহের হিতের নিমিত্ত ব্যবস্থাপিত ধর্ম্ম পালনপূর্ব্বক সমস্ত কার্য্য করিতে হইত।‡ কোন সভা, প্রপা, দেবগৃহ, তড়াগ, বা আরামের সংস্কার, অথবা অনাথ দরিদ্রব্যক্তির সংস্কার (সাহায্যপ্রদান করিয়া দুঃখমোচন), কোন দেবপূজা, কুলায়ন §-(সাধারণস্থান)-নির্ম্মাণ, দুর্জ্জনপ্রবেশনিরোধ প্রভৃতি কার্য্য উপস্থিত হইলে সকলে সমবেত হইয়া 'সময়' করিতেন যে, তাঁহারা অংশানুসারে সেই সমস্ত কার্য্য করিবেন। এই 'সময়'ক্রিয়া লিখিয়া রাখা হইত। সকলেই তাহা পালন করিতে বাধ্য। যে ব্যক্তি সমর্থ হইয়াও তাহাতে বিসংবাদ করে, তাহার সর্ব্বস্বহরণ বা নির্ব্বাসন অথবা ঐ উভয় দণ্ডই হইত (যাজ্ঞবল্ক্য)।॥ সেই

* সাহস ত্রিবিধ—প্রথম, মধ্যম ও উত্তম। নারদ বলেন, প্রথমসাহসদণ্ড—শতাধিক পণ, মধ্যম—পঞ্চশতাধিক, উত্তম—অবস্থাবিশেষে বধ, সর্ব্বস্বহরণ, গাত্রে চিহ্ন প্রদানপূর্ব্বক নির্বাসন ও অঙ্গচ্ছেদ। প্রথম ও মধ্যম সাহসে দণ্ডভোগ করার পর ঐ অপরাধী ব্যবহার্য্য হয়; উত্তমসাহসে দণ্ডিত ব্যক্তির সহিত সম্ভাষণ পর্য্যন্তও নিষিদ্ধ। দণ্ডনীতিনামক প্রবন্ধে এ বিষয় সবিস্তর লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

† কর্ত্তব্যং বচনং সর্ব্বৈঃ সমূহহিতবাদিনাম্। যস্তত্র বিপরীতঃ স্যাৎ স দাপ্যঃ প্রথমং দমম্॥ যাজ্ঞবল্ক্য।

‡ "সমূহানান্তু যো ধর্ম্মস্তেন ধর্ম্মেণ তে সদা। প্রকুর্য্যুঃ সর্ব্বকার্য্যাণি স্বধর্ম্মেষু ব্যবস্থিতাঃ॥" কাত্যায়ন।

§ "কুলায়নং কুলানন্ত অয়নমিতি" বিবাদরত্নাকরে ঠক্কুরচণ্ডেশ্বরঃ।

॥ "সভাপ্রপাদেবগৃহতড়াগারামসংস্কৃতিঃ। তথানাথদরিদ্রাণাং সংস্কারো যজনক্রিয়া॥

সময়ক্রিয়াতে যে ব্যক্তি ভেদ উৎপাদন বা উপেক্ষা প্রদর্শন করিত, তাহাকে চারি-সুবর্ণ অথবা ৩২০ তিনশত-বিংশতি-রতি রজত দণ্ড-স্বরূপে রাজাকে দিতে হইত। * যে সকল ব্যক্তি গণমধ্যে পরস্পর ভেদ উৎপাদন করিয়া দিত, তাহাদিগকে বিশেষরূপে শাসন করা হইত। † সাধারণের দ্রব্যাপহারী অথবা হিংসাকারীর নির্ব্বাসন দণ্ড ছিল। ‡

নগর বা দুর্গস্থিত গণাধ্যক্ষগণ § গণান্তর্গত পাপকারী ব্যক্তিবর্গকে ধিক্কার প্রদান করিয়া শাসন বা পরিত্যাগ করিতেন। গণাধ্যক্ষগণ স্বধর্ম্মানুসারে লোকদের যেরূপ অনুগ্রহ বা নিগ্রহ ব্যবস্থা করিতেন, রাজারও তাহা অনু-মোদিত হইত। ||

যদি দ্বেষসংযুক্ত হইয়া পরস্পর সম্মেলন-পূর্ব্বক কেহ কেহ কোন গণাধ্যক্ষের বাধা উপস্থিত করিত, তবে রাজাই তাহাদিগকে নিবারণ ও শাসন করিতেন। মুখ্য বা গণাধ্যক্ষসমূহের সহিত তদন্তর্গত লোকের বিসংবাদ উপস্থিত হইলে রাজা বিচার করিয়া তাহাদিগকে স্বস্ব ধর্ম্মে স্থাপন করিতেন। ¶

এক সম্প্রদায়ের মধ্যে যাহারা পরস্পর এক পাত্রে বা এক পংক্তিতে ভোজন করিয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি যদি অকারণে তাহা পরিত্যাগ করিত, তবে তাহাকে দণ্ডিত হইতে হইত (কাত্যায়ন)।

'সমূহ'কার্য্যের জন্য যে সকল ব্যক্তি রাজার নিকটে গমন করিতেন, কার্য্যশেষ হইলে রাজা সমুচিত দান, মান ও সৎকারে তাঁহাদিগের সংবর্দ্ধনা করিয়া বিদায় দিতেন। **

'সমূহ'কার্য্যে প্রেরিত হইয়া কোন ব্যক্তি কিছু লাভ করিলে তাহা 'সমূহ'কে অর্পণ করিতে হইত, নতুবা যাহা প্রাপ্ত হইত, তাহার একাদশ-গুণ তাহার নিকট হইতে আদায় করা হইত। ††

ঐ ধন সকলের সাধারণ, মাসান্তে বা ষণ্মাসান্তে সুবিধামত তাহা বিভক্ত করিয়া লওয়া হইত,

কুলায়নং নিরোধশ্চ কার্য্যমস্মাভিরংশতঃ। যত্রৈতল্লিখিতং সম্যক্ ধর্ম্ম্যা সা সময়ক্রিয়া॥
পালনীয়া সমস্তৈস্তু, যঃ সমর্থো বিসংবদেৎ। সর্ব্বস্বহরণং দণ্ডস্তস্য নির্বাসনং পুরাৎ॥ বৃহস্পতি।

* "তত্র ভেদমুপেক্ষাং বা যঃ কশ্চিৎ কুরুতে নরঃ। চতুঃসুবর্ণা ষট্‌নিষ্কা দণ্ডস্তস্য বিধীয়তে॥ বৃহস্পতি।
"নিগৃহ্য দাপয়েদেনং সময়ব্যভিচারিণম্। চতুঃসুবর্ণান্ ষট্‌নিষ্কান্ শতমানঞ্চ রাজতম্।" মনু।

† "পৃথগ্‌গণাংশ্চ যে ভিন্দ্যুস্তে বিনেয়া বিশেষতঃ। আবহেয়ুর্ভয়ং ঘোরং ব্যাধিবৎ তে হ্যুপেক্ষিতাঃ॥" নারদ।

‡ "গণদ্রব্যং হরেদ্‌যস্তু সংবিদং লঙ্ঘয়েত্তু যঃ। সর্ব্বস্বহরণং কৃত্বা তং রাষ্ট্রাদ্‌বিপ্রবাসয়েৎ॥" যাজ্ঞবল্ক্য।
"যস্তু সাধারণং হিংস্যাৎ ক্ষিপেৎ ত্রৈবিদ্যমেব বা। সংবিৎক্রিয়াং বিহন্যাচ্চ সনির্বাস্যস্ততঃ পুরাৎ॥" বৃহস্পতি।

§ ব্রাহ্মণাদি এক এক বর্ণের সমূহ পৃথক্ পৃথক্ নামে পূর্ব্বে অভিহিত হইত, যথা—ব্রাহ্মণসমূহ 'গণ', বণিক্-সমূহ 'পূগ', জৈন ও বৌদ্ধ সমূহ 'সঙ্ঘ', চণ্ডাল প্রভৃতির সমূহ 'গুল্ম', গৃহীতসন্ন্যাসত্যাগিসমূহ 'পাষণ্ড', শিল্পি-সমূহ 'শ্রেণী', ইত্যাদি। 'গণ', 'সঙ্ঘ' প্রভৃতি সকলের এক নাম 'বর্গ' (কাত্যায়ন)। আমাদের বক্ষ্যমাণ আলোচ্য শ্লোকে 'কুল', 'শ্রেণী' ও 'গণ' পদ অন্যান্য 'সমূহে'র উপলক্ষক। আলোচনা করিলে এইরূপই প্রতীয়মান হয়।

|| "কুলশ্রেণীগণাধ্যক্ষাঃ পুরদুর্গনিবাসিনঃ। বাগ্‌ধিগ্‌দমং পরিত্যাগং প্রকুর্য্যুঃ পাপকারিণাম্॥
তৈঃ কৃতং যৎ স্বধর্ম্মেণ নিগ্রহানুগ্রহং নৃণাম্। তদ্রাজ্ঞাপ্যনুমন্তব্যং নিসৃষ্টার্থা হি তে স্মৃতাঃ॥" বৃহস্পতি।

¶ বাধাং কুর্য্যুর্যদৈকস্য সম্ভূতা দ্বেষসংযুতাঃ। রাজ্ঞা তে বিনিবার্য্যাস্তু শাস্যাশ্চৈবানুবন্ধিনঃ॥
মুখ্যৈঃ সহ সমূহানাং বিসংবাদো যদা ভবেৎ। তদা বিচারয়েদ্রাজা স্বধর্ম্মে স্থাপয়েচ্চ তান্॥" বৃহস্পতি।

** "সমূহকার্য্য আয়াতান্ কৃতকার্য্যান্ বিসর্জ্জয়েৎ। সদানমানসৎকারৈঃ পূজয়িত্বা মহীপতিঃ॥ যাজ্ঞবল্ক্য।

†† "সমূহকার্য্যপ্রহিতো যল্লভেত তদর্পয়েৎ। একাদশগুণং দাপ্যো যদ্যসৌ নার্পয়েৎ স্বয়ম্॥" যাজ্ঞবল্ক্য।

অথবা বালিশ, বৃদ্ধ, অন্ধ, স্ত্রী, বাল, আতুর বা রোগীকে প্রদান করা হইত, অথবা পূর্ব্বোক্ত স্থান ভিন্ন সাধারণে কর্ত্তব্য বলিয়া যাহা স্থির করিত, সেই স্থানে তাহার ব্যয় হইত। *

গণ বা সমূহের প্রয়োজন আছে বলিয়া যে ব্যক্তি ঋণ গ্রহণ করিয়া সমূহকার্য্যে ঐ ঋণলব্ধ অর্থের বিনিয়োগ না করিয়া আত্মসাৎ করিত, তবে ঐ ঋণগ্রহণকারীকে সেই অর্থ প্রদান করিবার জন্য বাধ্য করা হইত। সমূহের যদি পূর্ব্বে কিছু ঋণ থাকিত, আর তাহার পর কোন ব্যক্তি ঐ সমূহের মধ্যে প্রবেশ করিত, তবে তাহাকেও ঐ ঋণের অংশ গ্রহণ করিতে হইত। সমূহের মধ্যে যে ব্যক্তি যতদিন থাকিত, সে ততদিন সমূহসম্বন্ধীয় ভোজ্য, বৈভাজ্য (ধান্যাদি), দানধর্ম্মাদি সর্ব্বত্রই অধিকারী হইত, তাহা হইতে বহির্ভূত হইলে আর তাহার অধিকার থাকিত না। †

শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী।

অক্ষরের প্রকৃতি ও স্বরবর্ণোচ্চারণ।

অক্ষরের দুই অবস্থা—এক লিখিত, আর শব্দিত; সেই লিখিত ভাবকে বর্ণ এবং শব্দিত ভাবকে অক্ষর বলা যাইতে পারে। লিখিতাবস্থাকে বর্ণ বলার কারণ এই যে, কালো কিংবা রক্তিম কিংবা অন্য কোন বর্ণ দ্বারা তাহা লিপি করিতে হয়, আর শব্দিতাবস্থাকে অক্ষর বলার কারণ এই যে, তাহার ক্ষয় নাই, তাহা অবিভাজ্য। অ বলিতে যে শব্দটি হয়, তাহাকে বিভাগ করা যায় না। সেইপ্রকার আ, ই, ক, খ ইত্যাদি বর্ণ উচ্চারণ করিলে যে সকল শব্দ উৎপন্ন হয়, তাহারা প্রত্যেকে অবিভাজ্য। লিখিতাবস্থাকে অক্ষর বলা যায় না, কারণ লিখিতবর্ণ অবিভাজ্য নহে, তাহা রেখাদ্বারা গঠিত, সুতরাং সেই রেখাসকলকে ইচ্ছামত বিভাগ করা যায়; কিন্তু তাহাদের শব্দিতাবস্থা বিভাজ্য নহে। অ বলিতে যে শব্দ হয়, তাহাকে ভাগ করা যায় না। অতএব বর্ণমালার লিখিতাবস্থাকেই বর্ণ বলা উচিত, তাহাকে অক্ষর বলা সঙ্গত নহে। আর শব্দিতাবস্থাকে অক্ষর বলিতে হয়, বর্ণ বলিলে অর্থসঙ্গতি হয় না, কারণ তাহাতে কালো কিংবা রক্তিমাদি বর্ণ নাই; কিন্তু উভয় অবস্থার সমষ্টিকে ব্যবহারত বর্ণ এবং অক্ষর উভয়ই বলা হইয়া থাকে।

বর্ণসকল দুই ভাগে বিভক্ত—স্বর এবং

* "ততো লভ্যেত যৎকিঞ্চিৎ সর্ব্বেষামেব তৎ সমম্। ষাণ্মাসিকং মাসিকং বা বিভক্তব্যং যথাংশতঃ ॥
দেয়ং বালিশবৃদ্ধান্ধস্ত্রীবালাতুররোগিষু। সন্তানিকাদিষু তথা এব ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥
যত্তৈঃ প্রাপ্তং রক্ষিতঞ্চ গণার্থং বা প্রকল্পিতম্। রাজপ্রসাদলব্ধঞ্চ সর্ব্বেষামেব তৎ সমম্ ॥" বৃহস্পতি।

† "গণমুদ্দিশ্য যৎকিঞ্চিৎ কৃত্বর্ণং ভক্ষিতং ভবেৎ। আত্মার্থং বিনিযুক্তং বা দেয়ং তৈরেব তদ্ভবেৎ ॥
গণানাং শ্রেণিবর্গানাং গতাঃ স্যুর্যে তু মধ্যতাম্। প্রাক্তনস্য ধনর্ণস্য সমাংশাঃ সর্ব্ব এব তে ॥
তথৈব ভোজ্যবৈভাজ্যদানধর্ম্মক্রিয়াসু চ। সমূহস্থোংশভাগী স্যাৎ প্রগতস্ত্বংশভাক্ ন তু ॥" কাত্যায়ন।

ব্যঞ্জন। অকারাদি বর্ণ স্বত শব্দিত বা ধ্বনিত বা স্বরিত হয়, এইজন্য তাহাদিগকে স্বর বলে, স্বরশব্দের অর্থ ধ্বনি বা শব্দ। অতএব যে বর্ণ স্বত স্বরিত বা ধ্বনিত হয়, তাহাকে স্বর কহে। আর ককারাদি বর্ণসকল স্বত ধ্বনিত বা স্বরিত হয় না, এইজন্য তাহারা স্বরবাচ্য নহে। তাহাদিগকে ব্যঞ্জনবর্ণ বলা যায়; কারণ,স্বরের সাহায্য ব্যতিরেকে তাহারা শব্দিতাবস্থা প্রাপ্ত হয় না, তাহারা স্বত কেবল মসি বা অঞ্জনাবস্থাতেই বর্ত্তমান থাকে, অর্থাৎ তাহারা একমাত্র 'লিখিতাবস্থাতেই' বর্ত্তমান থাকে। স্বরবর্ণ দুই অবস্থাতেই স্বত বর্ত্তমান; কিন্তু ককারাদি কেবলমাত্র অঞ্জনাবস্থাতেই বর্ত্তমান আছে, হয় ত এইজন্যই তাহাদের নাম ব্যঞ্জনবর্ণ হইয়াছে, এইরূপ অনুমান করা যায়।

সাহিত্যে, অলঙ্কারে ব্যঞ্জনশব্দের অর্থ প্রকাশ, কিন্তু সেই অর্থ এস্থলে সংলগ্ন হয় না। চলিতভাষায় ইহার অর্থ ভোজ্যান্নের উপকরণ। আমরা কেবল অঞ্জনাত্মক বর্ণকে ব্যঞ্জনবর্ণ বলাই অধিক সঙ্গত মনে করি। অকারাদি স্বরবর্ণসকল স্বরাত্মক এবং অঞ্জনাত্মক, কিন্তু ককারাদি বর্ণ কেবল অঞ্জনাত্মক, কেবল অঞ্জনেই তাহাদের প্রকাশ, তাহারা স্বরের সাহায্য ব্যতীত শব্দাকারে প্রকাশিত হয় না।

ব্যঞ্জনবর্ণ স্বতন্ত্রভাবে শব্দ নহে, স্বরই শব্দ এবং শব্দই ভাষা; অতএব স্বরবর্ণ ই ভাষার মূল। ব্যঞ্জনবর্ণসকল স্বরে যুক্ত হইয়া স্বরকে বিভিন্ন রূপ প্রদান করে, তাহারা স্বর বা শব্দের গুণমাত্র; যথা—প বলিতে যেরূপে ওষ্ঠদ্বয় মিলিত করিতে হয়, সেইভাবে ওষ্ঠ মিলিত করিয়া অকারধ্বনি করিলে উক্ত অকারের উচ্চারণ প হয়। ন বলিতে যেমন দন্তের সহিত জিহ্বাগ্রকে মিলাইতে হয়, সেইভাবে মিলাইয়া অকার উচ্চারণ করিলে সেই অকার ন-রূপ ধারণ করিয়া বহির্গত হয়। ক বলিতে যেভাবে জিহ্বামূলকে কণ্ঠের সহিত মিলাইতে হয়, সেইভাবে মিলাইয়া-ধরিয়া তৎপরে অ উচ্চারণ করিলে তাহা ক হইয়া আবির্ভূত হয়; অতএব প, ন, ক উক্ত অকারকেই বিভিন্নপ্রকার উচ্চারণ প্রদান করে। ব্যঞ্জন শব্দ নহে, স্বরই শব্দ, ব্যঞ্জন তাহার বৈচিত্র্যবিধায়ক গুণমাত্র।

উচ্চারণ।

"ভাষাতত্ত্ব" প্রথমখণ্ডে বলা হইয়াছে যে, আমাদের সংস্কৃত এবং কথিত ভাষার মধ্যে যে পার্থক্য, তাহার প্রধান কারণ উচ্চারণদোষ; আমরা সংস্কৃতও উচ্চারণ করিতে জানি না এবং বাঙলাও যেপ্রকার লিখিয়া থাকি, সেইপ্রকার উচ্চারণ করি না। বলা বাহুল্য যে, উচ্চারণই ভাষার মূল; তাহার ব্যতিক্রম হইলে ভাষাই বিভিন্ন বলিয়া বোধ হয়। মনে করুন, ইষ্ শব্দের অর্থ আশ্বিনমাস, আবার ইস্ বলিতে সাধারণ ভাষাতে আশ্চর্য্যের ভাবও বুঝায়, আর ঈশ্ অর্থ ঈশ্বর, এবং ঈষ্ অর্থ লাঙলের ফলা। ইহাদের সকলের যদি একপ্রকার উচ্চারণ করি, তবে শ্রোতা কি অর্থ বুঝিবে? ইহা-শব্দের অর্থ এই বস্তু বা কার্য্য কিংবা ভাব, ঈহা অর্থ চেষ্টা, কিন্তু উচ্চারণ আমরা একইপ্রকার করিয়া থাকি। আমাদের নিকট হ্রস্বদীর্ঘের প্রভেদ নাই; ইংরেজীভাষাতে steel শব্দকে যদি still উচ্চারণ করা যায়, তবে তাহার সম্পূর্ণ বিভিন্নার্থ

হয়। এইপ্রকার উচ্চারণদোষ না ঘটিতে পারে,তজ্জন্ত ব্যাকরণে প্রত্যেক বর্ণের উচ্চারণস্থান কণ্ঠ, তালু প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া আছে এবং হ্রস্ব, দীর্ঘ,অল্পপ্রাণ, মহাপ্রাণ এমনভাবে দেখান আছে যে, অন্য কোন ভাষার বর্ণমালায় এইরূপ বৈজ্ঞানিক সন্নিবেশ দেখিতে পাওয়া যায় না, এইজন্য আমাদের প্রত্যেক অক্ষরের উচ্চারণসম্বন্ধে নিম্নে আলোচনা করিতেছি।

ওঁ

বর্ণস্ফূর্ত্তির পূর্ব্বে মুখ মুদ্রিত করিয়া যে শব্দ করা যায়, তাহা ওঁ হয়। ইহাকে ঋষিগণ শব্দের আদি জ্ঞান করিয়া নিজস্ব করিয়া রাখিয়াছেন ; তাহা ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য জাতির শিখিবার বা উচ্চারণ করিবার অধিকার নাই। সৃষ্টিতত্ত্বমধ্যে যেমন আকাশ,—য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ যাহাকে ether বলেন,—শব্দতত্ত্বে ওঁশব্দটি সেইরূপ। ইহাই সর্ব্বপ্রকার বর্ণের ভিত্তিভূমি ; যেমন এই দৃশ্যমান জগতের যাবতীয় পদার্থের অবলম্বন আকাশ বা ether, তাহাতেই সকলের স্থিতি, সেইরূপ যাবতীয় অক্ষর বা শব্দ এই ওঁশব্দে স্থিতি করিতেছে এবং তাহারা ইহারই বিভিন্নপ্রকার বিকাশমাত্র। মুখ মুদ্রিত করিয়া ওঁ শব্দ করিতে করিতে সাধারণমত মুখব্যাদান করিলেই অ-অক্ষর স্ফুরিত হয়, এবং অধিক ব্যাদান করিলে আ হয়, তৎপরে বিভিন্নভাবে মুখব্যাদান করিলে ই, ঈ, উ, ঊ, এ, ঐ, ও, ঔ ইত্যাদি শব্দের উৎপত্তি হয়, ইহারা উক্ত আদিবর্ণেরই প্রকারান্তরমাত্র। ওঁকার উচ্চারণ করিতে করিতে মুখমধ্যস্থিত উচ্চারণস্থান ও জিহ্বাযন্ত্রের বিভিন্নভাব করিয়া মুখব্যাদান করিলে ভিন্ন ভিন্ন অক্ষর সূচিত হয়। এইপ্রকারে দেখিতেছি,স্বর-ব্যঞ্জন উভয় প্রকারের সকল বর্ণেরই ভিত্তিভূমি সেই ওঁকার।

পূর্ব্বে, এমন কি আমরাও বাল্যকালে দেখিয়াছি, ক খ লিখিতে আরম্ভ করিতেই সর্ব্বপ্রথমে একটি বর্ণ লিখিতে হইত, তাহাকে আজি বলিত। ঐ আজিটি ওঁ-অক্ষরের খণ্ডরূপমাত্র, কারণ সম্পূর্ণ ওঁ লিখিবার অধিকার ব্রাহ্মণেতর জাতির ছিল না, এবং উহাকে ওঁ না বলিয়া আজি বলিত, কারণ ওঁকার উচ্চারণ করিবার অধিকারও সাধারণের ছিল না। "ভাষাতত্ত্ব" প্রথমখণ্ডে দেখান গিয়াছে যে, উচ্চারণব্যতিক্রমের নিয়মানুসারে দ স্থানে জ উচ্চারণ হয়, যথা—বন্দর = বাঁজার = বাজার ; মধ্য = মঝ, অদ্য = আজ, ইত্যাদি। সেইপ্রকারে আদি = আজি ; এইজন্য উক্ত আদি অক্ষরকে আজি বলিত ; এক্ষণে আর বর্ণমালায় সেই আজি-অক্ষরটি নাই। উহার অর্থ কি এবং ব্যবহার কি, তাহা না জানিতে পারিয়া কাজেই আধুনিক ভাষার নেতাগণ তাহাকে বর্ণমালা হইতে তিরোহিত করিতে বাধ্য হইয়াছেন ; কিন্তু এখন দেখিতেছি, উহাকে আদিবর্ণ বলিয়া সর্ব্বাগ্রে স্থান দিয়া বর্ণমালার এই মহা-বৈজ্ঞানিক-ভাবটি রক্ষা করা অসঙ্গত নহে।

অ

অকারের উচ্চারণ দুইপ্রকার—এক স্বাভাবিক, আর তদপেক্ষা মৃদু। অনন্ত, অপূর্ব্ব, অন্ধ ইত্যাদি শব্দে অকারের উচ্চারণ স্বাভাবিক, কিন্তু অধীন, অকূল, অভিলাষ ইত্যাদি শব্দে উহার মৃদুচ্চারণ হইয়া থাকে। বর্ণবিশেষের কোন্ কোন্ স্থলে

প্রশস্ত বা মৃদু উচ্চারণ হয়, তাহার শিক্ষা শুনিয়া শুনিয়াই হয়, পুস্তকপাঠদ্বারা হয় না, এইজন্য কেহ কেহ বলেন, বিদেশীয় লোকের শিক্ষার সুবিধার জন্য অভিধানে বর্ণবিশেষের উপর মৃদু বা প্রশস্ত উচ্চারণের কোন চিহ্ন দেওয়া হইলে সুবিধা হয়।

ইংরেজীতে অক্ষরের অল্পতাহেতু স্থলবিশেষে বর্ণবিশেষের উচ্চারণবৈষম্য চিহ্নদ্বারা নির্দ্দেশ করার নিয়ম আছে। সুতরাং আমাদের অভিধানে উক্তরূপ চিহ্ন ব্যবহার করিলে ক্ষতি নাই, কিন্তু শব্দবিশেষের উপর চিহ্নদ্বারা উচ্চারণনির্দ্দেশ করিতে হইলে যেন ইহাই বুঝায় যে, এই বিষয়ে আমাদের ভাষা নিয়মবর্জ্জিত; কারণ, নিয়ম থাকিলে আর চিহ্নের প্রয়োজন কি? এই প্রশ্ন করিয়া প্রণিধানপূর্ব্বক দেখিতেছি, ইহাও নিয়মবহির্ভূত নহে। দেখিতেছি, অকারের পরবর্ত্তী প্রথম স্বর যদি ইকার কিংবা উকার থাকে, তবে অকারের মৃদুচ্চারণ হয়, যথা অনিল, অধুনা, অকিঞ্চিৎ, অতুল, অম্বুজ, অসীম, অনিত্য, অবিনাশ, অনুমান ইত্যাদি। অকারের পর প্রথম স্বর যদি ই, ঈ, উ, ঊ ভিন্ন অন্য স্বর থাকে, তবে তাহার প্রশস্তোচ্চারণ হয়, যথা—অখণ্ড, অব্যক্ত, অস্ত, অপহার, অভ্রান্ত, অশান্ত, অদেয়, অপেয়, অনেক, অনৈক্য, অশেষ, অক্ষত, অতৃপ্ত, অমোঘ, অশৌচ ইত্যাদি। অকারের পর অনুস্বার-বিসর্গ থাকিলে তাহাদের পর যে স্বর থাকে, অকারের উচ্চারণ তাহার অনুযায়ী হয়, অর্থাৎ তদনুসারে মৃদু বা প্রশস্ত হয়, যথা—অংশ প্রশস্ত, কিন্তু অংশী মৃদু। অর্থাৎ অনুস্বার-বিসর্গকে এস্থলে অগ্রাহ্য করিয়া তাহার পরবর্ত্তী স্বরকেই অকারের পর প্রথম স্বর গণ্য করিতে হয়। তাহার কারণ অনুস্বারবিসর্গশীর্ষক প্রবন্ধে পরে বিবৃত হইবে। এই সকল নিয়ম ব্যাকরণে নাই, তাহার কারণ এই যে, ভাষায় ভাবভঙ্গি অনন্তপ্রকার, তাহা সম্যক্‌রূপে ব্যাকরণে উঠিতে পারে না।

উপরে অকারের প্রশস্ত ও মৃদু উচ্চারণের নিয়ম প্রদর্শিত হইয়াছে, কিন্তু নিয়মমাত্রেরই মূলে তাহার বৈজ্ঞানিক কারণ নিহিত থাকে। অতএব অকারের এই উচ্চারণভেদের বৈজ্ঞানিক কারণানুসন্ধান করার প্রয়োজন; কারণ, নিয়মের মৌলিক বিজ্ঞান না জানিলে নিয়মকে অন্ধের ন্যায় চালন ও পালন করিতে হয়; বিজ্ঞান জানিলে নিয়মের দোষগুণ সমালোচনা করা যাইতে পারে। অতএব এই নিয়মের মূলানুসন্ধান করা যাইতেছে। স্বরবর্ণের মধ্যে ইকার এবং উকার সর্ব্বাপেক্ষা মৃদু অর্থাৎ তাহারা অল্পায়াসে উচ্চারিত হয়, তাহাদের উচ্চারণে অধিক মুখব্যাদান করিতে হয় না। ইকারের প্রশস্তোচ্চারণ একার এবং উকারের প্রশস্তোচ্চারণ ওকার। হরি বলিয়া দীর্ঘস্বরে ডাকিলে হরি=ই, ই, ই, এ, এ হইয়া আসে। এইজন্য ই, উ বর্ণদ্বয়কে মৃদুস্বর বলা যায়, অকারের পর ঐ দুই মৃদুস্বর থাকিলে তাহার সহিত সামঞ্জস্য রাখার জন্য অকারের মৃদুচ্চারণ হওয়া স্বাভাবিক। উপরোক্ত নিয়মের ইহাই বিজ্ঞান।

এ

অকারের ন্যায় একারেরও উচ্চারণদ্বৈধ আছে। বনে, মনে, ধনে, প্রাণে, অন্বেষণ, অশেষ, বিশেষ, অনেক, নেপাল, নেতা, ক্রোত

প্রভৃতি শব্দে একারের মৃদুচ্চারণ হইয়া থাকে; কিন্তু হেন, যেন, কেন, এতবার, এতকাল, এখন, কেমন, বেড়া, ভেড়া ইত্যাদি শব্দে একারের উচ্চারণ প্রশস্ত হয়; ইহার মধ্যে বিশেষ কোন নিয়ম পরিলক্ষিত হয় না। আধুনিক লেখকগণ যেস্থানে একারের প্রশস্তোচ্চারণ হইবে, সেস্থানে একারের স্থলে যফলা ও আকার দিয়া থাকেন। যেমন, "নিজেরে না দ্যাখে চক্ষু", "আরে ব্যাটা, তুই কি বলিস্?" অর্থাৎ যেস্থলে দেখে এবং বেটা লিখিয়া একারের প্রশস্তোচ্চারণ করিতে হয়, সেস্থলে একারের পরিবর্ত্তে যফলা ও আকার ব্যবহৃত হইয়াছে। একারের যে একটি মৃদু, আর একটি প্রশস্ত উচ্চারণ আছে, তৎপ্রতি প্রণিধান না করাতেই এইরূপ লেখা হইয়া থাকে, কিন্তু ইহা নিতান্ত ভ্রম-সঙ্কুল; কারণ, "য"র প্রকৃত উচ্চারণ (ই অ)র ন্যায়, তাহাতে আকার দিলে (ই আ) হয়, সুতরাং ব্যা লিখিলে তাহার প্রকৃত উচ্চারণ কথঞ্চিৎ "বিয়া"র ন্যায় হয়, প্রশস্ত "বে"র ন্যায় হয় না। আমরা ঘৃণার্থে "বিয়াটা" বলিতে চাহি না, প্রশস্তোচ্চারিত "বেটা" বলিতে চাহি। ইংরেজী Padশব্দ বাঙলাতে লিখিতে প্যাড্ লিখিয়া থাকে; যদি তাহা ঠিক হইত, তবে বাঙলা ব্যাস, ব্যাধ ইত্যাদি শব্দ ইংরেজীতে bàs, badh ইত্যাদি লিখিতে হইত। কিন্তু ব্যাস এবং basএর উচ্চারণ এক নহে; ব্যাসশব্দকে ইংরেজীতে লিখিতে হইলে byas, লিখিতে হয়; অতএব pad এবং "প্যাড্"এর উচ্চারণ এক হইতে পারে না। সুতরাং প্রশস্ত-একার-স্থলে ষ্যা ব্যবহার করা ঘৃণীয়, য্যা এবং প্রশস্ত "এ"তে উচ্চারণের অনেক প্রভেদ, ইহা জানিয়া উক্ত কুৎসিত ব্যবহার নিরাকরণ করা বিধেয়।

ঐ, ঔ

স্বরবর্ণমধ্যে ঐ এবং ঔ, এই অক্ষরদ্বয়কে স্বতন্ত্রবর্ণ বলা যায় না, ইহাদিগকে যুক্তবর্ণ বলিতে হয়। ইংরেজীতে এইপ্রকার বর্ণকে diphthong কহে। প্রচলিত উচ্চারণানুসারে উহাদিগকে আমরা অই্ এবং অউ্ বলিয়া থাকি। এক্ষণে আমরা জানিতে চাই যে, এই দুই বর্ণ প্রকৃতপক্ষে স্বতন্ত্র কি যুক্ত বর্ণ এবং আমাদের উচ্চারণ ঠিক কি না?

দেখিতেছি, আমাদের ভাষাতে দুই স্বর একত্র হইলে তাহাদের উচ্চারণ যেরূপ হয়, তাহা ব্যাকরণের সন্ধিসূত্রে ব্যবস্থিত আছে, সেই যুক্তোচ্চারণ হইতে চারিটি অতিরিক্ত বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে। যথা—

অ + এ = ঐ

অ + ও = ঔ

ই + অ = য

উ + অ = ব

উক্ত-বর্ণচতুষ্টয়-মধ্যে ঐ এবং ঔ এই দুইটি স্বর, আর য এবং ব এই দুইটি কিঞ্চিৎ-পরিমাণে ব্যঞ্জনের ন্যায়, এইজন্য ইহারা স্বরবর্ণমধ্যে পরিগণিত না হইয়া ব্যঞ্জনবর্ণের শেষভাগে অন্তঃস্থবর্ণমধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহারা যে যুক্তস্বর, তাহা না জানিয়া আমরা ইহাদের অশুদ্ধোচ্চারণ করিয়া থাকি। যখন "অ" এবং "এ"র যোগে ঐকারের উৎপত্তি, তখন উহার উচ্চারণ অই্ না হইয়া অএ্ অর্থাৎ সম্পূর্ণ অ এবং অর্দ্ধ একারের মিলনে যেরূপ উচ্চারণ হওয়া স্বাভাবিক, সেইরূপ হওয়া উচিত। অ, এ বর্ণদ্বয়কে দ্রুতভাবে

বারংবার উচ্চারণ করিলে উহাতে যে দুই শব্দাংশ আছে, তাহা এক হইয়া ঠিক্ "অএ্" বা "অয়্" এইপ্রকার উচ্চারণ হয়। দুই স্বরের মিলনে স্বভাবত যেরূপ উচ্চারণ হইয়া থাকে, ব্যাকরণ তাহাই বিধিবদ্ধ করিতে পারেন, কিন্তু কোন কল্পিত নূতন উচ্চারণের বিধান করিবার অধিকার ব্যাকরণের নাই। অতএব যখন সন্ধির বিধানে দেখিতেছি, অ এবং একারের যোগে ঐকারের উৎপত্তি, তখন এই বর্ণের উচ্চারণ অএ্ না হইয়া অই্ হওয়ার কোন কারণ নাই।• এক + এক = একই্ক না বলিয়া একএ্ক বলিলেই স্বাভাবিক এবং সহজবোধ্য হয় এবং তাহাই প্রকৃত উচ্চারণ। ঔকারের উৎপত্তি অ এবং ওকারের সংযোগে হইয়াছে। অতএব উহার উচ্চারণ অউ্ না হইয়া অও্ হওয়া স্বাভাবিক; অর্থাৎ অ, ও বর্ণদ্বয়কে বারংবার দ্রুতোচ্চারণ করিলে যেরূপ হয়, তাহাই প্রকৃত উচ্চারণ। অতএব ঐ এবং ঔ সন্ধিজাত বর্ণ বা Diphthong; উহারা স্বতন্ত্রবর্ণ নহে এবং উহাদের প্রচলিত উচ্চারণ ভ্রমাত্মক।

শ্রীশ্রীনাথ সেন।

রাজতপস্বিনী।

[জীবনীপ্রসঙ্গ]

৪

মহারাণীমাতা জীবিতমানে তাঁহার কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের কথা কাহিনীর মত বঙ্গসমাজের সর্ব্বত্র কীর্ত্তিত হইত এবং অদ্যাপি হইয়া থাকে। কিন্তু কয়বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার এক জীবনীলেখক তদীয় প্রাত্যহিক কার্য্যের বিবরণী দিতে গিয়া "হবিষ্যান্ন"সম্বন্ধে যে উপন্যাস লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহার কোন মূল নাই। তিনি "সাম্যধর্ম্মপ্রবণতায়" আশ্রিতা বিধবাদের সঙ্গে এক পংক্তিতে "এক খানা কদলীপত্র লইয়া দরিদ্রার মত উপবেশন করিয়া" ভোজন করিতেন, লেখকের এই চিত্র তাঁহার সম্পূর্ণ মনঃকল্পিত। অশনবসনসম্বন্ধে তপস্বিনীর সংযম পূর্ণমাত্রায় আচরিত হইত বটে, কিন্তু রাজোচিত মহিমা ও মর্য্যাদা তাঁহার সর্ব্ব কার্য্যে ও ব্যবহারে প্রতিফলিত হইত। তাঁহার "আহ্নিকের থাল" যে স্বচক্ষে না দেখিয়াছে, তাহাকে বুঝান শক্ত, কিরূপ ষোড়শোপচারে এবং মহার্ঘ খাদ্যদ্রব্যসম্ভারে দৈনিক দীর্ঘকালব্যাপী দেবার্চ্চনা তিনি সম্পন্ন করিতেন। ঐ আহ্নিকের থাল পূজাশেষে পুটিয়াবাসী কোন-না-কোন গৃহস্থবাটীতে অথবা সমাগত অতিথি-অভ্যাগতের নিকট প্রেরিত হইত,—নিজের ও অপর সরিকদের আমলাদের কাছেও বাদ যাইত না। তাঁহার হবিষ্যান্ন সচরাচর তাঁর মাতুলানীঠাকুরাণী প্রস্তুত করিতেন, কখন-কখন

ও-বাড়ী (পিত্রালয়) হইতে জেঠাইমাতা আসিয়া পাক করিয়া দিতেন। ইঁহারা কেহ না থাকিলে স্বয়ং রন্ধন করিয়া লইতেন। ১২৮৯ সালের আশ্বিনমাসের দৈনন্দিন লিপি পড়িয়া দেখিতেছি, মাতা যখন অতিশয় অসুস্থ, তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠতাতপত্নী উপর্য্যুপরি দুই-দিন আসার পর তৃতীয় দিনে তিনি বলিতেছেন যে, কাল আর তাঁকে আসিতে হইবে না, কাল ব্রত, নিজেই আলুনি পাক করিয়া লইবেন। ফলত এ সকল ব্যাপারে সুস্থ শরীরে যেরূপ কঠোর সংযম তিনি আচরণ করিতেন, পীড়াদির সময়ও তাহার অন্যথা হইত না।

পূজার্চ্চনায় শাস্ত্রসম্মত সর্ব্ববিধ বশুদ্ধির দিকে তিনি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন, নিজে পঞ্জিকা দেখিয়া প্রত্যহ সন্ধ্যাবন্দনাদি করি-তেন এবং পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণ অশুদ্ধ না হয়, তাহার ব্যবস্থায় কখন অমনোযোগী হই-তেন না। আমার সমক্ষে একদিন শ্রীযুক্ত কুঞ্জ ভাদুড়াকে বলিলেন যে, ভট্টাচার্য্যমহা-শয়কে বলিও ত যে, পূজা প্রভৃতি যেন ভাল করিয়া শিক্ষা করেন। ঐদিন গল্প করিয়া-ছিলেন, তাঁহার পিতৃদেবের জীবিতকালে এক-দিন শ্রাদ্ধোপলক্ষে তিনি মাতাকে বলিয়া-ছিলেন—"পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণ শুদ্ধ হয় না। তুমি ত তাঁহার সঙ্গে কথা কও না। গিরিসিদ্ধান্ত তোমায় পুনরায় মন্ত্র বলাইবে, তখন তুমি বলিও।" তান্ত্রিক মতের মদ্যপানা-দির অনুশাসন মহারাণীমাতা শ্রদ্ধেয় মনে করিতেন না। একদিন তীব্র বিদ্রূপ করিয়া ঐ মতকে "সুধাসিন্ধু" বলিয়াছিলেন।

হিন্দুস্থানের প্রায় সমস্ত প্রধান তীর্থ-স্থান তিনি দর্শন করিয়াছিলেন। প্রত্যেক তীর্থে গিয়া তাহার নামে একএকটি ফল ত্যাগ করিতেন। তাঁহার নিজমুখে পরি-ত্যক্ত ফলের একটি তালিকা আমি একবার সংগ্রহ করিয়াছিলাম।

নিজের ধর্ম্মবিশ্বাস কঠোর হিন্দুয়ানিসম্মত হইলেও তাঁহার মত সাধারণত বড় উদার ছিল। এদেশের সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের খবরা-খবর লইতেন এবং উপাসনাগৃহাদিনির্ম্মাণ জন্ম সাহায্যপ্রার্থনা করিলে কাহাকেও তিনি বিমুখ করিতেন না। ত্রিশবৎসর পূর্ব্বে পুটিয়ার ন্যায় হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে কেহ গেলে তাঁহার দাঁড়াইবার স্থান না হওয়ার কথা। কিন্তু মহারাণীমাতা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের একজন প্রচারককে রাজবাটীতে উপাসনাদি করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন এবং নিমন্ত্রণ করিয়া অতিশয় যত্নের সহিত তাঁহাকে আহা-রাদি করাইয়াছিলেন। প্রচারকমহাশয় নিরামিষভোজী জানিয়া স্বহস্তে তিনি কয়টি তরকারী প্রস্তুত করিয়াছিলেন। জয়পুরী (মনোহরের) শ্বেতপ্রস্তরের থালা ও তাহারই শতাধিক পাত্রে অভ্যাগত অতিথিমহাশয়ের জন্য ভোজনগৃহের অর্দ্ধেক স্থান সেদিন পূর্ণ হইয়াছিল, দীর্ঘকাল পরে তাহা আমার মনে পড়িতেছে। তিনি নিজহস্তে পাত্রগুলির নাগাল পাইতেছিলেন না। পাচক ব্রাহ্মণ-গণ তাহা ক্রমশ অগ্রসর করিয়া দিতেছিল। মহারাণীমাতার অতিথিসৎকার জাতধর্ম্মনির্ব্বি-শেষে এইরূপেই সচরাচর সম্পন্ন হইত।

এক দিকে স্বধর্ম্মে প্রগাঢ় নিষ্ঠার জন্ম তিনি যেমন হিন্দুসমাজের আদর্শ ছিলেন, অপর পক্ষে তাঁহার মহৎ চরিত্র ও উদারতার দরুণ অপরাপর সম্প্রদায়ের লোকেরাও তেমনি

অকপট শ্রদ্ধার অর্ঘ্য তাঁহাকে অর্পণ করিতেন। বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া কন্যানির্ব্বিশেষে তাঁহাকে স্নেহ করিতেন। ভূদেববাবু যতদিন রাজশাহীর স্কুল্-ইন্স্পেক্টর ছিলেন, মধ্যে মধ্যে পুটিয়ায় গিয়া মহারাণীমাতার সংবাদ লইতেন এবং স্বর্গীয় রাজার তৈলচিত্র দেখিয়া উচ্ছ্বাসভরে একবার এডুকেশন গেজেটের স্তম্ভে নিজে যে কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহাতে মহারাণীর প্রতি তাঁর ভক্তি ও স্নেহ পরিস্ফুট হইয়াছিল। রাজশাহী হইতে বদলী হওয়ার সময় তিনি স্বহস্তে মাতাকে "মা" ও "তুমি" সম্বোধন করিয়া চিঠি লিখিয়া আসেন। তাহাতে তিনি পরম আপ্যায়িত হইয়া বলিয়াছিলেন, পিতৃস্নেহ-সূচক এই "তুমি" তাঁর বড় মিষ্ট লাগিয়াছে। ১২৮৯ সালে শীতকালের শেষে তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙিয়া গেলে কাশীধামে তাঁহাকে লইয়া যাওয়ার ব্যবস্থা হইল। মহারাণীমাতা ও লোকজনদের কয়দিন পূর্ব্বে রওনা করিয়া কুমার স্বয়ং পশ্চাতে আসিতেছিলেন। পূর্ব্বাহ্ণে সংবাদ পাইয়া আমরা কলিকাতা হইতে মাতৃদর্শন জন্য চুঁচুড়ার জোড়াঘাটে উপস্থিত হইলাম। বেনারস পর্য্যন্ত স্পেশেল ট্রেণের বন্দোবস্ত করিতে ২।৩দিন অতিবাহিত হইল। তাঁহার সেবিকার শীর্ণ-জীর্ণ মূর্ত্তি দেখিয়া আমি বড় ম্রিয়মাণ হইলাম এবং বুঝিলাম যে, বেনারসে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা হইলেও রক্ষা পাওয়া কঠিন। কলিকাতার প্রসিদ্ধ ভিষক্‌মণ্ডলীকে দেখাইয়া কিছুদিন চিকিৎসার পর তাঁহাকে কাশী লইয়া যাওয়া হউক, আমার এই প্রস্তাব রাজকর্ম্মচারীদের ভাল লাগিল না। ভূদেববাবু তখন পেন্‌শেন্ লইয়া বাটীতেই ছিলেন, আমার মুখে সকল কথা শুনিয়া তিনি মহারাণীমাতার সংবাদ লইতে আসিলেন। তাঁহার বিশ্বস্ত রাজকৃষ্ণ-বাবুকে আনাইয়া তিনি মাতার নাড়ী পরীক্ষা করাইলেন এবং কিছুদিনের জন্য সেখানে রাখিয়া চিকিৎসার পরই যে বেনারস যাওয়া বিধেয়, ইহা সকলকে বুঝাইয়া দিলেন। সমভিব্যাহারী রাজকর্ম্মচারীরা এই পরামর্শানু-সারে কার্য্যারম্ভ করিবার পূর্ব্বেই কুমার সদলবলে পুটিয়া হইতে আসিয়া পৌছিলেন এবং বরাবর কাশীধামে যাওয়ার প্রস্তাবই বাহাল রহিল। আমার পিতৃদেব তখন রাজসংসার হইতে পেন্‌শেন্ লইয়া অবসর গ্রহণ করিয়া-ছিলেন। ভূদেববাবু কুমারকে বলিবার জন্য তাঁহাকে বলিলেন যে, তাঁর যে মা, তিনি সমস্ত দেশের মাতৃস্বরূপা, সুচিকিৎসার অভাবে অকালে কোন দুর্ঘটনা ঘটিলে তাঁহার কলঙ্কের সীমা থাকিবে না। এখানে বলা আবশ্যক, সে-যাত্রা মহারাণীমাতা আরোগ্যলাভ করেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই হঠাৎ কুমারের কাশীলাভ হওয়ায় তিনি দারুণ শোক পাইয়াছিলেন।

প্রধানত দানাদিসম্বন্ধে স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর-মহাশয়ের সহিত মহারাণীমাতার পত্রব্যবহার চলিত। সদনুষ্ঠানপ্রিয়তার জন্য বিদ্যাসাগর-মহাশয়কে তিনি বড় ভক্তি করিতেন এবং বলিতেন, তাঁহার প্রবর্ত্তিত বিধবাবিবাহ চলিলে সমাজে পাপস্রোত অনেক কমিবে। নিজের একটা প্রয়োজনে আমি একবার মহারাণী-মাতার পত্র লইয়া বিদ্যাসাগরমহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। প্রাতঃস্মরণীয়

পণ্ডিতপ্রবর কথায়-কথায় আমার শিক্ষাগুরু পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয়ের সমক্ষে আমাদিগকে বলিলেন, "কথাটা তোমাদের বেশী মনে হইবে, কিন্তু ইহা সত্য যে, শরৎ-সুন্দরীকে আমি নিজের কন্যাদের চেয়ে বেশী স্নেহ করি।" মহারাণীমাতার যে পীড়ার কথা বলিতেছিলাম, তাহার সংবাদ পাইয়া বিদ্যাসাগর বালকের ন্যায় রোদন করিতে করিতে তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিয়াছেন, চুঁচুড়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করার পর তদীয় জামাতা সূর্য্য-বাবুর মুখে ইহা আমি শুনিয়াছিলাম।

ব্রাহ্মসমাজের স্বর্গীয় বাবু কালীনাথ দে রাজশাহী জেলাস্কুলের যখন শিক্ষকতা করিতেন, তখন হইতে শেষ পর্য্যন্ত তিনি মহারাণীর সাধুদৃষ্টান্তের একজন পরম অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন। ১২৮৮ সালে তিনি যখন কাঁথির ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্, তখন মাতা বিষয়-আশয়ের ভার কুমারের হস্তে দিয়া কাশী যাইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন শুনিয়া লিখিয়াছিলেন, "আপনাকে বলা বাহুল্য যে, চিত্তকে পরিশুদ্ধ রাখিলে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই তীর্থস্থান।

'কাজ কিরে মোর কাশী,
ঘরে বসে দেখ্‌বো আমি গয়া, গঙ্গা, বারাণসী।
আমার কালীর পদকোকনদ তীর্থ রাশিরাশি॥'

আমার সহধর্ম্মিণী এই গান বলিয়া দিলেন, তাই লিখিলাম।"

আত্মীয়, অনুগত এবং পুত্রস্থানীয় যে সকল পুরুষের সমক্ষে তিনি বাহির হইতেন, নিঃসঙ্কোচে তাঁহাদের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতেন। কিন্তু তাঁহার সহজ নম্রতা ও লজ্জাশীলতা প্রত্যেক কথায় ও কার্য্যে বিকশিত হইয়া উঠিত। শৈলেশচন্দ্র যখন নিতান্ত বালক, গরিব সহপাঠীদের বই, স্কুলের বেতন ও অন্যান্য সাহায্যের জন্য মহারাণী-মাতাকে মাঝে মাঝে ধরিয়া বসিতেন। একদিন তিনি তাঁর এক দীর্ঘাকৃতি সতীর্থ সঙ্গে অন্দরের মধ্যে উপস্থিত। সে ছেলেটি আর কখন রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করে নাই এবং শৈলেশের সঙ্গে বলিয়াই যাইতে পারিয়াছিল। আমি দেখিলাম, মা হঠাৎ মাথার কাপড় টানিয়া দিলেন এবং শৈলেশকে কাছে ডাকিয়া তাহার আবদারটা মৃদুস্বরে প্রশ্ন করিয়া জানিয়া লইলেন। শেষে শৈলেশচন্দ্র কার্য্যোদ্ধার করিয়া সঙ্গী সহ চলিয়া গেলে, ব্যাপারটা কি, বুঝিলাম। আর এক দিনের কথা। প্রাতে আমরা তাঁহার কাছে বসিয়া আছি, এমন-সময় সংবাদ আসিল, দেওয়ানজী হাজিরা দিতে আসিতেছেন। গৃহান্তরে বসিয়া অন্যান্য কথার পর পিতৃদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, ময়মনসিংহের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ রাখালবাবু শেষে যে পুস্তক পাঠাইয়াছিলেন, তাহা মা পাইয়াছেন কি না? উত্তর—পাইয়াছি। প্রশ্ন—রাখালবাবু জানিতে চাহিয়াছেন, মহারাণীমা পড়িয়া কি মত দেন। মা কিছু উত্তর করিলেন না, কেবল লজ্জায় আরক্তিম হইয়া মৃদু হাস্য করিলেন।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার।

দুর্ভিক্ষপীড়িত ভারতে

১

গোলাপী রঙের সুন্দর পুরী।

আরো দেড়ক্রোশ উত্তরাভিমুখে। উদয়পুরের পর হইতে—মরুভূমির পর মরুভূমি। সমস্ত ভূমিই অভিশাপগ্রস্ত;—মাটির উপরে, যেন একটা শাদা ভস্মের স্তর পড়িয়াছে; যেন একটা আগ্নেয়গিরির ব্যাপক অগ্ন্যুচ্ছ্বাসে এই ভস্ম চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়াছে। পূর্ব্বে যেখানে জঙ্গল ছিল, গ্রাম ছিল, কৃষিভূমি ছিল—এখন সমস্তই একাকার,—একই বিষন্ন রঙে রঞ্জিত। কিন্তু এই উদাস-উজাড় মরুপ্রদেশেও একটি সুরম্য নগর, পূর্ণ প্রাচ্যমহিমায় বিরাজ করিতেছে। যে সকল বীথি, সমুচ্চ দস্তুর প্রাকারাবলী, ছুঁচাল-খিলান-সমন্বিত দ্বারসমূহ এইখানে আসিয়া মিলিত হইয়াছে,—উহা শুভ্রপরিচ্ছদধারী অশ্বারোহী পুরুষে, পীত কিংবা লোহিত অবগুণ্ঠনে আবৃত রমণীবৃন্দে পরিপূর্ণ। গরুর গাড়ি যাতায়াত করিতেছে। সুসজ্জিত উটেরা সারিবন্দি হইয়া চলিয়াছে। সু-কালের মত, চারিদিকে বিচিত্র রঙের ছড়াছড়ি—জীবন-উদ্যমের উদ্দাম স্ফূর্ত্তি।

কিন্তু প্রাকারাবলীর পাদদেশে, ছেঁড়া ন্যাকড়ার বস্তার মত ও সব কি দেখা যায়?—উহার মধ্যে কতকগুলা মনুষ্যের আকার প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।...জমির উপর ঐ লোকগুলা কে? উহারা কি মাতাল?—উহারা কি রুগ্ণ?—আহা! কতকগুলা শীর্ণকায় জীব, কতকগুলা অস্থিপঞ্জর, কতকগুলা "মমি"-শব!—কিন্তু না, এখনো যে নড়িতেছে; চোখের পাতা পড়িতেছে; চোখ মেলিয়া চাহিতেছে! শুধু তাহা নহে, খাড়া হইয়া উঠিয়াছে। জঙ্ঘাকার লম্বা-লম্বা অস্থিখণ্ডের উপর ভর দিয়া টল্‌মল্ করিতেছে।...

প্রথম দ্বারটি পার হইবার পরেই আর একটি দ্বার। এই দ্বারটি ভিতরকার প্রাচীর-গাঁথুনির মধ্য হইতে কাটিয়া বাহির-করা। দস্তুর চূড়াদেশ পর্য্যন্ত এই প্রাচীরটি গোলাপী রঙে রঞ্জিত;—গোলাপী রঙের জমির উপর, ভারতীয় নক্সার ধরণে, নিয়মিত-অন্তরে শাদা-শাদা ফুলের নক্সা কাটা। পুরু ধূলার স্তরের উপর, এখনো কতকগুলা শ্যামবর্ণ মনুষ্যের গাদা রহিয়াছে;—যেন ভস্মরাশির মধ্যে নিমজ্জিত। পুষ্পচিত্র-বিভূষিত এই সুন্দর গোলাপী রঙের প্রাচীরের সম্মুখে উহাদিগকে আরো কদাকার দেখাইতেছে। দেখিলে মনে হয়, যেন অস্থিপঞ্জরের উপর একখণ্ড শুকানো চাম্‌ড়া লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছে। হাড়গুলা যেন স্পষ্ট করিয়া গোণা যায়। হাঁটু ও কনুয়ের গাঁঠ যেন একএকটা মোটা গোলা;—লাঠির গাঁঠের মত। উরতে শুধু একটি হাড়—নীচের জঙ্ঘা অপেক্ষা শীর্ণ; জঙ্ঘাতেও দুইটি অস্থিখণ্ড ছাড়া আর কিছুই

নাই। উহাদের মধ্যে কতকগুলা লোক এক পরিবারের মত দলবদ্ধ হইয়া আছে; কতকগুলা বিচ্ছিন্নভাবে ইতস্তত রহিয়াছে। কেহ বা দুই হাত ছড়াইয়া মাটির উপর পড়িয়া যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছে; কেহ বা বোবার মত, স্থাণুর মত, উবু হইয়া নিশ্চলভাবে বসিয়া আছে; চোখগুলা জ্বরবিকারগ্রস্ত রোগীর ন্যায়; লম্বা-লম্বা দাঁত ঠোঁট হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছে—ঠোঁট পিছনে হটিয়া গিয়াছে। এক কোণে,—একটি মাংসহীন জীর্ণশীর্ণ বৃদ্ধা ছেঁড়া ন্যাকড়ার উপর বসিয়া নীরবে ক্রন্দন করিতেছে। বোধ হয়, এ সংসারে তাহার আর কেহ নাই।

এই দ্বারযুগল যেই পার হইলাম, অমনি নগরের অভ্যন্তরদেশ আমার সমক্ষে সহসা প্রকাশিত হইল। আমি এরূপ দেখিব বলিয়া আদৌ প্রত্যাশা করি নাই। কি আশ্চর্য্য কাণ্ড! কি ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার!

একটা বৃহৎ নগর সমস্তই গোলাপী;—উহার গৃহাদি, উহার প্রাকারাবলী, উহার দেবালয়, উহার কীর্ত্তিস্তম্ভ—সমস্তই গোলাপী; সমস্তের উপর একইরকম শাদা ফুলের নক্‌সা। রাজার এ কি অদ্ভুত খেয়াল! দেখিলে মনে হয়, ভারতীয়-ধরণের ফুলের নক্‌সা-কাটা যেন একটি অখণ্ড প্রাচীর বরাবর প্রসারিত। মনে হয়, যেন অষ্টাদশ শতাব্দীর কোন পুরাতন "একরঙা" নগর। কিন্তু এখানে সমস্ত মিলিয়া তাহা হইতে যে একটি পূর্ণ সৌন্দর্য্য বিস্ফুরিত হয়, তাহার তুলনা আর কোথাও নাই। অন্যান্য একরঙা নগরের সহিত এই বিষয়েই ইহার প্রভেদ। ইহা একেবারেই অনন্যসদৃশ।

লম্বা-লম্বা রাস্তা, ঠিক সমসূত্রে নির্ম্মিত;—আমাদের "বুল্‌ভার্" (Boulvard) রাস্তা অপেক্ষা দ্বিগুণ চওড়া। রাস্তার দুই ধারে সারি-সারি উচ্চ অট্টালিকা; এই সকল অট্টালিকার সম্মুখভাগ,—প্রাচ্যদেশসুলভ-খাম্‌খেয়ালি-কল্পনানুযায়ী কত যে বিচিত্র আকারে নির্ম্মিত, তাহার আর অন্ত নাই। মাল্য-নক্‌সা-ভূষিত ছোট-ছোট কত খিলান; অট্টচূড়া প্রভৃতি এত অতিরিক্ত পরিমাণে উপর্য্যুপরি বিন্যস্ত যে, এরূপ আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। সমস্তই গোলাপী রঙের। খুব সামান্য ছোটখাটো ঢালাই কাজ কিংবা ফল-পুষ্পের নক্‌সা—তাহাও শাদা-সাদা সূত্রাকার কারুকর্ম্মে খচিত। যে সকল অংশ খোদিত, তাহার উপর যেন শাদা "লেসের" কাজ (Lace) বসানো। পক্ষান্তরে, যে সকল অংশ সমতল, তাহার উপর সেই একই গোলাপী রং—সেই একই রকমের ফুলের নক্‌সা চিত্রিত।

এই সব রাস্তার সর্ব্বত্রই জনতার গতিবিধি। সর্ব্বত্রই উজ্জ্বল বর্ণচ্ছটা। শতশত দোকানদার নানাপ্রকার দ্রব্যসামগ্রী মাটির উপর সাজাইয়া রাখিয়াছে। দুই ধারের "পদ-পথ"—কাপড়ে, তাম্রসামগ্রীতে, অস্ত্রাদিতে সমাচ্ছন্ন। আবার এই জনতার মধ্যে কতকগুলি রমণীও চলাফেরা করিতেছে। উহাদের বিচিত্র রঙের ও বিচিত্র ঢঙের নক্‌সা-কাটা অবগুণ্ঠন; স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমস্ত নগ্নবাহু বাজুবন্দে ভূষিত।

এই বড় রাস্তার মধ্য দিয়া রৌপ্য-অস্ত্রধারী অশ্বারোহিগণ ঝক্‌মকে জিনের উপর বসিয়া চলিয়াছে। শিং-রং-করা বলদেরা বড়-বড় শকট টানিয়া লইয়া যাইতেছে। রজ্জুবদ্ধ

দ্বি-ককুদ উষ্ট্রগণ দীর্ঘরেখায় সারিবন্দি হইয়া চলিয়াছে। জরির পোষাক পরিয়া হস্তিবৃন্দ চলিয়াছে; উহাদের শুণ্ডের উপর চিত্রবিচিত্র নক্‌সা অঙ্কিত। এক-ককুদ উষ্ট্রেরা চলিয়াছে; তাহাদের পৃষ্ঠে দুইজন করিয়া লোক উপবিষ্ট—একজনের পিছনে আর একজন। এই সকল উষ্ট্র অষ্ট্রিচ্‌ পাখীর মত সম্মুখে ঘাড় বাড়াইয়া-দিয়া লঘুপদক্ষেপে দুল্‌কি-চালে চলিয়াছে। ফকির-সন্ন্যাসীরা চলিয়াছে—একেবারে নগ্ন-কায়;—আপাদমস্তক শাদা চূর্ণে আচ্ছন্ন। পাল্‌কী চলিয়াছে, তাঞ্জাম চলিয়াছে। সমস্তই যেন প্রাচ্য পরীদৃশ্যের একটি চিত্রপট—অপূর্ব্ব একরঙা গোলাপী ফ্রেমের মধ্যে আবদ্ধ।

কতকগুলা লোক রাজার পোষা চিতা-দিগকে রজ্জুবদ্ধ করিয়া, জনতায় অভ্যস্ত করাইবার জন্য উহাদিগকে লইয়া বেড়াই-তেছে। চিতারা সতর্কভাবে পা টিপিয়া-টিপিয়া চলিয়াছে। উহাদিগকে দেখিতে অদ্ভুত। মাথায় ছোট-ছোট জরির টুপি; থুঁতির নীচে একটা পুষ্পাকার ফিতার গ্রন্থি। মখ্‌মলের মত পায়ের থাবাগুলা,—একটার পর একটা,—কি সন্তর্পণেই মাটির উপর রাখিয়া চলিতেছে! আরো বেশী নিরাপদ্‌ হইবার জন্য কতকগুলি লোক উহাদের আংটা-বদ্ধ পুচ্ছ ধরিয়া রহিয়াছে। ইহারা ছাড়া আরো চারিজন পরিচারক পিছনে-পিছনে চলিয়াছে।

তা ছাড়া, সেই প্রাকারদ্বারের সম্মুখে যে-শ্রেণীর জীব দেখা গিয়াছিল, সেইরূপ কতক-গুলি লোক এখানেও বিষণ্নমুখে ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। দেখিলে মনে হয়, যেন গোর হইতে পলাইয়া আসিয়াছে। উহারা সাহস করিয়া এই পুষ্পবর্ণরঞ্জিত সুন্দর পুরীতে প্রবেশ করিয়াছে এবং আপনাদের অস্থিগুলা টানিয়া-টানিয়া লইয়া বেড়াইতেছে!... প্রথমে দেখিয়া যেরূপ মনে হইয়াছিল, তাহা অপেক্ষা এই সব লোকের সংখ্যা আসলে অনেক বেশী। অন্তঃপ্রবিষ্ট নিষ্প্রভ নেত্রে যাহারা টলিয়া-টলিয়া ইতস্তত বেড়াইতেছে, শুধু ইহারাই যে দুর্ভিক্ষপীড়িত লোক, তাহা নহে; দোকানদারদের মধ্যে, সুশোভন সুসজ্জিত দ্রব্যসামগ্রীর মধ্যে ছেঁড়া ন্যাকড়ার বস্তার মত—নরকঙ্কালের মত, এইরূপ আরো কতকগুলা লোক পাথর-বাঁধানো পদপথের উপর পড়িয়া আছে। পথ-চল্‌তি লোকেরা—পাছে উহাদের মাড়াইয়া ফেলে, এই ভয়ে একটু পাশ কাটাইয়া চলিতেছে...এই প্রেত-মূর্ত্তিগুলা চতুষ্পার্শ্বস্থ ক্ষেত্রভূমির কৃষক। যে অবধি বৃষ্টির অভাব হইয়াছে, তখন হইতেই উহারা, শস্যনাশনিবারণার্থ প্রাণপণে যুঝাযুঝি করিয়াছে; এই দীর্ঘকাল, উহারা যে দারুণ কষ্ট ভোগ করিয়াছে,—উহাদের দেহের অসম্ভব কৃশতা তাহারই পরিণামফল। এখন সব শেষ হইয়া গিয়াছে। গরুবাছুর সমস্তই মরিয়া গিয়াছে। মৃত গরুর চাম্‌ড়াও উহারা জঘন্য মূল্যে বিক্রয় করিয়াছে। যে সকল জমিতে উহারা চাষবুনানি করিয়াছিল, সমস্তই এখন শুষ্ক মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে। সেখানে এখন আর কিছুই অঙ্কুরিত হয় না। একমুঠা অন্নের জন্য উহারা কাপড়চোপড়, রূপার গহনাপত্র,—উহাদের যাহা-কিছু ছিল, সমস্তই বিক্রয় করিয়াছে। কয়েকমাস ধরিয়া উহাদের শরীর ক্রমশই শীর্ণ হইতেছে। তাহার পর এখন এই দারুণ দুর্ভিক্ষ;—ক্ষুধার অসহ্য যন্ত্রণা।

ক্রমে শবদেহের পূতিগন্ধে সমস্ত গ্রামপল্লী আচ্ছন্ন হইয়া গেল।

অন্ন! হাঁ, এই সব লোক একমুঠা অন্নের জন্য লালায়িত; তাই উহারা এই নগরাভিমুখে আসিয়াছে। এইখানে আসিলে লোকে উহাদের প্রতি দয়া করিবে, উহাদের প্রাণ বাঁচাইবে—এইরূপ উহাদের বিশ্বাস ছিল। কেন না, উহারা পরম্পরায় শুনিয়াছিল,—নগর-অবরোধের সময় খাদ্যসামগ্রী যেরূপ নগরের মধ্যে সংগ্রহ করিয়া রাখা হয়, সেইরূপ এইখানে রাশিরাশি চাউল-ময়দা রক্ষিত হইয়াছে; এবং এই নগরে আসিলেই সকলে একমুঠা খাইতে পায়।

বস্তুত রাজার আদেশক্রমে সারিবন্দি উষ্ট্রপৃষ্ঠে বস্তা-বস্তা চাউল ও ছোলা দূর-প্রদেশ হইতে সহরে অষ্টপ্রহর আমদানি হইতেছে। ধান্যাগারে—এমন কি, পদপথের উপরেও উহা জমা করিয়া রাখা হইতেছে;—শুধু এই ভয়ে, পাছে চতুর্দ্দিকের দুর্ভিক্ষ এই সুন্দর গোলাপী নগরেও প্রবেশ করে। এখানে খাদ্যসামগ্রী পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু উহা ক্রয় করিতে হয়। ক্রয় করিবার জন্য অর্থ চাই। সত্য বটে, রাজধানীতে যে সকল দরিদ্রের বসতি, রাজা তাহাদিগকে অর্থাদি বিতরণ করিতেছেন। কিন্তু চতুষ্পার্শ্বস্থ ক্ষেত্রভূমির শতসহস্র কৃষক, যাহারা অন্নাভাবে ক্ষুধার জ্বালায় মরিতেছে, তাহাদের সাহায্যের জন্য এই অর্থে কুলায় না। তাই উহাদিগকে আসিতে দেওয়া হইতেছে না। তাই তাহারা রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, আহার-স্থানের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে;—শুধু এই আশাভরে, যদি কেহ একমুষ্টি চাউল তাহাদের নিকট নিক্ষেপ করে। তাহার পর, যখন শয়নের সময় হয়, তখন উহারা যেখানে হয় একস্থানে শুইয়া পড়ে;—এমন কি, পদপথের সানের উপরেই শুইয়া পড়ে। বোধ হয়, উহাই তাহাদের অন্তিমশয্যা।

এইমাত্র শ-খানেক বস্তার চাউল উষ্ট্রপৃষ্ঠে এখানে আসিয়া পৌছিল। ধান্যাগারগুলা বোধ হয় পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাই ধান্যাগারের সম্মুখস্থ পদপথের উপর এই বস্তাগুলা নামাইয়া রাখিতে হইবে। ৫ হইতে ১০ বৎসরের কঙ্কালসার নগ্নকায় তিনটি শিশু সেইখানে বিশ্রাম করিতেছিল। একজন প্রতিবেশী বলিল,—"ইহারা তিনটি ভাই; ইহাদের মা-বাপ—যাহারা উহাদের আনিয়াছিল, তাহারা মরিয়াছে (বলা বাহুল্য, ক্ষুধার জ্বালায়); তাই, উহারা এইখানেই পড়িয়া আছে, উহাদের আর কেহ নাই।" যে স্ত্রীলোকটি এই কথা বলিতেছিল, তাহার কথার ভাবে মনে হইল, এ সমস্তই যেন স্বাভাবিক ঘটনা। আকারপ্রকারে স্ত্রীলোকটি দুষ্টা বলিয়াও মনে হয় না!...কি ভয়ানক! ইহারা কিরকম লোক? ইহাদের হৃদয় না জানি কি উপাদানে গঠিত! এদিকে ইহারা একটি পাখী মারিবে না; অথচ ইহাদের দ্বারের সম্মুখে কতকগুলা অনাথ পরিত্যক্ত শিশু অনাহারে মরিতেছে, তাহা দেখিয়াও উহাদের হৃদয় একটুও বিচলিত হইতেছে না!

যে শিশুটি সব চেয়ে ছোট, তাহার প্রায় সব শেষ হইয়া আসিয়াছে। একেবারে গতি-শক্তি রহিত। মুদ্রিত চোখের পাতার ধারে-ধারে যে মাছি বসিয়াছে, তাহাদের

তাড়াইবারও শক্তি নাই। রন্ধনার্থ ছাগাদি-পশুর অন্ত্র বাহির করিয়া ফেলিলে যেরূপ হয়, উহাদের উদর সেইরূপ দেখিতে হইয়াছে। রাস্তায় সানের উপর শরীরকে ক্রমাগত টানা-হ্যাঁচড়া করায়, পিঠের হাড় মাংসের মধ্যে বিঁধিয়া গিয়াছে।

যাহাই হউক, এই শস্যের বস্তাগুলা রাখিবার জন্য উহাদিগকে এক্ষণে সরানো আবশ্যক। যে শিশুটি সব চেয়ে বড়, সে অতীব বাৎসল্যসহকারে ছোটটিকে কাঁধে করিয়া লইল এবং মধ্যমটির হাত ধরিল; কেন না, মধ্যমটির এখনো একটু চলিবার শক্তি আছে। এইরূপে উহারা নীরবে-নিঃশব্দে সেখান হইতে প্রস্থান করিল।

ছোটটির চক্ষু মুহূর্ত্তের জন্য একবার উন্মীলিত হইল। আহা! উহার চোখের দৃষ্টি অন্যায়রূপে দণ্ডিত নির্দ্দোষ বধ্যজনের দৃষ্টির মত। যন্ত্রণার ভাব,—তিরস্কারের ভাব,—কি হেতু সর্ব্বজনপরিত্যক্ত হইয়া এতটা কষ্টভোগ করিতেছে, তজ্জন্য বিস্ময়ের ভাব—সমস্তই যেন ঐ দৃষ্টিতে পরিব্যক্ত!...কিন্তু ক্ষণপরেই তাহার সেই মুমূর্ষু চক্ষু আবার নিমীলিত হইল; আবার মাছিগুলা আসিয়া চোখের পাতার উপর বসিল। বেচারা শিশুটির ক্ষুদ্র মস্তক তাহার বড় ভায়ের শীর্ণ কাঁধের উপর আবার ঢলিয়া পড়িল।

পা একটু টলিল; কিন্তু চোখে জল নাই, মুখে একটি কাতরোক্তি নাই; শিশু-ধৈর্য্য ও শিশু-আত্মত্যাগের যেন সাক্ষাৎ মূর্ত্তি—এইরূপে সে, ভাই-দুটিকে লইয়া চলিয়া গেল। বড়টি আপনাকে বাড়ীর কর্ত্তা বলিয়া মনে করে। তাহার পর, সে যখন দেখিল, এতটা দূরে আসিয়াছে যে,এখন আর কাহারো পথের অন্তরায় হইবার সম্ভাবনা নাই, তখন খুব সতর্কতার সহিত, অতি সন্তর্পণে ভাই-দুটিকে রাস্তায় সানের উপর আবার শুয়াইয়া দিল এবং নিজেও তাহাদের পার্শ্বে শয়ন করিল।

এই চৌমাথা-রাস্তায়—যেখানে সমস্ত সুন্দর রাস্তাগুলি আসিয়া মিলিত হইয়াছে—যে শোভাসৌন্দর্য্য এই নগরের বিশেষত্ব, তাহা যেন এখানে পূর্ণমাত্রায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। রাস্তার শেষপ্রান্ত পর্য্যন্ত সমস্তই গোলাপী ও তাহার উপর শাদা গোলাপফুলের নক্সা। দেবমন্দিরের গোলাপী চূড়াসমূহ ধূলাচ্ছন্ন আকাশ ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে; তাহার চারিপার্শ্বে কালো-কালো পাখী আবর্ত্তের ন্যায় ঘোরপাক দিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে। রাজপ্রাসাদের সম্মুখভাগও গোলাপী, তাহার উপর শাদা ফুলের নক্সা;—আমাদের বড়-বড় গির্জ্জার সম্মুখভাগ অপেক্ষাও উচ্চ; প্রায় একশত সমপ্রমাণ চতুষ্ক উপর্য্যুপরি ন্যস্ত;—প্রত্যেকেরই একইপ্রকার স্তম্ভশ্রেণী, একইপ্রকার গরাদে, একইপ্রকার ছোট-ছোট গম্বুজ; সর্ব্বোপরি রাজনিশান,—শুষ্কবায়ুভরে পতপতশব্দে আকাশে উড়িতেছে। ফুলের নক্সা-কাটা গোলাপী রঙের প্রাসাদগৃহাদি;—চতুষ্পথের চারিপার্শ্ব হইতে সুরু করিয়া ধূলিময় রাস্তার সুদূর প্রান্ত পর্য্যন্ত সমসূত্ররেখায় বরাবর চলিয়া গিয়াছে।

এই চতুষ্পথের লোকেরা অলঙ্কারে আরো অধিক বিভূষিত, আরো অধিক জীবন-উদ্যমে পূর্ণ, বিচিত্র বর্ণে আরো অধিক সমুজ্জ্বল।

ক্ষুধাক্লিষ্ট পরিব্রাজকদিগের সংখ্যা,—বিশেষত ক্ষুদ্র বালকদিগের সংখ্যা এখানে আরো অধিক। কেন না, এই রাস্তার মাঝখানেই, খোলা জায়গায়,—চাউলের পিঠা, চিনি কিংবা মধু দিয়া প্রস্তুত মিষ্টান্নের পাক হইতেছে; তাহাতেই উহারা আকৃষ্ট হইতেছে। বলা বাহুল্য, উহাদিগকে কিছুই দেওয়া হইতেছে না। তথাপি উহারা দুর্ব্বল কম্পমান ছোট-ছোট পায়ের উপর ভর দিয়া এইখানেই দাঁড়াইয়া আছে।

এই সকল ক্ষুধিতের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। উহারা করাল বন্যার মত গ্রাম-পল্লী হইতে ঠেলিয়া আসিতেছে; সহরের দ্বারদেশে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই, দূরত্বের নিদর্শন-খোঁটার মত, উহাদের মৃতশরীরে সমস্ত পথ পরিচিহ্নিত হইতেছে।

একজন বলয়বিক্রেতা দোকানদার গরম-গরম মালপোয়া খাইতেছিল; তাহারি সম্মুখে, একজন রমণী—রমণীর কঙ্কাল বলিলেও হয়—'থাক্কার ভাবে সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার শুষ্ক স্তনের উপর, তাহার বুকের হাড়ের উপর, সে একটি কঙ্কালসার শিশুকে জাপুটাইয়া ধরিয়া আছে। না, দোকানদার তাহাকে কিছুই দিল না; এমন কি, তাহার দিকে একবার চাহিয়াও দেখিল না। সেই মৃতকল্প শিশুর শুষ্কস্তনা জননী একেবারে যেন পাগলের মত হইল। সে দাঁত বাহির করিয়া নেকড়ে বাঘের মত দীর্ঘস্বরে একটা চীৎকার করিয়া উঠিল। রমণী যুবতী,—বোধ হয় এক সময়ে দেখিতেও সুশ্রী ছিল। তাহার দুর্ভিক্ষ-ক্লিষ্ট কপোলদেশে এখনো যৌবনের চিহ্ন দেদীপ্যমান। বোধ হয় ১৬বৎসর বয়স; প্রায় বালিকা বলিলেই হয়।...অবশেষে সে বুঝিতে পারিল, কেহই তাহার প্রতি দয়া করিবে না; সে পরিত্যক্তা অনাথা। কোন বন্যপশু শত্রুকর্তৃক আক্রান্ত হইয়া পলাইবার পথ না দেখিয়া নিরুপায় হইয়া যেরূপ চীৎকার করিতে থাকে, সেইরূপ সে চীৎকার করিতে লাগিল। তাহার নিকট দিয়া প্রকাণ্ড-কায় হস্তিগণ নিঃশব্দে ধীরপদক্ষেপে চলিয়া যাইতেছে। তাহাদের আহারের জন্য, বহুদূর হইতে, মহার্ঘ মূল্যে ডালপালা সংগ্রহ করিয়া আনা হইয়াছে।

বালকদিগের কলরব এই সমস্ত জন-কোলাহল ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। হাজার-হাজার কাক গৃহছাদের উপর বসিয়া কা-কা ধ্বনি করিতেছে। কাকদিগের এই চিরকেলে কলরব ভারতবর্ষে আর সমস্ত শব্দকে ছাড়াইয়া উঠে। আজকাল তাহাদের ডাকের আরো বৃদ্ধি হইয়াছে—এখন উহা উল্লাসের সীমায় পৌঁছিয়াছে। যে সময়ে শবের পূতি-গন্ধে চারিদিক্ আচ্ছন্ন হইয়া যায়, সেই দুর্ভিক্ষের সময়ই ইহাদের সু-কাল—প্রাচুর্য্যের কাল।

সে যাহাই হউক, প্রাচীরবেষ্টিত উদ্যানের মধ্যে রাজার কুমীরেরা এখন আহার করিবে।

রাজার এই প্রাসাদটি একটি বৃহৎ জগৎ বলিলেই হয়। ইহার সংশ্লিষ্ট কত বিভিন্ন আবাস-গৃহ, কত অশ্বশালা, কত হস্তিশালাই যে আছে, তাহার আর অন্ত নাই। কুম্ভীরসরোবরে পৌঁছিতে হইলে, লৌহ-শলাকা-দুর্ঘিত কত উচ্চদ্বার পার হইতে হয়, (Louvre) লুভর্-প্রাঙ্গণের মত কত বড়-বড় প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিতে হয়। এই সব প্রাঙ্গণের ধারে-ধারে,

গরাদেওয়ালা গবাক্ষবিশিষ্ট ঘোরদর্শন কত-কত ইমারৎ রহিয়াছে। বলা বাহুল্য, উহাদের দেওয়াল গোলাপী রঙে রঞ্জিত এবং উহাতে শাদা ফুলের নক্‌সা কাটা। আজ এই অঞ্চলে খুব লোকের ভিড়। আজ এখানে লোক ডাকিয়া-ডাকিয়া আনা হইতেছে। আজ সৈনিকদিগের বেতন পাইবার দিন। তাই সমস্ত সৈন্য আজ এখানে উপস্থিত। উহাদিগকে দেখিতে একটু জংলি ধরণের, কিন্তু বেশ লম্বা-চওড়া; হস্তে বল্লম অথবা ধ্বজপতাকা। ভারী-ভারী সেকেলে ধরণের মুদ্রা, অথবা চৌকোণা তাম্রমুদ্রা উহাদিগকে দেওয়া হইতেছে।

থাম-ওয়ালা, খোদাই-করা ছোট-ছোট-খিলানবিশিষ্ট মার্ব্বেলের একটা দালানঘরে, একটা প্রকাণ্ড ফ্রেমের উপর বেগ্‌নি-মখ্‌মলের একটা কাপড়ের টানা রহিয়াছে—দশজন কারিকর তাহার উপর "তোলাকাজের" (raised work) সোনালি জরির ফুল বুনিতেছে। রাজার একটি প্রিয় হাতীর জন্য নূতন পোষাক তৈয়ারী হইতেছে।

কঠিনশ্রমসহকৃত জলসেকের প্রভাবে উদ্যানগুলা এখনো সবুজ রহিয়াছে। এই তাপদগ্ধ শুষ্কপ্রদেশের মধ্যে এই মরুকাননগুলি দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। এই উদ্যানগুলি উপবনের ন্যায় বিশাল; এবং উহাদের মধ্যে একপ্রকার বিষাদময় শোভা পরিলক্ষিত হয়। উহা ৫০ফিট্ উচ্চ, দন্তুর প্রাচীরদ্বারা বেষ্টিত। উহাদের পথগুলি প্রাচীন-ধরণের;—সোজা-সোজা ও মার্ব্বেল দিয়া বাঁধানো। ঝাউ, তাল, গোলাপ ও নারঙ্গিকুঞ্জে বিভূষিত। নারঙ্গি-ফুলের গন্ধে চারিদিক্ আমোদিত। ছায়ায় বসিয়া বিশ্রাম করিবার জন্য সর্ব্বত্রই মার্ব্বেল-পাথরের আরাম-কেদারা। নর্ত্তকীদের জন্য স্থানে-স্থানে চতুষ্ক-মণ্ডপ এবং রাজকুমারদিগের স্নানের জন্য মার্ব্বেলে বাঁধানো চৌবাচ্ছা। এখানে ময়ূর আছে, বানর আছে; এমন কি, নারঙ্গিগাছের তলায়, শিকারে বহির্গত, ছুঁচাল-মুখ তস্করবৃত্তি শৃগালদিগকেও দেখিতে পাওয়া যায়।

অবশেষে সেই বৃহৎ সরোবর! ইহাও ভীষণ প্রাচীরে আবদ্ধ। দুইতিনবৎসরব্যাপী অনাবৃষ্টির ফলে ইহার প্রায় অর্দ্ধেক জল শুকাইয়া গিয়াছে। ইহাঁর পাঁকের উপর শতবর্ষজীবিত গণ্ডশৈলপ্রায় প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড কুম্ভীর নিদ্রা যাইতেছে। এই সময়ে শুক্ল-বস্ত্রধারী একজন বৃদ্ধ ঘাটের সিঁড়ির উপর আসিয়া, মস্‌জিদের মুয়েজ্জিনের মত সুস্পষ্ট-স্বরে টানাসুরে কি-একটা ক্রমাগত আবৃত্তি করিতে লাগিল;—নানাপ্রকার-বাহুভঙ্গি-সহকারে কুমীরদিগকে ডাকিতে লাগিল। তখন কুমীরেরা জাগিয়া উঠিল। প্রথমে ধীরে ধীরে ও অলসভাবে,—ক্ষণপরেই ক্ষিপ্রভাবে— চটুলভাবে সাঁতার দিয়া নিকটে আসিল। তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে বড়-বড় কচ্ছপও আসিল। তাহারাও ডাক শুনিয়াছে। তাহারাও খাইতে চায়। যেখানে সেই বৃদ্ধ এবং দুইজন ভৃত্য মাংসের ঝুড়ি হস্তে দাঁড়াইয়া ছিল, সেই সোপানপংক্তির নীচে আসিয়া উহারা চক্রাকারে সমবেত হইল এবং সীসাবর্ণ শ্লেষ্মা-চটচটে মুখ ব্যাদান করিয়া ঐ সব মাংস গিলিবার জন্য প্রস্তুত হইল। তখন উহাদের মুখের মধ্যে ছাগলের পাঁজরা, ভেড়ার পা, ফুস্‌ফুস্, অন্ত্রাদি নিক্ষিপ্ত হইল।

কিন্তু বাহিরের রাস্তায়, সেই সব ক্ষুধিত

মনুষ্যদিগকে খাওয়াইবার জন্য, মুয়েজ্জিনের কণ্ঠস্বরে কেহই তাহাদিগকে ডাকিতেছে না। সেই নবাগত ভিক্ষুকেরা এখনো ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; কেহ তাহাদের পানে চাহিয়া দেখিলে তখনি হাত বাড়াইয়া দিতেছে,—পেট চাপ্ড়াইতেছে। যাহারা ভিক্ষা চাহিয়া-চাহিয়া একেবারে হতাশ হইয়াছে, তাহারা জনতার মধ্যে—অশ্বগণের মধ্যে, ভূতলে শুইয়া পড়িয়াছে।

প্রাসাদমন্দিরাদির দুইটি বীথি যেখানে মিলিত হইয়াছে, সেইখানকার একটি চত্বর-ভূমিতে,—যেখানে দোকানদার, ঘোড়সওয়ার, মল্মল্বস্ত্রাবৃত অলঙ্কারভূষিত রমণী প্রভৃতির বহুল জনতা,—সেইখানে একজন বিদেশী, একজন ফরাসী,—শীর্ণকায় বীভৎসদর্শন চলৎশক্তিরহিত একগাদা ভিক্ষুকের নিকট আসিয়া তাহার গাড়ি থামাইল এবং নতকায় হইয়া তাহাদের স্পন্দহীন নিশ্চেষ্ট হস্তে কতকগুলা মুদ্রা অর্পণ করিল। তখন হঠাৎ একদল "মমি"-শব যেন পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠিল; মলিন চীরবস্ত্রের মধ্য হইতে মাথা তুলিল; চোখ মেলিয়া দেখিতে লাগিল। পরে সেই কঙ্কালমূর্ত্তিগুলা খাড়া হইয়া দাঁড়াইল। "ওরে! কে একজন আসিয়া ভিক্ষা দিচ্চে, পয়সা দিচ্চে; এইবার তবে খাদ্য-সামগ্রী কিনতে পারা যাবে।" যে-সব ভিক্ষুকের গাদা,—আর-একটু দূরে—পথ-চল্তি লোকের পিছনে, কাপড়ের বস্তার পিছনে, অথবা মিঠাইওয়ালার উনানের পিছনে প্রচ্ছন্ন ছিল, ক্রমশ তাদের মধ্যেও এই পুনর্জাগৃতি সংক্রামিত হইল। সেই সব গাদা নড়িয়া উঠিল, উঠিয়া দাঁড়াইল, অগ্রসর হইতে লাগিল। যাহাদের চোপসানো ঠোঁটের মধ্য হইতে দাঁত বাহির হইয়া পড়িয়াছে, যাহাদের মাছি-লাগা চোখ কোটরে ঢুকিয়া গিয়াছে, কণ্ঠনালীর অস্থিবলয়ের উপর যাহাদের স্তনগুল খালী থলের মত ঝুলিয়া পড়িয়াছে,—সেই সব শ্মশান-প্রেতেরা সেই বিদেশী ফরাসীকে ঘিরিয়া ফেলিল;—তাহার দিকে ঠেলিয়া আসিতে লাগিল: পক্ষান্তরে, তাহাদের দীননেত্র যেন মার্জ্জনাভিক্ষা করিতে লাগিল, আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল, কাকুতিমিনতি করিতে লাগিল।...

তাহার পর নিরুদ্ধভাবে সকলে সরিয়া পড়িল, কোথায় যেন মিলাইয়া গেল। ঐ প্রেতগণের মধ্যে একজনের পা দোক্‌লা-প্রযুক্ত টলিতেছিল; সে আর-একজনের কাঁধে ভর দিল;—এইরূপ পরস্পরের ঠেলা ও চাপে,—পুতুলনাচের পুতুলগুলার মত, একতাড়া পাকাটির মত, সবাই একসঙ্গে ভূতলে পড়িয়া গেল। কাহারও এতটুকু শক্তি নাই যে, সেই ঠেলা সাম্‌লাইয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে, উহারা মাটিতে পড়িয়া ধূলায় লুটাইতে লাগিল, মূর্চ্ছিত হইল, আর উঠিতে পারিল না।...

এই সময়ে একটা বাদ্যের রোল ক্রমশ নিকটবর্ত্তী হইল। আবার জনতার গুঞ্জন-ধ্বনি শোনা গেল। কাল দেবালয়ে উৎসব হইবে—ইহাই ঘোষণা করিবার জন্য মন্দিরের কতকগুলি লোক রাস্তায় সমারোহে বাহির হইয়াছে। এই সময়ে, পথ করিবার জন্য, একজন রক্ষিপুরুষ ক্ষুধাক্লিষ্টা একটি বৃদ্ধাকে ধরিল। এই বৃদ্ধা ধূলিতে মুখ গুঁজিয়া, দুই হাত সটান্ ছড়াইয়া, পুলিস-নির্দ্দিষ্ট লাইন্

ছাড়াইয়া, যাত্রাপথের উপর পড়িয়া ছিল। রক্ষিপুরুষ সেই কম্পিতকায় বৃদ্ধাকে উঠাইয়া-লইয়া পদপথের উপর রাখিয়া দিল।

এই সুন্দর সমারোহের ঠাট আবার চলিতে আরম্ভ করিল। প্রথমে একটা কালো হাতী যাত্রা সুরু করিল। ইহার শুণ্ড শেষ-প্রান্ত পর্য্যন্ত স্বর্ণবর্ণে রঞ্জিত। শানাই ও কর্ত্তাল বাজাইতে বাজাইতে বাদকেরা সকলের পিছনে চলিয়াছে। সানাইয়ে একটা বিষাদ-গম্ভীর সুর আলাপ করিতেছিল।

পরে, উচ্চ মুক্তার মুকুটে সুশোভিত হইয়া, দেবসজ্জায় সজ্জিত একদল বালককে পৃষ্ঠে লইয়া, চারিটা ধূসরবর্ণ হস্তী অগ্রসর হইল। গজারূঢ় সুসজ্জিত বালকেরা, রঙিন সুগন্ধি চূর্ণরাশি জনতার উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। এই চূর্ণ এত পাতলা ও লঘু যে, উহা জলদজাল বলিয়া মনে হয়। প্রথমেই এই চূর্ণ নিজ্ হাতীদের উপর নিপতিত হইল। এই সব হাতীদের মধ্যে কেহ বা বেগ্‌নি, কেহ বা হল্‌দে, কেহ বা সবুজ, কেহ বা লাল—এইরূপ বিচিত্র রঙে রঞ্জিত হইল। এই মোহনমূর্ত্তি বালকেরা স্মিতহাস্যসহকারে মুঠা-মুঠা চূর্ণ জনতার মধ্যে নিক্ষেপ করিতে লাগিল; লোকদের পরিচ্ছদ, পাগ্‌ড়ী, মুখ,—নানারঙে রঞ্জিত হইল। যে সকল দুর্ভিক্ষপীড়িত কঙ্কালসার ক্ষুদ্র বালকেরা ভূতলশায়ী হইয়া এই সমারোহ-যাত্রা দেখিতেছিল,—এমন কি তাহাদের উপরেও এই চূর্ণমুষ্টির বর্ষণ হইতে লাগিল। তাহাদের দুর্ব্বল হস্ত ক্ষিপ্রতার সহিত আপনাদিগকে রক্ষা করিতে না পারায়, তাহাদের চক্ষু সেই চূর্ণে আচ্ছন্ন হইয়া গেল।

সহসা দিবাবসান হইল। চতুর্দ্দিকস্থ সেই শাদাফুলের নক্‌সা-কাটা একঘেয়ে গোলাপী রং ক্রমে ম্লান হইয়া আসিল। আকাশ Periwinkleফুলের রং ধারণ করিল। উহা ধূলায় এরূপ আচ্ছন্ন যে, রজতরঞ্জিত চন্দ্রমাও পাংশুবর্ণ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। ঘুমাইবার জন্য পাখীর ঝাঁক নীচে নামিয়া আসিল। গোলাপী প্রাসাদসমূহের কানাচের উপর,—পায়রা ও কাক কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘরজ্জুর আকারে সারিবন্দি হইয়া ঘেঁষাঘেঁষি বসিল। কিন্তু শকুনি ও চিলেরা এখনো বিলম্ব করিতেছে—এখনো গয়ংগচ্ছভাবে আকাশে ঘোরপাক দিতেছে। যে সকল মুক্ত বানর গৃহাদির উপর বাস করে, এখন নিদ্রার সময় উপস্থিত হওয়ায়, তাহারা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে;—থাবার উপর ভর দিয়া, ঊর্দ্ধপুচ্ছ হইয়া, পরস্পরকে অনুধাবন করিতেছে। উহাদের অপূর্ব্ব ছায়ামূর্ত্তিগুলা গৃহছাদের ধারে ধারে ছুটাছুটি করিতেছে। নীচে, বড় রাস্তা জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। কেন না, প্রাচ্য নগরসমূহে, রাত্রিকালে কোন কাজকর্ম্ম হয় না।

একটা পোষা চিতাবাঘিনী শুইবার জন্য এখনি প্রাসাদে যাইবে। টুপিটা তাহার পাশে রহিয়াছে,—একটা রাস্তার কোণে বেশ ভালমানুষের মত উবু হইয়া বসিয়া আছে। তাহার পরিচারকেরাও তাহাকে ঘিরিয়া ঐরূপভাবে বসিয়া আছে। তাহাদের মধ্যে সেই পুচ্ছধারী ভৃত্যটিও আছেন। দুই-পা দূরে, একদল দুর্ভিক্ষপীড়িত বালক ভূমিতে পড়িয়া হাঁপাইতেছে; বাঘিনীর Jude-মণির মত ফিঁকা হরিদ্বর্ণ চক্ষুর প্রহেলিকাপূর্ণ দৃষ্টি তাহাদের উপর নিপতিত রহিয়াছে।

দোকানদারেরা তাড়াতাড়ি তাহাদের বিচিত্ররঙের বস্ত্রাদি ভাঁজ করিয়া রাখিতেছে; তাহাদের ঝক্‌ঝকে তাম্রসামগ্রী—তাহাদের থালা, তাহাদের ঘটিবাটী ঝুড়ির মধ্যে উঠাইয়া রাখিতেছে। এই সমস্ত জিনিষপত্র উঠাইয়া তাহারা নিজ নিজ গৃহে চলিয়া গেল। এই সব নেত্ররঞ্জন দ্রব্যসামগ্রীর মধ্যে যে সকল কঙ্কালমূর্ত্তি দল বাঁধিয়া ইতস্তত শুইয়া ছিল;—দ্রব্যসামগ্রী অপসারিত হইলে ক্রমে তাহারা একটু একটু করিয়া নেত্রসমক্ষে প্রকাশ পাইতে লাগিল। এখানে ইহারাই এখন অবশিষ্ট;—এই পদপথের উপর এখন ইহাদেরই একাধিপত্য।

ক্রমশ এই দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকেরা দল ছাড়িয়া পৃথক্ হইয়া পড়িল। এখন চারিদিক্ জনশূন্য—এখন ইহাদিগকেই অধিক সংখ্যায় দেখা যাইতেছে। একটু পরেই দেখিতে পাইবে, তাহাদের মৃতশরীরে—তাহাদের মলিন চীরবস্ত্রে সমস্ত পদপথ পরিচিহ্নিত।

নগরপ্রাচীরের বাহিরে, উদাস-উজাড় ক্ষেত্রভূমির মধ্যে, এই সন্ধ্যাকালে,—প্রাণিপুঞ্জে সমস্ত মরা-গাছগুলা আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। চিল, শকুনি, বড়-বড় জাঁকালো ময়ূর, এক এক পরিবারের মত দল বাঁধিয়া গাছের উপর বিশ্রাম করিতেছে। পত্রহীন লঘু শাখা-প্রশাখার মধ্যে যে-সব স্থান শূন্য ছিল, এক্ষণে উহাদের দ্বারা পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। উহাদের দিবসের ডাক অনেকটা থামিয়া আসিয়াছে; অনেক্ষণ পরে-পরে এক একবার ডাকিয়া উঠিতেছে। একটু পরে একেবারেই নীরব হইবে। ময়ূরদের প্যান্‌পেনে চিছ্‌কাঁছনি ডাক সন্ধ্যার প্রাক্কাল পর্য্যন্ত চলিতে থাকে, তাহার পরেই শৃগালেরা শোকোচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বরে উহার "উতর" গাইতে আরম্ভ করে।

রাত্রি দশটা। এ নগরের পক্ষে অনেক রাত্রি; কেন না, এখানে দিবাবসানের সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত কাজকর্ম্ম বন্ধ হইয়া যায়। চতুর্দ্দিকস্থ মাঠময়দান একেবারেই নিস্তব্ধ। দূর দিগন্তে, মনে হয়, যেন কুয়াসা হইয়াছে। উহা ধূলি বই আর কিছুই নহে। সমস্তই শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। শাদা গুঁড়ায় ঢাকা মাটির উপর, মরা গাছের উপর, চন্দ্রালোক পতিত হইয়াছে। আবার এই অমল শুভ্রতার উপর হঠাৎ নৈশশৈত্যের আবির্ভাব হওয়ায়, মনে হইতেছে যেন তুষার পড়িয়াছে; শীতঋতু আসিয়াছে, যে-সব আসন্ন-মৃত্যু দুর্ভিক্ষপীড়িত বালকেরা নগ্নাবস্থায় ভূতলে পড়িয়া কষ্টে শ্বাসগ্রহণ করিতেছে, না জানি, তারা এখন শীতে কতই কাতর। এখন খুবই ঠাণ্ডা পড়িয়াছে।

বাহিরের ন্যায়, নগরপ্রাচীরের অভ্যন্তরেও সমস্ত নিস্তব্ধ। কদাচিৎ কোথাও, দেবালয় হইতে চাপা সঙ্গীতধ্বনি শোনা যাইতেছে। তা ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না। এই সকল দেবালয়ের গজমূর্ত্তিশোভিত উচ্চ সোপান দিয়া শুক্লপরিচ্ছদধারী কতকগুলি লোক এখনো উঠা-নামা করিতেছে; তা ছাড়া একটিও প্রাণী নাই। রাস্তাঘাট সমস্তই শূন্য। লোকের চলাচল না থাকায়, এই সকল রাস্তা যেন আরো চওড়া ও বিশাল বলিয়া মনে হইতেছে। নৈশ নিস্তব্ধতার মধ্যে, এই গোলাপী নগর * চন্দ্রালোকেও গোলাপী

* জয়পুর—অনুবাদক।

দেখাইতেছে; এবং ইহার সৌধপ্রাসাদ ও প্রাসাদের দন্তুর চূড়াবলী যেন আরো বর্দ্ধিতায়তন হইয়া উঠিয়াছে।

দুর্ভিক্ষের আশঙ্কায় যেখানে চাউলের বস্তা গাদা করিয়া রাখা হইয়াছে এবং যেখানে বেত্রধারী রক্ষিপুরুষেরা পাহারা দিতেছে—সেই পদপথের উপর এবং সেই বস্তাগুলার পার্শ্বে, এখনো সেই সব কালো-কালো কঙ্কাল-মূর্ত্তির গাদা। দূরদূরান্তরে, ছোট-ছোট পাথরের কুলুঙ্গি-ঘর, যাহা দিনমানে জনতার মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা এখন নেত্রসমক্ষে প্রকাশ পাইতেছে। প্রত্যেক কুলুঙ্গির মধ্যে এক-একটি বিগ্রহ—গজমুণ্ডধারী ঘোরদর্শন গণেশ, কিংবা মৃত্যুর দেবতা শিব অধিষ্ঠিত। সকলেরই গলায় মালা এবং সকলেরই নিকটে একএকটা প্রদীপ জ্বলিতেছে;—এই প্রদীপ সমস্ত রাত্রি জ্বলিবে।

এই সব ময়লা ছেঁড়া ন্যাকড়ার গাদা—যাহার কোন-একটা বিশেষ রূপ নাই, নাম নাই, যাহা অনির্দ্দেশ্য—ইহাই এই সুরম্য গোলাপী নগরের একমাত্র কলঙ্ককালিমা। মধ্যে-মধ্যে এই ন্যাকড়ার গাদা হইতে, কখন বা কাশির শব্দ, কখন বা গোঙানি-শব্দ, কখন বা নাভিশ্বাসের শব্দ শুনা যায়; আবার কখন-কখন দেখা যায়,—সেই ন্যাকড়ার গাদা হইতে কেহ বা বাহুরূপ অস্থিখণ্ড বাহির করিয়া নাড়িতেছে; কেহ বা সেই ন্যাকড়াগুলা জ্বরবিকার-গ্রস্ত রোগীর ন্যায় উন্মত্তভাবে ঝাঁকাইতেছে;—গাঁট-বাহির-করা অস্থিসার পা-গুলা ছুঁড়িতেছে। যাহারা এইরূপ মাটির উপর মুক্তাকাশতলে পড়িয়া আছে, তাহাদের পক্ষে, কি জ্বালাময় দিবস, কি প্রশান্ত রাত্রি, কি প্রভাময় প্রভাত—সকলি সমান। তাহাদের কোন আশাভরসা নাই। তাহাদের প্রতি কাহারো মায়া-মমতা নাই। তাহাদের ভারক্লান্ত মস্তক যেখানে একবার ঢলিয়া পড়িয়াছে, সেইখানেই পড়িয়া থাকিবে; সেই পদপথের সানের উপরেই উহাদিগকে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় থাকিতে হইবে; এবং সেই মৃত্যুতেই উহাদের সকল যন্ত্রণার অবসান হইবে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

"তানূ-নপ্ত্র।"

'তানূনপ্ত্র'—ইহা একটি বৈদিক শব্দ;—একটি বৈদিক কর্ম্মের নাম। পরস্পর মৈত্রী-বন্ধনের জন্য পুরাকালে এই কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইত। আপস্তম্ব-শ্রৌতসূত্রে * ইহার অনুষ্ঠানপ্রকার পাওয়া যায়। তাহা আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, প্রাচীন আর্য্যগণ ঘৃতস্পর্শ করিয়া পরস্পরে সখ্যবন্ধন করিতেন। এই ঘৃতস্পর্শব্যাপারে অবশ্য

* ১১।১।১—৩।

অন্যান্য আরও অনুষ্ঠেয় বিধি আছে, তাহা সাধারণের হৃদয়াকর্ষক হইবে না মনে করিয়া, ঐ সমস্ত বর্ত্তমান প্রবন্ধে উদ্ধৃত হইল না; কেবল এই 'তানূনপ্ত্র'কার্য্যের মূল কোথায় ও তাহার উপকারিতা কি, তাহাই কিঞ্চিৎ দেখাইতে চেষ্টা করিব।

যাহার অনুষ্ঠানে 'তনুর পতন হয় না,' তাহার নাম 'তানূনপ্ত্র'; ইহা বুৎপত্তিলভ্য অর্থ।* তনুশব্দে এখানে ধন, বল, পুত্র, শরীরাদি। নিম্নলিখিত বিবরণটি পাঠ করিলে বুঝা যাইবে, 'তানূ-নপ্ত্র' বস্তুতই 'তানূ-নপ্ত্র'। 'তানূনপ্ত্রে'র সৃষ্টি সেই সময়ে হইয়াছিল, যখন ধন-বল প্রভৃতির রক্ষণ দুষ্কর হইয়া পড়িয়াছিল; যখন পরস্পর অনৈক্যে-বিচ্ছেদে প্রত্যেকে জর্জরিত হইয়া উঠিয়াছিলেন; যখন ব্যক্তিবিশেষের প্রাধান্য লোকের অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল,—সকলেই প্রধান হইবার জন্য ব্যগ্রভাব অবলম্বন করিতেছিলেন; যখন পরস্পরের সমুন্নত সমৃদ্ধি অন্তঃকরণে নিপীতবিষবৎ তীব্রজ্বালা উপস্থিত করিয়াছিল; আর যখন শত্রুগণ সেই সময়ে যুক্ত অবসর লাভ করিয়া বিজয়াভ্যুত্থানে দিগন্তর কম্পিত করিয়া তুলিয়াছিল। এই দুর্বিষহ বিপত্তি হইতে রক্ষা করিবার জন্যই বৈদিক ঋষি 'তানূনপ্ত্র' করিতে সকলকে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। তাহার উদ্দেশ্য প্রণীত বহ্নিতে কয়েকটি হবিরাহুতিপ্রক্ষেপ নহে বা কেবল ঘৃতস্পর্শনও নহে;—তাহা আমাদিগকে হৃদয়ে-হৃদয়ে সম্পাদন করিতে হইবে,—ইহা অন্তরনুষ্ঠেয়, বহিরনুষ্ঠান কেবল তাহার ঐ পরমমঙ্গল ভাবকে উদ্বুদ্ধ করিয়া দিবার জন্য।

আমাদের এই মন্তব্যের কতটুকু সার্থক্য আছে, তাহা 'তানূনপ্ত্রে'র মূল অন্বেষণ করিলেই পরীক্ষিত হইতে পারিবে।

বেদে (মন্ত্র ও ব্রাহ্মণে †) ইহা এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে—

'পুরাকালে দেবগণের অসুরসমূহের সহিত সংগ্রাম উপস্থিত হইলে, দেবগণ নিজেদের মধ্যে পরস্পরে বিপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন; তাঁহারা পরস্পরের জ্যৈষ্ঠ্য (শ্রেষ্ঠত্ব) বা শ্রীসমৃদ্ধি, সহ্য করিতে পারিতেছিলেন না। অবশেষে ঐ মনোমালিন্যহেতু পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া দেবগণ পঞ্চভাগে বিভক্ত হইয়া যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইলেন। ইহার প্রথম দলের অধিনায়ক অগ্নি, মন্ত্রী বসুগণ; দ্বিতীয়ের সোম, মন্ত্রী রুদ্রবৃন্দ; তৃতীয়ের ইন্দ্র, মন্ত্রী মরুদ্গণ; চতুর্থের বরুণ, মন্ত্রী আদিত্যসমূহ ও পঞ্চমের বৃহস্পতি, মন্ত্রী বিশ্বদেবসংঘ। ‡

* "তনূনাং পুত্রাদিশরীরাণাং নপ্তৃঃ ন পতনম্"—ইতি ঐতরেয়ব্রাহ্মণভাষ্যে সায়ণাচার্য্যঃ। তুলনায়—তে বহ্-বরুণস্য রাজ্ঞো গৃহে তনূঃ সন্ন্যদধত, তৎ তানূনপ্ত্রমভবৎ; তৎ তানূনপ্ত্রস্য তানূনপ্ত্রত্বম্।" ঐতরেয়ব্রাহ্মণ ১।৪।৭

† "মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্বেদশব্দ" ইত্যাপস্তম্ব।

‡ "দেবাসুরান্‌সংযত্তা আসন্, তে দেবা মিথো বিপ্রিয়া আসন্, তেঽন্যোন্যস্মৈ জ্যৈষ্ঠ্যায়াতিষ্ঠমানাঃ পঞ্চধা ব্যক্রামন্নগ্নির্বসুভিঃ, সোমো রুদ্রৈঃ, ইন্দ্রো মরুদ্ভিঃ, বরুণ আদিত্যৈঃ বৃহস্পতির্বিশ্বৈর্দেবৈঃ।" তৈত্তিরীয়সংহিতা ৬।২।২

গান্ সমযতিরিৎ, তে চতুর্ধা ব্যদ্রবন্নোন্যস্য শ্রিয়া অতিষ্ঠমানা অগ্নির্বসুভিঃ, সোমো রুদ্রৈঃ, বরুণ আদিত্যৈঃ, ইন্দ্রো মরুদ্ভিঃ, বৃহস্পতির্বিশ্বৈর্দেবৈঃ; উত হৈক আহুরেতে হ ষেব তে বিশ্বেদেবা যে তে চতুর্ধা ব্যদ্রবন্।" শতপথ-ব্রাহ্মণ ৩।৪।২—১।

তুলনীয়—ঐতরেয়ব্রাহ্মণ ১।৪।৩

দেবগণ যখন এইরূপে পরস্পর বিশ্লিষ্ট, তখন অসুরবৃন্দ ঐ যুক্ততম অবসর লাভ করিয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করে। * এতক্ষণে দেবগণের চৈতন্যোদয় হইল। অসুরগণকর্ত্তৃক ভবিষ্যৎ পরাভবের ভয়ে তাঁহারা ভাবিতে লাগিলেন †—'আমরা যে এই পরস্পরের মধ্যে বিপ্রিয় হইয়া উঠিতেছি, তাহা কেবল শত্রুর অভীষ্টসিদ্ধির জন্য হইতেছে; ‡ ইহাতে আমরা পাপীয়ান্ হইয়া পড়িতেছি; § অতএব আমরা ঐকমত্য অবলম্বন করিব, এবং আমাদের মধ্যে প্রধানত একই ব্যক্তির সমৃদ্ধির জন্য,—একই ব্যক্তিকে জ্যেষ্ঠত্ব-অধিকার প্রদান করিয়া আমরা অবস্থান করিব ॥।' অবশেষে তাহাই হইল; প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক ঐকমত্য গ্রহণ করিবেন বলিয়া তাঁহারা স্থির করিলেন। সকলেই নিজ নিজ প্রিয়তম "তনূ"-রূপ ধন-বৈভব-পুত্রকলত্রাদি রাজা বরুণের গৃহে একত্র সমবেত করিয়া শপথ করিলেন যে, তাঁহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি প্রথমে অন্য কাহারও দ্রোহ আচরণ করিবে বা যে এই সময় উলঙ্ঘন করিবে, সে তাহার ঐ সকল ধনবৈভবাদি হইতে বঞ্চিত হইবে। ¶ তাঁহারা উপস্থিত কার্য্য কোনরূপে সম্পন্ন করিবার জন্য সেই ঐক্যবন্ধন করেন নাই; তাঁহারা শপথ করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা যতদিন দ্যুলোকে অবস্থান করিবেন, ততদিন তাহা 'অজর্য্য'—অক্ষয় হইয়া থাকিবে। ** দেবগণ এইরূপে ইন্দ্রকেই নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব-নায়কত্ব অর্পণ করিয়া বিজয়লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন, এবং তজ্জন্যই কথিত হইয়াছে—"ইন্দ্রশ্রেষ্ঠা দেবাঃ।" ††

ঋষিগণ 'তানূনপ্ত্রে'র এই ইতিবৃত্তের উল্লেখ করিয়া জগৎকে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন—'যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্তরূপ 'তানূনপ্ত্রে'র অনুষ্ঠান করে, সে শত্রুপরাভব করিতে পারে ও স্বয়ং বিভূতিমান্ হয়। যে ব্যক্তি 'সতানূনপ্ত্রী'—তাদৃশসমানপ্রতিজ্ঞা-

* "তান্ বিক্রতান্ অসুররক্ষসান্যনুব্যবেয়ুঃ।" শতপথব্রাহ্মণ ৩।৪।২।১

† "তে দেবা অবিভয়ুরস্মাকং বিপ্রেমাণমবিদমসুরা আভবিষ্যন্তীতি।" ঐতরেয়ব্রাহ্মণ ১।৪।৭

‡ "তেঽমন্যন্তাসুরেভ্যো বা ইদং ভ্রাতৃব্যেভ্যো রধ্যামো যন্মিথো বিপ্রিয়াঃ স্মঃ।" তৈত্তিরীয়সংহিতা ৬।২।২।৬

§ "তেঽবিদুঃ—পাপীয়াংসো বৈ ভবামোঽসুররক্ষসানি বৈ নোঽনুব্যাবাগুঃ, দ্বিষদ্ভ্যো বৈ রধ্যামো।" শতপথব্রাহ্মণ ৩।৪।২।২

|| "হন্ত সংজানামহা একস্য শ্রিয়ৈ তিষ্ঠামহা ইতি।" শতপথব্রাহ্মণ ৩।৪।২।২

¶ "যা ন ইমাঃ প্রিয়াস্তনুবঃ, তাঃ সমবদ্যামহৈ, তাভ্যঃ স নির্ঋচ্ছাদ্যঃ।—নঃ প্রথমোঽন্যোঽন্যস্মৈ দ্রুহ্যাদিতি।" তৈত্তিরীয়সংহিতা, ৬।২।২।৬—৯

"হন্ত যা এব ন ইমাঃ প্রিয়তমাস্তন্বঃ, তা অস্য বরুণস্য রাজ্ঞো গৃহে সন্নিদধামহৈ; তাভিরেব নঃ স ন সংগচ্ছাতৈ, যো ন এতদতিক্রামাদ্য আলুলোভয়িষাদিতি। ঐতরেয়ব্রাহ্মণ ১।৪।৭

"তে দেবাঃ। জুষ্টাস্তনূঃ প্রিয়াণি ধামানি সার্দ্ধং সমবদাদিরে। তে হোচুরেতেন নঃ স নানাসদ্, এতেন বিষঙ্ যো ন এতদতিক্রামাদিতি।" শতপথব্রাহ্মণ ৩।৪।২।৫

** "তে হোচুঃ। হন্তেদং তথা করবামহৈ, যথা ন ইদমাপ্রদিবমেবাজর্য্যম্ অসদিতি।" শতপথ ৩।৪।২।৪

†† "ত ইন্দ্রস্য শ্রিয়া অতিষ্ঠন্, তস্মাদাহুরিন্দ্রঃ সর্ব্বা দেবতা—ইন্দ্রশ্রেষ্ঠা দেবা ইতি।" শ-প ৩।৪।২।২

বন্ধুগণের মধ্যে প্রথমে কাহারও দ্রোহাচরণ করে, সে কষ্ট পায়।* দেবতারা পরস্পর বিশ্লিষ্ট হওয়াতেই অসুরসমূহকর্ত্তৃক তাঁহাদের পরাভব হইয়াছিল, অতএব কেহই নিজ নিজ জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে বৈমত্য উৎপাদন করিয়া ভেদসাধন করিবে না; অন্যথা অত্যন্ত দূরবর্ত্তী শত্রুও আসিয়া প্রবেশলাভ করিবে। আত্ম-ভেদকারী পুরুষ শত্রুর আনন্দ উৎপাদন করে, সে স্বয়ংই শত্রুর বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। অতএব কথনই আত্মবিচ্ছেদ করিবে না। যে ব্যক্তি এই সকল অবগত হইয়া আত্মভেদ সাধন না করে, সে শত্রুর অপ্রিয় করে এবং তাহার বশীভূতও হয় না।' †

বৈদিক ঋষিগণ এই 'তানূনপ্ত্রে'র অবতারণা করিয়া যে পীযূষমধুর উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহা আলোচনা করিয়া কোন্ ব্যক্তির হৃদয় আনন্দরসে আপ্লুত না হয়? দেবগণ বুঝিয়াছিলেন যে, পরস্পর বিরোধ থাকিলে বা সকলেই জ্যেষ্ঠত্ব-অধিকার-লাভের অভিলাষ করিলে কথনই অভীষ্টসিদ্ধির আশা করিতে পারা যায় না, তাই তাঁহারা ইন্দ্রকে 'শ্রেষ্ঠ' বা 'নায়ক'রূপে স্বীকার করিয়া ঐকমত্য অবলম্বন করেন। অভ্যুদয়লাভের যে ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট মার্গ, পূজ্যপাদ ঋষিগণ তাহা সবিশেষ আলোচনা করিয়া অসকৃৎ নানা উপাখ্যানে, বিবিধ কথায় আমাদিগকে বলিয়া গিয়াছেন। এই উপদেশটি তাঁহাদিগের অত্যন্ত প্রিয় বলিয়াই হয় ত সমস্ত ঋগ্বেদ শ্রবণ করাইয়া সর্ব্বান্তিম সূক্তে তাঁহারা ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন—

"হে স্তোতৃগণ, প্রাচীন দেবগণ যেমন ঐকমত্য অবলম্বন করিয়া স্বকীয় অংশ গ্রহণ করিয়াছেন, তোমরাও সেইরূপ সঙ্গত হও, বিরোধ পরিত্যাগ করিয়া একই কথা বল, এবং তোমাদের হৃদয় এক হউক।"

"তোমাদের মন্ত্র (মন্ত্রণা—গুপ্তভাষণ) সমান হউক, সমিতি সমান হউক, অন্তঃকরণ সমান হউক ও বিচারজ জ্ঞান সমান হউক; আমি তোমাদিগকে একরূপ হইবার জন্যই সংস্কার করিতেছি; তোমাদের সাধারণ হবির্দ্বারাই আমি হোম করিতেছি।"

"হে ঋত্বিক্ ও যজমানগণ, তোমাদের অধ্যবসায় সমান হউক, তোমাদের হৃদয় সমান হউক, তোমাদের অন্তঃকরণ সমান হউক,—যাহাতে তোমাদের সুন্দর সাহিত্য (সংহতি) সংঘটিত হইতে পারে।" ‡

শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী।

---

* "তস্মাদ্যঃ স তানূ-নপ্ত্রিণাং প্রথমো দ্রুহ্যতি, স আর্ত্তিমার্চ্ছতি। যস্তানূনপ্ত্রং সমবদ্যতি ভ্রাতৃব্যাভিভূত্যৈ ভবত্যাত্মনা, পরাস্য ভ্রাতৃব্যো ভবতি।" তৈত্তিরীয়সংহিতা ৬,২।২।৯

† "তস্মাদিহ ন মা ঋতীয়েরন্। য এষাং পরস্তরামিব ভবতি স এমানন্বৃষ্যবৈতি, তে প্রিয়ং দ্বিষতাং কুর্ব্বন্তি, দ্বিষদ্ভ্যো রধ্যন্তি, তস্মান্নর্ত্তীয়েরন্, স যো হৈবং বিদ্বান্নর্ত্তীয়তেঽপ্রিয়ং দ্বিষতাং করোতি, ন দ্বিষদ্ভ্যো রধ্যতি, তস্মান্নর্ত্তীয়েত।" শতপথব্রাহ্মণ ৩।৪।২।৩

‡ "সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্।
দেবা ভাগং যথা পূর্ব্বে সংজানানা উপাসতে॥
সমানো মন্ত্রঃ, সমিতিঃ সমানী, সমানং মনঃ, সহচিত্তমেষাম্।
সমানং মন্ত্রমভিমন্ত্রয়ে বঃ, সমানেন বো হবিষা জুহোমি।
সমানী ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি॥ ঋগ্বেদসংহিতা। ১০।১৯১।২—৪

রাইবনীদুর্গ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

অশ্বারোহি-দুইজন অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী হইলে দাসমহাশয় চিনিলেন, অগ্রবর্ত্তী স্বয়ং কুমার পদাঙ্কনারায়ণ। অপর ব্যক্তির যোদ্ধৃ-বেশ, তিনি সম্পূর্ণ অপরিচিত। উভয়ে আরো কাছে আসিলে দেখা গেল, যোদ্ধৃবেশীর শির-স্ত্রাণ মহারাষ্ট্রীয়। তা ছাড়া, তাঁহার সাজ-সজ্জায় এমন-একটা সাদাসিধে ভাব অথচ পারিপাট্য লক্ষিত হইতেছিল, যাহা কেবল শুদ্ধসত্ত্ব ব্রাহ্মণেই সম্ভব।

কুমার অগ্রসর হইয়া আনন্দে ও উৎসাহে বলিলেন, "দাদামহাশয়, তোমার জন্য অতিথি এনেছি। মহাশয়, ইনিই আমার দাদা-মহাশয়।"

পদাঙ্কনারায়ণ এই বলিয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন এবং স্বয়ং আগন্তুককে নামাইয়া-লইয়া চিরপরিচিতের মত তাঁহার দাদামহাশয়ের জিম্মা করিয়া দিলেন। ইহাতে এতটা সরল বালকতা অথচ সমাগত অতিথির জন্য সম্ভ্রমব্যস্ততা প্রকাশ পাইল যে, তাঁহারা উভয়ে মুগ্ধ হইয়া উচ্চহাস্য করিলেন।

চড়কের দোল তখনও পুরামাত্রায় চলিতে-ছিল। কুমার অপ্রতিভ হইয়া সেদিকে ছুটিয়া গেলেন।

শিবাপ্রসন্ন আগন্তুককে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "এই চৈত্রসংক্রান্তির মেলা আমার বংশের আদিপুরুষের স্থাপিত, আর তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত মহেশ্বর ও ভবানীর পূজা ইহার উপলক্ষ্য। মহাশয় অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া এদিকে আসিতেছেন শুনিয়া এই জনসমুদ্র চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু আপনি স্বয়ং ব্রাহ্মণ, হিন্দুকুলচূড়া মহারাজা শিবাজীর প্রতি-নিধি, ধর্ম্মার্থ সমাগত হিন্দুদের প্রতি কেন অত্যাচার করিবেন? ইহাই বুঝাইয়া আমি ইহাদের থামাইয়া রাখিয়াছি।" আগন্তুক প্রীতিভরে দাসমহাশয়ের করস্পর্শ করিলেন। সকলকে শুনাইয়া উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "হিন্দু-ধর্ম্মের গৌরবরক্ষাই মহারাজা শিবাজী ও তাঁর পরবর্ত্তীদের উদ্দেশ্য। হিন্দুস্থানের এমনই দুর্দ্দিন উপস্থিত যে, এ কথা লোকে সহসা বিশ্বাস করিতে চায় না। কিন্তু দেবাদিদেব মহাদেব আর মা ভবানী জানেন, ভিতরের কথা তাহাই।" শুনিয়া জনমণ্ডলী নির্ভয়ে "জয় শিবশম্ভু" উচ্চারণ করিয়া উঠিল।

সূর্য্যাস্তের তখন বেশী দেরি ছিল না। শিবাপ্রসন্ন তাঁহার অতিথিকে সমাগত বাগদী ও কৈবর্ত্তদের লাঠি ও তরবারি খেলা কিছুক্ষণ-মাত্র দেখাইয়া মেলা ভাঙিবার ইঙ্গিত করিলেন। দেখিতে দেখিতে সে জনস্রোত মিলাইয়া গেল।

কুমার এই অবসরে পুনরায় অশ্বারোহণ করিয়া শিবাপ্রসন্নের সমীপবর্ত্তী হইলেন। বলিলেন, "দাদামহাশয়, একটা কথা তোমায়

বলিতে ভুলিয়াছি। ইঁহার সঙ্গে যে পাঁচশ' ঘোড়সওয়ার আছে, তাহারা নদীপার হইয়া গেল। আমি তোমার অনুমতি না লইয়াই গজাদীনকে তাহাদের সঙ্গে পাঠাইয়াছি। আজ রাইবনীতে তাহারা রাত্রে থাকিবে—বেশ ত? আমি তোমার অতিথিকে বলিয়াছি, সেখানে মুকুন্দদেব রাজার সঙ্গে কুলাঙ্গার কালাপাহাড়ের লড়াই হইয়াছিল।" দাস-মহাশয় আগন্তুকের অভিপ্রায় জানিয়া বলিলেন—"রাত্রেই তাহাদিগকে জঙ্গলমহলের দিকে যাইতে হইবে। পদ, ভাই, তুমি অগ্রসর হইয়া উমাপুরে কিছুক্ষণের জন্য তাহাদিগকে বিশ্রাম করাও। রাইবনী যাওয়া হইবে না। আমরা দুজনে সন্ধ্যা করিয়া একটু পরে আসিতেছি।"

কথা শিবাপ্রসন্নের ওষ্ঠচ্যুত হইতে না হইতে কুমার পদাঙ্কনারায়ণ বেগে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন। যতক্ষণ তাঁহাকে দেখা গেল, মুগ্ধের ন্যায় শিবাপ্রসন্ন ঘোটকারোহী কিশোর কার্ত্তিকেয়-তুল্য সেই মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া রহিলেন।

তখন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণপণ্ডিত ভাস্করের সঙ্গে দাসমহাশয় দেবস্থানে গেলেন। উভয়ে সন্ধ্যাবন্দনা শেষ করিয়া মহেশ্বর-ও-ভবানী-মূর্ত্তিসমক্ষে একটা গুরুতর প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হইলেন। কিন্তু সে কথা এখন বলিবার সময় নহে।

ক্রমশ।

অপূর্ব্ব মিলন।

হে প্রেম রহস্যময়, মনে হয়েছিল
ভালবাসিলেই বুঝি তোমার জটিল
কুহকের আবরণ যাবে মুক্ত হ'য়ে,
বুঝিব সকলি। কি কুশল অভিনয়ে
বিরহের মিলনের সব অঙ্কগুলি
সাঙ্গ হ'ল একে একে, আজি তবু ভুলি
অন্তহীন অভিনব তোমার লীলায়
সুখের মিলন সেই; আর আজি হায়
এ তীব্র বিরহব্যথা, তবু তারি মাঝে
কেমনে সে মিলনের আনন্দ বিরাজে,
সেই তৃপ্তি, সে আগ্রহ, সেই নেত্রনীর,
সেই সে অপূর্ব্ব দুঃখ, শান্তি সুগভীর।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

বঙ্গদর্শন।

আবরণ।

পায়ের তেলোটি এমন করিয়া তৈরি হইয়া ছিল যে, খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া পৃথিবীতে চলিবার পক্ষে এমন ব্যবস্থা আর হইতে পারে না। যেদিন হইতে জুতা পরিতে সুরু করিলাম, সেই দিন হইতে তেলোকে মাটির সংস্রব হইতে বাঁচাইয়া তাহার প্রয়োজনকেই মাটি করিয়া দেওয়া গেল। পদতল এতদিন অতি সহজেই আমাদের ভার বহন করিতেছিল, এখন হইতে পদতলের ভার আমাদিগকে লইতে হইল। এখন খালিপায়ে পথে চলিতে হইলে পদতল আমাদের সহায় না হইয়া পদে পদে দুঃখের কারণ হইয়া উঠে। শুধু তাই নয়, ওটাকে লইয়া সর্ব্বদাই সতর্ক থাকিতে হয়; মনকে নিজের পদতলের সেবায় নিযুক্ত না রাখিলে বিপদ্ ঘটে। ওখানে ঠাণ্ডা লাগিলেই হাঁচি, জল লাগিলেই জ্বর—অবশেষে মোজা, চটি, গোড়তলা জুতা, বুট্ প্রভৃতি বিবিধ উপচারে এই প্রত্যঙ্গটির পূজা করিয়া ইহাকে সকল কর্ম্মের বাহির করিয়া দেওয়া হয়। ঈশ্বর আমাদিগকে খুর দেন নাই বলিয়া ইহা তাঁহার প্রতি একপ্রকার অনুযোগ।

এইরূপে বিশ্বজগৎ এবং আমাদের স্বাধীন-শক্তির মাঝখানে আমরা সুবিধার প্রলোভনে অনেকগুলা বেড়া তুলিয়া দিয়াছি। এইরূপে সংস্কার ও অভ্যাসক্রমে সেই কৃত্রিম আশ্রয়-গুলাকেই আমরা সুবিধা এবং নিজের স্বাভাবিক শক্তিগুলিকেই অসুবিধা বলিয়া জানিয়াছি। কাপড় পরিয়া পরিয়া এম্‌নি করিয়া তুলিয়াছি যে, কাপড়টাকে নিজের চামড়ার চেয়ে বড় করা হইয়াছে। এখন আমরা বিধাতার সৃষ্ট আমাদের এই আশ্চর্য্য সুন্দর অনাবৃত শরীরকে অবজ্ঞা করি।

কিন্তু কাপড়জুতাকে একটা অন্ধ-সংস্কারের মত জড়াইয়া ধরা আমাদের এই গরম দেশে ছিল না। এক ত সহজেই আমাদের কাপড় বিরল ছিল; তাহার ’পরে বালককালে ছেলেমেয়েরা অনেকদিন পর্য্যন্ত কাপড়জুতা না পরিয়া উলঙ্গ শরীরের সঙ্গে উলঙ্গ জগতের যোগ অসঙ্কোচে অতি সুন্দর-ভাবে রক্ষা করিয়াছে। এখন আমরা ইংরেজের নকল করিয়া শিশুদেহের জন্যও লজ্জাবোধ করিতে আরম্ভ করিয়াছি। শুধু বিলাতফেরৎ নহে, সহরবাসী সাধারণ বাঙালী গৃহস্থও আজকাল বাড়ীর বালককে অতিথির

সাম্নে অনাবৃত দেখিলে সঙ্কোচবোধ করেন এবং এইরূপে ছেলেটাকেও নিজের দেহ-সম্বন্ধে সঙ্কুচিত করিয়া তোলেন।

এম্নি করিয়া আমাদের দেশের শিক্ষিত-লোকদের মধ্যে একটা কৃত্রিম লজ্জার সৃষ্টি হইতেছে। যে বয়স পর্য্যন্ত শরীরসম্বন্ধে আমাদের কোনো কুণ্ঠা থাকা উচিত নয়, সে বয়স আর পার হইতে দিতে পারিতেছি না—এখন আজন্মকাল মানুষ আমাদের পক্ষে লজ্জার বিষয় হইয়া উঠিতেছে। শেষ-কালে কোন্ একদিন দেখিব, চৌকি-টেবিলের পায়া ঢাকা না দেখিলেও আমাদের কর্ণমূল আরক্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

শুধু লজ্জার উপর দিয়াই যদি যাইত, আক্ষেপ করিতাম না। কিন্তু ইহা পৃথিবীতে দুঃখ আনিতেছে। আমাদের লজ্জার দায়ে শিশুরা মিথ্যা কষ্ট পায়। এখনো তাহারা প্রকৃতির খাতক, সভ্যতার ঋণ তাহারা গ্রহণ করিতেই চায় না। কিন্তু বেচারাদের জোর নাই; এক কান্না সম্বল। অভিভাবকদের লজ্জানিবারণ ও গৌরববৃদ্ধি করিবার জন্য লেস্ ও সিল্কের আবরণে বাতাসের সোহাগ ও আলোকের চুম্বন হইতে বঞ্চিত হইয়া তাহারা চীৎকারশব্দে বধির বিচারকের কর্ণে শিশু-জীবনের অভিযোগ উত্থাপিত করিতে থাকে। জানে না, বাপমায়ে একজিক্যুটিভ্ ও জুডীশ্যাল্ একত্র হওয়াতে তাহার সমস্ত আন্দোলন ও আবেদন বৃথা হইয়া যায়।

আর দুঃখ অভিভাবকের। অকাললজ্জার সৃষ্টি করিয়া অনাবশ্যক উপসর্গ বাড়ানো হইল। যাহারা ভদ্রলোক নহে, সরল শিশু-মাত্র, তাহাদিগকেও একেবারে সুরু হইতেই অর্থহীন ভদ্রতা ধরাইয়া অর্থের অপব্যয় করা আরম্ভ হইল। উলঙ্গতার একটা সুবিধা, তাহার মধ্যে প্রতিযোগিতা নাই। কিন্তু কাপড় ধরাইলেই সখের মাত্রা, আড়ম্বরের আয়োজন রেষারেষি করিয়া বাড়িয়া চলিতে থাকে। শিশুর নবনীতকোমল সুন্দর দেহ ধনাভিমান-প্রকাশের উপলক্ষ্য হইয়া উঠে; ভদ্রতার বোঝা অকারণে অপরিমিত হইতে থাকে।

এ সমস্ত ডাক্তারির বা অর্থনীতির তর্ক তুলিব না। আমি শিক্ষার দিক্ হইতে বলিতেছি। মাটি-জল-বাতাস-আলোর সঙ্গে সম্পূর্ণ যোগ না থাকিলে শরীরের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। শীতে গ্রীষ্মে কোনোকালে আমা-দের মুখটা ঢাকা থাকে না, তাই আমাদের মুখের চামড়া দেহের চামড়ার চেয়ে বেশি শিক্ষিত—অর্থাৎ বাহিরের সঙ্গে কি করিয়া আপনার সামঞ্জস্যরক্ষা করিয়া চলিতে হয়, তাহা সে ঠিক জানে। সে আপনাতেই আপনি সম্পূর্ণ;—তাহাকে কৃত্রিম আশ্রয় প্রায় লইতে হয় না।

এ কথা বলা বাহুল্য, আমি ম্যাঞ্চেষ্টারকে ফতুর করিবার জন্য ইংরেজের রাজ্যে উলঙ্গতা প্রচার করিতে বসি নাই। আমার কথা এই যে, শিক্ষা করিবার একটা বয়স আছে—সেটা বাল্যকাল। সেই সময়টাতে আমাদের শরীরমনের পরিণতিসাধনের জন্য প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের বাধাবিহীন যোগ থাকা চাই। সে সময়টা ঢাকাঢাকির সময় নয়—তখন সভ্যতা একেবারেই অনাবশ্যক। কিন্তু সেই বয়স হইতেই শিশুর সঙ্গে সভ্যতার সঙ্গে লড়াই আরম্ভ হইতেছে দেখিয়া বেদনাবোধ করি। শিশু আচ্ছাদন ফেলিয়া দিতে চায়, আমরা

তাহাকে আচ্ছন্ন করিতে চাই। বস্তুত এ ঝগড়া ত শিশুর সঙ্গে নয়, এ ঝগড়া প্রকৃতির সঙ্গে। প্রকৃতির মধ্যে যে পুরাতন জ্ঞান আছে, তাহাই কাপড় পরাইবার সময় শিশুর ক্রন্দনের মধ্য হইতে প্রতিবাদ করিতে থাকে—আমরাই ত তাহার কাছে শিশু।

যেমন করিয়া হউক্, সভ্যতার সঙ্গে একটা রফা দরকার। অন্তত একটা বয়স পর্য্যন্ত সভ্যতার এলেকাকে সীমাবদ্ধ করা চাই। আমি খুব কম করিয়া বলিতেছি,—সাতবছর। সে পর্য্যন্ত শিশুর সজ্জায় কাজ নাই, লজ্জায় কাজ নাই। সে পর্য্যন্ত বর্ব্বরতার যে অত্যাবশ্যক শিক্ষা, তাহা প্রকৃতির হাতে সম্পন্ন হইতে দিতে হইবে। বালক তখন যদি পৃথিবীমায়ের কোলে গড়াইয়া ধূলামাটি না মাখিয়া লইতে পারে, তবে কবে তাহার সে সৌভাগ্য হইবে? সে তখন যদি গাছে চড়িয়া ফল পাড়িতে না পায়, তবে হতভাগা ভদ্রতার লোকলজ্জায় চিরজীবনের মত গাছপালার সঙ্গে অন্তরঙ্গ সখ্যসাধনে বঞ্চিত হইবে। এই সময়টায় বাতাস-আকাশ, মাঠ-গাছপালার দিকে তাহার শরীরমনের যে একটা স্বাভাবিক টান আছে—সব জায়গা হইতেই তার যে একটা নিমন্ত্রণ আসে, সেটাতে যদি কাপড়-চোপড়, দরজা-দেয়ালের ব্যাঘাতস্থাপন করা যায়, তবে ছেলেটার সমস্ত উদ্যম অবরুদ্ধ হইয়া তাহাকে ইঁচড়ে পাকায়। খোলা পাইলে যে উৎসাহ স্বাস্থ্যকর হইত, বদ্ধ হইয়া তাহাই দূষিত হইতে থাকে।

ছেলেকে কাপড় পরাইলেই কাপড়ের জন্য তাহাকে সাবধানে রাখিতে হয়। ছেলেটার দাম আছে কি না, সে কথা সব সময়ে মনে থাকে না—কিন্তু দরজির হিসাব ভোলা শক্ত। এই কাপড় ছিঁড়িল, এই কাপড় ময়লা হইল, আহা সেদিন এতটাকা দিয়া এমন সুন্দর জামা করাইয়া দিলাম, লক্ষ্মীছাড়া ছেলে কোথা হইতে তাহাতে কালী মাখাইয়া আনিল, এই বলিয়া যথোচিত চপেটাঘাত ও কানমলার যোগে শিশুজীবনের সকল খেলা, সকল আনন্দের চেয়ে কাপড়কে যে কিপ্রকারে খাতির করিয়া চলিতে হয়, শিশুকে তাহা শিখানো হইয়া থাকে। যে কাপড়ে তাহার কোনো প্রয়োজন নাই, সে কাপড়ের জন্য বেচারাকে এ বয়সে এমন করিয়া দায়ী করা কেন; বেচারাদের জন্য ঈশ্বর বাহিরে যে কয়টা অবাধ সুখের আয়োজন, এবং মনের মধ্যে অব্যাহত সুখসম্ভোগের ক্ষমতা দিয়াছিলেন,অতি অকিঞ্চিৎকর পোষাকের মমতায় তাহার জীবনারম্ভের সেই সরল আনন্দের লীলাক্ষেত্রকে অকারণে এমন বিঘ্নসঙ্কুল করিয়া তুলিবার কি প্রয়োজন ছিল! মানুষ কি সকল জায়গাতেই নিজের ক্ষুদ্রবুদ্ধি ও তুচ্ছ প্রবৃত্তির শাসন বিস্তার করিয়া কোথাও স্বাভাবিক সুখশান্তির স্থান রাখিবে না? আমার ভাল লাগে, অতএব যেমন করিয়া হোক্, উহারও ভাল লাগা উচিত, এই জবরদস্তির যুক্তিতে কি জগতের চারিদিকে কেবলি দুঃখবিস্তার করিতে হইবে?

যাই হোক্, প্রকৃতির দ্বারা যেটুকু করিবার, তাহা আমাদের দ্বারা কোনোমতেই হয় না, অতএব মানুষের সমস্ত ভাল কেবল আমরা বুদ্ধিমানেরাই করিব, এমন পণ না করিয়া প্রকৃতিকেও খানিকটা পথ ছাড়িয়া দেওয়া চাই। সেইটে গোড়ায় হইলেই ভদ্রতার

সঙ্গে কোনো বিরোধ বাধে না এবং ভিত্তি পাকা হয়। এই প্রাকৃতিক শিক্ষা যে কেবল ছেলেদের, তাহা নহে—ইহাতে আমাদেরও উপকার আছে। আমরা নিজের হাতের কাজে সমস্ত আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়া সেইটেতেই আমাদের অভ্যাসকে এমন বিকৃত করি যে, স্বাভাবিককে আর কোনোমতেই সহজদৃষ্টিতে দেখিতে পারি না। আমরা যদি মানুষের সুন্দর শরীরকে নির্ম্মল বাল্য-অবস্থাতেও উলঙ্গ দেখিতে সর্ব্বদাই অভ্যস্ত না থাকি, তবে বিলাতের লোকের মত শরীর-সম্বন্ধে যে একটা বিকৃত সংস্কার মনের মধ্যে বদ্ধমূল হয়, তাহা যথার্থই বর্ব্বর এবং লজ্জার যোগ্য।

অবশ্য ভদ্রসমাজে কাপড়চোপড়, জুতা-মোজার একটা প্রয়োজন আছে বলিয়াই ইহা-দের সৃষ্টি হইয়াছে—কিন্তু এই সকল কৃত্রিম সহায়কে প্রভু করিয়া তুলিয়া তাহার কাছে নিজেকে কুণ্ঠিত করিয়া রাখা সঙ্গত নয়। এই বিপরীত ব্যাপারে কখনই ভাল ফল হইতে পারে না। অন্তত ভারতবর্ষের জলবায়ু এরূপ যে, আমাদের এই সকল উপকরণের চিরদাস হওয়ার কোনো প্রয়োজনই নাই। কোনো-কালে আমরা ছিলামও না; আমরা প্রয়োজনমত কখনো বা বেশভূষা ব্যবহার করিয়াছি, কখনো বা তাহা খুলিয়াও রাখিয়াছি। বেশভূষা-জিনিষটা যে নৈমিত্তিক,—ইহা আমাদের প্রয়োজন সাধন করে মাত্র, এই প্রভুত্বটুকু আমাদের বরাবর ছিল। এই-জন্য খোলাগায়ে আমরা লজ্জিত হইতাম না এবং অন্যকে দেখিলেও আমাদের রাগ হইত না। এই সম্বন্ধে বিধাতার প্রসাদে য়ুরোপীয়-দের চেয়ে আমাদের বিশেষ সুবিধা ছিল। আমরা আবশ্যকমত লজ্জারক্ষাও করিয়াছি, অথচ অনাবশ্যক অতিলজ্জার দ্বারা নিজেকে ভারগ্রস্ত করি নাই।

এ কথা মনে রাখিতে হইবে, অতিলজ্জা লজ্জাকে নষ্ট করে। কারণ, অতিলজ্জাই বস্তুত লজ্জাজনক। তা ছাড়া, অতির বন্ধন মানুষ যখন একবার ছিঁড়িয়া ফেলে, তখন তাহার আর বিচার থাকে না। আমাদের মেয়েরা গায়ে বেশি কাপড় দেয় না মানি, কিন্তু তাহারা কোনোক্রমেই ইচ্ছা করিয়া সচেষ্টভাবে বুকপিঠের আবরণের বারো-আনা বাদ দিয়া পুরুষসমাজে বাহির হইতে পারে না। আমরা লজ্জা করি না, কিন্তু লজ্জাকে এমন করিয়া আঘাত করি না।

কিন্তু লজ্জাতত্ত্বসম্বন্ধে আমি আলোচনা করিতে বসি নাই, অতএব ও কথা থাক্। আমার কথা এই, মানুষের সভ্যতা কৃত্রিমের সহায়তা লইতে বাধ্য, সেইজন্যই এই কৃত্রিম যাহাতে অভ্যাসদোষে আমাদের কর্ত্তা হইয়া না ওঠে, যাহাতে আমরা নিজের গড়া সামগ্রীর চেয়ে সর্ব্বদাই উপরে মাথা তুলিয়া থাকিতে পারি, এদিকে আমাদের দৃষ্টি রাখা দরকার। আমাদের টাকা যখন আমাদিগকেই কিনিয়া বসে, আমাদের ভাষা যখন আমাদের ভাবের নাকে দড়ি দিয়া ঘুরাইয়া মারে, আমাদের সাজ যখন আমাদের অঙ্গকে অনাবশ্যক করিবার জো করে, আমাদের নিত্য যখন নৈমিত্তিকের কাছে অপরাধীর মত কুণ্ঠিত হইয়া থাকে, তখন সভ্যতার সমস্ত বুলিকে অগ্রাহ্য করিয়া এ কথা বলিতেই হইবে, এটা ঠিক হইতেছে না। ভারতবাসীর খালিগা কিছুমাত্র লজ্জার

নহে; যে সভ্যব্যক্তির চোখে ইহা অসহ্য, সে আপনার চোখের মাথা খাইয়া বসিয়াছে।

শরীরসম্বন্ধে কাপড়-জুতা-মোজা যেমন, আমাদের মনসম্বন্ধে বইজিনিষটা ঠিক তেম্‌নি হইয়া উঠিয়াছে। বইপড়াটা যে শিক্ষার একটা সুবিধাজনক সহায়মাত্র, তাহা আর আমাদের মনে হয় না—আমরা বইপড়াটাকেই শিক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়া ঠিক করিয়া বসিয়া আছি। এ সম্বন্ধে আমাদের সংস্কারকে নড়ানো বড়ই কঠিন হইয়া উঠিয়াছে।

মাষ্টার বই হাতে করিয়া শিশুকাল হইতেই আমাদিগকে বই মুখস্থ করাইতে থাকেন। কিন্তু বইয়ের ভিতর হইতে জ্ঞানসঞ্চয় করা আমাদের মনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম নহে। প্রত্যক্ষ-জিনিষকে দেখিয়া-শুনিয়া নাড়িয়া-চাড়িয়া সঙ্গে সঙ্গেই অতি সহজেই আমাদের মননশক্তির চর্চ্চা হওয়া স্বভাবের বিধান ছিল। অন্যের অভিজ্ঞাত ও পরীক্ষিত জ্ঞান, তাও লোকের মুখ হইতে শুনিলে তবে আমাদের সমস্ত মন সহজে সাড়া দেয়। কারণ, মুখের কথা ত শুধু কথা নহে, তাহা মুখের কথা। তাহার সঙ্গে প্রাণ আছে; চোখমুখের ভঙ্গী, কণ্ঠের স্বরলীলা, হাতের ইঙ্গিত—ইহার দ্বারা কানে শুনিবার ভাষা, সঙ্গীত ও আকার লাভ করিয়া, চোখকান দুয়েরই সামগ্রী হইয়া উঠে। শুধু তাই নয়, আমরা যদি জানি, মানুষ তাহার মনের সামগ্রী সদ্য মন হইতে আমাদিগকে দিতেছে,—সে একটা বই পড়িয়ামাত্র যাইতেছে না, তাহা হইলে মনের সঙ্গে মনের প্রত্যক্ষ সম্মিলনে জ্ঞানের মধ্যে রসের সঞ্চার হয়।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের মাষ্টাররা বই পড়াইবার একটা উপলক্ষ্যমাত্র; আমরাও বই পড়িবার একটা উপসর্গ। ইহাতে ফল হইয়াছে এই, আমাদের শরীর যেমন কৃত্রিম জিনিষের আড়ালে পড়িয়া পৃথিবীর সঙ্গে গায়ে-গায়ে যোগটা হারাইয়াছে এবং হারাইয়া এমন অভ্যস্ত হইয়াছে যে, সে যোগটাকে আজ ক্লেশকর লজ্জাকর বলিয়া মনে করে—তেম্‌নি আমাদের মন এবং বাহিরের মাঝখানে বই আসিয়া পড়াতে আমাদের মন জগতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগের স্বাদশক্তি অনেকটা হারাইয়া ফেলিয়াছে। সব জিনিষকে বইয়ের ভিতর দিয়া জানিবার একটা অস্বাভাবিক অভ্যাস আমাদের মধ্যে বদ্ধমূল হইয়া গেছে। পাশেই যে জিনিষটা আছে, সেইটেকেই জানিবার জন্য বইয়ের মুখ তাকাইয়া থাকিতে হয়। নবাবের গল্প শুনিয়াছি—জুতাটা ফিরাইয়া দিবার জন্য চাকরের অপেক্ষা করিয়া শত্রুহস্তে বন্দী হইয়াছিল। বইপড়া বিদ্যার গতিকে আমাদেরও মানসিক নবাবী তেম্‌নি অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে। তুচ্ছ বিষয়টুকুর জন্যও বই নহিলে মন আশ্রয় পায় না। বিকৃত সংস্কারের দোষে এইরূপ নবাবিয়ানা আমাদের কাছে লজ্জাকর না হইয়া গৌরবজনক হইয়া উঠে—এবং বইয়ের ভিতর দিয়া জানাকেই আমরা পাণ্ডিত্য বলিয়া গর্ব্ব করি। জগৎকে আমরা মন দিয়া ছুঁই না, বই দিয়া ছুঁই।

মানুষের জ্ঞান ও ভাবকে বইয়ের মধ্যে সঞ্চিত করিবার যে একটা প্রচুর সুবিধা আছে, সে কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু সেই সুবিধার দ্বারা মনের স্বাভাবিক শক্তিকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলে বুদ্ধিকে বাবু করিয়া তোলা হয়। বাবুনামক জীব চাকরবাকর জিনিষপত্রের সুবিধার অধীন।

নিজের চেষ্টাপ্রয়োগে যেটুকু কষ্ট,—যেটুকু কাঠিন্য আছে, সেইটুকুতেই যে আমাদের সুখ সত্য হয়, আমাদের লাভ মূল্যবান্ হইয়া উঠে, বাবু তাহা বোঝে না। বইপড়া-বাবুয়ানাতেও, জ্ঞানকে নিজে পাওয়ার যে একটা আনন্দ, সত্যকে তাহার যথাস্থানে কঠিন প্রেমাভিসারের দ্বারা লাভ করার যে একটা সার্থকতা, তাহা থাকে না। ক্রমে মনের সেই স্বাভাবিক স্বাধীনশক্তিটাই মরিয়া যায়, সুতরাং সেই শক্তিচালনার সুখটাও থাকে না, বরঞ্চ চালনা করিতে বাধ্য হইলে তাহা কষ্টের কারণ হইয়া উঠে।

এইরূপে বইপড়ার আবরণে মন শিশুকাল হইতে আপাদমস্তক আবৃত হওয়াতে আমরা মানুষের সঙ্গে সহজভাবে মেলামেশা করিবার শক্তি হারাইতেছি। আমাদের কাপড়পরা শরীরের যেমন একটা সঙ্কোচ জন্মিয়াছে, আমাদের মনেরও তেম্নি ঘটিয়াছে—সে বাহিরে আসিতেই চায় না। লোকজনদের সহজে আদর-অভ্যর্থনা করা, তাহাদের সঙ্গে আপনভাবে মিলিয়া কথাবার্তা কওয়া আমাদের শিক্ষিতলোকদের পক্ষে ক্রমশই কঠিন হইয়া উঠিতেছে, তাহা আমরা লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি। আমরা বইয়ের লোককে চিনি, পৃথিবীর লোককে চিনি না;—বইয়ের লোক আমাদের পক্ষে মনোহর, পৃথিবীর লোক শ্রান্তিকর। আমরা বিরাট্ সভায় বক্তৃতা করিতে পারি, কিন্তু জনসাধারণের সঙ্গে কথাবার্তা কহিতে পারি না। যখন আমরা বড় কথা, বইয়ের কথা লইয়া আলোচনা করিতে পারি, কিন্তু সহজ আলাপ, সামান্য কথা আমাদের মুখ দিয়া ঠিকমত বাহির হইতে চায় না, তখন বুঝিতে হইবে, দৈবদুর্যোগে আমরা পণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছি, কিন্তু আমাদের মানুষটি মারা গেছে। মানুষের সঙ্গে মানুষভাবে আমাদের অবারিত গতিবিধি থাকিলে ঘরের বার্তা, সুখদুঃখের কথা, ছেলেপুলের খবর, প্রতিদিনের আলোচনা আমাদের পক্ষে সহজ ও সুখকর হয়। বইয়ের মানুষ তৈরি-করা কথা বলে, তাহারা যে সকল কথায় হাসে তাহা প্রকৃতপক্ষেই হাস্যরসাত্মক, তাহারা যাহাতে কাঁদে তাহা করুণরসের সার; কিন্তু সত্যকার মানুষ যে রক্তমাংসের প্রত্যক্ষগোচর মানুষ, সেইখানেই যে তাহার মস্ত জিত্—এইজন্য তাহার কথা, তাহার হাসিকান্না অত্যন্ত পয়লানম্বরের না হইলেও চলে। বস্তুত সে স্বভাবত যাহা, তাহার চেয়ে বেশি হইবার আয়োজন না করিলেই সুখের বিষয় হয়। মানুষ বই হইয়া উঠিবার চেষ্টা করিলে তাহাতে মানুষের স্বাদ নষ্ট হইয়া যায়।

চাণক্য বুঝি বলিয়া গেছেন, বিদ্যা যাহাদের নাই, তাহারা "সভামধ্যে ন শোভন্তে"। কিন্তু সভা ত চিরকাল চলে না। এক সময়ে ত সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া আলো নিবাইয়া দিতেই হয়। মুস্কিল এই যে, আমাদের দেশের এখনকার বিদ্বান্‌রা সভার বাহিরে "ন শোভন্তে"—তাঁহারা বইপড়ার মধ্যে মানুষ, তাই মানুষের মধ্যে তাঁহাদের কোনো সোয়াস্তি নাই।

এরূপ অবস্থার স্বাভাবিক পরিণাম নিরানন্দ। একটা সৃষ্টিছাড়া মানসিক ব্যাধি য়ুরোপের সাহিত্যে সমাজে সর্ব্বত্র প্রকাশ পাইতেছে, তাহাকে সে-দেশের লোকে বলে "World-weariness"। লোকের বায়ু

বিকল হইয়া গেছে;—জীবনের স্বাদ চলিয়া গেছে, নব নব উত্তেজনা সৃষ্টি করিয়া নিজেকে ভুলাইবার চেষ্টা চলিতেছে। এই অসুখ, এই বিকলতা যে কিসের জন্য, কিছুই বুঝিবার জো নাই। এই অবসাদ মেয়ে-পুরুষ উভয়কেই পাইয়া বসিয়াছে।

স্বভাব হইতে ক্রমশই অনেক দূরে চলিয়া যাওয়া ইহার কারণ। কৃত্রিম সুবিধা উত্তরোত্তর আকাশপ্রমাণ হইয়া জগতের জীবকে জগৎছাড়া করিয়া দিয়াছে। পুঁথির মধ্যে মন, আস্‌বাবের মধ্যে শরীর প্রচ্ছন্ন হইয়া আত্মার সমস্ত দরজাজান্‌লাগুলাকে অবরুদ্ধ করিয়াছে। যাহা সহজ, যাহা নিত্য, যাহা মূল্যহীন বলিয়াই সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্‌, তাহার সঙ্গে আনাগোনা বন্ধ হওয়াতে তাহা গ্রহণ করিবার ক্ষমতা চলিয়া গেছে। যে সকল জিনিষ উত্তেজনার নব নব তাড়নায় উদ্ভাবিত হইয়া দুইচারিদিন ফ্যাশানের আবর্ত্তে আবিল হইয়া উঠে এবং তাহার পরেই অনাদরে আবর্জ্জনার মধ্যে জমা হইয়া সমাজের বাতাসকে দূষিত করে, তাহাই কেবল পুনঃপুন লক্ষ লক্ষ গুণী ও মজুরের চেষ্টাকে সমস্ত সমাজ জুড়িয়া ঘানীর বলদের মত ঘুরাইয়া মারিতেছে।

এক বই হইতে আর এক বই উৎপন্ন হইতেছে; এক কাব্যগ্রন্থ হইতে আর এক কাব্যগ্রন্থের জন্ম; একজনের মত মুখে-মুখে সহস্রলোকের মত হইয়া দাঁড়াইতেছে; অনুকরণ হইতে অনুকরণের প্রবাহ চলিয়াছে; এম্‌নি করিয়া পুঁথি ও কথার অরণ্য মানুষের চারদিকে নিবিড় হইয়া উঠিতেছে, প্রাকৃতিক জগতের সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ ক্রমশই দূরে চলিয়া যাইতেছে। মানুষের অনেকগুলি মনের ভাব উৎপন্ন হইতেছে, যাহা কেবল পুঁথির সৃষ্টি। এই সকল বাস্তবতাবর্জ্জিত ভাবগুলা ভূতের মত মানুষকে পাইয়া বসে; তাহার মনের স্বাস্থ্য নষ্ট করে; তাহাকে অত্যুক্তি এবং আতিশয্যের দিকে লইয়া যায়; সকলে মিলিয়া ক্রমাগতই একই ধুয়া ধরিয়া কৃত্রিম উৎসাহের দ্বারা সত্যের পরিমাণ নষ্ট করিয়া তাহাকে মিথ্যা করিয়া তোলে। দৃষ্টান্তস্বরূপে বলিতে পারি, প্যাট্রিয়টিজ্‌ম্‌নামক পদার্থ। ইহার মধ্যে যেটুকু সত্য ছিল, প্রতিদিন সকলে পড়িয়া সেটাকে তূলা ধুনিয়া একটা প্রকাণ্ড মিথ্যা করিয়া তুলিয়াছে; এখন এই তৈরি বুলিটাকে প্রাণপণ চেষ্টায় সত্য করিয়া তুলিবার জন্য কত কৃত্রিম উপায়, কত অলীক উদ্দীপনা, কত অন্যায় শিক্ষা, কত গড়িয়া-তোলা বিদ্বেষ, কত কূট যুক্তি, কত ধর্ম্মের ভাণ সৃষ্ট হইতেছে, তাহার সীমাসংখ্যা নাই। এই সকল স্বভাবভ্রষ্ট কুহেলিকার মধ্যে মানুষ বিভ্রান্ত হয়—সরল ও উদার, প্রশান্ত ও সুন্দর হইতে সে কেবল দূরে চলিয়া যাইতে থাকে। কিন্তু বুলির মোহ ভাঙানো বড় শক্ত। বস্তুকে আক্রমণ করিয়া ভূমিসাৎ করা যায়, বুলির গায়ে ছুরি বসে না। এইজন্য বুলি লইয়া মানুষে মানুষে যত ঝগড়া, যত রক্তপাত হইয়াছে, এমন ত বিষয় লইয়া হয় নাই।

সমাজের সরল অবস্থায় দেখিতে পাই, লোকে যেটুকু জানে, তাহা মানে। সেটুকুর প্রতি তাহাদের নিষ্ঠা অটল—তাহার জন্য ত্যাগস্বীকার, কষ্টস্বীকার তাহাদের পক্ষে সহজ। ইহার কতকগুলি কারণ আছে, কিন্তু একটি প্রধান কারণ, তাহাদের হৃদয়মন মতের দ্বারা

আবৃত হইয়া যায় নাই—যতটুকু সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবার অধিকার ও শক্তি তাহাদের আছে, ততটুকুই তাহারা গ্রহণ করিয়াছে। মন যাহা সত্যরূপে গ্রহণ করে, হৃদয় তাহার জন্য অনেক ক্লেশ অনায়াসেই সহিতে পারে—সেটাকে সে বাহাদুরি বলিয়া মনেই করে না।

সভ্যতার জটিল অবস্থায় দেখা যায়, মতের বহুতর স্তর জমিয়া গেছে। কোনোটা চর্চ্চের মত, চর্চ্চার মত নহে; কোনোটা সভার মত, ঘরের মত নহে; কোনোটা দলের মত, অন্তরের মত নহে; কোনো মতে চোখ দিয়া জল বাহির হয়, পকেট হইতে টাকা বাহির হয় না; কোনো মতে টাকাও বাহির হয়, কাজও চলে—কিন্তু হৃদয়ে তাহার স্থান নাই, ফ্যাশানে তাহার প্রতিষ্ঠা। এই সকল অবিশ্রাম-উৎপন্ন ভূরি ভূরি সত্যবিকারের মাঝখানে পড়িয়া মানুষের মন সত্য মতকেও অবিচলিত-সত্য-রূপে গ্রহণ করিতে পারে না। এইজন্য তাহার আচরণ সর্ব্বত্র সর্ব্বতোভাবে সত্য হইতে পারে না। সে সরলভাবে আপন শক্তি ও প্রকৃতি-অনুযায়ী কোনো পন্থা নির্ব্বাচন করিবার অবকাশ না পাইয়া বিভ্রান্তভাবে দশের কথার পুনরাবৃত্তি করিতে থাকে, অবশেষে কাজের বেলায় তাহার প্রকৃতির মধ্যে বিরোধ বাধিয়া যায়। সে যদি নিজের স্বভাবকে নিজে পাইত, তবে সেই স্বভাবের ভিতর দিয়া যাহা-কিছু পাইত, তাহা ছোট হউক্ বড় হউক্, খাঁটি জিনিষ হইত। তাহা তাহাকে সম্পূর্ণ বল দিত, সম্পূর্ণ আশ্রয় দিত; সে তাহাকে সর্ব্বতোভাবে কাজে না খাটাইয়া থাকিতে পারিত না। এখন তাহাকে গোলেমালে পড়িয়া পুঁথির মত, মুখের মত, সভার মত, দলের মত লইয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া কেবল বিস্তর কথা আওড়াইয়া বেড়াইতে হয়। সেই কথা আওড়াইয়া বেড়ানকে সে হিতকর্ম্ম বলিয়া মনে করে; সেজন্য সে বেতন পায়; তাহা বেচিয়া সে লাভ করে; এই সকল কথার একটুখানি এদিক্-ওদিক্ লইয়া সে অন্য সম্প্রদায়, অন্য জাতিকে হেয় এবং নিজের জাতি ও দলকে শ্রদ্ধেয় বলিয়া প্রচার করে।

মানুষের মনের চারিদিকে এই যে অতি-নিবিড় পুঁথির অরণ্যে বুলির বোল ধরিয়াছে, ইহার মোদোগন্ধে আমাদিগকে মাতাল করিতেছে, শাখা হইতে শাখান্তরে কেবলি চঞ্চল করিয়া মারিতেছে, কিন্তু যথার্থ আনন্দ, গভীর তৃপ্তি দিতেছে না। নানাপ্রকার বিদ্রোহ ও মনোবিকার উৎপন্ন করিতেছে।

সহজ জিনিষের গুণ এই যে, তাহার স্বাদ কখনই পুরাতন হয় না, তাহার সরলতা তাহাকে চিরদিন নবীন করিয়া রাখে। যাহা যথার্থ স্বভাবের কথা, তাহা মানুষ যতবার বলিয়াছে, ততবারই নূতন লাগিয়াছে। পৃথিবীতে গুটিদুইতিন মহাকাব্য আছে, যাহা সহস্রবৎসরেও ম্লান হয় নাই—নির্ম্মল জলের মত তাহা আমাদের পিপাসা হরণ করিয়া তৃপ্তি দেয়, মদের মত তাহা আমাদিগকে উত্তেজনার ডগার উপরে তুলিয়া শুষ্ক অবসাদের মধ্যে আছাড় মারিয়া ফেলে না। সহজ হইতে দূরে আসিলেই একবার উত্তেজনা ও একবার অবসাদের মধ্যে কেবলি ঢেঁকি-কোটা হইতে হয়। উপকরণবহুল অতিসভ্যতার ইহাই ব্যাধি।

এই জঙ্গলের ভিতর দিয়া পথ বাহির করিয়া, এই রাশীকৃত পুঁথি ও বচনের আবরণ

ভেদ করিয়া, সমাজের মধ্যে, মানুষের মনের মধ্যে স্বভাবের বাতাস ও আলোক আনিবার জন্য মহাপুরুষ এবং হয় ত মহাবিপ্লবের প্রয়োজন হইবে। অত্যন্ত সহজ কথা, অত্যন্ত সরল সত্যকে হয় ত রক্তসমুদ্র পাড়ি দিয়া আসিতে হইবে। যাহা আকাশের মত ব্যাপক, যাহা বাতাসের মত মূল্যহীন, তাহাকে কিনিয়া উপার্জ্জন করিয়া লইতে হয় ত প্রাণ দিতে হইবে। য়ুরোপের মনোরাজ্যে ভূমিকম্প ও অগ্ন্যুৎপাতের অশান্তি মাঝে মাঝে প্রায়ই দেখা দিতেছে; স্বভাবের সঙ্গে জীবনের, বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে অন্তঃপ্রকৃতির প্রকাণ্ড অসামঞ্জস্যই ইহার কারণ।

কিন্তু য়ুরোপের এই বিকৃতি কেবল অনুকরণের দ্বারা, কেবল ছোঁয়াচ লাগিয়া আমরা পাইতেছি! ইহা আমাদের দেশজ নহে। আমরা শিশুকাল হইতে বিলাতী বই মুখস্থ করিতে লাগিয়া গেছি—যাহা আবর্জ্জনা, তাহাও লাভ মনে করিয়া লইতেছি। আমরা যে-সকল বিদেশীবুলি সর্ব্বদাই অসন্দিগ্ধমনে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে ব্যবহার করিয়া চলিতেছি, জানি না, তাহার প্রত্যেকটিকে অবিশ্বাসের সহিত আদিসত্যের নিকষপাথরে ঘষিয়া যাচাই করিয়া লওয়া চাই—তাহার বারো-আনা কেবল পুঁথির সৃষ্টি, কেবল তাহারা মুখেমুখেই বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে, দশজনে পরস্পরের অনুকরণ করিয়া বলিতেছে বলিয়া আর দশজনে তাহাকে ধ্রুবসত্য বলিয়া গণ্য করিতেছে। আমরাও সেই সকল বাঁধিগৎ এমন করিয়া ব্যবহার করিতেছি, যেন তাহার সত্য আমরা আবিষ্কার করিয়াছি—যেন তাহা বিদেশী ইস্কুলমাষ্টারের আবৃত্তির জড় প্রতিধ্বনিমাত্র নহে।

আবার, যাহারা নূতন পড়া আওড়াইতেছে, তাহাদের উৎসাহ কিছু বেশি হইয়া থাকে। সুশিক্ষিত টিয়াপাখী যত উচ্চস্বরে কানে তালা ধরায়, তাহার শিক্ষকের গলা তত চড়া নয়। শুনা যায়, যে সব জাতির মধ্যে বিলাতীসভ্যতা নূতন প্রবেশ করে, তাহারা বিলাতের মদ ধরিয়া একেবারে মারা পড়িবার জো হয়—অথচ যাহাদের অনুকরণে তাহারা মদ ধরে, তাহারা মদে এত বেশি অভিভূত হয় না। তেম্নি দেখা যায়, যে সকল কথার মোহে কথার সৃষ্টিকর্ত্তারা অনেকটাপরিমাণে অবিচলিত থাকে, আমরা তাহাতে একেবারে ধরাশায়ী হইয়া যাই। সেদিন কাগজে দেখিলাম, বিলাতের কোন্ এক সভায় আমাদের দেশী লোকেরা একজনের পর আর একজন উঠিয়া ভারতবর্ষে স্ত্রীশিক্ষার অভাব ও সেই অভাবপূরণসম্বন্ধে অতি পুরাতন বিলাতীবুলি দাঁড়ের পাখীর মত আওড়াইয়া গেলেন; শেষকালে একজন ইংরেজ উঠিয়া ভারতবর্ষের মেয়েদের ইংরেজিকায়দায় শেখানই যে একমাত্র শিক্ষানামের যোগ্য, এবং সেই শিক্ষাই আমাদের স্ত্রীলোকের পক্ষে যে একমাত্র শ্রেয়, সে সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিলেন। আমি দুই পক্ষের তর্কের সত্যমিথ্যাসম্বন্ধে কোনো কথা তুলিতেছি না। কিন্তু, বিলাতে প্রচলিত দস্তুর ও মত যে গন্ধমাদনের মত আদ্যোপান্ত উৎপাটন করিয়া আনিবার যোগ্য, এ সম্বন্ধে আমাদের মনে বিচারমাত্র উপস্থিত হয় না তাহার কারণ, ছেলেবেলা হইতে এ সব কথা আমরা পুঁথি

হইতেই শিখিয়াছি এবং আমাদের যাহা-কিছু শিক্ষা, সমস্তই পুঁথির শিক্ষা।

বুলি ও পুঁথির বিবরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাদের দেশেও শিক্ষিতলোকের মধ্যে নিরানন্দ দেখা দিয়াছে। কোথায় হৃদ্যতা, কোথায় মেলামেশা, কোথায় সহজ হাস্যকৌতুক! জীবনযাত্রার ভার বাড়িয়া গেছে বলিয়াই যে এতটা অবসন্নতা, তাহা নহে। সে একটা কারণ বটে, সন্দেহ নাই; আমাদের সহিত সর্ব্বপ্রকার-সামাজিকযোগ-বিহীন আত্মীয়তাশূন্য রাজশক্তির অহরহ অলক্ষ্য চাপও আর একটা কারণ; কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদের অত্যন্ত কৃত্রিম লেখাপড়ার তাড়নাও কম কারণ নহে। নিতান্ত শিশুকাল হইতে তাহার পেষণ আরম্ভ হয়—এই জ্ঞানলাভের সঙ্গে মনের সঙ্গে যোগ অতি অল্প, এ জ্ঞান আনন্দের জন্যও নহে—এ কেবল প্রাণের দায়ে এবং কতকটা মানের দায়েও বটে।

আমরা মন খাটাইয়া সজীবভাবে যে জ্ঞান উপার্জ্জন করি, তাহা আমাদের মজ্জার সঙ্গে মিশিয়া যায়—বই মুখস্থ করিয়া যাহা পাই, তাহা বাহিরে জড় হইয়া সকলের সঙ্গে আমাদের বিচ্ছেদ ঘটায়। তাহাকে আমরা কিছুতেই ভুলিতে পারি না বলিয়া অহঙ্কার বাড়িয়া উঠে— সেই অহঙ্কারের যেটুকু সুখ, সেই আমাদের একমাত্র সম্বল। নহিলে জ্ঞানের স্বাভাবিক আনন্দ আমরা যদি লাভ করিতাম—তবে এতগুলি শিক্ষিত-লোকের মধ্যে অন্তত গুটিকয়েককেও দেখিতে পাইতাম, যাঁহারা জ্ঞানচর্চ্চার জন্য নিজের সমস্ত স্বার্থকে খর্ব্ব করিয়াছেন। কিন্তু দেখিতে পাই, সায়ান্সের পরীক্ষায় প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া ডেপুটিম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া সমস্ত বিদ্যা আইন-আদালতের অতলস্পর্শ নিরর্থকতার মধ্যে চির-দিনের মত বিসর্জ্জন করিতে সকলে ব্যগ্র এবং কতকগুলা পাস্ করিয়া কেবল হতভাগা কন্যার পিতাকে ঋণের পঙ্কে ডুবাইয়া মারাই তাঁহাদের একমাত্র স্থায়ী কীর্ত্তি হইয়া থাকে। দেশে বড় বড় শিক্ষিত উকিল-জজ-কেরাণীর অভাব নাই—কিন্তু জ্ঞানতপস্বী কোথায়?

কথায় কথায় কথা অনেক বাড়িয়া গেল। উপস্থিতমত আমার যেটুকু বক্তব্য, সে এই—বইপড়াটাই যে শেখা, ছেলেদের মনে এই অন্ধসংস্কার যেন জন্মিতে দেওয়া না হয়। প্রকৃতির অক্ষয়ভাণ্ডার হইতেই যে বইয়ের সঞ্চয় আহরিত হইয়াছে, অন্তত হওয়া উচিত এবং সেখানে যে আমাদেরও অধিকার আছে, এ কথা পদে পদে জানানো চাই। বইয়ের দৌরাত্ম্য অত্যন্ত বেশি হইয়াছে বলিয়াই বেশি করিয়া জানানো চাই। এদেশে অতি পুরা-কালে যখন লিপি প্রচলিত ছিল, তখনো তপোবনে পুথিব্যবহার হয় নাই। তখনো গুরু শিষ্যকে মুখেমুখেই শিক্ষা দিতেন—এবং ছাত্র তাহা খাতায় নহে, মনের মধ্যেই লিখিয়া লইত। এম্‌নি করিয়া এক দীপশিখা হইতে আর এক দীপশিখা জ্বলিত। এখন ঠিকটি এমন হইতে পারে না। কিন্তু যথাসম্ভব ছাত্র-দিগকে পুঁথির আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে হইবে। পারতপক্ষে ছাত্রদিগকে পরের রচনা পড়িতে দেওয়া নহে—তাহারা গুরুর কাছে যাহা শিখিবে, তাহাদের নিজেকে দিয়া তাহাই রচনা করাইয়া লইতে হইবে—এই স্বরচিত গ্রন্থই তাহাদের গ্রন্থ। এমন হইলে তাহারা মনেও করিবে না, গ্রন্থগুলা আকাশ

হইতে পড়া বেদবাক্য। "আর্য্যরা মধ্য-এশিয়া হইতে ভারতে আসিয়াছেন", "খৃষ্টজন্মের দুই-হাজার বৎসর পূর্ব্বে বেদরচনা হইয়াছে", এ সকল কথা আমরা বই হইতে পড়িয়াছি—বইয়ের অক্ষরগুলো কাটকুটহীন নির্ব্বিকার—তাহারা শিশুবয়সে আমাদের উপরে সম্মোহন প্রয়োগ করে—তাই আমাদের কাছে আজ এ সমস্ত কথা একেবারে দৈববাণীর মত। ছেলেদের প্রথম হইতেই জানাইতে হইবে, এই সকল আনুমানিক কথা কতকগুলা যুক্তির উপর নির্ভর করিতেছে। সেই সকল যুক্তির মূল উপকরণগুলি যথাসম্ভব তাহাদের সম্মুখে ধরিয়া তাহাদের নিজেদের অনুমানশক্তির উদ্রেক করিতে হইবে। বইগুলা যে কি করিয়া তৈরি হইতে থাকে, তাহা প্রথম হইতেই অল্পে-অল্পে ক্রমে-ক্রমে তাহারা নিজেদের মনের মধ্যে অনুভব করিতে থাকুক্, তাহা হইলেই বইয়ের যথার্থ ফল তাহারা পাইবে, অথচ তাহার অন্ধশাসন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে—এবং নিজের স্বাধীন উদ্যমের দ্বারা জ্ঞানলাভ করিবার যে স্বাভাবিক মানসিক শক্তি, তাহা ঘাড়ের-উপরে-বাহির-হইতে-বোঝা-চাপানো বিদ্যার দ্বারায় আচ্ছন্ন ও অভিভূত হইবে না—বইগুলোর উপরে মনের কর্ত্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিবে। বালক অল্প-মাত্রও যেটুকু শিখিবে, তখনি তাহা প্রয়োগ করিতে শিখিবে। তাহা হইলে শিক্ষা তাহার উপরে চাপিয়া বসিবে না; শিক্ষার উপর সে-ই চাপিয়া বসিবে। এ কথায় সায় দিয়া যাইতে অনেকে দ্বিধা করেন না, কিন্তু কাজে লাগাইবার বেলা আপত্তি করেন। তাঁহারা মনে করেন, বালকদিগকে এমন করিয়া শিক্ষা দেওয়া অসম্ভব। তাঁহারা যাহাকে শিক্ষা বলেন, তাহা এমন করিয়া দেওয়া অসম্ভব বটে। তাঁহারা কতকগুলা বই ও কতকগুলা বিষয় বাঁধিয়া দেন—নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে তাহার পরীক্ষা লওয়া হয়—ইহাকেই তাঁহারা বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া বলেন এবং যেখানে সেইরূপ শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাকেই বিদ্যালয় বলা হয়। বিদ্যাজিনিষটা যেন একটা স্বতন্ত্র পদার্থ; শিশুর মন হইতে সেটাকে যেন তফাৎ করিয়া দেখিতে হয়—সেটা যেন বইয়ের পাতা এবং অক্ষরের সংখ্যা—তাহাতে ছাত্রের মন যদি পিষিয়া যায়, সে যদি পুঁথির গোলাম হয়, তাহার স্বাভাবিক বুদ্ধি যদি অভিভূত হইয়া পড়ে, সে যদি নিজের প্রাকৃতিক ক্ষমতাগুলি চালনা করিয়া জ্ঞান অধিকার করিবার শক্তি অনভ্যাস ও উৎপীড়নবশত চিরকালের মত হারায়, তবু ইহা বিদ্যা—কারণ ইহা এতটুকু ইতিহাসের অংশ, এতগুলি ভূগোলের পাতা, এত কটা অঙ্ক, এবং এতটাপরিমাণ বি,এল্, এ, ব্লে, সি, এল্, এ, ক্লে! শিশুর মন যতটুকু শিক্ষার উপরে সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্বলাভ করিতে পারে, অল্প হইলেও সেইটুকু শিক্ষাই শিক্ষা,—আর যাহা শিক্ষানাম ধরিয়া তাহার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া দেয়, তাহাকে পড়ানো বলিতে পার, কিন্তু তাহা শেখানো নহে। মানুষের 'পরে মানুষ অনেক অত্যাচার করিবে জানিয়াই বিধাতা তাহাকে শক্ত করিয়া গড়িয়াছেন, সেইজন্য গুরুপাক অখাদ্য খাইয়া অজীর্ণে ভুগিয়াও মানুষ বাঁচিয়া থাকে—এবং শিশুকাল হইতে শিক্ষার দুর্ব্বিষহ উৎপীড়ন সহ্য করিয়াও সে খানিকটাপরিমাণে বিদ্যালাভও করে ও

তাহা লইয়া গর্ব্বও করিতে পারে। এই তাড়নায় ও পীড়নে তাহাকে যে কতটা লোকসান দিতে হয়, কি বিপুল মূল্য দিয়া সে যে কত অল্পই ঘরে আনিতে পায়, তাহা কেহ বা বুঝেন না, কেহ বা বুঝেন স্বীকার করেন না, কেহ বা বুঝেন ও স্বীকার করেন, কিন্তু কাজের বেলায় যেমন চলিয়া আসিতেছে তাহাই চালাইতে থাকেন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নীলাম্বরী।

আমি নীলাম্বরী সুন্দরী বড় ভালবাসি। একটি নীলাম্বরী সুন্দরীকে দেখিব, ইহা আমার জীবনের সাধ। মানুষের কত বিচিত্র আশা থাকে, আমার সমগ্র জীবনের আকাঙ্ক্ষা ঐ একটি সাধে কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল। আমার গুণই বল, আর দোষই বল, যৌবনের উন্মেষ হইতেই আমি কবি কীট্‌সের মত রূপের উপাসক। সেইজন্য আমার রুচি-সাধারণ লোকের রুচির সহিত বড়-একটা মিশিত না। কিন্তু তাহাতে কি আসে-যায়? আমাকে এই রুচির জন্য অনেকসময়ে বন্ধুবান্ধবের বিদ্রূপবাণ সহ্য করিতে হইত, কিন্তু পরিশেষে সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেন যে, আমার রুচির বিশেষত্ব আছে, এবং এইরূপ পরিমার্জ্জিত রুচির জন্য, আমি এ পর্য্যন্ত কোন কবিতা না লিখিলেও বন্ধুমহলে আমার 'কবি'-আখ্যা হইয়াছিল। কবিতা ও কবিত্ব এক জিনিষ নহে, কাহারও ভাগ্যে কবিতা, কাহারও ভাগ্যে কবিত্ব, কদাচিৎ কাহারও ভাগ্যে বা উভয়ের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। আমার ভাগ্যে কবিতা ঘটে নাই, ভাগ্যতর কবিত্ব ঘটিয়াছিল। যাহা হউক, আমার কবিত্বময়ী কল্পনা নীলাম্বরী সুন্দরীকে কেন্দ্র করিয়া এক অপূর্ব্ব কুহেলিকাময় বৃত্ত অঙ্কিত করিয়াছিল। আমার সমগ্র জীবন যেন তাহাতেই নিমগ্ন ছিল। বন্ধুদিগের মধ্যে আমার এই অতৃপ্ত সাধটি অপ্রকাশিত ছিল না। আমি যখন তাঁহাদের নিকট কল্পনালোকদুর্লভ অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যময়ী নীলাম্বরপরিহিতা কোন সুন্দরী রমণীর চিত্র উদ্‌ঘাটিত করিতে করিতে উদ্দীপনায় কণ্টকিত হইয়া উঠিতাম, তখন আমার বোধ হইত, যেন তাঁহাদের মনেও আমার বাসনার প্রতিধ্বনি জাগাইয়া তুলিয়াছি।

সৌন্দর্য্যের উপাসনা কখন নিন্দনীয় হইতে পারে না। বরং উহা মানসিক উৎকর্ষেরই পরিচায়ক,—যাহাকে ইংরেজিতে বলে Æsthetic Culture। এই কারণেই আমার আকাঙ্ক্ষাটি কাহারও নিকটে গোপন করা প্রয়োজনীয় বোধ করি নাই। আর আমার সমস্ত হৃদয় পূরিয়া গিয়াছিল ঐ এক ছবিতে—নীলাম্বরী সুন্দরী। চম্পকগৌরকান্তি, নিটোল নিচোল সুঠাম, নিবিড়কৃষ্ণজলদজালতুল্য কেশরাশি জলরাশিনীল বসনে

আসিয়া মিশিয়াছে, আর তাহার মধ্য হইতে গোলাপদলপেলব বাহুলতা ঈষৎ উন্নমিতভাবে অশোকশাখার দিকে প্রসারিত হইয়াছে! অতুলনীয় এ চিত্র! কোন্ নন্দনকাননে, নির্ঝরিণীগীতে আমার এই চিরসুরভি পারিজাত ফুটিয়াছে, কোন্ পরীরাজ্যে আমার এই মানসপ্রতিমা অম্লানমধুরিমায় বিভোর হইয়া আছে! মনে পড়ে, বৈষ্ণবকবির সেই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যসৃষ্টি। যখন যমুনার কূলে কনকবর্ণা গোপবধূ নীলাম্বরে সাজিয়া কামিনীকুঞ্জে গ্রীবা হেলাইয়া বিরাজ করিতেছেন, তখন রাজনীতিপণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণের মস্তিষ্কের অবস্থাও কল্পনা করিবার যোগ্য বটে। এইরূপ মস্তিষ্কের জন্যই পরিশেষে তিনি ব্যবস্থা করিলেন—দেহি পদপল্লবমুদারম্। বৈষ্ণবকবি যে অমর সৌন্দর্য্যের চিত্র আঁকিয়া গিয়াছেন, কখন সেরূপ মূর্ত্ত সৌন্দর্য্য দেখিয়া নয়ন সার্থক করিতে পারিয়াছিলেন কি না, জানি না—কিন্তু আমার বোধ হইল, যেন আমার এ আশা অপূর্ণই থাকিয়া যাইবে। কাব্যে কত সুন্দরীর চিত্র, চিত্রে কত জীবিতোপম অনির্ব্বচনীয় রূপ দেখিয়াছি, কিন্তু হায়, বাস্তবে কি তাহার কিছুই মিলে না। কবিকে জিজ্ঞাসা করিলে কবি বলিবেন, সৌন্দর্য্যের আদর্শ যেদিন নয়নগোচর হইবে, সেদিন সে যে "আদর্শ"-পদবী হইতে স্খলিত। চিত্রকর হয় ত মস্তক কণ্ডূয়ন করিবেন। কিন্তু আমার মন তাহাতে প্রবোধ মানিবে না। একান্ত আকাঙ্ক্ষার সহিত যাহা এতদিন হৃদয়ে পোষণ করিলাম, তাহা কাল্পনিক,—তাহা অলীক? তুমি কবি, তুমি চিত্রকর, তোমার ইচ্ছা হয় বল—কারণ তুমি ত আমার মত এমন সর্ব্বগ্রাসী সৌন্দর্য্যাভিলাষের প্রভাব জীবনের পরতে-পরতে অনুভব কর নাই। তুমি বলিতে পার, কিন্তু আমার হৃদয় তাহা মানিবে না। আমি বিশ্ব খুঁজিয়া খুঁজিয়া কেবল নিষ্ফলতাই লাভ করিয়াছি, কিন্তু আমার বিশ্বাস তাহাতে শিথিল হয় নাই। বাধা পাইয়া পাইয়া আমার আশা বাসনায়, বাসনা ব্যগ্রতায় এবং ব্যগ্রতা ক্রমে অধৈর্য্যে পরিণত হইয়াছিল। প্রথম বাধা পাইলাম বিবাহে। সকলের যেমন আশা থাকে যে, বিবাহের শুভদৃষ্টি এক অভিনব সৌন্দর্য্যরাজ্যের দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিবে, আমারও তাহাই ছিল; এবং সকলের মত আমাকেও নিরাশ হইয়া ফিরিতে হইয়াছিল। আমার স্ত্রী শ্যামবর্ণা। (সম্পাদকমহাশয়, অনুগ্রহ করিয়া লেখকের নামের স্থলে শুধু "শ্রী", "বিসর্গ" ও ছোটরকমের একটি "ড্যাশ্" দিয়া দিতে বলিবেন। দেখিবেন, যেন ভুলিয়া আমার নাম ছাপান না হয়। আর এ সংখ্যার "বঙ্গদর্শন" আমাকে আদৌ পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। আমি ক্লবে গিয়া পড়িয়া আসিব।) সুতরাং আমার আশা মিটিল না। আমার স্ত্রীর নিকট আমার কিছুই গোপনীয় ছিল না। আমি যখনই আমার কল্পনার মৌলিকসৃষ্টি নীলাম্বরী সুন্দরীর কথা তাঁহার নিকট পাড়িতাম, তখনই তিনি হঠাৎ গম্ভীর হইয়া পড়িতেন। আমি বুঝিতাম—স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা। কিন্তু আমার সে সব ভাবিবার সময় ছিল না। আমার হৃদয় সেই একই চিন্তায় ভরপুর। কাহার কোথায় একটু আঘাত লাগিল, তাহা দেখিবার বড় অবকাশ ছিল না। আমার স্ত্রী মাঝে মাঝে তাঁহার জন্য একখানি নীলরঙের পার্শী-শাড়ী আনিবার

জন্য বলিতেন। কিন্তু আমি সে কথা শুনিয়াও শুনিতাম না। আমার সে মানসী প্রতিমা শুভ্র শারদজোছনার ন্যায় সুন্দরী; নীলাম্বর তাহারই শোভে। তাহার একটা দীন মলিন অভিনয় করিতে আমার প্রবৃত্তি হইত না। কিন্তু একদিন বড় অনর্থ ঘটিল।

আমার স্ত্রী তাঁহার এক নবাগত বন্ধুর ভবনে নিমন্ত্রণরক্ষা করিয়া বাড়ী ফিরিতে "রাত্রি করিয়া" ফেলিয়াছেন। সেজন্যও বটে ও গ্রীষ্মাতিশয্যহেতুও বটে, আমার মেজাজের উষ্ণতা সাড়ে-অষ্টানব্বই অতিক্রম করিয়াছিল। তার পর যখন তিনি তাঁহার সইএর কানের ইয়ারিং হইতে তদীয় ময়নার প্রগল্‌ভতা পর্য্যন্ত সমস্ত বিষয়ের বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইলেন, তখন আমি হাই তুলিয়া প্রকাশ্যভাবে অন্যমনস্ক হইতে লাগিলাম। হঠাৎ আমার স্ত্রী বলিলেন, "নলিনী (তাঁহার বন্ধু) একখানা আশ্‌মানীরঙের শাড়ী পরিয়াছিল, তাহাকে এমন মানাইয়াছিল, সে আর কি বলিব?"

আমি এবার তাঁহার বর্ণনায় আগ্রহের সহিত মনোনিবেশ করিলাম। মনে করিলাম, এমন রুচি আমারই শিক্ষার ফল। না হইবে কেন? স্ত্রী হইতেছেন—"প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।" আমার আগ্রহ বোধ হয় তাঁহার বুঝিতে বাকি রহিল না। বলিলেন, "আমি কতদিন বলিয়াছি একখানা নীল পার্শী-শাড়ীর জন্য; আর বলিব না।"

আমি তাঁহার সে অপ্রচ্ছন্ন অভিমানে প্রশ্রয় না দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার বন্ধুটি বোধ হয় খুব ফর্শা হইবেন?"

"কেন, তাহার ত বিবাহ হইয়া গেছে, সে খবর জানিয়া আর লাভ হইবে কি?"

"কি আশ্চর্য্য! বিবাহ না করিলে বুঝি কাহারও চেহারার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতে নাই!"

"ভবানীবাবু (নলিনীর স্বামী) কাল তোমাকে নিমন্ত্রণ করিতে আসিবেন, সেখানে গেলেই দেখিতে পাইবে।"

"ভবানীবাবু কলিকাতায় আসিবার পর একবার তাঁহার বাড়ীতে গিয়াছি, কিন্তু তাঁহার স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই।—তার পর, তোমার বন্ধুর রং ফর্শা কি না, বলিলে না?"

"উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ।"

আমার ভ্রূ ঈষৎ কুঞ্চিত হইয়া আসিল, আমার স্ত্রীর সৌন্দর্য্যজ্ঞানসম্বন্ধে প্রথমটা যেমন সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম, তেমনই নিরাশ হইতে হইল। বলিলাম, "দেখ, শ্যামবর্ণের সঙ্গে নীলরঙের শাড়ী মানাইতে পারে না। যদি চাঁপাফুলের মত রং হয়, পটলচেরা—"

আমার স্ত্রী বাধা দিয়া বলিলেন, "যাহারা নীল শাড়ী পরে, সবাই বুঝি ডানাকাটা পরী?"

বাধা না মানিয়া আমি বলিতে লাগিলাম, "পটলচেরা চোখ হয়, সর্ব্বাবয়বের গঠনে বেশ স্বাস্থ্য ও সামঞ্জস্য থাকে—"

"এইরূপ একটি দেখিয়া বিবাহ করিলেই ত চুকিয়া যাইত।"

"দেখ, আমার কথার অর্থ তুমি ঠিক বুঝিতে পার নাই। বিবাহ করার কথা কে বলিতেছে? বিবাহ যেমন-তেমন হইলেই হয়, আদর্শটা—"

"যেমন-তেমন লইয়া থাকিবার প্রয়োজন

কি ?” অলঙ্কারশিঞ্জিতে আমার উপচীয়মান বক্তৃতার উচ্ছ্বাস নিমজ্জিত করিয়া দিয়া তিনি দ্রুতপদে কক্ষান্তরে গমন করিলেন।

———

পরদিন প্রাতে চা-এর টেবিলে ভবানীবাবুর নিমন্ত্রণ পাইলাম। অতি প্রত্যুষে, ঈষৎ গোলাপীরঙের সুপ্রসর মলমলের চাদরে তাঁহার স্থূলদেহ আপাদস্কন্ধ আবৃত করিয়া ভবানীবাবু ধীরপদসঞ্চারে আমার কক্ষে প্রবেশ করিয়াই একেবারে একখানা চেয়ার টানিয়া তাহাতে উপবিষ্ট হইলেন। আমি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া তাঁহার সংবর্দ্ধনার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। কিন্তু আমি উঠিবার পূর্ব্বেই তাঁহার আসনপরিগ্রহ করা হইয়া গিয়াছে। সুতরাং কেবল উচ্চহাস্য করিয়া তিনি আমার অপ্রতিভভাবের সমালোচনা করিলেন।

চা-পান শেষ হইলে ভবানীবাবু বলিলেন, “আজ সন্ধ্যায় আমার ওখানে আপনি আহার করিবেন। দেখিবেন, যেন ভুলিবেন না।” এই বলিয়া তিনি পকেট হইতে দেশলাই ও চুরুট বাহির করিয়া অতি যত্নপূর্ব্বক চুরুটে অগ্নিসংযোগ করিলেন ও কিছুক্ষণের জন্য ধূমপানে তন্ময় হইলেন।

“সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বেই যাইবেন। দু’-একবাজি দাবা খেলা যাইবে। দু’একখানা গানও শোনা যাইতে পারিবে। আর নেহাৎ কিছু না হয়, দুজনে খানিক চিৎপাত হইয়া পড়িয়া থাকাও ত যাইবে। কিছুক্ষণ আড্ডা দেওয়া বই ত নয়। আমার বোধ হয়, মাঝে মাঝে বন্ধুবান্ধবে মিলিয়া ঐরূপ একএকটা সান্ধ্যসমিতি বা আড্ডার জোগাড় করিলে মন্দ হয় না—যাহাতে সকলে মিলিয়া একটা বিস্তৃত ফরাশের উপর একএকটি তাকিয়া লইয়া স্রেফ্ চুপচাপ পড়িয়া থাকা যায়। অবশ্য রঙ্গালয়ে ধূমপান নিষিদ্ধ নহে। সময়টা বেশ কাটিয়া যায়—বুঝেচেন গোপালবাবু, বেশ বেমালুম কাটিয়া যায়।”

এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া ভবানীবাবু তাঁহার অনাদৃত অপরিসমাপ্ত চুরুটের কুণ্ডলীকৃত ধূমপুঞ্জে কিছুক্ষণের জন্য মন ও মুখমণ্ডলকে যুগপৎ নিমজ্জিত করিয়া দিলেন।

ভবানীবাবু বড় অমায়িক লোক। স্বভাবটি অতি সুন্দর। একবার পরিচয় হইলে, সহজে তাঁহাকে ভুলিতে পারা যায় না। তাঁহার হৃদয় সর্ব্বদাই যেন উন্মুক্ত—কৃত্রিমতার ব্যবধান সেখানে কোন সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেয় নাই। এই সকল কারণে অল্প পরিচয়েই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলাম।

অন্য কথাবার্ত্তার পর তিনি বিদায়গ্রহণ করিলেন। যাইবার সময় বলিলেন, “দেখিবেন, যেন দিনের কাজের গোলযোগে নিমন্ত্রণের বিষয় ভুলিয়া যাইবেন না। এ নিমন্ত্রণটা আমার গৃহিণীর পক্ষের, সুতরাং অত্যন্ত জরুরি।”

আমি বলিলাম, “শরীর ভাল থাকিলে—”

ভবানীবাবু “ঈশ্বরেচ্ছায় ঈশ্বরেচ্ছায়” বলিতে বলিতে সহাস্যমুখে বাহির হইয়া গেলেন।

———

সন্ধ্যার অব্যবহিত পরে ভবানীবাবুর গৃহে উপস্থিত হইলাম। তাঁহার ছোটখাটো বৈঠকখানার মেজেয় সতরঞ্চ ও চাদরের ফরাশ। তদুপরি বিভিন্ন আয়তনের গোটাকয়েক তাকিয়া অধিকার করিয়া কয়েকটি বাবু একটি

ছোটখাটো-রকমের মজলিস সাজাইয়া বসিয়া আছেন। আমি যাইবামাত্র তাঁহারা "আস্‌তে আজ্ঞে হোক্‌", "বস্‌তে আজ্ঞে হোক্‌" ইত্যাদি সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিতে করিতে আমাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। তাঁহারা সকলেই ভবানীবাবুর প্রতিবেশী, আমার আসিবার পূর্ব্বেই তাঁহারা আমার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভবানীবাবু একে একে সকলের সহিত আমার পরিচয় করিয়া দিলেন।

আমি আমার কোঁচানো চাদরটি সন্তর্পণের সহিত একটি তাকিয়ার উপর রক্ষা করিয়া অতি বিনীতভাবে উপবেশন করিলাম। চাকর আসিয়া সুবৃহৎ আল্‌বোলায় তামাক দিয়া তাহার নলটি আমার দিকে যত্নপূর্ব্বক প্রসারিত করিয়া দিয়া গেল। কিন্তু আমি "ও রসে বঞ্চিত দাসগোবিন্দ।" আমি নলটাকে তুলিয়া বেচারামবাবুর দিকে দিলাম। তিনি ধন্যবাদসূচক মৃদুহাস্য করিয়া বলিলেন, "আপনি বুঝি ওতে নাই? অতি উত্তম।" আমি চাহিয়া দেখিলাম, আর সকলের সতৃষ্ণদৃষ্টি ঐ নলটির উপরেই ছিল।

"এস হে ভায়া, একবাজি হোক্‌"—বলিতে বলিতে ভবানীবাবু দাবার বন্ধন উন্মোচন করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসিবাবু বলিলেন, "দাবা ত রোজই হয়, আজ গোপালবাবুর একআধখানা গান শোনা যাক্‌।"

বেচারামবাবু বলিলেন, "গোপালবাবু গাইতে পারেন বটে? বেশ, বেশ!"

আমি গ্রীবা হেলাইয়া বলিলাম, "আজ্ঞে না।"

আর "আজ্ঞে না!" আগুন যেমন ভস্ম-ঢাকা থাকে না, গুণও তেমনই বেশীক্ষণ চাপা থাকে না। বিশেষত যারা গান গাইতে জানে, তাদের ঐ "আজ্ঞে না" বলিবার ধরণই স্বতন্ত্র; অপরের পক্ষে বুঝিতে বেশী বিলম্ব হয় না। ভবানীবাবু তাঁহার প্রায়োন্মোচিত দাবা পুনরায় বন্ধন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এদিকে সন্ন্যাসিবাবু আমার সম্মতির অপেক্ষা না করিয়া একটি এস্‌রাজ—যাহা এতক্ষণ আমার অজ্ঞাতসারে গৃহকোণে বিরাজ করিতেছিল—আনিয়া হাজির করিলেন এবং কালোয়াত-দিগের ন্যায় একখানি জানুর উপর ভর দিয়া উপবেশন করিয়া সজোরে এস্‌রাজের অসংখ্য কর্ণ মর্দ্দনপূর্ব্বক বিচিত্র সুর বাহির করিতে লাগিলেন। সুরের দফায় আমার বিশেষ ব্যুৎপত্তি আছে বলিয়া খ্যাতি ছিল না। তবে আমার গলা খুব দরাজ; স্বর "বাজখাঁই" বলিয়া অনেকের পছন্দ হইত না বটে, কিন্তু আমার বোধ হয় পুরুষমানুষের কণ্ঠস্বর বামাকণ্ঠবিনিন্দিত হওয়া অত্যাবশ্যক নহে।

বহুক্ষণ পরে এস্‌রাজের সুর বাঁধা হইল। ছড়িটা দ্রুতসঞ্চালিত হইয়া সুরতরঙ্গে ক্ষুদ্র বৈঠকখানাগৃহটি প্লাবিত করিয়া দিল। বেচা-রামবাবু অতি গদ্গদভাবে বলিলেন, "এইবার গোপালবাবু আমাদের কৃতার্থ করুন।" আমি কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত প্রতিবাদ করিলাম। কিন্তু যখন গবাক্ষান্তরালে বলয়ের ধ্বনি শুনিতে পাইলাম, তখনই মন স্থির করিয়া ফেলিলাম। স্ত্রীজাতির সমক্ষে, বিশেষত আমার গৃহিণীর বন্ধুর সমক্ষে, যে-কোন উপায়েই হউক, আমাকে সম্মানরক্ষা করিতেই হইবে। সুতরাং আর ইতস্তত না করিয়া গান ধরিয়া দিলাম। এস্‌রাজের সুরের সঙ্গে সুর মিশিল না বলিয়া সন্ন্যাসিবাবু একটু আপত্তি করিলেন, কিন্তু

আমি তাহা লক্ষ্য না করিয়াই গাহিয়া চলিলাম। গানটি করুণরসাত্মক, গভীরভাবপূর্ণ, জড়-জগতের নশ্বরত্বপ্রতিপাদক। "শেষের সে দিন মন, কর রে স্মরণ, ভবধাম যবে ছাড়িবে।" উদারা, মুদারা, তারা, তিন গ্রাম অতিক্রম করিয়া আমার স্বর ছুটিয়া চলিল। শ্রোতৃমণ্ডলী নিস্তব্ধভাবে গানটি আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিলেন। গান সাঙ্গ হইলে সকলে উচ্চহাস্য করিয়া আমাকে অভিনন্দন করিলেন। সন্ন্যাসিবাবু এস্‌রাজটি ফরাশের উপর প্রলম্বিত করিয়া কিছুদূরে সরিয়া বসিলেন। আমি আবার একটি গান মনে করিতে লাগিলাম। দুঃখের বিষয়, আমার গানের মধ্যেই ভবানীবাবু দাবা বিস্তৃত করিয়া রাখিয়াছিলেন, এখন সকলে গিয়া সেই দাবার কোট ঘিরিয়া বসিলেন। আমি আর গান গাহিবার অবকাশ পাইলাম না।

দাবাখেলার পর আর সকলে বিদায়গ্রহণ করিলেন এবং ভবানীবাবু অলসভাবে তাকিয়ার আশ্রয় লইলেন। কিছুক্ষণ পরেই চাকর আসিয়া খবর দিল, "খাবার দেওয়া হয়েচে।" আমরা তাহার অনুবর্ত্তী হইলাম। আহারের সময় আমার স্ত্রীর বন্ধু,—ভবানীবাবুর পত্নী—বিশেষ যত্নসহকারে আমার তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। তিনি আমার গানের প্রশংসা করিলেন। আমি তাঁহার যত্ন ও অভ্যর্থনায় মুগ্ধ হইলাম।

আহারের পর ভবানীবাবুর শয়নকক্ষে গিয়া আমি বসিলাম। ভবানীবাবু তামাকুর অন্বেষণে বাহির হইলেন। আমি একখানি বেতের চেয়ারে উপবিষ্ট ছিলাম। ভবানীবাবুর স্ত্রী টেবিলের কাছে দাঁড়াইয়া আমার সহিত কথা কহিতেছিলেন। টেবিলের উপরে Hinksএর double burner আলো, ঘরটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। দেয়ালের গায়ে রবি-বর্ম্মার ছবি। ঘরের একদিকে বড় একখানা খাট ও তার উপর শুভ্রশয্যা আস্তৃত।

ভবানীবাবুর স্ত্রী শ্যামবর্ণা। গঠন দোহারা এবং মন অতি নির্ম্মল ও প্রফুল্ল। তাঁহার চোখে, মুখে ও ললাটে আনন্দের চাপল্য যেন সর্ব্বদাই বিরাজ করিতেছে। রন্ধনে, পরি-বেষণে ও যত্ন-অভ্যর্থনায় তাঁহার মত খুব কমই দেখা যায়।

ভবানীবাবুর স্ত্রী বলিতেছিলেন, আহারের সেরূপ আয়োজন করিতে পারেন নাই, ইত্যাদি।

আমি আগ্রহের সহিত তাহার প্রতিবাদ করিতেছিলাম, "যথেষ্ট আয়োজন হইয়াছে, আবার কি করিতে হইবে?" ইত্যাদি।

তিনি বলিলেন, "যাক্ সে কথা, আবার কবে আসিতেছেন বলুন? সেদিন কিন্তু সরোজিনীকে লইয়া আসিবেন।" আমি নানাপ্রকার কাজের ওজর জানাইতেছিলাম, এমনসময় তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'ঐ যা, আপনাকে পান দিতে ভুলিয়াছি। বিনু, ও বিনু, গোপালবাবুর পান দিয়ে যা।"

সহসা থিয়েটারের পট অপসারিত হইলে দর্শকমণ্ডলী ক্ষণকালের নিমিত্ত যেমন বিস্ময়-বিহ্বল হইয়া থাকে, আমার নয়নসমক্ষে যে দৃশ্য সহসা উদ্‌ঘাটিত হইল, তাহাতে আমিও তেমনই বিস্ময়বিমুগ্ধ হইয়া পড়িলাম। নাতি-কৃশাঙ্গী, রোচনাগৌরকান্তি, উছলিত-লাবণ্য-হিল্লোল-চঞ্চলা অথচ যৌবনোন্মেষলাজময়ী, প্রস্তনীলাব্জবিজিতধীরচরণা, চতুর্দ্দশবর্ষীয়া

একটি বালিকা আমার সম্মুখে! আমার চক্ষু ঝলসিয়া গেল। আমার হৃদয়ে নীলাম্বরী রমণীর যে আদর্শমূর্ত্তি জাগিতেছিল, দেহপরিগ্রহ করিয়া আমার সেই মানসী প্রতিমা আমার সম্মুখে বিরাজমানা। আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছিলাম। আমি ভুলিয়া গেলাম যে কোথায় আমি? ভুলিয়া গেলাম, সে ঘরে অপর কাহারও অস্তিত্ব। কল্পনা তাহার তুষার-কণসম্পৃক্ত, দিগন্তপ্রসারিত পক্ষপুটের উপর আমাকে উঠাইয়া-লইয়া যেন কোথায় উধাও হইয়া চলিল—যেন বহুদূরে—বহু—বহুদূরে। আমার আবেগ যেন সর্ব্বশরীর ব্যাপিয়া-ব্যাপিয়া মাদকসুলভ উন্মাদনায় আমাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। আমার চঞ্চলতা ভবানীবাবুর স্ত্রীর বুঝিতে বাকী রহিল না। তিনি মৃদুহাস্যের সহিত বলিলেন, "গোপালবাবু, অবাক্ হইয়া রহিলেন যে, পান খান্!" তাঁহার কণ্ঠস্বরে আমার চৈতন্য হইল। মনে করিলাম, তাই ত, "মায়া স্বিদেবা মতিবিভ্রমো নু!" নবাগতা আমার সম্মুখে টেবিলের উপরে তাম্বূলপাত্র রক্ষা করিয়া ভবানীবাবুর স্ত্রীর নিকটে গিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহার কুঞ্চিত অলকদাম উচ্ছৃঙ্খলভাবে ললাটস্পর্শ করিয়া দুলিতেছিল। তাঁহার অনিন্দ্য গৌরবর্ণ নীলাম্বর ভেদ করিয়া আলোকসম্পর্কে যেন কম্পিত হইতেছিল। আমি দেখিলাম—এ যে আমারই কল্পনার নীলাম্বরী।

আমি আদেশপালনের মত একটি পান লইয়া খুটিতে লাগিলাম। ভবানীবাবুর স্ত্রী বলিলেন, "এটি আমার ভগ্নী। বিনু, তুই ভবানীবাবুকে নমস্কার করিস্ নি?"

বিনোদিনী তাঁহার শরীরযষ্টি ঈষৎ হেলাইয়া আমাকে নমস্কার করিলেন। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাকে প্রতিনমস্কার করিলাম। ভবানীবাবুর স্ত্রী বলিলেন, "আপনার সহিত কত লোকের আলাপপরিচয় আছে, একটি পাত্র সস্তায় মিলাইয়া দিতে পারেন? মেয়ের বয়েস হইয়াছে, আর রাখা যায় না।" একটি অর্দ্ধপরিস্ফুট হাস্য কষ্টে চাপিয়া বিনোদিনী কক্ষ হইতে ছুটিয়া পালাইলেন।

পরে আর যে কি কথা হইল, তাহা সব আমার কর্ণে পৌঁছিল না। কারণ, আমি অন্যমনস্ক হইয়া ভাবিতেছিলাম—সেই নীলাম্বরী সুন্দরী।

সেইদিন হইতে একপ্রকার বিষাদপূর্ণ অলসতা আমাকে অধিকার করিয়া ফেলিল। কার্য্যে আর প্রবৃত্তি নাই, জীবনে আর সুখ নাই, আশায় আর মোহ নাই, এখন চিন্তাতেই কেবল সুখ, মরণেই শান্তি বলিয়া মনে হয়। বুঝিলাম, অনঙ্গদেব এতদিন ভুলিয়া-থাকিয়া অবশেষে এই বেচারীর প্রতি তাঁহার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিতেছেন। আমার চোখে কেবল সেই রূপের মোহ, আর কানে বাজিতেছিল ভবানীবাবুর গৃহিণীর কথা—"সস্তায় একটি পাত্র মিলাইয়া দিতে পারেন কি?" আমার মনে হইতেছিল—"ভাল, আমি যদি বিনোদিনীর পাণিপ্রার্থী হই, তাহা হইলে কি হয়?" এ প্রস্তাবে যে কেহ অসম্মত হইতে পারেন, তাহা আমার বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইল না। আমাদের "ঘরে" মিল আছে, তার পর, অন্যে যাহাই মনে করুন না, আমার নিজের রূপগুণসম্বন্ধে আমার মন্দ ধারণা ছিল না। কাহারই বা থাকে? তবে এক কথা এই, দোজো বর

এবং পূর্ব্বপক্ষ বর্ত্তমান। তা সস্তায় হইতে গেলে অমন একটু-আধটু অসুবিধা স্বীকার করিতেই হয়। বলিতে কি, আমি সেই অবধি মনে মনে বিনোদিনীকে বিবাহ করিবার চিন্তা ও প্রকাশ্যভাবে হিন্দুধর্ম্ম, কৌলীন্য-প্রথা ও তদন্তর্গত বহুবিবাহের প্রশংসা করিতে উঠিয়া-পড়িয়া লাগিলাম। আমার স্ত্রীর নিকটে পর্য্যন্ত কথায়-কথায় বলিলাম যে, আমার মাসিমা মৃত্যুকালে বলিয়া গিয়াছিলেন—"বাবা, আমার মাথা খাও, সংবৎসরের মধ্যে যদি বৌমার ছেলেপিলে না হয়, তবে তুমি আবার বিবাহ করিও।" বিনোদিনীর কথা পাড়িতে সাহস হইল না।

ভবানীবাবুর গৃহে আরও দুইতিনবার গিয়াছি, কিন্তু একবারও বিনোদিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় নাই। আমাকে দেখিয়া ভবানীবাবুর স্ত্রী মুখ টিপিয়া-টিপিয়া হাসিতেন। তিনি কি কিছু বুঝিতে পারিয়াছিলেন? স্ত্রীজাতির সর্ব্বজ্ঞত্বে আমার বিশ্বাস আছে।

বাড়ীতে আমার স্ত্রীর সংসর্গ আমার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু আমার স্ত্রী তাহাতে কাতর হওয়া দূরে থাকুক, বরং অধিকতর প্রফুল্ল হইতেন। বস্তুত তাঁহার হাস্যোজ্জ্বল দৃষ্টি আমাকে ব্যথিত করিত।

ভবানীবাবু সপ্তাহখানেক বাদে আমাকে আবার নিমন্ত্রণ করিলেন। এবার সস্ত্রীক নিমন্ত্রণ। যথেষ্ট সাজসজ্জা করিয়া একখানি সেকেণ্ডক্লাসের গাড়িতে খড়্‌খড়ি রুদ্ধ করিয়া ভবানীবাবুর দ্বারে উপনীত হইলাম। গাড়িতে আমার স্ত্রীর দৃষ্টি ও বাক্যালাপ যথাসম্ভব এড়াইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম।

ভবানীবাবুর বৈঠকখানায় আজ দাবার খুব ধুম। আমি একটি তাকিয়া অধিকার করিয়া বসিলাম। দাবার আসর হইতে অবিরাম যে বাদপ্রতিবাদের কলরব উঠিতেছিল, তাহা আমার বিরক্তিকর বোধ হইতেছিল। বৈঠকখানার উজ্জ্বল আলোক আমার পক্ষে অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। কখন অদৃশ্য ঈথিরীয় জগতের মধ্যে বিচরণ করিয়া, কখন রাস্তায় শকটের সঞ্চারিণী দীপশিখা দেখিয়া, কখন বা হাই তুলিয়া আমার সময় কাটিতেছিল।

অন্য সকলেই ধূমপানের আনন্দ উপভোগ করিতেছিলেন। আমার পক্ষে একটা-কিছু ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য বোধে ভবানীবাবু ডাকিয়া বলিলেন—"ওরে, এঁকে পান দিয়ে যা।" বেচারামবাবু ব্যস্তসমস্তভাবে হুঁকার নলটি আমার দিকে বাড়াইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু আমার মস্তকহেলনে হস্ত সঙ্কুচিত করিয়া বলিলেন—"ওঃ, আপনি ত ওতে নাই, বেশ! বেশ!"

একটি সুস্থ-সবল গৌরবর্ণ বালক পান দিয়া গেল। বালকটির মুখখানি বিনোদিনীর মত স্নিগ্ধ ও সরল, কিন্তু তত পূর্ণ নহে। মস্তকে কুঞ্চিত কেশভার, গায় একটি ওয়েস্ট-কোটমাত্র। আমার স্ত্রীর নিকট শুনিয়াছিলাম যে, ভবানীবাবুর একটি ভাই আছে। কিন্তু ইহাকে দেখিয়া বিনোদিনীর ভাই অর্থাৎ ভবানীবাবুর শ্যালক বলিয়াই মনে হয়। একবার তাহাকে কাছে ডাকিতে বড় ইচ্ছা হইল, কিন্তু তাহার নাম জানি না, সুতরাং সঙ্কোচবোধ করিলাম।

কিছুক্ষণ পরে চাকর আসিয়া বলিল, "খাবারের জায়গা হয়েচে।" বেচারামবাবু

তাঁহার স্বাভাবিক গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "উত্তম, উত্তম!" ভবানীবাবু বলিলেন, "যাও, যাচ্ছি।"

আজ সকলেই নিমন্ত্রিত। একটি লম্বা দালানে আমাদের সকলের জায়গা হইয়াছে। আহারের সময় অসমাপ্ত দাবার বাজির প্রত্যেক চালটির পরিণাম কিস্তীলাভের বিষয় উৎসাহের সহিত আলোচিত হইতেছিল।

আহার সমাপ্ত হইলে ভবানীবাবু নিমন্ত্রিতদিগকে বিদায় করিবার জন্য বৈঠকখানায় গমন করিলেন। আমাকে বলিলেন, "আপনার আর কষ্ট করিয়া বাহিরে যাওয়ার দরকার নাই।" আমি আহ্লাদের সহিত ভবানীবাবুর শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলাম। দূরের একটি প্রকোষ্ঠ হইতে আমার স্ত্রীর কণ্ঠস্বর শ্রুত হইতেছিল।

আমি ঘরে ঢুকিয়া দেখি, ভবানীবাবুর স্ত্রী আমার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তিনি বলিলেন, "আপনি এখন আপনার পথ দেখুন, সরোজিনী আজ এখানে থাকিবে।" আমি তাঁহার কথায় বিশেষ মনোযোগ দিলাম না। আমি ভাবিতেছিলাম, বিনোদিনী কেন আসিল না। ভবানীবাবুর স্ত্রী আমাকে চিন্তামগ্ন দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "কথাটা বুঝি পছন্দ হইল না! সরোজিনীকে আমরা ছাড়িয়া না দিলে আপনি কি করিয়া লইয়া যাইবেন?" আমি উত্তর করিলাম, "তা অবশ্য এখন আপনাদের হাত।" একটু পরে বলিলাম, "তবে একটা পান দিতে আজ্ঞা হোক্, প্রণাম করিয়া বিদায় হই।"

"ইস্, ভারি ভক্তি যে!" এই বলিয়া তিনি বিনোদিনীকে ডাকিলেন। আমিও তাই আশা করিয়াছিলাম।

ভবানীবাবুর স্ত্রী বলিলেন, "আপনাকে সেদিন যে একটি পাত্রের সন্ধান করিতে বলিয়াছিলাম, তাহার কি করিলেন, বলুন।"

"কিরূপ পাত্র চাহেন, তাহা না জানিলে কিরূপে পাত্রের সন্ধান করিতে পারি? বিবাহের বাজারের গতিক ত জানিতেছেন! ভাল ঘরবর ও লেখাপড়া দেখিয়া দিতে গেলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। দেখিতেছেন ত এখন আর কেহ শুধু মেয়ের রূপ দেখিয়া বিবাহ করে না।"

"তাহা হইলে আর ভাবনা কি ছিল? ভাল বংশ হয়, লেখাপড়া জানে, এমন একটি পাত্র যত কমে হয়, দেখিবেন। দোজো বর হইলেও ক্ষতি নাই, যদি বয়েস বেশী না হয়।"

আমি ভবানীবাবুর স্ত্রীর কথায় ক্রমশ একরূপ উত্তেজনা অনুভব করিতেছিলাম। অবিলম্বিতফল মনোরথ আমাকে সপ্তমস্বর্গে উঠাইয়া দিল। আমি কি বলিতে যাইতে-ছিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে (সৌভাগ্যক্রমে?) আমার বলিবার পূর্ব্বে বিনোদিনী গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহার দিদির হস্তে পানের ডিপে দিলেন। তিনি বলিলেন, "তুই যা, দিয়ে আয়।"

আমি খাটের উপরে বসিয়াছিলাম। বিনোদিনী আমাকে পান দিতে আসিলেন। পার্শ্বের কক্ষ হইতে শিশুকণ্ঠের ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া "এই রে, খোকা উঠেছে" বলিয়া ব্যস্তভাবে ভবানীবাবুর স্ত্রী চলিয়া গেলেন। আমি বিনোদিনীর হস্ত হইতে পান লইব কি!—আমার সর্ব্বশিরা দ্রুত স্পন্দিত হইতে-ছিল। বিনোদিনী আমার পার্শ্বে পান হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। আমার সকরুণ

দৃষ্টি তাঁহার মুখের উপর নিবদ্ধ ছিল। দেখিলাম, বিনোদিনী হাসিতেছেন। আমি তাঁহার পানপূর্ণ হস্ত দুই হস্তের মধ্যে লইয়া ঈষৎ চাপিয়া বলিলাম, "বিনো, আমি তোমাকে ভালবাসি, তুমি আমাকে ভালবাস কি?—শীঘ্র বল, এখনই হয় ত তোমার দিদি আবার আসিবেন।"

হায়, তখন বুঝিতে পারি নাই, আমার প্রেমের পরিণাম কি? বলিতে লজ্জা হয়, আমার দরবিগলিতধারে অশ্রু নির্গত হইতেছিল। বিনোদিনী উত্তর করিলেন না, আমার হস্ত হইতে হাতও ছাড়াইয়া লইলেন না, একটি উপাধানের উপর মুখ লুকাইলেন। আমি মনে করিলাম, আমার ভালবাসা ব্যর্থ হয় নাই। আমিও প্রেমের যথার্থ আবেগ সেইদিন প্রথম (এবং সেই শেষ) হৃদয়ে অনুভব করিলাম। কত কথাই বলিতে ইচ্ছা হইল, যাহা বলিবার অবকাশ আর এ জীবনে হয় ত পাইব না। কিন্তু আমার উদ্বেগলাঞ্ছিত বাণীর উপর ভরসা হইল না। সেইজন্য মনে করিলাম, দুইএকটি ভাল ভাল প্রেমকবিতার দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করিব। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, মনের ভাণ্ডারটাকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিলাম, কিছুতেই একটি প্রেমকবিতা মনে আসিল না। কামিনী সেন, রবিঠাকুর, নবীন সেন প্রভৃতি কবির নাম মনে হইতে লাগিল বটে, কিন্তু কাহারও একটিও কবিতা মনে পড়িল না। দুইএকটি গান আমার মনে ছিল, অবশেষে তাহাই আবৃত্তি করিতে লাগিলাম। সুর করিয়া গান করিতে পারিলে মিষ্ট শুনাইত, কিন্তু লোকে বলিবে কি? আমি বলিতে লাগিলাম—

"আমি আকাশে পাতিয়া কান,
শুনেছি শুনেছি তোমারই গান,
আমি তোমারে সঁপেছি প্রাণ, ওগো বিনোদিনি।"

আবেগভরে কহিলাম—

"তোমারি রাগিণী জীবনকুঞ্জে বাজে যেন সদা বাজে গো,
তোমারি আসন হৃদয়পদ্মে রাজে যেন সদা রাজে গো।"

কাতরকণ্ঠে বলিলাম—

আমি মর্ম্মের কথা, অন্তরব্যথা কিছুই নাহি কব,
শুধু পরাণমন চরণে দিনু বুঝিয়া লহ সব।

আরও বলিলাম—

কি মধুজোছনামাখা, চন্দ্রিমা তুলিতে আঁকা
হেরিলে তব মুখশশী প্রাণ জুড়ায়।

বিনোদিনী আরও মুখ লুকাইতে লাগিলেন। তাঁহার অলকরাজি বিস্রস্ত হইয়া পড়িল। একবার যেন ক্রন্দনের মত অস্পষ্টস্বর শুনিতে পাইলাম। জিজ্ঞাসিলাম, "বিনোদিনি, কাঁদিতেছ?"

বিনোদিনী কোন উত্তর করিলেন না। শুধু আপনার হাত লইয়া মুখ আচ্ছাদন করিলেন। আমার মনেও ভারি দুঃখ হইতেছিল। ইচ্ছা হইল যে, আমার সেই করুণরসাত্মক গানটা একবার আবৃত্তি করিয়া ফেলি—"শেষের সে দিন মন, কর রে স্মরণ", কিন্তু ঠিক সময়োপযোগী হইবে না বলিয়া চাপিয়া গেলাম।

ঠিক সেইসময় বিনোদিনীর দিদি আসিলেন। তখনও আমার হস্ত বিনোদিনীর স্কন্ধে ন্যস্ত ছিল। তাঁহার রোষকষায়িত দৃষ্টি কিরূপে সহ্য করিব, তাহা ভাবিয়া তাঁহার দিকে চাহিতে আমার সাহস হইতেছিল না। একটু পরেই ভয়ে ভয়ে চাহিয়া দেখি, তিনি খুব হাসিতেছেন। তিনি নিকটে আসিবামাত্র বিনোদিনীও খল্‌খল্ করিয়া হাসিয়া

উঠিল। আমি চমকিত হইলাম। বিনোদিনী ছুটিয়া পালাইতে যাইতেছিল, কিন্তু ভবানী-বাবুর স্ত্রী তাহার নীল বসনাঞ্চল ধরিলেন। বসনখানি তাঁহার হাতে রহিয়া গেল। আর সেই ধুতী ও ওয়েস্‌ট্‌কোট্‌পরা বালক কক্ষ হইতে হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া গেল। ভবানীবাবুর স্ত্রী ডাকিলেন "বিনোদবিহারি, এস, তোমার পরিচয় করিয়া দি।" ঘৃণা, লজ্জা ও ক্রোধে আমার সর্ব্বশরীর হইতে যেন আগুনের জ্বালা নির্গত হইতেছিল। ছিছি, আমার স্ত্রী কি মনে করিবেন। আমার কলেবর ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিল। তাহার উপর ভবানীবাবুর স্ত্রীর মর্ম্মভেদী উচ্চহাস্য আমাকে নিতান্ত ম্রিয়মাণ করিয়া ফেলিল। আমি কম্পিতহস্তে রুমাল লইয়া মুখ মুছিতে লাগিলাম।

এমনসময় আমার স্ত্রী সে কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার বন্ধু তাঁহাকে দেখিয়া দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত হাসিয়া উঠিলেন। আমার স্ত্রী তাঁহার হাস্যে যোগদান করিলেন না। দরজার নিকট দাঁড়াইয়া অপরাধীর মত কাতরভাবে আমার দিকে একবার চাহিলেন। সে দৃষ্টির মধ্যে অভিমানের মর্ম্ম-বেদনাও যেন মিশানো ছিল। একটু থাকিয়াই তিনি চলিয়া গেলেন। কিন্তু তাঁহার বিষাদপূর্ণ অভিমানের দৃষ্টি আমার মর্ম্মের অন্তস্তল স্পর্শ করিয়াছিল।

আমি একটি কথাও না বলিয়া সে কক্ষ পরিত্যাগ করিলাম এবং কাহাকেও কিছু না বলিয়া রাজপথের বিজন নিস্তব্ধতা ও অর্দ্ধ অন্ধকারের মধ্যে আমার গ্লানি, লজ্জা ও অভিমান লইয়া ডুবিয়া গেলাম।

উপসংহার।

কতক্ষণ উদ্দেশ্যশূন্যভাবে বেড়াইলাম, তাহার ঠিকানা নাই। অধিক রাত্রে গৃহে ফিরিয়া নিদ্রাদেবীর শরণে অন্তর্দাহ বিস্মৃত হইলাম। পরদিন গৃহিণী আসিলেন। আমি তাঁহার কটাক্ষকে ভয় করিতেছিলাম, কিন্তু তাঁহার সেই পূর্ব্বের মত মৃদু-সুকোমল দৃষ্টি সর্ব্বদা আমার চক্ষুর অনুসরণ করিতেছিল। অদ্যাপি তিনি একটিবারও আমার নিকটে সে প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন নাই। যেন সে ঘটনাটি আদৌ ঘটে নাই, এমনইভাবে তিনি ব্যবহার করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্বাভাবিক স্নিগ্ধ-মধুর ভাব আমাকে অল্পদিনের মধ্যেই সঙ্কোচের ব্যবধান হইতে টানিয়া লইল। এখন, আমার চোখে আমার স্ত্রী যেমন সুন্দর, শপথ করিয়া বলিতে পারি, এমন সুন্দর আর কিছুই নাই।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র।

শিবাজী-উৎসব।

এবারে কলিকাতায় শিবাজী-উৎসবে দুএকটি নূতন অঙ্গের সমাবেশ হইয়াছিল। তাহা লইয়া আমাদের মধ্যে কিছু মতান্তর উপস্থিত হইয়াছে। এ বিরোধ একেবারে ঘুচিবে কি না, জানি না। তবে এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা হয়, ইহা সর্ব্বান্তঃকরণে ইচ্ছা করি। এই আলোচনা প্রবর্ত্তিত করিবার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা করিলাম। প্রতিপক্ষের বক্তব্য শেষ হইলে, আশা করি, বঙ্গদর্শনসম্পাদকমহাশয় প্রস্তাবপ্রবর্ত্তকের শেষ জবাব দিবার অধিকার হইতে আমাকে বঞ্চিত করিবেন না।

এবারকার শিবাজী-উৎসবের বিশেষত্ব ইহার হিন্দুত্ব। এতদিন আমরা নিতান্ত সাদাসিধে ভাবে শিবাজী-উৎসব করিয়া আসিয়াছি। সভা ও বক্তৃতাই উৎসবের একমাত্র অঙ্গ ছিল। সভাতে যোগদান বা বক্তৃতাপ্রদান করাতে কাহারই কোনো বিশেষ আপত্তি হয় নাই। এবারে সভা ও বক্তৃতা উৎসবের মুখ্য অঙ্গ ছিল না। এ সকলের সঙ্গে সঙ্গে তিনদিন ধরিয়া পুতুল-নাচ, যাত্রাগান, লাঠিতলোয়ারখেলা, কথকতা প্রভৃতিও হইয়াছে। এ সকলেও কিন্তু উৎসবের প্রাচীনভাব পরিবর্ত্তিত হয় নাই। শিবাজীসম্বন্ধে যাঁহারা বক্তৃতা শুনিতে পারেন, শিবাজীর জীবনবিষয়িণী কথকতা শুনিতে কিংবা পুতুলনাচের মধ্য দিয়া সে জীবনের বিবিধ ঘটনাবলীর অভিনয় প্রত্যক্ষ করিতে তাঁহাদের কোনো আপত্তি থাকিতে পারে না। এ ছাড়া, এবারকার উৎসবক্ষেত্র একটা স্বদেশী মেলার মধ্যে রচিত হইয়াছিল, ইহাতেও ধর্ম্মসংস্পর্শ ছিল না। ইহাতেও কাহারো কোনো আপত্তি হয় নাই। আপত্তি হইয়াছে, এবারকার শিবাজী-উৎসবের সঙ্গে সিংহবাহিনী মূর্ত্তির সংস্রব ছিল বলিয়া। এইখানেই আবার এবারকার উৎসবের বিশেষত্ব ছিল,—এই মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠাতেই এবার শিবাজী-উৎসবকে বিশেষভাবে হিন্দু-আকার দেওয়া হয়। আর এ উৎসবের এই হিন্দুত্বই যত প্রতিবাদ উত্থাপন করিয়াছে।

দুই দল, দুই বিভিন্ন কারণে, এবারকার উৎসবের এই বিশেষত্বের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। একদল সিংহবাহিনী মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠাকে পৌত্তলিকতা বলিয়া তাহার গুরুতর প্রতিবাদ করিয়াছেন। ইঁহাদের প্রতিবাদ ধর্ম্মমূলক। ইঁহারা প্রতিমাপূজাকে পাপকার্য্য বলিয়া মনে করেন। এবারকার শিবাজী-উৎসব সিংহবাহিনীপ্রতিমার সংস্রবে পাপসংসৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া ইঁহারা উৎসব-ক্ষেত্রের ছায়া পর্য্যন্ত স্পর্শ করেন নাই। আর একদল আপনারা প্রতিমাপূজার বিরোধী নন; প্রত্যুত বিবাহাদি সামাজিক অনুষ্ঠানে, প্রতিমা কেন, শালগ্রামাদি প্রতীকের উপাসনা পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন। ইঁহারা সাধারণভাবে

হিন্দুত্বের বিরোধী নহেন, বরং হিন্দুত্বের পক্ষপাতী বলিয়াই আপনাদিগকে সর্ব্বথা জাহির করিয়া থাকেন। কিন্তু রাজনীতি-ক্ষেত্রে ইঁহারা ধর্ম্মের সংস্রব অকল্যাণকর বলিয়া মনে করেন। ভারতের রাজনীতি কেবল হিন্দুকে লইয়া চলিবে না। ইহাতে হিন্দু ও মুসলমান, ব্রাহ্ম ও খৃষ্টিয়ান, সকলকে এক হইয়া কার্য্য করিতে হইবে। এবং বিবিধ ধর্ম্মাবলম্বীর মধ্যে সাহচর্য্য ও সহানুভূতি প্রতিষ্ঠা করিতে গেলে, ইঁহাদের পরস্পরের ধর্ম্মের বিশেষত্বকে রাজনীতির বাহিরে না রাখিলে চলিবে না। শিবাজী-উৎসব রাজনৈতিক উৎসব, সুতরাং এ উৎসবে হিন্দু-মুসলমান সকলে সমভাবে যোগদান করিবে। ইহার সঙ্গে কোনোপ্রকারের ধর্ম্মানুষ্ঠানের সংস্রব থাকিতে পারে না। এবারকার উৎসবের সঙ্গে ধর্ম্মের সংস্রব রাখিয়া, কর্ম্মকর্ত্তাগণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রদান করেন নাই।

দ্বিতীয় দলের আপত্তির বিচারই প্রথমে করা যাউক। ইঁহাদের প্রথম কথা এই যে, শিবাজী-উৎসব একটা রাজনৈতিক উৎসব। এ কথার অর্থ আমি এখনো ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই। ইঁহারা শিবাজী-উৎসবকে একটা পোলিটিক্যাল্-ফেষ্টিভেল বলিয়া থাকেন। কিন্তু পোলিটিক্যাল্ ফেষ্টিভেল কাহাকে বলে? রাজা-প্রজার সম্বন্ধ লইয়াই রাজনীতি বা পোলিটিক্স্। এই সম্বন্ধকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য, এই সম্বন্ধকে আয়ত্ত করিবার জন্য, এই সম্বন্ধকে বিশুদ্ধ ও কল্যাণকর করিবার অভিপ্রায়ে যদি কোনো উৎসবাদির প্রতিষ্ঠা হয়, তাহাকে নিঃসঙ্কোচে পোলিটিক্যাল্ উৎসব বলা যাইতে পারে। কিন্তু শিবাজী-উৎসবে এশ্রেণীর রাজনীতি বা পোলিটিক্স্ তো কিছুই দেখিতে পাই না। বর্ত্তমানে যাঁহারা আমাদের রাজা— এ উৎসবের সঙ্গে তাঁহাদের কোনোই সম্পর্ক নাই। শিবাজীর জীবন ও চরিত্রের সঙ্গেও তাঁহাদের কোনোই বিশেষ সম্পর্ক ছিল না। আমরা যদি কংগ্রেস্কে কেন্দ্র করিয়া একটা উৎসব প্রতিষ্ঠা করি, তাহা পোলিটিক্যাল্ ফেষ্টিভেল হইবে। আমরা যদি সুরেন্দ্রনাথ বা গোপালকৃষ্ণ গোখেলের জন্মতিথি উপলক্ষে কোনো মহোৎসবের আয়োজন করি, তাহা পোলিটিক্যাল্ হইবে। কারণ, ইঁহাদের জীবনের সমুদায় শক্তিসামর্থ্য বর্ত্তমান ভারতে রাজাপ্রজার সম্বন্ধ যাহাতে ন্যায়ানুমোদিত ও কল্যাণকর হয়, তজ্জন্য নিয়োজিত হইয়াছে। এ সকল পোলিটিক্যাল্ উৎসবে ইংরেজ-রাজের সঙ্গে ভারতের প্রজাপুঞ্জের সম্বন্ধ এখন কিরূপ আছে ও ভবিষ্যতেই বা কিরূপ হইবে ও হওয়া বাঞ্ছনীয়, এই সকলই আমাদের চিন্তার ও ধ্যানের বিষয় হইবে। শিবাজী-উৎসব কি এরূপ হইবে, না কখনো হইতে পারে?

কিন্তু এই সঙ্কীর্ণ অর্থে না হইলেও, একটা বৃহত্তর অর্থে শিবাজী-উৎসবকে হয় ত ইঁহারা রাজনৈতিক উৎসব বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। মোগলশাসনাধীনে দক্ষিণ-ভারতের প্রজাশক্তি শিবাজীকে অবলম্বন করিয়া অত্যাচারী রাজশক্তির প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়াছিল,—শিবাজী-উৎসবে আমরা অত্যাচারপ্রবণ রাজশক্তির প্রতিকূলে দণ্ডায়মানা উদ্যতপিনাকধারিণী ভারতের প্রজাশক্তিরই ধ্যান করিব। শিবাজী যে

সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, আমরাও আজ সেইরূপই আর এক বিশাল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ভারতের প্রজাশক্তিকে বর্ত্তমানে পুনরায় রাজকীয় অত্যাচারের প্রতিকূলে আত্মপ্রতিষ্ঠ করিতে হইবে। প্রাচীন সংগ্রামের উদ্দীপনা হইতে আমরা এই শিবাজী-উৎসবের সাহায্যে বর্ত্তমানের প্রয়াসে শক্তিলাভ করিবার চেষ্টা করিব। এইভাবে শিবাজী-উৎসবকে কেহ কেহ দেখিয়া থাকেন। আর এভাবে যে ইহাকে দেখা যায় না বা দেখা অসঙ্গত, এমন কথাও বলিতে পারি না।

কিন্তু এভাবে শিবাজী-উৎসব করিবার একটা গুরুতর বিপদ্ আছে। শিবাজীকে অত্যাচারীর প্রতিবাদিরূপে দেখিতে গেলে, মুসলমানশাসনের প্রতি বৈরভাব বিদূরিত করা সহজ হইবে না। অত্যাচারীকে ছাড়িয়া অত্যাচারের ধ্যান কদাপি সম্ভব হয় না। গুণীকে ছাড়িয়া গুণের সত্যজ্ঞান কখনো হয় না,—হইতে পারে না। কৃষ্ণপদার্থকে ছাড়িয়া কৃষ্ণত্ব একটা ভাবমাত্র, একটা কথামাত্র, একটা কল্পনামাত্র,—তাহা বস্তুহীন ও অসৎ। সুন্দর পদার্থ বা সুন্দর পুরুষ বা সুন্দরী রমণী বা সুন্দর বালকবালিকাকে ছাড়িয়া সৌন্দর্য্য,—একটা ছায়ামাত্র। সৌন্দর্য্যের ধ্যান করিতে গেলেই সুন্দর বস্তু বা ব্যক্তির বিশিষ্ট রূপের মধ্য দিয়া তাহাকে ধরিতে হইবে। সেইরূপ অত্যাচারের ধ্যান করিতে হইলে অত্যাচারীকে বাদ দিয়া করিলে চলিবে না। অত্যাচারের প্রতিবাদিরূপে শিবাজীকে ধ্যান করিতে হইলে আওরংজিবের প্রতিপক্ষে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, নতুবা সে ধ্যান সত্যোপেত, বস্তুতন্ত্র ও শক্তিশালী এবং জীবনপ্রদ হইবে না। আবার আওরংজিবকে ধ্যান করিতে গেলে, সমগ্র মোগলসাম্রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত করিয়া মোগলরাজনীতির আলোকে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। এইভাবে শিবাজী-উৎসব করিতে গেলে, উৎসবকারীদিগের প্রাণে হিন্দুমুসলমানের বিরোধভাব আপনি জাগ্রত হইয়া উঠিবে। আর তাহা যদি না হয়, শিবাজীর ধ্যান সত্যধ্যান হইবে না;—শিবাজী-উৎসবে কোনোপ্রকারে প্রাণশক্তি জাগিয়া উঠিবার অবসর পাইবে না;—এই মহোৎসবের মহদনুষ্ঠান কেবল বাক্যে, কেবল কল্পনাজল্পনায়, কেবল হুজুগে ও করতালিতেই পর্য্যবসিত হইবে।

ফলত রাজকীয় অত্যাচারের প্রতিবিধানই শিবাজীর জীবনের মুখ্য লক্ষ্য বা একমাত্র শিক্ষা নহে। শিবাজী মোগলপ্রভুশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামঘোষণা করিয়া দক্ষিণভারতের হিন্দুপ্রজাগণকে মোগলশৃঙ্খলমুক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু ইহা তাঁহার জীবনের অবান্তর লক্ষ্যমাত্র ছিল। মোগল-অত্যাচারের প্রতিরোধ—শিবাজীর জীবনের অভাবাত্মক দিক্। এই অভাবাত্মক বস্তুকে ধরিয়া শিবাজীমহারাজ আমাদের জাতীয়-জীবনের অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানাদিতে কদাপি সনাতন স্থান লাভ করিতে পারিবেন না। আর শিবাজী যে সাধারণভাবে রাজকীয় অত্যাচারের বিরুদ্ধে সমরঘোষণা করিয়াছিলেন, এমন কথাও বলা যায় না। মারাঠাদিগের প্রভাবে এদেশে কখনো রাজকীয় অত্যাচার একেবারে নিরস্ত হয় নাই। মারাঠাসেনা-

নায়কগণ মোগলের অত্যাচার হইতে প্রজাগণকে মুক্ত করিয়া আপনাদের কঠোরতর শাসনে নিস্পেষিত করিতে ক্ষান্ত হন নাই। মোগলপাঠানের অত্যাচার অপেক্ষা বর্গীর অত্যাচার কম ছিল,—অন্তত বাঙলার লোকে এ কথা বিশ্বাস করিবে না। যেভাবে মার্কিণের ওয়াশিংটনকে, ইতালীর ম্যাট্সিনি বা গ্যারিবল্‌ডীকে, হল্যেরির কসুথ্‌কে বা ইংলণ্ডের পিউরিটান্ অধিনায়কগণকে রাজকীয় অত্যাচারের বিরোধী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায়, শিবাজীমহারাজকে কিংবা মারাঠারাষ্ট্রনায়কগণকে কদাপি সেভাবে গ্রহণ করা যায় না। রাজকীয় অত্যাচারের প্রতিরোধ করিয়াছিলেন বলিয়া যাঁহারা শিবাজীর গুণানুকীর্ত্তন করেন ও এইভাবে যাঁহারা শিবাজী-উৎসব করিতে চান, তাঁহারা শিবাজীর চরিত্র ও মারাঠার ইতিহাস বিচারপূর্ব্বক অধ্যয়ন করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।

কিন্তু শিবাজীমহারাজের জীবনের ও চরিত্রের, ভাবের ও আদর্শের, একটা বিরাট্ ভাবাত্মক দিক্ ছিল। আমরা সেই দিক্‌টা ধরিয়াই তাঁহার নামে একটা জাতীয় মহোৎসবের সূচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। সেই ভাবাত্মক দিক্ই তাঁহার নিজস্ব; এই দিকেই তাঁহার বিশেষত্ব ও বিশিষ্টতা। এই দিক্ই শিবাজীচরিত্রের সনাতন দিক্। এই দিক্ দিয়াই তিনি হিন্দুর জাতীয়জীবনের সঙ্গে এক নিত্যসম্বন্ধ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

শিবাজীমহারাজ হিন্দুসমাজে এক বিরাট্ ও উন্নত রাষ্ট্রতন্ত্রের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইংরেজিতে যাহাকে নেশন্ বলে, নানা কারণে প্রাচীনকালে তাহার আদর্শ আমাদের মধ্যে ভাল করিয়া ফুটে নাই। বর্ত্তমানে আমরা নেশনগঠনকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছি। প্রাগৈতিহাসিক যুগে, রামায়ণ বা মহাভারতের সময়, হিন্দুদেশে যে নেশনগঠনের প্রয়াস কখনো হয় নাই, এমন কথা ঠিক বলিতে পারি না। সেই প্রাচীনকালে ক্ষুদ্রতর গোষ্ঠীসকলের সম্মিলন ও সংমিশ্রণেই যে ক্রমে এই বিশাল হিন্দুজাতির উৎপত্তি হইতেছিল, ইহা স্থিরনিশ্চিত। কিন্তু অধুনাতন কালে, ইতিহাস অকাট্যপ্রমাণসহকারে যে যুগের কাহিনী বর্ণনা করিতেছে, সেই যুগে, দুইবারমাত্র আমাদের মধ্যে নেশন্ গড়িবার চেষ্টা হইয়াছে;—এক পঞ্জাবে শিখগুরু মহাত্মা গোবিন্দসিংহের দ্বারা, অপর দাক্ষিণাত্যে মহারাষ্ট্রসেনানায়ক ছত্রপতি মহারাজা শিবাজীর দ্বারা। আর এতদুভয়ের মধ্যে শিবাজীর চেষ্টাই বৃহত্তর ও স্ফুটতর হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

গুরুগোবিন্দ ভারতের হিন্দু ও মুসলমানতন্ত্রকে উপেক্ষা করিয়া, একটা তৃতীয়তন্ত্র গড়িতে চেষ্টা করেন। নূতন তন্ত্র গড়িতে গেলেই তাহা অপরিহার্য্য কারণে অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণস্থানে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। শিখতন্ত্র এইজন্য অতি সামান্যসংখ্যক লোককেই অধিকার করিতে পারিয়াছিল। এই কারণেই, কেবল সংখ্যার স্বল্পতানিবন্ধন শিখ খালসার অলৌকিক শৌর্য্যবীর্য্য সকলই অপেক্ষাকৃত নিষ্ফলতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

শিবাজীমহারাজ কোন নূতন তন্ত্র গড়িতে চান নাই। তিনি বিশাল হিন্দুসমাজেই একটা বিরাট্ রাষ্ট্রতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। আধুনিক যুগের উপযোগী করিয়া কিরূপে যে হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা

করা যাইতে পারে, শিবাজী তাহাই দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি বর্ণাশ্রমবিভক্ত হিন্দু-ভারতে একটা বর্ণাশ্রমাতিরিক্ত রাষ্ট্রতন্ত্র গঠন করিতে চাহিয়াছিলেন। রাষ্ট্রীয়জীবনে হিন্দুসমাজের ভেদের মধ্যে অভেদ প্রতিষ্ঠা করাই মারাঠারাষ্ট্রনীতির শ্রেষ্ঠশিক্ষা। এই-জন্য আধুনিক কালের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান হিন্দুনেশন্‌রচয়িতা ও হিন্দুরাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠাতা-রূপেই শিবাজী আমাদের বরণীয় ও পূজার্হ হইয়াছেন। এই দিক্ দিয়াই আমরা তাঁহাকে দেখি। এই দিক্ দিয়াই আমরা তাঁহার জীবনের ও চরিত্রের আলোচনা করি। এইভাবেই আমরা শিবাজীর নামে আমাদের জাতীয়জীবনে একটা অনুষ্ঠান ও উৎসব প্রতিষ্ঠা করিতে চাই।

এইভাবে যখন শিবাজীকে দেখি, তখন আর মোগল-অত্যাচারের প্রতি আমাদের তেমন দৃষ্টি পড়ে না। এইভাবে শিবাজীর ধ্যান করিতে গেলে মোগলের অত্যাচার-কাহিনী স্মরণ করা অত্যাবশ্যকও নহে।

প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রতন্ত্রের সঙ্গে সংঘর্ষ উপস্থিত না হইলে, কুত্রাপি নেশন্‌-আদর্শ জাগ্রত ও নেশন্‌বস্তু গঠিত হয় না সত্য; এবং এই কারণে হিন্দুনেশন্‌গঠনের জন্য একটা প্রতি-দ্বন্দ্বী রাজতন্ত্রের অত্যাচার ও বিজাতীয় রাজ-শক্তির সঙ্গে বিরোধের প্রয়োজন ছিল বটে; কিন্তু কোনো বিশেষ রাজতন্ত্র বা কোনো বিশেষ রাজশক্তি ব্যতীতও এই প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারিত। মোগল না হইয়া, শিবাজীর সময়ে, যদি ভারতে হূণ বা চীনে, জর্ম্মান্ বা ইংরেজ ভারতের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত থাকিত, তাহা হইলেও শিবাজীমহারাজ সেই শৃঙ্খল ছেদন করিয়া ভারতে হিন্দুরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা-কার্য্যে ব্রতী হইতেন। সে সময়ে ভারতে মোগলের অধিকার হিন্দুরাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার পক্ষে একটা আকস্মিক ব্যাপারমাত্র ছিল।

নায়কনায়িকার প্রেমবৈচিত্র্যপ্রকাশের জন্য বাসন্তী যামিনী, জ্যোৎস্নাপ্লাত উপবন, কোকিলকূজন, মলয়বীজন, কুসুমরাগগন্ধ-চর্চ্চিত প্রকৃতির কোমলাঙ্কের প্রয়োজন হয় সত্য, কিন্তু প্রকৃতির এই ললিতভাব কোনো দেশবিশেষে প্রকাশিত না হইলে যে তদ্দ্বারা প্রেমবৈচিত্র্য-উদ্দীপনের কোনো ব্যাঘাত উৎপন্ন হয়, তাহা নহে। আর এই প্রেম-বৈচিত্র্যের ধ্যান করিতে গেলে বিশেষভাবে যে এই সকল আকস্মিক আধার ও আলম্বন-বিশেষের প্রতি মনোনিবেশ করিতে হয়, তাহাও নহে। এই সকলকে উপেক্ষা করি-য়াও নায়কনায়িকার প্রেমচ্ছবি প্রত্যক্ষ, ধ্যান ও সম্ভোগ করিতে পারা যায়। সেইরূপ শিবাজীর চরিত্র ও শিক্ষাদীক্ষা ধ্যান করিবার জন্য মোগলের অত্যাচার ধ্যান করা নিষ্প্রয়োজন।

এইরূপে আধুনিক ভারতে হিন্দুনেশন্‌-রচয়িতারূপে শিবাজীর ধ্যান করিলে, এবং এইভাবে শিবাজী-উৎসব সম্পাদন করিলে, এতদ্দ্বারা হিন্দুমুসলমানের মধ্যে কোনো বিরোধ উৎপন্ন হইবার আশঙ্কা থাকে না। কিন্তু অন্যদিকে এইভাবে শিবাজী-উৎসব করিতে গেলে প্রকৃতপক্ষে ইহার সঙ্গে মুসলমানগণের সাক্ষাৎসম্বন্ধে কোনো যোগও থাকিতে পারে না।

তবে ভারতবর্ষে মুসলমান অধিকাংশই হিন্দুজাতির অন্তর্ভুক্ত,—মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ

করিয়া মুসলমানঅন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন। জাতীয়-জীবনের দিক্ দিয়া, নেশনের উদার আদর্শের দ্বারা বিচার করিলে, ইঁহারাও হিন্দুনেশন্-রচয়িতারূপে শিবাজীর সংবর্দ্ধনা করিতে পারেন। বিশেষত হিন্দুনেশন্‌গঠনের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়া, শিবাজীমহারাজ স্বয়ং কদাপি মুসলমানপ্রজাসাধারণকে উপেক্ষা করিয়া চলেন নাই। মুসলমানরাজশক্তির সঙ্গেই তাঁহার সংগ্রাম ও সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, মুসলমানধর্ম্মের বা মুসলমান-প্রজামণ্ডলীর সঙ্গে তাঁহার কোনো বিরোধ ছিল না। প্রত্যুত তিনি আপনার রাজ্যে কোনোপ্রকারের রাষ্ট্রীয়ব্যাপারে হিন্দু-মুসলমানে কোনো প্রভেদপ্রতিষ্ঠা করেন নাই।

কিন্তু হিন্দুকুলোদ্ভব মুসলমানগণের পক্ষে শিবাজীর সংবর্দ্ধনা করা সম্ভব ও স্বাভাবিক হইলেও, বিদেশাগত রাজমর্য্যাদাস্বত্বাভিমানী মোগলপাঠানের পক্ষে শিবাজী-উৎসবে যোগদান করা সম্ভব নহে। শিবাজীর জীবন ও চরিত্র হইতে তাঁহারা কোনোই উদ্দীপনা ও দীক্ষা লাভ করিতে পারেন না। শিবাজীর কার্য্যের সঙ্গে তাঁহাদের জাতীয়-জীবনের কোনোই সংস্রব নাই। তাঁহারা আমাদিগের আমন্ত্রণে উৎসবক্ষেত্রে দর্শক-রূপে উপস্থিত হইয়া আমাদিগকে আপ্যায়িত করিতে পারেন, কিন্তু সত্যভাবে শিবাজী-যজ্ঞে আমাদিগের সঙ্গে যোগদান করিতে পারেন না।

কেহ কেহ হয়ত বলিবেন, এ অবস্থায় বরং শিবাজী-উৎসব না করাই ভাল। ভারতের জাতীয়জীবন এখন আর কেবল হিন্দুর হইবে না; ইহাতে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টিয়ান, সকলেরই স্থান ও যথাযোগ্য সমাবেশ হওয়া আবশ্যক। এই জাতীয়জীবনের অনুষ্ঠানপ্রতিষ্ঠানাদিকে এমনভাবে গঠন করিতে হইবে যে, তাহাতে ভারতের বিভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বী লোকেরা স্বচ্ছন্দচিত্তে, সমভাবে যোগদান করিতে পারেন। ইংরেজ যেমন ধর্ম্মটাকে বাহিরে রাখিয়া একটা সমদর্শী রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, আমাদিগকেও সেইরূপ ভারতের জাতীয়জীবনের উদ্দীপনায় ও প্রতিষ্ঠায়, ধর্ম্মকে বাহিরে রাখিয়া চলিতে হইবে। হিন্দু হিন্দু থাকিবে, হিন্দু থাকুক; কিন্তু মাতৃমন্দিরে, জাতীয়জীবনের পুণ্যভূমিতে আসিবার সময় সে কেবল ভারতবাসী বা বাঙালী বলিয়াই আপনাকে মনে করিবে, শুদ্ধ তাহার ভারতবাসিত্ব বা বাঙালীত্ব লইয়াই সে এখানে আসিবে, তাহার অপর যা-কিছু বিশেষত্ব, তাহাকে সে তখন দূরে রাখিয়া আসিবে। মুসলমান সেইরূপ জাতীয়জীবনের অনুষ্ঠানাদিতে আপনার মুসলমানত্বকে দূরে রাখিয়া আসিবে, খৃষ্টিয়ানও সেইরূপই করিবে। কোনো কোনো লোক আধুনিক ভারতের জাতীয়জীবনকে এইরূপে একটা শুদ্ধ রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক ব্যাপারেই আবদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহেন।

এ আদর্শের দোষ এই যে, ইহাকে জাতীয়-জীবনের আদর্শরূপে কখনো গ্রহণ করা যাইতে পারে না। জাতীয়জীবন আমাদের জীবনের একটা অংশমাত্র যদি হইত, তবে এই আদর্শে জাতিগঠন সম্ভব হইতে পারিত। কিন্তু জাতীয়জীবন জাতির অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনের সমগ্র ক্ষেত্রকে অধিকার করিয়া থাকে;—তাহার ধর্ম, তাহার কর্ম,

তাহার শিল্প, তাহার সাহিত্য, তাহার পারিবারিক, তাহার সামাজিক, তাহার রাষ্ট্রীয়, সমুদায় কর্ত্তব্য, সমুদায় ভাব, সমুদায় আশা ও আদর্শকে লইয়াই—এই সকলের মধ্য দিয়াই—তাহার জাতীয়জীবন আপনার সার্থকতা লাভ করিয়া থাকে। আমরা আহার করি, বিশ্রাম করি, বিবাহ করি, সন্তানপ্রতিপালন করি, অর্থোপার্জ্জন করি, বুদ্ধিবৃত্তিমার্জ্জন করি, ললিতকলার অনুশীলন করি, দেবতার ভজনা করি, দীন-দুঃখীকে দান করি, আতুর-অনাথের সেবা করি,—সমাজের দশজনের সঙ্গে বিবিধ সম্বন্ধে আবদ্ধ হই, রাষ্ট্রীয়ব্যাপারে লিপ্ত হইয়া দেশের শাসনসংরক্ষণের সহায়তা করি,—এইরূপ বিবিধ কার্য্যে আমাদের জীবন অতিবাহিত করিয়া থাকি। এই সকল বিবিধ কর্ত্তব্য পরস্পরনিরপেক্ষ হইয়াই অনেকসময় সাধিত হইয়াও থাকে,—কিন্তু তাই বলিয়া আমাদের জীবনের এই বিবিধ কর্ত্তব্যের ভেদবিরোধের বা ভাগাভাগির দ্বারা জীবনবস্তু যাহা, তাহার একত্ব কদাপি নষ্ট হয় না। জীবন আমাদের এক, অখণ্ড,—এই এক, অখণ্ড জীবনশক্তিই এই সকল বিবিধ কার্য্যে প্রকাশিত হয়, আর জীবনের সেই এক ও অখণ্ড আদর্শই এই সকল বিবিধ কার্য্যের মধ্যে আপনার সফলতা অন্বেষণ করিয়া থাকে। আমাদের জীবন গড়িয়া তুলিতে হইলে,—এ সকলের কোনোটির বর্জ্জন করিলে চলিবে না। সেইরূপ জাতীয়জীবন বলিতে যাহা বুঝায়, তাহাও এক ও অখণ্ড। সমগ্র জাতিকে সে অধিকার করিয়া থাকে; জাতির অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনের সমগ্রটুকুকে যদি জাতীয়জীবন অধিকার করিতে না পারে, তবে তাহা জাতীয়জীবননামের অধিকারী হয় না। রাষ্ট্র (state), সমাজ (society), ব্যবসা-বাণিজ্য, পাঠশালা, পরিষদ্, ধর্ম্মাধিকরণ প্রভৃতি জাতীয়জীবনের অঙ্গ, জাতীয়জীবনের বিভিন্ন অংশ,—এ সকলের সঙ্গে জাতীয়জীবনের অঙ্গাঙ্গী ও অংশাংশী সম্বন্ধ। অঙ্গ অঙ্গীর অধিকার গ্রহণ করিতে পারে না; অংশ অংশীর স্থান লাভ করিতে পারে না। সেইরূপ শুদ্ধ রাষ্ট্রীয়শক্তি বা রাজনৈতিক কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কদাপি জাতীয়জীবনের স্থান, গৌরব ও অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।

যাঁহারা ভারতের জাতীয়জীবনকে কেবল রাষ্ট্রীয় বা রাজনৈতিক কিংবা ব্যবসাবাণিজ্যগত অধিকার ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে চাহেন, তাঁহারা জাতীয়জীবন বলিতে যে বিশাল বস্তুকে বোঝায়, তাহাকে সম্যক্ আয়ত্ত করিতে পারিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না।

রাজনীতিকে ধর্ম্মনিরপেক্ষ করা সহজ। ইংরেজ ভারতে তাহা করিয়াছে। কিন্তু জাতীয়জীবনকে ধর্ম্মনিরপেক্ষ করিতে গেলে, তাহার অঙ্গহানি হইবেই হইবে। আমরা কি এই বিকলাঙ্গ জীবনের জন্য লালায়িত হইয়াই, এতটা উদ্যম ও প্রয়াস প্রয়োগ করিতেছি?

জাতীয়জীবনকে ধর্ম্মনিরপেক্ষ করিবার চেষ্টা করা, আর জাতির অন্তর্ভুক্ত নরনারী-গণকে সর্ব্বপ্রকারের পরমার্থভাব ও আদর্শ বিবর্জ্জিত করা একই কথা। যাঁহারা এ চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারা পরমার্থের মহত্ত্ব ও জাতীয়জীবনের বিশালত্ব, দুএর কোনটাই হৃদয়ঙ্গম করেন নাই।

জাতির সঙ্গে ব্যক্তির সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। মাতৃগর্ভে যেমন শিশু বাস করে, আমরা প্রত্যেকে সেইরূপ আমাদের জাতির মধ্যে বাস করিয়া থাকি। মায়ের শক্তিতে শিশুর শক্তি, মায়ের চৈতন্যে শিশুর চেতনা, মায়ের স্বাস্থ্যে শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষিত হয়। সেইরূপ আমার জাতীয়জীবনের শক্তি-সম্পদ্-জ্ঞান-ঐশ্বর্য্য প্রভৃতির দ্বারা আমার নিজের জীবনের শক্তি-সম্পদ্-জ্ঞানাদিলাভ হইয়া থাকে। জল যেমন আপনার সমতলরেখাকে অতিক্রম করিয়া তদূর্দ্ধে কখনো উঠিতে পারে না, আমরাও সেইরূপ কখনো আমাদের জাতীয়জীবনের শক্তিসামর্থ্য, সভ্যতাসাধনা, জ্ঞানধর্ম্মাদিকে একেবারে অতিক্রম করিয়া কদাপি তাহার উপরে উঠিতে পারি না। জাতীয়জীবনে যদি ধর্ম্মানুশীলনের আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক ও সেই আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তির যথাযোগ্য ব্যবস্থাদি না থাকে, তবে আমার নিজের ব্যক্তিগত জীবনে কখনো ধর্ম্মাদর্শ উন্নত ও বিশদভাবে ফুটিয়া উঠিতে পারিবে না। যেখানেই জাতীয়জীবনের আদর্শকে ধর্ম্মনিরপেক্ষ করিয়া ফুটাইবার চেষ্টা হইয়াছে, সেখানেই অবশ্যম্ভাবিরূপে লোকের ধর্ম্মভাব ম্লান ও পরমার্থদৃষ্টি ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে।

আমরা যদি ভারতবর্ষে এই একান্ত সাংসারিক আদর্শে জাতীয়জীবন গঠন করিতে চাই, আমাদেরও এই হীনদশাই ঘটিবে। কিন্তু ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুমুসলমানের দেশে তাহা হইবে না—এই বিশ্বাস আছে বলিয়াই এ সকল উদ্ভট ভাব ও আদর্শে কোনো আতঙ্কের সঞ্চার হয় না।

ধর্ম্মকে যদি জাতীয়জীবনের বাহিরে না রাখিতে হয়, তবে হিন্দুমুসলমানে মিলিত হইয়া ভারতে এক বিশাল জাতীয়জীবনের প্রতিষ্ঠা হইবে কিরূপে?—ইহাই বর্ত্তমানযুগের প্রধান সমস্যা।

মার্কিণযুক্তরাজ্যের প্রতিষ্ঠায়, স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রাজতন্ত্রের সম্মিলনে কিরূপে যে একটা বিশাল রাষ্ট্রতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। তৎপূর্ব্বে এরূপ তন্ত্রের কথা লোকে কল্পনাও করিতে পারিত না। মার্কিণরাষ্ট্রীয়জীবনে বহুত্বের মধ্যে যে একত্ব, আত্মস্বাধীনতার সঙ্গে অপরের সংযোগ ও অপরের উপরে অপেক্ষার যে অদ্ভুত সমন্বয় সাধন করিয়াছে,—ভারতবর্ষ জাতীয়জীবনেও তাহাই প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত করিবে। আমি এই বিশ্বাস করি।

ভারতের ভবিষ্য জাতীয়জীবন ফেডারেশনের আদর্শে গঠিত হইবে। এই জীবনের এক অঙ্গ হিন্দু, অপর অঙ্গ মুসলমান, তৃতীয় অঙ্গ খৃষ্টীয়ান থাকিবেই থাকিবে। কিন্তু ইহারা প্রত্যেকে আপন-আপন বিশেষত্বকে রক্ষা করিয়া ও সেই বিশেষত্বেরই বিকাশসাধনের দ্বারা,—ভারতের সাধারণ জাতীয়জীবনকে পরিপুষ্ট করিবে। অন্যদেশে ব্যক্তিগত চরিত্রের ও আদর্শের বিচিত্রতার মধ্যেই যেমন জাতীয়জীবন পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে, ভারতে সেইরূপ হিন্দুমুসলমান প্রভৃতির জাতীয়জীবনের বৈচিত্র্যের মধ্যেই এক বিশালতর জাতীয় ভাব ও আদর্শ ফুটিয়া উঠিবে।

এই ভাবকে আয়ত্ত করিতে ও এই আদর্শকে ফুটাইয়া তুলিতে হইলে,হিন্দুকে আপনার শাস্ত্র, আপনার সাহিত্য, আপনার সাধনা, আপনার ইতিহাস, আপনার আচার-অনুষ্ঠানের অনু-

স্বরূপে ও যথাযথ বিকাশসাধনেই ভারতের বিশাল জাতীয়জীবনের পরিপুষ্টিসাধন করিতে হইবে। মুসলমানকেও সেইরূপ মুসলমানত্বের ভিতর দিয়াই আত্মশক্তিবিকাশ করিয়া, সাধারণ জাতীয়জীবনের উন্নতিবিধান করিতে হইবে। মাতৃভূমির ও স্বজাতীয়ের সেবায় হিন্দু আপনার প্রণালী অবলম্বন করিবে, স্বদেশপ্রেমসাধনে হিন্দু আপনার অভ্যস্ত রসতত্ত্বের ও ভাবাঙ্গসাধনের পন্থারই অনুসরণ করিবে। মুসলমানও সেইরূপ তাহার অভ্যস্ত পন্থাই অবলম্বন করিবে। আর এইরূপ বিবিধ-সাধনমার্গ-অবলম্বনে ইহাদের প্রাণে যে প্রেমের সঞ্চার হইবে, তাহা একই আধারে একই মাতৃভূমি, একই জন্মভূমিকে বরণ করিবে,—একই মাতৃভূমির সেবায় উৎসর্গীকৃত হইবে।

এই আদর্শ যাঁহারা আয়ত্ত করিয়াছেন, তাঁহারা, শিবাজী-উৎসবের হিন্দুত্বে ভারতে জাতীয়জীবনগঠনের ও জাতীয়-একত্ব-সম্পাদনের কোনো ব্যাঘাত উৎপাদন করিবে, এরূপ আশঙ্কা করিতে পারেন না। আমরা এই আদর্শ পাইয়াছি। তাহাতেই হিন্দুর জন্য হিন্দুরাষ্ট্রপতি শিবাজীর নামে জাতীয় মহোৎসবের প্রতিষ্ঠা করিতে যাইয়া, তাহাতে বিশেষভাবে হিন্দুত্বের সমাবেশ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হই নাই।

এ বিষয়ে আরো অনেক কথা বলিবার আছে। বারান্তরে তাহা বলিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

সভ্যতার আদর্শ।

সাধারণ ইংরেজ বা ইউরোপীয় যে আজ জগতের মধ্যে নিজেকে সভ্য বলিয়া মনে করে, তাহার কারণ, সে বিজ্ঞানের বলে জড়শক্তিকে নিজের ভৃত্যের ন্যায় খাটাইয়া লইতে পারিতেছে। ষ্টিম্, ইলেক্‌ট্রিসিটি, ম্যাগ্‌নেট্ প্রভৃতির শক্তিকে অনায়াসে কাজে লাগাইয়া তাহার রেল, ষ্টীমার, টেলিগ্রাফ্, জাহাজ চলিয়াছে। সাধারণ ইংরেজ এইরূপ উন্নতিলাভকেই সভ্যতা বলিয়া মনে করে।

জড়শক্তিকে যতদিন মানুষ না জানিত, ততদিনই তাহাকে দেবতা বলিয়া আসিয়াছিল। বিশ্বের সর্ব্বত্র এইরূপে আপনার বিস্ময়মুগ্ধ ভক্তিকে প্রসারিত করিয়া দিয়া মানুষ একটি আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ করিয়াছিল। জলে-স্থলে, আকাশে-অন্তরীক্ষে এক মহান্ জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের আবির্ভাব সে প্রত্যক্ষ করিয়াছিল। সেই পরম সত্তার উদ্দেশে তাহার নানা অর্থতত্ত্বসৌন্দর্য্যসমন্বিত স্তুতিগীতি বিরচিত হইয়াছিল।

জানি না, আজও কে বিস্ময়ের শেষ হইয়াছে কি না। কারণ জড়শক্তিকে খাটানোই যে তাহার পরিচয়লাভ, এ কথা কেহই বলিবে না। এখনকার বিজ্ঞান যে সকল গুরুতর সমস্যা লইয়া ব্যস্ত, সাধারণ

ইংরেজ যদি তাহার কোনো খবর রাখিত, তবে সভ্যতা লইয়া আস্ফালন তাহার অনেক-পরিমাণে কমিয়া আসিত। সমস্ত বিজ্ঞান যে আদিম মৌলিকপদার্থের অন্বেষণ করিতেছে, যে এক শক্তির ভিন্নধা বিকাশ বলিয়া অন্যান্য জড়শক্তির অর্থ পরিষ্কার করিতে চাহিতেছে—জড় ও চেতনের মধ্যে কৃত্রিম ব্যবধান দূর করিয়া জীবনী শক্তিকে সর্ব্বত্র স্বীকার করিতেছে—তাহার মূলেও কি পরম বিস্ময় নিহিত! বহুশতাব্দী পূর্ব্বে যাঁহারা বলিয়াছিলেন—'যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ,' তাঁহাদের অপেক্ষা তাহা কোন অংশেই কম নহে।

অথচ আমাদের দুঃখ এই যে, আমাদের সঙ্গে এক্ষণে ইউরোপের পরম বিরোধ বাধিয়াছে, আমরা ইউরোপের ইন্দ্রজালকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিতেছি। ইহা দুঃখ কি আনন্দ, তাহা জানি না—কিন্তু আমরা আর এ কথা মানি না যে, কলকারখানার সভ্যতাই বড় সভ্যতা।

কেন? না, ভিন্ন ভিন্ন দেশ প্রাকৃতিক অবস্থার জন্য কতগুলি বিশেষ বিশেষ সুবিধা পাইলেও আমরা জানি যে, সকল সভ্যতার উচ্চ আদর্শ এক বই দুই নয়। যে জাতি গোড়া হইতেই সমুদ্রের ধারে বাড়িয়াছে, সে জগতের জ্ঞান সর্ব্বাগ্রে লাভ করিবেই, সে ব্যবসাবাণিজ্যেও ধাইবেই। তাহার অনেক জাতিগত সংস্কার দূর হইয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র যে ঐক্য ও শৃঙ্খলা কাজ করিতেছে, সেইগুলি তাহার চোখে পড়িবেই। সে বিজ্ঞানরচনায় অগ্রণী হইবে, কারণ বিজ্ঞানের method তাহার মাথায় পাইবার সুযোগ সে লাভ করিয়াছে।

কিন্তু তাই বলিয়া সেই সকল সুবিধাই একমাত্র সুবিধা নহে এবং সেইখানেই সভ্যতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয় না। পৃথিবীকে যাঁহারা বাস্তবিক জ্ঞানে ও ধর্ম্মে উন্নত করিয়াছেন, মনুষ্যের মধ্যে আহারবিহার প্রভৃতি প্রয়োজন ব্যতিরেকে আর একটা বড় ও ব্যাপক জিনিষ যাঁহারা আনিয়া দিয়াছেন—যাঁহারা বলিয়াছেন 'আত্মানং বিদ্ধি'—আপনাকে জানো, তাঁহারা কি কোনো বিশেষ দেশের লোক, না সর্ব্বদেশের ও সর্ব্বকালের লোক? যে স্বাধীনতার বোধ, প্রেমের বোধ, ধর্ম্মের বোধ, কর্ত্তব্যের বোধ—আজ সভ্যজগতের প্রত্যেক লোকের মধ্যে ন্যূনাধিকপরিমাণে আছে, তাহা কোথায় প্রথমে প্রস্ফুট হইল—তাহা কি সর্ব্বত্রই হয় নাই? সেই সকল বোধ সর্ব্বসাধারণের মধ্যে যত বেশী দেখা যায়, ততই সভ্যতা প্রাণলাভ করে—প্রাচীন ভারত, ইজিপ্ট প্রভৃতিতে মনুষ্যসাধারণে সেই বোধ স্পষ্ট হইয়াছিল বলিয়াই তাহাদের সভ্যজাতি বলা হয়—আজও যাহাদের মধ্যে সেই সকল সদ্‌গুণ বিদ্যমান, তাহারাও সভ্য।

এইজন্য দেখা উচিত যে, প্রত্যেক ব্যক্তিবিশেষের জন্য সভ্যতা কি ব্যবস্থা করিয়াছে—ব্যক্তিবিশেষ বড় হইতেছে কি না—তাহাকে উক্ত সভ্যতা সর্ব্বপ্রযত্নে মানুষ করিতেছে কি না। অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন সমাজ ভিন্ন ভিন্ন দিক্ দিয়া এই কাজটি করে—কেহ গভর্ণমেণ্টে প্রজাসাধারণের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত করিয়া তাহাকে মানুষ করে, অর্থাৎ তাহাকে পোলিটিক্যাল্ জীব তৈরি করে, কেহ সামাজিক কর্ত্তব্যসমূহ তাহার উপর ন্যস্ত করে, অর্থাৎ সামাজিক জীব প্রস্তুত করে।

কিন্তু যাহাই করুক, সেই সকল কর্ত্তব্যের ভিত্তি চিরন্তন মানবনীতির উপর হওয়া যে উচিত, এ কথা কেহই অস্বীকার করিবে না। আমি যাহা করিব, অর্থাৎ আমার দ্বারা ষ্টেট্ বা সমাজ যে কাজ করাইয়া লইবে, তাহা প্রত্যেক মানুষ যে-কোন অবস্থায় যে-কোন কালে করিতে পারে, এই ধারণায় কাজ যদি না করি, যদি সাময়িক কোন সুবিধা বা অসুবিধা দেখিয়া করি—যদি দেশীয় বা দলীয় স্বার্থপরবশ হইয়া কার্য্য করি, তবেই সেই কার্য্য করা অন্যায় হইবে। অথচ এইরূপ সর্ব্বজনীন নীতির আদর্শ মাথায় রাখিয়া আজকাল যে সভ্যতা কিরূপ কার্য্য করিতেছে, তাহার দৃষ্টান্ত ঘরে-বাহিরে এত বেশী যে, না বলিলেও চলিবে। অধুনা চিরন্তন বিশ্বনীতি—দুর্ব্বলের উপর সবলের অত্যাচার, পরাধীন জাতিকে শোষণ করা ও তাহাকে সর্ব্বপ্রকার ন্যায্য ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত করা, বিদেশজয়ের জন্য স্বায়ত্ত-শাসনে প্রতিষ্ঠিত বোয়ার্‌কলনি ধ্বংস করা ও তাহাদের স্বাধীনতা হরণ করা, জোর করিয়া এক নিরীহ প্রাচ্যজাতিকে আফিম গেলান। এইরূপ শত শত দৃষ্টান্তের বিরাম নাই।

ইহার কারণ আর কিছুই নহে—ইহার কারণ, সাধারণ ইংরেজের সভ্যতাসম্বন্ধে অজ্ঞতা। সে মনে করে, কলকারখানা, রেলগাড়ি, গুলিগোলা, ইলেক্‌ট্রিক্-আলোই সভ্যতা। এগুলি আমাদের উপকরণমাত্র, আসলে যাহা মনুষ্যমনকে চিরদিন খাদ্য জোগাইবে, চিরদিন তৃপ্ত করিবে, চিরদিন আনন্দ দিবে, সে জিনিষ এ সকলের মধ্যে নাই। তাহা খুঁজিতে গেলে ইউরোপের কোণে-কাণায় যে সকল কবি ও ভাবুক আজও বর্ত্তমান, যে সকল বৈজ্ঞানিক বাস্তবিকই সত্যের আলোর অপেক্ষায় বসিয়া আছেন, তাঁহাদের কাছে যাইতে হইবে এবং সত্য বলিতে কি, বর্ত্তমান ইউরোপ তাঁহাদের খোঁজও আনে না। কখনও কি আনিয়াছিল?

আমরা যে জড়শক্তির পিছনে অন্ধভাবে যাই নয়, তাহার কারণ, আমাদের মধ্যে যেজন্যই হউক, একটা বৃহৎ মঙ্গল ও ধর্ম্মের ভাব গোড়া হইতেই আছে। অধর্ম্ম আমাদের গায়ে বাজে। ইউরোপীয় ডিমোক্রাসি যেভাবে যুদ্ধ করে, আমাদের প্রজাসাধারণ কখনই সেভাবে যুদ্ধ করিতে পারিত না। বোয়ার কি চীনযুদ্ধের ন্যায় নৃশংসব্যাপার আমাদের শিক্ষার সঙ্গে, আমাদের চিরন্তন বিশ্বাসের সঙ্গে একেবারে খাপ্ খায় না। ইহার কারণ কুসংস্কারই বল, আর আচারই বল—আমাদের মধ্যে একটা বিশ্বনীতির আদর্শ আছেই—যেখানে সে নীতি উল্লঙ্ঘিত হইতে চায়, সেখানে আর আমরা সায় দিতে পারি না।

ইউরোপ এথিক্‌স্ লেখে, আমরা পড়ি। তাহার ভাবুকদের মধ্যে নীতি কতরকম চেহারা লইতেছে, কত বিসদৃশকেও সদৃশ করিতেছে—কিন্তু ইউরোপীয়ের মধ্যে একটা বরাবরের এথিক্‌স্ নাই, নূতন নূতন চিন্তা তাই কেবলি তাহাকে বিভ্রান্ত করিতেছে—তাই সে তাহার কোন খবরও রাখিতেছে না। বহুযুগের সে আপূর্য্যমাণ নীতিধারা তাহার হৃদয়ের পাশ দিয়া বহিতেছে না।

আমাদের মধ্যে যাঁহারা ইউরোপে যুদ্ধ,

তাঁহারা ইউরোপীয় কবিগণ, ভক্তগণ ও তত্ত্বজিজ্ঞাসুগণে মুগ্ধ, ইউরোপীয়মাত্রেই মুগ্ধ নহেন। অথচ সর্ব্বপ্রকার উদারতা হইতে বঞ্চিত এই সংকীর্ণ বর্ব্বর আপামরসাধারণই আমাদের রাজা, হর্ত্তাকর্ত্তা ও বিধাতা। সেই বর্ব্বরতার বোঝাই আমরা প্রত্যহ সহিতেছি—টেনিসন্, ব্রাউনিং, ডারবিন্, ক্যারাডের বর্ব্বরতা সহ্য করিতেছি না।

'ডিমোক্রাসি'সম্বন্ধে আজকাল কোনো কথা বলিবার উপায় নাই—কারণ ডিমোক্রাসি ফ্রেঞ্চরেভোল্যুশন্ হইতে সমুদ্ভূত। অতএব তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শাসনতন্ত্র বলিয়া ইউরোপের বিশ্বাস। কিন্তু আমরা প্রাচ্যজাতিরা জানি যে, প্রজাসাধারণের হিতবুদ্ধির চেয়ে দেশের যাঁহারা শ্রেষ্ঠ, তাঁহাদের হিতবুদ্ধি বড়—তাঁহারাই দেশের কার্য্য চালনা করিবেন—প্রজার মঙ্গলের দিকে চাহিবেন—তাঁহারা ও দেশের রাজা মিলিয়া দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিবেন। আজকাল অনেক ইউরোপীয়ও এ কথা বলেন। বহুদিন পূর্ব্বে কাগজে জন্মর্লিও Democracy and reaction নামক একটি প্রবন্ধে এই কথারই ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। জগতে সকলেই সমান অধিকার পাইতে পারে না, এ কথা অনুদার শোনাইলেও অত্যন্ত সত্য—কুলার্ রাজা হইতে পারেন না এবং ইমারসন্ও ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুপযুক্ত। রাজ্য-শাসন কেবল সেই লোকের দ্বারাই সম্ভব, যে তাহার উপযুক্ত দায়িত্ব বুঝিয়া গম্ভীরভাবে, অপ্রমত্তভাবে তাহা গ্রহণ করিতে পারিবে।

এইজন্য যেখানে এই অনেকের দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়া একের কাছে আত্মসমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া যায়, সেখানে প্রজার মধ্যেও একটা কর্ত্তব্যবুদ্ধি জাগিয়া উঠে, কারণ সে কর্ত্তব্যবুদ্ধি একটা বৃহৎ আদর্শ সম্মুখে দেখিতে পায়। যেখানে আমিই আমার আদর্শ, সেখানে আমার অন্যায়ও আমার নিকটে ন্যায় হইয়া দাঁড়ায় এবং আমি অন্যায়চর্চ্চাতেও সুখ পাইতে পারি। পৃথিবীতে এক শ্রেণীর লোক অন্যায়কে ঘৃণার সহিত ত্যাগ করেন ও করিয়াছেন বলিয়াই আমিও ধর্ম্মবুদ্ধি লাভ করি। তাঁহাদের আদর্শ আমারও অন্তর্নিহিত আদর্শকে প্রবুদ্ধ করে।

এই উপায়েই সাধারণকে সভ্য করিতে হয়, দেশের শ্রেষ্ঠলোকের সাধনায় তাহারা সভ্য হইয়া থাকে।

ইংলণ্ডের যাঁহারা শ্রেষ্ঠলোক, তাঁহারা কোন্ রাজকর্ম্মে নিযুক্ত থাকেন বা থাকিতে পারেন? আমরা জানি, তাহার লিবারেল্ দলের মধ্যেও কোন একটা মতের স্থিরতা নাই। কেহ কেহ আপনাদিগকে ইম্পীরিয়্যাল্ লিবারেল্ বলিয়া চালাইবারও চেষ্টা করে।

ফল কথা এই যে, এই উদার বিশ্বনীতির অভাবই সভ্যতার অভাব। কূট রাজনীতি অথবা কলকারখানা-ব্যবসাবাণিজ্যে সভ্যতা বড় হয় না—মনুষ্যত্বের বড় আদর্শ, উচ্চনীতির আদর্শ না থাকিলে সভ্যতা একপ্রকার প্রাণহীন নির্জীব পদার্থ—তাহার শক্তি জড়ের শক্তির মত ভীষণ—কিন্তু সেই শক্তিকেই বুদ্ধিবলে বাগে আনা কিছুমাত্র শক্ত নহে।

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

রাইবনীদুর্গ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

রাজঘাটের অদূরে বনকুঞ্জ নামে ক্ষুদ্র গ্রাম। রাণী কৃষ্ণপ্রিয়ার পিত্রালয় সেইখানে। তাঁহার বৃদ্ধা মাতা কয়ঘর-জ্ঞাতি-পরিবেষ্টিত হইয়া সেখানে বাস করিতেন এবং বর্ষশেষে বাসন্তী পূজা ও রামনবমীর দোল উপলক্ষে কন্যাকে মাসখানেকের জন্য নিকটে লইয়া যাইতেন।

বাল্যকালে পদ্মাঙ্কনারায়ণ মার সঙ্গে মাতুলালয়ে যখন যাইত, সে বড় আনন্দের দিন। রাইবনীর দুর্গমধ্যে খেলার সঙ্গী কেহ ছিল না। তাহার চিত্তবিনোদন এবং বুদ্ধি ও হৃদয়বৃত্তির উন্মেষ জন্য দাসমহাশয় ব্যবস্থার কোন ত্রুটি করিতেন না। কিন্তু শুধু কবুতরের পাল, খরগসের ছানা, হরিণ-শিশু অথবা ময়ূর বা বানরের সাহচর্য্যে মানুষ সম্পূর্ণ তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না, তা সে পূর্ণ-বয়স্কই হউক আর শিশুই হউক। কিন্তু বনকুঞ্জে মামার বাড়ীতে তাঁহাদের নিকট-এবং-দূর জ্ঞাতিদের ভিতর ছোট-বড় বালক-বালিকার সংখ্যা নিতান্ত কম নহে। তা ছাড়া, প্রতিবেশীদের ছেলেপুলেরাও রাজপুত্রের আগমনে উৎফুল্ল হইয়া উঠিত। কাজেই বৎসরান্তে একবার বনকুঞ্জে আসিয়া মাতাপুত্রে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিতেন।

বড়র সঙ্গে ছোটর তুলনা যতই অমার্জ্জনীয় হউক, সংসারের নিয়ম তাহাই। লোকে সুদীর্ঘ জলাশয়ের নামে সাগরের মহিমা সংযুক্ত করে, বিরলবিটপী দূরবিস্তৃত প্রান্তরভূমির সঙ্গে শাহারার উপমা দেয়—ইহাই নিয়ম। অতএব আমরা যদি একটু কাব্যের ভাষা ধার করিয়া বলিয়া বসি—সেই রাইবনীদুর্গ মথুরা, আর এই বনকুঞ্জ বৃন্দাবন, তুলনাটা এমনি কি দুঃসাহসিক হয়!

বাস্তবিক সুখদুঃখের স্মৃতি লইয়াই ব্যক্তিগত জীবন। যেখানে সুখস্মৃতি নাই, সেখানে কৌমুদীপ্রফুল্ল নিশীথিনী, মলয়হিল্লোল ও পুষ্পবীথিকা এবং কোকিলপাপিয়ার যুগপৎ সমাবেশ দেখিয়া বংশীবাদনের চেষ্টা করিলেও কি "বনমাঝে কি মনোমাঝে" মধুর সে বাঁশী বাজে না! রাইবনীদুর্গ তাহার প্রাচীন দুর্জ্জয় প্রাকার ও পৌরাণিকী জয়পরাজয়ের কাহিনী লইয়া মাতাপুত্রের মনে কেবল আতঙ্কমিশ্রিত বিস্ময়ের ভাবই চিরদিন জাগরূক রাখিত। রাণী কৃষ্ণপ্রিয়ার কথা এখন না-ই বলিলাম, কিন্তু কুমার পদ্মাঙ্কনারায়ণ আপনার বাস-ভূমিকে কালাপাহাড়ের বিজয়ক্ষেত্র বলিয়া কখন তেমন প্রীতির চক্ষে দেখিতেন না।

শুধু খেলাধূলার আকর্ষণ নহে, বনকুঞ্জের প্রাকৃতিক দৃশ্য সত্যসত্যই বড় সুন্দর। সুবর্ণ-রেখা নদী একটু দূরে সরিয়া গেলেও তাহার প্রাচীন খাতে স্নিগ্ধনির্ম্মল গভীর সলিলরাশি বারমাস পরিপূর্ণ থাকিত। বিবিধ জলজপুষ্প বিভিন্ন ঋতুতে তাহাতে দেখিতে দেখিতে ফুটিয়া

উঠিত,—দিগ্‌দিগন্ত হইতে জলচর পক্ষীরা আসিয়া আহোরাত্র বিচরণ করিত। পল্লীর প্রায় সর্ব্বত্র সুঠাম ফলপুষ্পের বৃক্ষরাজি। আর দক্ষিণে নীলাচলের আকাশস্পর্শী অস্পষ্ট বিরাট্ ছায়া প্রভাতে ও সন্ধ্যায় সঞ্জীবিত হইয়া উঠিত। বালক পদাঙ্কনারায়ণ দেখিতে দেখিতে বিস্মিত-বিমুগ্ধ হইত।

নবম পরিচ্ছেদ।

কৈশোরে পদাঙ্কনারায়ণ মাতৃসঙ্গে বনকুঞ্জে গিয়া বেশীদিন থাকিতে পাইত না। দুই-দিনের জায়গায় তিনদিন হইলে স্বয়ং দাস-মহাশয় সেখানে ছুটিয়া যাইতেন। তাঁহার সতত আশঙ্কা, কোনরূপ কুসংসর্গে পড়িয়া পাছে কুমার তাঁহার আদর্শ হইতে স্খলিত হইয়া পড়ে।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পদাঙ্কনারায়ণ মৃগয়ায় কিছু আসক্ত হইয়া উঠিতেছিল, বাল্যের মত মাতুলালয়ে গিয়া শুধু গ্রাম্য খেলাধূলায় তাহার আর তৃপ্তি হইত না। তাহার লক্ষ্য স্থির হইলে প্রথমবৎসর বনকুঞ্জে আসিয়া জলচরপক্ষীদের প্রতি দুইএকদিন শরসন্ধান করিবার লোভ সে সংবরণ করিতে পারে নাই, দুইচারিটা বন্দুকের আওয়াজও গ্রামে শোনা গিয়াছিল। ইহাতে পদ মাতামহীর কাছে মৃদু ভর্ৎসিত হইয়াছিল। "ছি ভাই, ঐ নিরীহ পাখীগুলি চিরদিন এই গ্রামের আশ্রয়ে আছে, কখন তারা আমাদের কোন অনিষ্ট করে না। বরং পদ্মের বনে যখন খেলিয়া বেড়ায়, দেখিতে কেমন সুন্দর। তুমি আর কখন এমন অন্যায় কাজ করিও না। তোমার মা ছেলেবেলায় উহাদের কত ভালবাসিত, দীঘির পাড়ে যখন-তখন গিয়া উহাদের খেলা দেখিত, আর খাইতে দিত। তোমায় এমন পাথ্‌মারা বিদ্যা কে শিখাইতেছে ভাই!" বৃদ্ধা আদরের নাতিকে এইরূপ নরম-গরম অনুযোগ করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। কন্যাকে বলিলেন, "মা, রাজার ছেলে শিকার করে, তা জানি, কিন্তু পাহাড়ে-জঙ্গলে হিংস্রকপশুর অভাব নাই। দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন, যেমন মানুষের মধ্যে, তেম্‌নি জীবজন্তুরও মধ্যে। আমার দিব্য, ছেলেকে তুই কখন নিরীহ পশু-পাখীদের বধ করিতে দিস্ না।" ইহার পর বনকুঞ্জে আসিয়া কুমার শিকার খেলিতে ইচ্ছুক হইলে তাহাকে ময়ূরভঞ্জরাজ্যের অন্তর্গত নিকটবর্ত্তী নিবিড় জঙ্গলে প্রবেশ করিতে হইত।

শিবাপ্রসন্নদাস কুমারের মৃগয়াসক্তি লক্ষ্য করিয়াও কিছু বলিতেন না। তিনি স্বয়ং তাহাতে নিঃস্পৃহ হইলেও বুঝিতেন, রাজপুত্রের পক্ষে শৌর্য্যবীর্য্যের অনুশীলন অবশ্যকর্ত্তব্য এবং সেজন্য জীবহত্যা অবশ্যম্ভাবী। পরম বৈষ্ণবী মাতামহীঠাকুরাণী দাসমহাশয়কেও ছাড়িয়া কথা কহিবার পাত্রী ছিলেন না। কন্যাকে যাহা বলিয়াছিলেন, শিবাপ্রসন্ন বাসন্তী পূজার নিমন্ত্রণরক্ষা করিতে আসিলে তাঁহা-কেও অল্পবিস্তর সেই কথাই শুনাইয়া দিলেন। অতএব দাসমহাশয় অতঃপর দুইএকজন শিকারী কুমারের মাতুলালয়ে অবস্থানসময়ে বরাবর তাহার সঙ্গে পাঠাইতেন।

কিন্তু বৃদ্ধা ঠাকুরাণীর এমনই শাসন যে, পদাঙ্কনারায়ণ অথবা তাহার অনুচরেরা বন-কুঞ্জ হইতে বহুদূরে গিয়াও মৃগয়ার সময় তাঁহার আদেশলঙ্ঘন করিতে সাহস করিত না। ইহার ফলে হরিণ, শশক প্রভৃতি জন্তুর

শিকারেও কুমারের আর উৎসাহ রহিল না। ক্রমে শ্বাপদজীবের অনুসরণে দুর্ভেদ্য-শৈল-সঙ্কুল বনমধ্যে বিচরণ তাহার অভ্যস্ত হইয়া উঠিল।

ভাস্করপণ্ডিত প্রথমবার যখন এদেশে আসিয়াছিলেন, সঙ্গোপনে ঝারিখণ্ডের নিভৃত-পথে মুসলমানশক্তি পর্য্যবেক্ষণ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। বামনঘাটির বিশাল কানন-প্রান্তে মৃগয়ার্থী পদাঙ্কনারায়ণের সহিত তাঁহার প্রথম পরিচয়। প্রথম সাক্ষাতেই তিনি তাহাকে স্নেহের চক্ষে দেখিয়াছিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

শিবাপ্রসন্নদাসের যেখানে যত গৃহ ছিল, সর্ব্বত্র এবং সকল সময়ে তাহাদের দ্বার অতিথিসেবার জন্য উন্মুক্ত থাকিত। উমাপুরের বিশেষত্ব এই যে, তথায় তাঁহার সহধর্ম্মিণী স্বয়ং সদাব্রত-পালনের ভার লইয়া সন্তাননির্ব্বিশেষে সকল শ্রেণীর অতিথির পরিচর্য্যা করিতেন। তিনি স্বামীর যোগ্যা গৃহিণী ছিলেন। বিধাতা তাঁহাকে সন্তান দেন নাই, কিন্তু অপরিমিত, অবিচলিত মাতৃভাবে ভূষিত করিয়াছিলেন। অনাথ শিশুসন্তানদের কুড়াইয়া-আনিয়া মানুষ করা এই দম্পতির এক রোগ ছিল। নীলাচলের পথে প্রতিবৎসর অসংখ্য যাত্রীর সমাগমকালে দুঃস্থ এবং রুগ্ণ স্ত্রীপুরুষের ভার দাসমহাশয়ের নিযোজিত লোকজনেরা গ্রহণ করিবে, ইহা একেবারে ধরা কথা। তাহাদের ছোট ছোট ছেলেপুলেরা সুতরাং সাধারণত তাঁহার ঘাড়ে পড়িত।

সৌদামিনী দেবী সেকালের প্রথামত শৈশবে শিবাপ্রসন্নর সহিত পরিণীতা হইয়াছিলেন। দুজনের বয়সের তারতম্য অতি সামান্য। অতএব জীবনপ্রভাতে সহকার ও মাধবীর মিলনের মত অনুদিন তাঁহারা অচ্ছেদ্য প্রেমবন্ধনে বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। ইহার পর সৌদামিনীর সন্তান হওয়ার বয়স যখন উত্তীর্ণ হইয়া গেল, তখন দাসমহাশয়ের আত্মীয়-অন্তরঙ্গেরাও তাঁহাকে দারপরিগ্রহের জন্য অনুরোধ করিতে পারেন নাই।

দাসগৃহিণী রাইবনী-অঞ্চলের "মাঠাকুরাণী" ছিলেন। দাঁতন হইতে রাজঘাট পর্য্যন্ত যত গ্রাম, প্রত্যহ তাহার চারিদিকের গরিব-দুঃখীরা আহার ও ঔষধের জন্য তাঁহারি কাছে ছুটিয়া আসিত। গাছগাছড়ার টোট্‌কা ঔষধ তিনি যে কত জানিতেন, তাহার সংখ্যা হয় না। এবং বিজ্ঞ চিকিৎসকের মত রোগের বিবরণ শুনিয়া নিপুণতার সহিত যথাযথ ব্যবস্থা করার সামর্থ্য তাঁহার ছিল। এখানে বলা আবশ্যক, সেকালের গৃহিণীরা সকলেই ন্যূনাধিকপরিমাণে গার্হস্থচিকিৎসায় অভিজ্ঞতা লাভ করিতেন।

"মাঠাকুরাণী" কাজেই বয়সে তেমন প্রবীণা না হইলেও একটু একটু প্রগল্‌ভা ছিলেন। স্বামীর আশ্রিত এবং প্রতিপালিত প্রায় সকল পুরুষের সহিত তাঁহাকে কথা কহিতে হইত—নিতান্ত অবগুণ্ঠিতা, "ঘর হইতে আঙিনা-বাহির" আদর্শে গঠিতা হইলে তাঁহার চলারও উপায় ছিল না। ইহার ফলে দাসগৃহিণী প্রচুর মাতৃভাব ও দয়ামায়ার সঙ্গে দৃঢ়চিত্ততা এবং গাম্ভীর্য্যের সমবায় করিতে পারিয়াছিলেন।

অপেক্ষাকৃত সোজাপথে পদাঙ্কনারায়ণ মহারাষ্ট্রসেনার পূর্ব্বে উমাপুরে পৌঁছিল। অন্দরে প্রবেশ করিতে না করিতে ঠাকুরাণী-

দিদি হাসিয়া তাহার দুইটি কান মলিয়া দিলেন এবং স্নেহে মস্তক আঘ্রাণ করিলেন।

কুমার প্রণাম করিতে করিতে বলিল,—"ঠান্‌দিদি, এখন রক্ষা রাখ। পাঁচশ অতিথি উপস্থিত, তারা আবার দণ্ডদুই থাকিয়াই চলিয়া যাবে। ঠাকুরদাদা তাদের কিছু-কিছু জলযোগ না করাইয়া কিছু ছাড়িবেন না। এত শীঘ্র কি করে' তা হয়! ঠাকুরদাদার যেমন কাণ্ড, আরো গোটাকতক ঠান্‌দিদি করা উচিত ছিল!"

সৌদামিনী উচ্চহাস্য করিয়া আবার নাতির কর্ণযুগল লইয়া পড়িলেন। বলিলেন, "এইবার নাত্‌বউরা আস্‌বে! তা তোর এত ভাবনা কি ভাই? চৈত্রসংক্রান্তিতে কবে তোর ঠাকুরদাদা পাঁচশ অতিথির কম লইয়া বাড়ী ফেরেন? আমি তার জন্য আগেভাগেই উদ্যোগ করেছি। দেখ্‌বি আয়!"

কুমার আয়োজন দেখিয়া বিস্মিত হইল। বলিল, "দিদিমা বলেন, তোর ঠান্‌দিদি সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা, সে কথা সত্য।" এই প্রশংসার উত্তরে ঠান্‌দিদির হস্তযুগল আবার নাতির উভয় কর্ণপ্রান্তে ধাবিত হইতেছিল, কিন্তু এবার পদ কিসের শব্দ শুনিয়া ছুটিয়া বাহিরে গেল।

ক্রমশ।

দুর্ভিক্ষপীড়িত ভারতে।

১০

রাজাদিগের চাঁদ্‌নী-দরবারের ছাদ।

যে ভগ্নাবশেষরাশি আমার পদপ্রান্ত পর্য্যন্ত ক্রমশ নামিয়া আসিয়াছে, তাহার উপর সান্ধ্য-গগনবিলম্বিত পাংশুবর্ণ পূর্ণচন্দ্র স্বকীয় ম্লান-জ্যোতি এখনো বিস্তার করিতে আরম্ভ করে নাই। একঘণ্টাকাল হইল, যদিও সূর্য্যদেব চতুর্দ্দিকস্থ শৈলমালার পশ্চাতে অস্তমিত হইয়াছেন, তথাপি এখনো তাঁহার পীতাভ আলোকে দিগন্ত আলোকিত। আমি আজ একাকী, বিভবমহিমান্বিত ও বন্যভীষণ কোন-এক স্থানে,—একটা পুরাতন রাজপ্রাসাদের ছাদের উপর অবস্থিত হইয়া, রাত্রির প্রতীক্ষা করিতেছি। ইহা যেন একটা গরুড়পক্ষীর প্রকাণ্ড নীড়; পূর্ব্বে ধনরত্নে পূর্ণ ছিল; শত্রুর ভীতিজনক ও দুরধিগম্য ছিল। কিন্তু আজ ইহা শূন্য; একটা পরিত্যক্ত বৃহৎ নগরের মধ্যে অবস্থিত; কতকগুলি ভৃত্য ইহার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত।

আমি আকাশের খুব উচ্চদেশে উঠিয়াছি। সুচারুরূপে খোদিত যে সব প্রস্তরফলক ছাদের গরাদে-বেষ্টনের কাজ করিতেছে, সেই সব প্রস্তরের উপর হইতে ঝুঁকিয়া দাঁড়াইলে দেখিতে পাওয়া যায়—নীচে

সুগভীর খাত মুখব্যাদান করিয়া আছে; সেই খাতের তলদেশে,—গৃহ, মন্দির, মস্‌জিদ্‌ প্রভৃতির ভগ্নাবশেষ।

যদিও আমি খুব উচ্চে উঠিয়াছি,—তথাপি আমার চতুর্দ্দিকে আরো কত উচ্চতর ভূমি রহিয়াছে। যে শৈলভূমির উপর এই প্রাসাদটি অধিষ্ঠিত, উহা চক্রাকারে-পরিবেষ্টিত আর একটা উচ্চতর পর্ব্বতমালার কেন্দ্রস্থল। আমার চতুর্দ্দিকে, সরু-সরু তীক্ষ্ণাগ্র লাল-পাথরের বড় বড় শৈলচূড়া;—সমস্তই প্রাকারে বেষ্টিত। এই প্রাকারাবলী—উচ্চতম চূড়া-প্রান্ত পর্য্যন্ত বরাবর সমান চলিয়া গিয়াছে; এবং এই দন্তর বপ্রের করাতী-দন্ত, পীতাভ আকাশের গায়ে, অতীব নির্দ্দয়ভাবে অঙ্কিত রহিয়াছে। এই অন্তরীক্ষের প্রাচীরটি প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ডের দ্বারা গঠিত এবং এরূপ সঙ্কটস্থানের উপর স্থাপিত যে, উহা দুরধিগম্য বলিলেও হয়;—একটা চক্রের পরিধিরূপে কয়েকক্রোশ ঘিরিয়া রহিয়াছে। ইহা অতীত-যুগের এমন একটি কীর্ত্তি—যাহার ঔদ্ধত্য ও প্রকাণ্ডতায় একেবারে বিস্ময়বিহ্বল হইয়া পড়িতে হয়। এই সব প্রাকারাদি এত উচ্চে উঠিয়াছে—এমন বেপরোয়াভাবে খাড়া হইয়া রহিয়াছে যে, দেখিলে মাথা ঘুরিয়া যায়। বহু পুরাকালে, এই নগরের জন্য,—নিম্নস্থ এই রাজপ্রাসাদের জন্য,—একটি অপূর্ব্ব প্রাচীর নির্ম্মাণ করা আবশ্যক বিবেচিত হইয়াছিল; তাই, এই চতুর্দ্দিক্‌স্থ শৈলমালাকে দুর্ভেদ্য গিরি-দুর্গে পরিণত করা হয়। এই প্রাকারপরিধির মধ্যে প্রবেশ করিবার একটিমাত্র ফুকর আছে; ইহা একটা বৃহৎ প্রাকৃতিক "ফাটলের" মত উহার মধ্য দিয়া সুদূরপ্রসারিত একটা মরু-ভূমি অস্ফুটভাবে পরিলক্ষিত হয়।

এইখানে আসিবার জন্য, আমি দিবাবসানে জয়পুর হইতে ছাড়িয়াছি। যে সকল ভগ্না-বশেষ আমার চারিদিকে ঘিরিয়া আছে,—ইহাই পুরাতন রাজধানী অম্বর। দুই শতাব্দী হইল, ইহার স্থান জয়পুর অধিকার করি-য়াছে।*

কতকগুলি পথপ্রদর্শক সঙ্গে লইয়া—এবং "সুন্দর গোলাপীনগরের" রাজা আমার ব্যব-হারের জন্য যে ঘোড়া দিয়াছেন, সেই সব ঘোড়া লইয়া আমি যাত্রা করিয়াছি। এই অম্বর-প্রাসাদে যে সব ছাদের উপর আমি এইমাত্র উঠিয়াছি—এই সব ছাদে বর্ত্তমান রাজার পূর্ব্বপুরুষেরা পূর্ব্বে বাস করিতেন। আমি জয়পুরের রমণীয় পরীদৃশ্য ও দান্তে-বর্ণিত ভীষণ নরকদৃশ্য,—এই উভয়ই এড়াইবার জন্য তাড়াতাড়ি জয়পুর হইতে বাহির হইয়া এই পল্লিপ্রদেশে আসিয়াছি। আর-কিছু না হোক্‌—অন্তত, এখানে সমস্তই শেষ হইয়া গিয়াছে,—এখন শুধু মৃত্যুর নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছে।

কিন্তু আমি জানিতাম—দুর্গপ্রাকারের দ্বারদেশ পার হইবামাত্র, আমাকে আরো একটা ঘোরতর ভীষণ পথ অতিক্রম করিতে হইবে। যুদ্ধের অনেকদিন পরে, যুদ্ধক্ষেত্রের মত একটা-কোন দৃশ্য হয় ত আমাকে দেখিতে হইবে;—হয় ত দেখিতে হইবে, সূর্য্যাতপশুষ্ক রাশি রাশি মৃতশরীর বহুদিন হইতে ইতস্তত পড়িয়া রহিয়াছে; হয় ত দেখিব, কতকগুলা শবশরীর নিশ্বাস ফেলিতেছে,—নড়িতেছে—

* ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে জয়পুর স্থাপিত হয়

কখন-কখন উঠিয়া দাঁড়াইতেছে,—আমার অনুসরণ করিতেছে এবং কষ্টের আকস্মিক আবেগে প্রার্থনাচ্ছলে আমার হস্ত জাপ্‌টাইয়া ধরিতেছে।

আমি যা ভাবিয়াছিলাম, তাই। আজ দেখিলাম, এই শ্মশানভূমে অনেকগুলি বৃদ্ধা পড়িয়া রহিয়াছে—যেন কতকগুলো অস্থি ও ন্যাকড়ার বস্তা। ইহারা মাতামহী কিংবা পিতামহী—যাহাদের বংশধরেরা নিশ্চয়ই মরিয়াছে; এবং এইবার নিজেদের মরিবার পালা, এইরূপ মনে করিয়া ইহারাও অদৃষ্টের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়া মৃত্যুর প্রতীক্ষায় শান্তভাবে শুইয়া আছে। ইহারা কিছুই চাহে না; একটুও নড়ে-চড়ে না; কেবল ইহাদের বড় বড় উন্মীলিত নেত্রে দারুণ বিষাদ-নৈরাশ্য পরিব্যক্ত হইতেছে। উপরে, মরা-গাছের ডালে বসিয়া কাকেরা ইহাদিগকে নজরে-নজরে রাখিতেছে;—আসল সময়ের প্রতীক্ষা করিতেছে।

আজ কিন্তু অন্যদিন অপেক্ষাও অধিক-সংখ্যক শিশু দেখিলাম। আহা! এই ক্ষুদ্র শিশু-গুলি,—কেন তাহারা এত কষ্ট পাইতেছে, কেন সকলে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছে, এইরূপ ভাবিয়াই যেন বিস্মিত; এবং বিচার-প্রার্থনার ভাবে আমার দিকে যেন দীনভাবে চাহিয়া আছে!...এই ছোট ছোট দুর্ব্বল মাথাগুলির ভার—তাহাদের শীর্ণ কঙ্কালশরীর যেন আর বহন করিতে পারিতেছে না; একএকবার আস্তে আস্তে মাথা তুলিতেছে, আবার বিশ্রস্তভাবে চক্ষু নিমীলিত করিয়া আমার হাতের উপর ঢলিয়া পড়িতেছে,—যেন আমার আশ্রয়ে নিশ্চিন্তমনে একটু ঘুমাইতে চাহে। কখন-কখন দেখা যায়, সাহায্যের কাল উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু অনেক-সময়ে ইহাও দেখিতে পাই,—হাতে পয়সা দিবামাত্র উহারা উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে এবং কিছু খাদ্যসামগ্রী কিনিবার জন্য কষ্টেস্রষ্টে চাউলের দোকানে যাইতেছে।

আশ্চর্য্য! কি সামান্য ব্যয়েই এই শিশু-গুলির প্রাণরক্ষা করা যায়! *

এই গোলাপীরঙের সিংহদ্বারগুলি পার হইবার পরেই, সম্মুখে তিনক্রোশব্যাপী রাশিরাশি ভগ্নাবশেষ; তাহার পরেই পল্লিপ্রদেশের প্রকৃত মরুভূমি; মরা-গাছের বাগান-বাগিচার মধ্যে কত গম্বুজ, কত মন্দির, স্বচ্ছপ্রস্তরে নির্ম্মিত কত চতুষ্কমণ্ডপ একটার পর একটা চলিয়াছে, তাহার আর অন্ত নাই। বানর, কাক ও শকুনি ছাড়া এখানে আর কেহই বাস করে না। এদেশের প্রত্যেক নগরের আশপাশে এই সকল জীবের নিত্য গতিবিধি। এই সমস্ত শ্মশান-ভূমি, পূর্ব্ববর্ত্তী সভ্যতার ধ্বংসাবশেষে সমাচ্ছন্ন।

বলা বাহুল্য, কর্ষিত ক্ষেত্রের চিহ্নমাত্রও আর লক্ষিত হয় না। জনপ্রাণী নাই; কেবল মাছিতে গ্রামপল্লি ভরিয়া গিয়াছে।

তাহার পর যখন গিরিমালার পাদদেশে—সেই লাল-পাথরের রাজ্যে আসিয়া পৌঁছিলাম, মনে হইল, যেন সর্ব্বত্রই জ্বলন্ত অঙ্গার। এমন কি, ছায়াময় স্থানেও, ধূলা-ভরা এমন এক একটা শুষ্ক দম্‌কা-বাতাস আসিতেছে যে, তাহাতে যেন মুখ একেবারে ঝল্‌সিয়া যায়।

* একজন ভারতবাসীর মিতভোজনের দৈনিক ব্যয় প্রায় দুই-আনা মাত্র।

উদ্ভিজ্জের মধ্যে বড়-বড় cactus ছাড়া আর কিছুই নাই—সেই মরা-গাছগুলা শুধু খাড়া হইয়া রহিয়াছে;—সমস্ত শৈলখণ্ড উহাদের কণ্টকময় বৃন্তে কণ্টকিত।

আমার দুইজন পথপ্রদর্শক পৃষ্ঠে ঢাল ও হস্তে বল্লম লইয়া অশ্বপৃষ্ঠে চলিয়াছে। বাহাদুর ও আক্‌বরের আমলে, সৈনিকদের এইরূপ সাজ ছিল।

অপরাহ্ণ পাঁচঘটিকার সময় সূর্য্যের প্রখরকিরণে আমাদের চক্ষু যেন ঝল্‌সিয়া গেল। অম্বরের রুদ্ধ-উপত্যকার গায়ে, যেখানে একটা সরু ফাঁক আছে, সেই ফাঁকটি অবশেষে আমাদের নেত্রগোচর হইল। একটা ভীষণ দ্বার, এই একমাত্র প্রবেশপথটিকে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। তাহার পরেই হঠাৎ সেই প্রাচীন রাজধানীটি আমাদের নেত্রসমক্ষে উদ্ঘাটিত হইল। সান-বাঁধানো ঢালু সোপান দিয়া আমাদের ঘোড়ারা পিছ্‌লাইয়া-পিছ্‌লাইয়া চলিতে লাগিল;—এইরূপে আমরা রাজাদিগের পুরাতন প্রাসাদে আরোহণ করিলাম। বেলে-পাথর ও মার্ব্বেলে গঠিত এই প্রাসাদটি শৈলরাশির উপর রাজসিংহাসনের মত সদর্পে বিরাজ করিতেছে; এবং সেখানে অধিষ্ঠিত হইয়া চতুর্দ্দিকস্থ ধ্বংসাবশেষগুলি অবলোকন করিতেছে।

প্রবেশ করিয়া,—উপরে উঠিতে উঠিতে, যে-ই একটা মোড় ফিরিলাম, অমনি কৃষ্ণবর্ণ অশুভদর্শন একটা মন্দির দৃষ্টিপথে পতিত হইল;—যাহার ভূমি শোণিতধারায় কলঙ্কিত, এবং যেখান হইতে মৃতপশুর পূতিগন্ধ সর্ব্বদা নিঃসৃত হইতেছে। ইহা পুরাতন পশুবলির স্থান। মন্দিরের গর্ভদেশে, একটা কুলুঙ্গির মধ্যে, প্রচণ্ডভীষণ দুর্গা অধিষ্ঠিত; মূর্ত্তিটা অতীব ক্ষুদ্র ও অস্ফুটাবয়ব;—একটা ক্রূরকর্ম্মা রাক্ষসী, লাল ন্যাকড়ায় জড়ানো। ধ্বজস্তম্ভের ন্যায় একটা প্রকাণ্ড ঢাক তাহার পদতলে স্থাপিত। ঐখানে, বহুশতাব্দী হইতে, প্রতিদিন প্রাতে, ছাগবলি হইয়া আসিতেছে; সেই ছাগের তপ্তশোণিত একটা পিতলের গাম্‌লায় ও তাহার সশৃঙ্গ মুণ্ডটা একটা থালায় রক্ষিত হইয়া থাকে। আশ্চর্য্য! সংহারদেবতার পত্নী দুর্গারূপে এই ভীষণ কালী কিরূপে হিন্দুদেবতাদিগের মধ্যে স্থান পাইল? যে দেশে জীবহিংসা নিষিদ্ধ, সেই দেশে, কিছুদিন পূর্ব্বে এই স্থানে, রক্তপিপাসু কালীর সম্মুখে কিনা নরবলি হইত! না জানি, কোন্ পুরাকালের গর্ভ হইতে—কোন্ অমানিশার মধ্য হইতে এই কালীমূর্ত্তি নিঃসৃত হইয়াছে!...

আমরা পথের প্রত্যেক আড্ডায় যেখানেই থামিতেছি, সেখানেই আমাদের সম্মুখে "গজাল-মারা" পিতলের দ্বারসমূহ উদ্ঘাটিত হইতেছে। তাহার পর অশ্বপৃষ্ঠ হইতে নামিয়া পদব্রজে,—প্রাঙ্গণের মধ্য দিয়া, বাগানের মধ্য দিয়া, সিঁড়ি দিয়া—বরাবর উপরে উঠিতে লাগিলাম।

মোটা-মোটা থামওয়ালা মার্ব্বেলের দালান; তাহাতে কত সূক্ষ্ম বিচিত্র কারুকার্য্য; উহার খিলানমণ্ডপ পূর্ব্বে ছোট ছোট কাচের টুক্‌রা ও আয়নার টুক্‌রায় আচ্ছাদিত ছিল; গুহাগাত্রের ন্যায় এখন সমস্ত "ছাতা-পড়া" হইলেও, স্থানে-স্থানে এখনো ঝক্‌মক্ করিতেছে। দরজাগুলা কাঠের—গজদন্ত-

খচিত। কতকগুলা চৌবাচ্ছা, খুব উচ্চদেশে স্থাপিত, এখনো উহাতে একটু জল রহিয়াছে। অন্তঃপুরমহিলাদের জন্য শৈলগর্ভ খনন করিয়া কতকগুলা স্নানাগার নির্ম্মিত হইয়াছে; এবং সকলের মধ্যস্থলে, প্রাচীরবদ্ধ একটা "ঝোলানো"-বাগান;—তাহার সম্মুখেই কতকগুলা অন্ধকেরে ঘর সমুদ্ঘাটিত---উহাই রাজকুমারীদিগের, রাণীদিগের ও অবরুদ্ধ সমস্ত সুন্দরীদিগের অন্তঃপুর। আরো উচ্চতর ছাদে উঠিবার উদ্দেশে যখন ঐখান দিয়া চলিয়া গেলাম, তখন দেখিলাম, শতবর্ষ-বয়স্ক নারাঙ্গিবৃক্ষসমূহের সৌরভে সমস্ত স্থানটা আমোদিত। কিন্তু এখানকার বৃদ্ধ রক্ষক অতীব তীব্রভাবে বানরদিগের নামে অভিযোগ করিয়া বলিতেছিল যে. উহারাই এখানকার মালিক বলিলেই হয়; উহাদের উৎপাতে সমস্ত নেবু হস্তগত হওয়া দুষ্কর।

আমি এখন, এই শেষপ্রান্তবর্ত্তী ছাদটির উপর. বসিয়া রাত্রির প্রতীক্ষা করিতেছি। চন্দ্রালোকে রাজসভার অধিবেশনের জন্য জম্‌কালো-বারণ্ডাবেষ্টন-সমন্বিত এই ছাদ রাজারা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এখনি জ্যোৎস্না হইবে, আমিও জ্যোৎস্নালোকে এই স্থানটির সহিত একটু পরিচয় করিয়া লইব।

চীল, শকুনি, ময়ূর, ঘুঘু, তালচঞ্চু প্রভৃতি পক্ষীরা সকলেই এখন নিজ-নিজ নীড়ে শয়ন করিয়াছে; তাই এই পরিত্যক্ত প্রাসাদটি এখন আরো নিস্তব্ধ। উচ্চ শৈলমালার অন্তরালে সূর্য্য অনেকক্ষণ-যাবৎ আমার নিকটে প্রচ্ছন্ন ছিল, কিন্তু এইবার নিশ্চয়ই অস্তমিত হইয়াছে। কেন না, নীচেকার কেল্লার একটা ময়দানে কতকগুলি মুসলমান রক্ষি-পুরুষ মেক্কার দিকে মুখ করিয়া নেমাজ করিতেছে। উহারা নেমাজের এই পবিত্র সময়টি যথাকালে ঠিক জানিতে পারে।

ঠিক এই সময়ে রক্তাপ্লুত কালীমন্দির হইতেও একটা গহন-গম্ভীর ধ্বনি নিম্নদেশ হইতে আমার নিকট আসিয়া পৌছিল। ব্রাহ্মণ্যিক পূজা-অর্চ্চনারও এই সময়। লোহিতবসনা রাক্ষসীদেবীর ঢাক তাহারই "গৌরচন্দ্রিমা" আরম্ভ করিয়াছে।

প্রথম-সঙ্কেতের মত ঢাকের উপর দুই-চারিবার সজোরে ঘা পড়িল; তাহার পরেই ভীষণ শব্দঘটা; পরক্ষণেই, আর্ত্তনাদী শানাই ও কাংস্য-করতাল তাহার সহিত যোগ দিল। আর একটা শঙ্খ স্বরগ্রামের দুটিমাত্র স্বর অবলম্বন করিয়া ঘোররবে অবিশ্রামে বাজিতে লাগিল।

এই শব্দ যেন ভূগর্ভ হইতে আমার নিকট আসিয়া পৌছিতেছে; ক্রমেঃ স্ফীত হইয়া উঠিতেছে; এবং উপর্য্যুপরি-বিন্যস্ত অসংখ্য শূন্যগর্ভ ও শব্দযোনি দালানের মধ্য দিয়া, এই উচ্চ ছাদ পর্য্যন্ত পৌছিতে পৌছিতেই অনেকটা রূপান্তরিত হইতেছে। সহসা, উচ্চ আকাশ হইতে, প্রত্যুত্তরচ্ছলে কাঁশরঘণ্টার ধ্বনি নিঃসৃত হইল।

এই ধ্বনি, একটী ক্ষুদ্র শিবমন্দির হইতে যেন পূর্ণপক্ষভরে এই দিকে উড়িয়া আসিতেছে। আমার চতুর্দ্দিকে যে সকল উদগ্র শৈলচূড়া রহিয়াছে, তাহারি একটার উপরে এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত।

যাহার দন্তুর চূড়াবলী কালো চিরুণীর দাঁতের মত পীতাভ ম্লান অম্বরে পরিস্ফুটরূপে

অঙ্কিত—সেই গগনচুম্বী প্রাকারের গায়ে এই মন্দিরটি ঠেস্ দিয়া রহিয়াছে।

এই সকল ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এতটা শব্দকোলাহল আমি প্রত্যাশা করি নাই। কিন্তু ভারতবর্ষে, নগরাদি যতই জনপরিত্যক্ত হউক না,—মন্দিরাদি যতই ভগ্নদশাপন্ন হউক না, পূজা-অনুষ্ঠানের কোথাও গতিরোধ হয় না; দেবসেবা বরাবরই সমান চলিতে থাকে।...

কয়েক মিনিট ধরিয়া, কাঁশর-ঘণ্টা-মুখরিত সেই ক্ষুদ্র মন্দিরটির দিকে আমি মাথা তুলিয়া ছিলাম; তাহার পর যে-ই ভূতলের দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম, অমনি আমার নিজের ছায়া দেখিয়া চমকিত হইলাম,—ছায়াটি বেশ পরিস্ফুট ও সহসা-অঙ্কিত। সহজ-বুদ্ধিতে প্রথমে আমার এইরূপ মনে হইল, বুঝি কেহ আমার পিছনে কোন-এক অপূর্ব্ব আলোকের দীপ ধরিয়াছে কিংবা হয় ত কেহ বৈদ্যুতিক দীপের শুভ্ররশ্মি আমার উপর প্রক্ষেপ করিয়াছে;—কিন্তু আসলে তাহা নহে। যাহার কথা আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম, সেই গোলাকার পূর্ণচন্দ্র সেই রাজদরবারের চন্দ্রমা, ইহারি মধ্যে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন;—এতই সহসা, এদেশে দিবাবসান হয়। অন্য স্থাবরপদার্থেরও সুপরিস্ফুট ছায়া সর্ব্বত্র পতিত হইয়াছে;—মধ্যে-মধ্যে ছায়া-আলোকের দ্বন্দ্ব চলিতেছে। চান্দ্র-দরবারের ছাদের উপর চন্দ্রমা স্বকীয় শুভ্রমহিমায় বিরাজ করিতেছেন।...

উক্ত উৎকট বর্ব্বর বাদ্যধ্বনি থামিয়া গেলে আমি নীচে নামিব; এই সময়ে, কত খাড়া সিঁড়ি দিয়া, কত সরু বারণ্ডা-পথ দিয়া, কত দালানের মধ্য দিয়া একাকী এই রাত্রিকালে আমায় নামিতে হইবে;—আর রাত্রিকালে এই প্রাসাদ বানর ও অপচ্ছায়াদিগেরই আশ্রয়স্থান। তাই, ওই বাদ্যধ্বনি না থামিলে আমার চলিতে সাহস হইতেছে না।

বড়ই বিলম্ব হইতেছে,—বড়ই বিলম্ব হইতেছে। এই সময়ের মধ্যে আকাশে সমস্ত তারাই ফুটিয়া উঠিল।

এই স্থানটি যেমন একদিকে রাজপ্রতাপে মহিমান্বিত—তেম্নি আবার নিভৃত-নিরালয়। যে রাজারা এই চাঁদ্‌নী-দরবারের কল্পনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কল্পনার দৌড় না জানি কত ছিল!

যাহা হউক, অর্দ্ধঘণ্টার পরে, ঢাকের বাদ্য ও পবিত্র শঙ্খের নিনাদ একটু প্রশমিত হইল। শঙ্খনাদের টান্‌টা এখনো চলিয়াছে—তবে, একটু মৃদুভাবে; মধ্যে-মধ্যে আবার যেন প্রাণপণে ধ্বনিত হইতেছে;—তবে এখন একটু রহিয়া-রহিয়া। এইবার যেন শব্দটার মরণযন্ত্রণা উপস্থিত,—এইবার মরিল;—সমস্ত শক্তি নিঃশেষিত হওয়াতেই যেন মরিল। আবার সব নিস্তব্ধ। সকলের তলদেশ,—উপত্যকার গভীর অন্তস্তল—অম্বরের ধ্বংসাবশেষে সমাচ্ছন্ন। সেইখান হইতে শৃগালের শোকবিষণ্ণ তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর আবার শুনা যাইতে লাগিল।

আবার যখন আমি নীচে নাবিতে লাগিলাম, তখন সিঁড়ির মধ্যে—প্রাসাদের নিম্নস্থ দালানগুলার মধ্যে, তেমন অন্ধকার আর নাই। সে সমস্তই চন্দ্রমার শুভ্রকিরণে —নীলাভ কিরণে—অনুবিদ্ধ হইয়াছে; দন্তাকৃতি ছোট ছোট জান্‌লার ফাঁক দিয়া

রজতকিরণ প্রবেশ করিয়া, গবাক্ষের সুন্দর গঠনরেখা হর্ম্ম্যতলের সানের উপর অঙ্কিত করিয়াছে; অথবা, প্রাচীরের প্রস্তরফলকের উপর বিলুপ্ত খচিত-কাজগুলিকে (mosaic) আবার যেন ফুটাইয়া তুলিয়াছে; মনে হয়, যেন সমস্ত দেয়ালের গায়ে রত্নরাজি অথবা সলিলবিন্দু বিকীর্ণ। এবং যখন কুসুম-সৌরভাভিষিক্ত উদ্যানের মধ্য দিয়া চলিতে লাগিলাম, নারাঙ্গিনেবুর উচ্চতম শাখাগুলির হেলন-দোলনে ও মর্ম্মরশব্দে কপিবৃন্দ চকিত-চঞ্চল হইয়া উঠিল।

নীচে, প্রথম-দ্বারগুলির সম্মুখে,—যেখানে ছাদের স্বল্প-শৈত্যের পরেই বায়ু যেন আবার হঠাৎ গরম হইয়া উঠিয়াছে—সেইখানে বল্লমহস্তে অশ্বপৃষ্ঠের উপর আমার পথ-প্রদর্শকেরা আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। এই নৈশশান্তির মধ্যে ঘোড়-সওয়ার হইয়া শান্তভাবে আবার আমরা জয়পুর-অভিমুখে ফিরিলাম। কাল প্রভাতে নিশ্চিতই জয়পুর হইতে প্রস্থান করিব মনে করিয়াছি।

এখান হইতে দেড়শতক্রোশ দূরে, বিকানীয়ারে যাইব মনে করিয়াছিলাম; কিন্তু সে সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়াছি। শুনিলাম, সেখানে দুর্ভিক্ষের ভীষণতা চূড়ান্তসীমায় উঠিয়াছে;—রাস্তাঘাট সমস্তই মৃতদেহে আচ্ছন্ন। না, ঐ ভীষণ দৃশ্য আমার যথেষ্ট দেখা হইয়াছে; আর দেখিতে ইচ্ছা নাই। এখন আমি সেই সব প্রদেশের অভিমুখে যাত্রা করিব, যেখানে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ ততটা নাই; অথবা বঙ্গোপসাগরের সমীপবর্ত্তী সেই সব প্রদেশে যাইব, যেখানে এখনো লোকের প্রাণরক্ষা হইতেছে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রাজতপস্বিনী।

[জীবনীপ্রসঙ্গ]

৫

"যেই মাতৃভাব রূপে দেখাবার তরে
লভেছিলি জনম ধরায়;
সে বিশ্ববাৎসল্য, সেই আত্মবলিদান
আজো তোর অরূপ প্রভায়।"

মহারাণীমাতার স্বর্গারোহণের বৎসর শরৎ-কালে—সে আজ প্রায় বিশবছরের কথা—স্বপ্নে তাঁহার অরূপ মূর্ত্তি দর্শন করার পর এই কবিতা রচিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহা কেবলমাত্র উচ্ছ্বাসময় কল্পনা নহে। যে মাতৃভাবের পূর্ণবিকাশেই স্ত্রীচরিত্রের প্রকৃত গৌরব, বিধাতা অমিতহস্তে তাহা তাঁহাকে দান করিয়াছিলেন। তাহার যথাযথ চিত্র অঙ্কন করিতে "বিশ্ববাৎসল্য" কথাটির মত উপযোগী শব্দ আর নাই। কেন না, তাঁহার মাতৃস্নেহ মনুষ্যেতর জীবেও প্রসারিত হইত। বাল্যকালে দেখিয়াছি,

ছাদে বসিয়া অপরাহ্ণে তিনি গল্প অথবা লেখাপড়ার কাজ করিতেছেন, বন্যপারাবত তাঁহার অতি সন্নিকটে নির্ভয়ে চরিয়া বেড়াইতেছে। পক্ষিজাতিকে দেখিলেই করতলস্থ করার যে বালস্বভাবসুলভ লোভ, তাহা তখনও আমি সম্পূর্ণ পরিহার করিতে পারি নাই, অতএব এই দৃশ্যটি বড় বিস্ময়কর মনে হইত। রাজবাটীর উত্তরদিকের প্রাচীন পরিখাটিকে সংস্কৃত করাইয়া তিনি যে সুদীর্ঘ চৌকী বা জলাশয় খনন করাইয়াছিলেন, তাহাতে কিছুদিনমধ্যে বিস্তর শুক্তি জন্মিয়াছিল। মুক্তাব্যবসায়ীরা জানিতে পারিয়া প্রচুর লাভের আশায় দেওয়ানজির নিকট আবেদন করিল, তাহারা বেশী হার দিতে প্রস্তুত, ঝিনুক উঠাইয়া লইবার আদেশ তাহাদিগকে দেওয়া হউক। প্রধান কর্ম্মচারীরা ইহাতে কোন ক্ষতি দেখিতেছিলেন না, বরং রাজসংসারের একটা নূতন আয়ের পথ খুলিতেছে বলিয়া খুসী হইয়াছিলেন। কিন্তু মহারাণী সচরাচর তাঁহাদের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে অভ্যস্ত না হইলেও এ ক্ষেত্রে দৃঢ়তার সহিত আপন অসম্মতি প্রকাশ করিলেন এবং পিতৃদেবকে অনুযোগ করিয়া পাঠাইলেন যে, ছেলেপুলের বাপ হইয়া এরূপ নিষ্ঠুর প্রস্তাবের তিনি অনুমোদন করিয়াছেন! প্রাচীন রাজবাটীর চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী গড়খাই এক্ষণে বিভিন্ন সরিকদের চৌকীতে পরিণত হইয়াছে, নানাজাতি জলচর পক্ষীরা এই সময়ে তাহাতে বিচরণ করিতে আসিত। রাজকুমার এবং তাঁহার সহচরেরা শিকারে অভ্যস্ত হইবার উদ্দেশে ইদানীং বন্দুকসহায়ে বহুদিনের আশ্রিত পাখীগুলিকে দুইএকবার উত্যক্ত করিয়াছিলেন। দুইচারিটা বন্দুকের আওয়াজ হইবামাত্র কথা মহারাণীর গোচর হইল এবং তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া কুমারকে নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন। হবিষ্যান্নগ্রহণের পর হাতমুখ ধুইবার জন্য তিনি খিড়কীর ঘাটে গমন করেন শুনিয়া আমি একদিন কৌতূহলী হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। মা হাসিয়া বলিলেন, "একটা মাছ ভাত খাইতে আসে, তাই দেখিতে যাই।"

প্রায়শ দেখা যায়, সন্তানবতী না হইলে মহিলারা শিশুসন্তানদের অবারিত ঘনিষ্ঠতা সহিতে পারেন না। বিশেষত নিষ্ঠাবতী বালবিধবা হইলে ত কথাই নাই। মহারাণী ইহার ব্যতিক্রমস্থল ছিলেন। তাঁহার আদরযত্ন পাইয়া বালকবালিকারা তাঁহাকে ছাড়িতে চাহিত না, তিনিও তাহাদের সঙ্গে শিশু হইয়া যাইতেন। একদিন তিনি রাণীঠাকুরাণীর সহিত সাক্ষাৎ জন্য চারি-আনির রাজবাড়ী গিয়াছিলেন। পরদিন গল্প করিলেন, "সেখানে বড় রাজকন্যার ছোট ছেলেটি পেঁয়াজ খাইয়া আসিয়া তাঁহার মুখে হা দিতে লাগিল। যতক্ষণ 'বড় গন্ধ' বলিয়াছিলাম, ততক্ষণ ঐরূপ করিয়াছিল, শেষে যখন বলিলাম গন্ধ নাই (অথচ গন্ধ ছিল), তখন আর দিল না।" তাঁহার ভগিনী পূজনীয়া শ্রীসুন্দরী দেবীর জ্যেষ্ঠা কন্যাটি যখন নিতান্ত শিশু, তখন একদিন ছোটবাড়ীর কোকনের (রাজকুমারীর পুত্র, ডাকনাম কুকুর) কি জিনিষ লইয়াছিল। মা আমার সমক্ষে তাহাকে বলিলেন, "বুঝিয়াছ, পরের জিনিষ লইতে নাই। তুমি কুকুরের জিনিষে

হাত দিলে কেন?” শিশু রাগিয়া গেল, ঠোঁট ফুলাইয়া নিজের হাতের বালা খুলিয়া মহারাণীর গায়ে ফেলিয়া দিল এবং বলিল, “আর তোর কাছে আস্‌বো না। বাড়ীতে আমার যত অলঙ্কার আছে, গায়ে দিয়ে আস্‌বো না। চার-আনির বাড়ীর ভালবাসা!” মার ন্যায় আমিও বুঝিলাম যে, সেদিন চারি-আনির বাড়ী গিয়া তিনি যে বালিকার সাম্‌নে সেখানকার শিশুদের অত্যন্ত আদর করিয়াছিলেন, তাহার প্রাপ্য স্নেহ ও সোহাগ পরের ছেলেদের অর্পণ করিয়াছিলেন, ইহাতে তাহার হিংসা হইয়াছিল। সহ্য করিতে না পারিয়া রাগে আজ সেই কথা অর্দ্ধোচ্চারিত করিল। আর একদিন প্রাতে গিয়া দেখি, মা হলে দাঁড়াইয়া আছেন, কুমারের (পোষ্যপুত্র) জ্যেষ্ঠভ্রাতা রোহিণী গোস্বামীর চারিবছরের কালোকোলো নধর-দেহ ছেলেটি ক্ষুদ্র দুখানি হাত দিয়া তাঁহাকে বেড়িয়া ধরিল। বলিল, “আমায় বাড়ী পাঠাইয়া দাও।” মাতা হাসিয়া তার সঙ্গে আমোদ করিতে লাগিলেন। তার পর সে বলিল, “তুমি তোমার বাড়ী চল।” মা বুঝিলেন, পূর্ব্বদিন বধূরাণী প্রভৃতিকে লইয়া ছোটবাড়ীর বাগানে যখন শাকসবজী তুলিতে যান, বালক তখন সঙ্গে গিয়াছিল, আজ আবার সেখানে যাইতে বলিতেছে। তিনি হাসিলেন, বলিলেন, “আগে তোমার খুড়িমাকে (বৌরাণীকে) নিয়ে এসো, তবে ত যাব!” বালক তখন বধূরাণীর প্রকোষ্ঠের দিকে দৌড়িয়া গেল। স্বচক্ষে দেখিয়াছি, ৭।৮বছরের ব্রাহ্মণেতর বর্ণের ছেলে স্থানান্তরে যাইবার সময় প্রণাম করিতে গিয়াছে, মা তাহাকে কোলে উঠাইয়া লইয়াছেন, তাহার হাতের কণ্ডুরোগ গ্রাহ্য করেন নাই। নাটোরের বর্ত্তমান লোকপূজ্যা মহারাণী যখন নিতান্ত বালিকা, আত্মীয়তাসূত্রে পিতামাতার সঙ্গে কখন-কখন তাঁহাকে দেখিতে যাইতেন। মাতার পায়ের কাছে বসিয়া-বসিয়া বালিকা শৈশবসুলভ কৌতূহল ও ঔৎসুক্যের সহিত সমস্তদিন প্রায় তাঁহার কর্ম্মময় জীবন প্রত্যক্ষ করিতেন। একদিন আদরের সহিত বলিলেন, “কত্তা, (রাজশাহীতে কর্ত্রীদের কত্তা বলে) কত্তা, আমি আপনার মত মহারাণী হব!” মা হাসিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, “তা তুই হবি কুকী!” তদবধি অনেককে সেদিনের কথা আমোদ করিয়া বলিতেন। এই ক্ষুদ্র লেখকের কথা উঠিলে আমার অসাক্ষাতে বলিতেন, “পাগ্‌লাটা হাকিম হবে!”

আশ্রিত বিদ্যার্থীদের প্রতি তাঁহার করুণ-কোমল ব্যবহার আলোচনা করিলে এই মাতৃভাব আরো স্পষ্টীকৃত হইয়া উঠে। রাজশাহীকলেজের উন্নতিকল্পে তিনি কয়-বারে অনেকটাকা দান করিয়াছিলেন। তা ছাড়া, পুটিয়ার বঙ্গবিদ্যালয় এবং লালপুর মধ্যবিত্ত ইংরেজীস্কুল তাঁহারই অর্থসাহায্যে বরাবর পরিচালিত হইয়া আসিয়াছে। সংস্কৃত-শিক্ষার উৎসাহ জন্য পুটিয়ার ও অন্যান্য স্থানের টোলেও তিনি বিস্তর সাহায্য করিতেন। এ সকলের উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থী দরিদ্র বালক ও যুবকদের পুস্তকক্রয়ের ও “ফি”এর সহায়তায় প্রতি বৎসর নিঃশব্দে যে-সব দান হইত, তাহাও সামান্য নহে। এই সকল তাঁহার বিদ্যোৎসাহিতার প্রচুর প্রমাণ

বটে, কিন্তু তাঁহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল, তাঁহার সম্যক্ ব্যয়ে প্রতিপালিত এবং শিক্ষিত বিদ্যার্থীদের জন্য তিনি যাহা করিতেন, তাহার পরিচয়গ্রহণ না করিলে তদীয় আন্তরিকতা এবং বৎসলভাবের যথার্থ গভীরতা বুঝা যায় না।

এই সকল ছাত্রের অনেকে তাঁহাকে কখন দর্শন করিতে পাইত না, কিন্তু তাঁহার অযাচিত মাতৃস্নেহ অলক্ষ্যে তাহাদের অভিষিক্ত করিত। ইহাদের ভিতর কোন কোন ছাত্রকে পুটিয়াস্কুল হইতে আরম্ভ করিয়া রাজশাহীকলেজে এবং কলিকাতার কলেজাদিতে অধ্যয়ন করান হইয়াছিল। ছুটির সময় আমরা যেমন পুটিয়ায় যাইতাম, এই ছাত্রদিগকেও মাতৃ-আজ্ঞায় সেইরূপ সেখানে যাইতে হইত, কেহ না গেলে মহারাণী দুঃখিত হইতেন। এই ছাত্রদের শীর্ষস্থানে আমার বাল্যবন্ধু ভূতপূর্ব্ব "শিক্ষাপরিচয়ের" সম্পাদক সুলেখক শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী বি.-এ.র নাম করা যাইতে পারে। অবকাশান্তে আমরা যখন ফিরিয়া যাইতাম, মাতা এই ছাত্রদের প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইতেন, ব্যবহার্য্য কোন্ কোন্ দ্রব্যের কাঁহার কি অভাব আছে। এবং প্রতিবারে নূতন করিয়া গামছাখানি পর্য্যন্ত সঙ্গে দিতেন।

একটি ছাত্র দুর্ভাগ্যক্রমে কয়বার প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিয়া লজ্জায় ও মনস্তাপে পড়াশুনা ছাড়িয়া দিল। মাতা তাহার খোঁজখবর করিয়াও কোন সংবাদ পান না। আমি তখন জলবায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য লুপ্‌লাইন সাহেবগঞ্জে ছিলাম। ফিরিবার সময় পিতাঠাকুরমহাশয়ের আদেশে ৺রায় রাজীবলোচন রায় দেওয়ানবাহাদুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া মুরশীদাবাদের পথে পুটিয়ায় আসিতেছিলাম। ছাত্রটি আমার বন্ধু, তখন রামপুর বোয়ালিয়ায় ছিলেন। সাক্ষাৎ হইলে তাঁহার মনের অবস্থা বুঝিলাম এবং মহারাণীমাতাকে কিছু না জানাইয়া বিদ্যালয় ত্যাগ করার জন্য তাঁহাকে অনুযোগও করিলাম। আমার মুখে সকল শুনিয়া মাতা বড় দুঃখিত হইলেন। বলিলেন, "খরচপত্রের জন্য সে কুণ্ঠিত হয় কেন?" আমি নিবেদন করিলাম যে, তাহাকে আর স্থানীয় কোন স্কুলে পড়ান অনর্থক। মা যদি সম্মত হন, শিয়ালদহ মেডিক্যাল্‌স্কুলে তাহাকে ভর্ত্তি হইতে বলি। এই প্রস্তাব মহারাণীমাতা আহ্লাদের সহিত অনুমোদন করিয়া তাহাকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন। সে বন্ধুটি এক্ষণে ডাক্তার হইয়া দেশে চিকিৎসাব্যবসায় করিতেছেন।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার।

মধুবনে সন্ধ্যা।

'ক্রুম্মা'র শিখর হ'তে মন্দপদে নামি' সন্ধ্যারাণী
সুবিশাল দিক্‌চক্রে বিছাইছে স্বর্ণাঞ্চলখানি।
"যমুনী"র শীর্ণধারা শুভ্র যেন স্ফাটিক নিঃসার
লক্ষ কৃষ্ণ শিলাবক্ষ ভেদি' বহে উৎস করুণার।

পলাশের শিরে শিরে আরক্তিম লাবণ্যপ্লাবন
রৌপ্যকণ্ঠ পাপিয়ার ক্রমোচ্ছ্বাসে স্ফুরিত নিস্বন
দিগ্বিদিক্‌নির্ব্বিচারে শব্দভরা বায়ুর ফুৎকার
ভরিতেছে প্রতি ক্ষণে মৃত্তিকার এই পারাবার।
দিগন্তচুম্বিত ওই নতোন্নত ভূমিময় স্রোত
চিত্রিত তরঙ্গসম গগনে মিশিছে ওতপ্রোত।

এখনো উঠে নি তারা—প্রতিপদ্‌-চন্দ্র-করধার
সুবর্ণচুম্বনে বিশ্বে করিছে না পুলকসঞ্চার।
চিত্রিত উপলখণ্ড তুলি' ল'য়ে নদীবালু হ'তে
শ্রান্তদেহে গৃহে ফিরি' হেরিলাম দীপের আলোতে
যাহা-তাহা হেথা-হোথা পড়ি' আছে। সুচিত্রিত চেলী
গুছানো ভিত্তিতে ঝুলে। কোণে ক্ষুদ্র তাক্‌'পরে হেলি'
শুভ্র শঙ্খ একখানি ধূলিকীর্ণ পড়ি' ম্রিয়মাণ
গুমরি' গুমরি' কাঁদে—ফাটিতেছে আজি তা'র প্রাণ।
হায়! ও যে প্রতিদিন দিবাশেষে হর্ষে মাতোয়ারা
সন্ধ্যারে বন্দিতে ঘরে ছড়াইত আনন্দের ধারা।

গৃহলক্ষ্মী গৃহে নাই—বিশ্বতলে সন্ধ্যার মতন
দু'চারি-তারকাঙ্কিত নভতলে দাঁড়া'তে শোভন।
ধূলা মুছি' কে লইবে মুদিত-যুগল কর দিয়া
অধীর ও শঙ্খটিরে—শান্ত করি' ভারাক্রান্ত হিয়া?
কা'র দুটি দিব্য ওষ্ঠ করিবে গো তাহারে চুম্বন?—
আনন্দকাকলিরাজি তুলিবে সে শিশুর মতন।
বিশ্ববিপ্লাবিনী সন্ধ্যা বাহিরে নামিছে হের হোথা
যে তা'রে ডাকিবে ঘরে সে কল্যাণী তুমি আজি কোথা?
বাহিরের সুর সনে মিলিছে না আজিকে অন্তর
সন্ধ্যা আজি ব্যর্থ হয় হে জননি! তব গৃহ'পর।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

জাতীয় বিদ্যালয়।*

জাতীয়বিদ্যালয় ত বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল, এখন, এই বিদ্যালয়ের উপযোগিতা যে কি, সে কি যুক্তি দিয়া বুঝাইবার আর কোনো প্রয়োজন আছে?

যুক্তির অভাবে পৃথিবীতে খুব অল্প জিনিষই ঠেকিয়াছে। প্রয়োজন আছে, এ কথা বুঝাইয়া দিলেই যে প্রয়োজনসিদ্ধি হয়, অন্তত আমাদের দেশে তাহার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। আমাদের অভাব ত অনেক আছে, অভাব আছে এ কথা বুঝাইবার লোকও অনেক আছে এবং এ কথা মানিবার লোকেরও অভাব নাই, তবু ইহাতে ইতরবিশেষ কিছুই ঘটে না।

আসল কথা, যুক্তি কোনো বড় জিনিষের সৃষ্টি করিতে পারে না। ষ্ট্যাটিস্টিক্সের তালিকাযোগে লাভ, সুবিধা, প্রয়োজনের কথা বুঝাপড়া করিতে করিতে কেবল গলা ভাঙে, তাহাতে কিছু গড়ে না। শ্রোতারা গবেষণার প্রশংসা করে, আর-কিছু করা আবশ্যক বোধ করে না।

আমাদের দেশের একটা মুস্কিল এই হইয়াছে, শিক্ষা বল, স্বাস্থ্য বল, সম্পদ্ বল, আমাদের উপরে যে কিছু নির্ভর করিতেছে, এ কথা আমরা একরকম ভুলিয়াছিলাম। অতএব এ সকল বিষয়ে আমাদের বোঝা না বোঝা দুইই প্রায় সমান ছিল। আমরা জানি, দেশের সমস্ত মঙ্গলসাধনের দায়িত্ব গবর্মেণ্টের; অতএব আমাদের অভাব কি আছে না আছে, তাহা বোঝার দরুণ কোনো কাজ অগ্রসর হইবার কোনো সম্ভাবনা নাই। এমনতর দায়িত্ববিহীন আলোচনায় পৌরুষের ক্ষতি করে। ইহাতে পরের উপর নির্ভর আরো বাড়াইয়া তোলে।

স্বদেশ যে আমাদেরই কর্ম্মক্ষেত্র এবং আমরাই যে তাহার সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মী, এমন কি, অন্যে অনুগ্রহপূর্ব্বক যতই আমাদের কর্ম্মভার লাঘব করিবে, আমাদের স্বচেষ্টার কঠোরতাকে যতই খর্ব্ব করিবে, ততই আমাদিগকে বঞ্চিত করিয়া কাপুরুষ করিয়া তুলিবে—এ কথা যখন নিঃসংশয়ে বুঝিব, তখনই আর-আর কথা বুঝিবার সময় হইবে।

ইংরেজিতে একটা প্রবাদ শুনিতে পাই, ইচ্ছা যেখানে, পথ সেখানেই আছে। এ কথা কেহ বলে না, যুক্তি যেখানে আছে, পথ সেইখানেই। কিন্তু আমাদের ইচ্ছা যে আমাদের পথ রচনা করিতে পারে, পুরুষোচিত এই কথার প্রতি আমাদের বিশ্বাস ছিল না। আমরা জানিতাম, ইচ্ছা আমরা করিব, কিন্তু পথ করা না করা, সে অন্যের হাত—তাহাতে আমাদের হাত কেবল দরখাস্তে সই করিবার বেলায়।

এইজন্য উপযোগিতা বিচার করিয়া, অভাব বুঝিয়া, এতদিন আমরা কিছুই করি নাই। পরিণামবিহীন আন্দোলন-আলোচনার দ্বারা আমাদের প্রকৃতি যথার্থ বললাভ করে নাই। এইজন্যই ইচ্ছাশক্তির প্রভাব যে

* ২৯শে শ্রাবণ কলিকাতা টাউনহলে পঠিত ও ৩১শে ভাদ্র বঙ্গদর্শনে প্রথম প্রকাশিত।

কিরূপ অব্যর্থ, আমাদের নিজের মধ্যে তাহার পরিচয় পাইবার বড়ই প্রয়োজন ছিল। রাজা যে আমাদের পক্ষে কত-বড় অনুকূল, তাহা নহে, কিন্তু ইচ্ছা যে আমাদের মধ্যে কত-বড় শক্তি, ইহাই নিশ্চয় বুঝিবার জন্য আমাদের একান্ত অপেক্ষা ছিল।

বিধাতার প্রসাদে আজ কেমন করিয়া সেই পরিচয় পাইয়াছি। আজ আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম, ইচ্ছাই ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য, সমস্ত সৃষ্টির গোড়াকার কথাটা ইচ্ছা। যুক্তি নহে, তর্ক নহে, সুবিধা-অসুবিধার হিসাব নহে, আজ বাঙালীর মনে কোথা হইতে একটা ইচ্ছার বেগ উপস্থিত হইল এবং পরক্ষণেই সমস্ত বাধাবিপত্তি, সমস্ত দ্বিধাসংশয় বিদীর্ণ করিয়া অখণ্ড পুণ্যফলের ন্যায় আমাদের জাতীয়বিদ্যাব্যবস্থা আকারগ্রহণ করিয়া দেখা দিল। বাঙালীর হৃদয়ের মধ্যে ইচ্ছার যজ্ঞহুতাশন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল এবং সেই অগ্নিশিখা হইতে চরু হাতে করিয়া আজ দিব্যপুরুষ উঠিয়াছেন—আমাদের বহুদিনের শূন্য আলোচনার বন্ধ্যাত্ব এইবার বুঝি ঘুচিবে। যাহা চেষ্টা করিয়া, কষ্ট করিয়া, তর্ক করিয়া দীর্ঘকালেও হইবার নহে—পূর্ব্বতন সমস্ত হিসাবের খাতা খতাইয়া দেখিলে বিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই যাহাকে অসাময়িক, অসম্ভব, অসঙ্গত বলিয়া সবলে পক্কশীর্ষ চালনা করিতেন, তাহা কত সহজে, কত স্বল্পসময়ে আজ সত্যরূপে আবির্ভূত হইল।

অনেকদিন পরে আজ বাঙালী যথার্থভাবে একটা-কিছু পাইল। এই পাওয়ার মধ্যে কেবল যে একটা উপস্থিতলাভ আছে, তাহা নহে, ইহা আমাদের একটা শক্তি। আজালয় যে পাইবার ক্ষমতা আছে—সে ক্ষমতাটা যে কি এবং কোথায়, আমরা তাহাই বুঝিলাম। এই পাওয়ার আরম্ভ হইতে আমাদের পাইবার পথ প্রশস্ত হইল। আমরা বিদ্যালয়কে পাইলাম যে, তাহা নহে, আমরা নিজের সত্যকে পাইলাম, নিজের শক্তিকে পাইলাম।

আমি আপনাদের কাছে আজ সেই আনন্দের জয়ধ্বনি তুলিতে চাই। আজ বাংলাদেশে যাহার আবির্ভাব হইল, তাহাকে কিভাবে গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা যেন আমরা না ভুলি। আমরা পাঁচজনে যুক্তি করিয়া কাঠখড় দিয়া কোনোমতে কোনো-একটা সুবিধার খেলনা গড়িয়া তুলি নাই—আমাদের বঙ্গমাতার সূতিকাগৃহে আজ সজীব মঙ্গল জন্মগ্রহণ করিয়াছে—সমস্ত দেশের প্রাঙ্গণে আজ যেন আনন্দশঙ্খ বাজিয়া উঠে—আজ যেন উপঢৌকন প্রস্তুত থাকে, আজ আমরা যেন কৃপণতা না করি।

সুযোগ-সুবিধার কথা কালক্রমে চিন্তা করিবার অবসর আসিবে, আজ আমাদিগকে গৌরব অনুভব করিয়া উৎসব আরম্ভ করিতে হইবে। আমি ছাত্রদিগকে বলিতেছি, আজ তোমরা গৌরবে সমুদয় হৃদয় পরিপূর্ণ করিয়া স্বদেশের বিদ্যামন্দিরে প্রবেশ কর—তোমরা অনুভব কর, বাঙালীজাতির শক্তির একটি সফলমূর্ত্তি তাঁহার সিংহাসনের সম্মুখে তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন—তাঁহাকে যে পরিমাণে যথার্থরূপে তোমরা মানিবে, তিনি সেই পরিমাণে তেজ লাভ করিবেন এবং সেই তেজে আমরা সকলে তেজস্বী হইব। এই যে জাতীয়শক্তির তেজ, ইহার কাছে

ব্যক্তিগত সামান্য ক্ষতিবৃদ্ধি সমস্তই তুচ্ছ। তোমরা যদি এই বিদ্যাভবনের জন্য গৌরব অনুভব কর, তবেই ইহার গৌরববৃদ্ধি হইবে। বড় বাড়ী, মস্ত জমি বা বৃহৎ আয়োজনে ইহার গৌরব নহে,—তোমাদের শ্রদ্ধা, তোমাদের নিষ্ঠা, বাঙালীর আত্মসমর্পণে ইহার গৌরব। বাঙালীর ইচ্ছায় ইহার সৃষ্টি, বাঙালীর নিষ্ঠায় ইহার রক্ষা—ইহাই ইহার গৌরব এবং এই গৌরবেই আমাদের গৌরব।

আমাদের অন্তঃকরণে যতক্ষণ পর্য্যন্ত গৌরববোধ না জন্মে, ততক্ষণ কেবলি অন্যের সঙ্গে আমাদের অনুষ্ঠানের তুলনা করিয়া আমরা পদে-পদে লজ্জিত ও হতাশ হইতে থাকি। ততক্ষণ আমাদের বিদ্যালয়ের সঙ্গে অন্যদেশের বিদ্যালয় মিলাইয়া দেখিবার প্রবৃত্তি হয়—যেটুকু মেলে, সেইটুকুতেই গর্ব্ববোধ করি, যেটুকু না মেলে, সেইটুকুতেই খাটো হইয়া যাই।

কিন্তু এরূপ তুলনা কেবল নির্জ্জীবপদার্থ-সম্বন্ধেই খাটে। গজকাঠিতে বা ওজনের বাটখারায় জীবিতবস্তুর পরিমাপ হয় না। আজ আমাদের দেশে এই যে জাতীয়বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, আমি বলিতেছি, ইহা নির্জ্জীব ব্যাপার নহে—আমরা প্রাণ দিয়া প্রাণসৃষ্টি করিয়াছি। সুতরাং যেখানে ইহাকে দাঁড় করানো হইল, সেইখানেই ইহার শেষ নহে,—ইহা বাড়িবে, ইহা চলিবে—ইহার মধ্যে বিপুল ভবিষ্যৎ রহিয়াছে, তাহার ওজন কে করিতে পারে! যে-কোনো বাঙালী নিজের প্রাণের মধ্যে এই বিদ্যালয়ের প্রাণ অনুভব করিবে, সে কোনোমতেই ইটকাঠের দরে ইহার মূল্যনিরূপণ করিবে না—সে ইহার প্রথম আরম্ভের মধ্যে চরম পরিণামের মহতী সম্পূর্ণতা অনুভব করিবে, সে ইহার ব্যক্ত ও অব্যক্ত সমস্তটাকে এক করিয়া সজীব সত্যের সেই সমগ্রমূর্ত্তির নিকট আনন্দের সহিত আত্মসমর্পণ করিবে।

তাই আজ আমি ছাত্রদিগকে অনুরোধ করিতেছি, এই বিদ্যালয়ের প্রাণকে অনুভব কর—সমস্ত বাঙালীজাতির প্রাণের সঙ্গে এই বিদ্যালয়ের যে প্রাণের যোগ হইয়াছে, তাহা নিজের অন্তঃকরণের মধ্যে উপলব্ধি কর—ইহাকে কোনোদিন একটা ইস্কুলমাত্র বলিয়া ভ্রম করিয়ো না। তোমাদের উপরে এই একটি মহৎ দায়িত্ব রহিল। স্বদেশের একটি পরমধনের রক্ষণভার আজ তোমাদের উপরে যতটা-পরিমাণে ন্যস্ত হইল, তোমাদিগকে একান্ত ভক্তির সহিত, নম্রতার সহিত তাহা বুঝিয়া লইতে হইবে। ইহাতে তপস্যার প্রয়োজন হইবে। ইতিপূর্ব্বে অন্য কোনো বিদ্যালয় তোমাদের কাছে এত কঠোরতা দাবী করিতে পারে নাই। এই বিদ্যালয় হইতে কোনো সহজ সুবিধা আশা করিয়া ইহাকে ছোট হইতে দিয়ো না। বিপুল চেষ্টার দ্বারা ইহাকে তোমাদের মস্তকের ঊর্দ্ধে তুলিয়া ধর—ইহার ক্লেশসাধ্য আদর্শকে মহত্তম করিয়া রাখ—ইহাকে কেহ যেন লজ্জা না দেয়, উপহাস করিতে না পারে, সকলেই যেন স্বীকার করে যে, আমরা শৈথিল্যকে প্রশ্রয় দিবার জন্য, জড়ত্বকে সম্মানিত করিবার জন্য বড় নাম দিয়া একটা কৌশল অবলম্বন করি নাই। তোমাদিগকে পূর্ব্বাপেক্ষা যে দুরূহতর প্রয়াস, যে কঠিনতর সংযম

আশ্রয় করিতে হইবে, তাহা ব্রতস্বরূপ, ধর্ম্মস্বরূপ গ্রহণ করিয়ো। কারণ, এ বিদ্যালয় তোমাদিগকে বাহিরের কোনো শাসনের দ্বারা, কোনো প্রলোভনের দ্বারা আবদ্ধ করিতে পারিবে না—ইহার বিধানকে অগ্রাহ্য করিলে তোমরা কোনো পদ বা পদবীর ভরসা হইতে ভ্রষ্ট হইবে না—কেবল তোমাদের স্বদেশকে, তোমাদের ধর্ম্মকে শিরোধার্য্য করিয়া, স্বজাতির গৌরব এবং নিজের চরিত্রের সম্মানকে নিয়ত স্মরণে রাখিয়া, তোমাদিগকে এই বিদ্যালয়ের সমস্ত কঠিন ব্যবস্থা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অক্ষুব্ধ আত্মোৎসর্গের সহিত নতশিরে বহন করিতে হইবে।

আমাদের এই বিদ্যালয়সম্বন্ধে যখন চিন্তা করিবে, তখন এই কথা ভাবিয়া দেখিয়ো যে, যে দেশে জলাশয় নাই, সে দেশে আকাশের বৃষ্টিপাত ব্যর্থ হইয়া যায়। জল ধরিবার স্থান না থাকিলে বৃষ্টিধারার অধিকাংশ ব্যবহার নষ্ট হইতে থাকে। আমাদের দেশে যে জ্ঞানী, গুণী, ক্ষমতাসম্পন্ন লোক জন্মগ্রহণ করেন না, তাহা নহে—কিন্তু তাঁহাদের জ্ঞান, গুণ ও ক্ষমতা ধরিয়া রাখিবার কোনো ব্যবস্থা আমাদের দেশে নাই। তাঁহারা চাকরী করেন, ব্যবসা করেন, রোজগার করেন, পরের হুকুম মানিয়া চলেন, তাহার পরে পেন্‌শন্ লইয়া ভাবিয়া পান না, কেমন করিয়া দিন কাটিবে। এমন প্রত্যহ কত রাশিরাশি সামর্থ্য দেশের উপর দিয়া গড়াইয়া, বহিয়া, উবিয়া চলিয়া যাইতেছে। ইহা আমরা নিশ্চয় জানি, বিধাতার অভিশাপে আমাদের দেশে যে শক্তির চিরন্তন অনাবৃষ্টি ঘটিয়াছে, তাহা নহে, দেশের শক্তিকে দেশের কাজে-ব্যবহারে লাগাইবার, তাহাকে কোথাও একত্রে সংগ্রহ করিবার কোনো বিধান আমরা করি নাই। এইজন্য, যে শক্তি আছে, সে শক্তিকে প্রত্যক্ষ করিবার, অনুভব করিবার কোনো উপায় আমাদের হাতে নাই। যদি আমাদের প্রতি কেহ শক্তিহীনতার অপবাদ দেয়, তবে রাজসরকারের চাকরীর ইতিবৃত্ত হইতে রায়বাহাদুরের তালিকা খুঁজিয়া বেড়াইতে হয়, নিতান্ত তুচ্ছ সাময়িক প্রতিপত্তির উঞ্ছ খুঁটিয়া নিজেদের সামর্থ্য সপ্রমাণ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হয়—কিন্তু তাহাতে আমরা সান্ত্বনা পাই না এবং নিজেদের প্রতি বিশ্বাস আন্তরিক হইয়া উঠে না।

এমন দুর্দ্দশার দিনে এই জাতীয়বিদ্যালয় আমাদের বিধিদত্ত শক্তিসঞ্চয়ের একটি উপায়স্বরূপে আবির্ভূত হইয়াছে। দেশের মহত্ত্ব এইখানে স্বভাবতই আকৃষ্ট হইয়া বাঙালীজাতির চিরদিনের সম্বলের মত এই ভাণ্ডে, এই ভাণ্ডারে রক্ষিত ও বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। অতি অল্পকালের মধ্যেই কি তাহার প্রমাণ আমরা পাই নাই? এই বিদ্যালয়ে দেখিতে দেখিতে দেশের যে সকল প্রভাবসম্পন্ন পূজ্য ব্যক্তিগণকে আমরা একত্রে লাভ করিয়াছি, তাঁহাদের প্রচুর সামর্থ্য কি কেবলমাত্র আহ্বানেরই অভাবে, কেবলমাত্র যজ্ঞক্ষেত্রেরই অবর্ত্তমানে ক্ষীণভাবে বিক্ষিপ্ত হইয়া যাইত না? একি আমাদের কম সৌভাগ্য! দেশের গুরুজনেরা যেখানে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক উৎসাহের সহিত সমবেত হইতেছেন, সেইখানেই দেশের ছাত্রগণের শিক্ষালাভের ব্যবস্থা হইয়াছে, একি আমাদের সামান্য কল্যাণ! উপযুক্ত দাতাসকলে শ্রদ্ধার সহিত দান

করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিতেছেন, উপযুক্ত গ্রহীতারাও শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিবার জন্য করজোড়ে দাঁড়াইয়াছেন, এমন শুভযোগ যেখানে, সেখানে দাতাও ধন্য, গ্রহীতাও ধন্য এবং সেই যজ্ঞভূমিও পুণ্যস্থান।

আমরা আক্ষেপ করিয়া থাকি যে, আমাদের দেশের লোক দেশহিতকর কাজে ত্যাগস্বীকার করিতে পারে না। কেন পারে না? তাহার কারণ, হিতকর কার্য্য তাহাদের সম্মুখে সত্য হইয়া দেখা দেয় না। কতকগুলি কাজের মত কাজ আমাদের নিকটে বর্ত্তমান থাকে, ইহা আমাদের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। না থাকিলে প্রতিদিনের তুচ্ছ স্বার্থ আমাদের কাছে অত্যন্ত বেশি সত্য হইয়া বড় হইয়া উঠে। স্বীকার করি, আমরা এ পর্য্যন্ত দেশের মঙ্গলের জন্য তেমন করিয়া ত্যাগ করিতে পারি নাই। কিন্তু মঙ্গল যদি মূর্ত্তি ধরিয়া আমাদের প্রাঙ্গণে দাঁড়াইত, তবে তাহাকে না চিনিয়া এবং না দিয়া কি থাকিতে পারিতাম? ত্যাগস্বীকার মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক, কিন্তু সেই ত্যাগে প্রবৃত্ত করাইবার উপলক্ষ্য কেবল কথার কথা হইলে চলে না—চাঁদার খাতা এবং অনুষ্ঠানপত্র আমাদের মন এবং অর্থে টান দিতে পারে না।

যে জাতি আপনার ঘরের কাছে সত্যভাবে, প্রত্যক্ষভাবে আত্মত্যাগের উপলক্ষ্য রচনা করিতে পারে নাই, তাহার প্রাণ ক্ষুদ্র, তাহার লাভ সামান্য। সে কোম্পানির কাগজ, ব্যাঙ্কের ডিপজিট্ ও চাকরীর সুযোগকেই সকলের চেয়ে বড় করিয়া দেখিতে বাধ্য। সে কোনো মহৎভাবকে মনের সহিত বিশ্বাস করে না—কারণ, ভাব যেখানে কেবলই ভাবমাত্র, কর্ম্মের মধ্যে যাহার আকার নাই, সে সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য নহে—সম্পূর্ণ সত্যের প্রবল দাবী সে করিতে পারে না। সুতরাং তাহার প্রতি আমরা অনুগ্রহের ভাব প্রকাশ করি—তাহাকে ভিক্ষুকের মত দেখি; কখনো বা কৃপা করিয়া তাহাকে কিঞ্চিৎ দিই, কখনো বা অবজ্ঞা ও অবিশ্বাস করিয়া তাহাকে প্রত্যাখ্যান করি। যে দেশে মহৎভাব ও বৃহৎ কর্ত্তব্যগুলি এমন কৃপাপাত্ররূপে দ্বারে দ্বারে হাত পাতিয়া বেড়ায়, সে দেশের কল্যাণ নাই।

আজ জাতীয়বিদ্যালয় মঙ্গলের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আমাদের কাছে দেখা দিয়াছে। ইহার মধ্যে মন, বাক্য এবং কর্ম্মের পূর্ণসম্বন্ধ প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাকে আমরা কখনই অস্বীকার করিতে পারিব না। ইহার নিকটে আমাদিগকে পূজা আহরণ করিতেই হইবে। এইরূপ পূজার বিষয় প্রতিষ্ঠার দ্বারাই জাতি বড় হইয়া উঠে। অতএব জাতীয়বিদ্যালয় যে কেবল আমাদের ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিয়া কল্যাণসাধন করিবে, তাহা নহে—কিন্তু দেশের মাঝখানে একটি পূজার যোগ্য প্রকৃত মহৎব্যাপারের উপস্থিতিই লক্ষ্যে-অলক্ষ্যে আমাদিগকে মহত্ত্বের দিকে লইয়া যাইবে।

এই কথা মনে রাখিয়া আজ আমরা ইহাকে আবাহন ও অভিবাদন করিব। এই কথা মনে রাখিয়া আমরা ইহাকে রক্ষা করিব ও মান্য করিব। ইহাকে রক্ষা করা আত্মরক্ষা, ইহাকে মান্য করাই আত্মসম্মান।

কিন্তু যদি এই কথাই সত্য হয় যে, আমরা আমাদের অস্থিমজ্জার মধ্যে দাসখত্ বহন করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি, যদি সত্য হয় যে, পরের দ্বারা তাড়িত না হইলে আমরা চলিতেই পারিব না—তবেই আমরা স্বেচ্ছা-পূর্ব্বক স্বদেশের মান্যব্যক্তিদের শাসনে অসহিষ্ণু হইব, তবেই আমরা তাঁহাদের নিয়মের মধ্যে আপনাকে আবদ্ধ করিতে গৌরববোধ করিব না, তবেই অন্যত্র সামান্য সুযোগের জন্য আমাদের মন প্রলুব্ধ হইতে থাকিবে এবং সংযম ও শিক্ষার কঠোরতার জন্য আমাদের চিত্ত বিদ্রোহী হইয়া উঠিবে।

কিন্তু এ সকল অশুভ কল্পনাকে আজ মনে স্থান দিতে চাই না। সম্মুখে পথ সুদীর্ঘ এবং পথ দুর্গম—আশার পাথেয়দ্বারা হৃদয়কে পরিপূর্ণ করিয়া আজ যাত্রা আরম্ভ করিতে হইবে। উদয়াচলের অরুণচ্ছটার ন্যায় এই আশা এবং বিশ্বাসই পৃথিবীর সমস্ত সৌভাগ্য-বান্ জাতির মহদ্দিনের প্রথম সূচনা করিয়াছে। এই আশাকে, এই বিশ্বাসকে আমরা আজ কোথাও লেশমাত্র ক্ষুণ্ণ হইতে দিব না। এই আশার মধ্যে কোথাও যেন দুর্ব্বলতা, বিশ্বাসের মধ্যে কোথাও যেন সাহসের অভাব না থাকে। নিজের মধ্যে নিজেকে যেন আজ দীন বলিয়া অনুভব না করি। ইহা যেন পূর্ণভাবে বুঝিতে পারি, আমাদের দেশের মধ্যে, আমা-দের দেশবাসী প্রত্যেকের মধ্যে বিধাতার একটি অপূর্ব্ব অভিপ্রায় নিহিত আছে। সে অভিপ্রায় আর-কোনো দেশের আর-কোনো জাতির দ্বারা সিদ্ধ হইতেই পারে না। আমরা পৃথিবীকে যাহা দিব; তাহা আমাদের নিজের দান হইবে, তাহা অন্যের উচ্ছিষ্ট হইবে না। আমাদের পিতামহগণ তপোবনের মধ্যে সেই দানের সামগ্রী প্রস্তুত করিতেছিলেন, আমরাও নানা দুঃখের দাহে, নানা দুঃসহ আঘাতের তাড়নায় সেই সামগ্রীর বিচিত্র উপকরণকে একত্রে বিগলিত করিয়া তাহাকে গঠনের উপযোগী করিয়া তুলিতেছি, তাঁহাদের সেই তপস্যা, আমাদের এই দুর্ব্বহ দুঃখ কখনই ব্যর্থ হইবে না।

জগতের মধ্যে ভারতবাসীর যে একটি বিশেষ অধিকার আছে, সেই অধিকারের জন্য আমাদের জাতীয়বিদ্যালয় আমাদিগকে প্রস্তুত করিবে—আজ এই মহতী আশা হৃদয়ে লইয়া আমরা এই নূতন বিদ্যাভবনের মঙ্গলাচরণে প্রবৃত্ত হইলাম। সুশিক্ষার লক্ষণ এই যে, তাহা মানুষকে অভিভূত করে না, তাহা মানুষকে মুক্তিদান করে। এতদিন আমরা ইস্কুলকলেজে যে শিক্ষালাভ করিতেছিলাম, তাহাতে আমাদিগকে পরাস্ত করিয়াছে। আমরা তাহা মুখস্থ করিয়াছি, আবৃত্তি করিয়াছি, শিক্ষালব্ধ বাঁধিবচনগুলিকে নিঃসংশয়ে চূড়ান্তসত্য বলিয়া প্রচার করিতেছি। যে ইতিহাস ইংরেজিকেতাবে পড়িয়াছি, তাহাই আমাদের একমাত্র ইতিহাসের বিদ্যা, যে পোলিটিকাল্ ইকনমি মুখস্থ করিয়াছি, তাহাই আমাদের একমাত্র পোলিটিকাল্ ইকনমি। যাহা-কিছু পড়িয়াছি, তাহা আমাদিগকে ভূতের মত পাইয়া বসিয়াছে; সেই পড়া-বিদ্যা আমাদের মুখ দিয়া কথা বলাইতেছে, বাহির হইতে মনে হইতেছে, যেন আমরাই কথা বলিতেছি। আমরা মনে করিতেছি, পোলিটিকাল্ সভ্যতা ছাড়া সভ্যতার আর-কোনো আকার হইতেই পারে না।

আমরা স্থির করিয়াছি, য়ুরোপীয় ইতিহাসের মধ্য দিয়া যে পরিণাম প্রকাশ পাইয়াছে,জাতি-মাত্রেরই সেই একমাত্র সদ্গতি। যাহা অন্য-দেশের শাস্ত্রসম্মত, তাহাকেই আমরা হিত বলিয়া জানি এবং আগাগোড়া অন্যদেশের প্রণালী অনুসরণ করিয়া আমরা স্বদেশের হিতসাধন করিতে ব্যগ্র।

মানুষ যদি এমন করিয়া শিক্ষার নীচে চাপ্‌পা পড়িয়া যায়, সেটাকে কোনোমতেই মঙ্গল বলিতে পারি না! আমাদের যে শক্তি আছে, তাহারই চরম বিকাশ হইবে, আমরা যাহা হইতে পারি, তাহাই সম্পূর্ণভাবে হইব—ইহাই শিক্ষার ফল। আমরা চলন্ত পুঁথি হইব, অধ্যাপকের সজীব নোট্‌বুক্‌ হইয়া বুক ফুলাইয়া বেড়াইব, ইহা গর্ব্বের বিষয় নহে। আমরা জগতের ইতিহাসকে নিজের স্বতন্ত্র-দৃষ্টিতে দেখিতে সাহস করিলাম কই, আমরা পোলিটিকাল্‌ ইকনমিকে নিজের স্বাধীন-গবেষণার দ্বারা যাচাই করিলাম কোথায়? আমরা কি, আমাদের সার্থকতা কিসে, ভারতবর্ষকে বিধাতা যে ক্ষেত্রে দাঁড় করাইয়া-ছেন, সে ক্ষেত্র হইতে মহাসত্যের কোন্‌ মূর্ত্তি কিভাবে দেখা যায়, শিক্ষার দ্বারা বলপ্রাপ্ত হইয়া তাহা আমরা আবিষ্কার করিলাম কই? আমরা কেবল—

ভয়ে ভয়ে যাই, ভয়ে ভয়ে চাই,
ভয়ে ভয়ে শুধু পুঁথি আওড়াই।

হায়, শিক্ষা আমাদিগকে পরাভূত করিয়া ফেলিয়াছে।

আজ আমি আশা করিতেছি, এবারে আমরা শিক্ষার নাগপাশ কাটিয়া-ফেলিয়া শিক্ষার মুক্ত অবস্থায় উত্তীর্ণ হইব। আমরা এতকাল যেখানে নিভৃতে ছিলাম, আজ সেখানে সমস্ত জগৎ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, নানা জাতির ইতিহাস তাহার বিচিত্র অধ্যায় উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে,দেশদেশান্তর হইতে যুগ-যুগান্তরের আলোকতরঙ্গ আমাদের চিন্তাকে নানাদিকে আঘাত করিতেছে—জ্ঞানসামগ্রীর সীমা নাই, ভাবের পণ্য বোঝাই হইয়া উঠিল—এখন সময় আসিয়াছে, আমাদের দ্বারের সম্মুখবর্ত্তী এই মেলায় আমরা বালকের মত হতবুদ্ধি হইয়া কেবল পথ হারাইয়া ঘুরিয়া বেড়াইব না;—সময় আসিয়াছে, যখন ভারত-বর্ষের মন লইয়া এই সকল নানা স্থানের বিক্ষিপ্ত বিচিত্র উপকরণের উপর সাহসের সহিত গিয়া পড়িব, তাহাদিগকে সম্পূর্ণ আপ-নার করিয়া লইব, আমাদের চিত্ত তাহাদিগকে একটি অপূর্ব্ব ঐক্যদান করিবে, আমাদের চিন্তাক্ষেত্রে তাহারা যথাযথস্থানে বিভক্ত হইয়া একটি অপরূপ ব্যবস্থায় পরিণত হইবে; সেই ব্যবস্থার মধ্যে সত্য নূতন দীপ্তি, নূতন ব্যাপ্তি লাভ করিবে এবং মানবের জ্ঞান-ভাণ্ডারে তাহা নূতন সম্পত্তির মধ্যে গণ্য হইয়া উঠিবে। ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী জানিয়া-ছিলেন, উপকরণের মধ্যে অমৃত নাই; বিদ্যারই কি, আর বিষয়েরই কি, উপকরণ আমাদিগকে আবদ্ধ করে—আচ্ছন্ন করে; চিত্ত যখন সমস্ত উপকরণকে জয় করিয়া অবশেষে আপনাকেই লাভ করে, তখনি সে অমৃতলাভ করে। ভারতবর্ষকেও আজ সেই সাধনা করিতে হইবে—নানা তথ্য, নানা বিদ্যার ভিতর দিয়া পূর্ণতররূপে নিজেকে উপলব্ধি করিতে হইবে; পাণ্ডিত্যের বিদেশী বেড়ি ভাঙিয়া-ফেলিয়া পরিণতজ্ঞানে জ্ঞানী

হইতে হইবে। আজ হইতে "ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবাঃ"—হে দেবগণ,আমরা কান দিয়া যেন ভাল করিয়া শুনি, বই দিয়া না শুনি; "ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ"—হে পূজ্যগণ, আমরা চোখ দিয়া যেন ভাল করিয়া দেখি —পরের বচন দিয়া না দেখি! জাতীয়বিদ্যালয় আবৃত্তিগত ভীরুবিদ্যার গণ্ডী হইতে বাহির করিয়া আমাদের বন্ধনজর্জ্জর বুদ্ধির মধ্যে উদার সাহস ও স্বাতন্ত্র্যের সঞ্চার করিয়া যেন দেয়। পাঠ্যপুস্তকটির সঙ্গে আমাদের যে কথাটি না মিলিবে, তাহার জন্য আমরা যেন লজ্জিত না হই। এমন কি, আমরা ভুল করিতেও সঙ্কোচবোধ করিব না। কারণ, ভুল করিবার অধিকার যাহার নাই, সত্যকে আবিষ্কার করিবার অধিকারও সে পায় নাই। পরের শতশত ভুল জড়ভাবে মুখস্থ করিয়া রাখার চেয়ে সচেষ্টভাবে নিজে ভুল করা অনেক ভাল। কারণ, যে চেষ্টা ভুল করায়, সেই চেষ্টাই ভুলকে লঙ্ঘন করাইয়া লইয়া যায়। যাহাই হউক্, যেমন করিয়াই হউক্ শিক্ষার দ্বারা আমরা যে পূর্ণপরিণত আমরাই হইব—আমরা যে ইংরেজি লেক্‌চারের ফোনোগ্রাফ, বিলিতি অধ্যাপকের শিকলবাঁধা দাঁড়ের পাখী হইব না, এই একান্ত আশ্বাস হৃদয়ে লইয়া আমি আমাদের নূতন-প্রতিষ্ঠিত জাতীয়বিদ্যামন্দিরকে আজ প্রণাম করি। এখানে আমাদের ছাত্রগণ যেন শুদ্ধমাত্র বিদ্যা নহে, তাহারা যেন শ্রদ্ধা, যেন নিষ্ঠা, যেন শক্তি লাভ করে—তাহারা যেন অভয়প্রাপ্ত হয়—তাহারা যেন দ্বিধাবর্জ্জিত হইয়া নিজেকে নিজে লাভ করিতে পারে—তাহারা যেন অস্থিমজ্জার মধ্যে উপলব্ধি করে—

"সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখম্"।

তাহাদের অন্তরে যেন এই মহামন্ত্র সর্ব্বদাই ধ্বনিত হইতে থাকে—

"ভূমৈব সুখম্, নাল্পে সুখমস্তি"।

যাহা ভূমা, যাহা মহান্, তাহাই সুখ, অল্পে সুখ নাই!

ভারতবর্ষের প্রাচীন তপোবনে ব্রহ্মবিদ্যাপরায়ণ গুরু মুক্তিকাম ছাত্রগণকে যে মন্ত্রে আহ্বান করিয়াছিলেন, সে মন্ত্র বহুদিন এদেশে ধ্বনিত হয় নাই। আজ আমাদের বিদ্যালয় সেই গুরুর স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া ব্রহ্মপুত্র এবং ভাগীরথীর তীরে তীরে এই বাণী প্রেরণ করিতেছেন—

যথাপঃ প্রবতা যন্তি, যথা মাসা অহর্জ্জরম্, এবং মাং ব্রহ্মচারিণো ধাত আয়ন্তু সর্ব্বতঃ স্বাহা।

জলসকল যেমন নিম্নদেশে গমন করে, মাসসকল যেমন সংবৎসরের দিকে ধাবিত হয়, তেম্‌নি সকল দিক্ হইতে ব্রহ্মচারিগণ আমার নিকটে আসুন—স্বাহা।

সহ বীর্য্যং করবাবহৈ।

আমরা উভয়ে মিলিত হইয়া যেন বীর্য্যপ্রকাশ করি।

তেজস্বি নাবধীতমস্তু।

তেজস্বিভাবে আমাদের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা হউক্।

মা বিদ্বিষাবহৈ।

আমরা পরস্পরের প্রতি যেন বিদ্বেষ না করি।

ভদ্রন্নো অপি বাতয় মনঃ।

হে দেব, আমাদের মনকে মঙ্গলের প্রতি সবেগে প্রেরণ কর।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বঙ্গদর্শন।

বঙ্কিমচন্দ্র ও স্বদেশীভাব

ভগবানের কৃপায় সম্প্রতি আমি একটু অবসর পাইয়াছি, এই সময়ে আমার কোন আত্মীয় সাহিত্যসেবক আমাকে স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী সমালোচন করিবার জন্য অনুরোধ করেন।

এক্ষণে বঙ্কিমবাবুর রচিত 'বন্দে মাতরং' সঙ্গীতে আমাদের দেশ নিনাদিত, আনন্দমঠের বীজমন্ত্রে দেশের অনেক লোক দীক্ষিত। 'বন্দে মাতরং' ভক্তিসহকারে উচ্চারণ করিবার জন্য বঙ্গবাসী শোণিতপাত করিতে প্রস্তুত হইয়াছে, শোণিতপাত করিয়াছে—এমন কি, যখন বীর বালকের দেহে রক্তের ধারা ছুটিতেছে, লাঠির উপর লাঠি পড়িতেছে, তখন ভীষণ-নৃশংস আঘাতের প্রতিঘাতে সেই বালক 'বন্দে মাতরং' শব্দে আকাশ প্রতিধ্বনিত করিয়াছে। এই 'বন্দে মাতরং' সঙ্গীত যে পুস্তকের প্রাণ, যে নীতির কেন্দ্র, যে পূজার মন্ত্র, যে গ্রন্থকারের নিশ্বাস,—সেই পুস্তক অধ্যয়ন করিবার, সেই নীতি অনুশীলন করিবার, সেই পূজা আরম্ভ করিবার, সেই গ্রন্থকারকে সম্যক্ বুঝিবার ও তাঁহার উপদেশ কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য, বর্ত্তমান সময় আমাদিগকে আগ্রহসহকারে আহ্বান করিতেছে।

কিছুদিন পূর্ব্বে 'বন্দে মাতরং সম্প্রদায়' কর্ত্তৃক আহূত হইয়া ক্লাসিক থিয়েটারে যে মহাসভা এবং ঐ মহাসভায় বঙ্কিমবাবুর বিষয়ে যে আলোচনা হইয়াছিল, তাহা আমাদের এক সৌভাগ্যের কথা। আমার দুর্ভাগ্যক্রমে জনাকীর্ণ রুদ্ধবায়ু কক্ষ অনেক সময়ই আমার স্বাস্থ্যপক্ষে অসহনীয় হয়। তজ্জন্য আমি সেই উৎসবে যোগদান করিতে পারি নাই বটে, কিন্তু সভা-অধিষ্ঠানের সময় দুইচারিমিনিট মণ্ডপের বাহিরে দণ্ডায়মান থাকিয়া, নীরবে স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতির উদ্দেশে, আমার ভক্তি নিবেদন করিয়া প্রত্যাগমন করিয়াছিলাম। বাহির হইতে সেই রঙ্গালয় যেরূপ শ্রোতৃবর্গপূর্ণ দেখিয়াছিলাম, যে উৎসাহসূচক করতালি ধ্বনি শ্রবণ করিয়াছিলাম, তাহাতে মনে হইয়াছিল, আমরা যে স্বদেশী মহাত্মাদিগকে এরূপে আদর করিতে শিখিয়াছি, তাহা জাতীয় উন্নতির একটা সুলক্ষণ।

ঐ সভাসম্বন্ধে একখানি সংবাদপত্রে

একটি মন্তব্য দেখিয়াছিলাম। তাহা এই যে, বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থসম্বন্ধে ধারাবাহিক আলোচনার জন্য মধ্যে মধ্যে সভা হইলে ভাল হয়। আমি ভরসা করি, আমার এই সামান্য ক্ষুদ্রপ্রবন্ধে ঐ ধারাবাহিক আলোচনার আরম্ভ হইবে, এবং আমা অপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তিগণ এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া বঙ্কিম-বাবুর গ্রন্থের মর্ম্ম ধারাবাহিকভাবে প্রচার করিবেন।

বঙ্গীয়সাহিত্যে বঙ্কিমবাবু এমন কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন নাই, যাহা তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় প্রতিভাতে আলোকিত হয় নাই। তিনি যে মাসিকপত্র বাহির করিয়াছিলেন, তেমন জ্ঞানগর্ভ, সুদূরদর্শী, তেমন লীলাময়-বিশুদ্ধরহস্যপূর্ণ, তেমন মনোমদ মাসিক-পত্র অদ্যাপি কেহ বাহির করিতে পারেন নাই। তাঁহার সমালোচনায় স্থানে স্থানে কিছু অসঙ্গতিবোধ হইলেও, অদ্যাপি তাঁহার ন্যায় সমালোচক বঙ্গে দুর্লভ—উপন্যাসে তিনি নূতন পথপ্রদর্শক এবং অদ্যাপি বঙ্গীয় ঔপন্যাসিককুলতিলক; উপন্যাসগুলিতে অপূর্ব্ব সৃষ্টিক্ষমতা ও অতুলনীয় কৌতূহলো-দ্দীপকতা পরিলক্ষিত হয়। আকাশ যেমন নক্ষত্ররাজিতে সমুজ্জল, বঙ্কিমবাবুর উপন্যাস-গুলি তেম্‌নি কবিত্বরত্নে প্রদীপ্ত। ধর্ম্মসম্বন্ধে বঙ্কিমবাবু যে সকল গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহাতেও তাঁহার পরিপক্ক পাণ্ডিত্য, গভীর চিন্তা ও সূক্ষ্মদৃষ্টি পরিলক্ষিত হয়। তিনি তাঁহার 'আনন্দমঠে' উপন্যাসচ্ছলে স্বদেশের জন্য রাজনীতির যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা আমরা যতই মনঃসংযোগপূর্ব্বক অধ্যয়ন করিব, ততই তাহাতে জ্ঞানলাভ করিতে পারিব এবং স্বদেশের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্যপালনে সমর্থ হইব।

সংক্ষেপে বঙ্কিমবাবু বঙ্গসাহিত্যে সম্রাট্ ছিলেন।

অদ্য আমি তাঁহার উপন্যাসের সমালোচনা করিব না, তাঁহার ধর্ম্মগ্রন্থের দোষগুণের কথাও কিছু বলিব না, তাঁহার গদ্যরচনা-রীতিও আলোচনা করিব না, তাঁহার আনন্দ-মঠে নিহিত গভীরতত্ত্বও পর্য্যালোচনা করিব না। অদ্য কেবল তাঁহার স্বদেশীভাবসম্বন্ধে দুইএকটা কথা বলিব। কেন না, বর্ত্তমান সময়ে স্বদেশীভাবের এক মহাতরঙ্গ আমাদের হৃদয়কে অতর্কিতভাবে আলোড়িত করিয়াছে।

আমার বিবেচনায় বঙ্কিমবাবু স্বদেশী-ভাবের একজন আদিনেতা।

এমন একদিন আসিয়াছিল, যখন আমরা সহসা বিদেশীয় সভ্যতার আবর্ত্তে নিক্ষিপ্ত হইয়া স্বদেশকে একেবারে ভুলিয়া গিয়া-ছিলাম। তখন, আমরা রাজনৈতিক স্বাধী-নতার সহিত, মানসিক ও নৈতিক স্বাধীনতা বিক্রয় করিয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিয়াছিলাম। ইংরেজ যখন ভারতে তাহার শেক্‌স্‌পীয়ার ও মিল্‌টন্, বেকন্ ও নিউটন্, বর্ক ও মিল্, পিট্ ও শেরিডান্, বাইরন্ ও শেলী ব্রাণ্ডি ও শ্যাম্‌পেনের সহিত প্রচার করিল, তখন ভারত মজিল, তখন যেন ভারতচিত্তভৃঙ্গ শ্বেতপাদপদ্মের মধুপান-বিভোর হইল। তখন ভারত ভাবিল, এতদিন পরে অন্ধকার হইতে আলোকে আসিলাম; এতদিন পরে ইংরেজকৃপায় কুসংস্কারকূপ হইতে ভারতমাতার উদ্ধার হইল; এতদিন

পরে কদলীঘৃততণ্ডুললোলুপ ধূর্ত্ত ধর্ম্মযাজক ব্রাহ্মণদের হস্ত হইতে নিস্তার পাইয়া,—মূঢ় মনু, পাষণ্ড পরাশর, জঘন্য যাজ্ঞবল্ক্যের শাসনশৃঙ্খল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া, জ্ঞানের নভোমণ্ডলে উড্ডীন হইয়া, নৈতিক স্বাধীনতার বিমলানন্দ অনুভব করিলাম। ইংরেজিশিক্ষিত হিন্দুর মনের ভাব তখন এইরূপ।

তখন শিক্ষিত ভারতের এমন এক শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইল যে, সে মনে করিল, ভালমন্দ বিচার করার জন্য আয়াসস্বীকারের আর প্রয়োজন নাই—কেন না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে, যাহা বিলাতী তাহাই ভাল, যাহা স্বদেশী তাহাই মন্দ। যথা—আয়ুর্ব্বেদসম্মত চিকিৎসাপ্রণালী স্বদেশী, সুতরাং তাহা মন্দ। কুইনাইন ও এরণ্ডতৈল ইংরেজি চিকিৎসাপদ্ধতির অনুমোদিত, কাজেই জ্বরে তাহা প্রচুরপরিমাণে সেব্য। গোমাংসভোজন ও মদ্যপান হিন্দুশাস্ত্রে নিষিদ্ধ, কিন্তু ইংরেজ গোখাদক ও মদ্যপায়ী, অতএব ভারতবাসীর গোখাদক ও মদ্যপায়ী হওয়া সর্ব্বতোভাবে যুক্তিসঙ্গত। ইংরেজসমাজে একান্নবর্ত্তিপরিবারপ্রথা প্রচলিত নাই, সেজন্য joint family একটা damned institution এবং সদ্য পরিত্যাজ্য। ইংরেজ বর্ণভেদ মানে না,—হাড়িমেতর খানা পাকাইলে তাহা ভোজন করে, সুতরাং হিন্দুকে সুসভ্য হইতে হইলে হাড়িমেতরের হস্তে অন্নগ্রহণ করিতে হইবে। হিন্দু প্রণাম করে, সাহেব shakehand করে, সুতরাং shakehand করাই সভ্যতার লক্ষণ—তখনকার সভ্যতার মন্ত্র হইল—"খাও ব্র্যাণ্ডি-বীফ, হাঁকাও বগি"।

ইংরেজিশিক্ষার প্রারম্ভে এইরূপ মোহ ভারতবর্ষীয় হৃদয়কে অভিভূত করিয়াছিল। তখন ইংরেজিসভ্যতামদমত্ত ভারত যাহাই স্বদেশী, তাহাই চূর্ণবিচূর্ণ করিতে লাগিল। তখন ইংরেজিতে অশিক্ষিত প্রাচীন হিন্দুগণ নব্যভারতের সামাজিক কালাপাহাড়গণের উপদ্রবে শঙ্কিত, মর্ম্মাহত হইয়া, নেত্র নিমীলিত করিয়া, ইষ্টদেবতার নামজপ করিতে লাগিলেন। কেহ বা মনে করিতে লাগিলেন, বুঝি বা পূর্ণ কলির আবির্ভাব হইয়াছে, কেহ বা ভাবিলেন যে, যথেচ্ছাচারের মহাপ্লাবনে হিন্দুসমাজ বুঝি ভাসিয়া গেল।

কিন্তু কিছুকাল পরেই, কোন কোন ব্যক্তি, চিন্তাশীলতাবশত হউক, অথবা স্বেচ্ছাচারের অবসাদবশত হউক, অথবা মদ্যপানাদি-অত্যাচারজনিত-স্বাস্থ্যভঙ্গবশতই হউক অথবা আঘাতপ্রতিঘাতের সাধারণনিয়মক্রমেই হউক—কোন কোন ব্যক্তি ভাবিতে লাগিলেন যে, যাহা স্বদেশে ছিল তাহা স্বদেশের উপযোগী, যাহা বিদেশ হইতে লইয়াছি তাহার অধিকাংশ হয় ত এদেশের উপযোগী নহে,—অথবা আদৌ ভাল নহে। হতভাগ্য কুসন্তান মোহে পড়িয়া যেমন পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া পরে নিজের দুষ্ক্রিয়ানিবন্ধন অনুতপ্ত হইয়া পিতৃগৃহে প্রত্যাগমন করিবার জন্য ব্যাকুল হয়, তেম্‌নি কোন কোন ইংরেজিশিক্ষিত বঙ্গবাসী স্বদেশী আচার ও ধর্ম্মে প্রত্যাগমনের নিমিত্ত উৎসুক হইলেন। এদিকে মোক্ষমুলর, গোল্‌ড্‌ষ্টুকার প্রভৃতি ইউরোপীয় সংস্কৃতজ্ঞপণ্ডিতগণ প্রাচীনভারতের সাহিত্যদর্শনাদি অধ্যয়ন করিয়া প্রাচীনভারতের মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তখন ইংরেজিশিক্ষিত বঙ্গবাসীর চৈতন্যোদয়

হইতে লাগিল এবং কেহ কেহ প্রাচীন-ভারতের কীর্ত্তিকলাপ ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিবার কিছু-কিছু চেষ্টাও করিলেন।

এটি ইংরেজের ভাল লাগিল না, বলা বাহুল্য। তাই চল্লিশবৎসর পূর্ব্বে Sir. H. Sumner Maine বক্তৃতাতে Senateএ বলিয়াছিলেন—It is not to be concealed, and I see plainly that educated Natives do not conceal from themselves, that they have, by the fact of their education, broken for ever with much in their history, much in their customs, much in their creed. Yet I constantly read, and sometimes hear, elaborate attempts on their part to persuade themselves and others, that there is sense in which these rejected portions of native history, and usage and belief, are perfectly in harmony with the modern knowledge which the educated class has acquired, and with the modern civilization to which it aspires. Very possibly, this may be nothing more than a mere literary feat, and a consequence of the over-literary education they receive. But whatever the cause, there can be no greater mistake, and, under the circumstances of this country, no more destructive mistake. সংক্ষেপে মহাবিজ্ঞ শ্রীযুক্ত মেন্‌সাহেব বিবেচনা করেন, বঙ্গবাসী ভারতের প্রাচীনগৌরবে যে বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত ভ্রমাত্মক, সেই ভ্রম নিতান্ত সাংঘাতিক। এমন কি, শ্রীযুক্ত মেন্‌সাহেব নব্যভারতবাসিগণসম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে, their real affinities are with Europe and the Future, not with India and the Past, অর্থাৎ মেন্ বলেন, ভারতের অতীত ইতিহাসের গৌরব-কাহিনী ছাড়িয়া দাও, তোমাদের ভাবী মঙ্গলের জন্য ইউরোপের উপর নির্ভর কর। যখন কোমল স্বদেশীভাব ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হইতেছিল এবং দৃপ্ত বিদেশীয় সভ্যতা তাহা পদদলিত করিবার চেষ্টা করিতেছিল, এমনসময় স্বর্গীয় ভূদেব, বঙ্কিম ও রাজনারায়ণ বঙ্গীয়সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন এবং স্বদেশীভাব পোষণ করিতে লাগিলেন।

প্রতিভাশালী বঙ্কিম এই স্বদেশী সাহিত্য-ক্ষেত্রে এমন কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিলেন, যাহার স্বর্ণশস্য শিক্ষিত বঙ্গবাসিগণ এক্ষণে সংগ্রহ ও উপভোগ করিতেছেন।

এই কৃষির প্রথম ফসল স্বদেশীভাষার উন্নতি।

বঙ্কিমবাবু যখন বাঙ্‌লা লিখিতে আরম্ভ করিলেন, তখন মাতৃভাষার কিরূপ দুর্দ্দশা ও অনাদর ছিল, তাহা বঙ্কিমবাবুর মুখেই শ্রবণ করুন।—

"যাঁহারা বাঙ্গালাভাষায় গ্রন্থ বা সাময়িক-পত্র" প্রচারে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহাদিগের বিশেষ দুরদৃষ্ট। তাঁহারা যত যত্ন করুন না কেন, দেশীয় কৃতবিদ্যসম্প্রদায় প্রায়ই তাঁহাদিগের রচনাপাঠে বিমুখ। ইংরাজি-

প্রিয় কৃতবিদ্যগণের প্রায় স্থির জ্ঞান আছে যে, তাঁহাদিগের পাঠের যোগ্য কিছুই বাঙ্গালাভাষায় লিখিত হইতে পারে না। তাঁহাদের বিবেচনায় বাঙ্গালাভাষার লেখক-মাত্রই হয় ত বিদ্যাবুদ্ধিহীন, লিপিকৌশল-শূন্য; নয় ত ইংরাজিগ্রন্থের অনুবাদক।"

বঙ্কিমবাবু এইরূপ দুঃখ করিয়া পরে বঙ্গবাসিগণের নিকট তাঁহার অতুলনীয় ভাষায় নিতান্ত সত্য তথ্য বিজ্ঞাপন করিয়াছিলেন যে—

"আমরা যত ইংরাজি পড়ি, যত ইংরাজি কহি বা যত ইংরাজি লিখি না কেন, ইংরাজি কেবল আমাদিগের মৃতসিংহের চর্ম্মস্বরূপ হইবে মাত্র। ডাক ডাকিবার সময় ধরা পড়িব।

* * *

"নকল ইংরাজ অপেক্ষা খাঁটি বাঙ্গালী স্পৃহণীয়। ইংরাজিলেখক, ইংরাজিবাচক সম্প্রদায় হইতে নকল ইংরাজ ভিন্ন কখন খাঁটি বাঙ্গালীর সমুদ্ভবের সম্ভাবনা নাই। **যতদিন না সুশিক্ষিত জ্ঞানবন্ত বাঙ্গালীরা বাঙ্গালাভাষায় আপন উক্তিসকল বিন্যস্ত করিবেন, ততদিন বাঙ্গালীর কোন উন্নতির সম্ভাবনা নাই।"** এই ধ্রুবসত্য বঙ্কিমবাবু ঘোষণা করিয়া দিয়া গিয়াছেন। তিনি আক্ষেপের সহিত বলিয়াছিলেন যে—

"এ কথা কৃতবিদ্য বাঙ্গালীরা কেন যে বুঝেন না; তাহা বলিতে পারি না। যে উক্তি ইংরাজিতে হয়, তাহা কয়জন বাঙ্গালীর হৃদয়ঙ্গম হয়? সেই উক্তি বাঙ্গালায় হইলে কে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারে? যদি কেহ মনে করেন যে, সুশিক্ষিত-দিগের উক্তি কেবল সুশিক্ষিতদিগেরই বুঝা প্রয়োজন, সকলের জন্য সে সকল কথা নহে, তবে তাঁহারা বিশেষ ভ্রান্ত। সমস্ত বাঙ্গালীর উন্নতি না হইলে দেশের কোন মঙ্গল নাই।

"সমস্ত দেশের লোক ইংরাজি বুঝে না, কস্মিন্ কালে বুঝিবে, এমত প্রত্যাশা করা যায় না। সুতরাং বাঙ্গালায় যে কথা উক্ত না হইবে, তাহা তিনকোটি বাঙ্গালী কখন বুঝিবে না, বা শুনিবে না, এখনও শুনে না, ভবিষ্যতে কোনকালেও শুনিবে না। যে কথা দেশের সকল লোকে বুঝে না, বা শুনে না, সে কথায় সামাজিক বিশেষ কোন উন্নতির সম্ভাবনা নাই।"

দেখুন, বঙ্কিববাবুর এই সকল কথাতে তাঁহার স্বদেশীভাব কেমন বুঝা যাইতেছে। আমরা বেশ দেখিতে পাইতেছি যে, তাঁহার স্বদেশীভাবের পবিত্র নির্ঝর হইতে তাঁহার মাতৃভাষাসেবা, বঙ্গভাষায় রচিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধ-পরম্পরা নিঃসৃত হইয়াছিল। বঙ্কিমবাবুর স্বদেশ, জনকতক ইংরেজিশিক্ষিত লোক লইয়া নহে। তিনকোটি লোক তাঁহার স্বদেশ,—তিনকোটি লোকের শিক্ষার বিষয় মনে করিয়া তিনি বাঙ্লা লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয় তিনকোটি স্বদেশবাসীকে মাতৃ-ভাষায় সম্ভাষণ ও আলিঙ্গনকরণার্থ পিপাসু হইয়াছিল।

এইহেতু ইংরেজিভাষায় বঙ্কিমবাবুর অসাধারণ দখল থাকা সত্ত্বেও তিনি ইংরেজি-রচনাতে যশোলাভ করার কুহকে মজেন নাই, মাতৃভাষাসেবাপরাঙ্মুখ হন নাই। সত্য বটে, তিনি বাল্যে Rajmohan's Wife নামক

একখানি ইংরেজি উপন্যাস লিখিয়াছিলেন, মধুসূদনও প্রথমে The Captive Lady নামক একখানি কাব্য ইংরেজিতে রচিয়াছিলেন; কিন্তু দুইজনই অসামান্য-ধীশক্তিসম্পন্ন। দুইজনেই শীঘ্রই স্বস্ব ভ্রম বুঝিয়া স্বদেশীভাষাতে জীবন উৎসর্গ করিলেন। একজন বঙ্গভাষায় নব গদ্যে অমৃত ঢালিলেন, আর একজন নূতন পদ্যে অপূর্ব্ব 'মধুচক্র' রচনা করিলেন। সাহেবিয়ানামুগ্ধ মধুসূদন প্রথমে—

> পরধনলোভে মত্ত, করেন ভ্রমণ
> পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি—
> পরে পাইলেন কালে
> মাতৃভাষারূপ খনি, পূর্ণ মণিজালে।

বঙ্কিমবাবু বাল্যকালের পর আর "পরধনলোভে মত্ত" হন নাই, অল্পবয়সেই তিনি মাতৃভাষারূপ খনি হইতে মণিজাল আহরণ করিয়াছেন। আমি অন্যত্র বলিয়াছি, এখানেও আবার বলি, মাতৃভাষা জাতীয়হৃদয়ে প্রবেশ করিবার একমাত্র পথ, আপামর সাধারণের কর্ণস্বরূপ। মার কোলে বসিয়া মার মাইয়ের দুধ খাইতে খাইতে যে ভাষায় মার মধুমাখা কথা শুনিয়াছেন, জনকের মাঙ্গল্যগম্ভীর উপদেশ যে ভাষায় শুনিয়াছেন, ভগ্নী কোমল-কমনীয় স্মিতসম্ভাষণে যে ভাষায় হৃদয়ে আলোক ছড়াইয়াছিল, প্রিয়ার প্রাণারাম প্রণয়পুষ্পাঞ্জলি যে ভাষায় দয়িত-চরণে নিবেদিত, যন্ত্রণায় প্রাণ ছট্‌ফট্ করিলে যে ভাষায় ভগবান্‌কে ডাকি, ভবলীলার অবসানে গঙ্গাসৈকতশায়ী হইলে যে ভাষায় পতিতপাবনের নাম হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হয়,—জীবনে-মরণে, বাল্যে-বার্দ্ধক্যে, প্রণয়ে-শোকে, উৎসবে-বিপদে যে ভাষা প্রাণে প্রাণে মিশ্রিত—সেই মাতৃভাষা; সেই চিরপ্রিয়া, সেই চিরপূতা, সেই চিরপূজনীয়া, সেই নিরুপমা মাতৃভাষা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠভাষা আর কি হইতে পারে? স্বদেশকে উন্নত করিবার, স্বদেশকে মাতাইবার এমন শক্তি আর কিসের আছে? স্বদেশপ্রেমও যখন প্রতিভার সহিত মিশ্রিত হয়, তখন আপনা-আপনি মাতৃভাষার কোলে গড়াইয়া পড়ে এবং স্বজাতীয় সাধারণ লোকের গলা জড়াইয়া প্রাণ খুলিয়া আলাপ করে। বঙ্কিমবাবু তাহাই করিয়াছিলেন।

বঙ্কিমবাবু কেবল উচ্চশ্রেণীর লোক লইয়া বিব্রত হন নাই। মূর্খ দীনদরিদ্র স্বদেশীয়দের জন্য তিনি যেমন ভাবিয়াছিলেন, তিনি যেমন লিখিয়াছিলেন, তেমন আর কয়জন বাঙালী লিখিয়াছেন, কয়জন বাঙালী ভাবিয়াছেন। বঙ্কিমবাবু বেশ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন যে, দীনদরিদ্র সাধারণ লোকের উন্নতি না হইলে স্বদেশের প্রকৃত উন্নতি কদাপি হইবে না। এ বিষয়ে তাঁহার অতি সারবান্ কথা উদ্ধৃত করিলাম—

"প্রধান কথা এই যে, এক্ষণে আমাদিগের উচ্চশ্রেণী এবং নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে পরস্পর সহৃদয়তা কিছুমাত্র নাই। উচ্চশ্রেণীর কৃতবিদ্য লোকেরা মূর্খ দরিদ্রলোকদিগের কোন দুঃখে দুঃখী নহেন। * * এরূপ কোন দেশ হয় নাই যে, ইতরলোকে চিরকাল এক অবস্থায় রহিল, ভদ্রলোকদিগের অবিরত শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। বরং যে যে সমাজের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে, সেই সেই সমাজে উভয় সম্প্রদায় সমকক্ষ, বিমিশ্রিত এবং সহৃদয়তাসম্পন্ন। যতদিন

এই ভাব ঘটে নাই—যতদিন উভয়ে পার্থক্য ছিল, ততদিন উন্নতি ঘটে নাই। যখন উভয় সম্প্রদায়ের সামঞ্জস্য হইল, সেইদিন হইতে শ্রীবৃদ্ধি-আরম্ভ। রোম, এথেন্স, ইংলণ্ড এবং আমেরিকা ইহার উদাহরণস্থল।" বঙ্কিমবাবু এখানে দেখাইলেন যে, ভদ্রলোক এবং ইতরলোকের মঙ্গল অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্বদ্ধ।

কিন্তু তিনি কেবলমাত্র উভয়ের দৃঢ় সম্বন্ধ দেখাইয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারেন নাই। স্বদেশের ইতরলোকের অর্থাৎ অধিকাংশ লোকের অবস্থা কি, তাহা তিনি পর্য্যালোচনা করিয়াছেন; পর্য্যালোচনা করিয়া তাঁহার স্বদেশপ্রেম ব্যথিত হইয়াছে, ব্যথিত হইয়া তাঁহার কোমলহৃদয় নিপীড়িত নিরক্ষর স্বদেশীগণের জন্য দেশের শিক্ষিত-লোকের নিকট করুণ-আবেদন করিয়াছে। সাধারণলোকের শোচনীয় অবস্থার উন্নতির জন্য বঙ্কিমবাবু যে পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা অনুসরণ করিয়া, সাধারণশিক্ষার নিশান ধরিয়া, যদি এক্ষণে আমরা পবিত্র অভিযানে নির্গত হই, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিব। কেন না, আজ সহসা মরা গাঙে বান ডাকিয়াছে, স্বদেশীভাবের জোয়ার আসিয়াছে। স্বদেশ-প্রেমিক নাবিকগণ, এখন একবার "হরি হরি" বোল দিয়া, একবার "বন্দে মাতরং" বলিয়া, নৌকা খুলিয়া দিন। জোয়ারের টানে সন্‌সন্‌ করিয়া দূরস্থ গ্রামে সত্বর পৌঁছিবেন। সেখানে নিরক্ষর দীনদরিদ্র কৃষকগণ আপনাদের বোঝাই নৌকার প্রতীক্ষা করি-তেছে। তাহারা জ্ঞানের জন্য ক্ষুধার্ত্ত, আপনাদের প্রেমের জন্য পিপাসু। সেখানে গিয়া গরিব স্বদেশীদিগকে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করুন; তাহাদের অশ্রুমোচন করুন; তাহা-দের সহস্রদুঃখজর্জ্জরিত প্রাণকে, তাহা-দের নিত্য-আতঙ্ক-কম্পিত জীবনকে আশ্বা-সিত করুন; তাহাদিগকে এমন শিক্ষা ও জ্ঞান দিন, যাহাতে তাহারা দারিদ্র্যদুঃখ হইতে আপনিই নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারিবে। এমন জ্ঞান দিন, যাহাতে তাহারা নিজের স্বার্থ, নিজের স্বত্ব বুঝিতে পারিবে; স্বদেশ যে কি, তাহা বুঝিতে পারিবে; ভগবান্‌ মনুষ্যমাত্রকে যে অধিকার দিয়াছেন, সে অধিকার লাভ করিতে পারিবে।

যে সকল দরিদ্র স্বদেশীব্যক্তি গ্রামে গ্রামে আপনাদিগকে প্রতীক্ষা করিতেছে এবং আমি এখানে যাহাদিগকে প্রধানত লক্ষ্য করিতেছি, বঙ্কিমবাবু তাহাদিগকে ভুলিয়া যান নাই।

আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক কৃষক, তাহা বলা বাহুল্য। এই কৃষকসম্প্র-দায়ের উপকার করিতে হইলে, পাছে এমন কোন কথা বা কাজের অবতারণা করিতে হয়, যাহাতে ধন ও ক্ষমতাশালী জমিদারসম্প্র-দায়ের অসন্তোষ হইতে পারে, বোধ হয় যেন এই আশঙ্কায় অধিকাংশ লেখক ও বক্তা এ বিষয়ে কিছু বলিতে চাহেন না। কিন্তু বঙ্কিম-বাবুর হৃদয়ে খাঁটি স্বদেশীভাব ছিল, তাই তিনি জমিদারগণের অসঙ্গত অসন্তোষের আশঙ্কায় কর্ত্তব্যসাধন হইতে নিরস্ত হন নাই। তাই তিনি বলিয়াছিলেন যে—

"আমরা জমীদারের দ্বেষক নহি, কোন জমীদারকর্ত্তৃক আমাদিগের অনিষ্ট হয় নাই। বরং অনেক জমীদারকে আমরা বিশেষ

প্রশংসাভাজন বিবেচনা করি। * * জমীদারেরা বাঙালীজাতির চূড়া, কে না তাঁহাদিগের প্রীতিভাজন হইবার বাসনা করে?” কিন্তু “বঙ্গীয় কৃষকেরা নিঃসহায়, মনুষ্যমধ্যে নিতান্ত দুর্দ্দশাপন্ন, এবং আপনাদিগের দুঃখ সমাজের মধ্যে জানাইতেও জানে না। যদি মূকের দুঃখ দেখিয়া একবার বাক্যব্যয় না করিলাম, তবে মহাপাপ স্পর্শে। * * * যে কণ্ঠ হইতে কাতরের জন্য কাতরোক্তি নিঃসৃত না হইল, সে কণ্ঠ রুদ্ধ হউক, যে লেখনী আর্ত্তের উপকারার্থে না লিখিল, সে লেখনী নিষ্ফলা হউক।”

এইরূপ দৃঢ়তার সহিত কর্ত্তব্যপালনে বদ্ধপরিকর হইয়া বঙ্কিমচন্দ্র কৃষকদের দুঃখপরম্পরা “বঙ্গদেশের কৃষক” শীর্ষক প্রবন্ধাবলীতে তাঁহার অতুলনীয় বর্ণনাশক্তিদ্বারা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু বঙ্গদেশের শিক্ষিতসমাজ তাহা অনুকূলভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন, বলিতে পারি না। বরঞ্চ “সমাজদর্পণ” নামে একখানি সংবাদপত্রে তাহা প্রতিকূল ভাবে সমালোচিত হইয়াছিল। কৃষকদের অবস্থা মন্দ, তাহাদের উপর অত্যাচার হয়, এ কথা প্রকাশ করিলে দশশালার বন্দোবস্ত রহিত হইতে পারে, এইরূপ আশঙ্কা আছে, তজ্জন্য বঙ্কিমবাবুর ঐরূপ প্রবন্ধ লেখা উচিত হয় নাই, এইরূপ মন্তব্য ঐ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। আমি নিজেও যখন কৃষকদের দুরবস্থাসম্বন্ধে লিখি, তখন দশশালার বন্দোবস্ত রহিত করিবার জন্য আমরা প্রয়াসী, গবর্মেণ্ট পাছে এই কথা অন্যায়পূর্ব্বক বলেন, তজ্জন্য শঙ্কিত হই। কৃষকদের অবস্থা বঙ্গীয় জমিদারের অধীন থাকিয়া যতই মন্দ হউক, তাহা গবর্মেণ্টের খাসমহলের প্রজার অবস্থা অপেক্ষা মন্দ নহে, তাহা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। এবং যদি কখন দশশালার বন্দোবস্ত রহিত হয়, আর প্রজাগণ গবর্মেণ্টের খাসমহলের অন্তর্গত হয়, তাহা হইলে তাহাদের আরও দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। কিন্তু আমরা কাগজে লিখি আর না লিখি, প্রজাদের যে দুঃখ ও দুরবস্থা, তাহা গবর্মেণ্ট নিত্য দেখিতে পাইতেছেন। যেস্থলে গবর্মেণ্টের নিজের আয়ের কোন ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই, সেস্থলে গবর্মেণ্টের প্রজাবাৎসল্য দুর্দ্দমনীয় হওয়া আশ্চর্য্য নহে। সুতরাং যদি জমিদারগণ দশশালা বজায় রাখিতে চান, তাহা হইলে তাঁহাদের পক্ষে প্রজাবর্গের উন্নতি করা যুক্তিসঙ্গত।

বঙ্কিমবাবু বঙ্গীয় কৃষকদের দুঃখমোচনার্থ জমিদারসম্প্রদায়ের নিকট,—ব্রীটিশ ইণ্ডিয়ান্ এসোশিয়েশনের নিকট তাঁহার প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন। আমিও জমিদারগণের নিকট বরাবর প্রার্থনা করিয়া আসিয়াছি, অদ্যও করিতেছি। আর প্রার্থনা করিতেছি, স্বদেশীভাবপূত শিক্ষিতব্যক্তিগণের নিকট।

স্বদেশী কাপড় যেমন আমাদের স্বদেশীভাবের কার্য্যক্ষেত্র হইয়াছে, স্বদেশী সাধারণলোকদের শিক্ষাও যেন তেমনি আমাদের স্বদেশীভাবের কার্য্যক্ষেত্র হয়। এক্ষণে সাধারণ গরিবলোকের এবং ভদ্রলোকের মধ্যে এমন একটি দূরতা ঘটিয়াছে, স্বদেশীজন যেন বিদেশী হইয়া গিয়াছে। যতদিন স্বদেশীকৃষকগণকে ও সাধারণ দরিদ্র মূর্খজনকে স্বজন বলিয়া অনুভব না করিতে পারিবেন, স্নেহে

তাহাদিগকে ক্রোড়ে টানিতে না পারিবেন, ততদিন আপনাদের স্বদেশী চেষ্টা কখনই ফলবতী হইবে না। যদি ৺বঙ্কিমের স্বদেশীভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া এই শিক্ষাদানে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে 'বন্দে মাতরং' ধ্বনি সার্থক হইবে, তাহা হইলে 'বন্দে মাতরং' সঙ্গীত যুগপৎ কোটিকণ্ঠ হইতে গম্ভীরস্বরে স্বর্গের দিকে উত্থিত হইয়া বঙ্গে মঙ্গলময় কার্য্য বর্ষণ করিবে, এবং আপনাদের স্বদেশ, যাহা এক্ষণে স্বপ্নবৎ বোধ হইতেছে, তাহা বাস্তব-জগতে দেখিতে পাইবেন। তাই আবার বলি, মরা গাঙে বান ডাকিয়াছে, ভাইসকল, এই সুযোগে 'বন্দে মাতরং' বলিয়া নৌকা খুলিয়া দিন।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায়।

আসেসার।

১

রঘুনাথপুর মুঙ্গেরজেলার অন্তর্গত একটি মধ্যবিৎ-গোছের গণ্ডগ্রাম। রঘুনাথপুরের বাহ্যদৃশ্য মনোহর এবং তাহার আভ্যন্তরীণ অবস্থাও উত্তম। সুনির্ম্মলধারাশালিনী গিরি-নির্ঝরিণী তাহার শস্যশ্যামল প্রান্তর দ্বিধা বিভিন্ন করিয়া চলিয়াছে। অদূরে বৃক্ষরাজি-খচিত শৈলশ্রেণী সূর্য্যকরে তাহার কিরীটবৎ প্রতিভাত হইতেছে। সচ্ছলতাজনিত মধুর সন্তোষ গ্রামের ছোট-বড় অধিবাসীদের প্রসন্ন মুখশ্রীতে দেদীপ্যমান।

এই ক্ষুদ্র গ্রামের উপর বাবু বিন্ধ্যেশ্বরী-প্রসাদ তেওয়ারির অসাধারণ প্রভুত্ব। তেওয়ারিজি গ্রামের জমিদার নহেন—সাধারণ সম্পন্ন গৃহস্থমাত্র। কেবল তাঁহার কোমল হৃদয়, বিনীত ব্যবহার, সর্ব্বত্রগামিনী সমবেদনা তাঁহার জন্য এই রাজোচিত মর্য্যাদা অর্জ্জন করিয়াছে। গ্রামের মধ্যে যে-কোন ব্যক্তির যে-কোন বিপদ্-আপদ্ উপস্থিত হইলে তেওয়ারিজি প্রাণ দিয়া সাহায্য করিয়া থাকেন। যেখানে অসহায় রোগী রোগ-যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করে, যেখানে অর্থহীন গৃহস্থ জমিদারের অনুচরবর্গের দ্বারা উৎপীড়িত, যেখানে কলহের সুতীক্ষ্ণ তরবারি প্রেমের বন্ধন ছেদন করিতে উদ্যত, সেখানেই তেওয়ারিজি চন্দনচর্চ্চিত বিশাল ললাট, স্নেহ-করুণাবিমণ্ডিত উজ্জ্বল নয়নদ্বয় এবং সদাপ্রফুল্ল বদনমণ্ডল লইয়া উপস্থিত হন।

কিন্তু তেওয়ারিজি শেষবয়সে এই বহু-ক্লেশলব্ধ অখণ্ড লোকানুরাগ হারাইতে বসিলেন। ১৩০৫ সালের আশ্বিনমাসে গ্রামের প্রভুত্বপ্রয়াসী এক প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী আপনার অসাধারণ ক্ষমতার উপর দৃঢ়নির্ভর করিয়া গজেন্দ্রবিক্রমে রঘুনাথপুরের লোকহৃদয় আক্রমণ করিল। লালা জগদম্বী সহায়ের দশনরাজি "দ্বিরদরদে"র অনুকরণ না করিলেও তাহার দীর্ঘবিলম্বিত গুম্ফরাজি সে অভাব পূরণ করিয়াছিল এবং তাহার কোটরগত

রক্তচক্ষু ও মসীবর্ণ বিশালোদর গজরাজকে নিরন্তর বিদ্রূপ করিত।

লালাজির পূর্ব্ববৃত্তান্ত আবিষ্কার করিতে অনেক সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎকেও গলদঘর্ম্ম হইতে হইয়াছিল, সুতরাং সেই দুরূহ তত্ত্ব-নিরূপণ হইতে নিবৃত্ত থাকিয়া আমরা কেবল তাঁহার "ব্যক্ত" অংশটুকুরই আলোচনায় ব্যাপৃত থাকিব।

২

লালাজির আগমনের দুইমাস পূর্ব্ব হইতে গ্রামে একটা হুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল। গ্রামের প্রান্তভাগে জমিদারবাবুদের পরিত্যক্ত এক ভগ্নপ্রায় 'বাংলা' বহুদিন হইতে পড়িয়া আছে। সহসা একদিন প্রাতঃকালে গ্রামবাসিগণ দেখিল, হরিদ্বর্ণ-উষ্ণীষ-শোভিত স্থূলোদর দ্বারবান্‌জির অধীনে বহুসংখ্যক লোকজন উক্ত গৃহের সংস্কারসাধনে নিরত হইয়াছে। কৌতূহলপরায়ণ দুইএকজন গ্রামবাসী দ্বারবান্‌জিকে জিজ্ঞাসা করিয়া সসম্ভ্রমে শুনিল, "বড়া ভারি" এক "বাবুসাহেব" রঘুনাথপুরে বাস করিবার অভিপ্রায়ে উক্ত বাংলা খরিদ করিয়াছেন। দুই মাসে গৃহের সংস্কারকার্য্য সুসম্পন্ন হইলে গ্রামবাসিগণ উৎকণ্ঠিতচিত্তে দিনের পর দিন "বাবুসাহেবে"র আগমন-প্রতীক্ষায় বিনিদ্র রজনী এবং শান্তিহীন দিবস কোনরূপে অতিবাহিত করিতে লাগিল।

অবশেষে একদিন অপরাহ্নে জনসাধারণের শুষ্কপ্রায় আশালতা সফল করিয়া এক "জরি"-খচিত-রক্তবর্ণ-সালুমণ্ডিতা এবং সিপাহী-অনুগামিনী শিবিকা রঘুনাথপুরের গ্রাম্য-পথপ্রান্তে দর্শন দিল।

কালিদাস জীবিত থাকিলে লিখিতেন, সেদিন শরতের রবিকররঞ্জিত মধুর গোধূলিতে শিবিকাশোভী "বাবুসাহেবে"র শ্রীমূর্ত্তিদর্শন-ব্যগ্রতায় কত কুলবধূর বেণীবন্ধন অসমাপ্ত রহিয়া গিয়াছিল, কত রূপসীর প্রাণঘাতিনী কজ্জলরেখা এক চক্ষুতেই পরিসমাপ্ত হইয়াছিল, কত ভূষণগর্ব্বিতার স্বর্ণাঞ্চল ধূলায় ধূসরিত হইয়াছিল, ইত্যাদি ইত্যাদি।

৩

লালাজির রঘুনাথপুরপ্রবেশের পর তিনদিন অতীত হইয়াছে। তাঁহার অগাধ ঐশ্বর্য্য এবং রাজদরবারে অসীম ক্ষমতার কথা ইতিমধ্যেই চাটুকারমণ্ডলীর মুখে-মুখে পল্লি-বাসীর কর্ণবিবর পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছে। লালাজি ছদ্মবেশী মহারাজা অথবা সরকার-বাহাদুরের.. গন্ডচর্ম্মাবৃত পশুরাজস্বরূপ কোন গুপ্ত কর্ম্মচারী, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া জনমণ্ডলী ভয়ে ও বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া এ কয়দিন আপনাপন অবসরকাল লালাজির দ্বারপ্রান্তেই বসিয়া কাটাইয়াছে। আজ প্রভাতের রবিরশ্মিরঞ্জিত পূর্ব্বদ্বারী বারান্দায় লালাজির দরবার বসিয়াছে। সতরঞ্চি-মণ্ডিত হর্ম্ম্যতলে সাটিনশোভিত উপাধান-বেষ্টনের মধ্যস্থলে উচ্চ গদীতে লালাবাবু আসনগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার স্বভাব-রক্তিম লোচনযুগল নিদ্রাপাশ হইতে সদ্যোমুক্তি লাভ করিয়া "জবাকুসুমসঙ্কাশ"-মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, বিচিত্রবর্ণ-"লেস্" শোভিত গোলাপী বর্ণের রেশমী পাঞ্জাবীর অভ্যন্তর হইতে তাঁহার বিশাল উদরের ক্ষীণ বর্ণচ্ছটা রক্তকমল-দলাভ্যন্তরস্থ ভ্রমরশোভার অনুকরণ করিতেছে বহুযত্নসংস্কৃত গ্রীবাচ্ছাদী কেশকলাপের উপর বামে হেলান জরির শিরস্ত্রাণ কাদম্বিনী-

শিরঃশোভী তাড়িতমুকুটের শোভা ধারণ করিয়াছে। বাবুজি সম্মুখস্থিত পুষ্প-মাল্যশোভিত তাম্রকূটাধার হইতে সুরভি ধূম্ররাজি আকর্ষণ করিয়া অনুগ্রহভিখারী জনগণের চিত্তহরণ করিতেছিলেন এবং সুবর্ণালঙ্কৃত হস্তিযূথে আরোহণাভাবে তাঁহার "মোতি"চূর্ণমিশ্রিত-পলান্ন-পরিপাকের কিরূপ ব্যাঘাত ঘটিতেছিল, তাহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়া সমবেত জনসাধারণের সমবেদনা এবং বিস্ময় যুগপৎ উদ্রিক্ত করিতেছিলেন। দরবার বেশ জমিয়া আসিয়াছিল, এমনসময় মন্ত্রমুগ্ধ জনমণ্ডলী করজোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া অজ্ঞাতসারে কাহার চরণতলে নিপতিত হইল। লালাজির দ্বারদেশে সমুপস্থিত কাষায় বস্ত্র এবং উত্তরীয়ে মণ্ডিত তেওয়ারিজির প্রসন্ন ললাট এবং সদ্যঃস্নাত দীর্ঘ কেশরাজির উপর প্রভাতের স্বর্ণকিরণ সূর্য্যদেবের স্নেহচুম্বন অঙ্কিত করিয়া দিল। সেই মহিমামণ্ডিত অনাড়ম্বর ব্রাহ্মণশ্রীর সমক্ষে লালাজির বহুযত্ন-রচিত ঐশ্বর্য্যগরিমা যেন মুহূর্ত্তের মধ্যে পরিম্লান হইয়া গেল। স্বয়ং লালাজি অজ্ঞাতসারে তেওয়ারিজির চরণতলে প্রণত হইলেন। তেওয়ারিজি সসম্ভ্রমে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া, ইতিপূর্ব্বে কেন লালাজির প্রতি সম্মানপ্রদর্শন করিতে আসিতে পারেন নাই, তাহার উপযুক্ত কারণ দেখাইয়া পুনঃপুন তাঁহার নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিলেন এবং তাঁহাকে জানাইলেন যে, লালাজির মত মহৎ-ব্যক্তির আগমনে রঘুনাথপুর কৃতার্থ হইয়াছে, সুতরাং তাঁহার যাহাতে কোনপ্রকার ক্লেশ বা অনাদর না হয়, এরূপ ব্যবস্থা করিতে গ্রামবাসিমাত্রেই বাধ্য। অতএব "সরকারে"র যদি কখনো কোন বিষয়ের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে যেন আদেশ পাঠাইয়া তেওয়ারি-জিকে অনুগৃহীত করেন, ইত্যাদি।

কিয়ৎকাল সদালাপের পর তেওয়ারিজি বিনীতভাবে বাবুসাহেবের নিকট বিদায়গ্রহণ করিলেন। তিনি চলিয়া গেলে লালাজি কেমন-একটা অপ্রসন্নতা অনুভব করিতে লাগিলেন এবং তেওয়ারিজির সমক্ষে আপন হীনতা উপলব্ধি করিয়া ভিতরে-ভিতরে তেওয়ারিজির উপর জাতক্রোধ হইয়া উঠিলেন।

আপনার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ব্যক্তিকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিতেও অনেকটুকু মহত্ত্বের প্রয়োজন। সে মহত্ত্ব সকলের থাকে না।

৪

সেইদিন হইতে তেওয়ারিজিকে অতিক্রম করা কায়স্থকুলতিলকের জীবনব্রত হইয়া উঠিল। লালাজি ক্রমশ অক্লান্তচিত্তে তেওয়ারিজির নানাবিধ কুৎসা এবং আপনার মহত্ত্বকাহিনী সুকৌশলে চতুর্দ্দিকে প্রচার করিতে লাগিলেন। কেহ এই সকল কথা তেওয়ারিজির কর্ণগোচর করিলে তিনি করজোড়ে বলিতেন, "উনি 'বড়া আদমী', আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, উঁহার সঙ্গে কি আমার তুলনা হয়!"

সুতরাং অতি অল্পদিনেই লালাজি বুঝিতে পারিলেন, প্রকৃতপক্ষে রাজদরবার হইতে কোন ক্ষমতা লাভ করিতে না পারিলে এ পথে সফলতালাভের সম্ভাবনা নাই।

তখন লালাজি রঘুনাথপুর হইতে দুই-মাইল-দূরবর্ত্তী থানার দারোগাসাহেবের আশ্রয়গ্রহণ করিলেন। দারোগাবাবু বিদ্যানন্দ

লালাজিরই স্বজাতি এবং ইন্দ্রিয়সুখে তাঁহারই ন্যায় অনুরাগী। কাজেই অল্পদিনের ভিতর উভয়ের মধ্যে বেশ ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়া গেল। বলা বাহুল্য, দারোগাজির চিত্তবিনোদনার্থে সুরা এবং নাচগানের ব্যয়ভার লালাজিকেই বহন করিতে হইত।

কিছুদিন এইরূপ তোষামোদের পর লালাজির উদ্দেশ্যসিদ্ধির কিঞ্চিৎ সম্ভাবনা দেখা দিল। এই সময়ে ম্যাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের নিকট হইতে দারোগাজির উপর আসেসার-নির্ব্বাচনের পরওয়ানা আসিল। দারোগাজি নিতান্ত অকৃতজ্ঞ ছিলেন না—অন্যান্য নামের সঙ্গে বন্ধুবরের নামও সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দিলেন এবং আশ্বাস দিলেন যে, "দোস্ত" যাহাতে অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট্ হইতে পারেন, সে চেষ্টাও সময়মত তিনি করিবেন।

লালাজির ভাগ্যটা তখন ছিল ভাল। একমাস যাইতে না যাইতেই তিনি শুধু যে আসেসার নির্ব্বাচিত হইলেন, তাহা নহে, প্রথম সেশনেই উপস্থিত হইবার জন্য নিমন্ত্রণপত্র পাইলেন।

সেইদিন গ্রামবাসীরা সত্রাসে শুনিল যে, যে জজসাহেব দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা, সেই জজ-সাহেব কঠিন মকদ্দমার বিচার স্বয়ং করিতে না পারিয়া "সলা" লইবার জন্য লালাজিকে আহ্বান করিয়াছেন।

পত্র পাইয়া লালাজি একবার তেওয়ারিজির গৃহাভিমুখে চাহিয়া অবজ্ঞাপূর্ণ কটাক্ষপাত করিলেন এবং গভীর আত্মপ্রসাদসুখে আপনার মিসি-রঞ্জিত দন্তশ্রেণীকে ক্ষণেকের জন্য নিবিড় গুম্ফপাশ হইতে নিষ্কৃতি দিলেন। তার পর যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। সমস্ত রাত্রি গোযানে গমন করিয়া সুলতানগঞ্জ-ষ্টেশনে রেল ধরিলেন এবং পরদিন বেলা ১০টার সময় মুঙ্গের পৌঁছিলেন। তার পর বিশ্রামমাত্র না করিয়াই একেবারে আদালতে উপস্থিত হইলেন।

তিনঘণ্টাকাল সেই গুরুভার দেহপিণ্ডকে বাবুসাহেব বৃক্ষতলে স্থাপন করার পর চাপরাসী সংবাদ দিল, জজসাহেব আসিয়াছেন। তখন সেই গজেন্দ্রগঞ্জী দেহভার যথাসম্ভব সত্বর বহন করিতে করিতে লালাজি জজসাহেবের সম্মুখীন হইলেন এবং তাঁহাকে আভূমিপ্রণত সেলাম করিলেন। জজসাহেব সমবেত অষ্টাদশ আসেসারের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া দুইজনকে বাছিয়া লইলেন এবং অপর সকলকে চলিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিলেন। লালাজি নির্ব্বাচিত হইতে না পারিয়া বড়ই মনঃক্ষুণ্ণ হইলেন এবং "অলস অঙ্গ" "শিথিল কবরী" প্রিয়বঞ্চিতা অভিসারিকার ন্যায় আবার শূন্য-গৃহে ফিরিয়া চলিলেন।

যে রাত্রে লালাজি গৃহে ফিরিলেন, তাহার পরদিন প্রাতে তাঁহার দ্বারদেশে গভীর জনতা জমিয়া গেল। বাবুজি বাহিরে আসিয়া তাঁহার প্রতি জজসাহেবের শ্রদ্ধা এবং সমাদর ও তাঁহার "আক্কেল" ও "নেয়াকৎ" সম্বন্ধে "তারিফের" বিস্তৃত বিবরণ পুনঃপুন কীর্ত্তন করিয়া কৌতূহলপরবশ জনমণ্ডলীর তৃপ্তি-বিধান করিলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে নারায়ণ-জিকে হৃদয়াভ্যন্তরে ধন্যবাদ দিলেন যে, রঘুনাথ-পুরের কোন অধিবাসী তাঁহার নিষ্ফলতা দেখিবার জন্য মুঙ্গেরে উপস্থিত ছিল না।

৫

দারোগাসহায় লালাজি ইতিমধ্যেই খ্যাতি-

প্রতিপত্তিতে প্রায় তেওয়ারিজির সমকক্ষ হইয়া উঠিয়াছিলেন, কিন্তু অচিরে তাঁহার নিঃসন্দেহে গ্রামের শীর্ষস্থান অধিকার করিবার অবসর ঘটিয়া গেল।

রঘুনাথপুরে একঘর গোয়ালা বাস করিত। গৃহস্বামী বিহারিগোপের পরিবারে চারিজন লোক ছিল—তাহার স্ত্রী, বিধবা শ্যালিকা, পুত্র এবং পুত্রবধূ। একদিন এই হতভাগ্য গোপ-পরিবারের উপর বিধাতার রোষ—বর্ষার ঘন-ঘটার ন্যায় ভীমমূর্ত্তিতে ঘনাইয়া আসিল।

পুত্রবধূ হীরিয়া চতুর্দ্দশবর্ষে উপনীত হইলেও তাহার সদানন্দময়ী সরলা বালিকা-মূর্ত্তিতে আজিও কোন রূপান্তর হয় নাই। সে প্রতিবেশিনী শিশুকন্যাগণের সঙ্গে মিলিয়া শিশুরই মত গ্রামপ্রান্তবর্ত্তী শস্যক্ষেত্রে মনের সুখে খেলিয়া বেড়াইত এবং শাশুড়ীকর্ত্তৃক এজন্য তিরস্কৃত হইলে বড় বড় চক্ষুদুটি অশ্রু-পূর্ণ করিয়া কিয়ৎকালের জন্য তাহার দিকে চাহিয়া থাকিত। সুতরাং তাহার বালিকাস্বভাব সহসা যুবতীর গাম্ভীর্য্য লাভ করিতে পারিল না।

আজিও হীরিয়া পূর্ব্বদিনের মত সপ্তবর্ষীয়া প্রতিবেশিনীকন্যা বুধিয়ার সঙ্গে মাঠে খেলা করিতে গিয়াছিল। খেলা করিতে করিতে দুই বালিকায় পরামর্শ আঁটিল, হীরিয়াদের "রহর"ক্ষেত্রে যাইয়া উভয়ে কিছু "রহরকা ছিমরি" সংগ্রহ করিবে। তাহারা তৎক্ষণাৎ ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া যুগপৎ "ছিমরি"সংগ্রহ এবং রসনেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধন করিতে নিযুক্ত হইল।

হীরিয়ার মাস্‌শাশুড়ী ঘটনাক্রমে কাষ্ঠসংগ্রহ করিয়া সেই পথে বাটী ফিরিতে-ছিল, সে বধূ এবং বুধিয়াকে উক্ত অপকার্য্যে প্রবৃত্ত দেখিয়া রোষান্ধমনে একখণ্ড কাষ্ঠ হস্তে চীৎকার করিতে করিতে তাহাদের তাড়না করিল। অতর্কিতে এইরূপ ভর্ৎসিত ও পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া বালিকাদ্বয় অত্যন্ত ভীত হইল এবং যে যেদিকে পারিল, রুদ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পালাইল।

বুধিয়া যেদিকে ছুটিয়াছিল, সেদিকে উচ্চ আইলের নীচেই ৫হাতগভীর এক "পাইন্" ছিল। বালিকা বুধিয়া অন্ধ ব্যগ্রতায় ছুটিতে ছুটিতে সেই খাদমধ্যে পড়িয়া গেল। পশ্চাদ্ধাবিতা প্রৌঢ়া পাইনের ধারে আসিয়া দেখিল, সর্ব্বনাশ! পতনের আঘাতে বালিকার প্রাণবায়ু অন্তর্হিত হইয়াছে! তখন বেপমানা প্রৌঢ়া মাথায় হাত দিয়া পাইনের ধারে বসিয়া পড়িল।

কিন্তু "জীবিতাশা বলীয়সী"। সে ক্ষণেক পরেই বিপদ্ বুঝিতে পারিয়া এবং ইতস্তত চাহিয়া লাস গোপন করিয়া ফেলিতে মনস্থ করিল। তখন সেই উদ্দেশ্যে বুধিয়ার প্রাণ-হীন দেহ ক্রোড়ে তুলিয়া-লইয়া নিকটবর্ত্তি-কূপাভিমুখে সে অগ্রসর হইল।

প্রৌঢ়া যে মুহূর্ত্তে সেখানে উপস্থিত হইল, হীরিয়া তখন কূপের অপর পার হইতে মুখ ফিরাইয়া দেখিল, তাহার মাস্‌শাশুড়ী তাহার সখীকে কূপমধ্যে ফেলিয়া দিবার উদ্যোগ করিতেছে! দেখিয়াই সে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে ভীতি-বিবশা প্রৌঢ়ার বেপমান করপাশ হইতে বুধিয়ার মৃতদেহ কূপমধ্যে স্খলিত হইয়া পড়িল!

তখন প্রৌঢ়া হীরিয়ার কণ্ঠপীড়ন করিয়া

বলিল, "এ কথা যদি প্রকাশ হয়, তাহা হইলে তোকে খুন করিয়া ফেলিব।"

বিস্ময় এবং ভীতিবিমূঢ়া বালিকা কোন উত্তর করিতে পারিল না। উদ্‌ভ্রান্তদৃষ্টিতে এদিক্‌-ওদিক্‌ চাহিয়া একদিকে প্রাণপণে ছুটিয়া পালাইল।

৬

দুইঘণ্টার মধ্যে গ্রামে হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। বিহারিগোপের পুত্রবধূ হীরিয়া প্রতিবেশি-কন্যা বুধিয়াকে অলঙ্কারলোভে হত্যা করিয়া কোথায় পলায়ন করিয়াছে। বলা বাহুল্য, প্রাণভয়ভীতা প্রৌঢ়া হীরিয়ার পলায়নে আপনার দুষ্কৃতি প্রচারিত হইবার আশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া আগেভাগেই এই মিথ্যাকথা প্রচার করিয়া দিয়াছিল।

এরূপ একটা সঙীন কথা যে বায়ুবেগে থানায় গিয়া পৌঁছিবে, তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি? কাজেই আহারাদি সমাপন করিয়াই সুসজ্জিত এবং সানুচর দারোগাসাহেব রঘুনাথপুরে দর্শন দিলেন।

হীরিয়ার পিত্রালয় রঘুনাথপুর হইতে দুই-ক্রোশ দূরে। সন্ধান পাইয়া দারোগাসাহেব প্রথমেই সেখানে একবার খোঁজ লইয়া আসা আবশ্যক মনে করিলেন। নিজদোষাবিষ্কার-ভীতা প্রৌঢ়া আগে-আগে পথ দেখাইয়া চলিল। ইহার ফলে বিস্ময়বিমূঢ়া নিরপরাধা হীরিয়া সন্ধ্যার সময় হত্যাপরাধে অভিযুক্ত হইয়া থানায় আনীত হইল।

পুলিসের অত্যাচারভয়ভীত শ্বশুরশাশুড়ী বিপন্না বধূর কোনই সংবাদ লইল না।

অষ্টাদশবর্ষীয় স্বামী গুরুদয়াল কিন্তু স্থির থাকিতে পারিল না। তাহার প্রাণের ভিতর হুহু করিতেছিল। সন্ধ্যার পর গোপনে সে থানায় গিয়া দারোগাসাহেবের কাছে প্রার্থনা করিল, একবার মুহূর্ত্তের জন্য হীরিয়ার সঙ্গে তাহাকে সাক্ষাৎ করিতে দেওয়া হউক। তার পর অনেক সাধ্যসাধনায় থানার "অপসর" অনুমতি দিলে বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠ গুরুদয়াল অনেক কষ্টে স্ত্রীকে সুধাইল, "এমন কাজ কেন করিলে হীরিয়া?"

উদ্‌ভ্রান্তদৃষ্টি হীরিয়া বড় বড় চক্ষু মেলিয়া বলিল, "আমি কি করিয়াছি?"

গুরুদয়াল অস্ফুটস্বরে কহিল, "এই খুন!"

অশ্রুপূর্ণলোচনা বালিকা বলিল, "সে ত তোমার মাসী।" গুরুদয়াল শিহরিয়া উঠিল।

তখন সেই সরলা বালিকা একে একে যাহা জানিত, সকলি বলিল। গুরুদয়াল মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। স্ত্রীর নির্দ্দোষিতায় তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ রহিল না।

সেই সময় কন্‌ষ্টেবল হাঁকিল, "বস্‌, চলা যাও।"

তখন বিদীর্য্যমাণ বক্ষ দুই হাতে চাপিয়া-ধরিয়া অশ্রুসিক্তমুখে হতভাগ্য যুবক নৈশ অন্ধকারে গৃহে ফিরিয়া আসিল। আকাশে নক্ষত্রপুঞ্জ চাহিয়া-চাহিয়া তাহাকে যেন বলিতেছিল "হীরিয়া নির্দ্দোষী, হীরিয়া নির্দ্দোষী!"

গুরুদয়াল বাড়ী আসিয়া একবার জননীকে এ কথা বলিবে মনে করিয়াছিল, কিন্তু মাতৃস্বসার ভীম পরাক্রম এবং দুর্জ্জয় রসনা স্মরণ করিয়া কোনক্রমেই সাহসসঞ্চয় করিতে পারিল না।

৭

কিন্তু সেই বিপন্না বালিকার করুণ মুখচ্ছবি সর্ব্বদা তাহার পাশে-পাশে ঘুরিয়া তাহাকে উন্মত্তপ্রায় করিয়া তুলিল। একদিন প্রাতঃ-কালে সে তেওয়ারিজিকে একান্তে ডাকিয়া তাঁহার চরণদ্বয় জড়াইয়া ধরিল। তেওয়ারিজি সমস্ত শুনিলেন এবং দুইবিন্দু অশ্রু ফেলিয়া বলিয়া উঠিলেন, "হা রামচন্দ্র, কি সর্ব্বনাশ!"

মনুষ্যচরিত্রের উপর তেওয়ারিজির অগাধ বিশ্বাস ছিল, বিশেষত অল্পবয়স্ক নরনারীর প্রতি। তিনি প্রথমদিন হীরিয়ার এই অপবাদকাহিনী শুনিয়াই শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন এবং ক্রমাগত আপনার মনে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "সরলা বালিকা—সে এমন ভীষণ কাজ করিল! এ কি সম্ভব!"

আজ গুরুদয়ালের মুখে সব কথা শুনিয়া তাঁহার কোমল হৃদয় গলিয়া গেল—"অভাগিনী বালিকা, আজ তার বিনা দোষে একি নির্যাতন! হা ভগবান্, তুমি কোথায়!" তেওয়ারিজি অশ্রুপূর্ণনেত্রে ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

ইহার পর গুরুদয়াল থানা হইতে খবর আনিল, ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারফলে হীরিয়া দায়রা-সোপরদ্দ হইয়াছে। আর একমাস পরে তাহার বিচার।

তেওয়ারিজি মৌনভঙ্গ করিয়া বলিলেন, "তাই ত বচ্চা, কি করি! চল একবার লালাজির কাছে যাওয়া যাক্। রাজদরবারে তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি, তিনি যদি কিছু করিতে পারেন।" তেওয়ারিজি তৎক্ষণাৎ উত্তরীয়মাত্র গ্রহণ করিয়া লালাজির গৃহাভিমুখে ধাবিত হইলেন। গুরুদয়াল সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

লালাজি অনুচরবর্গে বেষ্টিত হইয়া তেমনি সভা উজ্জ্বল করিয়া বসিয়াছিলেন। তেওয়ারিজি সব কথা বলিয়া লালাজির হস্তধারণ করিয়া বলিলেন, "বাবুসাহেব, গরিবের এ উপকার করিতেই হইবে। আপনি ভিন্ন অভাগিনী বালিকার উদ্ধারের আর কোন আশা নাই!"

আজ স্বয়ং তেওয়ারিজি লালাজির করুণা-ভিখারী!—বিধাতা আজ স্বহস্তে বিজয়মাল্য লালাজির গলায় পরাইয়া দিলেন। গর্ব্ব-বিস্ফারিতবক্ষ লালাজি একবার করুণা-কটাক্ষে অনুগতজনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তাহারা সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল!

তখন বিপুল গুম্ফরাশি দুই হস্তে যথাসাধ্য বিমর্দ্দিত করিয়া গম্ভীরভাবে লালাজি বলিলেন, "যখন স্বয়ং আপনি অনুরোধ করিতেছেন, তখন আমার যথাসাধ্য আমি করিবই। আপনি 'বেপরওয়া' থাকুন।" আশ্বাসলাভ করিয়া তেওয়ারিজি কতকটা নিশ্চিন্তমনে গৃহে ফিরিলেন।

৮

লালাজি তেওয়ারিজিকে আশ্বাস দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এই একটা গভীর আশঙ্কা তাঁহাকে এ কয়দিন অনুক্ষণ আকুলিত করিতেছিল—"যদি তিনি এবার আসেসর নির্ব্বাচিত না হন! এবার ত গ্রামের লোকের নিকট তাঁহার পরাজয়কাহিনী গোপন থাকিবে না!"

কিন্তু বিধাতা মুখ তুলিয়া চাহিলেন। এবারকার সেশনেও তিনি আহূত হইলেন। যাত্রার পূর্ব্বদিন লালাজি স্বগৃহে এক দরবার করিলেন এবং সেদিন সুবাসিত-তাম্রকূট-ধূমরাশির সঙ্গে তাঁহার মহিষশৃঙ্গনিন্দী গুম্ফ-যুগ মুহুর্মুহু আন্দোলিত করিয়া বিস্ময়বিহ্বল শ্রোতৃবৃন্দের মনে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত করিয়া

দিলেন যে,রঘুনাথপুরে তাঁহার সমকক্ষ ব্যক্তির অস্তিত্ব দিবাস্বপ্নবৎ অলীক এবং হাস্যোদ্দীপক।

সন্ধ্যার পরে গোশকটে আরোহণ করিয়া লালাজি সগৌরবে জজসাহেবকে "মদৎ" দিতে শুভযাত্রা করিলেন। রঘুনাথপুরের বহু ব্যক্তি—কেহ বা গুরুদয়ালের দুঃখে কাতর হইয়া, কেহ বা তামাসা দেখিবার জন্য—বাবুসাহেবের সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

করুণহৃদয় তেওয়ারিজি হীরিয়ার উদ্ধার-সম্বন্ধে যথাসম্ভব সুব্যবস্থা করিবার জন্য ইতিপূর্ব্বেই গুরুদয়ালকে সঙ্গে করিয়া মুঙ্গের রওনা হইয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে লালাজি দুইক্রোশ পথ অতিক্রম করিবার পরেই ভয়ানক ঝড়বৃষ্টি দেখা দিল। অনন্যোপায় লালাজিকে সিক্তবস্ত্রে সমস্তরাত্রি অনিদ্রায় অতিবাহিত করিতে হইল। রজনী বিগতপ্রায়া হইলেও জলঝড় থামিবার কোন লক্ষণই দেখা দিল না। কিন্তু রাজার হুকুম অমান্য করে কাহার সাধ্য? কাজেই ম্রিয়মাণ শকটবাহকদ্বয়কে অব্যাহতি দিয়া কোনপ্রকারে গজেন্দ্রনিন্দী দেহভার বহন করিয়া বাবুসাহেবকে বৃষ্টি এবং কদ্দম অতিক্রম করিয়া ষ্টেশন-অভিমুখে ধাবিত হইতে হইল।

এই দুর্যোগে এবং এই পিচ্ছিলপন্থা-অতিক্রম-অবসরে একবারও যে লালাজির পদস্খলন হয় নাই—এমন কথা বলিলে আমরা ধর্ম্মে পতিত হইব।

কাজেই লালাজি যখন সুলতানগঞ্জ-ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহার জানুদেশে গভীর বেদনা—উদরদেশ কর্দ্দমলিপ্ত এবং তাঁহার সাধের জরিখচিত রেশমি "আচকান" সিক্ত এবং মলিনতাগ্রস্ত।

দুঃখে এবং যাতনায় লালাজির অক্ষিদ্বয় অধিকতর রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছিল এবং দীর্ঘশ্বাস তাঁহার বিপুলদেহকে প্রকম্পিত করিতেছিল। কাজেই পরদিন বেলা দশটার সময় লালাজি যখন জজসাহেবের গোচরে সমুপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহার অবস্থা অতি শোচনীয়।

কিন্তু শারীরিক এবং মানসিক উভয়বিধ যাতনা ভগবান্ এবার তাঁহার অদৃষ্টে লেখেন নাই। এতদিন পরে তাঁহার চিরাকাঙ্ক্ষিত সম্মানের স্থান প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্বরাত্রির সকল যাতনা লালা জগদম্বী সহায় বিস্মৃত হইলেন এবং বিশাল উদরের সম্মানরক্ষা করিয়া যতদূর নত হওয়া চলে, ততদূর প্রণত হইয়া, জজসাহেবকে বন্দনাপূর্ব্বক তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিলেন।

আসনগ্রহণ করিয়া একবার বিজয়কটাক্ষে লালাজি রঘুনাথপুরের জনমণ্ডলীর প্রশংসমান মুখগুলি দেখিয়া লইলেন। মকদ্দমা আরম্ভ হইল। "উকিলসরকার" মকদ্দমার মর্ম্ম জুরিদ্বয়কে বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন।

সহসা জজসাহেব গভীর নাসিকাগর্জ্জন-শব্দে চকিত হইয়া পার্শ্বে ফিরিয়া দেখিলেন, আহা আহা, কি অপরূপ মাধুরী! লালাজির বিশাল গুম্ফ তাঁহার ততোধিক বিশাল উদরদেশ স্পর্শ করিয়াছে—তাঁহার সৃক্কণী বহিয়া মদস্রাব হইতেছে এবং সমস্ত কক্ষ প্রতিধ্বনিত করিয়া সুমধুর গর্জ্জন তাঁহার বিস্ফারিত নাসাবিবর হইতে থাকিয়া-থাকিয়া উথলিয়া উঠিতেছে। জজসাহেব বিরক্ত হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "ইয়ে কেয়া হায় বাবুসাব?" পেস্কারের বজ্রকণ্ঠে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিধ্বনি উঠিল, "ইয়ে কেয়া হায় বাবুসাব?" চমকিত

হইয়া লালাজি "খোদাবন্দ "বলিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন এবং পুনঃপুন ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া জজসাহেবের উদ্যতক্রোধ অর্দ্ধপথে নিবারিত করিলেন।

উকিলসরকারের বক্তৃতা আবার আরম্ভ হইল। জজসাহেব মনোযোগ দিয়া শুনিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে তাঁহার মনঃসংযোগ পুনশ্চ বাধাপ্রাপ্ত হইল! লালাজি নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও পুনর্ব্বার পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

জজসাহেবের ক্রোধবহ্নি এবার ভীমবেগে প্রজ্বলিত হইল। তিনি হুঙ্কার করিয়া বলিলেন, "চাপরাসী, ইস্‌কো কান পকড়্‌কে কোণেপর খাড়া কর্ দেও।"

লালাজি বিনীতভাবে এই কঠিন আদেশের অনেক প্রতিবাদ করিলেন। কিন্তু ফল হইল না। রঘুনাথপুরবাসিগণ তাঁহার দুর্দ্দশা দর্শন করিল ভাবিয়া লালাজির হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। তেওয়ারিজি শুদ্ধ লালাজির ভরসায় নিশ্চিন্ত ছিলেন না,—যথাসাধ্য অর্থব্যয়ে হীরিয়ার পক্ষসমর্থনের তিনি সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। প্রায় তিনঘণ্টা পরে উভয়পক্ষের বক্তব্য সমাপ্ত হইলে লালাজি পুনরায় স্বস্থানে আনীত হইলেন। জজসাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপ্‌কো রায় কেয়া হ্যায়?" কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় লালাজি লজ্জাবনত মস্তক উত্তোলিত না করিয়া করজোড়ে কম্পিতকণ্ঠে কহিলেন, "হুজুরকা জো রায়!" উত্তেজিত জজসাহেব টেবিলে মুষ্ট্যাঘাত করিয়া কহিলেন, "ড্যাম্ ইউ, আপ্‌কো রায় কহিয়ে, ইয়ে মুদালে মুজরিম্ হায় ইয়ে নহি?"

কম্পিতবপু লালাজি মূঢ়ের ন্যায় মস্তকান্দোলন করিতে লাগিলেন। অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া জজসাহেব ধমকের উপর ধমক দিলেন এবং প্রকৃত উত্তর দিবার জন্য লালাজিকে পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিলেন।

এইরূপে লাঞ্ছিত হইয়া লালাজি কাঁদিয়া ফেলিলেন। হরজটাধৃতা জাহ্নবীধারার ন্যায় পতমান অশ্রুধারা তাঁহার গুম্ফজালে আশ্রয়গ্রহণ করিল। রুদ্ধকণ্ঠে লালাজি বলিলেন, "খোদাবন্দ, মুজরিম্!"

জজসাহেব ঘৃণাভরে লালাজির দিকে তীব্রকটাক্ষ করিয়া রায় লিখিতে বসিলেন। অপর আসেসর ভাবগতিক দেখিয়া আসামীকে "লা-মুজরিম্" বলিয়া ফেলিল।

জজসাহেবের সুবিচারে আসামী অব্যাহতি পাইল। বিপন্মুক্তা বালিকা এবং গুরুদয়াল করুণাময় তেওয়ারিজির চরণে লুটাইয়া পড়িল। প্রতিবেশিগণ আনন্দে-উৎসাহে তাহাদের ঘেরিয়া দাঁড়াইল!

* * * *

লালাজিকে তাহার পর হইতে আর কেহ রঘুনাথপুরে দেখে নাই!

শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্ত।

দুর্ভিক্ষপীড়িত ভারতে।

১১

জালিকাটা বেলে-পাথরের নগর।

এই দুর্ভিক্ষপ্রদেশ ছাড়িয়া বঙ্গোপসাগরতটে ফিরিয়া যাইবার সময় গোয়ালিয়ার আমার পথে পড়িল। দুর্ভিক্ষপ্রদেশে ইহাই আমার শেষ থামিবার আড্ডা। সমস্ত নগরটি খোদিত-কারুকার্য্যে, শুভ্র 'জালির' কারুকার্য্যে সমাচ্ছন্ন। সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে গোয়ালিয়ার প্রস্তরের উপর সুন্দর ও বিচিত্র তক্ষণ-কার্য্যের জন্য প্রসিদ্ধ। এখানে যাহা-কিছু দেখা যায়, প্রায় সবই সুন্দর; সবই খোদাই-কাজে—জাফ্‌রির কাজে বিভূষিত।

এই শোভাগৃহগুলি দেখিলে মনে হয়, যেন পাত্‌লা তাস-কাগজের উপর ফোঁড় কাটা; কিন্তু আসলে কঠিন বেলে-পাথরে নির্ম্মিত এবং উহার সূক্ষ্ম সুকুমার কাজগুলি আদৌ ক্ষণভঙ্গুর নহে। দ্বারপ্রকোষ্ঠের উপর পুষ্পমালার নক্‌সা; গবাক্ষের উপর ঝালরের নক্‌সা। দ্বারপ্রকোষ্ঠগুলা ছোট-ছোট অসংখ্য থাম দিয়া ঘেরা; থামের মাথালগুলা বৃক্ষপত্রের অনুকরণে এবং থামের তলদেশ পুষ্পকোষের অনুকরণে গঠিত। উপর্য্যুপরি-ন্যস্ত রাশিরাশি অলিন্দ ও বারণ্ডা,—স্বসীমা অতিক্রম করিয়া রাস্তার উপর বাহির হইয়া পড়িয়াছে। সমস্তই বেলে-পাথরের। এই গোয়ালিয়ার-নগরে, যদি কেহ গবাক্ষের গরাদে, কিংবা সুন্দরীদিগকে প্রচ্ছন্ন রাখিবার জন্য ঝাঁজরী-জান্‌লা নির্ম্মাণ করিতে চাহে, তাহা হইলে সে বেলে-পাথরের একটা বৃহৎ চাক্‌লা লইয়া তক্তার মত চাঁচিয়া পাত্‌লা করে এবং তাহাতে ছিদ্র করিয়া লতাপাতার আকারে অনেকগুলা সূক্ষ্মচারু ফুকর বাহির করে। দেখিলে মনে হয়, যেন উহা হাল্‌কা কাঠের কাজ কিংবা কাগজের কাজ। সমস্তই চুনকামের মত তুষারশুভ্র শ্বেতবর্ণে ধবলিত; মধ্যে-মধ্যে, দেয়ালের উপর পুষ্প, হস্তী ও দেবদেবীর চিত্র উজ্জ্বলবর্ণে অঙ্কিত। এদিকে গ্রামপল্লী ক্রমেই উজাড় হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও, এই ইন্দ্রপুরীতুল্য নগরটিতে প্রবেশ করিলে দুর্ভিক্ষের কথাটা যেন প্রায় ভুলিয়া যাইতে হয়। এখানকার লোকের এতটা অর্থসম্বল আছে যে, তাহারা শস্যাদি অনায়াসে ক্রয় করিতে পারে; এবং তাহাদের এখনো এতটা জলসঞ্চয় আছে যে, তাহাতে উদ্যানাদি সংরক্ষিত হইতে পারে।

আতর প্রস্তুত করিবার জন্য ও সাজসজ্জার জন্য নগরচত্বরে ঝুড়িঝুড়ি গোলাপফুল বিক্রী হইতেছে।

গোয়ালিয়ার আসলে হিন্দুনগর; কিন্তু এখানকার লোকের পাগ্‌ড়ীগুলা মুসলমানী-ধরণের। তবে একরকম বিশেষধরণের পাগ্‌ড়ী আছে—যাহা খুব আঁটসাঁট করিয়া

জড়াইয়া বাঁধা; বর্ণভেদ অনুসারে এই সকল পাগ্‌ড়ী অসংখ্যরকমের। কোনটার শাঁখের মত গড়ন, কোনটার বা একাদশ-লুই-রাজার আমলের টুপির মত গড়ন। আবার একরকম পাগ্‌ড়ী আছে—যাহার লম্বা দুই পাশ উর্দ্ধে উত্তোলিত ও দুইদিকে সিং-বাহির-করা। এই পাগ্‌ড়ীগুলা,—লালরঙের কিংবা পীচফল-রঙের, কিংবা ফিঁকা-সবুজ-রঙের রেশমী কাপড়ের। হাইদ্রাবাদে যেরূপ দেখা গিয়াছিল—সেইরূপ এখানেও, জনতার শুভ্র পরিচ্ছদের উপর—রাস্তার শাদা রঙের উপর, পাগ্‌ড়ীর এই টাট্‌কা রংগুলা যেন আরো বেশী ফুটিয়া উঠিয়াছে। এখানকার লোকেরা ললাটে যে শৈবচিহ্ন ধারণ করে, তাহা দেখিতে কতকটা শাদা প্রজাপতির মত, ও খুব সযত্নে চিত্রিত। ললাটের মধ্যস্থলে একটা বড় লাল ফোঁটা;—তাহার দুইপাশ হইতে যেন দুইটা ডানা বাহির হইয়াছে। পক্ষান্তরে, এখানকার বৈষ্ণবচিহ্ন দাক্ষিণাত্যের বৈষ্ণবচিহ্নেরই মত।

গোয়ালিয়ারকে ঘোড়-সওয়ারের নগর বলিলেও হয়;—সর্ব্বত্রই দেখা যায়, ঘোড়-সওয়ারেরা জরির জিন-লাগানো তেজী ঘোড়ার উপর চড়িয়া ছুটিয়া চলিয়াছে কিংবা চক্রাকারে ঘুরিতেছে; অনেকে হাতীর উপরেও চড়িয়াছে; দলে-দলে উষ্ট্রগণ সারিবন্দি হইয়া চলিয়াছে; অশ্বতরী ও ছোট ছোট ধূসরচর্ম্ম গর্দ্দভেরও অভাব নাই।

গাড়ি যে কত রকমের, তার সংখ্যা নাই। ঝক্‌ঝকে তামার ছোট-ছোট ভাড়াটে গাড়ি—তাহার ছাদ সূচ্যগ্র মন্দিরচূড়ার মত;—গাড়িটা ঘোটকের পশ্চাদ্দেশে যেন আটা দিয়া জোড়া; আর ঘোড়াগুলা ক্রমাগত পিছনদিকে লাথি ছুঁড়িতেছে। কোন কোন শকট স্থূলকায় দুইটা অলস বলদে টানিতেছে; শকট "গদাইনস্করি" চালে চলিয়াছে; একটা লম্বা পিতলের ডাণ্ডা দুইটা বলদকে পরস্পর হইতে একগজপরিমাণ পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে,—তাহাতে অনেকটা রাস্তা জুড়িয়া যায়; এই শকটের গঠন কতকটা সেকেলে তিন-সারি-দাঁড়ওয়ালা নৌকার মত;—খুব অলঙ্কারভূষিত নৌকার অগ্রভাগের মত; কিন্তু এই অগ্রভাগটি একেবারে সূচ্যগ্র; ইহার উপর আরোহীরা, অশ্বপৃষ্ঠে বসিবার ধরণে সারি-সারি বসিয়াছে। এই ধরণের বড় শকটগুলা প্রচ্ছন্নকায় রহস্যময়ী সুন্দরীদিগের ব্যবহারের জন্য; ইহাদের গঠন কোন বৃহদাকার পক্ষীর অণ্ডের মত; একেবারে গোলাকৃতি; লাল কাপড় দিয়া অতি সাবধানে চারিদিক্ ঢাকা; এই শকটগুলাও ধীরে-ধীরে চলিয়াছে। কখন-কখন এই ঢাকা কাপড়ের আধ-খোলা ফাঁক হইতে স্বর্ণবলয়-ভূষিত, তৃণমণিবর্ণের একটা বাহু, কিংবা স্বর্ণনূপুরভূষিত একটা নগ্ন পদ, কিংবা অঙ্গুরী-ভারাক্রান্ত কতকগুলা আঙুল বাহির হইয়া আছে, দেখিতে পাওয়া যায়। তা ছাড়া, কতরকমের পাল্‌কি-তাঞ্জাম; এই সকল যানে চড়িয়া তরুণবয়স্ক সর্দ্দারেরা হাওয়া খাইতে বাহির হইয়াছেন। তাঁহাদের পরিচ্ছদ নারাঙ্গিরঙের কিংবা Mallow-তরু-রঙের রেশমী কাপড়ের; চোখে কাজলের দীর্ঘ রেখা এবং কানে হীরকের অলঙ্কার। অথবা কোন নবাব বাহির হইয়াছেন; তাঁহার পাটল কিংবা বেগ্‌নি রঙের আচ্‌কান; সেই

আচ্‌কানের উপর তুষারশুভ্র কিংবা সিন্দুর-বর্ণে রঞ্জিত শ্মশ্রুরাজি বিলম্বিত।

শাদা পাথরের এই সকল সুন্দর রাস্তায় চলিতে চলিতে লোকেরা পরস্পরকে ক্রমাগত সেলাম করিতেছে দেখিতে পাওয়া যায়। গোয়ালিয়ারের লোকেরা বড়ই ভদ্র।

এ কথা নিশ্চিত, এ দেশের উচ্চবর্ণের মধ্যে আর্য্যজাতীয় দৈহিক শ্রীসৌন্দর্য্য চরম উৎকর্ষে উপনীত হইয়াছে,—উহাদের মুখের রং প্রায় ইরাণীদিগেরই ন্যায় ফর্শা।

স্বচ্ছ মল্‌মল্‌-বস্ত্রে রোমীয়ধরণে আবৃত হইয়া এবং উজ্জ্বল বর্ণচ্ছটা বিচ্ছুরিত করিয়া যে সকল রমণী দলে-দলে রাস্তায় চলিয়া বেড়াইতেছে, তাহাদের কি সুন্দর চোখ!—কি অনিন্দ্যসুন্দর দেহের গঠন!

তালীবনসঙ্কুল ভারত হইতে—তাম্রবর্ণ নগ্নতার ভারত হইতে—আলুলিত দীর্ঘ-কুন্তলের ভারত হইতে, এই প্রদেশটি কত দূরে!

রাজপুতানার এই সকল মল্‌মলের ওড়্‌না—যাহার দ্বারা রমণীদের আপাদমস্তক আবৃত—এই সকল ওড়্‌নার কাপড়ে যে নক্‌সা কাটা আছে, তাহাতে ইচ্ছা করিয়াই যেন একটু বর্ব্বররুচির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে; উহাতে যেন কেবল কতকগুলা রঙের ধ্যাব্‌ড়া ছোপ্‌—কতকগুলা বেঢপ চক্রাকার রেখা।

একজন রমণী যে ওড়নাটা পছন্দ করিয়া গায়ে পরিয়াছেন,তাহার রং শ্যাওলা-সবুজ;—তাহার উপর গোলাপীরঙের চক্র কাটা; তাঁহার সঙ্গিনীটি যে ওড়্‌না পরিয়াছেন, উহা সোনালী-রঙের,—তাহার উপর নীলের ছোপ্‌ অথবা Lilacপুষ্প-রঙের ছোপ্‌। ওড়নার কাপড় যেরূপ সূক্ষ্ম ও লঘু, তাহাতে সূর্য্যরশ্মি ও ছায়া ভিতরে প্রবেশ করায়, বেলোয়ারী কাচের সমস্ত আভাই যেন বস্ত্রের উপর খেলাইয়া বেড়াইতেছে। এই সব বিচিত্র কুসুমবর্ণের মধ্যে—প্রাভাতিক বর্ণ-চ্ছটার মধ্যে কোন সুন্দরী সাক্ষাৎ নিশাদেবীর ন্যায় দীর্ঘ-রজত-রেখাঙ্কিত কৃষ্ণবর্ণ ওড়না পরিধান করিয়া সকলকে চমকিত করিতেছেন।

গোয়ালিয়ারের লোকেরা এই রঙের খেলা দেখিতে এতই ভালবাসে যে,একএকটা রাস্তার সমস্তটা জুড়িয়া কেবলি কাপড়-রঙানোই হইতেছে এবং মিলাইয়া-মিলাইয়া তাহার উপর বিচিত্র রঙের ছোপ্‌ দেওয়া হইতেছে। পথ-চল্‌তি লোকদিগের সম্মুখেই এই সব কাজ চলিতেছে;—তাহারা দেখিবার জন্য সেইখানে দাঁড়াইতেছে এবং আপনাদের মতামতও প্রকাশ করিতেছে। একটা কাপড়ের রং-করা শেষ হইবামাত্র অম্‌নি উহা গৃহ-বারাণ্ডার উপর বিছাইয়া রাখা হইতেছে; অথবা দুইজন বালক রৌদ্রে শুকাইবার জন্য ঐ কাপড়টার দুই প্রান্ত ধরিয়া ক্রমাগত নাড়া দিতেছে। এই রঞ্জক-দিগের অঞ্চলটিতে যেন একটা নাগাড় উৎসব চলিয়াছে। পাত্‌লা কাপড়গুলা গৃহাদির উপর ঝুলিতেছে; বালকেরা কোন কোন কাপড়ের দুই প্রান্ত ধরিয়া দুলাইতেছে; ঠিক্‌ যেন চারিদিকে উৎসবের নিশান উড়িতেছে।

কখন-কখন দেখা যায়, বরযাত্রীর দল ধীরে-ধীরে অগ্রসর হইতেছে; আগে-আগে ঢাক-ঢোল-শানাই চলিয়াছে; অশ্বপৃষ্ঠে বর;

ভৃত্যগণ একটা বৃহৎ ছত্র তাহার মাথার উপর ধরিয়া আছে। আবার কখন-কখন দেখা যায়, শবযাত্রীর দল ছুটিয়া চলিয়াছে; শবশরীর দৃঢ়বন্ধনে বদ্ধ;—কাপড় দিয়া জড়ানো; শববাহকেরা দ্রুতপদে চলায়, শবশরীর ঝাঁকাইতেছে; সহযাত্রীরা হাঁপাইতে হাঁপাইতে পিছনে চলিয়াছে এবং কুকুরেরা আকাশের দিকে মুখ তুলিয়া যেরূপ চীৎকার করে, সেইরূপ একএকবার চীৎকার করিয়া উঠিতেছে। রাস্তার কোণে-কোণে ফকীর-সন্ন্যাসীরা গায়ে ভস্ম মাখিয়া অপস্মার-রোগাক্রান্ত ব্যক্তির ন্যায় ধূলায় পড়িয়া নানা-প্রকার অঙ্গবিক্ষেপ করিতেছে, এবং যেন মরণযন্ত্রণা উপস্থিত, এইভাবে কাতরস্বরে ভিক্ষা চাহিতেছে। বাজার-চত্বরের চারিধারে সূক্ষ্ম খোদাই-কাজে বিভূষিত কত দেবমন্দির ও চতুষ্কমণ্ডপ। যাহাদের ওড়না ইন্দ্রধনুর সমস্ত বর্ণে রঞ্জিত—সেই সব রমণী গালিচার দোকানে, রেশমি-বস্ত্রের দোকানে, ফলের দোকানে, মেঠায়ের দোকানে, শস্যের দোকানে প্রবেশ করিতেছে। আমাদের দেশে বিক্রয়ের জন্য যাহা দোকানে সাজাইয়া রাখা হয়—সেই সব শবদেহের বীভৎস দৃশ্য,—পচা মাছ, অন্ত্র ও টুক্‌রা-টুক্‌রা মাংস, এখানে কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। তাহার কারণ, হিন্দুরা আহারের জন্য কখনই জীবহিংসা করে না। এখানে বেশীর ভাগ বিক্রী হয়—নির্বৃন্ত গোলাপফুল। আতর প্রস্তুত করিবার জন্য, কিংবা শুধু ফুলের মালা বানাইবার জন্য রাশিরাশি গোলাপ বাজারে আনীত হয়।

চূড়াসমন্বিত অতি শুভ্র সিংহদ্বারসমূহের মধ্য দিয়া সুবিশাল রাজপ্রাসাদাঙ্কনে প্রবেশ করিতে হয়। এই সব প্রাসাদ একেবারে তুষারশুভ্র; প্রাসাদের চারিধারে গোলাপের কেয়ারী; তাহার চতুর্দ্দিকে অবসাদম্রিয়মাণ বৃহৎ তরুরাজি,—যাহারা এই এপ্রিলমাসেও শারদীয় বর্ণ ধারণ করিয়া আছে। এই সকল বিজন উপবন দিন-দিন শুকাইয়া যাইতেছে; রাজা তাহার কোন প্রতিবিধান করিতে পারিতেছেন না। এই সব ক্ষুদ্র হ্রদ—এখন শুষ্ক; উহাদের তটদেশে চমৎকার খোদাই-কাজ-করা চতুষ্কমণ্ডপসমূহ; যে সময়ে একটু বৃষ্টি হইয়াছিল, তাহারই একটু জল চতুষ্কপ্রাঙ্গণে এখনো জমিয়া আছে; এবং তাহারই প্রভাবে অঙ্গনভূমি এখনো নিবিড় শাখাপল্লবে বিভূষিত।

গোলাপের কেয়ারীতে শরতের ভাব থাকিলেও, যত্নপ্রভাবে গাছগুলা এখনো সতেজ রহিয়াছে; ময়ূর ও বানরেরা বিচরণ করিতেছে; ভূমির এই শুষ্কতায়,—এই দুর্ভিক্ষের সূচনায়, বানরগুলা যেন বিমর্ষ হইয়া পড়িয়াছে।

রাজা এখন জ্বরে ভুগিতেছেন; তাই আরোগ্যলাভের জন্য তিনি এখন পার্শ্ববর্ত্তী কোন শৈলচূড়ায় বিশ্রাম করিতে-ছেন। তথাপি আমি তাঁহার প্রাসাদে প্রবেশ করিবার অনুমতি পাইয়াছি। আমার জন্য প্রাসাদদ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল।

ঘরদালানগুলা য়ুরোপীয় ধরণে সজ্জিত; সর্ব্বত্রই সোনালি-গিল্টির কাজ, জরির কাজ ও ঝাড়-লণ্ঠন। মনে হয়, যেন Palais-Bourbon-প্রাসাদে কিংবা Elysee-প্রাসাদে আসিয়া পড়িয়াছি। কিন্তু এই সব দস্তরমত-সাজানো বিলাসদ্রব্যের মধ্যে

থাকিয়াও, যখন সেই সব বিগতবসন্ত উপবন-গুলির বিষণ্ণতা মনে করি,—দুর্ভিক্ষের কথা মনে করি, তখন যে ভারত দুকূলবস্ত্রাবৃত দেয়ালের বাহিরে অবস্থিত, সেই ভারত আবার আমার মনে পড়িয়া যায়। সর্দ্দার-শ্রেণীর যে যুবকটি আমাকে এই প্রাসাদে আনিয়াছিলেন এবং যিনি মধুর-সৌজন্য-সহকারে আমাকে সমস্ত দেখাইতেছিলেন, তিনি যেন পরীরাজ্যের লোক। তাঁহার শুভ্র পরিচ্ছদ; মাথায় গোলাপী রেশমের টুপি; কানে মুক্তা; এবং গলায় দুই নহরের পান্নার কণ্ঠী। ভারতীয় ও পারস্যদেশীয় পুরাতন ক্ষুদ্রায়তন চিত্রপটে যেরূপ চেহারা সচরাচর দেখা যায়, তাঁহার মুখশ্রী সেইরূপ অপূর্ব্বসুন্দর। এম্নিই ত তাঁহার দীর্ঘায়ত চক্ষু, তাহাতে আবার কজ্জলরেখায় আরো দীর্ঘীকৃত হইয়াছে। নাক খুব সরু; রেশম-নিন্দী কালো গোঁপ; গালের রক্ত সিন্দুরের মত লাল;—স্বচ্ছ তৃণমণিসদৃশ ত্বকের উপর যেন একটা গোলাপীরঙের ছোপ্ দেওয়া।

নগরের অপর পার্শ্বে গোয়ালিয়ারের প্রাচীন রাজাদিগের সমাধিমন্দির; এই অঞ্চলটি একেবারে নিস্তব্ধ। উদ্যানের মধ্যে এই সকল বেলে-পাথরের কিংবা মার্ব্বেলের মন্দির-গুলি অবস্থিত, উহার চূড়াগুলা প্রকাণ্ড 'সাইপ্রেস্'তরুর মত ঊর্দ্ধদিকে ক্রমসূক্ষ্ম।

এখানে যতগুলি গগনস্পর্শী সমাধিমন্দির আছে, তন্মধ্যে যেটিতে ভূতপূর্ব্ব মহারাজ কিয়ৎ-বৎসর হইতে চিরনিদ্রায় মগ্ন, সেই মন্দিরটি সর্ব্বাপেক্ষা জম্‌কালো। তাহাতে বেলে ও মার্ব্বেল পাথরের চমৎকার কাজ। এবং খুব পশ্চাদ্ভাগে যে স্থানটি সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র—সেইখানে একটা কালো মার্ব্বেলের বৃষ বসিয়া আছে। ইহা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের একটি পরমারাধ্য সাঙ্কেতিক চিহ্ন। এই রাজকীয় সমাধিমন্দিরটির নির্ম্মাণকার্য্য শেষ না হইতে হইতেই, ইহারি মধ্যে পক্ষীরা ইহাকে আক্রমণ করিয়াছে। পেচক, ঘুঘু, টিয়াপাখী ঝাঁকে-ঝাঁকে আসিয়া মন্দিরের চূড়ায় বাসা বাঁধিয়াছে। চূড়ায় উঠিবার সিঁড়ি সবুজ ও ধূসর পক্ষে সমাকীর্ণ। চূড়াটা খুব উচ্চ; চূড়ার উপর হইতে—"চিকণে"র মত কাজ-করা বাড়ী, প্রাসাদ, অবসাদ-ম্রিয়মাণ উদ্যান, পাথরের বড়বড়-মন্দিরচূড়া-সমেত সমস্ত নগরটাই দৃষ্টিগোচর হয়। মাথার উপর—আকাশে, কাকচিলেরা ঘোরপাক দিয়া উড়িতেছে। ভারতবর্ষে প্রায়ই যাহা দেখা যায়—নগরের আশপাশ ভগ্নাবশেষে আচ্ছন্ন; পুরাতন গোয়ালিয়ার, পুরাতন বাসস্থান,—দুর্নিবার কালপ্রভাবে, খেয়ালের অবসানে, কিংবা যুদ্ধবিগ্রহের ভাগ্যবিপর্য্যয়ে পরিত্যক্ত হইয়াছে। যে সময়ে মহাভাগ হিন্দুজাতি বিদেশীয় দাসত্ব স্বীকার করে নাই, স্বাধীনভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত, বীরগর্ব্বে গর্ব্বিত ছিল, লড়াকা ছিল—সেই বীরযুগের বিরাট্ দুর্গসমূহ এ দেশের সর্ব্বত্র যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ একটি দুর্গ দিগন্তের একটা কোণ জুড়িয়া রহিয়াছে। ঐ অদূরে, একশত গজের অধিক উচ্চ খাড়া শৈলের উপর, দেড়ক্রোশব্যাপী বপ্রপ্রাকার, ঘোর-দর্শন প্রাসাদসৌধাবলী, রাজমুকুটের ন্যায় শোভা পাইতেছে।

পরিশেষে, ভস্মের আভাবিশিষ্ট—পাংশুবর্ণ পত্রের আভাবিশিষ্ট দূর দিগন্ত গড়াইতে-

গড়াইতে কোথায় চলিয়া গিয়াছে। এখনো এই নগরটি নিরুদ্বেগ ও আমোদ-উল্লাসে পূর্ণ; কিন্তু ঐ সব মরা বন, ঐ সব মরা জঙ্গল, যাহা এখান হইতে অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে—উহা নগরের উপর একটা যেন বিভীষিকার ছায়া নিক্ষেপ করিয়াছে—আসন্ন দুর্ভিক্ষের সূচনা করিতেছে।

গত সায়াহ্নে,রাজদরবারের একজন সৌম্য-দর্শন পুরুষের সহিত, হাতী চড়িয়া সারা সহরটা ঘুরিয়া আসিলাম। বেলে-পাথরের নগরের নিকট আজ আমার এই শেষ বিদায়। এ সময় ততটা গরম নহে; এই সময়ে রমণীরা রঙীণ ওড়না পরিয়া—রূপালি জরির ওড়না পরিয়া, হাওয়া খাইবার জন্য সুন্দর-কাজ-করা নিজ নিজ গৃহের বারাণ্ডায় বসিয়া আছে।

আমার সঙ্গীটিকে চিনিতে পারিয়া এবং গাড়ির আগে-আগে দুই জন ক্রুপ্-সোয়ার দেখিয়া, লোকেরা খুব সেলাম করিতে লাগিল।

একটা প্রকাণ্ডকায় হাতীর উপর চড়িয়া আমরা সহরের সরু সরু রাস্তা দিয়া চলিয়াছি। এটি হস্তিনী—উহার বয়স ৬৫বৎসর; এই হাতীর উপর বসিয়া আমাদের মাথা একতলা পর্য্যন্ত ঠেকিল; এমন কি, যেখানে সুন্দরীরা বসিয়া ছিল, সেই খোদাই-কাজ-করা বারণ্ডাটা সেখান হইতে ঝুঁকিয়া দুই হাত বাড়াইয়া স্পর্শ করা যায়।

চৌমাথা-রাস্তার উপর একটা স্থান—একমানুষ-পরিমাণ উচ্চ দর্ম্মা দিয়া ঘেরা; কিন্তু আমরা এত উচ্চে বসিয়া আছি যে, হাতীর উপর হইতে নীচের সমস্তই দেখা যায়। এখানে একটা বিবাহোৎসব হইতেছে; বরের বাড়ী নিতান্ত ছোট বলিয়া রাস্তার উপরেই এই উৎসবের আয়োজন হইয়াছে। অলঙ্কারে বিভূষিত কতকগুলি তরুণী চুম্‌কি-বসানো ওড়না পরিয়া গানবাদ্য শুনিবার জন্য সেইখানে চক্রাকারে বসিয়া আছে।

বাজার-চত্বর দিয়া যখন আমরা চলিতে লাগিলাম, তখন লোকেরা কতই সেলাম করিতে লাগিল! সামান্য দোকানদারেরা, দরিদ্রলোকেরা, খুব নত হইয়া ভক্তিভরে সেলাম করিতে লাগিল। ইঙ্গিতমাত্রে, সুন্দর অশ্বারোহিগণ রাশ-টানিয়া নিজ নিজ অশ্বকে থামাইয়া রাখিল। কেন না, ঘোটকেরা হাতী দেখিলে ভয় পায়। ভয় পাইয়া ঘোড়াগুলা পিছনের পা ছুঁড়িতে লাগিল, চক্রাকারে ঘুরিতে লাগিল, গোলাপের ঝুড়ি-গুলাকে ওলট্‌পালট্ করিয়া দিল। পাঁচ-ছয় বৎসরের ছোট-ছোট সুন্দর কাজল-পরা মেয়ে-গুলি—এমন কি, শিশুগুলি পর্য্যন্ত সেইখানে থামিয়া গম্ভীরভাবে আমাদিগকে সেলাম করিতে লাগিল। খুব নীচে হইতে, এমন কি, হাতীর পায়ের কাছে দাঁড়াইয়া তাহারা অতি ভদ্রভাবে ও মজার ধরণে সেলাম করিতে লাগিল এবং পাছে তাহাদের কোন হানি হয়, এইজন্য হাতীও মাতৃসুলভ সতর্কতার সহিত একটার পর আর-একটা পা অতি সন্তর্পণে ফেলিতে লাগিল।

আমার স্মরণ হয়, যখন এমন-একটা সরু রাস্তা দিয়া চলিয়াছি, যেখানে হাতীর দুই পাশ দুইদিক্‌কার দেয়াল ঘেঁষিয়া যাইতেছে, তখন হঠাৎ একটা ঝাঁকানি হইল, হাতী সহসা থামিয়া পড়িল।

আমাদের হাতী অপেক্ষাও বড় আর-

একটা দাঁতালো পুরুষ-হাতী বিপরীত দিক্ হইতে ঠিক্ আমাদের সম্মুখে আসিয়া পড়িল।...

আমাদের হাতীটা ক্ষণেকের জন্য যেন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল! কিন্তু তাহার পরেই সৌজন্যসহকারে দুইজনের মধ্যে কি-একটা পরামর্শ হইয়া গেল। এক হস্তিশালাতেই দুইজনে একত্র বাস করে; এক পাত্র হইতেই দুইজনে একসঙ্গে আহার করে,—সুতরাং উভয়েই উভয়ের সুপরিচিত। পরিশেষে অন্য হাতীটা ত্রিশ-পা পিছু হটিয়া একটা প্রাঙ্গণের মধ্যে প্রবেশ করিল,—যাইবার সময় আমাদের গায়ে শুধু একটু শুঁড় বুলাইয়া গেল। তাহার পর আমরা আবার চলিতে লাগিলাম।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রাচীন সামাজিক চিত্র।

৩

গ্রামাদির সীমাবন্ধন।

যাহাতে এক গ্রামের সহিত গ্রামান্তরের ক্ষেত্রাদি লইয়া কোনরূপ বিবাদ উপস্থিত না হয়, তজ্জন্য গ্রামাদিনির্ম্মাণকালে তাহাদের সীমানির্দ্ধারণ করিয়া লইতে হইত। *

কেবল গ্রাম বা নগরাদি নহে, দশগ্রাম, শতগ্রাম, সহস্রগ্রাম ইত্যাদি নিখিল বিভাগ বা জনপদাদি সমস্ত বিবাদবিষয়ীভূত স্থানেরই সীমাবন্ধন করা হইত। গৃহ, উদ্যান, জলাশয়, বর্ষাজলনির্গমপ্রণালী প্রভৃতি সর্ব্বত্রই এই নিয়ম ছিল। †

গর্ত্তদ্বারা যেখানে সীমা নির্দ্ধারিত হইত, তাহা 'নিম্না' বলিয়া কথিত হইত; যেখানে শরতৃণ, কুব্জরূপ বল্মীক, দেবায়তন বা প্রস্তরকূট দ্বারা সীমা নির্ণীত হইত, তাহার নাম ছিল 'উন্নতা'; ধ্বজাকার উন্নত বৃক্ষের দ্বারা নির্ণীত সীমার নাম 'ধ্বজিনী'; ইষ্টক, অঙ্গার প্রভৃতি ভূমধ্যে নিহিত করিয়া নির্ণীত সীমা 'নৈধানী' বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল; এবং কোন জলাশয় দ্বারা স্থিরীকৃত সীমা 'মৎস্যিনী' নামে অভিহিত হইত। ‡

---

* "নিবেশকালে কর্ত্তব্যঃ সীমাবন্ধবিনির্ণয়ঃ।" বৃহস্পতি।

† "দশগ্রাম-শতগ্রাম-সহস্রগ্রাম-লক্ষণাম্।
বিষমাং নৃপতিঃ কুর্য্যাচ্চিহ্নৈঃ সীমাং বিনিশ্চিতাম্॥" বৃহস্পতি।
"আরামায়তনগ্রামনিপানোদ্যানবেশ্মসু।
এষ এব বিধির্জ্ঞেয়ো বর্ষাম্বুপ্রবহাদিষু॥" যাজ্ঞবল্ক্য।

‡ "গ্রাময়োরুভয়োর্যত্র গর্ত্তঃ সীমাপ্রবর্ত্তকঃ।
নিম্নোপলক্ষিতা সা তু শাস্ত্রবিদ্ভিরুদাহৃতা॥

এই সকল সীমা 'প্রকাশ' ও 'উপাংশু' বা অপ্রকাশরূপে দ্বিবিধ বলিয়া গণ্য হইত।

যে সমস্ত সীমাচিহ্ন ভূমির উপরে স্পষ্টই দেখা যাইত, তাহারা প্রকাশ; এবং যেখানে তাহা ভূমির অভ্যন্তরে নিহিত থাকিত, উপরে দেখিতে পাওয়া যাইত না, তাহা উপাংশু বা অপ্রকাশ। সীমানির্ণয়ে এই উভয় প্রণালীই অনুসৃত হইত।

প্রকাশসীমা করিতে হইলে সীমাসন্ধিস্থলে সীমাসূচক বৃক্ষ রোপণ করিবার প্রথা ছিল। ন্যগ্রোধ, অশ্বত্থ, কিংশুক, শাল্মলী, শাল, তাল, বা ক্ষীরী (পিণ্ডখর্জ্জুর) বৃক্ষ সামান্যত রোপিত হইত। শর (তৃণ), শমীলতা ও অন্যান্য বিবিধ গুল্মও সন্নিবেশিত হইত এবং কখন বা মৃৎপিণ্ড ও প্রস্তরকূট দ্বারা সীমাবন্ধন চলিত। সীমাসন্ধিস্থলে বাপী, কূপ, তড়াগ, প্রস্রবণ * ও দেবালয় নির্ম্মাণ করিবার নিয়ম ছিল †

সীমা লইয়া লোকে নানাবিধ বিপর্য্যয় উপস্থিত হইয়া থাকে। এজন্য প্রকাশের ন্যায় উপাংশু বা অপ্রকাশ চিহ্নের দ্বারাও সীমানির্দ্দেশ করা হইত। ইহা করিতে হইলে প্রস্তর, অস্থি, গোপুচ্ছ, তুষ; ভস্ম, কপালিকা (কর্পর, মৃন্ময়পাত্র), করীষ (শুষ্ক গোময়,—ঘুঁটে) শর্করা (ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভগ্নভাণ্ডের অবয়ব,--'খোলামকুচি'), বালুকা, ইষ্টক, অঙ্গার বা এতাদৃশ অপর বস্তু—যাহাকে মৃত্তিকা সহজে নষ্ট করিতে না পারে, ভূমিমধ্যে নিহিত করা হইত। ‡

দেখা যায়, পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যগুলি প্রথমে কুম্ভের মধ্যে স্থাপন করিয়া পরে ভূমধ্যে

শরকুব্জকবল্মীকা যত্র দেবগৃহাণি চ।
অশ্মকূটাশ্চ দৃশ্যন্তে সীমা সোক্তা সমুন্নতা॥
গ্রাময়োরুভয়োঃ সীম্নি বৃক্ষা যত্র সমুন্নতাঃ।
সমুচ্ছ্রিতা ধ্বজাকারা ধ্বজিনী সা প্রকীর্ত্তিতা॥
ইষ্টকাঙ্গারসিকতাঃ শর্করাস্থিকপালিকাঃ।
নিহিতা যত্র দৃশ্যন্তে নৈধানী সা প্রকীর্ত্তিতা॥
স্বচ্ছন্দগা বহুজলা ঝষকূর্ম্মসমন্বিতা।
নিত্যপ্রবাহিনী যত্র সীমা সা মৎস্যিনী মতা॥" ব্যাস।

* 'প্রস্রবণ'শব্দের অর্থ কুল্লূকভট্ট 'জলনির্গমমার্গ' বলিয়াছেন। বিবাদরত্নাকরে 'নদীব্যতিরিক্ত স্রোত' লিখিত হইয়াছে। বৃহস্পতি এই প্রকরণে লিখিয়াছেন—'স্থলনিম্ননদীস্রোতঃ'। ইহা আলোচনা করিলে 'প্রস্রবণ'শব্দের যথাশ্রুত অর্থই ধরিতে হয়। পূর্ব্বোদাহৃত ব্যাসবচন দ্রষ্টব্য।

† "সীমাবৃক্ষাংস্তু কুর্ব্বীত ন্যগ্রোধাশ্বত্থকিংশুকান্।
শাল্মলীশালতালাংশ্চ ক্ষীরিণশ্চৈব পাদপান্॥
গুল্মান্‌বেণূংশ্চ বিবিধান্ শমীবল্লীস্থলানি চ।
শরান্ কুব্জকগুল্মাংশ্চ তথা সীমা ন নশ্যতি॥
তড়াগান্যুদপানানি বাপ্যঃ প্রস্রবণানি চ।
সীমাসন্ধিষু কার্য্যাণি দেবতায়তনানি চ॥" মনু।

‡ "অশ্মনোঽস্থীনি গোবালাংস্তুষান্ ভস্মকপালিকাঃ।
করীষমিষ্টকাঙ্গারান্ শর্করাবালুকাংশ্চ হ॥
যানি চৈবংপ্রকারাণি কালাদ্‌ভূমির্ন ভক্ষয়েৎ।
তানি সন্ধিষু সীমায়া অপ্রকাশানি কারয়েৎ॥" মনু।

নিহিত করিতে হইত। বৃহস্পতি প্রাগুক্ত দ্রব্যগুলির মধ্যে 'কার্পাসাস্থি'ও (কার্পাস-বৃক্ষের সার ?) ধরিয়াছেন। *

যখন সীমাসন্ধিস্থলে এইরূপ উপাংশুচিহ্ন-সকল প্রোথিত করা হইত, তখন, যে ব্যক্তি তাহা করিতেন, তিনি পরিবারস্থ বালকগণকে তাহা দেখাইয়া দিতেন ; এবং ইহারাও স্ব স্ব বার্দ্ধক্যাবস্থায় অধস্তন বালকগণকে দেখাইয়া দিয়া যাইত।†

সীমামধ্যে যে সকল বৃক্ষ রোপিত হইত, তাহা যাহার অধিকৃত ভূমিতে থাকিত, তাহারই অধীন ; ঐ ক্ষেত্রস্বামীই ঐ সকল বৃক্ষের পুষ্প-ফলাদির অধিকারী থাকিতেন। তবে যদি কোন বৃক্ষের শাখা অন্যের অধিকৃত ক্ষেত্রে গিয়া পড়ে, তাহা হইলে, যাহার ক্ষেত্রে ঐ বৃক্ষের শাখা যায়, তাহা সেই ব্যক্তিরই অধীনে থাকিত। ‡

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে সীমানির্দ্ধারণ করিলেও বিবাদ হইতে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতিলাভ হইত না। নানাপ্রকারে সীমাচিহ্নসকল নষ্ট হইয়া যাইত। হয় ত কখন নদীপ্রবাহে ভূমি অপহৃত হইয়া যাইত বা নূতন ভূমি আনীত হইত। ইহাতে সহজেই বিবাদ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। এরূপস্থলে যথোচিতরূপে রাজাই উপস্থিত বিবাদের নিষ্পত্তি করিয়া দিতেন। বলা বাহুল্য, রাজা তাহা যথেচ্ছ করিতেন না ; প্রমাণপ্রয়োগ দেখিয়াই করিতে হইত। প্রধানত কাহার ভোগে বা দখলে বিবাদাস্পদ ভূমি ছিল, তাহা নির্ণয় করিতে হইত এবং তজ্জন্য সাক্ষীর প্রয়োজন হইত। এই সাক্ষী দ্বিবিধ—'লেখ্যারূঢ়' অর্থাৎ যাহা দলিলে লিখিত থাকে ; এবং অপর সেই ভূমির ভোগজ্ঞ ব্যক্তি। এই ভোগজ্ঞ ব্যক্তি সামান্যত তাহারাই, যাহারা বিবাদাস্পদ ভূমির সমীপে বাস করিত। ক্ষেত্র-বিবাদে সেই ক্ষেত্রের সীমান্তবাসী ব্যক্তিই সাক্ষী। অন্যত্রও এইপ্রকার। ইহা ভিন্ন, গ্রাম বা নগরের মুখ্য ও বৃদ্ধতম ব্যক্তিগণেরও মতামত গৃহীত হইত।§

রাজা বিবাদনিষ্পত্তি করিবার সময়

* "করীষাস্থিতুষাঙ্গারশর্করাশ্মকপালিকাঃ।
সিকতেষ্টকগোবালকার্পাসাস্থীনি ভস্ম চ।
প্রক্ষিপ্য কুম্ভেষ্বেতানি সীমান্তেষু নিধাপয়েৎ ॥" বৃহস্পতি।

† "ততঃ পোগণ্ডবালানাং প্রযত্নেন প্রদর্শয়েৎ।
বার্দ্ধক্যে চ শিশূনাং তে দর্শয়েয়ুস্তথৈব চ।
এবং পরম্পরাজ্ঞানে সীমাভ্রান্তির্ন জায়তে ॥" বৃহস্পতি।
বালক দশবৎসর পর্য্যন্ত 'পোগণ্ড' ও ষোড়শবর্ষ পর্য্যন্ত 'বাল' নামে অভিহিত হয়।

‡ সীমামধ্যে তু জাতানাং বৃক্ষাণাং ক্ষেত্রয়োর্দ্বয়োঃ।
ফলং পুষ্পঞ্চ সম্ভাতং ক্ষেত্রস্বামিষু নির্দ্দিশেৎ ॥
অন্যক্ষেত্রেষু জাতানাং শাখা যান্যত্র সংস্থিতা।
স্বামিনং তং বিজানীয়াদ্‌যস্য ক্ষেত্রেষু সংস্থিতা ॥" কাত্যায়ন।

§ "ক্ষেত্রসীমাবিরোধে তু সামন্তেভ্যো বিনিশ্চয়ঃ।
নগরগ্রামগণিনো যে চ বৃদ্ধতমা নরাঃ ॥" নারদ।
"গৃহক্ষেত্রবিবাদেষু সামন্তেভ্যো বিনির্ণয়ঃ।
নগরগ্রামগণিনো যে চ বৃদ্ধতমা নরাঃ ॥" বৃহস্পতি।

গ্রামস্থ ব্যক্তিবর্গকে ও সাক্ষিভূত কতকগুলি পূর্ব্বোল্লিখিত সীমান্তবাসীকে আহ্বান করিয়া অর্থি-প্রত্যর্থীর ও ঐ গ্রামবাসিগণের সমক্ষে তাহাদিগকে বিবাদভূমির সীমাচিহ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন; ইহারা যাহা বলিত, তদনুসারে রাজা নির্ণয় করিয়া দিতেন, এবং তাহা লেখারূঢ় হইত। ঐ লেখপত্রে সেখানে উপস্থিত সীমান্তবাসী বা সামন্তগণের নামও লিখিয়া রাখা হইত। * সীমানির্ণয় করিবার সময় ইহাদিগকে রক্তবস্ত্র ও মাল্য ধারণ করিয়া মস্তকে মৃত্তিকা (লোষ্ট—কুল্লূকভট্ট) গ্রহণপূর্ব্বক নিজ নিজ সুকৃতের শপথ করিতে হইত; † এবং সীমানিহিত তুষাঙ্গারাদিরূপ পূর্ব্বোক্ত উপাংশুচিহ্নসকল দেখাইয়া দিতে হইত।‡

সামন্তরূপ সাক্ষীর অভাব হইলে 'মৌল', 'বৃদ্ধ' বা 'উদ্ধৃত'গণের সাহায্যে বিবাদনিষ্পত্তি করিতে হইত। যাহারা পূর্ব্বে কোন গ্রামের 'সামন্ত' বা সীমান্তবাসী থাকিয়া পরে দেশান্তরে গমন করে, তাহারা 'মৌল'; সত্য, ব্রত ও আচারযুক্ত যে বৃদ্ধ ব্যক্তি সীমানির্ণয় দর্শন করিয়া থাকে, সে 'বৃদ্ধ';—সময়ে সময়ে বয়সে বৃদ্ধ না হইলেও এতাদৃশ ব্যক্তি 'বৃদ্ধ'-রূপে গণ্য হইত। যে ব্যক্তি কোন ক্ষেত্রের ভোগদখল বা শস্যগ্রহণ প্রভৃতি স্বয়ং না দেখিয়া লোকপরম্পরায় 'অমুকের অধীনে ঐ ক্ষেত্র আছে'—এইমাত্র শুনিয়া রাখে, তাহারা 'উদ্ধৃত'।

মৌলাদির অভাব হইলে ব্যাধ, শাকুনিক, গোপাল, সর্পগ্রাহী প্রভৃতি বনচারী লোকগণকেও সময়ে সময়ে গ্রামাদির সীমা জিজ্ঞাসা করা হইত। ইহারা স্বপ্রয়োজনসিদ্ধির জন্য সেই গ্রাম দিয়া সর্ব্বদা বনগমনহেতু গ্রামসীমাসম্বন্ধে নিতান্ত অজ্ঞ থাকিত না।§

বিশ্বাসী হইলেও একজনের উপর নির্ভর করিয়া সীমানির্ণয় সাধারণত করা হইত না; তবে যদি চিহ্নের লোপ হইয়া যায়, বা সেই সীমাজ্ঞ লোকের অত্যন্ত অভাব হয়, তবে বিবাদিদ্বয়ের সম্মতি অনুসারে অগত্যা একজনই ঐ কাজ করিত। তখন ইহাকে উপ-

* "গ্রামেয়ককুলানাঞ্চ সমক্ষং সীমসাক্ষিণঃ।
প্রষ্টব্যাঃ সীমলিঙ্গানি তয়োশ্চৈব বিবাদিনোঃ॥
তে পৃষ্টাস্তু যথা ব্রূয়ুঃ সামন্তাঃ (সমস্তাঃ) সীমনিশ্চয়ম্।
নিবধ্নীয়াৎ তথা সীমাং সামন্তাংস্তাংশ্চ (সর্ব্বাংস্তাংশ্চৈব) নামতঃ॥" মনু।

† "শিরোভিস্তে গৃহীত্বোর্ব্বীং স্রগ্বিণো রক্তবাসসঃ।
সুকৃতৈঃ শাপিতাঃ স্বৈঃ স্বৈর্নয়েয়ুস্তে সমঞ্জসম্॥" মনু।

‡ "শপথৈঃ শাপিতাঃ স্বৈঃ স্বৈঃ কুর্য্যুঃ সীম্নি বিনিশ্চয়ম্॥"
দর্শয়েয়ুর্নিধানানি তৎ প্রমাণমিতি স্থিতিঃ॥" বৃহস্পতি।

§ "সামন্তানামভাবে তু মৌলানাং সীমসাক্ষিণাম্।
ইমানপ্যনুযুঞ্জীত পুরুষান্ বনগোচরান্॥
ব্যাধাঞ্ছাকুনিকান্ গোপান্ কৈবর্ত্তান্ মূলখানকান্।
ব্যালগ্রাহানুঞ্ছবৃত্তীনন্যাংশ্চ বনচারিণঃ॥" মনু।

বাসী থাকিয়া পূর্ব্বের ন্যায় রক্তবর্ণ মাল্য ও বস্ত্র ধারণ করিয়া মস্তকোপরি মৃত্তিকা রাখিতে হইত। *

নদীর এক কূল ভগ্ন হইলে ক্রমশ অপর কূলে ঐ মৃত্তিকা সঞ্চিত হয়। এস্থলে যে কূলে মৃত্তিকা সঞ্চিত হইবে, তাহা সেই কূল-স্বামীর অধীনেই থাকিত; তবে যদি নদী-প্রবাহ গতিপরিবর্ত্তন করিয়া কাহারও সশস্য ক্ষেত্র উল্লঙ্ঘন করিয়া যায়, তবে ঐ ক্ষেত্র পূর্ব্ব-স্বামীরই অধিকৃত হইত। †

শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী।

শিবাজী-উৎসব ও ভবানীমূর্ত্তি।

এবারকার শিবাজী-উৎসবে ভবানীমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। একদল লোক এই কারণেও ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। ইঁহাদের আপত্তি ধর্ম্মমূলক।

শিবাজী উৎসব যদি বিশেষভাবে হিন্দুদেরই জাতীয় উৎসব হয়, তবে হিন্দুসাধারণের জন্য এই উৎসবে এরূপ প্রতিমার প্রতিষ্ঠা কেবল নির্দ্দোষ হয় নাই, একান্ত আবশ্যকও ছিল।

সকল হিন্দু প্রতিমাপূজা করেন না, সত্য। সকলে যে ভবানীপ্রতিমারই পূজা করিয়াছিলেন, এমনও নহে। কিন্তু নিজে প্রতিমা-পূজা না করা এক কথা, আর অপরে কোনো উৎসবে প্রতিমাপূজা করে বলিয়া সেই উৎসবানুষ্ঠান বর্জ্জন করা অন্য কথা।

যাঁহারা প্রতিমাপূজাকে পাপকার্য্য বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের পক্ষে এরূপ আচরণ সঙ্গত হইবে, সন্দেহ নাই; কিন্তু প্রতিমাপূজাকে যে পাপকার্য্য বলিয়া জ্ঞান করে, সে আর যাহা-কিছুই হউক না কেন, হিন্দু নয়, ইহা স্থির-নিশ্চিত। শিবাজী-উৎসব এই সকল অহিন্দুর জন্য নহে।

অতি প্রাচীনকাল হইতেই হিন্দুধর্ম্মে দুই প্রশস্ত পন্থা প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে—এক জ্ঞানমার্গ, অপর কর্ম্মমার্গ। জ্ঞানমার্গে প্রতিমাদির বা দেবোপাসনার বা যাগযজ্ঞের স্থান নাই। জ্ঞানপন্থাবলম্বী হিন্দু উপনিষদের সময় হইতেই প্রতিমাপূজক নহেন, ব্রহ্মোপাসক। কর্ম্ম-মার্গাবলম্বিগণ যজ্ঞাদিকর্ম্মশীল, দেবোপাসক ও

* "নৈকঃ সমুন্নয়েৎ সীমাং নরঃ প্রত্যয়বানপি।
গুরুত্বাদস্য কার্য্যস্য ক্রিয়ৈষা বহুষু স্থিতা॥
একশ্চেদুন্নয়েৎ সীমাং সোপবাসঃ সমুন্নয়েৎ।
রক্তমাল্যাম্বরধরঃ ক্ষিতিমারোপ্য মূর্দ্ধনি॥" নারদ।
"জ্ঞাতৃচিহ্নবিনাশে তু একোঽপ্যুভয়সম্মতঃ।" ইত্যাদি। বৃহস্পতি।

† "এককূলনিপাতস্তু ভূমেরন্যত্র সংস্থিতিম্।
নদীতীরেষু কুরুতে তস্য তাং ন বিচালয়েৎ॥
ক্ষেত্রং সশস্যমুল্লঙ্ঘ্য ভূমিশ্ছিন্না যদা ভবেৎ।
নদীস্রোতঃপ্রবাহেণ পূর্ব্বস্বামী লভেত তাম্॥" বৃহস্পতি।

ইদানীন্তন কালে পৌত্তলিক বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। জ্ঞানমার্গে ও কর্ম্মমার্গে পার্থক্য ও প্রভেদ চিরদিনই ছিল, কিন্তু তীব্র বৈরিতা কখনো ছিল বলিয়া বোধ হয় না। জ্ঞানপন্থিগণ যুগে যুগে কর্ম্মকাণ্ডের প্রতিবাদ করিয়াছেন; কিন্তু প্রত্যেক যুগেই আবার এই প্রতিবাদের ফলে কর্ম্মকাণ্ড বিশোধিত হইয়া, একটা উন্নততর ভূমিতে জ্ঞানকর্ম্মের কোনো-না-কোনো প্রকারে একটা যথাযথ সামঞ্জস্য ও মীমাংসাও হইয়াছে। যুগে যুগে এইরূপ সমন্বয় সাধিত হইয়াই হিন্দুধর্ম্ম আপনার উদারতারক্ষা ও অপূর্ব্ব গভীরতা ও বিশালতা লাভ করিতে পারিয়াছে। বারংবার এইরূপ বিরোধ ও এইরূপ উন্নততর মীমাংসাহেতু জ্ঞানে ও কর্ম্মে হিন্দুদিগের মধ্যে কদাপি ঐকান্তিক বিরোধ ও বৈরিতা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। অধিকারিভেদের দ্বারা একই বিশাল ও উদার ধর্ম্মতন্ত্রে উচ্চ-নিম্ন সকল শ্রেণীর সাধকেরই যথাযোগ্য স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

মুসলমান বুঝিয়াই হউক, আর না বুঝিয়াই হউক, হিন্দুর পৌত্তলিকতাকে পাপ বলিয়া পরিহার করিতে পারে। খৃষ্টীয়ানও আপনার সঙ্কীর্ণ আদর্শদ্বারা হিন্দুর ধর্ম্মকর্ম্মকে পরিমাপ করিয়া তাহার জন্য নরকের ব্যবস্থা করিতে পারে। কিন্তু হিন্দু স্বয়ং প্রতিমাপূজা বর্জ্জন করিলেও কদাপি তাহার স্বজাতির পূজোপাসনাদিকে পাপকর্ম্ম বলিয়া ঘৃণা করিতে পারে না।

হিন্দু যখন নিরাকারবাদী হয়, তখনই সাকারোপাসনাকে বর্জ্জন করে। বর্জ্জন করিলেও প্রকৃত নিরাকারবাদীর কখনো সাকারোপাসকের সঙ্গে কোনো বৈরিতা উপস্থিত হইতে পারে না। ফলত নিরাকারবাদের ভাণ করিয়া যাহারা সাকারোপাসনাকে পাপকার্য্য বলিয়া গণনা করে, তাহারা মূলত নিরাকারবাদীই নহে, প্রচ্ছন্নসাকারবাদী মাত্র।

প্রতিমাপূজার বিরুদ্ধে অনেক কথা বলিবার আছে; আমার বিশ্বাস, সঙ্গতভাবে শাস্ত্রযুক্তিপ্রমাণে অনেক আপত্তি ইহার বিরুদ্ধে করা যাইতে পারে। প্রবন্ধান্তরে সময়মত এ সকল আপত্তির উল্লেখ করিতেও চেষ্টা করিব। কিন্তু প্রতিমাপূজায় ভগবৎস্বরূপে অসত্য আরোপিত হয়, এ আপত্তির সারবত্তা বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

শাস্ত্রে ত্রিবিধ প্রণালীর উপাসনার কথা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম স্বরূপোপাসনা, দ্বিতীয় সম্পদুপাসনা, তৃতীয় প্রতীকোপাসনা। এই ত্রিবিধ উপাসনার কোনো উপাসনাতেই ব্রহ্মস্বরূপের অবমাননা করা হয় না।

আত্মরূপে,—সমাধির অবস্থায়, ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে যে উপাসনা হয়, তাহারই নাম স্বরূপ-উপাসনা। ইন্দ্রিয়বৃত্তির নিরোধ ও স্বরূপে অবস্থিতি ব্যতীত এ উপাসনা সম্ভবে না। ব্রহ্মবস্তুর সঙ্গে কোনো সৃষ্টবস্তুর সামান্যধর্ম্মদর্শনে, সেই বস্তুর সাহায্যে, সেই-বস্তু-অবলম্বনে ব্রহ্মের যে ধ্যান বা উপাসনা, তাহারই নাম সম্পদুপাসনা। ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ ও জগৎপ্রকাশক; স্বপ্রকাশত্ব ও জগৎপ্রকাশকত্ব চৈতন্যের ধর্ম্ম। বহির্বিষয়সম্বন্ধে সূর্য্যও স্বপ্রকাশ ও জগৎপ্রকাশক। এই বিষয়ে ব্রহ্মের সঙ্গে সূর্য্যের সামান্যধর্ম্ম পরিলক্ষিত হয়। এই সামান্যধর্ম্মকে ধ্যানের বিষয় করিয়া সূর্য্যবিগ্রহসাহায্যে ব্রহ্মের উপাসনা

করা—সম্পদুপাসনা। এখানে স্বরূপের ব্যাঘাত করিয়া নহে, কিন্তু বহিরালম্বনসাহায্যে স্বরূপজ্ঞান জাগ্রত করিয়াই ব্রহ্মোপাসনা হইয়া থাকে। এইরূপ সূর্য্যোপাসনায় নিরাকার চিন্ময় ব্রহ্মতত্ত্বের কোনোই ব্যাঘাত উৎপন্ন হইতে পারে না। প্রতীকোপাসনা সকলের নিকৃষ্ট উপাসনা। শাস্ত্রে ইহাকে অধ্যাসজনিত উপাসনা বলা হইয়াছে। অধ্যাসের অর্থ—পরত্র দৃষ্টোঽন্যত্রাবভাসঃ। একস্থানে কোনো-এক বস্তু দৃষ্ট হইয়াছে, অন্যস্থানে, যেখানে সত্যত তাহা নাই, সেখানে তাহাকে আরোপ করার নাম অধ্যাস। বনে সর্প দৃষ্ট হইয়াছে, গৃহপ্রাঙ্গণে পতিত রজ্জুতে সেই সর্পগুণ আরোপ করাকেই অধ্যাস বলা যায়। এই অধ্যাসকার্য্যটা মিথ্যা হইলেও, ইহার মূলে সত্যবোধ বিদ্যমান আছে। যে কখনো সর্প দেখে নাই, রজ্জুতে সর্পাধ্যাস তাহার পক্ষে কদাপি সম্ভব হইবে না। প্রতীকোপাসনা অধ্যাসজনিত উপাসনা, অতএব ইহা মিথ্যা উপাসনা, সত্য; কিন্তু অন্যত্র দৃষ্ট ব্রহ্মস্বরূপই প্রতীকে আরোপিত হইয়া প্রতীকোপাসনা সম্ভব করে। সে স্বরূপ দৃষ্টও হয় ত হয় নাই—কেবল শ্রুতমাত্র হইয়াছে। কিন্তু কোনো-না-কোনো প্রকারে, কোনো-না-কোনো আকারে ইষ্টদেবতার কিছু-না-কিছু স্বরূপজ্ঞান না হইলে, প্রতীকোপাসনাও সম্ভব হয় না। অতএব নিকৃষ্টতম যে প্রতীকোপাসনা, তাহাতেও স্বরূপসম্পর্ক একটু-না-একটু থাকিবেই; এই স্বরূপ-সম্পর্ক থাকে বলিয়া প্রতীকোপাসনাও কদাপি ভগবৎস্বরূপের ব্যাঘাত উৎপন্ন করিতে পারে না। আমাদের দেশপ্রচলিত মূর্ত্তিপূজা সম্পদ্ ও প্রতীকের সম্মিশ্রণে উৎপন্ন হইয়াছে। এই মূর্ত্তিপূজার প্রকৃতি ও তত্ত্ব অনুসন্ধিৎসার বিষয় হইলেও, বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নহে। এস্থলে এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এই সকল মূর্ত্তিপূজায় ঈশ্বরস্বরূপের কদাপি অবমাননা হয় না।

মুসলমান ও ইহুদী তন্ত্রে যে প্রতিমাপূজার বা দেবোপাসনার বিরুদ্ধে এমন তীব্র প্রতিবাদ দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার প্রকৃত অর্থ এই যে, প্রাচীন ইহুদী কখনো নিরাকারবাদী ছিল না; ইস্লাম্ ইহুদীধর্ম্ম হইতেই একরূপ উৎপন্ন হইয়াছে। ইহুদীধর্ম্মের প্রভাব ইস্লামে প্রভূত। ইস্লামেও এইজন্য আদিতে প্রকৃত নিরাকারতত্ত্ব প্রকাশিত হয় নাই। ইহুদী ও ইস্লাম্ উভয়ই নিরাকারবাদী নহে, কিন্তু প্রচ্ছন্নসাকারবাদী; এইজন্যই ইহুদী ও ইস্লাম্ তন্ত্রে প্রতিমাপূজায় ঈশ্বরের অবমাননা হয় বলিয়া তাহা পাপকার্য্যমধ্যে পরিগণিত হইয়াছে।

যাহার নিজস্ব একটা আকার আছে, তাহাতেই অন্য আকার আরোপিত হইলে, মিথ্যা ও অসৎ কার্য্য হয়। যাহার নিজস্ব কোনো আকার নাই—তাহার কোনো আকারেরই সঙ্গে বিরোধও ঘটিতে পারে না। ফলত নিরাকার ও সর্ব্বাকার একই কথা। উপনিষদে এইজন্য ব্রহ্মস্বরূপ বর্ণনা করিতে যাইয়া বলিতেছেন—

> অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
> রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
> একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
> রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥
> বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো

রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ ॥

অগ্নি যেমন ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া যখন যে বস্তুকে দাহ করে, তখন তাহারই রূপ ধারণ করিয়া থাকে, সেইরূপ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম প্রতি বস্তুতে সেই বস্তুর রূপ ধরেন ও তাহার বাহিরেও অবস্থান করেন। বায়ু যেমন ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া প্রত্যেক আধারের রূপ ধরিয়া থাকে, সেইরূপ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা অদ্বিতীয় পরব্রহ্মও প্রতি বস্তুতে সেই বস্তুর রূপ ধরেন ও তাহার বাহিরেও অবস্থিতি করেন। ইহাই প্রকৃত নিরাকারতত্ত্ব। এ তত্ত্বে কোনো সাকারবাদের সঙ্গে ঐকান্তিক বিরোধের স্থান নাই। সাকারবাদের বিরুদ্ধে অন্য আপত্তি থাকিতে পারে, অন্য আপত্তি আছে। কিন্তু সাকারবাদে ঈশ্বরের মর্য্যাদাহানি হয়, তজ্জন্য ইহা মহাপাপ, এ কথা নিরাকারবাদীর নহে, কিন্তু প্রচ্ছন্নসাকারবাদীর।

ফলত নিরাকারবাদের অভিমানে স্ফীত হইয়া যাঁহারা প্রতিমাপূজাকে পাপাচার বলিয়া ঘৃণা করেন, তাঁহারা স্বয়ংও যে প্রতিমার উপাসক, ইহা কখনো তলাইয়া দেখেন না। প্রচলিত প্রতিমাপূজকদিগের সঙ্গে ইঁহাদের পার্থক্য এই যে, ইঁহারা মানসী প্রতিমার পূজা করেন, দেশের আপামর সাধারণ হিন্দুগণ মৃন্ময়ী প্রতিমার পূজা করেন। মানসী প্রতিমাও কল্পিত, মৃন্ময়ী প্রতিমাও কল্পিত। মানসী প্রতিমা মননের বিষয়, মৃন্ময়ী প্রতিমা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য,—চক্ষুরাদির বিষয়। মানসী প্রতিমা সূক্ষ্ম, মৃন্ময়ী প্রতিমা স্থূল। পার্থক্য এই। আর এই সকল মানসী প্রতিমা হইতেই মৃন্ময়ী প্রতিমার উৎপত্তি হয়। মানসী কল্পনাই চিত্রে, ভাস্কর্য্যে, মৃন্ময়ী প্রতিমার রূপে ফুটিয়া উঠে। মৃন্ময়ী প্রতিমা মানসী প্রতিমারই ফল। মৃন্ময়ী প্রতিমার উপাসনায় যদি পাপ হয়, যে মূল হইতে ইহার উৎপত্তি, তাহা কদাপি নিষ্পাপ থাকিতে পারে না। ফলত মানসীই হউক, আর মৃন্ময়ীই হউক, কোনো প্রতিমার সাহায্যে ভগবদারাধনা করাই পাপকার্য্য নহে। ফলাফলের দ্বারা বিচার করিলে এক অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ, অপর নিকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইবে, সত্য; একের দ্বারা উন্নতির পথ সহজ হয়, অপরের দ্বারা অন্তর্দৃষ্টি হীন হইতে পারে; অতএব এক অপেক্ষাকৃত অধিকতর ইষ্টকর, অপর অপেক্ষাকৃত অনিষ্টকর, এরূপও বা বিবেচিত হইতে পারে, কিন্তু দুএর কোনোটিই যে পাপজনক নহে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।

ইহুদীতন্ত্রে ও ইস্লামে প্রতিমাপূজার বিরুদ্ধে যে তীব্র প্রতিবাদ দৃষ্ট হয়, ইহার অর্থ কেবল এই যে, ইহুদী ও ইস্লামের চতুঃপার্শ্বস্থ বিরোধী সমাজসকলে এরূপ প্রতিমাপূজা সে সময়ে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল; এবং ইহুদীজাতির ও মুসলমানসম্প্রদায়ের স্বাতন্ত্র্যরক্ষার জন্য প্রতিমাপূজার বিরুদ্ধে তখন অত্যন্ত তীব্র প্রতিবাদ করা আবশ্যক ছিল। ইহুদীরা বিদেশীদেবতার ভজনাকে মহাপাপ বলিয়া মনে করিত। অন্যদেবোপাসনার—the worship of strange gods—বিরুদ্ধে ইহুদী নেতৃবর্গ সমরঘোষণা করেন। এরূপ না করিলে চতুঃপার্শ্বস্থ নিম্নশ্রেণীর জাতিসকলের সঙ্গে ইহুদীরা একেবারে

মিশিয়া-গিয়া আপনাদের জাতীয় স্বাতন্ত্র্য ও স্বপ্রতিষ্ঠা একেবারে হারাইয়া ফেলিত। প্রতিমাপূজা অর্থে ইহুদীতন্ত্রে অন্যদেবোপাসনা—strange godদিগের পূজা বুঝাইত; এবং এইজন্যই ইহুদীনীতিতে প্রতিমাপূজা ব্যভিচার বা harlotry বলিয়া বর্ণিত ও নিন্দিত হইয়াছে। ইহুদীরা ঠিক একেশ্বরবাদীও ছিল না। ইহুদীতন্ত্রকে পণ্ডিতেরা এখন প্রায় একবাক্যে এইজন্য monotheistic বা একেশ্বরবাদী না বলিয়া, monolatrous বা একদেবোপাসক বলিয়া থাকেন। প্রতিদ্বন্দ্বী জাতিসকলের দেবগণ যাহাতে ইহুদীর উপাসনালয়ে প্রবেশাধিকার না পান, ইহুদীরা সর্ব্বদা প্রাণপণে তাহার চেষ্টা করিয়াছিল। এইজন্যই তাহারা একদেবোপাসক হয়। যে তত্ত্বজ্ঞানে একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়, ইহুদীর প্রাচীনকালে সে তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশিত হয় নাই। ইহুদীর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আমাদিগের জাতীয়জীবনের স্বাতন্ত্র্য ও স্বপ্রতিষ্ঠা রক্ষা করিবার জন্য ধর্ম্মের বন্ধনকে দৃঢ় করিতে হইলে, প্রতিমাপূজাকে নহে, কিন্তু ইংরেজের বা য়ুরোপীয়ের উপাস্যদেবতার ভজনাকে পাপকার্য্য বলিয়া বর্জন করা আবশ্যক হইবে। আমরা মানবেতিহাসের যে যুগে জন্মিয়াছি এবং মানবীয় সাধনার যে সোপানে অবস্থিতি করিতেছি, তাহাতে জাতীয়জীবনের ঘননিবিষ্টতাসম্পাদনের এরূপ বিষম পরজাতিবিদ্বেষ জাগ্রত করার কোনো প্রয়োজন উপস্থিত হয় নাই। সেরূপ প্রয়োজন থাকিলে য়ুরোপীয় ধর্ম্ম বা য়ুরোপীয় রীতিনীতির সম্পর্ককে ব্যভিচার বা harlotry বলিয়া প্রচার করিতে হইত। দেশপ্রচলিত প্রতিমাপূজাকে পাপাচার বলিয়া তাহার সঙ্গে সর্ব্বপ্রকার বাহ্যসম্পর্ক পরিত্যাগ করা স্বধর্ম্ম, স্বমত, স্বজাতি বা স্বদেশ, কিছুরই রক্ষার জন্য আবশ্যক নহে।

সকলে ভবানীমূর্ত্তিকে পছন্দ না করিতে পারেন। আমরা যে ব্রহ্মোপাসনা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি, তাহাই কি সকলে পছন্দ করেন? সকলে এই প্রতিমাপূজায় যোগদান করিতে পারেন না,—আমাদের উপাসনাদিতেই কি সকলে যোগ দিয়া থাকেন? কিন্তু অধিকাংশ হিন্দু যখন ইহা পছন্দ করেন ও এরূপ পূজায় যোগ দিয়া থাকেন, তখন একটা হিন্দুজাতীয় উৎসবে এরূপ মূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠা বা এরূপ মূর্ত্তিপূজায় কেন এমন গুরুতর আপত্তি উঠিবে, বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

আর একটি কথা। শিবাজীমহারাজ স্বয়ং ভবানীর উপাসক ছিলেন। তাঁহাকে বুঝিতে হইলে ভবানীকে ছাড়িলে চলিবে না।

শিবাজীর বীরচরিত্র ও স্বদেশপ্রীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত জনমণ্ডলীর মধ্যে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করা এবং শিক্ষিতসাধারণকে যথাসম্ভব শিবাজীচরিত্রলাভে সাহায্য করা, ইহাই শিবাজী-উৎসবের মূল উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্যই এবারে উৎসবক্ষেত্রে শিবাজী, রামদাস ও সিংহবাহিনী ভবানীমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। জনসাধারণে কথকতা প্রভৃতি দ্বারা শিবাজীচরিত্রসম্বন্ধে যে জ্ঞানলাভ করিবে, এই মূর্ত্তিত্রয়দর্শনে সেই জ্ঞান তাহাদিগের চিত্তে বদ্ধমূল হইয়া যাইবে, এই উদ্দেশ্যেই মূর্ত্তির ব্যবস্থা করা হয়। প্রাকৃতজনের শিক্ষার জন্য এই বাহ্য আলম্বন ও অবলম্বনাদির সর্ব্বথাই

প্রয়োজন হয়, লোকশিক্ষার্থেই শিবাজী-উৎসবে প্রতিমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল।

কিন্তু শিক্ষিত সাধকের পক্ষেও যে এই সকল বাহ্য আলম্বন একান্ত অনাবশ্যক, এমনও মনে করি না। কোন মহৎ-ব্যক্তির চরিত্র আয়ত্ত করিতে হইলে, সে চরিত্রের ধ্যান করিতে হয়। এই ধ্যানের জন্য সেই চরিত্রের বাহ্য আধার ও আলম্বনাদির চিন্তা করাও অত্যাবশ্যক। কোনো বস্তুকেই তাহার আধার ও আবেষ্টন হইতে একেবারে পৃথক্ করিয়া সত্যভাবে বোঝা যায় না। দুষ্মন্তের চরিত্র বুঝিতে গেলে, প্রাচীনভারতের রাজন্যসমাজের রীতিনীতি, আচারব্যবহার, আহার্য্য-পরিধেয়, ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রভৃতি বিবিধ আধার ও আলম্বনের মধ্যে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিতে হয়,—সেই সকল আধার ও আলম্বন সহকারে তাঁহার ধ্যান করিতে হয়। কুশলানুশিষ্ট অভিনেতা ও অভিনেত্রীরাও প্রাচীনকালের কোন নাট্যলীলা দেখাইতে হইলে, তত্তৎকালের দৃশ্য, পরিচ্ছদ, গৃহসজ্জাদির মধ্যে বহুদিন ধরিয়া ধ্যানপরায়ণ হইয়া বাস করেন; নতুবা সে সকল লোক-চরিত্র কদাপি সত্যভাবে রঙ্গমঞ্চে প্রদর্শন করিতে পারেন না। সামান্য অভিনয়ের প্রয়োজনে কোন নায়কনায়িকার চরিত্রকে আয়ত্ত করিতে হইলে যদি এই চরিত্রের বাহ্য আধার ও আলম্বনের মধ্যে আপনাকে স্থাপন করা আবশ্যক হয়, তবে লোক-গুরুগণের মহৎ চরিত্র আত্মস্থ করিয়া তাহা হইতে আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পদ্ লাভ করিতে হইলে, তাঁহাদের সামসময়িক চিত্র ও অনুষ্ঠানাদির ধ্যান ও ধারণা না করিলে চলিবে কেন?

শিবাজীচরিতের আলম্বন দুই—এক গুরুজী রামদাস, অপর তাঁহার ইষ্টদেবতা ভবানী। যে দৈবশক্তি শিবাজীর জীবনে আত্ম-প্রকাশ করিয়া তাঁহার দ্বারা এক বিশাল হিন্দুরাষ্ট্রের আদর্শ প্রকট করিয়াছিল, শিবাজী তাঁহাকেই ভবানীরূপে ভজনা করিতেন। এইজন্যই ভবানী তাঁহার ইষ্টদেবতার নাম ও সেই ভবানীই তাঁহার কৃপাণের নাম ছিল। ভবানীই শিবাজীর শক্তি, ভবানীই শিবাজীর অস্ত্র। ভবানীই তাঁহার জীবনের অদৃশ্য হেতু, ভবানীই তাঁহার কার্য্যের সহায়, ভবানীই সে কার্য্যের সফলতা ও সিদ্ধি। ভবানীকে ছাড়িয়া দিলে শিবাজী দুর্ব্বোধ্য, কুহেলিকাচ্ছন্ন হইয়া পড়েন। যে দেবতাকে যীশু সর্ব্বদা পিতা নামে অভিহিত করিতেন,—সেই "স্বর্গস্থ পিতাকে" ছাড়িয়া যীশুচরিত্র বুঝিতে যাওয়া বিড়ম্বনা। যে দেবতাকে মোহম্মদ আল্লানামে ডাকিতেন, তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া মোহম্মদের চরিত্র ধ্যান করিতে যাওয়া পণ্ডশ্রম মাত্র। রাধাকৃষ্ণকে ছাড়িয়া শ্রীচৈতন্যকে বুঝিতে যাওয়া মূর্খতা। বিটোবাকে ছাড়িয়া তুকারামকে জানিতে পারা অসাধ্য। যীশুকে বৈদান্তিকহিন্দুরূপে কল্পনা করা সম্ভব; মোহম্মদকে তোমার-আমারি মত একজন বিংশশতাব্দীর একেশ্বরবাদিরূপে কল্পনা করা সহজ; শ্রীচৈতন্যকে রাধাকৃষ্ণবর্জ্জিত করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানী সাজানো কঠিন নহে। এ সকল চেষ্টাও হইয়াছে ও এখনো হইতেছে। কিন্তু ইহাতে এই সকল মহাপুরুষের প্রকৃততত্ত্ব অবগত হওয়া যায় না। কোন ভক্তকে বুঝিতে গেলে ঠিক যেভাবে তিনি

ভগবান্‌কে ভজনা করিতেন, সে ভাব তোমার-আমার চক্ষে ভাল হউক আর মন্দ হউক, সেই ভাবেই তাঁহাকে দেখিতে হইবে। এইজন্য শিবাজীকে সত্যভাবে বুঝিতে গেলে ভবানীর সঙ্গে সংযুক্ত করিয়াই তাঁহাকে দেখিতে হইবে, নতুবা তাঁহার চরিত্রের নিগূঢ়তত্ত্ব কদাপি আয়ত্ত করা সম্ভব হইবে না।

শিবাজীর চরিত্রের নিগূঢ়তত্ত্ব বুঝিতে গেলে যেমন ভবানীকে ছাড়িলে চলিবে না, সেইরূপ রামদাসকেও ছাড়িলে চলিবে না। ফলত ভবানী ও রামদাস পরস্পরের সঙ্গে অচ্ছেদ্য অঙ্গাঙ্গিসম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াই শিবাজীর নিকট প্রকাশিত হইয়াছিলেন। ভবানীকে শিবাজী প্রচলিতসংস্কারানুযায়ী মূর্ত্তিমতী করিয়াই ধ্যান করিতেন সত্য, কিন্তু জটিল হিন্দুসাধনায় মূর্ত্ত ও অমূর্ত্তের মধ্যে কোনো সুস্পষ্ট বিভাগ ও বিভেদ করিতে পারা যায় না। বাংলাদেশে রামপ্রসাদ ও রামদুলাল উভয়েই কালী-উপাসক বলিয়া প্রসিদ্ধ;—একজন পশ্চিমবঙ্গে, অপর পূর্ব্ববঙ্গে কালী-ভক্তের আদর্শস্থানীয় হইয়া আছেন। কিন্তু রামপ্রসাদ বা রামদুলালের ইষ্টদেবতা সত্য-সত্য কোনো আকারবিশেষে আবদ্ধ ছিলেন না, প্রকৃতপক্ষে অমূর্ত্ত ও নিরাকার ছিলেন, এ কথা কে সাহস করিয়া বলিবে? ফলত প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের দেবদেবী সকলেই স্বরূপত অমূর্ত্ত বলিয়াই পরিগণিত হন, সাধকের হিতার্থে কেবল তাঁহারা বিশেষ বিশেষ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহাদের ধ্যানগোচর হইয়া থাকেন,—ইহাই জনসাধারণের বিশ্বাস। এইজন্য শিবাজী ভবানীর মূর্ত্তিবিশেষ ধ্যান করিতেন, ইহা যদি সত্যও হয়, বস্তুত তাহা যে তাঁহার অন্তরে অমূর্ত্তশক্তিরূপেই প্রকাশিত হইত, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। যে শক্তি তাঁহাকে স্বদেশ ও স্বজাতির উদ্ধারসাধনে নিয়োজিত করিয়াছিল, যাঁহার আশাময়ী বাণী তিনি নিয়ত অন্তরে শ্রবণ করিয়া সেই একই মহৎ লক্ষ্যপানে অবিরাম ছুটিয়াছিলেন, যে শক্তি তাঁহাকে এই লক্ষ্যলাভ না করা পর্য্যন্ত কিছুতেই শান্তি ও সোয়াস্তি দেয় নাই,—তাঁহাকেই তিনি ভবানীনামে, ভবানীরূপে ভজনা করিতেন।

আমাদের আজকালকার ভাব ও ভাষায় শিবাজীর এই উদ্দীপনা ও প্রেরণাকে ব্যক্ত করিতে গেলে, আমরা ইহাকে জাতীয়শক্তি-নামে হয় ত অভিহিত করিব। যখন যে দেশে যে-কোন ব্যক্তি স্বদেশ ও স্বজাতির উদ্ধারসাধনে বদ্ধপরিকর হন, তখনই তাঁহার মধ্যে এই শক্তি কার্য্য করিয়া থাকে। এই জাতীয় মহাশক্তি, এই spirit of the race-এর দ্বারা অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ না হইলে, কেহ কদাপি স্বদেশের জন্য সত্যভাবে আত্মোৎ-সর্গ করিতে পারেন না। দেবতা যেমন আপনি ভক্তের অন্তরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া, তাঁহার ভক্তিভাব জাগ্রত করিয়া, আপনি আবার সেই ভক্তি গ্রহণ করিয়া ভক্তকে কৃতার্থ করেন ও আপনি পরিতৃপ্ত হন, স্বদেশ-প্রেমিকের প্রাণে সেইরূপ তাঁহার স্বদেশের ও স্বজাতির জীবনী শক্তি, তাঁহার সভ্যতা ও সাধনার মধ্যে যে শক্তি যুগযুগান্তর ব্যাপিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে—The Spirit of his Race—অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার মাতৃভূমির নামে তিনি যে সকল সুখস্বার্থ বলিদান করেন,

তাহা হাস্যমুখে গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহুদীরা রোমকশৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া, খৃষ্টজন্মকালে, এই মহাশক্তিকে,—আপনাদের এই সনাতন spirit of the raceকেই মশি বা Messiah নামে অভিহিত ও তাঁহার প্রতীক্ষায় পরাধীনতার সমুদয় ক্লেশযন্ত্রণা সহ্য করিয়াছিল। ফরাসীবিপ্লবকালে ফরাসীরা এই মহাশক্তিকেই স্বাধীনতা-(liberty)-নামে ভজনা করিয়াছিল, এবং এখনো এই স্বাধীনতার মর্ম্মরমূর্ত্তিসমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া তাহারা এই মহাশক্তিরই ধ্যান করে। জাপানবাসিগণ মিকাডোর মধ্যে আপনাদের এই Race-spiritকেই প্রত্যক্ষ করে, এবং স্বজাতির সনাতন মহাশক্তি ও মহাপ্রাণতার প্রকটমূর্ত্তি ও প্রত্যক্ষবিগ্রহ-রূপেই তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া একই সঙ্গে দেশভক্তি ও রাজভক্তির চরম চরিতার্থতা লাভ করিয়া থাকে। এই জাতীয়শক্তি, এই Spirit of the Raceই শিবাজীর নিকটে ভবানীরূপে প্রকাশিত হইয়াছিলেন।

এই ভবানীকে ছাড়িয়া যেমন শিবাজীর চরিত্রের নিগূঢ়তত্ত্ব ও তাঁহার জীবনের মুখ্য লক্ষ্য বোঝা যায় না, সেইরূপ রামদাসকে ছাড়িয়াও তাহা বোঝা সম্ভবপর নহে। ফলত ভবানী ও রামদাস একই বস্তুর দুই দিক্ মাত্র ছিলেন। বৈষ্ণবতন্ত্রে যে গুরুশক্তি-প্রভাবে জীবের পরমপুরুষার্থলাভ হইয়া থাকে, তাহার দ্বিবিধ স্বরূপ বর্ণিত আছে—এক অন্তর্যামী, আর-এক বহিঃপ্রতিষ্ঠ। অন্তর্যামী গুরুশক্তিকে বৈষ্ণবেরা চৈত্যগুরু বলেন, বহিঃপ্রতিষ্ঠ গুরুশক্তিকে তাঁহারা মহান্তগুরু বলেন; আর নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণবের নিকটে চৈত্যগুরু ও মহান্তগুরু উভয়েই একই কৃষ্ণের স্বরূপ,—কৃষ্ণই অন্তর্যামিরূপে ধর্ম্মভাব ও ভক্তিরস অন্তরে স্ফুরিত করেন, কৃষ্ণই মহান্তরূপে সেই ধর্ম্ম ও ভক্তিলাভের উপদেশ দিয়া জীবের পুরুষার্থ প্রদান করিয়া থাকেন। চৈত্যগুরুর প্রকাশ ব্যতিরেকে মহান্ত-গুরুর উপদেশের মর্ম্মগ্রহণে কেহ সমর্থ হয় না; আর মহান্তগুরুর উপদেশ ও তৎকর্ত্তৃক শক্তিসঞ্চার ব্যতিরেকে চৈত্যগুরুও জাগ্রত হন না। আধুনিক দার্শনিকতত্ত্বে আত্মপ্রত্যয় বা Intuitionএর সঙ্গে বহির্বিষয়ের যে অচ্ছেদ্য অঙ্গাঙ্গিসম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—বহির্বিষয়ের সাক্ষাৎকার ব্যতীত আত্মপ্রত্যয় জাগ্রত হয় না, আবার আত্মপ্রত্যয়ের আলোক ব্যতিরেকে বহির্বিষয় বুদ্ধিগ্রাহ্য ও জ্ঞানগম্য হয় না,—আধুনিক দর্শন এই যে সত্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, বৈষ্ণবতন্ত্র চৈত্যগুরু ও মহান্তগুরুর মধ্যে অঙ্গাঙ্গিসম্বন্ধ স্থাপন করিয়া সেই সত্যই প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি ও বাহিরের আলোক, এ দুই যেমন পরস্পরের অপেক্ষা রাখিয়া চলে,—বাহিরের আলোক না থাকিলে চক্ষু যেমন অন্ধ হইয়াই থাকে, আবার চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি না থাকিলে বাহিরের আলোক যেমন বস্তুপ্রকাশে সমর্থ হয় না,—সেইরূপ চৈত্যগুরু অন্তরে প্রতিষ্ঠিত না থাকিলে মহান্তগুরু, আচার্য্য বা শিক্ষক কিছুতেই শিষ্যের অন্তরে আত্মপ্রভাব প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন না; আবার মহান্তগুরুর সাক্ষাৎকার, তাঁহার কৃপা ও উপদেশ ব্যতীত অন্তরের চৈত্যগুরুও আত্মপ্রকাশ করিতে পারেন না। চৈত্যগুরু গুরুশক্তির একার্দ্ধ,

মহান্ত তাহার অপরার্দ্ধ; এই দুই অঙ্গে গুরুশক্তি পূর্ণ ও প্রকট হয়।

যে গুরুশক্তি শিবাজীর জীবন ও চরিত্রকে অধিকার করিয়া তাঁহাকে লক্ষ্যপথে পরিচালিত করিয়াছিল, তাহাও এই দ্বিবিধ অঙ্গেই পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইহার চৈত্য-অঙ্গ, অন্তর্যামী, অদৃশ্যদিক্ ছিলেন—ভবানী, ইহার মহান্ত-অঙ্গ, বাহ্য ও লৌকিক দিক্ ছিলেন—রামদাস। রামদাসই শিবাজীর অন্তর্নিহিত ভবানী বা ভগবৎশক্তিকে জাগাইয়া তোলেন, আবার এই ভবানীই রামদাসের শিক্ষাদীক্ষার প্রত্যক্ষ প্রামাণ্য প্রদান করিয়া শিবাজীকে রামদাসের চরণে আত্মোৎসর্গ করিতে প্রবৃত্ত করেন। শিবাজীর জীবনের অপ্রকটশক্তির বিগ্রহ ছিলেন ভবানী, তাঁহার চরিত্রের প্রকট আদর্শ ছিলেন রামদাস। ভবানী ও রামদাস—এ দুয়ের কাহাকেও ছাড়িয়া শিবাজীকে ধরিতে, বুঝিতে,জানিতে ও আত্মস্থ ও আত্মসাৎ করিতে পারা যাইবে না। যোগাসনে উপবিষ্ট রামদাস, তাঁহার সম্মুখে জননীদুঃখভারখিন্ন, মাতৃশৃঙ্খল-মোচনে কৃতসঙ্কল্প, স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য মহাসাধনায় নিযুক্ত শিবাজী; এবং মধ্যস্থানে, উভয়কে ধারণ করিয়া, উভয়ের গুরুশিষ্য-সম্বন্ধের সূত্ররূপে বিদ্যমানা মহাপ্রলয়ঙ্করী অসুরদলনী কল্যাণমূর্ত্তি—ভবানী; এই ত্রিমূর্ত্তিতেই ছত্রপতি মহারাজ শিবাজীর চরিত্রের প্রকৃততত্ত্ব প্রকাশিত হয়। এই ত্রিমূর্ত্তিকেই শিবাজী-মহোৎসব-সমিতি শিবাজী-চরিত্রের বিগ্রহরূপে শিবাজীমেলায় এবারে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

প্রাকৃতজনে এই মূর্ত্তিত্রয়ের নিগূঢ়তত্ত্ব বুঝিতে পারে নাই—সে অধিকার তাহাদের জন্মে নাই, কিন্তু তাহারাও ভবানীচরণতলে রামদাসশিষ্য শিবাজীকে প্রত্যক্ষ করিয়া স্থূলভাবে তাঁহার চরিত্রের যে রস গ্রহণ করিতে পারিয়াছে, শুধু বক্তৃতা বা কথকতাদির দ্বারা তাহা কখনো ধরিতে পারিত বলিয়া মনে হয় না। এই মূর্ত্তিত্রয়সাহায্যে এবারে শিবাজীর প্রতি লোকের মনে যে ভক্তির উদ্রেক হইয়াছে, হাজার সভাসমিতি ও বক্তৃতা করিয়া কদাপি তাহা জাগাইতে পারা যাইত না। লোকশিক্ষার্থে এই সকল প্রতিকৃতি ও চাক্ষুষ ছবির সাহায্যগ্রহণ না করিলে চলিবে না। কিন্তু এই মূর্ত্তিত্রয়ের প্রতিষ্ঠাতে তত্ত্বদর্শী দর্শকও অসাধারণ উদ্দীপনা ও তৃপ্তি লাভ করিয়াছেন বলিয়াই বিশ্বাস করি। তত্ত্বদর্শীর নিকট যথাযোগ্য বিগ্রহাদির যে মূল্য, প্রাকৃতজনের নিকটে তাহা নাই। ফলত যাহার তত্ত্বজ্ঞান না ফুটিয়াছে, সে কদাপি বিগ্রহাদির প্রকৃত মর্ম্মগ্রহণে সমর্থ হয় না। যে কখনো মাতৃমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করে নাই, সন্তানবতী রমণীর অঙ্গসমাবেশের মধ্যে, রক্তমাংসের ভিতর দিয়া, যে বিশাল, যে মমতাময়, যে প্রাণময়, যে আত্মহারা মাতৃভাব প্রকাশিত হয়, ইহা যে কখনো দেখে নাই এবং এই পীনপয়োধরা রমণীমূর্ত্তি দেখিয়া যাহার চক্ষু উহারই মধ্যে বিশ্বজনীন মাতৃত্বের প্রতিবিম্ব মানস-চক্ষে প্রত্যক্ষ করে নাই,—সে কখনো ম্যাডোনা বা গণেশজননীর স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিবে না। ম্যাডোনার ছবি বা গণেশজননীর মূর্ত্তির মধ্যে বিশ্বজননীর আভাস প্রাপ্ত হওয়া প্রাকৃতজনের সাধ্যাতীত। ইহা কেবল তত্ত্বদর্শীরই পক্ষে সম্ভব। শিবাজী-মহোৎসবের মূর্ত্তিত্রয়ে এইজন্য প্রাকৃতজনে

যাহা দেখিয়াছে, তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণ তদপেক্ষা অনেক বেশী দেখিয়াছেন। প্রাকৃতজনে মূর্ত্তি দেখিয়াছে,—দেবতাজ্ঞানে সে মূর্ত্তিকে হয় ত শ্রদ্ধাবশত অন্তরে প্রণাম করিয়াছে, কিন্তু এই মূর্ত্তিত্রয়ের মধ্যে শিবাজীচরিত্রের মূলচিত্র,—শিবাজীর জীবনের নিগূঢ়শক্তি ও শিক্ষার প্রতিকৃতি দেখিয়াছেন কেবল জ্ঞানী ও ভাবুকে। তাঁহাদের চক্ষে এ কেবল মৃন্ময়ী মূর্ত্তিতে প্রতিভাত হয় নাই। তাঁহারা ভারতের চিন্ময়ী জাতীয়শক্তি ও ভারত-ইতিহাসের নিত্য অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে এই মূর্ত্তিত্রয়ের সমাবেশে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। নিম্ন অধিকারীর জন্য নহে, প্রকৃতপক্ষে উচ্চ অধিকারীর জন্যই এই সকল বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। বেদান্তের পরে পুরাণ এ কথা ভুলিয়া গেলে চলিবে না।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

পুত্রাভিলাষ।

পশুপক্ষ্যাদির প্রকৃতিতে ভবিষ্যচ্চিন্তা অতি অল্পই আছে, অথবা নাই। প্রত্যুপকারপ্রাপ্তির আশাও সেইরূপ। কিন্তু মনুষ্যের প্রকৃতিতে ভবিষ্যচ্চিন্তা ও প্রত্যুপকারপ্রাপ্তির আশা অত্যন্ত বলবতী। তদনুসারে প্রথমোক্ত জীবের শাবকস্নেহ কেবল মোহমূলক এবং দ্বিতীয় জীবের অর্থাৎ মনুষ্যের পুত্রাভিলাষ বা অপত্যস্নেহ মোহ ও লোভ উভয়মূলক। এইটুকু তথ্য প্রত্যক্ষ উদাহরণের দ্বারা বুঝাইবার জন্য মেধসঋষি সুরথরাজাকে দুইটি শ্লোক বলিয়াছিলেন—

"জ্ঞানেঽপি সতি পশ্যৈতান্ পতগান্ শাবচঞ্চুষু।
কণমোক্ষাদৃতান্ মোহাৎ পীড্যমানানপি ক্ষুধা॥
মানুষা মনুজব্যাঘ্র সাভিলাষাঃ সুতান্ প্রতি।
লোভাৎ প্রত্যুপকারায় নন্বেতান্ কিং ন পশ্যসি॥"

রাজন্, তুমি দেখ, মোহের এম্‌নিই প্রভাব যে, পক্ষীরা নিজে ক্ষুধাকাতর থাকিলেও, ভক্ষ্য আহরণ করিয়া শাবকমুখে অর্পণ করে এবং মনুষ্যেরাও লোভের বশে,—প্রত্যুপকারপ্রাপ্তির আশায় পুত্রাভিলাষী হয়। অতএব, পশুপক্ষ্যাদির অপত্যস্নেহ লোভবর্জ্জিত-মোহমূলক এবং মনুষ্যজীবের পুত্রাভিলাষ মোহযুক্ত-লোভমূলক। লোভ—ভবিষ্যৎ উপকারের আশা, ভবিষ্যতে পুত্রের দ্বারা সুখলাভের প্রত্যাশা। পরন্তু প্রত্যাশার সাফল্য সকলের ভাগ্যে হয় না, কাহার ভাগ্যে হয়, কাহার বা ভাগ্যে হয় না। মৃতপুত্রক ও দুর্বিনীতপুত্রক মনুষ্য তাহার উদাহরণ। মৃতপুত্রক ও দুর্বিনীতপুত্রক, এই দ্বিবিধ লোকের মধ্যে মৃতপুত্রকের দুঃখ পরিমেয়, পরন্তু দুর্বিনীতপুত্রক লোকের দুঃখ অপরিমেয়। তাই নীতিশাস্ত্রের লেখকগণ বলিয়াছেন যে—

"অজাত-মৃত-মূর্খাণাং বরমাদ্যৌ ন চান্তিমঃ।
সকৃদ্দুঃখকরাবাদ্যাবন্তিমস্তু পদে পদে॥"

অজাত, মৃত, মূর্খ অর্থাৎ হিতাহিতবোধশূন্য বা কর্ত্তব্যজ্ঞানবর্জ্জিত, এই তিনপ্রকারের মধ্যে প্রথমোক্ত দুইপ্রকার বরং ভাল ত শেষোক্তপ্রকার ভাল নহে। প্রথমোক্ত দুইপ্রকার হইতে একইরকমের দুঃখ জন্মে; পরন্তু শেষোক্তপ্রকারের সন্তান পদে পদে দুঃখপ্রদ হয়। এই সকল দেখিয়া-শুনিয়া, এই দুঃখবহুল সংসারে যাঁহারা পুত্রঘটিত দুঃখে দুঃখিত, তাঁহাদের চিত্তসান্ত্বনার্থ প্রাচীন ঋষিরা নানা উপদেশকথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। আমিও পুত্রঘটিত দুঃখে দুঃখিত পাঠকদিগের চিত্তসান্ত্বনার্থ ঋষিদিগেরই লিখিত উপদেশকথা হইতে পাঁচপ্রকার পুত্রলক্ষণ সংগ্রহ করিয়া এই পুত্রাভিলাষপ্রবন্ধ প্রকাশ করিলাম।

ঋষিরা বলেন, এই মনুষ্যজীবের মধ্যে প্রধানত পাঁচপ্রকার পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। ঋণ-পুত্র, ন্যাসাপহার-পুত্র, রিপু-পুত্র, উদাসীন-পুত্র ও প্রিয়-পুত্র বা সৎপুত্র। এই শেষোক্ত পুত্রের দ্বারাই মনুষ্যের পুত্রাভিলাষ সফল হয়, অন্যবিধ পুত্রের দ্বারা ঐ অভিলাষ সফল ত হয়-ই না, অধিকন্তু সমধিক ক্লেশই হইয়া থাকে। ঋণ-পুত্র কি? ন্যাসাপহার পুত্র কি? তাহা ঋষিদিগের লিখিত লক্ষণের দ্বারা বুঝা যাইতে পারে, সেজন্য ঐ সকল পুত্রের লক্ষণ ক্রমনিয়মে উদ্ধৃত করা হইল। প্রথম—ঋণ-পুত্রের লক্ষণ, তাহা এইরূপ—

"ঋণসম্বন্ধিনঃ পুত্রান্ প্রবক্ষ্যামি তবাগ্রতঃ।

* * *

মিত্ররূপেণ বর্ত্তেত অত্যন্তদুষ্টঃ সদৈব সঃ।
গুণং নৈব প্রপশ্যেত স ক্রূরো নিষ্ঠুরাকৃতিঃ॥
জল্পতে নিষ্ঠুরং বাক্যং সদৈব স্বজনেষু চ।
নিত্যং মিষ্টং সমশ্নাতি ভোগান্ ভুঞ্জীত নিত্যশঃ॥
দ্যূতকর্ম্মরতো নিত্যং চৌরকর্ম্মণি নিত্যশঃ।
গৃহাদ্দ্রব্যং বলাদ্ধর্ত্তা বার্য্যমাণঃ প্রকুপ্যতি॥
পিতরং মাতরঞ্চৈব কুৎসতে চ দিনে দিনে।
দ্রাবকস্ত্রাসকশ্চৈব বহুনিষ্ঠুরজল্পকঃ॥
বঞ্চয়িত্বৈব মুদ্রাঞ্চ হৃত্বা সৌখ্যেন তিষ্ঠতি।

* * *

এবং সংক্ষীয়তে দ্রব্যং নৈব কিঞ্চিদ্দদাতি চ।
গৃহক্ষেত্রাদিকং সর্ব্বং মমৈবৈতৎ বদত্যপি॥
মুদণ্ডৈর্মুশলৈশ্চৈব কশাঘাতৈশ্চ তাড়য়েৎ।
পিতরং মাতরঞ্চৈব নিষ্ঠুরঞ্চ দিনে দিনে॥
মৃতে তু তস্মিন্ পিতরি তথা মাতরি নিষ্ঠুরম্।
নিঃস্নেহো নির্ঘৃণশ্চৈব জায়তে নাত্র সংশয়ঃ॥"

অনুবাদ—

হে দ্বিজ, আমি তোমার নিকট ঋণ-পুত্রের লক্ষণ বলি, শ্রবণ কর। এই পুত্র পিতামাতা, ভাইভগিনী প্রভৃতির প্রতি বাহিরে সন্তুষ্ট, পরন্তু অন্তরে রুষ্ট থাকে। উঁহাদের কেবল দোষই দেখে, গুণ দেখে না। ইহাদের আকৃতি ক্রূর, প্রকৃতিও ক্রূর। ইহারা নিষ্ঠুর, ভোগবিলাসে রত, দ্যূতপ্রিয় ও চৌর্য্যকারী হয়। ইহারা বলপূর্ব্বক গৃহদ্রব্য গ্রহণ করে, নিষেধ করিলে ক্রুদ্ধ হয়। ইহারা পিতৃমাতৃনিন্দুক হয় ও তাঁহাদের ভীতি উৎপাদন করে, নিষ্ঠুর বাক্য বলে, বঞ্চনার দ্বারা পিতামাতার দ্রব্য হরণ করে, নানা উপায়ে ব্যয় করায় উঁহাদিগকে প্রহার করিতে কুণ্ঠিত হয় না এবং পিতামাতাভ্রাতা প্রভৃতির মৃত্যু হইলে কিছুমাত্র দুঃখানুভব করে না।

ন্যাসাপহার-পুত্রের লক্ষণ এইরূপ—

"রূপবান্ গুণবাংশ্চৈব সর্ব্বলক্ষণসংযুতঃ।
ভক্তিঞ্চ দর্শয়েৎ তস্য পুত্রো ভূত্বা দিনে দিনে॥
প্রিয়বাক্যধরো বাপি বহুস্নেহং প্রকাশয়েৎ।
অল্পায়ুবস্তথা ভূত্বা মরণং যাস্তি বৈ তথা॥

দুঃখং দত্ত্বা প্রযাত্যেবং প্রকৃত্যৈব পুনঃপুনঃ।
যদাহ পুত্র পুত্রেতি প্রলাপং হি করোতি সঃ॥"

অনুবাদ—

এই পুত্র রূপগুণলক্ষণসম্পন্ন হয়। পিতা মাতা, ভ্রাতাভগিনীর প্রতি ভক্তি ও স্নেহ-মমতা প্রদর্শন করে, তথা প্রিয়ভাষী হয়। ইহারা দীর্ঘজীবী হয় না, অতি অল্পবয়সে মরিয়া যায়,—পুনর্ব্বার ঐপ্রকার হইয়া জন্ম-গ্রহণ করে। ইহাদের কেহ কেহ মৃত্যুকালে প্রলাপপ্রসঙ্গে পিতামাতার উদ্দেশে অনেক সূচক কথাও বলিয়া থাকে। এতদ্দেশে এই ন্যাসাপহার-পুত্রের মাতা মৃতবৎসা বলিয়া বিখ্যাত।

রিপু-পুত্রের লক্ষণ এইরূপ—

"রিপুপুত্রং প্রবক্ষ্যামি তবাগ্রে দ্বিজপুঙ্গব।
বাল্যে বয়সি সম্প্রাপ্তে রিপুবৎ বর্ত্ততে সদা॥
পিতরং মাতরঞ্চৈব ক্রীড়মানো হি তাড়য়েৎ।
তাড়য়িত্বা প্রযাত্যেবং প্রহস্য চ পুনঃপুনঃ॥
পুনরায়াতি তং তত্র পিতরং মাতরং পুনঃ।
সক্রোধো বর্ত্ততে নিত্যং বৈরকর্ম্মণি সর্ব্বদা॥
পিতরং মারয়িত্বা তু মাতরঞ্চ পুনস্তথা।
প্রযাত্যেবং স দুষ্টাত্মা পূর্ব্ববৈরানুভাবতঃ॥"

অনুবাদ—

এই পুত্র শিশুকাল হইতেই পিতামাতার প্রতি শত্রুবৎ ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত থাকে। শিশুকালেও ক্রীড়াপ্রসঙ্গে পিতামাতাকে তাড়না করে, প্রহার করে, প্রহার করিয়া পলায়ন করে, পুনর্ব্বার পিতৃমাতৃসন্নিধানে আগমন করে। সর্ব্বদা ক্রুদ্ধ ও সর্ব্বদা শত্রুসম ব্যবহারে রত থাকে। অবশেষে পিতৃবধের ও মাতৃবধের দোষে লিপ্ত হয়।

উদাসীন-পুত্রের লক্ষণ—

"উদাসীনং প্রবক্ষ্যামি তবাগ্রে প্রিয় সম্প্রতি।
উদাসীনেন ভাবেন সদৈব পরিবর্ত্ততে॥
দদাতি নৈব গৃহ্লাতি ন ক্রুধ্যতি ন তুষ্যতি।
নৈবোপযাতি সন্ত্যজ্য উদাসীনো দ্বিজোত্তম।
তবাগ্রে কথিতং সর্ব্বং পুত্রাণাং গতিরীদৃশী॥"

অনুবাদ—

এই পুত্র গৃহে পিতামাতার নিকট উদাসী-নের ন্যায় অবস্থান করে। কোন-কিছুর সম্পর্ক রাখে না। উপকার, অপকার, দান ও গ্রহণ, রোষ অথবা তোষ ব্যক্ত করে না, অথবা করেই না। প্রকৃত উদাসীন যেমন গৃহত্যাগী হয়, এই উদাসীন-পুত্র সেরূপ গৃহ-ত্যাগী হয় না। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, তোমার নিকট সমস্ত লক্ষণই বর্ণন করিলাম। পুত্রদিগের গতি এইরূপই হইয়া থাকে।

প্রিয়-পুত্রের অর্থাৎ সৎপুত্রের লক্ষণ এই-রূপ—

"জাতমাত্রঃ প্রিয়ং কুর্য্যাৎ বাল্যে নটনক্রীড়নৈঃ।
বয়ঃ প্রাপ্য প্রিয়ং কুর্য্যাৎ মাতাপিত্রোরনন্তরম্।
ভক্ত্যা সন্তোষয়েন্নিত্যং তাবুভৌ পরিপালয়েৎ।
স্নেহেন বচসা চৈব প্রিয়সম্ভাষণেন চ॥
মৃতৌ গুরূ সমাজ্ঞায় স্নেহেন রুদতে পুনঃ।
শ্রাদ্ধকর্ম্মাণি সর্ব্বাণি পিণ্ডদানাদিকাং ক্রিয়াম্॥
করোত্যেবং সুদুঃখার্ত্তস্তেভ্যো যাত্রাং প্রযচ্ছতি।
ঋণত্রয়ান্বিতঃ স্নেহাৎ নির্যাপয়তি নিশ্চিতঃ॥"

অনুবাদ -

এই পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াই পিতামাতার প্রীতি উৎপাদন করে। অর্থাৎ যাহাকে সুখপ্রসব বলে, এই পুত্র সেই সুখপ্রসবের দ্বারা পিতা-মাতার আনন্দ জন্মায়। পরে বাল্য আগত হইলে প্রীতিপ্রদ ক্রীড়াই করে, অপ্রীতিজনক ক্রীড়ায় নিবিষ্ট হয় না। পরে যোগ্যবয়সে, ভক্তির

দ্বারা, স্নেহমমতার দ্বারা, প্রিয়বাক্যের দ্বারা পিতামাতার প্রীতি জন্মায় ও অবশেষে তাঁহাদিগকে পরিপালন করে। পিতামাতার মৃত্যুতে অত্যন্ত কাতর হয়, রোদন করে এবং শ্রদ্ধাসহকারে তদীয় পারলৌকিক কার্য্যসকল নির্ব্বাহ করে। পরে তদুদ্দেশে গয়াযাত্রাদি করিয়া থাকে।

এইরূপ এইরূপ বিভিন্নধর্ম্মাক্রান্ত বা বিভিন্নস্বভাব পুত্র জন্মগ্রহণ করে বলিয়া ঋষিরা সেই সেই পুত্রের সেই সেই সংজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন। অর্থাৎ লক্ষণ অনুসারে কেহ ঋণ-পুত্র, কেহ ন্যাসাপহার-পুত্র, কেহ বা রিপু-পুত্র, এইরূপ নির্দ্দেশভাজন হয়। ঋণ, ন্যাস (গচ্ছিত), রিপু, এই তিন শব্দের অর্থের সহিত উহাদের পূর্ব্বসম্বন্ধ থাকা অনুমিত হয়। পূর্ব্বসম্বন্ধ অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মকৃত ঋণ, ন্যাস, শত্রুতা, এই তিনের সম্বন্ধ। গীতায়—

"যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥"

এই শ্লোকে প্রকাশিত অন্তকালের নিয়ম ঐ কল্পনার, ঐ অনুমানের মূল। অন্তকালের নিয়ম, এ কথার ব্যাখ্যা এই যে, মৃত্যুকালে জীবের অন্তরে যে ভাব প্রবল হয়, যথোচিতকালে সেই ভাবের পুনর্জ্জন্ম হয়, তাহার অন্যথা হয় না। যাহার প্রদত্ত ঋণ প্রত্যাবর্ত্তিত করিতে না পারিয়া অনুতপ্ত হইয়া মরে, যাহারা গচ্ছিত-অপহরণের প্রতীকার করিতে অক্ষম হইয়া উপায় ভাবিতে ভাবিতে মরে, যাহারা শত্রুতার প্রতিশোধচিন্তায় কাতর হইয়া মরে, ঐ তাপ বিস্মৃত হয় না, তাহারাই সেই সেই ব্যক্তির পুত্রাদিরূপে উৎপন্ন হয় ও বিবিধপ্রকারে কষ্টপ্রদান করে। ঋষিদিগের এই অভিপ্রায় নিম্নলিখিত শ্লোকে নিবদ্ধ আছে—

"ঋণং যস্য গৃহীত্বা যঃ প্রযাতি মরণং কিল।
ঋণদস্তৎসুতো ভূত্বা ভ্রাতা বা সমতাদৃশঃ ॥"
"যেন চাপহৃতো ন্যাসস্তস্য গেহে ন সংশয়ঃ।
ন্যাসস্বামী স পুত্রোঽভূৎ ন্যাসাপহারকস্য চ ॥"
"পূর্ব্ববৈরানুবন্ধেন সুতো ভূত্বা দিনে দিনে।
রিপুবৎ বর্ত্ততে তস্য ক্রূরকারী ন সংশয়ঃ ॥"

শ্লোকতিনটির অর্থ সুস্পষ্ট, অনুবাদবিন্যাস নিষ্প্রয়োজন।

এই বিষয়ের উপর স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে অনেকপ্রকারের জল্পকথা শুনা যায়। যে সকল পুত্র ঋণলক্ষণান্বিত, তাহাদিগের কার্য্যকলাপে ব্যথিত হইয়া স্ত্রীলোকেরা বলিয়া থাকে, এ ছেলে ধার শোধ লইতে আসিয়াছে। যাহারা ন্যাসলক্ষণান্বিত, তাহাদের জন্য দুঃখিত হইয়া বলে, আমি জন্মান্তরে না জানি ইহার কত অপকারই করিয়াছিলাম! রিপুলক্ষণান্বিত সন্তানকেও বলিয়া থাকে, আমি উদরে শত্রু ধারণ করিয়াছি। হয় আর মরিয়া যায়, এরূপ অল্পায়ু সন্তানের উপর স্ত্রীলোকেরা সন্দেহবতী হইয়া বলে, বুঝি আবার সেইটা আসিয়াছে। সন্দেহের জন্য ইহারা মৃতশিশুর অঙ্গে কোন-একটা চিহ্ন করিয়া দেয়। কেহ কর্ণচ্ছেদ, কেহ বা অঙ্গুলিচ্ছেদ, কেহ বা কুদ্দালের দ্বারা শরীরের কোন-একটা স্থান ব্রণিত করিয়া দেয়। শুনা গিয়াছে এবং দেখাও গিয়াছে, ঐরূপ চিহ্ন করিয়া দেওয়ার পর যে সন্তান হইয়াছে, সেই সন্তান সেইরূপ চিহ্নবিশিষ্ট। এরূপ কেন হয়?—কারণ কি?—তাহা আমরা বুঝি না। দার্শনিক পণ্ডিতেরা অনুমান করেন ও বলেন,

জননীর মনে ঐ ঐ চিন্তা সদা বিদ্যমান থাকে, বিশেষ গর্ভাবস্থায় অঙ্গুলিচ্ছেদাদির স্মৃতি প্রদীপ্ত হয়, সেই কারণে তাহার সেই সেই চিহ্নবিশিষ্ট সন্তান জন্মে। গর্ভাবস্থায় গর্ভিণীর মনোগত প্রবল ভাবের দ্বারা গর্ভস্থশিশুর আকার-প্রকার ও প্রকৃতি প্রভৃতি গঠিত হইয়া থাকে। শুনা গিয়াছে যে, য়ুরোপের কোন স্ত্রীলোক কৃষ্ণবর্ণ শিশু প্রসব করিয়াছিল। কিন্তু সেরূপ কৃষ্ণবর্ণ কেন হইল? এই আলোচনার পর ঐরূপ কৃষ্ণবর্ণ হওয়ার কারণকল্পে তত্রস্থ তাৎকালিক পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছিলেন যে, স্ত্রীলোকটির ঘরে একটি কাফ্রির চিত্রিত প্রতিমূর্ত্তি ছিল। স্ত্রীলোকটি গর্ভাবস্থায় প্রত্যহই সেই প্রতিমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিত, তাহাতেই তাহার তাদৃশ কৃষ্ণবর্ণ সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। এতদ্দেশীয় বিধানশাস্ত্রে যে ঋতুস্নাতা নারীর পক্ষে পতিদর্শনের বিধান এবং পরপুরুষ-দর্শনের ও কুদৃশ্যদর্শনের নিষেধ আছে, সে বিধানেও সে নিষেধের উদ্দেশ্যও পতিসদৃশ-সন্তানলাভ।

এই মনুষ্যবংশ অধঃপতিত না হয়, পশু-তুল্য না হয়, উত্তরোত্তর উত্তমগুণসম্পন্ন হয়, এই অভিপ্রায়ে পূর্ব্বকালের ঋষিরা এই মনুষ্য-বংশের উন্নতির জন্য যে সকল চিন্তাব্যয় ও চেষ্টা করিয়াছিলেন, সে সকল চিন্তার ও চেষ্টার কথা এতদ্দেশীয় বিধিশাস্ত্রে অদ্যাপি গ্রথিত আছে। "পুত্রেষ্টিযাগ" নামে একটা ব্যাপার ছিল, তন্মধ্য হইতে এতৎপ্রস্তাবোপযোগী যৎসামান্য অংশ নিদর্শনার্থ উদ্ধৃত হইল—

"যা যাথ যথাবিধং পুত্রমাশাসীত তস্যাস্তস্যাস্তাংস্তান্ পুত্রাশিষামনুনিশম্য তাংস্তান্ জনপদান্ মনসানু-পরিক্রাময়েৎ। ততো যা যা যেষাং যেষাং জনপদানাং মনুষ্যাণামনুরূপং পুত্রমাশাসীত সা সা তেষাং তেষাং জনপদানামাহারবিহারোপচারপরিচ্ছদান্ অনুবিধীয়-স্বেতি বাচ্যা স্যাৎ। ইত্যেতৎ সর্ব্বং পুত্রাশিষাং সমৃদ্ধিকরং কর্ম্ম।"

নারী কিপ্রকার পুত্রের প্রার্থনা করে, আচার্য্য তাহা জ্ঞাত হইয়া তাহাকে বলিবেন,—উপদেশ দিবেন, তুমি সর্ব্বদাই মনে মনে তদনুরূপ ভাব বহন করিবে। অপিচ, সে যে দেশের লোক ভাল মনে করে, তাহাকে বলি-বেন, তুমি মনে মনে সেই দেশে ভ্রমণ কর ও তদ্দেশীয় লোকের আকৃতিপ্রকৃতি অনুক্ষণ চিন্তা কর। পরে বলিবেন, তুমি সেই দেশের অনুরূপ আহার, বিহার, উপচার ও পরিচ্ছদ অনু-করণ কর। এই সমস্ত ক্রিয়া পুত্রকামীর মঙ্গলাবহ ও উন্নতিকর।

পুত্রেষ্টিযাগের এই বিধান আমাদিগকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিতেছে যে, নারী ঋতুকালাবধি গর্ভাবক্রান্তি পর্য্যন্ত যদ্রূপ রূপ-গুণসম্পন্ন পুরুষের সন্দর্শনাদি করিবে, প্রসবকালে সে সেইরূপ রূপগুণসম্পন্ন পুত্র প্রসব করিবেই করিবে। দৃশ্যপুরুষ যদি দেশান্তরীয় হয়, তাহা হইলে দেশপ্রকৃতির অনুবল প্রাপ্ত না হওয়ায় সে সর্ব্বাংশে দেশান্ত-রীয় পুরুষের অনুরূপ পুত্র প্রসব করিবে না, কোন কোন অংশে ব্যতিক্রমঘটনা হইবে। ফল কথা, ঐরূপ বিধানের বলে ৩।৪ পুরুষের পর সর্ব্বাংশে সমান পুত্র উৎপন্ন হইতে পারিবে। বিধান অবলম্বন না করিলেও পল্লীবাস ও নিত্যসংসর্গবশত ক্রমপরম্পরার দ্বারা অন্য-দেশীয় মনুষ্যের সন্তানে এতদ্দেশীয় সংসর্গি-মনুষ্যের আকৃত্যাদি জন্মে, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ ব্যাপার। অনেক হিন্দুস্থানীর বংশে বাঙালীর

রূপগুণাদি ও অনেক বাঙালীর বংশে হিন্দুস্থানীর রূপগুণাদি আবির্ভূত হইয়াছে, ইহা বোধ হয় অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

আমরা যদি এই সকল প্রাচীন কথার উপর নির্ভর করি, আস্থা বা বিশ্বাস স্থাপন করি, তাহা হইলে বোধ হয় যে, আমাদের "কর্ণচ্ছেদচিন্তার প্রভাবেই গর্ভিণী ছিন্নকর্ণ পুত্র প্রসব করে" এ কথা বলায় বাধা হয় না।

অতঃপর একটি দৃষ্টঘটনার উল্লেখ করিতেছি। হাওড়ার সন্নিহিত কোন এক গ্রামের একটি ভদ্রলোক প্রথমাবস্থায় অনপত্য ছিলেন। শান্তিস্বস্ত্যয়ন প্রভৃতি হিন্দুশাস্ত্রোক্ত বহুবিধ ক্রিয়ানুষ্ঠানের পর তাঁহার একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিল। ইনি এই পুত্রজন্মদিবসেই আনন্দিত হইয়া প্রতিবাসীদিগকে মিষ্টান্ন-প্রদানদ্বারা প্রায় শত টাকা ব্যয় করিলেন। পরে একমাস পূর্ণ না হইতেই সন্তানটি মরিয়া গেল। সন্তানের পীড়া উপলক্ষ্যেও তাঁহার অর্থ কিছু ব্যয়িত হইল। বৎসরান্তে পুনর্ব্বার একটি পুত্র হইল। এবার তিনি আনন্দিত হইলেন না। পুত্রটি এবার ছয়মাস নিরাময় রহিল, অন্নপ্রাশন উপলক্ষ্যে কিছু ব্যয় করাইয়া সপ্তমমাসে মৃত হইল। কিছুকাল পরে পুনর্ব্বার পুত্র হইল। এবার সেটি ৬বৎসর জীবিত রহিল, তৎপরে মরিয়া গেল। দুইবৎসর পরে আবার একটি পুত্র জন্মিল, এবার সেটি অষ্টাদশবর্ষ জীবিত রহিল। ভদ্রলোক এই অষ্টাদশবর্ষীয় পুত্রের বিবাহ দিলেন, বিবাহের পরেই পুত্রের সাংঘাতিক বাতশ্লেষ্মাবিকার উপস্থিত হইল। চিকিৎসায় কোন ফল দর্শিল না, অবশেষে মৃত্যুঘটনা হইল। মৃত্যুর পূর্ব্বে এই পুত্রটি নানাপ্রকার প্রলাপবাক্য বলিয়াছিল, তন্মধ্যে দুইটি প্রলাপ এতৎপ্রসঙ্গে বলিবার যোগ্য। মৃত্যুর পূর্ব্বে রোগী উন্মত্তের ন্যায় হইয়া বলিতে লাগিল, "আর একটি টাকা দাও—শীঘ্র আর একটি টাকা দাও। ডাক্তারবাবুকে দাও।" পুত্রের পিতা কি করেন, ডাক্তারবাবুকে আর একটি টাকা দিলেন। এই টাকা দেওয়ার পর রোগী পিতার মুখপানে চাহিয়া খিল্‌খিল্‌ করিয়া হাসিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে বলিল, "হইয়াছে—আমি আর আসিব না।" এই কথা বলিয়াই রোগী চক্ষু মুদ্রিত করিল, ক্রমে শবীভূত হইল। পরে দেখা গেল, রোগীর প্রাণত্যাগ হইয়াছে। অতঃপর এই ভদ্রলোকের আর কি পুত্র, কি কন্যা কিছুই হয় নাই!

মনুষ্যজীবের মধ্যে সর্ব্বদাই এইরূপ ও অনুরূপ ঘটনাসকল উপস্থিত হইতে দেখা যায়। সে সকলের মূল কি? কারণ কি? রহস্য কি? কেন হয়?—ভাবিতে গেলে কেবল আকাশ বৈ আর কিছু দেখা যায় না। অবশেষে ঋষিদিগের নিম্নলিখিত বচনাবলী মনে পড়ে—

> ঋণসম্বন্ধিনঃ কেচিৎ কেচিন্ন্যাসাপহারকাঃ।
> রিপবশ্চ প্রিয়াশ্চেতি স্বকর্ম্মবশবর্ত্তিনঃ॥
> ভেদৈশ্চতুর্ভির্জায়ন্তে পুত্রামিত্রাঃ স্ত্রিয়স্তথা।
> ভার্য্যা পিতা চ মাতা চ ভৃত্যাঃ স্বজনবান্ধবাঃ॥
> যেন যেন হি জায়ন্তে সম্বন্ধেন মহীতলে।
> ভৃত্যাশ্চান্যে সমাখ্যাতাঃ পশবস্তুরগাস্তথা।
> গজা মহিষ্যো দাস্যশ্চ ঋণসম্বন্ধিনস্তথা॥"

তাই আমার বক্তব্য—মৃতপুত্রক ও দুর্বিনীতপুত্রক ব্যক্তিরা সেই সেই অনুতাপে যেন বৃথা দগ্ধ না হন। বলা বাহুল্য যে, কেবল পুত্রেরাই যে পৌর্ব্বকালিক ঋণ, ন্যাস ও শত্রুতার সম্পর্কে

জন্মগ্রহণ করে, আর কেহ করে না, তাহা নহে। পুত্র, মিত্র, ভৃত্য, ভার্য্যা, পিতা, মাতা, বান্ধব, এমন কি বন্ধন পর্য্যন্তও পৌর্ব্বকালিক কর্ম্মসম্বন্ধের ঘটনায় সংঘটিত হইয়া থাকে।

শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ।

রাজতপস্বিনী।

[জীবনীপ্রসঙ্গ]

৬

বিস্ময়ের কথা এই যে, তাঁহাতে মাতৃভাবের তাদৃশ প্রাচুর্য্য থাকিলেও ন্যায়পরতায় মাতা সমান শক্তিশালিনী ছিলেন। দুই প্রহরের সময় তাঁহার কাছারী ভাঙিলে সেইদিন মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত সমাগত পত্রাদি, এবং দৈনিক খরচপত্রের সুমারের খাতা অন্দরে পাঠান হইত। ভোজনান্তে মহারাণী সমস্ত কাগজ-পত্র পাঠ করিয়া দেখিতেন এবং প্রয়োজন হইলে মতামত দিতেন। কিন্তু কর্ম্মচারীদের কৃত খরচ কখন তিনি বাজেয়াপ্ত করিতেন না। কেবল একদিন আট-আনা খরচ লাল কালি দিয়া কাটিয়া দিয়াছিলেন। দেখা গেল, একটি প্রজা তাঁহার সহোদরা ভগ্নীর ষ্টেট্‌সংক্রান্ত কোন কাজ করায় ঐ আট-আনা খোরাকী পাইয়াছে। দেওয়ানজী কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মহারাণীমাতা বলিয়া পাঠাইলেন যে, তাঁর ভগিনীর কার্য্যের জন্য পুত্রের ষ্টেট্ হইতে কেন খরচ পড়িবে? কুমার যখন পুটিয়ার ইংরেজীস্কুলে পড়েন, তখন একদিন জলখাবারের ছুটী হইলে ছেলে-দের সঙ্গে ক্রিকেট্ খেলিতেছিলেন। রাজ-বাটীর বক্সী রাধিকানাথ সেনের ভাগিনেয় বল্ নিক্ষেপ করিতে গিয়া হঠাৎ কুমারের চক্ষুতে আহত করিল। তিনি যন্ত্রণায় অধীর হইয়া তাহাকে গালি দেওয়ায় সে শাসাইয়া রাখিল, ছুটীর পর বুঝা যাবে! তার পর ছুটী হইয়া গেলে কুমারের পাল্‌কি "শিবের চৌকী" ও "মরাচৌকী"র মধ্যবর্ত্তী পথে অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া সুবুদ্ধি বালক অকস্মাৎ দৌড়িয়া-আসিয়া এক পার্শ্বের বরকন্দাজকে "মরাচৌকী"র দিকে ফেলিয়া দিল এবং ক্ষিপ্রহস্তে ধূলি লইয়া অন্য পার্শ্বের বরকন্দাজটার চক্ষে নিক্ষেপ করিল। তার পর রক্ষকহীন পাল্‌কির মুক্তপথে কুমারকে সজোরে কয়বার মুষ্ট্যাঘাত করিয়া নক্ষত্রবেগে দৌড়িয়া পালাইল। খবরটা কিঞ্চিৎ শাখা-পল্লবিত হইয়া অনতিবিলম্বে রাজবাটীতে পৌঁছিলে মহারাণীমাতা কুমারকে ডাকিয়া প্রকৃত ঘটনা অবগত হইলেন। তিনি কুমারকেই দোষ দিলেন। খেলা করিতে করিতে ছেলেপুলের অমন হঠাৎ লাগিয়াই থাকে, সেজন্য গালি দেওয়া বড় অন্যায় হইয়াছে। বলিলেন, "কোকন, কাল তুমি স্কুলে গিয়া বক্সীর ভাগিনেয়ের সঙ্গে সদ্ভাবে

খেলিয়া মাপ চাহিয়া আসিবে। নহিলে আমি জলগ্রহণ করিব না।" ওদিকে সেই বালক আত্মীয়বন্ধুদের কাছে ভৎর্সিত হইলেও বুঝিল যে, ব্যাপার তেমন কিছু গুরুতর হয় নাই, অতএব সে পরদিন নিয়মমত স্কুলে পড়িতে গেল। দেখিল, রাজকুমার আহত চক্ষু বাঁধিয়া আসিয়াছেন। জলখাবারের ছুটী হইলে কুমার আসিয়া বন্ধুভাবে তাহার হাত ধরিলেন এবং কহিলেন, "চল, খেলিতে যাই!" ছেলেটি তাহাতে সম্মত হয় না। শেষে যখন শুনিলেন, মহারাণীর আদেশে কুমারকে সেভাবে আসিতে হইয়াছে, তখন খেলিতে গেল। কুমার সেদিন ব্যাট্ ধরিয়াই চলিয়া গেলেন, চক্ষুর চিকিৎসা জন্য অতঃপর ৪।৫দিন স্কুলে আসিতে পারেন নাই। এই ক্ষুদ্র গল্পের নায়ক সেই "বীর"বালক মনোমোহনকর প্রৌঢ়বয়সে পদার্পণ করিয়াছেন। তাঁহার কয়বৎসর পূর্ব্বের দত্ত নোট্ হইতে শেষ কয় পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি:—"আমি মহারাণীমাতার নিকট পূর্ব্বোল্লিখিত ঘটনার পূর্ব্বে কোনদিন পরিচিত ছিলাম না। আমার দুষ্টামিই আমাকে তাঁহার নিকট পরিচিত করিয়া দেয়। কয়েকমাস পরে আমার অতি উৎকট জ্বর হয়। ক্রমাগত জোলাপের ঔষধ ব্যবহার করায় তিনদিন অবিশ্রান্তভাবে এমন বমন ও বিরেচন হইতে লাগিল যে, আমার জীবনের আশা লোপ পাইতেছিল। ডাক্তারগণ নিরাশ হইলেন। মহারাণীমাতার দাসীরা বারংবার আমার অবস্থা দেখিয়া গিয়া তাঁহাকে জানাইতে লাগিল। তখন তিনি স্বয়ং অম্লপিত্তের পীড়ায় অতিশয় কাতর হইয়াছিলেন। সেই সংবাদ পাইয়া তাঁহার কবিরাজ রাধিকাধর সেন মহাশয় আমার সঙ্কটাপন্ন অবস্থার দিন রাজবাটীতে আসিয়া মহারাণীর শারীরিক অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করেন। তিনি নিজের কোন কথা না বলিয়া অগ্রে আমাকে দেখিয়া যদি বাঁচানর কোন উপায় থাকে, তাহা করিতে বলেন। তৎক্ষণাৎ কবিরাজমহাশয় আমায় দেখিতে আসেন এবং সামান্য কয়টি বটিকাদ্বারা বমন ও বিরেচন বন্ধ করিয়া আমাকে মৃত্যুমুখ হইতে উদ্ধার করেন। অন্ন ও বিশুদাসী মহারাণীমাতার আদেশ অনুসারে সমস্ত পুটিয়া ঘুরিয়া কার্ ঘরে অন্ন নাই, কার্ বস্ত্র নাই, কার্ ব্যাধির উপযুক্ত চিকিৎসা হইতেছে না, সন্ধান করিয়া তাঁহাকে বলিত। তিনি তদনুসারে ব্যবস্থা করিতেন।"

কুমারের বয়ঃপ্রাপ্তির কিছুদিন পূর্ব্বে রাজশাহীর কোন পুরাতন মোক্তার রাজবাটীর কার্য্যে শৈথিল্য প্রভৃতি দোষে প্রধান কর্ম্মচারিগণের বিরাগভাজন হন। মোক্তারটি উপায়ান্তর না দেখিয়া প্রার্থনা করিলেন, মহারাণীর সমীপে হাজিরি দিয়া সকল কথা বলিবার সুযোগ তাহাকে দেওয়া হউক। অনেকদিনের আশ্রিত ব্রাহ্মণের এই ন্যায়সঙ্গত কথায় মাতা সম্মতিপ্রকাশ করিলে কুমার ইচ্ছাপ্রকাশ করিলেন যে, তিনি অন্তরালে থাকিয়া মোক্তারের সকল কথা শুনিবেন। মা বলিলেন যে, "তাহা হইতে পারে না। আমি এমন অবিশ্বাসের কাজ করিতে পারিব না। সে লোক মনে করিবে, সব কথা কেবল আমিই জানিলাম। তুমি কেন প্রকাশ্যে সব শোন না?" শেষে তাহাই হইয়াছিল। কুমারের বিবাহের পূর্ব্বে মহিষ-

মেখায় এক ব্রাহ্মণ নিজ অবিবাহিতা কন্যাকে পুটিয়ায় লইয়া আইসে এবং রাজসংসারের কোন প্রতিষ্ঠাপন্ন অথচ সসম্পর্কীয় কর্ম্মচারীর গৃহে তাহাকে রাখিয়া দেয়। বলা বাহুল্য, তাহার সহিত কুমারের বিবাহ হয় নাই। মেয়েটি ক্রমে বড় হইয়া উঠিল, পাত্র জুটে না, পিতা বলিয়া বেড়াইতে লাগিল যে, যখন বাক্যদান করিয়াছি, তখন কুমারের সহিত কন্যার বিবাহ হইয়াছে ধরিতে হইবে। ব্রাহ্মণ শুধু ইহাতে ক্ষান্ত না হইয়া মাঝে মাঝে নিজে ও মেয়েটির দ্বারা কুমারমহাশয়কে চিঠি লিখিতে লাগিল। তিনি মহা উত্যক্ত হইয়া একদিন আমাদের সমক্ষে মার কাছে প্রস্তাব করিলেন যে, সে কন্যার বিবাহ দেওয়াইয়া দেওয়া হউক। মহারাণী বলিলেন, "সে ব্রাহ্মণ নিজ জেদে কষ্ট পায়, আমি কি করিব? পাত্র কোথায় পাইব?" কুমার সাড়েতিন-আনির কুমারের নাম করিলেন, বলিলেন, "তার বিবাহ হইয়াছে বটে, কিন্তু আমি ফুস্‌লাইয়া তাহাকে রাজি করিতে পারি।" মা বলিলেন, "তা হইতে পারে না।" কুমার,—"আপনি মতামত কিছু দিবেন না।" মহারাণী—"তাই বা কেমন করিয়া হইতে পারে? এ বিবাহে যদি মত দিতে পারি, তবে তোমারও বিবাহ দিতে পারি। আর কাহারও উপর আমার অধিকার নাই, একা তোমায় বলিতে পারি।" মা হাসিলেন। এ হাসির অর্থ একটু রহস্য, কুমারের মন জানিবার কৌতূহল। কুমার বলিলেন, "তাই দেন!" মার মুখে সেই হাসি! আমায় সুধাইলেন, "শ্রীশ, কি বল?" আমি বলিলাম, "তা হ'লে বাড়ীতে কাক বসিতে পাবে না, অমন কথাও বলিতে নাই!" সকলে হাসিয়া উঠিলেন।

একদিন প্রাতে আমরা মহারাণীমাতার কাছে বসিয়া আছি, এমনসময় খবর আসিল, পুটিয়ার এক কুপল্লীতে এক গুলিখোর ব্রাহ্মণ মারা গিয়াছে, তাহার সৎকার হয় না। কোন্ সদ্‌ব্রাহ্মণ তাহার দাহকার্য্যে সহায়তা করিবে? ফণী মহাশয় উপস্থিত ছিলেন, তিনি বলিলেন, "সে আর ব্রাহ্মণ কিসে?" চারি-আনির রাণী-ঠাকুরাণী বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, তাঁহার আমলারা সকলে অনুপস্থিত, এ অবস্থায় পাঁচ-আনির বাটী হইতে ব্রাহ্মণ আমলা দেওয়া হউক। ইহাতে কেহ কেহ বলিলেন, "এ বড় অত্যাচার। তুমি মনিব, পেটের দায়ে হয় ত ব্রাহ্মণ আমলারা তোমার কথা শুনিবে, কিন্তু তোমার একবার ভাবা উচিত যে, কাজটি কি গর্হিত!" মা বলিলেন, "যদি সকল তরফের লোক যায়, আমাদেরও যাইবে। তাহা নহিলে কেমন করিয়া বলিব?" রাজসংসারের পেন্‌শন্‌প্রাপ্ত কাশীপ্রবাসী এক আত্মীয় কর্ম্মচারীর অল্পবয়স্ক পুত্র এই সময়ে আসিল এবং বলিল যে, শব লইয়া যাইতে সে প্রস্তুত। আমি বলিলাম, "দেখিও, কথা কাশী পর্য্যন্ত পৌছিবে!" এই নবযুবকের উৎসাহাতিশয্য দেখিয়া মা হাসিলেন, বলিলেন—"আচ্ছা, অনুমতি দিতেছি, তোমরা ডু ভেয়ে যাও,—কেমন?"

আর একদিন ফণী মহাশয়ের সঙ্গে মহারাণীর একটি জোতের কথা হইতেছিল। জোৎটি মাতার জায়গীর সম্পত্তির মধ্যে। মা বলিলেন, দুইজন ভদ্রলোক তাহা লইয়া বিবাদ বাধাইতেছে, তিনি আর কোন ভদ্রলোককে

জোৎ দিতে ইচ্ছা করেন না—চাষাদের দিবেন।

প্রসঙ্গক্রমে একদিন ভগিনীর পুত্রকন্যাদের বিবাহের কথা উঠিলে মা বলিলেন, "বড়-মানুষের ঘরে বিবাহ দিতে আমি দিব না। তাতে কত সুখ, সবই ত দেখিলাম। ৩।৪ হাজার টাকা আয়ের গৃহস্থের বাড়ীতে বিবাহ দেওয়া ভাল।" ত্রৈলোক্য বলিল, "হাঁ, তা হ'লে ত কাজকাম করিতে হবে!" আমি বলিলাম, "গৃহস্থের ঘরে কাজ করিয়াও যে সুখ, তোমার রাজার ঘরে তাহার কিছুই নাই।" মা পুনরায় কহিলেন, "কোকনেরও বিয়ে বড়-মানুষের ঘরে হতে দিব না। বড়মানুষের জামাই হ'লে অস্বাধীন হতে হয়।"

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার।

শয্যাসভার বক্তৃতা।*

স্ত্রী। দেখ, টাকা চাইতে যেন আমার মাথা কাটা যায়—এম্‌নি স্বভাব আমার যে, আমি কারো কাছে হাত পাত্‌তে পারি নে—মরে' গেলেও না। আমার নিজের জন্যে হলে—না খেয়ে মরি, ছেঁড়া ন্যাকড়া পরে' থাকি, সেও স্বীকার, তবু প্রাণান্তে মুখ ফুটে চাইতে পারি নে। তবুও চাইতে হয় তোমারই জন্যে, না চাইলে ত আর সিকি পয়সা বেরুবে না।—ঐ হ'লো—অম্‌নি চোটে উঠেছ—একটা কথা যদি আমার বল্‌বার জো আছে! কেন চাই? তোমারই জন্যে—তোমার যদি মায়া-দয়া থাক্‌তো,—ছেলে-পুলেদের দিকে একবার ফিরে চাইতে,তা হ'লে কি তাদের এ দুর্দ্দশা হয়! কি হয়েছে?—কি বল্‌তে চাই? ন্যাকা! যেন কিছুই জানেন না! ভগবান্ জানেন, যদি আমার হাতে কিছু থাক্‌তো ত এক পয়সা কখনো চাইতুম না। কখ্‌খনো না। অন্তর্যামী জানেন—টাকা চাইতে আমার কি কষ্ট হয়! কি বল্‌ছো? কষ্ট হয় ত চাই কেন? আহা! কি কথাই বল্লেন! মনে করছ বড্ড রসিকতাটা করেছ! তোমার মনে যদি একটু দয়ামায়া থাক্‌তো, তা হ'লে কি আর তুমি অমন আঁতে ঘা দিয়ে ঠাট্টা কর্‌তে পার? আজ যদি আমার হাতে দু পয়সা থাক্‌তো! সব কথায় হাত পা্‌তে মেয়েদের যে কি লজ্জা হয়, তা তারাই জানে! মা! কি ঘেন্না!

দেখ, আজ আর ঘুমুলে চল্‌চে না,—আগে আমার কথাটা শোন, তার পর যত ইচ্ছে ঘুমিয়ো! দেবতা জানেন, আমি ত এক-রকম বোবা হ'য়েই আছি—তা যদি-বা একটা কথা কইতে যাই, অম্‌নি তোমার ঘুম আসে! আচ্ছা, বলি আজ মাসটা কি, তা মনে আছে? আর ছেলেপুলেদের কাপড়ের দিকে একবার

---

* Mrs. Candle's Curtain Lectures-এর অনুসরণে।

চেয়ে দেখেছ—কি দশা হয়েছে? কেন—কি হয়েছে? আচ্ছা, কি বলে' জিজ্ঞাসা কর্‌ছো? ওরা এখনো সে শীতকালের ধোকড়া পরে' বেড়াচ্ছে! আর এদিকে যে ফাগুনের মাঝামাঝি হ'তে চল্লো! তার হয়েছে কি? ওমা, সে কি কথা গো! আজ ঐ মিত্তিরদের বিন্দি-দাসী তাদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে বেড়াতে এসেছিল—ওদের ওই ধোকড়া গায়ে দেখে সেটার যদি একবার নাক-তোলা দেখ্‌তে! আর তাদের বড় মেয়েটা এম্‌নি করে' চেয়ে রইল যে, আমি আর লজ্জায় বাঁচি নে। মনে হ'লো, দূর করে' তাড়িয়ে দিই, নয় বাছাদের ঘরে বন্ধ করে' রাখি! কি বল্লে? কথাটা বল্‌তে মুখে বাধ্‌লো না? কেন? আমার লজ্জা কিসের? তোমার ছেলেরা সব সং সেজে রয়েছে, তা তোমার লজ্জা নেই, লজ্জা হবে আমার! তোমার মত লোকের পাঁচজনের সঙ্গে মেলামেশা রাখ্‌তে নেই! বাছাদের কি দোষ—ওরা কেন মাথা হেঁট করে' থাকে?

তা বেশ! আর বেশী কথায় কাজ নেই! কিন্তু আমি এই বলে' রাখ্‌লুম যে, কাপড়জামা না হ'লে আমি ছেলেদের বাড়ীর চৌকাট পার হ'তে দিচ্ছি নে—হ্যাঁ দেখো, আমি তেমন মেয়ে নই—যে কথা সেই কাজ! আমার বাছাদের যে, যে-সে পথের লোকে এসে অপমান করে' যাবে, পরের চাকরদাসী এসে নাক তুলে যাবে, সে আমি সহ্য কর্‌তে পার্‌বো না!

বটে! কাপড়জামার জন্যে প্রায়ই টাকা চাই? ওমা! এমন জলজ্যান্ত মিথ্যেকথা কেমন করে' বল্লে? মুখে একবার আট্‌কাল না? এখনো আকাশে চন্দরসুয্যি উঠ্‌ছে! বছরে ক'টি টাকা কাপড়ের জন্যে দাও, তা হিসেব রাখ কি? আমার বাছারা ত সব লক্ষ্মী—এত কম টাকার কাপড়ে আর কারো চলে? আমি মর্‌তে যত টানাটানি করে' চালাই, ততই আমার বদ্‌নাম। কলিকাল কিনা! ভাল হ'তে নেই। যারা দুহাতে করে' জিনিষপত্তর সব উড়িয়ে দেয়—তাদের সুখ্যাতির আর বাকী থাকে না—ধন্যি ধন্যি পড়ে' যায়। গেল বারের জামাগুলো একটু-আধ্‌টু সেলাই করে' বদ্‌লে দিই নে কেন? কেন? আমার গরজ—আমি ও-সব পার্‌বো না। আর সেলাই করার বয়স আমার নেই—সে যখন পার্‌তুম, তখন কর্‌তুম। আচ্ছা, এ কথায় হাসির কি হ'লো? কাজ যদি কর্‌তে হ'ত, তবে কেমন হাসি বেরুত দেখ্‌তুম। আমি মর্‌চি নিজের জ্বালায়, এতে তোমার হাসি, তাইতে ত আমার সর্ব্বশরীর জ্বলে' যায়!

আচ্ছা, কেমন-ধারা লোক তুমি! আমি কি আর তোমাকে চিনি নে,—সেই তুমি টাকা দেবে, কেবল মিথ্যেমিথ্যি জ্বালাতন কর্‌ছ! আমি কি আর জানি নে যে, তুমি নিজের ছেলেদের কষ্ট দেখ্‌তে পার না? তবু আমাকে বল্‌তে হয় একবার, তাই বলি! কত টাকা লাগ্‌বে? এই ধর না কেন—কাশী, বিনি, রাম—কি বল্‌ছ—আর নাম কর্‌তে হবে না—তুমি সবারই নাম জান? আচ্ছা বেশ! তার পর ধর নিতু, পুঁটি, খোকা—। এদের সবারই—! কি বল্‌ছ? অত কথায় কাজ নেই—ক' টাকা চাই? এই দেখ না হিসেব করে'! আমি হিসেব করে'

বল্‌বো? তা বল্‌ছি—কিন্তু যেন ঘুমিয়ো না। দেখ, আমার বাছাদের একটু সাজিয়ে-গুজিয়ে দিলে—নিজে মুখে বল্‌তে নেই—যেন রাজপুত্তুর। সেদিন আমাদের হরিদাসীর মা এসেছিল বেড়াতে—সে খোকাকে দেখে বল্লে, যেন সাহেবদের ছেলে! আচ্ছা, আচ্ছা,—বল্‌ছি। মা!—একটা কথা যদি মন খুলে তোমার কাছে বল্‌বার জো আছে। সারাদিন খাটিখুটি, রাত্রে একটু গল্প কর্‌তে ইচ্ছে হয়—তা তোমার—কত টাকা লাগ্‌বে? টাকা-কুড়ি? ক্ষেপেছ? তাই কখন হয়—এই ধর না কেন। হিসেব চাও না—তা বেশ। কিন্তু পঞ্চাশটাকার সিকি পয়সা কমে হবে না। কি বল্‌ছ—এই সেদিন যে অতগুলো টাকা দিলে? সে কি গো! সে যে আজ পাঁচছ'মাস হ'লো। আর সে টাকা কি আমি নিজে খেয়েছি—সেও ওদেরই কাপড়চোপড়ে গেছে। কি, আমি ছেলেপুলেদের মাথা খাচ্ছি—ওদের নবাব করে' তুল্‌ছি! আচ্ছা, এমন কথাটা বল্লে কি করে'! ষাট্! ষাট্! বাছারা আমার—ষষ্ঠীর দাস! আমি নবাব কর্‌ছি? আর ভদ্দরলোকের ছেলেপুলে সব, ওরা ছেঁড়া কাপড়ে বেরুবে—তাতে তোমার অপমান নেই! কি—অত কথায় কাজ নেই—ত্রিশটাকা দেবে? কেন, একি ভিক্ষে দেওয়া, না আমি দরদস্তুর কর্‌ছি। আমি এখন ত্রিশটাকা নিই—তার পর আর কি, তুমি খোঁটা দাও যে, এই ত কমে চল্ল, তবে অত টাকা চেয়েছিলুম কেন? সে হবে না। পঞ্চাশটাকাই দিতে হবে। কি বল্‌ছ—এখন টানাটানির সময়, ওরা এত বাবুগিরি না-ই কর্‌লে? কি আমি ওদের বাবুগিরি শেখাই? কখনো না! আমি সে পাত্তর নই—আমার কাছে কোন বেচাল হবার জোটি নেই! আমি কেবল যাতে ভদ্রতারক্ষা হয়—তোমার মুখ হেঁট না হয়, তাই করি। কি—ত্রিশটাকার বেশী দেবে না! পঞ্চাশটাকার এক পয়সা কম আমি নোব না—তাতেই হ'লে হয়! পঞ্চাশটাকা দেবে বল, তবে ঘুমুতে দেব—ত্রিশটাকা বলেই যে পাশ ফিরে শুয়ে নিদ্রা দেবে—সে কিছুতে হ'চ্ছ না! আগে বল, পঞ্চাশ—পঞ্চাশ পঞ্চাশ—!"

স্বামী। তার পর আমি ঘুমিয়ে পড়্‌লুম। আমার বিশ্বাস, আমি এই ত্রিশটাকাই ধরে' ছিলুম, কিন্তু প্রাতে গৃহিণী বল্লেন যে, না, আমি পঞ্চাশটাকা দিতে স্বীকার করেছি—কি কর্‌বো! পুরুষের মন বড়ই দুর্ব্বল এবং—আর সে কথায় কাজ নেই—আমাকে পঞ্চাশ টাকাই দিতে হ'লো।

শ্রীঃ—

স্মরণ।

সেই গৃহ পড়ে' আছে তোমার করবীগাছে
আজি কত ফুটি' আছে রাঙা ফুলদল্,
বিল্ববিটপীর শিরে বসন্তপবনে ধীরে
পূজার ত্রিপত্র তব ফুটেছে কোমল।
তেমনিই ঘণ্টা বাজে সন্ধ্যা-আরতির মাঝে
তেমনি উজলে চূড়া শালগ্রামশিরে
ধূপধুনাগন্ধ বহি' বায়ু আসে রহি' রহি'
তোমার আশিষসম মম অঙ্গ ঘিরে।

ভাঙাঘাটে সে সোপান এখনো বিরাজমান
তব পদধূলা বুঝি আজো আছে তায়
উপরে সে বেণুবন বামে তব নিকেতন
যেথা হ'তে কতদিন ডেকেছ আমায়।
নদীপারে দেখি চেয়ে সেই ইক্ষু আছে ছেয়ে
কূলে সে পিটুলীতরু ঝুরুঝুরু কাঁপে
চঞ্চল জলের বুকে তারি ছায়া শুয়ে সুখে
নিশ্চিন্ত শিশুর মত এ বৈশাখ যাপে।

হে জননি! হেথা আজ বসে' আছি ভুলি' কাজ
ভাবি মনে তুমি যেন বহি' এ সোপান
সুবর্ণডিঙির 'পরে আরোহি বিশ্রামতরে
কোন্ নব পিত্রালয়ে করেছ প্রয়াণ।
সেথায় মায়ের কোল ভরি' হাসি' উতরোল
তুলিছে মধুর বোল তব পদ্মমুখ
আমি হেথা বসি' ঘাটে দিবা মোর ব্যর্থ কাটে
অশ্রু আর নিরাশার ঝড়ভরা বুক।

তোমার এ লীলাভূমি দেখিবে না আর তুমি
এ নন্দনবনে হায়! এ কি অভিশাপ?
ছিল যাহা দেবালয় সুখময় পুণ্যময়
সেথায় আজিকে আছে দৈন্য আর তাপ।
কিছু ত লও নি সাথে চলে' গেছ রিক্তহাতে
দৈন্যের কঙ্কাল তবু শুষ্কচোখে চায়
অসার যা তাই দিয়ে রেখে গেছ ভুলাইয়ে
অন্তরের সেই দৈন্য ক'দিন লুকায়?

দিবা অই হ'ল শেষ কই সে তৃপ্তির লেশ
বিরাম কিনিব আমি যার বিনিময়ে?
সুদীর্ঘ আসিছে রাতি নিবানো আনন্দবাতি
অনাদর-অন্ধকার ঘেরিছে নিলয়ে।
নদীবন আলো করি' বাহিয়া সুবর্ণতরি
এস শান্তিময়ি এস—এস দুঃখহরা
হেরিব তোমার রূপ বিশ্বতলে অপরূপ
এ পুণ্যনদীর তীরে বরাভয়করা।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

রাইবনীদুর্গ।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

বর্গীর হাঙ্গামার অনতিপূর্ব্বে রাজনৈতিক এবং সামাজিক যে সকল ক্ষুদ্র-বৃহৎ বিপ্লবে বঙ্গসমাজ বিক্ষুব্ধ হইয়াছিল, তাহা মনে রাখিলে মহারাষ্ট্রীয় অশ্ববাহিনীর সেই অভিযানব্যাপার নিতান্ত আকস্মিক বলিয়া প্রতিভাত হয় না। প্রাকৃতিক নিয়মে বাষ্পকণা শনৈঃশনৈঃ সঞ্চিত হইয়া অনুদিন মেঘের সৃষ্টি করিতেছে। সময়ে নিবিড় ঘনঘটায় পরিণত হইয়া তাহা যখন বজ্রবিদ্যুতে ভীষণ হইয়া উঠে, তখনই তাহার বিপুলশক্তি অনুভূত হয়। বাস্তবিক মোগলপাঠানের দীর্ঘকালব্যাপী দ্বন্দ্বের পর হিন্দুমুসলমানের সাধারণ স্বার্থ যে মিলনক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছিল, চিরদিন তাহা উভয় জাতিকে স্থায়ী সুখশান্তি দান করিতে পারিত। কিন্তু আলীবর্দ্দীখাঁর দুর্জ্জয় সাম্রাজ্য-লোভ তাহাতে বাদ সাধিল। তিনি স্বয়ং রাজোচিত নানাগুণে বিভূষিত হইলেও প্রভু-

হত্যাপাপলব্ধ সিংহাসনে যে কলঙ্ককালিমা লেপন করিলেন, উত্তরকালে বঙ্গোপসাগরের সমগ্র বারিরাশি জাহ্নবীপথে পলাশীক্ষেত্র পর্য্যন্ত উদ্বেল হইয়া তাহার কিয়দংশমাত্র ক্ষালন করিয়াছে।

যে সকল কমনীয় গুণ যুগযুগান্তর ধরিয়া হিন্দুস্থানে অনুশীলিত ও ধর্ম্মের অঙ্গীভূত হইয়াছে, কৃতজ্ঞতা তাহার অন্যতম। আলীবর্দ্দীখাঁ তাহার মূলে কুঠারাঘাত করিয়া মুসলমান-রাজধর্ম্মের দৃঢ় ভিত্তি শিথিল করিয়া দিলেন। তিনি যে আগুন জ্বালিয়া গিয়াছিলেন, তাহা তদীয় স্নেহপুত্তলিকে ভস্মীভূত করিয়া কোথায় নির্ব্বাপিত হইয়াছিল, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিতেছে।

এইজন্যই বর্গীর হাঙ্গামা প্রথমে জয়যুক্ত হইয়াছিল। শিবাপ্রসন্ন দাসের মত যে সকল ক্ষমতাশালী হিন্দু তাহার সহায়তায় প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, নূতন নবাবের বিশ্বাসঘাতকতায় সমগ্র বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যা সংক্ষুব্ধ হইয়া না উঠিলে তাহা সম্ভবপর হইত না।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

পদাঙ্কনারায়ণ যে শব্দ শুনিয়া বাহিরে আসিল, তাহা মহারাষ্ট্রসেনার সমবেত অশ্বপদ-ধ্বনি নহে। অপরাহ্ণ হইতে সেদিন মেলার লোকে যাহা আশঙ্কা করিয়াছিল শেষে তাহাই ফলিয়া গেল। সহসা সুবর্ণরেখানদীতে ভীষণ বন্যা আসিল, তাহার গর্জ্জন দিকে দিকে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

বর্গীসেনা যে সময়ে নদীপার হইয়াছিল, তখন বরাবর চলিয়া গেলে সন্ধ্যার প্রাক্কালে তাহারা উমাপুরে পৌঁছিতে পারিত। কিন্তু নিদারুণ গ্রীষ্মমধ্যাহ্নে দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া তাহাদের অনেকে শ্রান্তক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সুবর্ণরেখার স্বচ্ছশীতল বারি-স্রোতে একবার হাতমুখ ধুইবার লোভ অনেকের পক্ষে অসংবরণীয় হইয়া উঠিল। বিশেষত সৈন্যমধ্যে যাহারা জাতিতে ব্রাহ্মণ, সন্ধ্যা-বন্দনার এমন সুযোগ তাহারা উপেক্ষা করিতে পারিল না।

এদিকে শিবাপ্রসন্ন ও ভাস্করপণ্ডিত অশ্বারোহণে সুবর্ণরেখার বিশাল সৈকতভূমি পার হইতেছিলেন। ক্ষীণ চন্দ্রালোকে উভয়ে দেখিতে পাইলেন, এক ব্যক্তি "দণ্ডী দিতে দিতে" মহাদেবস্থানের দিকে অগ্রসর হইতেছে। তখনও অগ্নিবৎ উত্তপ্ত বালুকারাশির উপর সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইতে হইতে উপবাসক্ষীণ ভক্ত প্রাণপণে অভীষ্টস্থানে চলিয়াছে দেখিয়া দুজনে অশ্বরশ্মি সংযত করিলেন। ভাস্করপণ্ডিত বলিলেন, "এমন দৃশ্য দাক্ষিণাত্যে আমরা বড় দেখিতে পাই না। কিন্তু ভক্তের এই বীরত্বের কাছে সৈনিকের শৌর্য্যবীর্য্য কি তুচ্ছ!" শিবাপ্রসন্ন কোন উত্তর দিলেন না, তিনি উন্মুখ হইয়া অন্যমনস্ক হইতেছিলেন। তার পর সুদূরশ্রুত বন্যাগর্জ্জন বুঝিতে পারিয়া তিনি পণ্ডিতজীকে অবিলম্বে নদীপার হইয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন। বলিলেন, "আমি নিজে এই বিপন্ন ভক্তকে এভাবে ছাড়িয়া যাইতে পারি না। কিন্তু এরূপ বিপদে সর্ব্বদা আমি অভ্যস্ত, আমার জন্য আশঙ্কা নাই!" পণ্ডিত তথাপি দাসমহাশয়কে নির্ব্বন্ধাতিশয়ে বারংবার উপরোধ করিয়া অপেক্ষা করিতে-ছিলেন, কিন্তু শেষে তাঁহার সঙ্কল্প অটল বুঝিয়া যথাসম্ভব বেগে অশ্বচালনা করিলেন।

তিনি পরপারে উত্তীর্ণ হইতে না হইতে বন্যাস্রোতে নদীবক্ষ স্ফীত হইয়া উঠিল।

কুমার পদাঙ্কনারায়ণ পুনরায় অশ্বারোহণ করিয়া নদীর দিকে ছুটিয়া গেল। তখন বন্যাজল সুবর্ণরেখার কূলে কূলে পূরিয়া উঠিয়াছে। পথে কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া তাহার উদ্বেগের সীমা ছিল না। ক্রমে তীরে আসিয়া দেখিল, বর্গীসেনা নিতান্ত বিশৃঙ্খলভাবে সজ্জিত হইবার চেষ্টা করিতেছে—গোটাকতক ঘোড়ার কোন সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। স্বয়ং ভাস্করপণ্ডিত আর্দ্র অশ্বে আরোহণ করিয়াই বিচ্ছিন্ন সৈন্যগণকে অবিলম্বে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে আদেশ করিতেছেন।

কুমারকে দেখিয়া তিনি অতিমাত্র বিচলিত হইয়া উঠিলেন। প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে দাসমহাশয়ের অভাবনীয় আপদের সংবাদ তাহাকে দিয়া নিজেকে ধিক্কৃত করিলেন। বলিলেন, "আমার তাঁহাকে ছাড়িয়া আসা কিছুতে উচিত হয় নাই, নিতান্ত কর্ত্তব্যানুরোধে আসিয়াছি। প্রভুর বিপদ্ শুনিয়াই গঙ্গাদীন রাজঘাটের দিকে চলিয়া গিয়াছে। তুমি বাড়ী ফিরিয়া গিয়া অন্যান্য ব্যবস্থা কর। আমার আজ রাত্রে জঙ্গলমহালের শিবিরে না গেলে নহে। তাই আমি আর অপেক্ষা করিতে পারিতেছি না। বড় দুঃখ রহিল, দাসমহাশয়ের সঙ্গে তাঁহার গৃহে যাইতে পারিলাম না।"

পদাঙ্কনারায়ণ অশ্বকে কশাঘাত করিয়া বেগে উমাপুরে ফিরিয়া গেল। দুই দণ্ডের পর প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখিল, মহারাষ্ট্রীয় সেনা প্রস্তুত হইয়া অগ্রসর হইতেছে। ভাস্করপণ্ডিতকে প্রণাম করিয়া কুমার বলিল, "আমি আমার ঠাকুরাণীদিদির আদেশমত আপনাদের লইতে আসিয়াছি। ঠাকুরদাদামহাশয়ের আপদের কথা শুনিয়া তিনি কহিলেন, 'পরের কাজে নিত্য ইহার চেয়ে গুরুতর বিপদ্ তিনি আলিঙ্গন করেন। ভগবানের কৃপায় নিরাপদে ফিরিবেন। কিন্তু সেজন্য অতিথি বিমুখ হইলে চলিবে না। আপনাকে সসৈন্য উমাপুরের বাড়ীতে একবার পদার্পণ করিতেই হইবে।'"

পণ্ডিতজী বিস্মিত-বিমুগ্ধ হইলেন। বলিলেন, "তাহাই হউক, সাধ্বীর বচন মা ভবানী পূর্ণ করুন। এমন কথা আর কখন শুনি নাই। তিনি তোমার দাদামহাশয়ের যোগ্যা গৃহিণী,—যথার্থ সহধর্ম্মিণী! যে গৃহে এমন লক্ষ্মী অধিষ্ঠিতা, তাহাই সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠ। দাস-মহাশয় ফিরিলে একাকী আমি আসিয়া তাঁহার অতিথি হইব।"

তখন পণ্ডিত দেখিতে দেখিতে শ্রেণীবদ্ধ অশ্বারোহী সৈন্যের অগ্রে অন্তর্হিত হইয়া গেলেন।

ক্রমশ।

বঙ্গদর্শন।

রেখাক্ষর বর্ণমালা।

প্রথম খণ্ড।

বর্ণাধ্যায়।

গণেশ-বন্দনা
গোড়া'য় মন্দ না॥

ইঞারে প্রণমি!
ইনি গণেশঠাকুর!
নাক দিয়া বাহিরয়
বাজখাঞি সুর॥
টবর্গের দেউড়িতে
বাবাজি গণেশ
মনের আনন্দে দিয়া
বোঁচ্‌কায় ঠেস,

ইঞা ইঞো ইঞা রবে সাধিছেন গলা।
পিছু থেকে নন্দী আসি দিয়া কান-মলা,
বোঁচকা টানিয়া ল'য়ে দেখে তাহা খুলি'—
সর্ব্বনাশ! শঙ্করের সিদ্ধি'র ঝুলি!
নন্দী উনি গণেশের গুরুমহাশয়!
"সিদ্ধিরস্তু * অ আ ই ঈ" ইত্যাদি-বিষয়—

* আমাদের ছেলেব্যালাকা'র ডাহা স্বদেশী গুরুমহাশয় মাদুর-বিছানো ভূতলে আসন-পীঁড়ি হইয়া বসিয়া বেত্র উঁচু করিয়া পাখি-পড়ানো ছন্দে আমাদিগকে উচ্চৈঃস্বরে পড়াইতেন—"সিদ্ধিরস্তু অ আ ই ঈ" ইত্যাদি।" বছর-তিনেক পরে ডাহা একেলে পণ্ডিতমহাশয় চেয়ার গ্রহণ করিয়া আমাদের সেই আদিম পাঠের শিখাকর্ত্তন করিলেন—সিদ্ধিরস্তু-অংশটি [illegible] মতো ছাঁটিয়া ফেলিলেন;—অথচ তাঁহার নিজের প্রযত্নপোষিত শিখাটি লম্বায় চওড়ায় দিব্য মানানসই ছিল।

বিশেষত "সিদ্ধিরস্তু" আর সিদ্ধিঘোঁটা,
কেমনে বা পি'তে হয় ভরি' ভরি' লোটা,
যাবৎ না লম্বোদর হইয়া ভরাট্
ধরয়ে মণ্ডলাকৃতি মূরতি বিরাট্ ;
নন্দীর নিকটে শেখা বিদ্যা এ সমস্ত !
কাজেই সিদ্ধির ঝুলি পিঠে তাঁর মস্ত ॥
আরেক বিদ্যায় তাঁর লম্বোদর ভরা।
বড় বিদ্যা সে বিদ্যা যদি না পড়ে ধরা ॥
তন্ত্রে আছে চাবি-দেওয়া মন্ত্র ভূরি ভূরি—
না যাহাতে গণেশ সিদ্ধি করেন চুরি ॥*
লক্ষকোটি মন্ত্রজপে বুদ্ধি যার ভোঁতা।
খুঁজিয়া না পায় শেষে সিদ্ধি যায় কোথা !
"গণেশ করেন চুরি" তন্ত্রে লেখে পষ্ট।
লোকে জানে গণেশজি সিদ্ধি ল'য়ে অষ্ট
বিলাইতে ব'সেছেন জগত-মাঝারে।
ঢ্যাঁঢরা পিটিছে তাই সহরে বাজারে
(এ ও'রে বলিছে আর "সজোরে বাজা রে !
সিদ্ধি লভে **একজন** যদি বা **হাজারে**—
জানে না **গণেশজিই** সিদ্ধির করতা !")
"গণেশে ভজ রে ভাই ছাড়িয়া জড়তা ॥"
মূঢ়জনে নাহি জানে গূঢ় এ বারতা—
সিদ্ধির **করতা** যিনি তিনিই **হরতা** ॥
গণুজি'রে হনুজি কহিলা বন্ধুভাবে
"চুরি-করা আম্রফল গলে নাহি নাবে ॥"
কিন্তু চোরা নাহি শোনে ধর্ম্মের কাহিনী !
শূলী'র সিদ্ধি'র ঝুলি হ'ল সেই-দিনই
নিরুদ্দেশ ! নন্দি-ভৃঙ্গী পথে হ'য়ে বে'র
মুখ-চাওয়াচাউয়ি করে পরসপরের ॥

* তন্ত্রের সাধকদিগের ইহা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, চোর গণেশ বিধিমতে পূজা না পাইলে সাধকগণের সিদ্ধি চুরি করেন।

নন্দী বলে "নিমেষেক থাক' তুমি স্থির।
চোরে আমি করিতেছি আনিয়া হাজির॥"
অদৃষ্টে আছয়ে নাকি ঘা-কতক বেত—
ধরা পড়িলেন ইঞা বমাল-সমেত॥
"সিদ্ধিচোর!" বলি নন্দী আরক্তনয়নে
ইঞারে লইয়া চলে শঙ্করসদনে॥
লাফাইয়া আসি হনু চুপিচুপি বলে
"কাঙাল-জন্তু'র কথা বাসী হ'লে ফলে!"
ঝুলিটি সে শূলীজি'র সবে-মাত্র পুঁজি।
মহা খাপা আজি খ্যাপা না পে'য়ে তা খুঁজি॥
"হারা ঝুলি পাওয়া গেছে" নিবেদিলা ভৃত্য।
দিগম্বর ভোলা আর আরম্ভিলা নৃত্য॥
অট্টহাসে ভূত ভাগে, বন-শৈল কাঁপে।
অবাকিয়া দিক্‌বধূ মেঘে মুখ ঝাঁপে॥
গর্ত্তে ঢুকিলেন ইঞা চড়িয়া মূষিক।
বরণমালা'র আর মাভা'ন্ না দিক্॥
চৈতন্যচরিতে স্নান্ মাঝে-মাঝে ডুব।
ভাইঞা-লোগ্ * পাইঞা সেথা আড্ডা জমে খুব!

নএর নাট।

বাহবা! দন্ত্য ন এযে
আসিয়াছে ইঞা সেজে!
কত আর হাসিব বল না!
কোকিলের হ'য়ে বাচ্ছা
কাগের ছা একি আচ্ছা!
দেখি নাই এমন ছলনা॥

* ভাইঞা, ভাঞ্যা, ভাঁইয়া, তিনের উচ্চারণ একই। ভাইয়া-লোগ্ খোট্টাই বুলি, তাহার বাঙ্‌লা অনুবাদ ভাইলোক। ভাইয়া-শব্দের লেজুড় ঐ যে, য়া, উহার স্থানে ঞা হইয়াছে কোন্ ব্যাকরণের হুকুমে, তাহা চৈতন্যচরিত প্রভৃতি মধ্যমযুগের বাঙ্‌লা গ্রন্থকারচূড়ামণিদিগকে জিজ্ঞাসা কর;—তাঁহারাই ঞা-পাঠপ্রবর্ত্তনের আদিগুরু।

দাঁও পেয়ে দেঁতো ন'র ফুটিয়াছে বুলি।
বিঁধা'য়ে বিঁধা'য়ে বলে বাক্য এইগুলি ॥
"প্রত্যাশা রাখি না কোনো তোমাদের আর!
যাচ্ঞা করিনু ক্ষমা—যাক্রাই সার!
গুরু-আজ্ঞা গুরু আজ্ঞা! কা'রে তবে শঙ্কা!
মাথায় ধরিয়া তাহা, বাজাইয়া ডঙ্কা,
চছজঝ-গজবর-চারিটার স্কন্ধে
চড়িয়া ব্যাড়াব আমি মনের আনন্দে :
পন্‌চ জনে সাক্ষী মানি—পন্‌চ কি পঞ্চ না?
মুর্খ লোকে মুর্খ বলি' দিক্ না লান্‌ছনা!
লান্‌ছনায় গন্‌জনায় ডরে কোন্ জনা?
লান্‌ছনা লাঞ্ছনামাত্র, গন্‌জনা গঞ্জনা!
ঝন্‌ঝা ল'য়ে মহা-ঝঞ্ঝা হৈল এ যে সুরু!
ঝন্‌ঝায় টলে-না এ না', শক্ত মাঝি গুরু ॥

শূন্যের শূন্যতা।

শবদের অন্তে মাঝে য-ড-ঢ'র মুখে
বেরো'য় য়-ড়-ঢ় বুলি শ্লেষ্মা জমি' বুকে ॥
জানো যদি কেন তবে শূন্য দেও নীচে?
চেনা বামুনের গলে পৈতে কেন মিছে!
নবোঢাই তো নবোঢ়া, ঘোড়াই তো ঘোড়া।
এ ছার ঘোড়ার ডিম অনর্থের গোড়া!

ময়ূর মজুর তো না! কিসে তবে দুখী?
ডিম পাড়ে বা না-পাড়ে উহার তা' খুসী!
ভুষুণ্ডী যে বহুকেলে প্রাচীন বায়স!
ডিম পাড়িবার তা'র আছে কি বয়স?
দিলাম বাইশ ছত্র— ধীরে ধীরে পড়'
যাবৎ না হয় তাহা কণ্ঠে সড়গড় ॥

পাঠ।

আষাঢে ঢাকিল নভ' পযোধর-জালে ॥
বাযস উডিযা বসে ডালের আডালে ॥
বরষণ সুরু হ'তে দৌডি তাডাতাডি
পান্থশালে ঢকিযা বাঁচিনু হাঁপ ছাডি ॥
ঘডি খুলি নেহারিনু ব্যালা সাঢে তিন।
গজগতি পা বাডায আষাঢের দিন ॥
ফেলিযা রাখিযা ঘডি মেজের উপরে।
কাপড ছাডিতে গেনু পাশের কোটরে ॥
পরিনু নূতন্ ধুতি ব্যাগ্ থেকে নিযে
উদ্ধচিত হইনু খডম পাযে দিযে।
খুলিযা খডম-জোডা
খাটিযায পাশ-মোডা
দিতে দিতে চক্ষে এ'ল ঘুম।
তডিঘডি উঠে' পডি'
দেখিলাম নাই ঘডি
হ'ল আর আক্কেল গুডুম ॥
ঘডি'র পো হ'যে ঘুডি
কোথায গেল রে উডি!
হায হায! স্বর্ণে মোডা সে যে!
লেজুড সোনার চেন্
উডি গেছে হ'যে শ্যেন!
হাউই যেমন যায তেজে ॥

V-বিসর্জ্জন।

গুরুজি'র মহা-ভাব্না "গিয়াছে তো ইঞা—
বত্রিশ কেমনে করি তেত্রিশ ভাঙিঞা?
বরং গর্দ্দভ পিটি' অশ্বায়িতে পারি—
বর্ণমালী ভায়াটি'রে মানিয়াছি হারি!"
কহিলা বর্ণমালীরে ডাকি নিরালা'য়
"কলহ পুষিছ কেন বরণমালা'য়?

এক বএ বস্ আছে—তুই ব কিজন্য ?"
এত শুনি বর্ণমালী হইলা বিষণ্ণ ॥
বলিলা বিবর্ণমুখে "রেখাচার্য্যদাদা!
অন্তস্থ বএর আমি জানি তো মর্য্যাদা!
সেযে ব বেদের মূল! ভুবনের সার!
ইংরাজি Vএর মতো উচ্চারণ তা'র ॥"
গুরুজি ধমক দিলা "কহিছ কিরূপ?
মরিতেছে V-বেচারী—সাজে কি বিদ্রূপ?—
বঙ্গের ভ-ভূত চাপে V'র যবে ঘাড়ে,
ভ-ভ-ভ-ভ-বুলি তা'রে বলাইয়া ছাড়ে ॥
বাঙালী না-জানে বেদ, না-জানে কোরাণ!
দশচক্রে Bhagavan হৈলা Vagaban!
পশ্চিমে সুঅর্ণ ফলে; সুবর্ণ সে খাঁটি
বঙ্গের মাটিতে পড়ি, একেবারে মাটি!
আছিলেন বিক্টোরিয়া সাক্ষাৎ জননী!
দগ্ধিয়া মারিলা তাঁরে বঙ্গের লেখনী
ভিক্টোরিয়া ভিক্টোরিয়া করি দিবারাত্র!
ভএর ভ্রুকুটি দেখি জ্বলি' যায় গাত্র!"
এত শুনি বর্ণমালী সুরু করে কান্না।
বলে "বস্ করো দাদা! হইয়াছে! আন্না!"

হেন শুভ অবসরে রেখাচার্য্যদাদা
নিঃশবদে ডিঙাইয়া পুঁথি গাদা-গাদা,
বর্ণমালা-পিঁজিরা'র খুলি দিলা দ্বার।
অন্তস্থ ব উড়ি' গেলা রাজ্যে আপনার ॥

চতুর্ব্বর্ণ আর চতুর্ব্বর্গ ॥

"চারি বর্ণ, চারি বর্গ, উগরিলা ব্রহ্মা!"
হেন বাক্য কানে শুনি' রেখাচার্য্য শর্ম্মা
বলিতে চাহেন কিছু! কি বলেন—শুন :—
বর্ণ চারি—ঠিক্! কিন্তু বর্গ তা'র দুনো ॥

শুধুই কেবল জানে—দৃষ্টি যা'র ক্ষুদ্র—
চারি বর্ণ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র ॥
চারি বর্ণ বরণমালা'র পদে পদে !
চলে ক খ গ ঘ রথ ঘর্ঘরশবদে ॥
পাছু-পাছু চ ছ জ ঝ চ'লেছে পদাতি।
চলে ত থ দ ধ ঘোড়া প ফ ব ভ হাতি ॥
ন ণ ম ঙ নটদল নাকীস্বরে গায়।
ট ঠ ড ঢ তাল স্থা'য় হাতুড়ি'র ঘা'য় ॥
ভাবে হ'য়ে বিভোর গড়ায় র ল য হ।
স ষ শ ক্ষ শীষ্ দিয়া জাগায় বিরহ ॥
আঁটঘর চারি বর্ণ পাইনু গুণিয়া।
চারে চারে ছয়লাপ আজব দুনিয়া ॥
চৌবর্গে চারি-রঙের চারি ফল মেলে।
ফলে কিন্তু শস্মা নহে ভুলিবা'র ছেলে॥
ফলের সঙ্গে অফল গায়ে-গায়ে গাঁথা।
খুঁড়িতে খুঁড়িতে কেঁচো সর্প তোলে মাথা ॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চারি ফল মোটে।
জুটিলে অফল-চারি অষ্ট হ'য়ে ওঠে ॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম ফলাফল যুগ-বাঁধা ঘুঁটি।
অর্থানর্থ, কামক্রোধ, তেম্নি-দুটি-দুটি ॥
মোক্ষবন্ধ ফলাফল জুড়ি' দিয়া তা'তে,
পুরা আট বরগ পে'লেম হাতে হাতে ॥
এ আটের জুড়ি-আট অতি চমৎকার।
বর্ণমালা-গাছে ফলে ফলাফল তা'র ॥
ক খ গ ঘ কবর্গ, চবর্গ চ ছ জ ঝ।
পহিলা এ-দুই বর্গ, কথা-টি সমঝ' ॥
ত থ দ ধ তবর্গ, পবর্গ প ফ ব ভ।
দোসরা এ-দুই বর্গ, শিক্ষা এই লভ' ॥
নবর্গ ন ণ ম-উঁআ কাঁদে যেন খুকী।
ট ঠ ড ঢ টবর্গ দাঁড়ায় তাল ঠুকি' ॥
র ল য হ চারি বর্ণে রবর্গ ভরাট্।
স ষ শ ক্ষ সবর্গ, বগ্‌গ এই আট ॥

রবর্গ-রহস্য বা নব রামায়ণ।

রবর্গ-কাহিনী শুন', রহস্য বড় এ।
ঋএ অএ র হয়, ল হয় ৯এ অএ॥
ইএ অএ য হয়, এ কথা মিথ্যা নয়।
অ পিতা, ঋ ৯ ই মাতা, র ল য তনয়॥
অ-উনি অযোধ্যাধিপ রাজা দশরথ।
র রাম, ল লক্ষ্মণ, য জড়ভরত॥
ঋ ৯ ই মহিষী তিন বৃদ্ধ মহীশের।
অযোধ্যা বরণমালা; অভাব কিসের?
দশরথ অজসুত, জানা আছে তব।
স্বরেশ্বর খজসুত বারতা এ নব॥
"খজ কে আবার" বলি' হ'লে যে আড়ষ্ট!
খ হৈতে জনমে বায়ু বেদে লেখে পষ্ট॥
অ বায়ুর তনয়, এ নয় উপহাস।
অ থাকিত কোথায় না-থাকিলে বাতাস?
অএর বৈমাত্র ভাই কে জানো? হ-বীর!
অকার গলা'র স্বর, হকার নাভি'র॥
অএর মা কণ্ঠনলী, হএর মা নাভি।
ঠাণ্ডা করে দোঁহে বায়ু, উঠি আর নাবি॥
KA'র ভাই KHA তো বটে? গ'র ভাই ঘ তো?
অ'র ভাই কে তাহা বুঝা'ব আর কত?
K-কেশ ফেলিয়া কাটি KA KHA দুই ভাই
অ হ হয়; দুটি যেন গউর নিতাই!
অকার সহজ স্বর, হকার হাঁপানি।
হাঁপানি'র বিদ্‌ঘুটে লাফানি-ঝাঁপানি॥

যে-দেখি ল্যাজের ঘটা অএর হএর
বায়ুপুত্র উভয়েই পেয়েছি তা' টের॥

ত্রেতাযুগে কে কি ছিল কি হবে তা ভেবে?
রেখাচার্য্য কি বলেন শুন তাই এবে॥
রাণীদের শাণিতাস্ত্র না পারি সহিতে,
রলয এ তিন ভাই হ-খুড়া সহিতে
জনমের মতো ছাড়ি স্বরের সংসর্গ,
বরগী'র দলে মিশি' হইলা রবর্গ॥
কোথা হ'তে এ'ল ওরা কেহ নাহি জানে।
আন লোকে আন বলে শুনি আমি কানে॥
পষ্ট ওরা স্বর-দেশী কষ্ট তবু স'য়ে—
হলরাজ্যে করে বাস হলজীবী হ'য়ে॥
কর্ণ যথা সূতগৃহে বর্ণচোরা আম।
উহাদের দেওয়া গেল উপস্বর নাম।

সবর্গ-রহস্য।

সশষ আছিল তিন মণিহারা ফণী।
সবর্গে গুঁজিয়া মাথা পেয়ে গেল মণি॥
দন্ত্য স হইল রাজা, মূর্দ্ধন্য সচিব।
তালব্যে ছাড়িয়া দেও—ভোলা তিনি শিব॥
করিল গো তালব্য শ (রাজ্য পায়ে দলি')
দন্ত্য স'র সঙ্গে পাল্লা-বদলাবদলি॥
শ ষ স ক্ষ ঘুরি বসি হল স ষ শ ক্ষ।
জ্যান্ত : সাপ দন্ত্য স যে! পা ক'রেছ লক্ষ্য?
তবে আর ভাবনা কি? ছিলিম্ চড়াও!
স্যাক্‌রা ডাকিয়া আনি মুকুট গড়াও!
কিন্তু নাহিরে বিশ্বাস! জন্তু নহে সোঝা।
ফণিশ্বাস (কিনা ফোঁস!) নাম দিলা রোঝা॥

উস্‌স্‌স্‌ করি যমে দ্যায় বিধি যারে বাম।
"উষ্মা" হইয়াছে তাই স-এদের নাম॥

ব্যাঙ্‌ চায়া দেখ্‌চে মাছি।
সাপ বলে "আমিও আছি"॥
ময়ূর বলে "আমি কি নাই?"
ব্যাধ বলে "আছে সবাই॥"
"সবাই তো আছ" বলে শমন
"বলো দেখি আমি কেমন?"
ব্যাধ বলে ক্ষমা যাচি
"ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি!'

ওটা কে আড়ালে বসি?
কেউটিয়া কি ও?
ক্ষি ও বলে মৎস্যজীবী, ছাতুজীবী চ্ছি ও!
বেদে' চেনে ও সকল ক্ষিওচ্ছিও হাঁচি।
চিনুক্‌ সে! আমি এবে পলাইয়া বাঁচি॥

নূতন-পুরাতন।

ঘুঁটিয়া বরণ-গ্রাম
আট বর্গ পাইলাম,
আট নাম আট বরগের।
পাঁচটি সাবেক-কেলে,
তিনটি দুধের ছেলে,
দেখিলেই পাবে তাহা টের॥ অতএব দেখ :—

কবর্গ ক খ গ ঘ কণ্ঠ্য
চবর্গ চ ছ জ ঝ তালব্য।
টবর্গ ট ঠ ড ঢ মূর্দ্ধন্য
তবর্গ ত থ দ ধ দন্ত্য
পবর্গ প ফ ব ভ ওষ্ঠ্য
এই পাঁচ পুরাতন;

আর, তা ছাড়া,
নবর্গ ন ণ ম ঙ সানুনাসিক
রবর্গ র ল য হ উপস্বর
সবর্গ স ষ শ ক্ষ ফণিশ্বাস অথবা উষ্মা
এই তিন নূতন।

নূতনের নূতন ঠাট।

কণ্ঠ, তালু, শিরোমঞ্চ, দন্ত, ওষ্ঠ, এই পঞ্চ
বহুকেলে পুরাতন মঠ।

বর্ণ এই পঞ্চদেশী সহে না একের বেশী
হসন্ত; যেমন চট্‌ট্‌ট্‌ পট্‌ট্‌ট্‌॥
নূতন ত্রিবর্গ-বাসী, হসন্তে উড়ায় হাসি;
ভন্‌ন্‌ন্‌ন্‌ করি সাক্ষি* তা'য় মক্ষী।
গড়্‌ম্‌ম্‌ম্‌ যায় তোপ পড়ি', ঢঙ্‌ঙ্‌ঙ্‌ঙ্‌ ঢঙ্‌ঙ্‌ঙ্‌ঙ্‌ বাজে ঘড়ি,
ফর্‌র্‌র্‌র্‌ করি উড়ি' যায় পক্ষী॥
কল্‌ল্‌ল্‌ ডাকে নলজল, জয়্‌য়্‌য়্‌য়্‌ হাঁকে দলবল
আহ্‌হ্‌হ্‌ বলি জিরায় পথিক।
হাউই আকাশ জুড়ি', হুস্‌স্‌স্‌স্‌ করি যায় উড়ি;
যূথচ্যুত ক্ষিওটারে ধিক্‌॥

জোড়াবর্গ।

কচ-বর্গ অর্থাৎ কবর্গ+চবর্গ কিনা ক খ গ ঘ চ ছ জ ঝ
তপ-বর্গ „ তবর্গ+পবর্গ „ ত থ দ ধ প ফ ব ভ
নট-বর্গ „ নবর্গ+টবর্গ „ ন ণ ম ঙ ট ঠ ড ঢ
রস-বর্গ „ রবর্গ+সবর্গ „ র ল য হ স ষ শ ক্ষ

জোড়াবর্গের বর্গপতি

অর্থাৎ পালের গোদা।
ক-বীর কচের চূড়া, মাথায় বিরাজে।
কচ শব্দে কেশ তাই চূড়া বলা সাজে॥
তপের বরগপতি ত উরধ-রেতা।
তেসরা বরগপতি ন নটের নেতা॥
রসের বরগপতি র রাসবিহারী।
বর্গপতি ক, ত, ন, র রথী এই চারি॥
ইতি বর্ণাধ্যায় সমাপ্ত।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

* সাক্ষী শব্দ এবং সাক্ষি-শব্দ এ দুই শব্দের মধ্যে ঈষৎ প্রভেদ আছে—এটা ভুলিলে চলিবে না। সত্যি-শব্দ যেমন সত্য-শব্দের অপভ্রংশ, বাক্যি-শব্দ যেমন বাক্য-শব্দের অপভ্রংশ, সাক্ষি-শব্দ তেমনি সাক্ষ্য-শব্দের অপভ্রংশ।

অযোধ্যা।

বিগত ১৮২৪ শকাব্দের ২রা কার্ত্তিক রবিবার প্রত্যুষে বারাণসীধাম হইতে যাত্রা করিয়া সিকরোল-ষ্টেশনে গিয়া গাড়িতে উঠিলাম। মোগলসরাই হইতে লক্ষ্ণৌর দিকে যে রেলপথ গিয়াছে, উহাকে "আউড্-রোহিলখণ্ড রেলওয়ে" বলে। এই রেলপথ অনতিপ্রশস্ত ও গাড়িগুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। কিদদ্দূর গেলেই দক্ষিণভাগে অতিদূরে মৃগদাবপত্তনের (সারনাথের) অরণ্যানীসমাকীর্ণ বৌদ্ধস্তূপের ভগ্নাবশেষগুলি নয়নপথে পতিত হইল। সময়াভাবে ঐ স্থান দেখিতে যাওয়া হয় নাই বলিয়া মনে একটা ক্ষোভ রহিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে বাষ্পশকট ভাগীরথীসঙ্গিনী বরণার তটদেশে গিয়া উপনীত হইল। বরণার বিমল প্রবাহ দ্রুতবেগে বারাণসী-অভিমুখে প্রধাবিত হইতেছে। প্রায় ১০ঘটিকার সময় বাষ্পশকট পুণ্যসলিলা গোমতীর প্রসিদ্ধ সেতু অতিক্রম করিয়া জৌনপুরে পৌঁছিল। জৌনপুর সহরটি প্রাচীন। এখনও ইহার সমৃদ্ধি নিতান্ত অল্প নহে. চতুর্দ্দিকে লোকের কলরব, ষ্টেশনে অত্যন্ত জনতা। কেহ নামিতেছে, কেহ উঠিতেছে। কতকগুলি লোক জিনিষপত্র লইয়া ছুটাছুটি করিতেছে। সহরটি মুসলমানপ্রধান বলিয়া বোধ হইল। অধিকাংশ আরোহীই দীর্ঘশ্মশ্রু। এ দেশের মুসলমানমহিলারাও অনেকটা স্বাধীনপ্রকৃতি,—রঙিল পরিচ্ছদে শোভিত হইয়া অনাবৃতবদনে গাড়িতে উঠিতে লাগিলেন। জৌনপুরে অনেকক্ষণ গাড়ি থামে। ষ্টেশনের কলরব কতকটা নিবৃত্ত হইলে বাঁশী বাজিয়া উঠিল। পুনরায় হুস্‌হুস্ শব্দ করিয়া বাষ্পশকট দ্রুতবেগে দৌড়াইতে আরম্ভ করিল। যখন ভারতের আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকির কবিত্বশক্তিবিকাশিনী পুণ্যতোয়া তমসার সন্নিহিত হইলাম, তখন অনেক বেলা হইয়াছে। উত্তরপশ্চিমপ্রদেশবাসী ব্রাহ্মণেরা গাড়িতে বসিয়া আহার করিতে কুণ্ঠিত নয়। অনেকে পুরীমিঠাই কিনিয়া খাইতে লাগিল। অযোধ্যার সন্নিহিত কোন গ্রামবাসী একটি ব্রাহ্মণ নিজেকে বশিষ্ঠগোত্র ও সূর্য্যবংশের কুলপুরোহিত মহর্ষি বশিষ্ঠের অধস্তনবংশীয় বলিয়া পরিচয় দিলেন। ইনি রেঙ্গুনজেলের জমাদারের কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। তিনমাসের ছুটি লইয়া সপরিবারে দেশে ফিরিতেছেন। সিকরোল হইতে দর্শননগর পর্য্যন্ত এক সঙ্গে ছিলাম। অনেক কথা হইল। ইনি দর্শননগরের আদিত্যসরোবরে স্নান করিবার জন্য উপবাসী রহিলেন, কিন্তু ইঁহার গৃহিণী সঙ্গী মুসলমান কনেষ্টবলের দ্বারা জিলাপী কিনিয়া কন্যাদের সহিত আহার করিতে লাগিলেন।

টাণ্ডাউলি ছাড়িয়া যখন আমাদের গাড়ি বিল্‌হারঘাট-ষ্টেশনে পৌঁছিল, সেই সময় বহুলোক অবতরণ করিল। কথিত আছে, পুণ্যতোয়া সরযূর ঐ প্রসিদ্ধ ঘাটেই ভরত-

কর্ত্তৃক রাজা দশরথের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল। সুতরাং ঐ ঘাট এখন একটি তীর্থে পরিণত হইয়াছে। ঐ স্থানে উপযুক্ত আহার্য্য ও বাসগৃহ মিলিবে কি না, সন্দেহে আমি নামিলাম না। কিয়ৎক্ষণ পরেই আমরা দর্শননগরে উপনীত হইলাম। দর্শননগর-ষ্টেশনটি ক্ষুদ্র হইলেও বেশ সুদৃশ্য। ষ্টেশন-সন্নিহিত রাজপ্রাসাদ ও জলাশয়টির শোভা অত্যন্ত মনোহর। অযোধ্যার বর্ত্তমান মহা-রাজের পূর্ব্বপুরুষ রাজা দর্শনসিংহ ঐ প্রাসাদ, সূর্য্যমন্দির ও জলাশয় প্রভৃতি নির্ম্মাণ করেন। এখানেও আদিত্যসরোবরে স্নান করিবার জন্য বহু যাত্রী অবতরণ করিল। আমার সঙ্গী রেঙ্গুনপ্রত্যাগত বশিষ্ঠগোত্রীয় মিশ্রজি পরিবার ও মহম্মদীয় কনেষ্টবল সহ অবতরণ করিলেন। আমাকেও সঙ্গী হইতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু আমি অযোধ্যাসন্দর্শ-নের নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক, সুতরাং ঐ স্থানে নামিতে আমার তত ইচ্ছা হইল না। শুনিলাম, দর্শননগরের বাজারটি সুন্দর, ঐ স্থানে সকল দ্রব্যই পাওয়া যায়।

মধ্যাহ্ন ১২টার সময় রেণুবালী-ষ্টেশনে গাড়ি পৌছিল। এখান হইতে অযোধ্যা-তীর্থঘাট প্রায় তিনক্রোশ দূরে অবস্থিত। দর্শননগর হইতেই কয়েকজন পাণ্ডা সঙ্গ লইয়াছিল। এখানে নামিলে তাহারা আমার জিনিষপত্র লইয়া অত্যন্ত টানাটানি আরম্ভ করিল। ১৭।১৮বর্ষবয়স্ক একটি ক্ষত্রিয়বালক কোন পাণ্ডার চাকর। সে কাতরভাবে বলিল, "মহাশয়, আমার সঙ্গেই আপনার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। বিশেষ, ইহারা ধনী পাণ্ডাদের চাকর। কত দিক্ হইতে কত যাত্রী উহাদের মনিবের বাটী যাইবে। আমার পাণ্ডার এ পর্য্যন্ত একটি যাত্রীও জোটে নাই। অতএব আপনি আমার সঙ্গে চলুন, যত্নের কোনরূপ ত্রুটি হইবে না।" আমি অবশেষে তাহারই অনুসরণ করিলাম। ষ্টেশনের অনতিদূরে একটি সুদীর্ঘ বাংলো আছে। উহাতে প্রায় ২০।২৫টি ঘর। প্রত্যেক ঘরের বারাণ্ডায় এক এক পাণ্ডার এক এক মুন্সী বাক্স ও খাতা সম্মুখে করিয়া বসিয়া আছে। আমার পাণ্ডার মুন্সী নাম-ধাম লিখিয়া-লইয়া অপর পাণ্ডার জেম্মায় আমাকে এক্কায় তুলিয়া দিল। পূর্ব্বে রেণু-বালী হইতে অযোধ্যাতীর্থঘাট পর্য্যন্ত রাস্তায় দস্যুভীতি ছিল। এমন কি, অযোধ্যায় রাত্রি-বাস করাও নিরাপদ্ ছিল না। তজ্জন্য পাণ্ডারা বলিষ্ঠ ও সুদীর্ঘবংশযষ্টিধারী লোক-দিগকে রক্ষী করিয়া যাত্রী লইয়া যাইত। এখনও ঐ প্রথা তিরোহিত হয় নাই। প্রায় ১॥০টার সময় পাণ্ডার বাটীতে উপস্থিত হইলাম। স্বর্গদ্বারঘাটের ঠিক উপরেই একটি দ্বিতল গৃহে বাসস্থান নির্দ্ধারিত হইল। যেখানে আমি রহিলাম, উহা ঐ পাণ্ডার ঠাকুরবাড়ী। উহা ব্যতীত আরও যাত্রিবাসের জন্য বাটী আছে। প্রায় দুইটার সময় সরযূস্নানে চলিলাম।

কথিত আছে, পুণ্যসলিলা সরযূ হিমা-লয়ের অঙ্কস্থিত ব্রহ্মসরোবর হইতে সমুদ্ভূতা। ইনি নেপালরাজ্য পবিত্র করিয়া কোশল-রাজ্যের রাজধানী অযোধ্যার অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদনপূর্ব্বক মগধজনপদের মধ্য দিয়া অঙ্গ-দেশের বর্ত্তমান ছাপরানগরীর নিকটে ভাগী-রথীর সহিত মিলিত হইয়াছেন। মহর্ষি

বাল্মীকি ও মহাকবি কালিদাস সরযূর অনন্ত মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। বাহুল্যপ্রযুক্ত এখানে উহা উদ্ধৃত হইল না। ঐদিন বেলা অধিক হওয়ায় সাধারণ স্নান ও সন্ধ্যা শেষ করিয়া আহারের উদ্যোগে ব্যাপৃত হইলাম। পরদিন (৩রা কার্ত্তিক) প্রত্যূষে প্রাতঃকৃত্য সমাপনপূর্ব্বক পুরোহিত সঙ্গে করিয়া স্বর্গদ্বার-তীর্থে গমন করিলাম। ইহাই অযোধ্যার সর্ব্বপ্রধান তীর্থ। পুরাণের মতে কাশী, মথুরা, মায়াপুরী, অবন্তী, কাঞ্চী ও দ্বারকার ন্যায় অযোধ্যা মোক্ষপ্রদ তীর্থ। কথিত আছে ;—মহর্ষি দুর্ব্বাসার কৌশলে লক্ষ্মণবর্জ্জন শেষ হইলে রঘুকুলপতি ভগবান্ রামচন্দ্র বন্ধুবান্ধব, অমাত্য ও ভক্ত পুরবাসিগণের সহিত সরযূ-সলিলে প্রবেশ করেন। যেখানে তাঁহারা পুণ্য-সলিলে অবতরণ করিয়া স্বর্গে গমন করেন, বাল্মীকির মতে উহার নাম "গোপ্রতর-তীর্থ"। উহাই এখন স্বর্গদ্বারতীর্থ নামে আখ্যাত হইয়া থাকে। অযোধ্যাগমনের পূর্ব্বে আমার ধারণা ছিল, অযোধ্যা সরযূর দক্ষিণতীরে অবস্থিত এবং সরযূ কোনরূপ ক্ষুদ্র তরঙ্গিণী। কিন্তু এখানে আসিয়া সে ভ্রান্ত সংস্কার বিদূরিত হইল। বস্তুত অযোধ্যা সরযূর দক্ষিণতীরে বিরাজিত এবং সরযূ একটি বিপুলকায়া বেগবতী নদী। দক্ষিণতীর হইতে অতিকষ্টে উত্তরতীর দৃষ্টিগোচর হয়। বড় বড় পণ্য-বাহিনী নৌকা ইহার স্রোতোবেগে নক্ষত্রবৎ ছুটিতেছে। শত শত নৌকা পাইল তুলিয়া যাইতেছে। শিশুক, নক্র, কুম্ভীর প্রভৃতিরও ভয় না আছে, এমন নহে। বর্ষাকালে এই নদী ঠিক পদ্মানদীর ন্যায় প্রচণ্ডমূর্ত্তিতে প্রবাহিত হইয়া লোকের মনে ভয় ও বিস্ময় উৎপাদন করিয়া থাকে। কিন্তু গ্রীষ্মকালে ঐ অবস্থা থাকে না। ইহার প্রবল প্রবাহে কোশলজনপদ বা বর্ত্তমান অযোধ্যাপ্রদেশ বিলক্ষণ উর্ব্বরাশক্তিসম্পন্ন। স্বর্গদ্বারতীর্থ-ঘাটটি বহুদূর বিস্তৃত এবং প্রস্তরময় সোপানে গ্রথিত। মধ্যে মধ্যে গোলাকার পাষাণময় অর্দ্ধস্তম্ভাকৃতি স্থান আছে। উহার উপর বসিয়া বেশ সন্ধ্যাপূজা করা যায়। অপরাহ্নে উহা বায়ুসেবনের নিমিত্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ঘাটটি অন্যূন সিকিমাইল বিস্তৃত হইবে। এরূপ প্রশস্ত ঘাট কাশী,প্রয়াগ, মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি কোথাও দেখা যায় না। একটি সুপণ্ডিত সরযূপারী ব্রাহ্মণকে পুরোহিত স্থির করিয়াছিলাম। ইনি বিশুদ্ধভাবে মন্ত্র উচ্চারণ ও বৈধকার্য্যের প্রক্রিয়াগুলি উত্তমরূপ জানেন। প্রথম বিশেষসঙ্কল্পপূর্ব্বক স্নান ও সরযূর অর্ঘ্য অর্পণ করিয়া সন্ধ্যা করিতে বসিলাম। এখানে তুলসী, বিল্বপত্র এবং পুষ্প বিলক্ষণ সুলভ। এক পয়সায় একরাশি সুগন্ধি কুসুম প্রাপ্ত হইলাম। দরিদ্র সধবা ব্রাহ্মণমহিলারা পুষ্পচন্দনাদিবিক্রয়ে নিযুক্ত। একটি পয়সার পুষ্প ক্রয় করিলে ইঁহারা এত পরিতুষ্ট হন যে, দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। সন্ধ্যা শেষ হইলেই পাণ্ডার ভৃত্য তীর্থশ্রাদ্ধের দ্রব্যাদি লইয়া উপস্থিত হইল। এখানে কচ্ছপের উপদ্রব অত্যন্ত অধিক। জোগাড় করিয়া বসিবার পূর্ব্বেই কূর্ম্মগণ দলবদ্ধ হইয়া শ্রাদ্ধীয়দ্রব্য আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিল। পাণ্ডার ভৃত্য লগুড়হস্তে তাহাদের ভয় দেখাইতে লাগিল। আমি এই অবসরে শ্রাদ্ধ শেষ করিলাম। পুরোহিতটি অতি সুজন ও যদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্ট ; দক্ষিণা ও আহার্য্য বলিয়া যাহা

পাইলেন, তাহাতেই পরম তুষ্ট হইলেন। তাহার পর, সুপ্রসিদ্ধ নাগেশ্বর-মহাদেব ও সরযূতীরস্থ অপর কয়েকটি মন্দিরে পূজা শেষ করিয়া বাসায় উপস্থিত হইলাম।

অপরাহ্নে দুইজন দীর্ঘযষ্টিধারী ভৃত্যের সহিত দর্শন করিতে বাহির হইলাম। কতক-গুলি পঞ্জাবী ক্ষত্রমহিলাও সঙ্গ লইলেন। অযোধ্যায় এখন বসতি তত ঘন নহে। বিশেষ পশ্চিমাংশে কেবল তেঁতুলবন। দূরে দূরে এক-একটি অতি পুরাতন দেবমন্দির। রামো-পাসকগণের মহাতীর্থ অযোধ্যায় হনুমানজীর অত্যন্ত প্রভাব। তজ্জন্য তাঁহার মন্দিরটিই সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ। তদীয় বংশবৃদ্ধিও এখানে অত্যধিক,—দুইতিনশত বানরকেও একসঙ্গে দলবদ্ধ হইয়া হুপ্‌হাপ্‌শব্দে নিরন্তর বন হইতে বনান্তরে ধাবিত হইতে দেখা যায়। সম্মুখে পড়িলেই বিপদ্‌। রাস্তা-গুলি যেমন বন্ধুর, তেম্‌নি স্থানে স্থানে ইষ্টকস্তূপ ও পাষাণখণ্ডে নিতান্ত দুর্গম। নগ্নপদে দেবদর্শনে বাহির হইয়াছি, সুতরাং পদে পদে হোঁছট খাইতে হইতেছে। মঠগুলি প্রায়ই বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের। কোন মঠে মিথিলায় জনকালয়ে রামের বিবাহলীলা দেখিলাম। কোথাও জটাবল্কল পরিধান করিয়া রামের বনগমন। কোন স্থানে যুদ্ধ, কোথাও অযোধ্যায় প্রত্যাগমনের লীলা। এক স্থানে দেখিলাম, সীতা রন্ধনে ব্যাপৃত। অপর স্থানে কনকময়ী সীতার সহিত রাম অশ্বমেধযজ্ঞ করিতেছেন। এই সব মঠে বিনা দর্শনীতে দেবদর্শন হয় না। কোন কোন স্থানে দর্শনীর পরিমাণ নির্দ্ধারিত আছে। স্থানে স্থানে পয়সার জন্য যাত্রী-দিগকে কিছু অধিক পীড়ন করা হয়। আমাদের সঙ্গিনী পঞ্জাবী মহিলাদের কথা এ পর্য্যন্ত কিছুই বলা হয় নাই। এখানে তাহা-দের বিষয়ে দুইচারি কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। ঐদিন মধ্যাহ্নে আমি যখন নীচের একটি ঘরে পাক করিতেছিলাম, সেই সময় ইহারা সরযূস্নান করিয়া ঝটিকাবৎ বেগে পাণ্ডার ঠাকুরবাড়ীতে আসিয়া প্রবেশ করিল। আসিবার সময় দরজায় কপাটের বিষম শব্দ হইল, ক্ষণকালের মধ্যে নীরব দেবমন্দির উচ্চহাস্য ও কলরবে মুখরিত হইয়া উঠিল। ইহারা সংখ্যায় ১৪।১৫টির কম নহে। সকলেই স্ত্রীলোক, একটিমাত্র বৃদ্ধ পুরুষ সঙ্গী। স্ত্রীলোকদের মধ্যে ৪।৫টি বিধবা, অপরগুলি সধবা, দুইটি ১২।১৩বর্ষবয়স্কা কুমারী। সকলেই গৌরাঙ্গী। কেহই অসুন্দরী নহে, কিন্তু অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মোটামুটি গঠন ও পরিচ্ছদাদি দেখিয়া বোধ হইল, উহারা তেমন ধনী বা সম্ভ্রান্ত গৃহের মহিলা নহে। ঐ সকল রমণী পঞ্জাবের উত্তরাংশের সুদূরপল্লিবাসিনী, নাগরিক সভ্যতার সহিত উহাদের কিছুমাত্র পরিচয় নাই। সরলতা অত্যধিক, প্রফুল্লতা অস্বাভাবিক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কথায় কথায় উচ্চহাস্য ও প্রগল্‌ভতা। আমি যে ঘরে পাক করিতে-ছিলাম, উহার সম্মুখস্থ অঙ্গনের অপরাংশের একটি ঘরের প্রশস্ত বারাণ্ডায় তিনটি উনুনে উহাদের পাক চড়িল। রমণীরা দেখিতে দেখিতে রুটি সেঁকিয়া পর্ব্বতাকার করিল। বৃদ্ধ ডালতরকারি সিদ্ধ করিতে লাগিল। এক-হাঁড়ী ডাল ও একহাঁড়ী তরকারি নামিলেই বালিকা ও সধবারা উনুনের চারিদিকে,

আহারে বসিয়া গেল। পঞ্জাবীরা উচ্ছিষ্ট বিচার করে না, আহার করিতে করিতে উচ্ছিষ্টহস্তেই ডাল-তরকারি-রুটি তুলিয়া লইতে লাগিল। একটি যুবতী বিধবা তাহার ক্ষুদ্র ঘটীটি রাখিয়া কোন কথা না বলিয়া আমার বড় লোটাটি তুলিয়া লইল। আমি বিস্মিতভাবে মুখের দিকে তাকাইলে হাসিয়া হিন্দীতে বলিল, "তোমার লোটায় অনেক জল ধরে, তারি জন্য লইতেছি। তুমি ততক্ষণ আমাদের লোটা লইয়া কাজ কর।" আমি বলিলাম, "স্বচ্ছন্দে আপনারা লোটা লইতে পারেন, যে কয়দিন ইচ্ছা, আপনাদের নিকটে রাখুন।"

তার পর, রমণী হাসিতে হাসিতে লোটা লইয়া চলিয়া গেল। সেই উহাদের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। তাহার পর, দেবদর্শনের জন্য বাসা হইতে বাহির হইলেই একটি মন্দিরের বাগানের প্রাচীর হইতে এক বৃহৎকায় বানর হুপ্ করিয়া আমাদের সম্মুখে আসিয়া পড়িল। এই ব্যাপারে সকলেই ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। আমি কিছু বেশি দূরে গিয়া পড়িয়াছিলাম, সুতরাং রমণীরা আমাকে ঠাট্টা করিবার বিলক্ষণ অবসর পাইল। কিছুদূর অগ্রসর হইলেই তেঁতুল-গাছের অগ্রভাগ হইতে কতকগুলি বানর শব্দ করিয়া উঠিল। এক রমণী বলিল, "মহারাজ, সাবধান।" আর একজন বলিল, "মহারাজ, পালাও।" অপর একজন বলিল, "এবার আর রক্ষা নাই।" এইরূপে সারাপথ বানরের কিচ্‌মিচি ও সঙ্গে সঙ্গে পঞ্জাবী মহিলাদের ঠাট্টা শুনিতে শুনিতে আমি জ্বালাতন হইয়া পড়িলাম। আমি অপরাহ্নে আকাশে একটু মেঘের সঞ্চার দেখিয়াই ছাতা হাতে করিয়া গিয়াছিলাম। একটি দেব-মন্দির হইতে দূরস্থ অপর দেবমন্দিরে যাইতে পথে বাগানের ধারে মাঠের মধ্যে বিলক্ষণ একপশলা বৃষ্টি আসিল। আমি যেই ছাতাটি খুলিয়াছি, অমনি সকলে হাসিতে হাসিতে আসিয়া আমার ছাতার মধ্যে হাজির হইল। আমি সরিতে সরিতে ছাতার বাহিরে গিয়া পড়িলাম। অগত্যা পরোপকারের ভাণ করিয়া ছাতাটি তাহাদের মস্তকে রাখিয়া সরিয়া দাঁড়াইলাম। আমাকে ভিজিতে দেখিয়া একটি প্রবীণা বিধবা (বয়স ৪০ বৎসরের অধিক নহে, ইনিই এই তীর্থযাত্রি-সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকবয়স্কা) বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তোরা বড় বেয়াদব, মহারাজকে ছত্তা দে, উনি ভিজিতেছেন।" তাহারা এ কথায় বড় কর্ণপাত করিল না। যতক্ষণ বৃষ্টি হইল, ততক্ষণ তাহারা ছাতাটি লইয়া টানাটানি করিল, বৃষ্টি থামিয়া গেলে আমার হাতে দিল। আমি অগ্রে অগ্রে চলি-লাম। আবার বানরের কথা, আবার হাসির তরঙ্গ বহিতে লাগিল। প্রধান প্রধান দেব-মন্দিরগুলির দর্শন শেষ হইলে যখন বাসার দিকে ফিরিতেছি, তখন একটি কৌতুকাবহ ঘটনা ঘটিল। এক বাগানের নিকট পৌঁছিলে একদল বানর তাড়া খাইয়া সদলবলে উত্তর-দিকে ছুটিতেছিল, আমরা তাহাদের মাঝখানে পড়িয়া গেলাম। এই সময় ঐ রমণীগণের মধ্যে একটি যুবতীর দুই স্কন্ধে হঠাৎ দুইটি বানরশিশু লাফাইয়া পড়িল। সকলের গতিরোধ হইল। আমরা দেখিয়া অবাক্। রমণী নির্ভীক, নড়িল-চড়িল না, বরং সঙ্গিনী-

দিগকে হাসিতে দেখিয়া নিজেও হাসিতে লাগিল। বানরনন্দনদ্বয় যেন একটু কৌতুক করিয়া আপনা হইতেই নামিয়া গেল। পাণ্ডার ভৃত্যদ্বয় বলিল, "ঐ রমণী বানর-শিশুদিগকে কিছু না বলিয়া বড় বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছিল। একটু বিরুদ্ধাচরণ করিলে রুধিরাক্তদেহে বাসায় ফিরিতে হইত।" সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে আমরা বাসায় পৌঁছিলাম। রমণীরা পুনরায় তাহাদের আহার প্রস্তুত করিবার জন্য নিযুক্ত হইল, আমি সায়ংসন্ধ্যার নিমিত্ত স্বর্গদ্বারঘাটে গেলাম। এই সময় সরযূতীর বড়ই মনোরম। ঘাটে অসংখ্য লোক সন্ধ্যা ও স্তবপাঠ করিতেছে। সারিসারি দেবমন্দিরে ঘণ্টা-কাঁশরের মধুর নিক্কণ সন্ধ্যা-আরতির আড়ম্বর সূচিত করিতেছে।

৪ঠা কার্ত্তিক প্রাতঃকালে সরযূস্নান ও অবশিষ্ট দেবমন্দিরে পূজা শেষ করিয়া বাসায় গেলাম। অপরাহ্ণে অযোধ্যার মহারাজের অন্যতম সভাপণ্ডিত প্রয়াগদত্ত মিশ্রের বাসায় বর্ত্তমান মহারাজ ও তাঁহার রাজ্যাদিসংক্রান্ত অনেক কথোপকথন হইল।

বাল্মীকিরামায়ণপাঠে অবগত হওয়া যায়, মানবেন্দ্র-মনু-কর্ত্তৃক প্রথম অযোধ্যাপুরী নির্ম্মিত হয়।* রামায়ণে ইহার অপূর্ব্ব বর্ণনা আছে।+ তখন এই পুরী দৈর্ঘ্যে ১২যোজন ও প্রস্থে ২যোজন ছিল। বৈবস্বতমনু হইতে রাজা সুমিত্র পর্য্যন্ত সূর্য্যবংশীয় নৃপতিরা ১১২ পুরুষ এখানে রাজত্ব করেন। তন্মধ্যে রাজা দশরথ ও মহারাজ রামচন্দ্রের সময়েই ইহা উন্নতির পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। কারণ সূর্য্যবংশীয় নৃপতিগণই তখন ভারতবর্ষের সম্রাট্‌পদে অভিষিক্ত ছিলেন। স্মৃতি ব্যতীত এখন আর এখানে সেকালের অপর কোন দ্রষ্টব্য পদার্থ নাই। বর্ত্তমান মঠমন্দিরাদি সমুদয়ই আধুনিক। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন ;— সূর্য্যবংশীয় রাজারা অযোধ্যা পরিত্যাগ করিলে শ্রাবস্তীর রাজারা এখানে বহুকাল রাজত্ব করেন। মহারাজ অশোকের সময়ে এই নগরী বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারের প্রধান ক্ষেত্র ছিল। কারণ বুদ্ধদেবের প্রধান লীলাভূমি শ্রাবস্তী ও তাঁহার জন্মস্থান কপিলবস্তু অযোধ্যা হইতে অধিক দূরবর্ত্তী নহে। অশোকবংশীয়দের পর, কাশ্মীরের রাজা মেঘবাহন অযোধ্যার রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। তাহার পর, পরাক্রান্ত রাজা বিক্রমজিৎ মেঘবাহনকে পরাজিত করিয়া এই রাজ্য স্বীয় অধিকারভুক্ত করেন। তিনিই রামায়ণ-বর্ণিত লুপ্ততীর্থসকল উদ্ধার করিয়াছিলেন। উক্ত রাজা অযোধ্যায় ৩৬০টি দেবালয় নির্ম্মাণ করেন। বিক্রমজিতের পর অযোধ্যা সমুদ্র-পালের করায়ত্ত হয়। এই রাজবংশ ৬৪৩ বৎসর শাসনদণ্ড পরিচালনা করেন। তাহার পর, এই নগরী জঙ্গলে পূর্ণ ও থারুনামক অসভ্যজাতির হস্তগত হয়। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে চীনপরিব্রাজক হুয়েন্থসাঙ্‌ অযোধ্যায় আগমন করেন। তখন এখানে বৌদ্ধকীর্ত্তির অল্পমাত্র অবশিষ্ট ছিল। কিছু-

* অযোধ্যা নাম নগরী তত্রাসীল্লোকবিশ্রুতা।
মনুনা মানবেন্দ্রেণ যা পুরী নির্ম্মিতা স্বয়ম্‌॥

\+ বাল্মীকিরামায়ণ বালকাণ্ড ৫ম সর্গ দ্রষ্টব্য।

কাল পরে, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশ হইতে জৈন-ধর্ম্মাবলম্বী সোমবংশীয় রাজারা থারুজাতিকে বিতাড়িত করিয়া অযোধ্যারাজ্য অধিকার করেন। এই পুরী জৈনদেরও একটি প্রধান তীর্থক্ষেত্র। ২য় তীর্থঙ্কর অজিতনাথ অযোধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। আর কতিপয় তীর্থঙ্কর এখানে জন্মগ্রহণ ও দীক্ষালাভ করেন। সোমবংশীয়দের পর, জৈনমতাবলম্বী ভড়েরা অযোধ্যা অধিকার করে। তাহার পর, ১১৯৪ খৃষ্টাব্দে শাহা উদ্দিন ঘোরী কনোজ জয় করিয়া অযোধ্যালুণ্ঠন করেন। তদবধি ইহা মুসলমানের করায়ত্ত হয়। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রাচীন রাজ্য ইংরেজরাজের অধিকারে আসিয়াছে। অযোধ্যা রাজবিপ্লব ও ধর্ম্মবিপ্লবের একটি লীলাক্ষেত্র। বর্ত্তমান অযোধ্যার মহারাজ শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ। ভারতবর্ষে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণেরা একটি বিস্তৃত সম্প্রদায়। নানা জনপদে ইঁহারা নানা নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। এস্থলে ইঁহাদের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্তের উল্লেখ বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বহু পুরাণ ও উপপুরাণে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণের বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে সাম্বপুরাণে ইঁহাদের ইতিবৃত্ত বিশেষভাবে উল্লিখিত আছে। আমরা উহা হইতে যৎকিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিলাম।

দ্বাপরযুগের শেষে যখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় রাজত্ব করেন, সেই সময় একদিন দেবর্ষি নারদ দ্বারকার রাজসভায় উপনীত হন। নারদকে দেখিয়া প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি কৃষ্ণের সমুদয় পুত্রই অভ্যুত্থান ও প্রণামাদি করিলেন, কিন্তু সাম্ব কিছুই করিলেন না। ইহাতে নারদ আপনাকে কথঞ্চিৎ অবমানিত ভাবিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, সাম্ব বড়ই গর্ব্বিত, উহার গর্ব্ব খর্ব্ব করিতে হইবে। তাহার পর তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, "ভগবন্, আপনার পুত্র সাম্ব রূপবান্ যুবা, তজ্জন্য আপনার যুবতী পত্নীরা সর্ব্বদাই উহার দর্শনাকাঙ্ক্ষা করে।" শ্রীকৃষ্ণ মুনির কথায় অনাস্থাপ্রকাশ করিয়া বলিলেন, "মুনিবর, আমার পুত্রগণের মধ্যে সাম্বই সর্ব্বাপেক্ষা বিনীত এবং ধার্ম্মিক। অতএব আপনি তাহার বিষয়ে যাহা বলিতে-ছেন, উহাতে আমি বিশ্বাস করিতে পারিলাম না।" নারদ বলিলেন, "ভগবন্, আমার কথায় অদ্য বিশ্বাস করিলেন না বটে, কিন্তু একদিন প্রত্যক্ষ হইলে বিশ্বাস করিবেন।" এই বলিয়া নারদ চলিয়া গেলেন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্ববৎ নির্ব্বিকারহৃদয়ে দ্বারকানগরীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

একদা বসন্তকাল সমাগত। দিঙ্মণ্ডল নির্ম্মল, উদ্যানসকল বিকসিত কুসুমের গন্ধে আমোদিত। মলয়ানিল মৃদুমন্দ প্রবাহিত হইয়া তরুণ ও তরুণীগণের হৃদয়ে সুখস্পৃহা উৎপাদন করিতেছে। রসালমঞ্জরীর রসাস্বাদনে উন্মত্ত কোকিলগণ কুহুরবে বনভূমি মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে। ভ্রমরগণ ঝঙ্কার তুলিয়া মধুপানের নিমিত্ত কুসুম হইতে কুসুমান্তরে পরিভ্রমণ করিতেছে। এই মনোজ্ঞ সময়ে একদিন অপরাহ্ণে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্যানভবনের স্বচ্ছ সরসীতে প্রমদাগণসহ জলকেলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বিনীত তনয় সাম্ব উপবনের দ্বারদেশে প্রহরী নিযুক্ত আছেন। এমনসময় দেবর্ষি নারদ উপস্থিত হইয়া ভগবানের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন। সাম্ব বলিলেন, "মুনিবর, কিছুক্ষণ

অপেক্ষা করুন,ভগবানের বৈকালিক স্নান শেষ হইলেই আমি সংবাদ দিতেছি।” নারদ অপেক্ষা করিলেন। ভগবান্ প্রমদাগণসহ সরসী হইতে উত্থিত হইয়া বস্ত্রপরিবর্ত্তন করিলেই সাম্ব দেবর্ষির আগমনসংবাদ জানাইবার জন্য সেখানে গমন করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে নারদও উপস্থিত। সাম্বকে দেখিয়া বস্তুতই শ্রীকৃষ্ণের তরুণী ভার্য্যাদের মধ্যে একটা সম্ভ্রম উপস্থিত হইল। তাঁহারা যেন একটু চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। দেবর্ষি নারদ অঙ্গুলিসঙ্কেতে ভগবান্‌কে রমণীগণের চাঞ্চল্য প্রদর্শন করিলেন। ভগবান্ কুপিত হইয়া অচঞ্চলা সাধ্বী রুক্মিণী, সত্যভামা ও জাম্ববতী ব্যতীত অন্যান্য পত্নী-দিগকে অভিশাপপ্রদান করিলেন। এদিকে দেখিতে দেখিতে সাম্বের দেহ কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হইল। নিরুপায় সাম্ব দেবর্ষির চরণে নিপতিত হইলেন। তখন দেবর্ষির ক্রোধের উপশম হইয়াছিল। নারদ প্রসন্ন হইয়া সাম্বকে আরোগ্যদাতা ভগবান্ সূর্য্যের উপাসনা করিতে উপদেশ দিয়া প্রস্থান করিলেন।

সাম্ব পঞ্চনদপ্রদেশের চন্দ্রভাগাতীরে এক উদ্যানের মধ্যে সূর্য্যমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া সেখানে সূর্য্যপ্রতিমা স্থাপনপূর্ব্বক যথাবিধি সূর্য্যের অর্চ্চনা করিলেন। মিত্রশব্দের অর্থ সূর্য্য। সূর্য্যের অর্চ্চনার নিমিত্ত ঐ উদ্যান নির্ম্মিত হওয়ায় উহার নাম “মিত্রবন” হইল। ভগবান্ সূর্য্যের প্রসাদে সাম্বের দেহ হইতে দারুণ কুষ্ঠরোগ অন্তর্হিত হইল। তিনি সূর্য্যপূজা চিরপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য কুলপুরোহিত মহর্ষি গৌরমুখকে আহ্বান করিলেন। মহর্ষি গৌরমুখ বলিলেন, “কুমার, এই সূর্য্যপূজার দান বড়ই গুরুতর, এখানকার ব্রাহ্মণেরা সূর্য্যের দান প্রতিগ্রহ করিবে না। অতএব ভগবান্ সূর্য্যকে জিজ্ঞাসা করুন, কে তাঁহার পূজা ও প্রতিগ্রহের ভার গ্রহণ করিবে।” সাম্ব মহর্ষি গৌরমুখের উপদেশে ভগবান্ সূর্য্যের অভিমত প্রার্থনা করিলেন। ভগবান্ সূর্য্য প্রত্যক্ষ হইয়া সাম্বকে বলিলেন, “কুমার, যে-সে ব্রাহ্মণ আমার পূজার দান গ্রহণ করিতে সমর্থ নহে। অতএব বিশেষগুণযুক্ত ব্রাহ্মণ আবশ্যক। পুণ্যাত্মা নরপতি প্রিয়ব্রতের শাসিত শাকদ্বীপ * অতি পবিত্রস্থান। সেখানকার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ সকলেই সদাচারনিরত। ঐ জনপদে বর্ণসঙ্করের বাস নাই। অতএব তুমি আমার পূজার নিমিত্ত শাকদ্বীপ হইতে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে আনয়ন কর। সেখানকার ব্রাহ্মণগণ চারি বেদেই অভিজ্ঞ এবং তেজস্বী। তাঁহারাই আমার পূজার বিশেষ বিধি অবগত আছেন।

সাম্ব শ্রীকৃষ্ণের নিকট গিয়া ভগবান্ সূর্য্যের আদেশের কথা নিবেদন করিলেন। দ্বারকাধিপ উহা শুনিয়া অত্যন্ত পরিতুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাদের আনয়নের নিমিত্ত সাম্বের সহিত গরুড়কে প্রেরণ করিলেন। সাম্ব শাকদ্বীপে উপনীত হইয়া দেখিলেন, ঐ জনপদ সূর্য্য-মন্দিরে পরিব্যাপ্ত। প্রত্যেক মন্দিরে তেজঃ-পুঞ্জকলেবর ব্রাহ্মণগণ ধূপ-দীপ-নৈবেদ্য-গন্ধ-মাল্য লইয়া সূর্য্যের স্তব ও আরাধনা করিতে-

* শাকদ্বীপ কাশ্মীরের উত্তরভাগস্থ একটি জনপদ। এখনও উহার একাংশ শাকলনামে খ্যাত।

ছেন। সাম্ব ঐ সকল ব্রাহ্মণের কার্য্যকলাপ দেখিয়া ভক্তিগদ্‌গদচিত্তে তাঁহাদের চরণে প্রণত হইলেন এবং ভগবান্ সূর্য্যের আদেশ তাঁহাদিগকে অবগত করিলেন। সূর্য্যোপাসক ব্রাহ্মণগণ বলিলেন, "রাজকুমার, আমরা আপনার আগমনের পূর্ব্বেই ভগবান্ সূর্য্যের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়াছি। অতএব চলুন, আমরা যাই। তাহার পর, সাম্বের প্রার্থনায় প্রথমে অষ্টগোত্রসম্ভূত সূর্য্যোপাসক ব্রাহ্মণগণের আটটি কুল শাকদ্বীপ হইতে গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া চন্দ্রভাগাতীরে মিত্রবনে সমাগত হন। সাম্ব নানাবিধ স্তবে তাঁহাদিগকে পরিতুষ্ট করিয়া ঐ স্থানে তাঁহাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তাঁহাদের হস্তে সূর্য্যপূজার ভার অর্পণ করিয়া তাঁহাদের বরগ্রহণপূর্ব্বক দ্বারকায় গমন করেন।* কালক্রমে মিত্রবন সাম্বপুর নামে প্রসিদ্ধ হয়। সাম্বপুর যে প্রদেশের অন্তর্গত, শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণেরা ঐ প্রদেশকে মূলস্থান বলিতেন, এখন উহা উচ্চারণবৈষম্যে "মুলতান"রূপে পরিণত হইয়াছে। তাহার পর, ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রদেশেই শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণের বসতিবিস্তার হয়। গান্ধারপ্রদেশ একসময় শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণে পরিপূর্ণ ছিল। প্রসিদ্ধ শব্দবিদ্যাপ্রবর্ত্তক অষ্টাধ্যায়ীপ্রণেতা মহর্ষি পাণিনি শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণকুল অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। সূর্য্যোপাসক ব্রাহ্মণগণের দ্বারা বেদবিদ্যারও যথেষ্ট বিস্তার হইয়াছিল। একসময় ভারতবর্ষের অসংখ্য সূর্য্যমন্দির সূর্য্যোপাসক ব্রাহ্মণগণের সুমধুর বেদধ্বনিতে মুখরিত হইত। কাশ্মীরের জম্বার্কমন্দির, বারাণসীধামের লোকার্কমন্দির, মগধের বরুণার্কমন্দির, উৎকলের কোণার্কমন্দির, (কণারকের নবগ্রহমন্দির) প্রভৃতি বহু সূর্য্যমন্দির ভারতবর্ষে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। মগধপ্রদেশ শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণের একটি প্রধান আবাসভূমি। অতি পুরাকাল হইতে ঐ প্রদেশে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণের আধিপত্য লক্ষিত হয়। খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে মগধের আদিত্যদাসনামক শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণের পুত্র সুপ্রসিদ্ধ বরাহমিহির স্বীয় অলৌকিক পাণ্ডিত্যগুণে ভারতের প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় উজ্জয়িনীরাজধানীর নবরত্নসভার অন্যতম রত্ন বা সদস্যপদে বৃত হন। তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থাবলী ভারতীয় বিজ্ঞানবিদ্যার অপূর্ব্ব উন্নতির পরিচায়ক। মহাকবি বাণের হর্ষচরিতপাঠেও একজন জ্যোতির্ব্বিদ্ শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণের পরিচয় পাওয়া যায়। ইঁহার নাম তারক জ্যোতিষী। ইনি স্থাণ্বীশ্বরের অধিপতি সুবিখ্যাত রাজা প্রভাকরবর্দ্ধনের বিশ্বাসভাজন ছিলেন। খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীতে গঙ্গাধরমিশ্রনামক এক ভরদ্বাজগোত্রীয় শাকদ্বীপী বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ মগধেশ্বরের মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। গয়াজেলা হইতে আবিষ্কৃত এক শিলাফলকে এই মন্ত্রিবংশের বহু কীর্ত্তিকলাপের উল্লেখ দেখা যায়। ভারতবর্ষের সকল জনপদেই শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণের বাস আছে। কোন কোন প্রদেশে ইঁহারা অপর ব্রাহ্মণের সহিত মিশিয়া গিয়াছেন, কোন প্রদেশে বা বিভিন্ন নামে পরিচিত হইয়া থাকেন। বিহারপ্রদেশে

* সাম্বপুরাণ ২য়, ৩য়, ৪র্থ অধ্যায় পাঠ করুন।

পৌরোহিত্যই ইঁহাদের একমাত্র উপজীবিকা। কাহারও কাহারও ভূমিবিত্ত আছে। গয়াক্ষেত্রে ইঁহারাই শ্রাদ্ধকার্য্যে পুরোহিতের পদে বৃত হইয়া থাকেন। শাকদ্বীপ হইতে শুধু ব্রাহ্মণেরাই আগমন করেন নাই, অসংখ্য ক্ষত্রিয়-বৈশ্যও আসিয়াছিলেন। উহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। প্রবন্ধান্তরে ঐ সমুদয় উল্লেখ করিব।

শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণের সাম্প্রদায়িক ইতিবৃত্ত লিখিতে গিয়া অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। এইবার সংক্ষেপে অযোধ্যার রাজবংশের পরিচয় দিব। মুসলমানরাজত্বের শেষভাগে গয়াজেলার টীকারির সন্নিহিত কোন গ্রামে পুরন্দরমিশ্র নামে এক পৌরোহিত্যব্যবসায়ী শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার পুত্র দর্শন-সিংহ সামান্য ফৌজরূপে সৈন্যদলে প্রবেশ করেন। ক্রমে পদোন্নতি হওয়ায় তুরুক-সোয়ার হন। ঐ কার্য্যে তিনি বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করায় লক্ষ্ণৌর নবাবের অধীনে চাকলাদারী প্রাপ্ত হন এবং কিছুদিন পরেই রাজা উপাধি লাভ করেন। ক্রমে ক্রমে রাজা দর্শনসিংহ অযোধ্যাপ্রদেশের প্রভূত জমিদারী হস্তগত করেন এবং সুদূর গয়াজেলায় অবস্থান করিয়া ঐ বিস্তৃত জমিদারী শাসন করা অসম্ভব ভাবিয়া অযোধ্যায় স্বীয় রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন। দর্শননগরের সুবিখ্যাত সূর্য্যনারায়ণের মন্দির ও আদিত্যসরোবর রাজা দর্শনসিংহের প্রধান কীর্ত্তি। এখন উহা তীর্থে পরিণত হইয়াছে। প্রতি রবিবারে অসংখ্য যাত্রী দর্শননগরের আদিত্যসরোবরে স্নান করিবার জন্য সমাগত হইয়া থাকে। রাজা দর্শনসিংহের পুত্র মানসিংহ। ইংরেজরাজত্বের প্রারম্ভে ইনি ইংরেজগবর্মেণ্টের বিশেষ সাহায্য করিয়া-ছিলেন এবং জমিদারীর প্রভূত উন্নতি করেন। ইংরেজগবর্মেণ্ট ইঁহাকে মহারাজ-উপাধি-দ্বারা বিশেষ সম্মানিত করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে মহারাজ মানসিংহ অযোধ্যাপ্রদেশে অসাধারণ ক্ষমতা পরিচালন করিতেন। তিনি অযোধ্যা ও অন্যান্য তীর্থক্ষেত্রে বহু দেবমন্দিরপ্রতিষ্ঠা ও জলাশয় খনন করাইয়াছিলেন। মহারাজ মানসিংহ প্রভূত অর্থব্যয়ে অগ্নিষ্টোমযজ্ঞ করেন। ঐ যজ্ঞে ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রদেশের শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন। উহাতে আর্য্যাবর্ত্তবাসী বেদজ্ঞদিগের সহিত দক্ষিণাপথবাসী বেদজ্ঞদিগের বরণ লইয়া অত্যন্ত বিরোধ উপস্থিত হয়। দ্রাবিড় ও মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণগণ ঋত্বিকের পদ একচেটিয়া করিবার নিমিত্ত সভার মধ্যে উঠিয়া বলেন, দক্ষিণাপথ-বাসী ব্যতীত বেদজ্ঞ কেহ নাই। বেদবিদ্যা বহুদিন গত হইল আর্য্যাবর্ত্তবাসীদিগকে পরি-ত্যাগ করিয়া দাক্ষিণাত্যপণ্ডিতগণের রসনা আশ্রয় করিয়াছেন। এই সভার মধ্যে উত্তরা-পথবাসী এমন কে আছেন, যিনি বেদের প্রকৃতিরূপ ও বিকৃতিরূপ পারায়ণ অবগত আছেন? এই স্পর্দ্ধাবাক্যে আর্য্যাবর্ত্ত-বাসীদের মধ্যে তুমুল সংক্ষোভ উপস্থিত হয়। তাঁহারাও দ্রাবিড়দিগকে নায়াররমণীর গর্ভজাত ও মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণদিগকে পরশুরামের সৃষ্ট ব্রাহ্মণ বলিয়া উপহাস করেন। অনেক বাদানুবাদের পর দক্ষিণী ব্রাহ্মণদিগেরই বেদ-বিদ্যায় সমধিক অভিজ্ঞতা সপ্রমাণ হয়, কিন্তু শুধু তাঁহাদিগের বরণ করিলে মহাবিভ্রাট ঘটে। সুতরাং মহারাজ মানসিংহ মধ্যস্থ হইয়া

ছেন। সাম্ব ঐ সকল ব্রাহ্মণের কার্য্যকলাপ দেখিয়া ভক্তিগদ্গদচিত্তে তাঁহাদের চরণে প্রণত হইলেন এবং ভগবান্ সূর্য্যের আদেশ তাঁহাদিগকে অবগত করিলেন। সূর্য্যোপাসক ব্রাহ্মণগণ বলিলেন, "রাজকুমার, আমরা আপনার আগমনের পূর্ব্বেই ভগবান্ সূর্য্যের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়াছি। অতএব চলুন, আমরা যাই। তাহার পর, সাম্বের প্রার্থনায় প্রথমে অষ্টগোত্রসম্ভূত সূর্য্যোপাসক ব্রাহ্মণগণের আটটি কুল শাকদ্বীপ হইতে গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া চন্দ্রভাগাতীরে মিত্রবনে সমাগত হন। সাম্ব নানাবিধ স্তবে তাঁহাদিগকে পরিতুষ্ট করিয়া ঐ স্থানে তাঁহাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তাঁহাদের হস্তে সূর্য্যপূজার ভার অর্পণ করিয়া তাঁহাদের বরগ্রহণপূর্ব্বক দ্বারকায় গমন করেন।* কালক্রমে মিত্রবন সাম্বপুর নামে প্রসিদ্ধ হয়। সাম্বপুর যে প্রদেশের অন্তর্গত, শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণেরা ঐ প্রদেশকে মূলস্থান বলিতেন, এখন উহা উচ্চারণবৈষম্যে "মূলতান"রূপে পরিণত হইয়াছে। তাহার পর, ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রদেশেই শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণের বসতিবিস্তার হয়। গান্ধারপ্রদেশ একসময় শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণে পরিপূর্ণ ছিল। প্রসিদ্ধ শব্দবিদ্যাপ্রবর্ত্তক অষ্টাধ্যায়ী-প্রণেতা মহর্ষি পাণিনি শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণকুল অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। সূর্য্যোপাসক ব্রাহ্মণগণের দ্বারা বেদবিদ্যারও যথেষ্ট বিস্তার হইয়াছিল। একসময় ভারতবর্ষের অসংখ্য সূর্য্যমন্দির সূর্য্যোপাসক ব্রাহ্মণগণের সুমধুর বেদধ্বনিতে মুখরিত হইত। কাশ্মীরের জম্বার্কমন্দির, বারাণসীধামের লোকার্কমন্দির, মগধের বরুণার্কমন্দির, উৎকলের কোণার্কমন্দির, (কণারকের নবগ্রহমন্দির) প্রভৃতি বহু সূর্য্যমন্দির ভারতবর্ষে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। মগধপ্রদেশ শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণের একটি প্রধান আবাসভূমি। অতি পুরাকাল হইতে ঐ প্রদেশে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণের আধিপত্য লক্ষিত হয়। খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে মগধের আদিত্যদাস-নামক শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণের পুত্র সুপ্রসিদ্ধ বরাহমিহির স্বীয় অলৌকিক পাণ্ডিত্যগুণে ভারতের প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় উজ্জয়িনী-রাজধানীর নবরত্নসভার অন্যতম রত্ন বা সদস্যপদে বৃত হন। তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থাবলী ভারতীয় বিজ্ঞানবিদ্যার অপূর্ব্ব উন্নতির পরিচায়ক। মহাকবি বাণের হর্ষচরিতপাঠেও একজন জ্যোতির্ব্বিদ্ শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণের পরিচয় পাওয়া যায়। ইঁহার নাম তারক জ্যোতিষী। ইনি স্থাণ্বীশ্বরের অধিপতি সুবিখ্যাত রাজা প্রভাকরবর্দ্ধনের বিশ্বাসভাজন ছিলেন। খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীতে গঙ্গাধরমিশ্রনামক এক ভরদ্বাজগোত্রীয় শাকদ্বীপী বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ মগধেশ্বরের মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। গয়াজেলা হইতে আবিষ্কৃত এক শিলাফলকে এই মন্ত্রিবংশের বহু কীর্ত্তিকলাপের উল্লেখ দেখা যায়। ভারতবর্ষের সকল জনপদেই শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণেব বাস আছে। কোন কোন প্রদেশে ইঁহারা অপর ব্রাহ্মণের সহিত মিশিয়া গিয়াছেন, কোন প্রদেশে বা বিভিন্ন নামে পরিচিত হইয়া থাকেন। বিহারপ্রদেশে

* সাম্বপুরাণ ২য়, ৩য়, ৪র্থ অধ্যায় পাঠ করুন।

প্রত্যেক ব্রাহ্মণশ্রেণীর মধ্য হইতে ঋত্বিক্ গ্রহণপূর্ব্বক বিবাদের মীমাংসা করিয়া দেন। শেষে মহাসমারোহে যজ্ঞকার্য্য সম্পন্ন হয়। মহারাজ মানসিংহের সময়ে জমিদারীর আয় ছিল বার্ষিক ১৪০০০০০৲ চৌদ্দলক্ষ টাকা। তিনি ভ্রাতৃগণসত্ত্বেও স্বীয় দৌহিত্রের নামে জমিদারীর উইল্ করিয়া যান। তদনুসারে বর্ত্তমান মহারাজ মহামহোপাধ্যায় সার্ প্রতাপনারায়ণ সিংহ বাহাদুর কে, সি, আই, ই, মহোদয় এখন অযোধ্যা-নরেশ *। ইনি প্রৌঢ়বয়স্ক এবং সংস্কৃত ও হিন্দীভাষায় শিক্ষিত। মহারাজ ইংরেজী-ভাষাও জানেন। ইঁহার যত্নে রাজ্যের আয় বার্ষিক চৌদ্দলক্ষ হইতে ষোললক্ষে পরিণত এবং উদ্যান, দেবমন্দির, জলাশয়, মনোহর সৌধমালা ও অত্যুচ্চসিংহদ্বারপরিশোভিত রাজভবন অমরাবতীর ন্যায় শোভাযুক্ত হইয়াছে। মহারাজ অত্যন্ত আস্তিক,—সন্ধ্যাপূজা, বেদ-পাঠ, স্তোত্রপাঠ ও পণ্ডিত এবং দণ্ডী পরমহংস-গণের সহিত শাস্ত্রীয় আলাপেই অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেন। ইনি বারাণসী-ধামস্থ ৺ ভাস্করানন্দস্বামীর শিষ্য। এখন পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য মৈথিলস্বামী মহারাজের ধর্ম্মোপদেষ্টা। অযোধ্যার রাজ-বাটীতে শাস্ত্রীয় বিবাদমীমাংসার নিমিত্ত একটি পণ্ডিতসভা ও রাজকার্য্যনির্ব্বাহের জন্য দরবার বা কাউন্সিল আছে। পণ্ডিতসভার সভাপতি মহারাজ। সদস্যগণ যথা—প্রয়াগদত্ত শর্ম্মা (বেদবিৎ), ভাউরাম পণ্ডিত (জ্যোতিষী), পণ্ডিত রামাবতার (বৈয়াকরণ), পণ্ডিত রামভরসা (সাহিত্যবিৎ), পণ্ডিত শিবদত্ত মিশ্র (আলঙ্কারিক), গোবর্দ্ধন পণ্ডিত (গণিতবিৎ), পণ্ডিত ববনপতি (দার্শনিক), পণ্ডিত নৃসিংহপতি (মীমাংসক)। এতদ্ভিন্ন রাজধানী হইতে বৃত্তিপ্রাপ্ত বহু পণ্ডিত আছেন। দরবার বা কাউন্সিলের প্রেসিডেণ্ট স্বয়ং মহারাজ। ম্যানেজার্ পুরুষোত্তম দাস (গুজরাটী বণিক্), দেওয়ান শ্রীধর পণ্ডিত (শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ), প্রাইভেট সেক্রেটারি গোবর্দ্ধন মিশ্র (ঐ), সেক্রেটারি (একটি বাঙালী) এবং অন্যান্য মেম্বর ও রাজকর্ম্মচারী অনেক আছেন।

৫ই কার্ত্তিক পূর্ব্বাহ্নে সরযূস্নান ও সন্ধ্যা-পূজা শেষ করিয়া পূর্ব্বপ্রস্তাব অনুসারে রাজ-বাটীতে গেলাম। দারোগা পণ্ডিত শিবদত্ত মিশ্র আহ্বান করিয়া একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসাইলেন। তখন বেলা আটটা। রাজ-ভবনের দক্ষিণাংশে সুবিস্তৃত পুষ্পোদ্যানের মধ্যে স্বর্ণমণ্ডিতচূড়াবিশিষ্ট বহু দেবমন্দির বিরাজমান। উহার অধিকাংশেই শিব, বিষ্ণু, রাম ও কৃষ্ণের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। মহারাজ পূর্ব্বাহ্ণ ৮টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত ক্ষৌম বসন ও উত্তরীয় ধারণ করিয়া নগ্নপদে প্রত্যেক দেব-মন্দিরে অর্চ্চনা ও স্তোত্রপাঠ করিলেন। কোথাও বেদপাঠ, কোথাও রামায়ণ, কোথাও মহাভারত, কোথাও পুরাণপাঠ হইতেছে। প্রত্যেক মন্দিরে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া ঐ সকল পাঠ শ্রবণ করিলেন। ইহা মহারাজের প্রাত্যহিক ব্যাপার। আমি অগ্রে জানিলে যথাসময়ে উপস্থিত হইতাম। কিন্তু কি করি,

* ইনি বর্ত্তমান বর্ষে মহামহোপাধ্যায় উপাধি লাভ করিয়াছেন। আমি যখন অযোধ্যায় গমন করি, তখন মহারাজ উক্ত উপাধিদ্বারা ভূষিত হন নাই।

সময় কাটাইবার জন্য ঘুরিয়া-ঘুরিয়া ঐ সমুদয় দেখিয়া বেড়াইলাম। ১২টার পর রাজপরিচ্ছদ পরিয়া মহারাজ দরবারে উপস্থিত হইলেন। স্বাক্ষরকার্য্য শেষ হইলেই আমি আহূত হইলাম। মহারাজ বিনয়ী ও বিলক্ষণ শিষ্টাচারপরায়ণ। প্রায় ১৫মিনিট কথোপকথন হইল। প্রথমে সংস্কৃতে, শেষে হিন্দীতে আলাপ শেষ হইল। তাহার পর আমি আদেশ লইয়া বাসায় ফিরিলাম। দেওয়ান্, প্রাইভেট্ সেক্রেটরি ও দারোগা আমাকে রাজবাটীতে আহার করিবার জন্য বিশেষ নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করিলেন, কিন্তু অকারণ তীর্থক্ষেত্রে প্রতিগ্রহ করা আমি সঙ্গত মনে করিলাম না, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ করিয়া ১টার সময় বাসায় ফিরিলাম।

বর্ত্তমান অযোধ্যায় শতাধিক মন্দির বিদ্যমান। উহার কতক বিষ্ণুমন্দির, কতক শিবমন্দির, কতক জৈনমন্দির। অবশিষ্ট মুসলমানের মস্‌জিদ্। এই নগরী উদাসীন ও ব্রাহ্মণে পরিপূর্ণ। উদাসীনগণের মধ্যে নির্ব্বাণী, নির্ম্মোহী, দিগম্বরী, খাকী, মহানির্ব্বাণী, সন্তোষী, নিরালম্বী প্রভৃতি বহু বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মঠ আছে। কাশ্মীর, জয়পুর, উদয়পুর, অযোধ্যা প্রভৃতি স্থানের মহারাজদিগের প্রদত্ত অর্থে ঐ সকল মঠ ও অতিথিশালার ব্যয়নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। কনোজিয়া, সরযূপারী ও শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণই এই নগরীর প্রধান অধিবাসী। কিন্তু এই তিন সম্প্রদায়ই নিতান্ত দরিদ্র। কনোজিয়াদের অধিকাংশই কৃষিজীবী, দরোয়ান্, পাণ্ডাদের চাকর ও মেঠাইওয়ালা। সরযূপারী ও শাকদ্বীপীরা জ্যোতিষী, চিকিৎসক, পুরোহিত, আর ভিক্ষাজীবী। ইতিপূর্ব্বে এখানে বিদ্যাচর্চ্চা অধিক ছিল না। বর্ত্তমান মহারাজের যত্নে কয়েকটি সংস্কৃতপাঠশালা ও একটি ইংরাজীস্কুল্ স্থাপিত হইয়াছে। ঐ সকল বিদ্যালয়ে নগরবাসী বালকেরা কিছু কিছু বিদ্যাশিক্ষা করিতেছে।

ঐ দিন অপরাহ্নে ৫টার সময় স্বর্গদ্বারঘাটে বসিয়া সরযূর তরঙ্গমালা নিরীক্ষণ করিতেছিলাম, এমনসময় এক ভৈরবী সেখানে উপস্থিত হইলেন। পরিচয়ে জানিলাম, ইনি বাঙালী ব্রাহ্মণকন্যা, বৈধব্যদশায় নিপতিত হইয়া কাশীতে গমন করেন এবং কিছুকাল কাশীতে অবস্থানের পর তন্ত্রমতে দীক্ষিত হইয়া ভৈরবী হন। এখন প্রায় প্রৌঢ়বয়সে উপনীত হইয়াছেন। এই বাঙালীমহিলার সাহস নিতান্ত অল্প নহে। ইনি কাশ্মীরের অমরনাথ, দ্বারকার রণছোড়মূর্ত্তি, কামরূপের কামাখ্যাদেবী, ভূতপুরীর শ্রীরঙ্গমূর্ত্তি প্রভৃতি একাকিনী ভ্রমণ করিয়া দর্শন করিয়াছেন। ভৈরবী বলিলেন, "তিনি দুইতিন সপ্তাহের অধিক কোথাও থাকেন না, কিন্তু অযোধ্যায় মাসাধিক কাল আছেন। দুইদিন গত হইল, বানরে তাঁহার দেহ ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিয়াছে।" তাঁহার দুর্দ্দশা দেখিয়া আমারও মনে ভয়ের সঞ্চার হইল। আমি পরদিন অপরাহ্নে অযোধ্যা ত্যাগ করিলাম।

শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী।

সঞ্চয়।

বেলা পড়ে' এল অই— করে' নেরে জীবনের
বেচা-কেনা সায়;
খেয়া-তরি ঘাটে বাঁধা, যাবি যদি ত্বরা করি',
এই বেলা আয়।

পশ্চিমে দিগন্তকোলে নিবিছে দিনের চিতা
রাঙা করি' জল;
পরপারে গ্রামখানি আঁকা যেন স্বর্ণপটে
নিবিড় শ্যামল!

কি দিলাম, কি পেয়েছি, হারায়েছি কিছু বুঝি,
দেখি ক্ষতি-লাভ;
গিয়াছে—গিয়াছে কিছু, পেয়েছি যা', তাহে মোর
হ'বে না অভাব!

লাভ কিছু নাই হ'ল, না হয়, সমানে গেছে
সম বিনিময়,
হেসে যাহা পাই নাই, পেয়েছি কি আঁখিজলে,
কে জানে নিশ্চয়?

আশা, স্মৃতি জড় করি' তাই নিয়ে নাড়াচাড়া,
ফিরে ফিরে চাই!
নূতন অর্জ্জন কিছু করিবার অবসর
নাই—আর নাই।

মুঠা-মুঠা ধূলি লুটি' করিনু শৈশবে কেলি
কলহাস্য তুলি';
স্বপ্নমত কোথা গেল অনাবিল জীবনের
স্বচ্ছ দিনগুলি?

কৈশোরের সুখচ্ছবি, যৌবনে প্রমত্ত আশা,
গেল কি ছলিয়া ?
শুধুই কি মরীচিকা, পাই নাই সার কিছু
আপন বলিয়া ?

'ওরে অন্ধ, খুলে ভাখ্ তোর পুঁজিপাটা যত,
ব্যর্থ সব নয় ;
ক্ষতি বলি' ভাব যারে, জীবনের মাঝে তাই
সফল সঞ্চয়।

'দিয়েছ অনেক বুঝি, এখন পাও না খুঁজি,
নাই—কিছু নাই,
হৃদয় করিয়া শূন্য, রিক্ত করি' প্রাণমন
ভাবিতেছ তাই।

'শূন্য নয়—রিক্ত নয় ওরে আশাহত, দীন,
তুচ্ছ লাভ-ক্ষতি ;
সকল আচ্ছন্ন করি' চেয়ে ভাখ্ দীপিতেছে
প্রেমের মূরতি !'

শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়।

শিল্পে ত্রিমূর্ত্তি।*

ধ্যানযোগস্ত সংসিদ্ধ্যৈ প্রতিমা লক্ষণং স্মৃতম্—
প্রতিমাকারকো মর্ত্ত্যো যথা ধ্যানরতো ভবেৎ,
তথা নান্যেন মার্গেণ প্রত্যক্ষেণাপি বা খলু ॥
দেবানাং প্রতিবিম্বানি কুর্য্যাচ্ছ্রেয়স্করাণি চ,
স্বর্গ্যাণি মানবাদীনামস্বর্গ্যাণ্যশুভানি চ।
অপি শ্রেয়স্করং নৃণাং দেববিম্বমলক্ষণম্,
সলক্ষণং মর্ত্ত্যবিম্বং নহি শ্রেয়স্করং সদা ॥

আর্য্যাবর্ত্তের কারুশিল্পিগণকে উপদেশ দিয়া শুক্রাচার্য্যের এই উক্তি।

In the best days of Phidias and even of his scholars there was but one aim—nature was looked upon only with one view that of understanding and representing her meaning and her efforts at attaining perfection in various grades whether of animate or inanimate

* পূজাবকাশ উপলক্ষে গভর্মেণ্ট আর্ট স্কুলে পঠিত।

life. এই হচ্চে গ্রীকৃশিল্পসম্বন্ধে বিলাতের Royal Academyর মূর্ত্তিশিল্পের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক Henry Weekes R. A. সাহেবের মতামত এবং আমরা ইহাকে নির্ভয়ে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি।

They aim not at a literal transcription of nature but at an expression of its inner significance... Directness, reticence and restraint are its main characteristics. To present the essential quality of a scene, not its mere outward appearance and that with best possible obtrusion of the material was its object.

জাপানিশিল্পের এই হ'ল লক্ষ্য।

এখন মোট কথাটা দাঁড়াইতেছে এইরূপ—

আর্য্যাবর্ত্তের শিল্পীর কর্ত্তব্য—চাক্ষুষ সমস্ত পদার্থ এবং বাস্তবজগৎ হইতে আপনাকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন রাখিয়া কেবল ধ্যানের দ্বারা হৃদয়পটে যে মূর্ত্তির উদয় হয়, তাহাই প্রকাশ করিতে যত্ন করা।

গ্রীকৃশিল্পীর মতে—বাস্তবজগতের ও চাক্ষুষ পদার্থসকলের সুন্দর অংশ একত্র করিয়া পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যের একটা একটা প্রতিমা খাড়া করাই শিল্পের চরম উৎকর্ষ।

জাপানি শিল্পীর কাছে—সুন্দর-অসুন্দর, স্বর্গ-মর্ত্ত্য, সকলি সমান। গোচর-অগোচর সমস্ত পদার্থের মর্ম্মগ্রহণ কর এবং সেই মর্ম্ম-কথা সহজে, সুসংযতভাবে, পরিষ্কাররূপে প্রকাশ কর।

পৃথিবীর তিনটা মহাদেশে তিন বিভিন্ন জাতির মধ্যে শিল্পের এই তিন আদর্শ তিনটি বিজয়স্তম্ভের মত আজিও বিদ্যমান। হঠাৎ দেখিলে তিনটা শিল্পই সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন বোধ হয়, কিন্তু গোড়ার কথা তিনেই এক। সেই মানস-প্রতিমা ও ধ্যানের প্রভাব তিনের ভিতরেই ফল্গুনদীর ন্যায় প্রচ্ছন্ন আছে।

গ্রীকৃশিল্পী যখন কোন নারীপ্রতিমা কিংবা কোন বীরমূর্ত্তি গড়িয়াছিল, তখন সে কোন মডেলের অপেক্ষা রাখে নাই; সে তার মানসপটে দৃঢ়তার যে আদর্শ কিংবা সৌন্দর্য্যের যে সুকুমার ভাবটি বহু সাধনায় পরিস্ফুট করিয়াছিল, সেইটাই জড় প্রস্তরে যথাসাধ্য আরোপ করিয়াছিল। যদি তাহাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মানুষ দেখিয়া তবে গড়িতে হইত, তাহা হইলে জগতে গ্রীকৃশিল্পের সৃষ্টিই হইত না।

জাপানিশিল্পীও তুলির দুই টানে মুহূর্ত্ত-মধ্যে যখন অনন্ত আকাশে উড্ডীন মরাল-শ্রেণী আঁকিয়া ফেলিল, তখন মেঘালোকে রাজহংসগণের আনন্দকাকলি এবং অপ্রতিহত গতিবেগের একটা যে ধারণা তাহার মনে ছিল, সেইটুকু প্রকাশ করিয়াই সে ক্ষান্ত রহিল। হাঁসটা ঠিক ডাক্তারিমতে anatomical হাঁস হইল কি না, দেখিবার ইচ্ছাও রাখিল না।

তেম্‌নি ভারতবর্ষের শিল্পীও যখন যেটি গড়িল, যথাশাস্ত্র ধ্যান ধরিয়া নিজের মানস-প্রতিমারূপেই গড়িল। ব্রহ্মার চার মুখ, বিষ্ণুর চারি হস্ত দিতে কিছুমাত্র ইতস্তত করিল না; শাস্ত্রোক্ত ধ্যানটুকু ধরিয়া সে যথাসাধ্য ব্রহ্ম-জ্যোতি কিংবা বিষ্ণুতেজের একটা

একটা অপার্থিব প্রতিমা খাড়া করিয়া তুলিল। মানুষ-মডেলের অপেক্ষাই রাখিল না।

অতএব দেখা যাইতেছে, যে একই মানস-প্রতিমা তিন শিল্পেরই লক্ষ্য, সেই একই মানস-দেবতা তিনেতেই বিদ্যমান। ত্রিমূর্ত্তি যেমন তিনই এক, একই তিন, ইনিও তাই। আমাদের দেশে ইনি ভোলানাথমূর্ত্তিতে বিরাজমান, এককালে সংসারত্যাগী,কেমন যেন পাগলাটে। গ্রীসে ইনি পুরুষোত্তম, শ্রীসৌন্দর্য্যসেবিত; আর জাপানে ইনি সৃষ্টিকর্ত্তা, যা মনে করেন, তাই হয়।

এ ছাড়া, এই কলিকালে আর এক শিল্প-দেবতা বলা চলে না—উপদেবতা আমাদের মধ্যে আপনার প্রভাব বেশ বিস্তার করিতেছেন, পূর্ব্বোক্ত ত্রিমূর্ত্তির সঙ্গে ইনি সম্পূর্ণ তফাৎ। লক্ষ্মীঠাকুরাণী যেমন কাহারও কাহারও ঘরে টাকার থলিরূপে পূজিতা, এই শিল্প-উপদেবতাটিও তেম্‌নি ধনদরূপে ইউরোপের ঘরে ঘরে উপাসিত এবং নব-শিক্ষিত আমাদের মধ্যেও বেশ আদরে-যত্নে পূজা পাইতেছেন। এই আজকালকার ইউরোপীয় কলাবিদ্যা পণ্যশালার বেশভূষার চাক্‌চিক্যে সাজিয়া-গুজিয়া বাঁধাদরে এবং লোকবিশেষে চড়া দরেও আপনাকে বিক্রয় করেন। ইনিও বলেন, স্বর্গকামনাই ইঁহার চরম লক্ষ্য, কিন্তু টাকার থলি টেঁকে লইয়া; কাজেই যাহারা টাকা দিবে, তাহাদের আগে সন্তুষ্ট কর এবং পার তো সময়মত হরিনামটা করিয়া লইও। ইঁহাকে দেখিলে চিনিতে পারিবে, গড়ের মাঠে ইনি খাস্ বিলাতি-আমদানি ডফ্‌রীন্‌মূর্ত্তিতে বিদ্যমান এবং আমাদের ঠাকুরঘরেও কার্ত্তিকটি সাজিয়া ইনিই বসিয়া আছেন। জাপানে ইনি এখনও বড় দেখা দেন নাই, কিন্তু জাপান আর কিছুদিন সাহেবি-দলে মিশিলে কি হইত বলা যায় না। পুণ্য-শেষে পুণ্যবান্ যেমন স্বর্গভ্রষ্ট হন, তেম্‌নি সেই প্রাচীন গ্রীকৃশিল্প লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া এই শিল্পে দাঁড়াইয়াছে, অতএব আমরা ইহাকে ভ্রষ্টশিল্প বলিতে পারি। গ্রীকৃশিল্প আর্য্যশিল্পের মত মর্ত্ত্যলোক হইতে আপনাকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন রাখে নাই;—সে নরদেবের উপাসনা শিখিয়াছিল, দেবতাকে দেখিতে চায় নাই, তাই তার দুর্দ্দশা।

ঘরের দেওয়ালে চিত্র করিবার সময় শিল্পীকে যেমন একমাত্রা চড়াইয়া রং লাগাইতে হয়—কালে সেটুকু মরিয়া ঠিক দাঁড়াইবে —সেইরূপ শিল্পের লক্ষ্য পার্থিব হইতে একধাপ উচ্চে না রাখিলে চলে না; এটুকু আমাদের শিল্পাচার্য্যেরা বেশ বুঝিয়াছিলেন। তাঁহারা জানিতেন, নরদেব হইতে নরে নামিতে বিলম্ব হয় না—কিন্তু স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যে পতন প্রাপ প্রবল না হইলে শীঘ্র ঘটে না। মানবশিল্পে মানুষভাব থাকিবেই, সেটা স্বাভাবিক, কিন্তু সেই মানুষভাবকে প্রশ্রয় দিলে একদিন দেব-সেনাপতি যে কাপ্তেন্‌বাবুতে নামিবেন, এ সত্যটা শুক্রাচার্য্য প্রভৃতি শিল্পাচার্য্যেরা বেশ হৃদয়ঙ্গম করিয়া শিল্পীর আদর্শ যতটা পারেন উচ্চে তুলিয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং সেইজন্যই দেবতার দিকে অতটা ঝোঁক দিয়াছিলেন। ঋষিবাক্যের সত্যতা, গ্রীক্ এবং আর্য্য শিল্পের মধ্যে কোন্‌টার কিরূপ পতন হইয়াছে আলোচনা করিলেই, বেশ উপলব্ধি হইবে। জাপানের শিল্পকে আমরা ইহার

ভিতর আনিতে পারি না, কারণ এখনও তাহার উঠিবার মুখ।

ভারতবর্ষে আর্য্যশিল্পের আদর্শগুলির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করিলে তাহাতে পর-পর প্রধানত তিনটা স্তর দেখা যায়। একটা খাঁটি ব্রাহ্মণ্যশিল্প, দ্বিতীয়টা বৌদ্ধশিল্প, আর তৃতীয়টা মোগলশিল্প।

ব্রাহ্মণ্যশিল্পে অপ্রাকৃতের চূড়ান্ত প্রভাব দৃষ্ট হয়, সে সকল গঠন পার্থিব হইতে যতদূর সম্ভব বিচ্ছিন্ন। নরসিংহ, দশগ্রীব, চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা, চতুর্ভুজ বিষ্ণু, এমন কি শ্রীরামে নবদূর্ব্বাদল ও শ্রীকৃষ্ণে নবীননীরদকান্তির মধ্যেও অপ্রাকৃতের প্রভাব। যেন একটা সৃষ্টিছাড়া খাম্‌খেয়ালি-গোছের, আলুথালু ভোলানাথমূর্ত্তি। হঠাৎ দেখিলে মনে হয় ছেলেখেলা, কিন্তু তাহারও ভিতরে মহামুক্তির যে উৎকট আনন্দ-উচ্ছ্বাস বর্ত্তমান, সেটি জগতের কোন শিল্পে কোনকালে পাওয়া যায় না। এ-কালের একএকটা মূর্ত্তি দৈবতেজে মানুষ হইতে যেন সম্পূর্ণ পৃথক্ হইয়া বসিয়া আছে; অতি অভাবনীয়! স্পর্শ করিতে ভয় হয়, পৃথিবীর দিকে দৃক্‌পাত নাই।

বৌদ্ধযুগে শিল্পদেবতা মানুষের আর একটু কাছে আসিলেন, তাহাতে শিল্পে সম্পূর্ণ মুক্তির উদ্দাম বেগ সংযতভাব ধারণ করিল বটে, কিন্তু সে মানুষের বশ্যতা এখনও স্বীকার করিল না। শিল্প বুদ্ধদেবের শরণ লইল, অশোক যে অত-বড় সম্রাট্, তাঁহার দিকে দৃক্‌পাতও করিল না—কেবল এক মনে নির্ব্বিকার বুদ্ধের প্রশান্তমূর্ত্তির ধ্যান ধরিয়া থাকিল। শিল্প যদি সে সময় ধর্ম্মাশোকের পূজা করিত, তবে প্রত্যেক অশোকস্তম্ভের শিখরদেশে অনুশাসনের পরিবর্ত্তে অশোকের নিজমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে দেখিতাম। অতএব বৌদ্ধযুগে আর্য্যশিল্প যে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছে, এ কথা বলা চলে না; ব্রাহ্মণ্যযুগে সে মেঘরাজ্যে বসিয়াছিল, এখন ধরাতলে, কিন্তু দৃষ্টি সেই ঊর্দ্ধমুখেই আছে।

তার পর মোগল-আমল। সে সময় আর্য্যশিল্প স্বাধীনতা হারাইয়া বাদশাহের পদানত হইয়াছে বটে, কিন্তু দাসখৎ লিখিয়া দেয় নাই। বাদশাহ-বেগমের মূর্ত্তি লিখিয়াছে বটে, কিন্তু ঠিক মানুষটি করিয়া লিখিতে পারে নাই, তাহাতেও অপ্রাকৃতের সম্পূর্ণ প্রভাব; স্বর্ণে, বর্ণে, ঔজ্জ্বল্যে তখনকার একএকটা মূর্ত্তি ঠিক বাদশা-বেগমটি না হইয়া রাজশ্রীর যেন একএকটা ধ্যানমূর্ত্তিরূপে প্রকাশ পাইতেছে এবং শাজাহানবাদশার আমলে যেম্‌নি একটু ছাড়া পাইয়াছে, অম্‌নি সে স্বর্গের মুখে ছুটিয়াছে এবং সেখান হইতে বিশুদ্ধ মর্ম্মরে মৃত্যুর এক মহাস্বপ্ন আনিয়া আগ্রায় যমুনা-তীরে বসাইয়া দিয়াছে। দেবতা ছাড়া আর্য্য-শিল্প আর কাহাকেও বলে নাই—

'ত্বমসি মম শরণং ত্বমসি মম জীবনম্।'

এখন দেখা যাক্, গ্রীক্‌শিল্পের কতদূর কি হইল—

গ্রীক্‌সাম্রাজ্যের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে রোম-রাজত্ব মাথা তুলিল এবং রোমরাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে সীজার্‌গণও মাথা তুলিলেন; সে যে-সে মাথাতোলা নয়, সারা পৃথিবীর একচ্ছত্র-সম্রাট্‌রূপে। রোমক কাব্যে, সাহিত্যে, শিল্পে, সঙ্গীতে যেন একটা দর্প আর ঐশ্বর্য্য ফুটিয়া পড়িতে লাগিল। রোমের সম্রাট্ ক্রমে নর-দেব বলিয়া গণ্য হইলেন এবং দেশের সমস্ত শিল্প-সাহিত্য-কাব্যকলা এই সকল নরদেবের

ও তাঁহাদের অনুচরগণের সেবায় নিযুক্ত হইল। জুপিটার্ হইতে গ্রীক্‌শিল্প সীজারে নামিল। রোমান্‌দিগের মধ্যে ধর্ম্মবিশ্বাস যে খুব উচ্চদরের ছিল, তা নয়; সৌন্দর্য্যের উচ্চতর ধারণা গ্রাক্ অপেক্ষা যে অধিক ছিল না, সে কথাও ঠিক; কাজেই শিল্পের আদর্শ এবং সেই সঙ্গে চরম লক্ষ্যটাও খাটো হইয়া আসিল। সৌন্দর্য্যের জ্যোতি গিয়া তাহাতে ক্রমে পার্থিব ধনৈশ্বর্য্যের চাক্‌চিক্যটাই অধিক ফুটিতে লাগিল। ক্রিশ্চিয়ান্‌ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবের সঙ্গে শিল্প আর একবার মাথা নাড়া দিয়াছিল বটে, তার প্রমাণ র‍্যাফেলের নিরুপম যিশু ও মাতৃমূর্ত্তিসকলে বিদ্যমান। সে সময়ে শিল্পকলা আর একবার ধর্ম্মবিশ্বাসে নবজীবন লাভ করিয়া স্বর্গীয় আলোকে মণ্ডিত হইয়া ধ্যানের প্রভাব, ধর্ম্মের প্রভাব ঘোষণা করিল,কিন্তু এই দীপ্তি ক্ষণস্থায়ী, যেমন নির্ব্বাণের পূর্ব্বে দীপশিখা। যিশুর অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে রোমরাজতন্ত্রের পতন এবং সেই সঙ্গে ক্রিশ্চিয়ান্ ধর্ম্মতন্ত্রের প্রাদুর্ভাব ক্রমেই প্রকাশ পাইতে লাগিল,—সে যেন আর একটা নূতন রোমরাজত্ব! যিশুর দীনতা, সাম্যভাব এবং শান্তমূর্ত্তি ইহার ছিল না; সীজার্ যেমন, পোপ্‌ও তেম্‌নি দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে নরদেবরূপে রোমসিংহাসনে দেখা দিলেন। শিল্পকলা যিশুর উপাসনা ছাড়িয়া পোপ্‌দিগের পদানত হইল এবং পোপের Vaticanনামক রাজপ্রাসাদে পারিষদগিরি করিতে থাকিল। এখানে কথা উঠিতে পারে যে, র‍্যাফেল্ এবং তাঁহার শিল্প তো পোপদিগের আশ্রয়েই প্রতিপালিত; কিন্তু এ কথা যেন মনে থাকে যে, র‍্যাফেল্‌শিল্প পোপাশ্রিত, কিন্তু পোপায়িত নয়। যে রসে র‍্যাফেল্‌শিল্প রসায়িত, সে রস পোপ্ হইতে আসে নাই, আসিতে পারেও না। সে রস স্বর্গের সুধা,ধর্ম্মবিশ্বাসের পুরস্কার। আমরা গ্রীক্‌শিল্পকলাকে পোপের পারিষদগিরিতে বসাইয়া আসিয়াছি, কিন্তু 'নলিনীদলগতজলবৎ' মানুষের সৌভাগ্য আজ আছে কাল নাই; পোপ্‌দিগের ক্ষমতা বেলান্ত সূর্য্যের ন্যায় ধীরে ধীরে অস্ত গেল এবং সেই সঙ্গে নানা রাজতন্ত্র ছোট-বড় ছত্রাকের মত ইউরোপের দেশে দেশে গজাইয়া উঠিল। গ্রীক্ শিল্পবেচারা এতদিন যা হোক একটা মহৎ-আশ্রয়ে থাকিয়া কতকটা গাম্ভীর্য্য বজায় রাখিয়াছিল, এবার তাহাকে পাকারকমে তোষামোদ আরম্ভ করিতে হইল; সে রাজা ও রাজপ্রণয়িনীদিগের উপবনসজ্জার ভার পাইল এবং সমস্ত স্বাধীনতা, যাকিছু উচ্চতর লক্ষ্য বিসর্জ্জন দিয়া অপেক্ষাকৃত অল্পশিক্ষিতের কাছে নকল দেখাইয়া এবং ওরি মধ্যে লোকবিশেষের কাছে নকীবি করিয়া দিনে দিনে অধঃপাতে গেল। যোগভ্রষ্টের কাছে তপঃসিদ্ধি, আর এই ভ্রষ্টশিল্পের চর্চ্চায় ফললাভের আশা, একইরূপ। কথাটা একটু শক্তরকমের হইল—আধুনিক ইউরোপীয় কলাবিদ্যা হইতে কিছুই শিখিবার নাই, এ কথা কে বিশ্বাস করিবে? কিন্তু সত্যের খাতিরে বলিতে হইতেছে যে, এ শিল্পচর্চ্চায় যতটুকু সুফল, কুফল-উৎপত্তির ভয় তার শতগুণ। প্রমাণ খুঁজিতে অধিকদূর যাইতে হইবে না, আমরাই তার প্রমাণ। এই নবশিক্ষার গুণে আমরা কি ফললাভ করিয়াছি,—তাহা দেখিলেই যথেষ্ট। আমরা দেশীয়শিল্পকে উন্নত করিতে পারি নাই, কিন্তু ঘৃণা করিতে শিখিয়াছি এবং সাধারণের মনে সেই ঘৃণার

ভাব যতদূর সম্ভব আমরাই জাগাইয়া তুলিয়াছি। আমরা জনসাধারণকে দোষ দিই যে, তাহারা দেশীয়শিল্পের আদর করে না, এ কথা পাকা শিল্পীর মত কথা নয়; যে সত্য ভাবুক, সে জনসাধারণের অপেক্ষা রাখে না; যে আসল ধর্ম্মাত্মা, সে যেমন রাজসিংহাসন তুচ্ছ গণে, সংসারের মান-অপমান, বিচার-অবিচার তার কাছে যেমন, খাঁটি শিল্পীরও আসন তেম্‌নি অটল। যে শিল্পকে জনসাধারণ গড়িয়া তোলে, সে শিল্প ক্ষণভঙ্গুর—কিন্তু যে শিল্প জনসাধারণকে গড়িয়া তোলে, সেই শিল্পই শিল্প এবং সেইখানেই শিল্পীর মহত্ত্ব। আমরাই এই বহুবর্ষ ধরিয়া জনসাধারণের মন ইউরোপের ভ্রষ্ট-শিল্পের দিকে লইয়া গিয়াছি এবং আমরাই ইচ্ছা করিলে সেই মন ফিরাইতে পারি। বিলাতী শিল্পের সুফলটুকু সাপের মাথার মণি —দেশীয়ভাবের তাগা বাঁধিয়া তবে তাহার দিকে হাত বাড়াইও, নচেৎ মরিতে হইবে, এইটুকু বুঝিলেই আমাদের মঙ্গল।

ইউরোপে শিল্পের কি অধঃপাত হইয়াছে, যদি আরও স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে চাও, তবে একটা গ্রীক্‌মূর্ত্তি, আর একটা আধুনিক মূর্ত্তি পাশাপাশি রাখিয়া দেখ, দেখিবে দুটার ভিতর আকাশপাতাল প্রভেদ। আধুনিকটা হুবহু মানুষ, নাক-চোখ-চুল-দাড়ি নিখুঁত, আর গ্রীক্‌মূর্ত্তি মানুষের মত হইয়াও ঠিক মানুষের সঙ্গে কতটাই না তফাৎ। একটা যেন শিল্প-দেবতা, পুরুষোত্তমরূপে বিরাজমান, তিলে তিলে উত্তম, আর আধুনিকটা সত্যপীরের মত মর্ম্মান্তিকরূপে সত্য হইয়া 'সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতম্' অতিশয় ভাল নয় বাক্যকে সার্থক করিতেছে। আবার এই গ্রীক্‌মূর্ত্তির সঙ্গে আর্য্যাবর্ত্তের বুদ্ধ কিংবা বিষ্ণু অথবা কোন একটি ধ্যানমূর্ত্তি জুড়িয়া দাও এবং পার তো জাপানের নারামন্দির হইতে এক বোধিসত্ত্ব আনিয়া বসাও, দেখিবে তিনেতেই এক ধ্যানের প্রভাব বর্ত্তমান। তিনেরই গঠনপারিপাট্য এতই সমান যে, সহসা দেখিলে মনে হইবে, একটা শিল্প হইতে তিনেরই উৎপত্তি। এইজন্য বৌদ্ধশিল্পে গ্রীক্‌ভাব দেখিয়া অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিত স্থির করেন যে, আর্য্যশিল্প গ্রীসের কাছে এবং জাপানশিল্প আর্য্যাবর্ত্তের নিকট ঋণী; কিন্তু একই দেবতা; তাঁরই যে এই ত্রিমূর্ত্তি; এ যে তিনই এক, একই তিন; কেহ কাহারও কাছে ঋণী নয়;—এ কথা ইউরোপকে বোঝান শক্ত। যে দেশের শিল্পী এখনও ধ্যানমূর্ত্তি গড়ে, সেই দেশের লোকই বুঝিয়াছে, জাপান বুঝিয়াছে এবং বুঝিয়া সে আপনার শিল্পের উপর একান্ত নির্ভর করিয়াছে; শিল্প-শিক্ষা করিতে সে বিলাতের মুখে ছুটে নাই; জাপানিশিল্প আজও নিজত্বটুকু বজায় রাখিয়াছে বলিয়া জগতে তার স্থান আজ অতি উচ্চে।

এখন কর্ত্তব্য, হয় গ্রীক্ পুরুষোত্তম সত্যপীররূপে ইউরোপে সিন্নি পাউন, জাপান জাপান লইয়া, পারেন তো রুষিয়া লইয়া থাকেন থাকুন; আমাদের যাহা আছে, আমরা তাহা লইয়াই থাকি।

কথা উঠিতে পারে, আমাদের কিছু আর আছে কি? সব যে গেছে। এটা কি সত্য? যে ধর্ম্মবিশ্বাস লইয়া পুরাকালে আর্য্যাবর্ত্তের শিল্পিকুল শ্রমকে শ্রমজ্ঞান করে নাই, যে বিশ্বাসের বলে সে একএকটা পর্ব্বত এক-টুকরা-পাথর-জ্ঞানে কাটিয়া-কুটিয়া তাহা

হইতে ইচ্ছামত বিচিত্র মঠমন্দির সৃষ্টি করিয়াছে, পর্ব্বতের গুহায় গুহায় যাহারা অক্ষয়-প্রদীপের ন্যায় মহোজ্জ্বল চিত্রশ্রেণী জ্বালাইয়া গিয়াছে, তাহাদের ধর্ম্মবিশ্বাসে আর আমাদের বিশ্বাসে কোন প্রভেদ আছে কি? সনাতন হিন্দুধর্ম্ম তখনও ছিল, এখনও আছে। যে জাতি সাঞ্চি গান্ধারস্তূপ গড়িয়াছিল, অজন্তায় চিত্র লিখিয়াছিল, সে জাতি পাতাল হইতেও উঠে নাই, আকাশ হইতেও পড়ে নাই; সে এখনও যে আর্য্য, তখনও তাই; ধর্ম্মের আদর্শ, সমাজের নিয়ম, শাস্ত্রের অনুশাসন এখনও সমান প্রচারিত—তবে কেন না আমরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষের সমকক্ষ হই? আমাদের আদর্শের অভাব নাই—ব্রাহ্মণ্যযুগের, বৌদ্ধযুগের মন্দিরমঠ এখনও বিদ্যমান, শিল্পশাস্ত্রও অপ্রচুর নয়, নিপুণতার বিজয়দণ্ড এখনও ভারতের হাতেই আছে; ইউরোপের ভ্রষ্টশিল্প মোহকুহকে কেবল আমাদের আচ্ছন্ন করিয়াছে মাত্র, লক্ষ্যভ্রষ্ট করিতে পারে নাই।

"দেবানাং প্রতিবিম্বানি কুর্য্যাৎ"—দেববিম্ব গঠন করিবে—এই ঋষিবাক্য গভীরভাবে আমাদের কারুশিল্পীর মনে এখনও মুদ্রিত রহিয়াছে। কারুশিল্পী বলিতে artschoolএর ছাত্র বুঝায় না, যাহারা বংশপরম্পরায় পুত্রপৌত্রাদিক্রমে এখনও প্রতিমা গড়িতেছে, পট লিখিতেছে, সুবর্ণের টুক্‌রা হইতে স্বর্ণশতদল, শঙ্খখণ্ড হইতে বিচিত্র বলয়, বন্যপুষ্প হইতে দেবতার পুষ্পমুকুট, কুসুমালঙ্কার রচনা করিতেছে; যাহারা শিশুকাল হইতে মাটিতে, পাথরে, সোনায়, রূপায় ধ্যানমূর্ত্তি গড়িয়া আসিতেছে, আমি তাহাদেরই কথা বলিতেছি। ঋষিবাক্য তাহারা এখনও অমান্য করে নাই এবং সেই কারণে তাহাদের শিল্পের অধঃপতন এখনও সুদূর। এ কথা যদি স্পষ্টতরভাবে চক্ষে দেখিয়া বুঝিতে চাও, তবে আশ্বিনের সন্ধ্যায় শঙ্খঘণ্টামুখরিত কোন দেবায়তনে আরতি-প্রদীপের আলোকতরঙ্গের মাঝখানে ধূপাচ্ছন্ন দুর্গাপ্রতিমার মুখের দিকে ভক্তিভরে চাহিয়া দেখিও, মহামায়ার কৃপায় মায়াকুহক দূর হইবে—দেখিবে, এখনও এদেশীয় শিল্পী মাটির প্রতিমায় কি নিরুপম সৌন্দর্য্য নিহিত করিবার ক্ষমতা রাখে এবং তুমি স্পষ্টই বুঝিবে, ধ্যানমূর্ত্তির মহত্ত্ব কোন্‌খানে, আর আর্য্যশিল্পের সৌন্দর্য্য ও স্থায়িত্ব কতটা।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ

ব্যঞ্জনবর্ণ দুইপ্রকার। ক হইতে ম পর্য্যন্ত যে পঁচিশটি অক্ষর, ইহারা সম্পূর্ণ ব্যঞ্জনধর্ম্মী এবং য হইতে হ পর্য্যন্ত আংশিক ব্যঞ্জনধর্ম্মী। কারণ ব্যঞ্জনের দুইটি লক্ষণ—(১) ইহা স্বরের সাহায্য ব্যতীত আপনা হইতে উচ্চারিত হইতে পারে না; (২) ইহার উচ্চারণে জিহ্বাযন্ত্র যাইয়া কণ্ঠতাল্বাদি স্থানের সহিত এমনভাবে মিলিত হয় যে, তাহাতে বাগ্বায়ুর্নির্গমনের পথ এককালে নিরুদ্ধ হইয়া যায়, যথা—অক্, অচ্ ইত্যাদি। কিন্তু অয়্, অর্, অল অব্

অশ্, অহ্ বলিতে সেইপ্রকার নিরোধ হয় না। "য"র উচ্চারণে "জ"র ন্যায় জিহ্বা যাইয়া তালুকে সম্পূর্ণভাবে চাপিয়া ধরে না, ইংরেজি zএর ন্যায় আংশিক স্পর্শ করে মাত্র, সুতরাং অয্ বলিতে বাগ্বায়ু নিঃসৃত হইতে পারে। এইপ্রকারে যকারাদি হকার পর্য্যন্ত বর্ণে বাগ্বায়ুর সম্পূর্ণ নিরোধ না হওয়া হেতু তাহারা পূর্ণভাবে উল্লিখিত-উভয়লক্ষণ বিশিষ্ট না হওয়ায় বর্গীয় ব্যঞ্জনবর্ণের অন্তে স্থাপিত হইয়াছে।

য

অন্তস্থ 'য' এবং 'ব' এই দুই বর্ণ যে যুক্তস্বর বা Diphthong মাত্র, তাহা পূর্ব্বে বলা গিয়াছে। ইহাদের উচ্চারণ যুক্ত ইঅ এবং যুক্ত উঅ, তাহাদেরই দ্রুতোচ্চারণ করিতে কখন-কখন কিয়ৎপরিমাণে z এবং bর ন্যায় হইয়া পড়ে। 'ই' এবং 'অ'র সংযোগে য-বর্ণের সৃষ্টি হয়, কিন্তু আমরা উহাকে ঠিক বর্গীয় "জ"র ন্যায় উচ্চারণ করি। যথা, যখন=জখন, কার্য্য=কার্জ্য, যাহার=জাহার। ইঅ বর্ণদ্বয়কে একস্বর করিয়া দ্রুতোচ্চারণ করিলে ক্রমে কথঞ্চিৎ "জ"র ন্যায় হইয়া আসে। কিন্তু 'জ' বলিতে যে দুইটি উচ্চারণযন্ত্রের অর্থাৎ জিহ্বা ও তালুর সবল সংঘাত হয়, 'য' বলিতে তদ্রূপ হয় না। য বলিতে ঐ দুইটি উচ্চারণযন্ত্রের কিঞ্চিন্মাত্র স্পর্শ হয়, সম্পূর্ণ স্পর্শ হয় না। ইংরেজিতে J এবং z এই দুইটি বর্ণের যেরূপ পার্থক্য, 'জ' এবং 'য'র কতক-পরিমাণে সেইপ্রকার পার্থক্য। কিন্তু z দন্ত্যবর্ণ আর য তালব্য। সুতরাং তাহাদের উচ্চারণ ঠিক এক নহে।.. zকে তালু হইতে উচ্চারণ করিলে যেরূপ হয়, 'য'র উচ্চারণ সেইরূপ। স্থূলত জানিতে হইবে যে, ইহা যুক্ত ইঅ।

(অন্তস্থ) ব।

অন্তস্থ ব। ইহারও আমরা বর্গীয় বকারের ন্যায় উচ্চারণ করিয়া থাকি। যথা ধাবতি, পিবতি, রাবণ ইত্যাদি। কিন্তু জানিতে হইবে যে, বকারটি যুক্তাক্ষর। উঅ বর্ণদ্বয়কে এক করিয়া দ্রুতোচ্চারণ করিলে প্রায় 'ব'র ন্যায় হইয়া আসে। বর্গীয় ব বলিতে যেরূপ ওষ্ঠদ্বয়ের সংঘাত হয়,অন্তস্থ ব বলিতে তদ্রূপ সম্পূর্ণ সংঘাত হয় না, ইহাতে ওষ্ঠদ্বয় অতি অল্প মিলিত হয় মাত্র, এবং সেইপ্রকার অল্প স্পর্শনে যেপ্রকার উচ্চারণ হয়, তাহাই ইহার প্রকৃত উচ্চারণ। ইংরেজি v, আর আমাদের অন্তস্থ বকারের উচ্চারণ কতকপরিমাণে একপ্রকার হইতে পারে। স্থূলত জানিতে হইবে যে, ইহা উঅ বর্ণদ্বয়ের সংক্ষিপ্তোচ্চারণ মাত্র; কিন্তু সেইরূপ না করিয়া এই বর্ণের অস্বাভা-বিক উচ্চারণ হইয়া থাকে। দ্বারকে বলা হয় দ্দার, 'দ্বি'কে দ্দি; দ্দা এবং দ্দির মধ্যে ব কিংবা উঅ কিছুই নাই, সুতরাং এইরূপ উচ্চারণ অদ্ভুত। বলা বাহুল্য যে, এই সকল অশুদ্ধো-চ্চারণহেতুই সংস্কৃত অনেকসময় আমাদের অবোধ্য হইয়া থাকে। দ্বার এবং দ্বি শব্দের আমরা কথিতভাষাতেই বরং বিশুদ্ধোচ্চারণ করিয়া থাকি। আমরা দ্বারকে দুয়ার এবং দ্বিকে দুই বলি। এস্থলে জানিতে হইবে যে, এই দুয়ার এবং দুই শব্দদ্বয় একএক-শব্দাংশক-(Syallable)-মাত্র; উহারা দ্বিশব্দাংশক নহে, সুতরাং উহাদের উচ্চারণ দু-য়া এবং দু-ই নহে। উভয় বর্ণকে মিলাইয়া এক-শব্দাংশক করিলে যেরূপ উচ্চারণ করিতে

হয়, আমরা চলিতভাষায় তাহাই করি এবং তাহাই বিশুদ্ধ, কিন্তু পণ্ডিত হইলেই সেইরূপ উচ্চারণ না করিয়া দ্দার এবং দ্দি বলিতে আরম্ভ করি। "তাম্বাদি" একটি শব্দ, ইহাকে যদি "তাম্লাদি" উচ্চারণ করি, তাহার অর্থ, যে সন্ধিবৃত্তি পড়ে নাই, তাহার বুঝিবার সাধ্য কি? কিন্তু বিশুদ্ধ উচ্চারণ করিলে সকলেই বুঝিতে পারে। এই উচ্চারণদোষে দ্বার এবং দুয়ার যে এক শব্দ, তাহা কেহ বুঝিতে পারে না। বিদ্যালয়ে পণ্ডিতমহাশয়েরা ছাত্রগণকে অর্থ লিখাইয়া দেন দ্বার অর্থ দুয়ার, অভিধানে লেখা হয় দ্বার অর্থ দুয়ার, যেন দ্বার এবং দুয়ার দুইটি বিভিন্ন শব্দ। কেবলমাত্র অন্তস্থ বকারের উচ্চারণজ্ঞানাভাবে এক শব্দকে দুইপ্রকার করিয়া লিখিয়া আমাদের আধুনিক "বঙ্গভাষার" নেতাগণ নানাপ্রকার ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। এতকাল বাঙ্‌লাতে দ্বারকে "দুআর" লিখিতেছিল, প্রাচীন বাঙ্‌লাপুস্তকে তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু যখন বাঙ্‌লায় ব্যাকরণ প্রণীত হইয়া ইহা এক স্বতন্ত্র সাহিত্যের ভাষারূপে গৃহীত হইল, তখন নেতাগণ দেখিলেন, ব্যাকরণানুসারে দুই স্বর একত্র থাকিতে পারে না। অতএব দুআর না লিখিয়া দুয়ার লিখিতে লাগিলেন। তাহা করিয়া আবার আর এক ভ্রমে পতিত হইলেন। তাহা এই যে, তাঁহারা আ এবং য়া এই দুইয়ের উচ্চারণ এক বলিয়া জানিতেন। আ এবং য়া যদি এক হইত, তবে সান্যাল এবং সানালেরও এক উচ্চারণ হইত। দুয়ার লিখিলে তাহার উচ্চারণ 'দুইআর' বা 'duyar' হয়, দুআর হয় না। এইপ্রকারে উচ্চারণানভিজ্ঞতাহেতু আমাদের ভাষার এরূপ অবস্থা হইয়াছে; সুতরাং ইহার প্রতি শিক্ষকগণের বিশেষ প্রণিধান করা আবশ্যক।

উল্লিখিত যুক্তস্বরসকল বিশুদ্ধরূপে উচ্চারণ না করাতেই অধিকাংশ সংস্কৃতশব্দ সাধারণের পক্ষে অবোধ্য হইয়া উঠে। 'য'র উচ্চারণ ইঅ হইতে প্রায় 'জ' পর্য্যন্ত এবং 'ব'র উচ্চারণ উঅ হইতে প্রায় ব পর্য্যন্ত। ইহাদের শেষসীমা পর্য্যন্ত না আসিয়া যতদূর প্রথমসীমার দিকে থাকা যায়, ততই শ্রেয়।

বিশেষ সাবধান না হইলে 'ইঅ'র উচ্চারণ 'জ' পর্য্যন্ত এবং 'উঅ'র উচ্চারণ ব পর্য্যন্ত আসিয়া পড়ে, কিন্তু তাহা বাঞ্ছনীয় নহে। এই যুক্ত উঅ এবং বর্গীয় ব উভয়ের আকার বাঙ্‌লাতে ঠিক একপ্রকার, কিন্তু দেবনাগরীতে তাহাদের আকারগত কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে; বাঙ্‌লা বর্ণমালায় ঐ দুই বর্ণের প্রভেদ করিয়া লেখার নিতান্ত প্রয়োজন। নচেৎ শব্দের প্রকৃত উচ্চারণ হইতে পারে না।

ল

লকারের আমরা যেরূপ উচ্চারণ করি, উৎকলদেশে তদ্রূপ করে না, তথায় উহাকে কতকপরিমাণে 'র'র ন্যায় উচ্চারণ করে। অন্তস্থবর্ণের যে লক্ষণ করা গিয়াছে, তাহা এই উভয়প্রকার উচ্চারণেই প্রযুক্ত হইতে পারে। সেই লক্ষণানুসারে ইহার কোন উচ্চারণই দূষণীয় নহে। কিন্তু দেখিতেছি, এই লকারবর্ণটির আমরা যেরূপ উচ্চারণ করি, তাহাতে অন্যান্য অন্তস্থবর্ণের সহিত ইহার উচ্চারণপ্রক্রিয়ার কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। কারণ ল ভিন্ন সকল অন্তস্থবর্ণেই উচ্চারণযন্ত্রদ্বয় দুই

পার্শ্বে মিলিত হইয়া মধ্যভাগ কিঞ্চিৎ ব্যবহিত থাকে এবং তদ্দ্বারাই বাগ্বায়ু নির্গত হয়। কিন্তু লকারের উচ্চারণে যন্ত্রদ্বয়ের মধ্যভাগ মিলিত হইয়া পার্শ্বদ্বয় ব্যবহিত থাকে এবং বাগ্বায়ু সেই দুই পার্শ্ব দিয়া বিনির্গত হয়।

আর-এক প্রকারে এই বর্ণের প্রকৃতি অন্য বর্ণ হইতে পৃথক্ দৃষ্ট হয়। সকল বর্ণই কণ্ঠ-তালু-মূর্দ্ধাদি কোন একটি বিশেষ স্থান হইতে উৎপন্ন হয় এবং বৈয়াকরণগণ এই লকারেরও একটি উৎপত্তিস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারা ইহাকে দন্ত্যবর্ণ বলেন; কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে ইহা তালু হইতে ওষ্ঠ পর্য্যন্ত সকল স্থান হইতেই উচ্চারিত হইতে পারে। ওষ্ঠ বলিতে ওষ্ঠদ্বয়ের সম্মিলন বলিতেছি না, উর্দ্ধোষ্ঠের সহিত জিহ্বাগ্রের মিলনে লকারের উচ্চারণ হইতে পারে। সুতরাং ইহাকে কেবল দন্ত্যবর্ণ বলার কোন কারণ আমরা দেখিতেছি না। বরঞ্চ আমরা সাধারণত ইহাকে মূর্দ্ধা হইতেই উচ্চারণ করিয়া থাকি। এমন অবস্থায় ইহা যে দন্ত্যবর্ণমধ্যে কেন ধৃত হইয়াছে, তাহার কারণ বুঝিতে পারি না। স্থূল কথা, উৎপত্তিবিষয়ে ইহার সমভাবাপন্ন বর্ণ আর নাই; কারণ, সকল বর্ণই কোন একটি বিশেষ-স্থান ব্যতীত অন্যস্থান হইতে উচ্চারিত হইতে পারে না, কিন্তু ইহার উচ্চারণ একাধিক স্থান হইতে নিষ্পন্ন হয়, এইরূপ বর্ণ আর বর্ণমালা-মধ্যে নাই।

শ্রীশ্রীনাথ সেন।

রাইবনীদুর্গ।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

বাঙ্লার সিংহাসন অধিকৃত করিয়া তাহা সুদৃঢ়ভিত্তিতে স্থাপিত করিতে আলিবর্দ্দীখাঁর প্রায় এক বৎসর কাটিল। কিন্তু প্রভু এবং প্রতিপালক ভূতপূর্ব্ব নবাব সুজাউদ্দীনের জামাতা মুর্শিদকুলীখাঁ তখনও নায়েব-নাজিম-রূপে উড়িষ্যাপ্রদেশ দখল করিতেছিলেন। কাজেই প্রভুপুত্রহন্তা রাজনীতিজ্ঞ নূতন নবাব নিজেকে নিষ্কণ্টক মনে করিতে পারিলেন না। অনেক কুটিল কৌশল ও মন্ত্রণার পর উড়িষ্যার খবর আসিল যে, "কৃতজ্ঞ" আলিবর্দ্দী অবশ্য জামাতাবাবাজীউর কোনরূপ অনিষ্ট-কামনা করেন না, তবে কিনা অবস্থাটা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে কুলীখাঁর স্বপদে অবস্থান কোন পক্ষেরই বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না, ইত্যাদি। স্বয়ং মুর্শিদকুলী সন্ধিস্থাপনের জন্য নবাবের কাছে দূত পাঠাইয়া এইরূপ উত্তর পাইলে ধনসম্পত্তি ও পরিবারবর্গ সহ স্থানান্তরে চলিয়া যাওয়াই নিরাপদ্ মনে করিতেছিলেন, কিন্তু সহধর্ম্মিণী দুর্দ্দানাবেগম ইহার প্রতিবাদিনী হইলেন। তাহার উপর যুবক জামাতা বাখরখাঁ নিজের শৌর্য্যবীর্য্যের বিস্তর "তারিফ" করিয়া সাহস দেওয়ায় কুলীখাঁ আর অমত করিতে পারিলেন না। যুদ্ধ করাই স্থির হইল।

গিরিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে নবাব সরফরাজের

হত্যাবসরে আলিবর্দ্দী যে দুরপনেয় কলঙ্ক সঞ্চয় করিয়াছিলেন, কুলীখাঁর প্রতি ব্যবহারটা তাহারই অনুরূপ, সন্দেহ নাই। ফলত ইহাতে তাঁহার প্রতি সমসাময়িক সকল সমাজের লোকই বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিল। উড়িষ্যাবিজয়ের পথে মেদিনীপুর ও বালেশ্বর অঞ্চলের জমিদারবর্গ তাঁহার রসদসরবরাহসম্বন্ধে যে সব বিঘ্ন উৎপাদন করেন, তাহা অকৃতজ্ঞ রাজ্যাপহারীর প্রতি আন্তরিক ঘৃণার পরিচায়ক মাত্র।

ময়ূরভঞ্জাধিপ রাজা চক্রাধিপভঞ্জ সাধারণ রাজা-জমিদারদের মত কেবল গৌণ উপায়ে সেই অধর্ম্মের প্রতি স্বীয় বিদ্বেষ প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না। সুবর্ণরেখার পরপারে রাজঘাটনামক স্থানে শ্রীক্ষেত্রযাত্রীদের জন্য তাঁহার অনেক ধর্ম্মশালা ছিল। তিনি সেই ধর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহার বিপুল চুয়াড় ও খণ্ডাইৎ বাহিনীর সমাবেশ করিয়া নবাব আলিবর্দ্দীর গতিরোধ করিতে স্থিরসঙ্কল্প হইলেন। ইদানীন্তনকালে এরূপ ধর্ম্মযুদ্ধের কথা আর শোনা যায় না।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

রাণী কৃষ্ণপ্রিয়া শৈশবে পিতৃহীনা হইয়াছিলেন। তাঁহার অনেকগুলি ভাই-বোন হইয়াছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কেহই বাল্যকাল উত্তীর্ণ হয় নাই। বিধবা মাতার তিনি একমাত্র অবশিষ্ট সন্তান এবং সম্পন্ন গৃহস্থের ঘরে এমন অবস্থায় যেরূপ হইয়া থাকে, বড় আদরে-যত্নে প্রতিপালিতা। মাতা নারায়ণী দেবী স্থির করিয়াছিলেন,একমাত্র কন্যাকে চক্ষুর অন্তরাল করিবেন না, তাঁহার মাতৃকুলের এক দূর জ্ঞাতিপুত্রকে ঘরজামাই করিয়া চিরদিন উভয়কে কাছে-কাছে রাখিবেন। কিন্তু স্বামীর জ্ঞাতিভাইবন্ধুরা এই পরামর্শের বিরোধী হইবেন জানিয়া প্রথমত কাহাকেও তিনি কিছু জানিতে-বুঝিতে দেন নাই,—সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার উদ্দেশে ভিতরে-ভিতরে সঙ্গোপনে চেষ্টা করিতেছিলেন।

নারায়ণী দেবী স্বামীর পরলোকগমনের পর গৃহে গোবিন্দজীবিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করিলেন। নিত্যসেবার ব্যবস্থায় গৃহস্থালীর কাজ অতিশয় বাড়িয়া গেল। বিশেষত সংসারে চাষ ছিল, চাকরবাকর অনেকগুলি। একাকিনী সব কাজ পারিয়া উঠেন না বলিয়া নিজের দূরসম্পর্কীয়া এক দরিদ্র বিধবা ভ্রাতৃবধূকে তিনি নিকটে আনাইয়া লইলেন। সঙ্গে তাহার একমাত্র পুত্র রাধাচরণ, সে কৃষ্ণপ্রিয়ার চেয়ে তিনবছরের বড়।

কৃষ্ণপ্রিয়ার পঞ্চম বৎসরে রাধাচরণ তাহার অহর্নিশি খেলাধূলার সঙ্গী হইল। এদিকে আশ্রিতা বিধবাকে নারায়ণী ইতিপূর্ব্বে মনের কথা ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছিলেন। কাজেই বালকবালিকা পরস্পরকে নাম ধরিয়া ডাকিলে তাঁহারা সুদূর সম্পর্কের গণ্ডীতে তাহাদিগকে আবদ্ধ করিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন না। যে বিরুদ্ধ সম্বন্ধে বিবাহ বাধে, হিন্দুর মেয়ে আশৈশবের সংস্কার ও শিক্ষার প্রভাবে তাহা কল্পনারও বাহিরে রাখিতে চায়।

রাধাচরণ স্বভাবত কিছু চঞ্চল, আর কৃষ্ণপ্রিয়া তাহার ঠিক বিপরীত। এরূপ প্রকৃতির ঘাতপ্রতিঘাতে সচরাচর চঞ্চলেরই জয়লাভ হয়। বালিকা গৃহপ্রাঙ্গণে ইঁট ও মাটির ছোট ছোট কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া পুতুল ও ঘুটিং খেলিয়া আগে আনন্দলাভ করিত। রাধা-

চরণের অভ্যুদয়ের কিছুদিন পরে দেখিতে-দেখিতে তাহার রুচি পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। বালক যখন দুইপ্রহরের রৌদ্রে আমবাগানের উদ্দেশে ছুটিত, সেও তাহার সঙ্গে ছুটিয়া একটুতে হাঁফাইয়া উঠিত। সে যখন অশ্বথ বা বট গাছে উঠিয়া পক্ষিকুলায়লুণ্ঠনের অভিসন্ধি করিত, বালিকা তখন ছায়ায় দাঁড়াইয়া ছবির মত সেই দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিত। স্নানের সময় রাধাচরণ যখন অবগাহনার্থ স্ত্রীপুরুষদের বারণ অগ্রাহ্য করিয়া সাঁতার কাটিত এবং সখীর জন্য কুমুদ ও কমলের বনে ফুল তুলিত, তখন বালিকা দীর্ঘিকার তীরে কি ঘাটের সোপানে বসিয়া-বসিয়া আকর্ণ-বিশ্রান্ত চক্ষুদুইটি তাহারই পানে স্থাপিত করিত। নিজে সাঁতার শিখিয়া তেমনি করিয়া ফুল তুলিতে তাহারও সাধ হইত, কিন্তু সাহসে অতটা কুলাইত না।

এইরূপে দুইজনের ভিতর প্রণয়সঞ্চার হইল। চারিবছরের বালিকা প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগরমহাশয়কে বলিয়াছিল, "তুই আমায় ভালবাসিবি না? আমি বাসিব।" সাধারণত লোককে তুমি বুঝাইতে পারিবে না যে, কচি ছেলেমেয়ের হৃদয় হইতে এমন কথা বাহির হইতে পারে। কিন্তু ইহাই সত্যকথা। সেই যে বালকবালিকার প্রণয় বা ভালবাসা, তাহাই স্নেহপ্রবণ মনুষ্যহৃদয়কন্দরের সুবিমল উৎস-ধারা,—তাহাতে যৌবনের আবিলতা নাই। কবি যথার্থ ই বলিয়াছেন, শিশুদের মত ভাল-বাসিতে কেহ জানে না।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

রাধাচরণের মত চঞ্চলপ্রকৃতির ছেলে সচরাচর সঙ্গিনী বালিকার স্নেহে ভুলিয়া বরাবর গৃহ-প্রাঙ্গণে অথবা ক্ষুদ্র বনকুঞ্জগ্রামের আম্র-কাননে আবদ্ধ থাকিতে জন্মগ্রহণ করে না। একটু বড় হইলে ক্রমশ সে পাঠশালায় লিখিতে-পড়িতে অভ্যস্ত হইল বটে, কিন্তু মাঝে মাঝে তামাসা দেখিবার জন্য জগন্নাথযাত্রিসঙ্কুল রাজঘাট, এমন কি জলেশ্বর পর্য্যন্ত ছুটাছুটি আরম্ভ করিল। কৃষ্ণপ্রিয়ার শক্তি এবং সাহসে গ্রামস্থ সুবর্ণরেখার প্রাচীন খাত পর্য্যন্ত কুলাইত না। কাজেই তাহাদের একটু একটু ছাড়াছাড়ি আরম্ভ হইল। কিন্তু তাহাতে ভাবের অভাব হইত না।

এই সময়ে রথযাত্রা উপলক্ষে রাধাচরণের মাতা, নারায়ণী দেবীকে অনুনয়ে বাধ্য করিয়া, পুরুষোত্তম যাত্রা করিলেন। সেকালে পুরী গেলে অনেককেই আর ফিরিয়া আসিতে হইত না, অতএব রাধাচরণ বিস্তর জেদ ও কাঁদা-কাটা করিয়াও মার সঙ্গে যাইতে পাইল না। যথাসময়ে খবর আসিল, ফিরিবার সময় বৈত-রণীতীরে তাঁহার তনুত্যাগ হইয়াছে। শোকে রাধাচরণ ক্ষিপ্তপ্রায় হইল। তার পর একদিন কোথায় চলিয়া গেল। নারায়ণী দেবী বিস্তর অনুসন্ধান করিয়াও তাহার কোন খোঁজ পাইলেন না।

রাইবনীদুর্গের রাজা শশাঙ্কনারায়ণ ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে বিপত্নীক হইয়াছিলেন। তখনও তাঁহার সন্তানাদি কিছু হয় নাই, কাজেই উমাপ্রসন্ন দাস স্বয়ং সুলক্ষণা কন্যার অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। বনকুঞ্জে কৃষ্ণ-প্রিয়ার সংবাদ পাইয়া তিনি সন্ন্যাসীর বেশে সেখানে উপনীত হইলেন। নারায়ণী দেবী তখন প্রায় বৎসরেককাল রাধাচরণের জন্য অপেক্ষা করিয়া তাহার সকল আশাভরসা

ত্যাগ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণপ্রিয়া আর বড় বাটীর বাহির হয় না, অন্য বালকবালিকার সঙ্গে খেলা করে না,—দিনদিন কেমন ম্রিয়মাণ হইতেছিল। দেখিয়া তিনি তার জন্য নূতন-রকম খেলার ব্যবস্থা করিলেন। বনকুঞ্জ-গ্রামের দীঘিগুলিতে বারমাস জলচর পক্ষীরা চরিতে আসিত, সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। মাতা কন্যাকে সঙ্গে লইয়া প্রত্যহ তাহাদের জন্য দুইবেলা আহারযোজনা করিতেন। ক্রমশ ধান্য ও তণ্ডুলকণার লোভে তাঁহাদের দূর হইতে দেখিতে পাইলে তাহারাও উল্লাসে তীরের নিতান্ত কাছে সাঁতার দিতে আসিত। এই খেলা কৃষ্ণপ্রিয়ার এরূপ ভাল লাগিল যে, কিছুদিনের অভ্যাসে যখন তখন সে একলাটি দীঘির ধারে গিয়া বসিত, মার সঙ্গ দরকার হইত না।

উমাপ্রসন্ন সর্ব্বসুলক্ষণা কন্যার এই জীব-সেবানুরাগ লক্ষ্য করিয়া মুগ্ধ হইলেন। তিনি নারায়ণী দেবীর আতিথ্যগ্রহণ করিয়া আত্ম-পরিচয় দিলেন এবং আগমনের উদ্দেশ্য গোপন করা বিহিত মনে করিলেন না।

এখন উমাপ্রসন্ন দাসের যশঃপ্রভা সমগ্র উৎকলপ্রদেশে বিকীর্ণ হইয়াছিল। নারায়ণী দেবী তাঁহার ন্যায় অতিথি লাভ করিয়া পরম সৌভাগ্য জ্ঞান করিলেন এবং আত্মসঙ্কল্প বিধাতার অনুমোদিত নহে স্থির বুঝিয়া দাস-মহাশয়ের প্রস্তাব অঙ্গীকার করিয়া লইলেন।

এই বিবাহের পাঁচবৎসর পরে পদাঙ্ক-নারায়ণ ভূমিষ্ঠ হইল। শিবাপ্রসন্ন তখন দ্বাত্রিংশদ্‌বর্ষীয় যুবাপুরুষ। ইহার কিছুকাল পরে শশাঙ্কনারায়ণ এবং উমাপ্রসন্ন প্রায় একই-সময়ে স্বর্গারোহণ করিলেন। কাজেই নিজ ও রাজসংসারের সকল ভার তাঁহার উপর পড়িয়াছিল।

রাইবনীদুর্গের ন্যায় বিজনপ্রদেশে বৈধব্যাবস্থায় অপেক্ষাকৃত হীনভাবে বাস করিতে রাণী কৃষ্ণপ্রিয়া আদৌ ইচ্ছুক ছিলেন না। কিন্তু শিবাপ্রসন্নের পরামর্শে মাতা নারায়ণী দেবীর ন্যায় কন্যাও শেষে বুঝিয়া-ছিলেন, ভাল হউক মন্দ হউক, সেই তাঁহার সকল গৌরবের স্থান। প্রথম-প্রথম সৌদামিনী দেবী বৎসরের অধিকাংশ রাণীর অভিভাবিকা-স্বরূপ রাইবনীতে থাকিতেন এবং সেই সময় হইতে পদাঙ্কনারায়ণ তাঁহার বড় অনুগত হইয়াছিল।

এই সকল পরিবর্ত্তনের মধ্যে কৃষ্ণপ্রিয়া বাল্যসখা রাধাচরণকে একেবারে ভুলে নাই। তাহাকে মনে করিয়া সময়ে-সময়ে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিত। সে মনঃকষ্ট স্নেহশীল নিরুদ্দেশ ভ্রাতার জন্য কনিষ্ঠার অবশ্যসহনীয়-শোকো-চ্ছ্বাস-তুল্য, তাহার বেশী আর কিছু নহে। আর রাধাচরণ?—তাহার কথা পরে হইবে।

ক্রমশ।

প্রাচীন সামাজিক চিত্র।

৪

শস্যক্ষেত্র।

ক্ষেত্র সামান্যত দুইপ্রকারে ব্যবহৃত হইত—'কৃষ্ট' ও 'অকৃষ্ট'। যাহাতে শস্য উৎপন্ন হইতেছে, তাহা 'কৃষ্ট', পতিত জমি 'অকৃষ্ট'। 'অকৃষ্ট' জমির অপর নাম 'খিল', একবৎসর জমি পতিত থাকিলে তাহা 'অর্দ্ধ-খিল', তিনবৎসরে 'খিল'; এবং ক্রমান্বয়ে পাঁচবৎসর পতিত থাকিলে তাহা অরণ্যের ন্যায় গণ্য হইত। (নারদ)

যদি কোন ক্ষেত্রপতি অশক্ত বা মৃত হয় বা স্থানান্তরে চলিয়া যায়,তবে তাহার ক্ষেত্রকে যে কর্ষণ করিত, সেই তাহার ফলভোগী হইত। আর যদি ক্ষেত্রপতি ক্ষেত্রকর্ষণের পর পুনর্ব্বার আসিয়া উপস্থিত হন, তবে কর্ষককে কর্ষণব্যয় প্রদান করিলেই তিনি শস্যের অধিকারী হইতেন; অন্যথা লব্ধশস্যের অষ্টমভাগ মাত্র পাইতেন। (নারদ)

যদি এতাদৃশ অবস্থায় কোন ক্ষেত্রপতি অষ্টবর্ষ পর্য্যন্ত ক্ষেত্রকর্ষণের ব্যয়প্রদান না করিতেন, তবে পূর্ব্বোক্তনিয়মানুসারে উপ-ভোগের পর অষ্টমবর্ষশেষে ক্ষেত্রপতিই ঐ ক্ষেত্র পাইতেন। (কাত্যায়ন)

যথোচিত করাদি বিতরণ করিয়া একাদি-ক্রমে তিনপুরুষ কোন ক্ষেত্র উপভোগ করিলে, সেই ক্ষেত্রস্বামীকে তাহা হইতে ক্ষেত্রে উপযুক্ত জল না হইলে শস্য শুষ্ক হইয়া যায়, আবার অতিরিক্ত হইলে নষ্ট হয়। এই উপদ্রব নিবারণের জন্য ক্ষেত্রে সেতুবন্ধন আবশ্যক হইত।

সেতু দ্বিবিধ—'খেয়' ও 'বন্ধ্য'। যেখানে জল আনিবার জন্য মৃত্তিকা খনন করা যায়, তাহা 'খেয়'; আর যে স্থানে অতিরিক্ত জলের আগমন নিবারণ করিবার জন্য মৃত্তিকাদির দ্বারা উচ্চস্তূপ নির্ম্মাণ করা যায়, তাহার নাম 'বন্ধ্য'। (নারদ)

ক্ষেত্রস্বামী প্রয়োজনানুসারে স্বস্ব ভূমিতেই সাধারণত সেতুবন্ধন করিয়া থাকিতেন। কিন্তু যদি দেখা যাইত যে,অপর কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে সেতু প্রস্তুত করিলে বহু লোকের উপকার হইতে পারে, আর সেই ক্ষেত্রস্বামীর অল্প ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে পরকীয় ক্ষেত্রেও অপর লোকে সেতু প্রস্তুত করিতে পারিত। এজন্য তাহাকে কোনরূপে দণ্ডিত হইতে হইত না। তবে সেতু প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বে ক্ষেত্রস্বামীকে জানাইতে হইত, নতুবা সেতুলব্ধ শস্যে সেতুকর্ত্তার অধিকার থাকিত না, তাহা ঐ ক্ষেত্রপতি গ্রহণ করি-তেন, অথবা তাহার অভাবে, রাজাই তাহাতে অধিকারী হইতেন। (নারদ, যাজ্ঞবল্ক্য)

বঞ্চিত করা হইত না। তবে রাজা ক্ষেত্র-স্বামীকে আনন্দপূর্ব্বক সম্মত করিতে পারিলে এ নিয়ম অন্যথা হইত। গৃহসম্বন্ধেও এই নিয়ম ছিল। (নারদ)

যদি কোন কৃষক ক্ষেত্রস্বামীর নিকট হইতে ক্ষেত্রগ্রহণের পর কেবল হলসঞ্চালন করিয়াই পরিত্যাগ করে, ও শস্যের বপন, রক্ষণ ও সংগ্রহ না করে, বা অন্যের দ্বারা না করায়, তবে সে ক্ষেত্রস্বামীকে কৃষ্টক্ষেত্রোৎপন্নের ন্যায় শস্যদান করিতে বাধ্য হইতে হইত এবং ক্ষেত্রস্বামী অন্য ব্যক্তিকে নিজক্ষেত্র প্রদান করিতেন। এই ক্ষেত্রস্বামী ঐ কর্ষকের নিকট হইতে যে ঐ শস্য আদায় করিতেন, তাহা ক্ষেত্রের মধ্যমরূপ ফলন অনুসারে ধরা হইত, অর্থাৎ অত্যুৎকৃষ্ট বা অতিনিকৃষ্টরূপে গৃহীত হইত না। (যাজ্ঞবল্ক্য ও বৃহস্পতি) কখন-কখন রাজাও এই কৃষকের নিকট হইতে তৎপরিমাণ শস্য দণ্ডস্বরূপে গ্রহণ করিতেন। (ব্যাস)

ক্ষেত্রে গবাদিপশু পতিত হইয়া যাহাতে শস্য নষ্ট না করে, তজ্জন্য গোচারভূমি প্রত্যেক লোকালয়েই নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিতে হইত। এই গোচারভূমির পরিমাণ স্বয়ং গ্রামবাসিগণ নিজের ইচ্ছায় ভূমির ন্যূনাধিকত্ব বিবেচনা করিয়া নির্দ্ধারণ করিতেন, অথবা রাজশাসনের দ্বারা তাহা সম্পাদিত হইত।

এই গোপ্রচারভূমি গ্রামের প্রত্যেক দিকে, গ্রাম ও ক্ষেত্রের মধ্যে শতধনু বা চারিশত হস্ত রাখিতে হইত। অথবা গ্রামের প্রান্ত হইতে কোন কীলক (চণ্ডেশ্বর) বা যষ্টি (কুল্লুকভট্ট) বহির্দিকে নিক্ষেপ করিলে তাহা যতদূরে উল্লঙ্ঘন করিয়া যায়, তাহার তিনগুণ ভূমি গ্রামের প্রত্যেক দিকে নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিতে হইত। নগরসম্বন্ধে এই শেষোক্ত প্রণালীতে গ্রামের জন্য যত ভূমি হয়, তাহার তিনগুণ অথবা চারিশত ধনু বা ষোড়শ-শত হস্ত রাখিবার নিয়ম ছিল। এতাদৃশ নির্দ্ধারিত গোপ্রচারভূমির অপর নাম 'বিবীত'। (মনু, যাজ্ঞবল্ক্য)

পথ, গ্রাম বা এই গোপ্রচারভূমির প্রান্তেই যদি কোন শস্যক্ষেত্র থাকে এবং তাহা যদি যথোচিত বৃতি বা বেড়া দ্বারা রক্ষিত না হয়, তাহা হইলে কোন পশু ঐ ক্ষেত্রের শস্য নষ্ট করিলে পশুপালের কোন অপরাধ হইত না। তবে অধিককাল ধরিয়া নষ্ট করিলে তাহাকে দোষী হইতে হইত। (নারদ, বিষ্ণু)

এই সকল স্থানে বৃতিগুলি এতদূর উচ্চ করিতে হইত, যেন উষ্ট্র বৃতির অন্তর্গত শস্য দেখিতে না পায়, অশ্ব তাহা উল্লঙ্ঘন করিতে সমর্থ না হয়, আর এতদূর দৃঢ় করিতে হইত, যাহাতে শূকর তাহা ভেদ করিয়া না যাইতে পারে। (নারদ, শঙ্খ, লিখিত)

পূর্ব্বোক্ত ভিন্ন অপর ক্ষেত্রে পশু শস্যনাশ করিলে, সাধারণত প্রত্যেক পশুর জন্য সওয়া-পণ কড়ি দণ্ডস্বরূপ ক্ষেত্রপতিকে দিতে হইত। এই দণ্ড পালকেরই দেয়, গো-স্বামীর নহে। (মনু)

গো প্রভৃতি কয়েকটি বিশেষ বিশেষ পশুর সম্বন্ধে নিম্নলিখিতরূপে দণ্ডগ্রহণ হইত—মহিষ আট, গো চারি, এবং ছাগ ও মেষের দুই মাষ পরিমাণ রজতদণ্ড। এই সকল পশু যথেষ্টরূপে শস্যভক্ষণ করিয়া যদি সেই ক্ষেত্রেই উপবেশনপূর্ব্বক বিশ্রাম করিতেছে দেখা যাইত, তবে ঐ দণ্ড দ্বিগুণপরিমাণে গৃহীত

হইত। (যাজ্ঞবল্ক্য) অশ্ব শস্য নষ্ট করিলে দশ এবং উষ্ট্র ও গর্দ্দভ করিলে ষোড়শ মাষ দণ্ড হইত। সাধারণত সমস্ত কথসেরই দণ্ড-রূপে একমাষ রজত প্রচলিত ছিল।* (শঙ্খ, লিখিত)

এই সকল দণ্ড স্থানবিশেষে পালক (রাখাল) বা স্বামীর নিকট হইতেই আদায় করা হইত।

যদি কোন ক্ষেত্রপতি গো-স্বামীর নিকট গোদ্বারা ভক্ষিত ধান্যের অনুরূপ ধান্য প্রার্থনা করেন, তবে গো-স্বামী তাঁহাকে ধান্য বা তাহার পরিবর্ত্তে যব প্রদান করিতেন। ইহার পরিমাণ নির্ণয় করিয়া দিতেন সামন্তগণ—অর্থাৎ সেই ক্ষেত্রের চারিদিকে অন্নর যে যে লোকের ক্ষেত্র থাকে, তাঁহারা। (নারদ) কিন্তু ধর্ম্মনাশভয়ে কখন-কখন লোকে তাহা চাহিত না। (উশনাঃ)

বীজসেক্তা বা বৃষোৎসর্গাদিতে উৎসৃষ্ট বৃষ, নবপ্রসূতা (যাহার প্রসবের দশদিন গত হয় নাই) গাভী, স্বযূথপরিভ্রষ্ট ও বিদ্যুদাদি দৈব-বিপ্লবে ও সৈন্যাদিদর্শনজনিত ভয়ে উপদ্রুত কোন পশু শস্যহানি করিলে, তাহার জন্য দণ্ড হইত না। (যাজ্ঞবল্ক্য ও মনু) বীজসেক্তা ছাগের সম্বন্ধেও এই নিয়ম ছিল। (শঙ্খ) হস্তী ও প্রজাপালনোপযুক্ত (সৈন্যাদির অন্তর্গত) অশ্ব ক্ষেত্রে শস্যনাশ করিলে, তাড়াইয়া দিতে হইত। তজ্জন্য কোন দণ্ডগ্রহণ করা হইত না। (উশনাঃ, নারদ) অধম, মধ্যম বা উত্তম, যে-কোন পশুই হউক না কেন, ক্ষেত্র বা আরামাদিতে প্রবেশ করিলে বন্ধন ও তাড়ন করা যাইত; ইহাতে স্বামী বিবাদ করিলে তাঁহাকে দণ্ডিত হইতে হইত। (কাত্যায়ন)

শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী।

রাজতপস্বিনী।

[জীবনীপ্রসঙ্গ]

৭

স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার ও গভীরতার সঙ্গে সঙ্গে গত-বিশবৎসর-মধ্যে এদেশের উচ্চশিক্ষিতা মহিলারা রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিয়া আসিতেছেন। কিন্তু ২৫।২৬বৎসর পূর্ব্বে লর্ড রিপনের আমলে স্বায়ত্তশাসনপ্রণালীর (Local Self-Government) অনুষ্ঠান-পত্র প্রথমে যখন গবর্মেণ্টগেজেটে মুদ্রিত হয়, তখন মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবীর ঐকান্তিক পোষকতায় সর্ব্বাগ্রে পুটিয়ার ন্যায় অপেক্ষাকৃত নগণ্যস্থানে সে-সম্বন্ধে সভা ও আনন্দোৎসব

* এই দণ্ডবিধানসম্বন্ধে কোন কোন স্মৃতিতে কিঞ্চিৎ ন্যূনাধিক পরিমাণ দেখা যায়

হইয়াছিল, ইহা সম্ভবত অনেকেরই জানা নাই। ঐ সভায় পর্দ্দার অন্তরালে মহারাণী স্বয়ং অন্যান্য সম্ভ্রান্ত কুলমহিলাদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন এবং দেওয়ানজী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই সভাধিষ্ঠানের কয়দিন পরে এদেশের ভিতর কৃষ্ণনগরে দ্বিতীয় অধিবেশনের খবর পাওয়া গেল। পুটিয়ার সভার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ তখনকার সাপ্তাহিক "বেঙ্গলি"তে প্রকাশিত হইবামাত্র দেশীয় ও ইংরেজী সংবাদপত্রসমূহে মহারাণীমাতার সাধুবাদ ঘোষিত হইতে লাগিল এবং নানারূপে বৎসরাধিককাল তাহা ধ্বনিতপ্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। মাতা ইহাতে বড় লজ্জিত হইলেন। গোপনে সৎকার্য্য করাই তাঁহার অভিপ্রেত এবং প্রকৃতিগত, খবরের কাগজের ঢক্কানিনাদ আদৌ পছন্দ করিতেন না। ফলত এই উপলক্ষে একদিকে দেশের কল্যাণকল্পে তিনি যেমন কর্ত্তব্যজ্ঞান ও দৃঢ়চিত্ততার পরিচয় দিয়াছিলেন, অপর পক্ষে তাঁহার স্বাভাবিকী লজ্জাশীলতাও তেমনি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তিনি জীবনে আর কখন তেমন প্রত্যক্ষভাবে কোন সভাসমিতিতে যোগদান করেন নাই, এবং যাত্রাদি উপলক্ষে সরিকদের গৃহে কদাচিৎ নিমন্ত্রণরক্ষার্থ যাইতেন। কিন্তু এই সংস্রবে অন্য প্রধান সরিক চারি-আনির বাটীতে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যাইতে কুণ্ঠিত হন নাই। লোকসমাগম অধিক হইবে বলিয়া চারি-আনির নূতন প্রশস্ত দ্বিতল গৃহে সভার স্থান নির্ব্বাচিত হইয়াছিল, ইহাতে কোনরূপ আপত্তি না করিয়া তিনি বরং উৎসাহ দিয়াছিলেন এবং আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার ন্যায় অসূর্য্যম্পশ্যরূপা আদর্শ-হিন্দুবিধবার পক্ষে সাধারণ রাজনৈতিক সমিতিতে সেভাবে যোগ দেওয়া সম্ভব, ইহা বস্তুত তাঁহার পূর্ব্বে ইদানীন্তনকালে আর দেখা যায় নাই। ইহার পর যত দিন যাইতে লাগিল, ততই সংবাদপত্রে ও দেশের চারিদিকে অন্যান্য সভাসমিতিতে তাঁর "রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়ার" কাহিনী প্রশংসার নানাসুরে অবিরত বর্ণিত হইতেছিল—তিনি কিছু ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। টাউন্‌হলের বিরাট্ সভায় আনন্দমোহন বসু মহাশয় প্রথমেই মহারাণীমাতার ও পুটিয়ার সমিতির উল্লেখ করিয়াছেন,তার পর মহারাণী স্বর্ণময়ীর কথা বলিয়া আত্মশাসনসম্বন্ধে বঙ্গের এই দুই লোকপূজ্যা সম্ভ্রান্তমহিলার (the two distinguished ladies of Bengal) আগ্রহ ও সহানুভূতির পরিচয় দিয়াছেন শুনিয়া তিনি ভারি কুণ্ঠিত হইলেন, যেন কি-একটা অন্যায় কাজ করা হইয়াছিল! সে যাহা হউক, স্বায়ত্তশাসনসম্বন্ধে কোথায় কি হইতেছে, তাহার খুঁটিনাটি সম্বাদ তিনি সর্ব্বদা রাখিতেন। রাজশাহীতে মিউনিসিপালিটির প্রথম চেয়ার্‌ম্যান্ কে হন জানিতে তিনি উৎসুক ছিলেন এবং আগ্রহে একদিন আমায় সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। একদিন প্রাতে আমরা কয়জনে তাঁহাকে প্রণাম করিতে গেলাম। মা রাজবাটীর কেরাণী ব্রজসুন্দরকে একখানি অপেক্ষাকৃত পুরাতন সাধারণী দিয়া বলিলেন, সেখানি তাঁর কাছে ছিল। পরে আমায় বলিলেন, "তুমি কি দেশে গিয়া আত্মশাসনের সভা করিয়াছিলে? (তিনি আত্মশাসনই বলিতেন।) এই কাগজে লেখা আছে, তুমি চাষাদিগকে আত্মশাসন বুঝাইয়াছিলে,

তোমার বড় ভাই সভাপতি হইয়াছিলেন।”

স্বায়ত্তশাসনসংক্রান্ত ঢাকায় যে সভা হইয়াছিল, তাহাতে বিশহাজার লোকসমাগম হয়। ইংলিশম্যানের তারের খবরের স্তম্ভে এই সংবাদ পড়িয়া আমি মহারাণীমাতাকে জানাইলাম। ইহাতে তিনি আনন্দলাভ করিয়াছিলেন। আর একদিন কলিকাতা মিউনিসিপালিটির নূতন নির্ব্বাচনের কথা হইতেছিল। সে উপলক্ষে রাজধানীতে বড় ধুমধাম হইয়াছিল। করদাতৃগণ সে সময় যেরূপ আগ্রহ ও উৎসাহ দেখাইয়াছিলেন,তাহা “আত্মশাসনে” অভ্যস্ত দেশেই সম্ভব। হাইকোর্ট হইতে বিচার হইয়া গিয়াছিল, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মিউনিসিপাল কমিশনর হইতে পারেন না। তাহা লইয়া সেদিন হুলুস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল। মাতা এই মোকদ্দমার কথায় জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, এই “ডাক্তার” উপাধির অর্থ কি? আমি বুঝাইয়া দিলাম। মিত্রমহাশয় “ওয়ার্ড-ইন্‌ষ্টিটিউট্‌”-সম্পর্কে সেকালের কোর্ট অব্‌ ওয়ার্ডসের কর্ত্তৃত্বাধীন তরুণ জমিদারদের বিলক্ষণ পরিচিত ছিলেন, স্বর্গীয় রাজাকেও কিছুকাল তাঁহার পর্য্যবেক্ষণে থাকিতে হইয়াছিল। অতএব মহারাণীমাতা সেদিন তাঁহার কথা অনেক জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

সাধারণত দেশের বর্ত্তমান ঘটনাবলীর খবরাখবর সকলই তিনি জানিতেন এবং আগ্রহের সহিত সকল বিষয়ের তথ্যানুসন্ধান করিতেন। গভর্ণর জেনারেলের জেল্‌সম্বন্ধে মন্তব্যপত্রে অনেক নূতন কথা ছিল। এই সময়ে সুরেন্দ্রবাবুর প্রেসিডেন্সি-ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ হওয়ার খবরও সংবাদপত্রে বাহির হইল। মহারাণীমাতার সহিত এই উভয় বিষয়ে আমাদের কথাবার্ত্তা হইয়াছিল।

তিনি রাণী-উপাধি লাভ করিলে খেলাৎদানসম্বন্ধে গবর্মেণ্টের সহিত পত্রব্যবহার হইল। তিনি কুলবধূ, দরবারে উপস্থিত হইতে অক্ষম—তাঁহার উত্তরের মর্ম্মার্থ এইরূপ। নজর বলিয়া অর্থোপহার দেওয়ারও দরকার তিনি মনে করেন নাই। যথাসময়ে দরবারের দিন স্থির হইলে দেওয়ানজীকে তাঁহার পক্ষে উপাধির সনন্দ আনিতে জেলার সদরে যাইতে হইল। তাঁহাকে মাতা বলিয়াছিলেন, “গতবৎসর প্রিন্স অব্‌ ওয়েল্‌স্‌ আসিলে বাঁকিপুরের দরবারে আমার নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। তখন আমি কলেক্টর ডয়েলীসাহেবকে লিখিয়াছিলাম, নিমন্ত্রণের গৌরবরক্ষার্থ আগামী শীতঋতুতে আপনার যোগে আমি গরিবদুঃখীদের কিছু শীতবস্ত্র দিব। সেই প্রতিশ্রুতিপালনের সময় উপস্থিত। আপনি কলেক্টরের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া দরবারের পূর্ব্বেই হাজার-টাকার কম্বল শীতার্ত্তদের বিতরণ করিবেন। কিন্তু আমার এই উপাধিপ্রাপ্তি উপলক্ষে কোনরূপ দান হইতে পারিবে না। দরবারের পর কিছু বিতরণ করিলে লোকে বুঝিবে যে, উপাধি পাইয়া আমার আহ্লাদ হইয়াছে।” ইহার অনেকদিন পর ডয়েলীসাহেব, যখন ভাগলপুরের কলেক্টর, সেখানকার কলের জলের জন্য কিছু চাঁদা দিতে মহারাণীকে অনুরোধ করেন। তদুপলক্ষে মাতা আমায় বলিয়াছিলেন, “কলিকাতায় তোমার কাছে টাকা পাঠাইব। তুমি সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাহা তাঁকে দিও, কিন্তু বিশেষ করিয়া

বলিও যে, দানের কথাটা যেন গোপন থাকে, খবরের কাগজে না উঠে।" ইহার পরই তিনি বড় পীড়িত হইয়া পড়েন। চাঁদা পাঠান হইয়াছিল কি না, বলিতে পারি না।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার।

দুর্ভিক্ষপীড়িত ভারতে।

১২

রাজাদের শৈলনিবাস।

ভারতের এই উদাস মরুদৃশ্যের উপর ভাস্বর ও বিষণ্ণ মধ্যাহ্ন ক্রমশ অগ্রসর হইতেছে। হস্তী শান্তভাবে পর্ব্বতের উপরে উঠিতেছে; অতিমানুষপ্রমাণ একটা খোদিত ঢালু-সিঁড়ি দিয়া হস্তী পর্ব্বতের পার্শ্বদেশে আরোহণ করিল। এই স্থানটি ভগ্নাবশেষে সমাচ্ছন্ন; যেন ইহা দেবতাদের—মন্দিরসমূহের—প্রাসাদ-সৌধাবলীর একটা প্রকাণ্ড সমাধিক্ষেত্র।

সহজভাবে ও মৃদুভাবে যাহাতে উপরে উঠিতে পারে, এইজন্য হাতী বাঁকা-চোরা পথ দিয়া চলিতেছে। তাহার দোদুল্যমান প্রকাণ্ড দেহপিণ্ডটা আমাদিগকেও মুহুমুহু দুলাইতেছে। তাহার "গোদা-পায়ের" প্রতি পদক্ষেপে ধূলা-রাশি যেরূপভাবে নিষ্পেষিত হইতেছে, তাহাতেই তাহার প্রকাণ্ড শরীরের গুরুত্ব আমি বেশ অনুভব করিতে পারিতেছি। হাতী নিঃশব্দে চলিয়াছে; চারিদিক্ নিস্তব্ধ; কেবল তাহার দুই পার্শ্বে যে দুইটি রূপার ঘণ্টিকা ঝুলান রহিয়াছে, তাহা হইতে বিষণ্ণ-গম্ভীর ধ্বনি মধ্যে মধ্যে নিঃসৃত হইতেছে। কখন-কখন, উচ্চ স্থির আকাশে উড়ন্ত পাখীর পক্ষোত্থিত শাঁই-শাঁই শব্দ শুনা যাইতেছে;—মাথার উপর দিয়া একটা শকুনি, একটা চিল চলিয়া গেল।

পর্ব্বতটা একেবারে খাড়া হইয়া উঠিয়াছে;—উহার উপরে উঠা কষ্টকর। পর্ব্বতের যে পাশে 'খদ্', তাহার উপর দিয়া দুর্গবপ্র-সমন্বিত একটা প্রাচীর প্রসারিত হইয়া ধূলিসমাচ্ছন্ন সূর্য্যরশ্মি-উদ্ভাসিত ধূসরবর্ণ দূর-দিগন্তকে বিখণ্ডিত করিয়াছে। পর্ব্বতের অপর পার্শ্বের উপর হইতে বিরাট্-আকৃতি পদার্থসকল দৃষ্টি-গোচর হইতেছে; তিনশত ফিটেরও অধিক স্থান ব্যাপিয়া একটা গণ্ডশৈল—তাহার উপর দুর্গপ্রাসাদসমূহ অধিষ্ঠিত; সেরূপ সৌধ-প্রাসাদাদি একালে নির্ম্মাণ করা দুঃসাহসের কাজ,—একপ্রকার অসাধ্য বলিলেও হয়। মাথা তুলিলেই দেখিতে পাওয়া যায়—এই সব প্রাচীনকালের প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড প্রাসাদ কতদূর পর্য্যন্ত চলিয়াছে, তাহার আর শেষ নাই; ইহাদের গঠনভঙ্গী আমাদের নিকট সম্পূর্ণ-রূপে অপরিচিত; কত-কত শতাব্দী হইতে, এই সকল সৌধপ্রাসাদ অতলস্পর্শ খাতের ধারে অঘূর্ণিতমস্তকে অটলভাবে দণ্ডায়মান। এই নৈসর্গিক দুর্গশৈলের উপর কত-কত

রাজবংশ—যাঁহাদের অস্তিত্বও এখন আমরা কল্পনা করিতে পারি না—ঐ উচ্চদেশে দুষ্প্রবেশ্য নিরাপদ্ আবাসস্থান নির্ম্মাণের জন্য কত সহস্র বৎসর হইতে প্রস্তরের উপর প্রস্তর রাশীকৃত করিয়াছেন। ভারতের সর্ব্বত্রই যেসব প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড ধ্বংসাবশেষ সমাকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার নিকটে আমাদের দেশের ক্ষুদ্র ভূপতিদিগের দুর্গ-প্রাসাদাদি কি হাস্যজনক!

হাতী থপ্‌থপ্ করিয়া মন্থরগমনে উপরে উঠিতেছে। মধ্যে মধ্যে তাহার গাত্রবিলম্বিত ঘণ্টিকা হইতে একঘেয়ে মৃদুমধুর ধ্বনি নিঃসৃত হইতেছে। মধ্যাহ্নসূর্য্য হাতীর তলদেশে হাতীর চলন্ত ছায়াচ্ছবি অঙ্কিত এবং মাটীর উপর তাহার দোদুল্যমান শুণ্ডটি কালো-রঙে চিত্রিত করিয়াছে। আদবকায়দার দস্তুর অনুসারে দুইজন লোক আমাদের আগে-আগে চলিয়াছে এবং রূপালী-মাথাওয়ালা দুইটা লম্বা ছড়ি হস্তে ধারণ করিয়া তন্দ্রাগ্রস্ত ব্যক্তির ন্যায় অলসভাবে উপরে উঠিতেছে। উপরে উঠিতে উঠিতে একএকটা দ্বার আমাদের সম্মুখে আসিয়া পড়িতেছে; আমরা প্রাচ্য-দেশসুলভ ঢিমা-চালে তাহার মধ্য দিয়া চলিয়াছি। দ্বারগুলা—বলা বাহুল্য—ভীষণ-দর্শন; তাহার উপরে প্রহরীদের ঘর; গোয়ালিয়ারের সৈনিকেরা পাহারা দিতেছে; কেন না, অতীত-গৌরবের নিদর্শনস্বরূপ বিপুল ভগ্নাবশেষের মধ্যে, পর্ব্বতের ঐ উচ্চচূড়ায়, তাহাদের রাজা এখন অবস্থিতি করিতেছেন। আমাদের চতুর্দ্দিকে, দূর দিগন্তের অস্পষ্ট পরিধিমণ্ডল ক্রমশ বিস্তৃত হইতেছে। গগন-বিলম্বিত একপ্রকার ভস্ম-কুয়াসার নীচে শুষ্ক তরুগণের বিচিত্রবর্ণ যেন ধূসরে বিলীন হইয়াছে।

স্ফুলিঙ্গবৎ দীপ্যমান ধূলিকণায় পরিষিক্ত ধূসর দিগন্তদেশ ধূসর আকাশে মিলাইয়া গিয়াছে। সেই আকাশতলে বড়-বড় শিকারি-পাখী প্রাতঃকাল হইতে আবর্ত্তের ন্যায় ক্রমাগত ঘোরপাক দিয়া এক্ষণে শ্রান্ত-ক্লান্ত-অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

শৈলরাশির মধ্য হইতে যেন একটা তপ্ত-নিশ্বাস উচ্ছ্বসিত হইল; আকাশে বায়ুর হিল্লোলমাত্র নাই। মধ্যাহ্নসূর্য্যের প্রচণ্ড কিরণে অভিভূত হইয়া পাখীরাও নিস্পন্দ ও নিদ্রামগ্ন; চিল ও শকুনিরা পাখা গুটাইয়া স্থিরভাবে বসিয়া আছে এবং আমাদিগকে নিরীক্ষণ করিতেছে। গণ্ডোলা-নৌকার অবিশ্রান্ত দোলনের ন্যায় হাতীর চলন-ভঙ্গীতে আমাদের মন ক্রমশ অসাড় হইয়া পড়িতেছে; সূর্য্যের দুর্নিরীক্ষ্য আলোকে প্রতিহত হইয়া চক্ষু নিমীলিত হই-তেছে; তাহার পরেই, এই সব ধূসর পদার্থরাশির মধ্যে,—বর্ষণহীন বহুবর্ষের ধূলায় লোহিতীকৃত এই সব প্রস্তররাশির মধ্যে,—সম্মুখের ভূমি ছাড়া, কাছের জিনিষ ছাড়া আমি আর কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। প্রথমে চোখে পড়িল একটা জরির পাগ্‌ড়ি, একটা শ্যামল-রঙের ঘাড়, শাদা কাপড়ে আচ্ছাদিত একটা স্কন্ধ, একটা ছোট তীক্ষ্ণ বল্লম; হিন্দু মাহুত হাতীর ঘাড়ের উপর বুদ্ধের ন্যায় উপবিষ্ট; তাহার হাতে অঙ্কুশ। তাহার পর, হাতীর মাথায় জড়ান এক-টুকরা লাল কাপড়, কালো-ডোরা-কাটা গোলাপী-রঙের বৃহৎ কর্ণযুগল; মাছি

ও ডাঁশ তাড়াইবার জন্য হাতী তাহার কানদুটা হাতপাখার মত ক্রমাগত নাড়িতেছে।

গুরুপদভরে পথ দলিত করিয়া, শান্ত-শিষ্ট-বশ্য অক্লান্ত হস্তী পর্ব্বতের উপরে উঠিতেছে। তাহার পার্শ্বদেশে একটা গোলাকার গণ্ডশৈল, দেখিতে তাহারি মত; না জানি, তিমিরাবৃত কোন্ দূর অতীতের মনুষ্যগণকর্ত্তৃক কতকটা হস্তিদেহের অনুকরণে এই গণ্ডশৈলটি খোদিত হইয়াছিল; উহাতে হস্তীর শুণ্ড, দীর্ঘদন্তসমন্বিত মস্তক, হস্তীর পশ্চাদ্ভাগ অস্পষ্টরূপে উৎকীর্ণ রহিয়াছে। তা ছাড়া, বিলুপ্তভাষায় লিখিত কতকগুলা উৎকীর্ণ-লিপি এবং পর্ব্বতের গায়ে খোদিত কুলুঙ্গির মধ্যে বহুসংখ্যক খোদিত দেবদেবীর প্রতিমাও রহিয়াছে। যাহারা এই ভীষণ স্থানের প্রথম অধিবাসী, সেই পাল-রাজাদিগের ও জৈনদিগেরই এই সমস্ত কীর্ত্তি।

নীচে,—জলন্ত উত্তাপময় প্রসারিত ক্ষেত্রের মধ্যে, ভাসমান একপ্রকার ভস্মময় বাষ্পের তলদেশে, প্রাচীন গোয়ালিয়ারের ভগ্নাবশেষসমূহ একটু-একটু দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে; তা ছাড়া, নূতন গোয়ালিয়ার—সব শাদা—যাহাকে দেশীয় লোকেরা অবজ্ঞাসহকারে "লথ্থর" (সৈন্য-ছাউনী) বলে—তাহারও পাথরের বড়-বড় সৌধচূড়া, মন্দিরচূড়াদি অল্প-অল্প দৃষ্টিগোচর হইতেছে। এখন মধ্যাহ্ন। আমাদের মাথার উপর প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড অনলকণা বর্ষণ করিতেছেন; পাথরগুলা এরূপ তাতিয়া উঠিয়াছে, মনে হয় যেন অগ্নিকুণ্ড হইতে আগুনের কিরণ নিঃসৃত হইতেছে। নিস্তব্ধতা ও উত্তাপে বিহ্বল হইয়া চিল, শকুনি ও কাকেরা নিদ্রা যাইতেছে।

ক্রমাগত উপরে উঠিয়া অবশেষে ভীষণদর্শন প্রাসাদসমূহের পাদমূলে আসিয়া উপনীত হইলাম। এই প্রাসাদগুলা একেবারে "খদের" ধারে অধিষ্ঠিত এবং উহাদের দ্বারা পর্ব্বতচূড়ার উচ্চতা যেন আরো বর্দ্ধিত হইয়াছে। ছোট-ছোট-চূড়াসমন্বিত প্রাসাদের মুখভাগটি অতুলনীয়। সমানভাবে বসান প্রস্তরপিণ্ড উপর্য্যুপরি বিন্যস্ত হইয়া বরাবর প্রসারিত এবং বিবিধ-জীবজন্তু-ও-মনুষ্য-আকৃতির অনুকরণে রচিত নীল, সবুজ সোনালি রঙের প্রভৃত খচিত-কাজে অলঙ্কৃত। এই সকল উত্তুঙ্গ দুর্গম প্রাসাদে গোয়ালিয়ারের ভূতপূর্ব্ব প্রবলপ্রতাপ ভূপতিগণ ষোড়শশতাব্দী পর্য্যন্ত বাস করিয়াছেন।

শেষের একটা প্রকাণ্ড দ্বার—নীলরঙের মিনার কাজে আচ্ছাদিত। এখনও মহারাজের সিপাহিরা এখানে পাহারা দেয়; এই দ্বার দিয়া একটা চূড়ার উপরিস্থ ময়দানে উপনীত হইলাম। এই ময়দানটি প্রায় দেড়মাইল দীর্ঘ; উহার সমস্তটাই দুর্গবপ্রে পরিবেষ্টিত। সমস্ত পশ্চিমভারতের মধ্যে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা দুষ্প্রবেশ্য স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। ঐতিহাসিক যুগ হইতে যোদ্ধ্ রাজামাত্রেই এই স্থানটিকে আকাঙ্ক্ষার সামগ্রী বলিয়া মনে করিয়া আসিয়াছেন—এই স্থানটি কত লোমহর্ষণ যুদ্ধবিগ্রহ দেখিয়াছে,—যাহার বর্ণনায় রাশিরাশি গ্রন্থ পূর্ণ হইতে পারে। এই উত্তুঙ্গ বিজনভূমি,—সৌধপ্রাসাদে, সমাধিমন্দিরে, দেবালয়ে, সকল সভ্যতান্তরের—সকল যুগের পুত্তলিকাসমূহে সমাচ্ছন্ন। য়ুরোপের এমন কোন স্থান নাই, যাহার সহিত ইহার তুলনা হইতে পারে; বিলুপ্ত পুরাতন বৈভবাদি

শোকোদ্দীপক 'জাদুঘর' ইহার মত আর নাই।

মিনার কাজকরা প্রথম প্রাসাদের সম্মুখে হাতী হাঁটু গাড়িয়া বসিল; আমরা নামিয়া প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। এই প্রাসাদটি ততটা ঘোরতর "সেকেলে"ধরণের নহে—এবং ততটা ভগ্নদশাপন্নও নহে।

ইহা হদ্দ পাঁচশত বৎসরের; কিন্তু ইহার বিরাট্ পত্তনভিত্তি সেই সব পালরাজাদের আমলের—যাঁহারা তৃতীয় শতাব্দী হইতে দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত গোয়ালিয়ারে রাজত্ব করিয়াছিলেন। বড়-বড় পাথরের মঞ্চের উপর কতকগুলা ঘোরদর্শন নীচু দালান সংস্থাপিত। ধ্বংসাবশেষের নিস্তব্ধতা, হঠাৎ অর্দ্ধচ্ছায়ান্ধকার এবং আমরা যে জলন্ত বহির্দ্দেশ হইতে আসিতেছি আমাদের নিকট হঠাৎ একটু শৈত্যের, আবির্ভাব হইল। আগেকার বিলাস-বৈভবের মধ্যে, এখন কেবল রাশিরাশি খোদাই-কাজ এবং দেয়ালে চমৎকার মিনার কাজ অবশিষ্ট রহিয়াছে; এই সমস্ত ডানা-ওয়ালা পশু, অদ্ভুত বিহঙ্গ, সবুজ-ও-নীল-পক্ষ-বিশিষ্ট ময়ূর প্রভৃতির প্রতিকৃতি। ময়ূরের পাখায় যেরূপ ছুরপনেয় উজ্জল বর্ণচ্ছটা দেখা যায়—সে বর্ণবিন্যাসের গুহ্যকলা এখন বিলুপ্ত হইয়াছে। দেয়ালের গাঁথুনির মধ্যে, ছোট-ছোট-ছিদ্র-করা একএকটা প্রস্তরফলক বসানো রহিয়াছে—বহির্জগতের দৃশ্য তাহার মধ্য হইতেই যাহা-কিছু দেখা যায়। এইরূপ গবাক্ষের নিকটে বসিয়াই তখনকার বন্দীকৃত সুন্দরীরা আপন-আপন কল্পনায় বিভোর হইত এবং রাজারা—আকাশের মেঘ, দূর দিগন্তদেশ, সৈন্যবাহিনী ও যুদ্ধাদি নিরীক্ষণ করিতেন।

"খদ্"প্রান্তবর্ত্তী প্রাসাদসমূহের সমস্ত মুখভাগ—যাহা উচ্চতায় প্রায় একশত ফিট্ ও দৈর্ঘ্যে প্রায় তিনশত ফিট্—সুরঙ্গগৃহের মত আষ্টে-পৃষ্ঠে বদ্ধ সমস্ত দালান, সমস্ত কক্ষ,—শুধু এই সকল সচ্ছিদ্র প্রস্তরফলকের মধ্য দিয়াই বায়ুগ্রহণ করে; কি পলায়ন, কি আত্মহত্যা, কি প্রেমের ব্যাপার,—কোন কারণেই এই সকল প্রস্তরফলক খুলিতে পারা যায় না। আমাদের কারাগারের লৌহ-গরাদে অপেক্ষাও ইহা দারুণ কঠোর। সানের নীচে সর্ব্বত্রই,—সুরঙ্গপথে নামিবার জন্য গুপ্তসোপান, সুরঙ্গ ও সুরঙ্গকারাগার। না জানি, কত গভীর পর্য্যন্ত পর্ব্বতগর্ভ কাটিয়া এই সকল অন্ধকূপ—এই সকল সুরঙ্গ প্রস্তুত হইয়াছিল।

এই প্রাসাদের পাশাপাশি আরও কতকগুলি প্রাসাদ সারিসারি চলিয়াছে; এগুলি পর-পর অধিকতর বর্ব্বর-ধরণের। উহার মধ্যে একটি পালরাজাদিগের আমলের—আরও বেশী গুরুভার প্রস্তরপিণ্ডে গঠিত। আর একটি জৈনদিগের আমলের;—বিশেষ কোন গঠন নাই বলিলেও হয়;—পর্ব্বত-গাত্রের সহিত যেন মিশিয়া গিয়াছে; গুপ্ত-ভাবে বন্দুক ছুঁড়িবার দুর্গরন্ধ্রের ন্যায়, ত্রিকোণাকৃতি শুধু কতকগুলা ছোট-ছোট গবাক্ষচ্ছিদ্র প্রাসাদগাত্রে পরিলক্ষিত হয়।

তা ছাড়া, এখানকার গড়বন্দী ময়দানটা বিভিন্ন-ধরণের দেবালয়ে সমাচ্ছন্ন; উহাদের এই বিচিত্রতার মধ্যে, হিন্দুধর্ম্মের সকল বিভাগেরই নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। এইখানে গর্ত্ত খুঁড়িয়া কতকগুলা চৌবাচ্ছা প্রস্তুত হইয়াছে; এই চৌবাচ্ছাগুলা এত বড়

যে, শত্রুকর্ত্তৃক দুর্গ অবরুদ্ধ হইলে, হাজার-হাজার লোককে অনেকদিন পর্য্যন্ত পানীয়জল জোগাইতে. পারা যায়। সমস্ত স্থানটাই দেবপ্রতিমায় ও সমাধিমন্দিরে আচ্ছন্ন।

একটা জৈনমন্দিরে গিয়া একটু দাঁড়াইলাম; পূর্ব্বে মোগলসৈন্য আসিয়া অত্রত্য প্রতিমাদিগকে বিকলাঙ্গ করে। আমাদের প্রাচীনকালের খৃষ্টধর্ম্মের কীর্ত্তিচিহ্নগুলার সহিত তুলনা করিবার জন্যই এইখানে একটু দাঁড়াইলাম।...আমাদের খুব সুন্দর গির্জ্জাগুলিও ছোট-ছোট অসমান প্রস্তরে গঠিত এবং আটা দিয়া জোড়া। কিন্তু এখানে, বড়-বড় পাষাণপিণ্ড—সব বাছা-বাছা ও সব সমান—এরূপভাবে পরস্পরের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট এবং ঘড়ির কলকব্জার মত এরূপ যথাযথস্থানে স্থাপিত যে, মনে হয় যেন এই প্রস্তরসমষ্টি একখণ্ড প্রস্তরের মত অনাদিকাল হইতে একইভাবে রহিয়াছে।...

এক্ষণে, আমার ভারতবাসী লোকদিগের সহিত আবার আমি সেই মন্থরগামী দোদুল্যমান হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিলাম; আবার হস্তিপার্শ্ববিলম্বিত ঘণ্টিকা হইতে মধুর নিক্বণ নিঃসৃত হইতে লাগিল; আবার সেইরূপ পর্ব্বতের অপর পার্শ্বের ঢালু দিয়া আমরা শান্তভাবে নামিতে লাগিলাম এবং ক্রমশ একটা লালপাথরের গুহার মধ্যে প্রবেশ করিলাম;—হঠাৎ আমাদের মাথার উপর একটা ছায়া আসিয়া পড়িল। কতকগুলা ঘোড়সোয়ার আমাদের সম্মুখ দিয়া যাইতেছিল; হাতী দেখিয়া তাহাদের ঘোড়া ভড়্কাইয়া লাফালাফি করিতে লাগিল; একটা উট হঠাৎ মাথা-ঝাঁকানি দেওয়ায় উটের সোয়ার উষ্ট্রপৃষ্ঠ হইতে ভূতলে পতিত হইল। এই হাতীর দেশে এমন কোন জীবজন্ত নাই যে, হাতীর পাশ দিয়া গেলে ভয় না পায়।

যে গুহাপথ দিয়া আমরা নামিতেছি, এই পথটি বড়-বড় প্রস্তরপ্রতিমায় সমাচ্ছন্ন *। এই গুহাটি তীর্থঙ্করদিগের প্রকাণ্ড প্রতিমাসমূহের নিবাসভূমি;—এই সমস্ত মূর্ত্তি পর্ব্বতগাত্র হইতে খুদিয়া বাহির করা হইয়াছে; কুলুঙ্গির মধ্যে, গুহার মধ্যে, কোন মূর্ত্তি উপবিষ্ট, কোনটি বা দণ্ডায়মান। বিশ-ফিট্ উচ্চ, সম্পূর্ণরূপে নগ্ন; সে নগ্নতায় কোন খুঁটিনাটিই বাদ যায় নাই—এমন কি, অশ্লীলতার মাত্রায় উপনীত হইয়াছে। উপত্যকার এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্য্যন্ত এই সকল মূর্ত্তি অধিষ্ঠিত;—আমরা তাহার মধ্য দিয়া চলিয়াছি।

ষোড়শ শতাব্দীতে, প্রতিমাধ্বংসী মোগলসৈন্য এই পথ দিয়া—এই সকল মূর্ত্তির মধ্য দিয়া যাত্রা করিবার সময়, কাহারও মস্তক, কাহারও পুরুষাঙ্গ, কাহারও হস্ত ভাঙিয়া ফেলে। এইরূপে সকল মূর্ত্তিগুলিই ছিন্নাঙ্গ হইয়া রহিয়াছে। †

ঐ অদূরে—যে তপ্তধূলার কুজ্ঝটিকায় সমস্ত দেশ আচ্ছন্ন—সেই কুজ্ঝটিকার মধ্য দিয়া আবার যেন এইরূপ কতকগুলি মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম।...অন্যান্য উপত্যকা—

* পরেশনাথ ও তীর্থঙ্কর আদিনাথের প্রতিমা সর্ব্বাপেক্ষা বড়; আদিনাথ জৈনধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। এই প্রতিমাগুলি ১৫ শতাব্দীর অধিক প্রাচীন নহে।

† ১৫২৭ খৃষ্টাব্দে মোগল্-বাদশা বাবর এইরূপ অঙ্গচ্ছেদ করিবার হুকুম জারি করেন।

অন্যান্য গণ্ডশৈল আমাদের নেত্রসমক্ষে ক্রমশ উদ্‌ঘাটিত হইল। সেখানেও এই সকল মূর্ত্তি সারিসারি চলিয়াছে, ইহাদের আর শেষ নাই। সমস্ত আকাশে যেন একপ্রকার ভস্মরাশি বিলম্বিত এবং সূর্য্যের জলন্ত কিরণ সর্ব্বত্রই দীপ্যমান। এই উত্তাপ ও মধুরনাদী ঘণ্টিকার প্রশান্ত নিক্কণ আমার নিদ্রাকর্ষণ করিতেছে; যতই আমরা নীচে নামিতেছি, ততই যেন সমস্তের উপর একটা আবরণ পড়িয়া যাইতেছে; এইরূপ আধ-ঘুমন্ত অবস্থায় আমরা ঢুলিতে-ঢুলিতে চলিয়াছি; এই বিরাট্‌ মূর্ত্তিগুলার রূপ একটু-একটু করিয়া অস্পষ্ট হইতে লাগিল;—ক্রমে মন হইতে একেবারেই তিরোহিত হইল।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সন্ন্যাস।

শুভলগ্ন যায় ব'য়ে বিলম্ব কিসের,
ওরে মূঢ় মন্দবুদ্ধি কিবা আছে তোর,
কায় লাগি আগুপিছু? কুলিশকঠোর,
কর চিত্ত, লহ দীক্ষা নবজীবনের।
হে স্বদেশ, গুরু মোর তাপস নির্ব্বাক্‌,
জ্বাল হোমবহ্নি তব বিরজার লাগি,
শিখাসূত্রোপাধি নাম ভস্ম হ'য়ে যাক্‌,
সর্ব্ববাধাবন্ধহীন নির্ম্মুক্ত বৈরাগী
কর মোরে। কেড়ে লহ মুখ হ'তে মম
প্রগল্‌ভ প্রলাপবাণী; অগ্নিমন্ত্র তব
নিত্য জপি' চিত্তমাঝে হে অন্তরতম,
সর্ব্বদ্বিধাশঙ্কাহীন মৃত্যুঞ্জয়ী হ'ব।
নিষ্কাম কল্যাণব্রতে দেহমনপ্রাণ
শ্রেষ্ঠ চরিতার্থতায় লভুক্‌ নির্ব্বাণ।

শ্রীঃ-

বঙ্কিমবাবু ও স্বদেশী ইতিহাস।

বাঙ্গলার ইতিহাস নাই,—ইতিহাস হইতে পারে না; বাঙালী চিরকাল ভীরু; ইহারা গৃহে তস্কর বা দস্যু প্রবেশ করিলে রমণীর অঞ্চলের ভিতর লুকাইতে চাহে, সাহস করিয়া লড়িতে পারে না; ইহারা এমন দুর্ব্বল, ভীরু ও কাপুরুষ যে, কখন যুদ্ধ করে নাই—এইরূপ একটা ধারণা কিছুকাল হইতে বাঙালীর মধ্যে, কি জানি কেমন করিয়া, স্থান পাইয়াছিল। নিন্দুক লর্ড মেকলে বাঙালী দুর্ব্বল, ভীরু, কাপুরুষ, প্রবঞ্চক ও মিথ্যাবাদী, এই মিথ্যাপবাদ তাহার চেকনাই ভাষায় প্রচার করিল। ইংরেজিশিক্ষার কল্যাণে শিক্ষিতবাঙালী সেই কুৎসাকলঙ্কিত পুস্তক আঁস্তাকুড়ে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল না, তাহা তুলিয়া-তুলিয়া পাঠ করিতে লাগিল, এবং যে স্থানটায় বাঙালীচরিত্রে কলঙ্কপুরীষ গাঢ়ভাবে প্রলেপিত হইয়াছে, সেই স্থানের উপমা-পরম্পরা এমন করিয়া আস্বাদন করিল যে, বলিতে ঘৃণা ও লজ্জা হয়, তাহা একেবারে মুখ-স্থ ও উদর-স্থ করিল, আর বলিল, "মেকলের 'ষ্টাইল্' কি সুন্দর!" জেম্‌স্ মিলের ইতিহাসে হিন্দুজাতির নিন্দা ও অগৌরব পাঠ করিয়া ইংরেজ সিভিলিয়ান্‌গণ, যাঁহাদিগের অন্নে আপনারা প্রতিপালিত হইবেন, তাঁহাদিগকে ঘৃণা করিতে শিখিয়া ভারতে পদার্পণ করেন, তাহা আশ্চর্য্য নহে। আশ্চর্য্য এই যে, বাঙালী মেকলেপ্রচারিত স্বজাতিকুৎসা উদরস্থ করিয়া আত্মমর্য্যাদা ও স্বজাতিসম্মানের মস্তক চর্ব্বিত করিলেন; মেকলে যাহা বলিয়াছেন, তাহা বিশ্বাস করিলেন; যাহা বিদেশী অত্যাচারের ফল, তাহাকে বাঙালীজাতিচরিত্রের মজ্জাগত দোষ মনে করিলেন। ইংরেজ বলিলেন—"বাঙালি! তোমরা বরাবর দুর্ব্বল, ভীরু ও কাপুরুষ।" অমনি ইংরেজের শিষ্যস্থানোপেত বাঙালী বলিলেন "আজ্ঞে, তাই।" ইংরেজ বলিলেন—"বাঙালি! তোমরা চিরকাল দুর্ব্বল ও কাপুরুষ, সুতরাং তোমাদিগের কস্মিন্‌কালে স্বাধীনতা ছিল না।" বাঙালী উত্তর করিলেন—"আজ্ঞে, তাই ত বোধ হইতেছে।"

ইংরেজ আরও বলিলেন—"বাঙালি! দুঃখিত হইও না, তোমার কোন দোষ নাই। দোষ তোমাদিগের দেশের,—বঙ্গদেশের, তাহার বাষ্পপূর্ণ বায়ুর এবং তাহার বারিসিক্ত ভূমির। এ স্থানে বীরপুরুষ জন্মান দূরে থাকুক, বীরজাতি এদেশে আসিয়া দীর্ঘকাল বাস করিলে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। আর, ভীরুতা দুর্ব্বলতার অনিবার্য্য ফল। সুতরাং তুমি যে দুর্ব্বল ও ভীরু ও কাপুরুষ, তাহাতে তোমার কোন দোষ নাই, তুমি অনুতাপ করিও না।"

বাঙালী বলিলেন—"প্রভু, এইবার মনটা একটু ঠাণ্ডা হইল। আপনার কৃপায় এখন সার কথা বুঝিলাম, আমাদিগের কোন দোষ

নাই, যত দোষ বঙ্গদেশের বায়ুর ও ভূমির—ও বিধাতার।

ইংরেজ বলিলেন—"বৎস, বুঝিবে না কেন? তুমি বুদ্ধিমান্, কঠিন কথাও সহজে বুঝিতে পার। এক্ষণে আর একটা কথা বুঝিয়া লও। যে ব্যক্তি প্রকৃতিগত্যা দুর্ব্বল, ভীরু ও কাপুরুষ, পরাধীনতা স্বীকার করিয়া শান্তভাবে তাহার জীবনধারণ করা উচিত; শাসনকর্ত্তারা কৃপাপরবশ হইয়া তাহাকে যেটুকু অনুগ্রহ করেন, তজ্জন্যই তাহার কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। শাসনকর্ত্তার কার্য্যে তাহার হৃদয়ে বিশেষ ব্যথা লাগিলেও তাহার আর্ত্তনাদ করা অসঙ্গত। কেন না, সহিষ্ণুতাই অধীন ব্যক্তির প্রধান বা একমাত্র ধর্ম্ম।"

বাঙালী বলিলেন, "প্রভো, নিশ্চয়ই—সকলই আপনার কৃপা। সাফ্ বুঝিতেছি, আমরা অতি অধম, অতি দুর্ব্বল, অতি কাপুরুষ—চিরকাল, চিরকাল। এক্ষণে আপনারা ভবসাগরে আমাদিগের তরণীর কর্ণধার। এখন আমাদের একমাত্র ভরসা ঐ গৌরাঙ্গের শ্রীচরণ।" এই বলিয়া বাঙালী নিজের নৌকার হাল ছাড়িয়া নিদ্রিত হইল। তরণী কোন্ দিকে বাইবে, কোন্ দিকে যাওয়া উচিত, তাহা লক্ষ্য করিল না।

এই নিদ্রা—মোহ, আত্মসম্মানবিসর্জ্জন, আত্মাবমাননা, নিশ্চেষ্টতা। নৌকায় দুই-একটা ধাক্কা লাগিল। বাঙালীর ঘুম ভাঙিল। বাঙালী দেখিল, নৌকা ক্রমেই অধঃপাতের দিকে যাইতেছে। নৌকাতে জল উঠিতেছে।

কেহ কেহ বলিলেন—"নিজের নৌকা একেবারে অন্যের হাতে সঁপিয়া-দিয়া নিজে ঘুমানো নির্ব্বোধের কাজ। ইংরেজমাঝির মতলব ভাল হইলেও এ মাঝি এ গাঙের পানি চেনে না, চড়া ও ঘূর্ণো জানে না; কি জানি, নৌকা যদি ডুবে যায়। বাঙালি, তুমি ইংরেজমাঝির পাশে বোস, তাকে মাঝে মাঝে সমঝাইয়া দাও। ইংরেজ তোমাকে যত অকর্ম্মণ্য, ভীরু, দুর্ব্বল ও কাপুরুষ ভেবেছেন, তুমি তত অকর্ম্মণ্য-অপদার্থ নহ। তোমাদের দেশে পূর্ব্বে বীরপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। দেশবিদেশে তাঁহাদের জয়পতাকা উড়িয়াছিল। এই দেশ, এই জলবায়ুতে, যখন তাঁহাদের বীরত্ব ফুটিয়াছিল, তোমাদিগের বীরত্ব ফুটিবে না কেন?"

বাঙালী বলিল—"বলেন কি? আমাদিগেরই পূর্ব্বপুরুষগণ এককালে প্রবলপরাক্রান্ত স্বাধীনজাতি ছিলেন?" উত্তর—"হাঁ, কেবল স্বাধীন নহেন; তাঁহাদিগের বিজয়-বাহিনী গিরিশৃঙ্গনিঃসৃতনদীবৎ দূরে, বহুদূরে ধাবমান হইয়া, নানা দেশ, নানা জনপদ বঙ্গীয় ভূপতির শাসনাধীন করিয়া, শত্রুদিগের দুর্গশিখরে, রাজপ্রাসাদশিরে বঙ্গীয়বিজয়-বৈজয়ন্তী স্থাপিত করিয়াছিল।"

মোহাভিভূত মুমূর্ষু বাঙালী এই সঞ্জীবনী বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া নবজীবন লাভ করিল। "স্থানীয়-জলবায়ু-জনিত অনিবার্য্য দুর্ব্বলতা-ভীরুতা"র একটা উপকথা যাহা ইংরেজমুখে শুনিয়া বিশ্বাস করিয়াছিল, এবং বিশ্বাস করিয়া হাত-পা ছাড়িয়া-দিয়া অসাড় হইয়া শুইয়া পড়িয়াছিল, এক্ষণে সেই উপকথা সে অবিশ্বাস করিল; ব্যাধিমুক্ত রোগীর ন্যায় কেবল উঠিয়া বসিল, তাহা নহে, উল্লাসে লাফাইয়া উঠিল; এবং অতীতকালের সুদূরবর্ত্তী দেশ হইতে আগত একটা তুমুল জয়জয়কারশব্দ শুনিতে পাইল।

এখন বলিতে পারেন, এই আশ্বাসবাণী বাঙালীকে কে শুনাইয়াছিল? বঙ্গ-ইতিহাস-বদনে বিদেশীগণ যে গাঢ় কালিমা লেপিয়াছিলেন, তাহা কোন্ বঙ্গসুত মুছিল? ৺ রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ৺ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং ৺ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—এই তিনজন বাঙালীর কলঙ্ক অপনয়ন করিয়াছিলেন।

বঙ্কিম কি বলিতেছেন, শুনুন—(গ্রঃ, ২য় খঃ, ৬৭৬) "যাহা ভারতের কলঙ্ক, বাঙ্গালারও সেই কলঙ্ক। এ কলঙ্ক আরও গাঢ়। এখানে আরও দুর্ভেদ্য অন্ধকার। কদাচিৎ অন্যান্য ভারতবাসীর বাহুবলের প্রশংসা শুনা যায়, কিন্তু বাঙ্গালীর বাহুবলের প্রশংসা কেহ কখন শুনে নাই। সকলেরই বিশ্বাস, বাঙ্গালী চিরকাল দুর্ব্বল, চিরকাল ভীরু, চিরকাল স্ত্রীস্বভাব, চিরকাল ঘুসি দেখিলেই পলাইয়া যায়। মেকলে বাঙ্গালীর চরিত্রসম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, এরূপ জাতীয়নিন্দা কখনও কোন লেখক কোন জাতিসম্বন্ধে কলমবন্দ করে নাই। ভিন্নদেশীয়মাত্রেরই বিশ্বাস যে, সে সকল কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। ভিন্নজাতীয়ের কথা দূরে থাকুক, অধিকাংশ বাঙ্গালীরও এইরূপ বিশ্বাস। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর চরিত্র সমালোচনা করিলে কথাটা কতকটা যদি সত্য বোধ হয়, তবে বলা যাইতে পারে, বাঙ্গালীর এক্ষণ এ দুর্দ্দশা হইবার অনেক কারণ আছে। মানুষকে মারিয়া ফেলিয়া তাহাকে মরা বলিলে মিথ্যাকথা বলা হয় না। কিন্তু যে বলে, বাঙ্গালীর চিরকাল এই চরিত্র, বাঙ্গালী চিরকাল দুর্ব্বল, চিরকাল ভীরু, স্ত্রীস্বভাব, তাহার মাথায় বজ্রাঘাত হউক, তাহার কথা মিথ্যা।"

বঙ্কিমচন্দ্রের কথা আবার শুনুন—

"যে বলে, বাঙ্গালী চিরকাল দুর্ব্বল, চিরকাল ভীরু, স্ত্রীস্বভাব, তাহার মাথায় বজ্রাঘাত হউক, তাহার কথা মিথ্যা।"

এই ভাষার ভিতরে কি দেখিতেছেন? "বন্দে মাতরম্"—সেই মধুমাখা স্বদেশীসঙ্গীত, যাহার মধুর স্বরতরঙ্গে অদ্য ভারত-আকাশ, ভারতপবন, ভারতহৃদয় মুহুর্মুহু বিধুনিত হইয়া পূত হইতেছে—সেই স্বদেশপ্রেমকুসুমাঞ্জলি, যাহা, ভক্তিগঙ্গোদকে বিধৌত হইয়া মাতৃচরণকমলে অদ্য নিবেদিত হইতেছে - "সেই মধুর 'মা-মা'-ধ্বনি যাহা কান পূরিয়া, প্রাণ ভরিয়া, বঙ্গসুত-বঙ্গসুতা আজি শুনিতেছে"—এই "বন্দে মাতরম্" সঙ্গীত উপরি-উক্ত কয়েকটি ছত্রের অন্তরালে রহিয়াছে। ঐ কয়েক ছত্রে, ঐ অতীতকালের চিন্তায়, ভবিষ্য আনন্দমঠের বীজ নিহিত।

বঙ্কিমবাবু যাহা বলিলেন, ইতিহাস হইতে তাহা তিনি প্রতিপন্ন করিতে চাহেন, স্বদেশকে ইতিহাসের বাণীদ্বারা উৎসাহিত করিতে তিনি উৎসুক। কেন না, তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, —"যে জাতির পূর্ব্বমাহাত্ম্যের ঐতিহাসিক স্মৃতি থাকে, তাহারা মাহাত্ম্যরক্ষার চেষ্টা পায়, হারাইলে পুনঃপ্রাপ্তির চেষ্টা করে। * * ইতালী অধঃপতিত হইয়াও পুনরুত্থিত হইয়াছে। * * বাঙ্গলার ইতিহাস চাই, নতুবা বাঙ্গালী কখন মানুষ হইবে না। যাহার মনে থাকে যে, এ বংশ হইতে কখন মানুষের কাজ হয় নাই, তাহা হইতে কখন মানুষের কাজ হয় না। তাহার মনে হয়, বংশে রক্তের দোষ আছে।" (৬৭৯।২খ)

বাঙালী যে চিরকাল দুর্ব্বল, ভীরু ও

পরাধীন ছিল না, তাহা দেখাইবার জন্য বঙ্কিমবাবু প্রতাপশালী বাঙালী রাজার বৃত্তান্ত আপনাদিগকে বলিতেছেন। আধুনিক সময়, সীতারামের একটি ক্ষুদ্র কাহিনী পাইয়াছিলেন, তাহা উপন্যাসে নিক্ষিপ্ত করিয়া স্বজাতিকে উদ্বোধিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রী সীতারামকে ত্যাগ করিয়াছিল; ইহাতে রাজশ্রী বঙ্গদেশকে ত্যাগ করিয়াছে; সেই রাজশ্রী গীতাপ্রচারিত কর্ম্মযোগে, জ্ঞানযোগে, ভক্তিযোগে কিরূপে আবার বঙ্গদেশে ফিরিবে, বঙ্কিমবাবুর সীতারাম তাহারই আভাস। বঙ্কিমবাবুর আনন্দমঠ, সীতারাম প্রভৃতি কতকগুলি পুস্তকের দুইটি অঙ্গ আছে —অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ। বালক ও অর্দ্ধশিক্ষিতা মহিলা বহিরঙ্গ পাঠ করিয়া আনন্দলাভ করে। চিন্তাশীল ব্যক্তি, স্বদেশপ্রেমিক, ভাবুক, কর্ম্মী অন্তরঙ্গ পাঠ করেন। এই অন্তরঙ্গে দেখিতে পাইবেন, বঙ্কিমের হৃদয়ের মহতী আকাঙ্ক্ষা, চাকরত্বের আচ্ছাদনের মধ্যে অগ্নিশিখাবৎ জ্বলিতেছে। বঙ্কিমবাবুর মানসগর্ভে এমন ভ্রূণ আছে, যাহা হইতে মুশা বা ম্যাট্‌সিনি, ক্রম্‌ওয়েল্ বা কস্‌ফিয়স্কো, প্রিন্স অব্ ওরেঞ্জ বা ওয়াশিংটন্ কালে জন্মিতে পারে। আপনারা মনে করিবেন, হয় ত আমি অত্যুক্তি করিলাম। অত্যুক্তি কি না; সময়ে তাহার পরীক্ষা হইবে। চিন্তাশীল পাঠক বঙ্কিমের উদ্দেশ্যযুক্ত উপন্যাসের অন্তরঙ্গ আলোচনা করিয়া দেখুন।

উপন্যাসে,—সীতারামে' যাহা বঙ্কিম দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, যে স্বদেশগৌরবাকাঙ্ক্ষা উদ্বোধিত করিবার আয়াস পাইয়াছেন, ইতিহাসে সেই স্বদেশগৌরবলালসা উত্তেজিত করিবার জন্য তিনি আমাদিগকে, বঙ্গদেশে যখন পালবংশীয় ও সেনবংশীয় রাজারা বঙ্গমহিমা বিস্তার করিয়াছিলেন, সেই অতীত সময়ের রম্যপ্রদেশে তাঁহার সমভিব্যাহারে বিচরণ করিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন;—

"সেনবংশীয়েরা পূর্ব্ববাঙ্গালায় রাজা ছিলেন। আর পালবংশীয়েরা মুদ্গগিরিতে অর্থাৎ আধুনিক মুঙ্গেরে রাজা ছিলেন। এখনকার বাঙ্গালীরা গবর্ণমেণ্টের সিপাহীপল্টনে প্রবেশ করিতে পায় না, কিন্তু বেহারীদিগের পক্ষে অবারিত দ্বার, এবং বেহারীরা এখনকার উৎকৃষ্টসিপাহীমধ্যে গণ্য। অথচ আমরা রাজেন্দ্রবাবুর আবিষ্কৃত ঐতিহাসিকতত্ত্বে দেখিতে পাইতেছি,—পূর্ব্বাঞ্চলবাসী বাঙ্গালীরা বেহারজয় করিয়াছিল। সেনবংশীয়েরা 'বাঙ্গালী রাজা হইয়াও বেহারের অধিকাংশের রাজা ছিলেন, ইহা ঐতিহাসিক কথা। সেনগণের অধিকার যে বারাণসী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল, ইহারও ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।"

* * * * *

"মেগাস্থিনিস্ বলেন যে, এই রাজ্য (গাঙ্গারিডি Gangaridæ অর্থাৎ বাঙ্গালার রাঢ়দেশ) এরূপ প্রতাপান্বিত ছিল যে, ইহা কখন কোন শত্রুপরাজিত হয় নাই এবং অন্যান্য রাজগণ গঙ্গারাঢ়ীদিগের হস্তিসৈন্যভয়ে তাহাদিগকে আক্রমণ করিতেন না। তিনি ইহাও লিখিয়াছেন যে, স্বয়ং সর্ব্বজয়ী আলেক্‌জাণ্ডার গঙ্গাতীরে উপনীত হইয়া গঙ্গারাঢ়ীদিগের প্রতাপ শুনিয়া, সেইখান হইতে প্রস্থান করিলেন। বাঙ্গালীর বল-

বীর্য্যের ভয়ে আলেক্‌জাণ্ডার যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়াছিলেন, এ কথা কেহ বিশ্বাস করুন আর না করুন, ইহার সাক্ষী স্বয়ং মেগাস্থিনিস্। আমরা নূতন সাক্ষী শিখাইয়া আনিতেছি না।"

কিন্তু বাঙ্‌লা-ইতিহাসের কথা উঠিলেই মনে হয় যে, বাঙ্‌লার ইতিহাস নাই; কেবল বাঙলার ইতিহাস নাই, তাহা নহে, ভারতবর্ষের ইতিহাস নাই। যদি কেবল বঙ্গদেশের কথা হইত,তাহা হইলে মেকলের ন্যায় বাঙালীর কোন নিন্দুক চট্ করিয়া বলিতেন যে, বাঙ্‌লাদেশের এমন কোন ঘটনা নাই,যাহা ইতিহাসে লিখিবার যোগ্য, সেইজন্য বঙ্গের ইতিহাস নাই। কিন্তু প্রাচীনভারতসম্বন্ধে ত সে কথা খাটে না। তাহার ধর্ম্ম, দর্শন, সাহিত্যাদি জগতে অতুলনীয়, আজিও তাহা মানবজাতির সভ্যতামুকুটে হীরকের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে,—আজিও যে সভ্যতাভিমানী ইউরোপ তাহা আলোচনা করিয়া পুলক-বিস্ময়ে মগ্ন হইতেছেন!

ভারতের অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্টজাতির ইতিহাস আছে; অথচ সভ্যতার শীর্ষস্থানীয় প্রাচীন ভারতের ইতিহাস নাই—ইহা বড়ই আশ্চর্য্য বোধ হয়। ইহার নানা কারণ অনুমিত হইতে পারে।

কেহ বলেন, যে-দেশে রাজার ক্ষমতা অব্যাহত, প্রজাগণের স্বাধীনতাস্ফূর্ত্তি নাই, সে দেশে ইতিহাস জন্মায় না। এ কথা সত্য বোধ হয় না। কারণ, তাহা যদি হইত, মুসলমানদিগের মধ্যে ইতিহাস থাকিত না। বাঙ্‌লাদেশে যখন নবাবের শাসন অতিশয় উচ্ছৃঙ্খল এবং প্রজাদিগের স্বাধীনতা নিতান্ত সঙ্কুচিত, তখনও তাহাদিগের মুতাক্ষরীণ প্রভৃতি ইতিহাস দেখিতে পাওয়া যায়।

কেহ কেহ বলেন, যে-জাতি অন্য দেশ জয় করে, তাহারা নিজের বিজয়কাহিনী আবৃত্তি করিতে ভালবাসে এবং আত্মশ্লাঘাপরবশ হইয়া তাহা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখে এবং তাহাতেই ইতিহাসের প্রথমসৃষ্টি হয়। এ কথা যদি সত্য হইত, তাহা হইলে ভারতবাসী আর্য্যদিগের ইতিহাস অবশ্য থাকিত। কারণ আধুনিক পণ্ডিতগণ সকলেই স্বীকার করেন যে, আর্য্যগণ ভারতে বিজয়ডঙ্কা বাজাইয়া প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং পুনঃপুন অনার্য্যজাতিকে পরাজিত করিয়া আর্য্যাবর্ত্ত অধিকার করেন।

কখন-কখন ইতিহাস না থাকার আর একটা কারণ লক্ষিত হয়। যখন দীর্ঘকাল উন্নতি বা অবনতি অতি ধীরে ধীরে হইতে থাকে, অথবা সমাজ একই অবস্থায় থাকে, তখন দেশের ইতিহাস লিখিত হয় না। এমন কি, সমাজ যদি নিরুপদ্রবে শান্তিসহ দীর্ঘকাল সৌভাগ্যশালীও থাকে, তাহার ইতিহাস লিখিত হয় না। ভারতসম্বন্ধে এ কথা স্বীকার করা যায় না। এত দীর্ঘকালের মধ্যে ভারতে কোন বিপ্লব হয় নাই, সহসা কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই, সমাজ অতি মন্দবেগে অলক্ষিতভাবে উন্নতিলাভ করিয়াছিল, আবার অতি মন্দবেগে তেমনি অলক্ষিতভাবে উন্নতিশিখর হইতে অবরোহণ করিয়াছিল, এই সময়ে কোন সামাজিক বাত্যাঝঞ্ঝাবাত ঘটে নাই, সমাজ কখন কোন চিন্তা-ভাব-কার্য্য-উচ্ছ্বাসে আলোড়িত হয় নাই, ইহা বিশ্বাস করা যায় না।

এমন কথা কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, মুসলমানেরা, যেমন আলেক্জাণ্ড্রিয়ার বৃহৎ পুস্তকালয় পোড়াইয়া দিয়াছিল, তেম্নি ভারতের ইতিহাসগুলি পোড়াইয়া বা অন্য কোনরূপে নষ্ট করিয়াছে। যেমন ভারতবর্ষের অনেক স্থানে মন্দির ভাঙিয়া মস্জিদ্ নির্ম্মাণ করিয়াছে, তেম্নি ভারত-ইতিহাসের বস্তুসকল লইয়া, তাহা হইতে ইচ্ছামত উপকরণ নির্ব্বাচন করিয়া হিন্দুদিগের ইতিহাস নষ্ট করিয়াছে। ইহাও বিশ্বাস করা কঠিন। কারণ, মুসলমানগণ যদি হিন্দুদিগের মহিমা লোপ করিবার জন্য ইচ্ছুক হইত, তাহা হইলে হিন্দুশাস্ত্রসম্বন্ধীয় গ্রন্থ ও দর্শন-সাহিত্য জ্যোতিষ-আয়ুর্ব্বেদ, এগুলিও নষ্ট করিত। হিন্দুদিগের অন্য সমুদয় বিষয়েই, অল্পই হউক অধিকই হউক, গ্রন্থ পাওয়া যায়, কেবল কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। ইহাতে "গোহত্যাকারী ক্ষৌরিতচিকুর মুসলমানদিগের" স্কন্ধে দোষ চাপাইলে অন্যায় হয়।

ইতিহাসে যাহাদিগের বিপুল গৌরব-কাহিনী লিখিবার ছিল, যাহাদিগের পুরাকালের জাতীয়জীবনগগন শুভ্র তারকাস্তবকপুঞ্জে পরিব্যাপ্ত ও পরিদীপিত হইয়াছিল, যাহাদিগের চিন্তা ও সাহিত্য দেবতাগণের জ্যোতির্ম্ময় নেত্রের ন্যায় আমাদিগকে অদ্যাপি নিরীক্ষণ করিতেছে, শান্ত সদয়-উদার-ভাবে উৎসাহিত করিতেছে, হায়! সেই জাতি তাহার ইতিহাস জগতের জন্য, হতভাগ্য আমাদিগের জন্য কেন লিখিল না? যাহার এত বলিবার কথা ছিল, সে নীরব থাকিল কেন?

আমরা নিজের কথা বলি না। জগতে কাজ করিতে আসিয়াছিলাম, কাজ করিয়াছি। জগৎকে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম শিখাইতে আসিয়াছিলাম, শিখাইয়া চলিয়া গিয়াছি। আমরা আর্য্য, আমরা নিজের গৌরব নিজে বর্ণনা করি না। এই কি ইতিহাস না থাকার কারণ?

এসম্বন্ধে বঙ্কিমবাবু বলেন—

"কতকটা ভারতবর্ষীয় জড়প্রকৃতির বলে প্রপীড়িত, কতকটা আদৌ দস্যুজাতীয়দিগের ভয়ে ভীত হইয়া ভারতবর্ষীয়েরা ঘোরতর দেবভক্ত। * * দেবতাই সর্ব্বত্র সাক্ষাৎ কর্ত্তা। * মনুষ্য কেহ নহে, মনুষ্য কোন কার্য্যের কর্ত্তা নহে, অতএব মনুষ্যের প্রকৃতকীর্ত্তি-বর্ণনে প্রয়োজন নাই। এ বিনীত মানসিক ভাব ও দেবভক্তি অস্মজ্জাতির ইতিহাস না থাকার কারণ।"

বঙ্কিমবাবুর এই মত আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

যে জাতির হৃদয় হইতে 'সোঽহং'ধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল, সে জাতি "জড়প্রকৃতির বলে প্রপীড়িত" হইয়া অথবা "দস্যুজাতীয়দিগের ভয়ে ভীত হইয়া" দেবভক্ত হইয়াছিল, আর দেবভক্তির জন্য তাহাদিগের আত্মভক্তি কমিয়া গিয়াছিল, তাহা কিরূপে বিশ্বাস করি? ভারতবাসীদিগের দেবভক্তিতে আত্মগৌরবের হ্রাস হয় নাই, তাহার বৃদ্ধি হইয়াছিল; এত বৃদ্ধি হইয়াছিল যে, জগতে কুত্রাপি তেমন হয় নাই। ভারতবাসী আত্মমহিমায় এত মহিমান্বিত হইয়াছিলেন যে, তিনি আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া অনুভব করিয়াছিলেন; প্রকৃতির মহিমময় দৃশ্যে তিনি অভিভূত না হইয়া মানবজীবনকে অধিকতর মহিমময় বলিয়া

হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন; ঐ যে অভ্রভেদী হিমালয়ের তুঙ্গশৃঙ্গ, এই বিশাল ভাগীরথী, ব্রহ্মপুত্র, সিন্ধু প্রভৃতি মহানদনদীর তরঙ্গ-ভঙ্গ, আর ঐ দিগ্‌দিগন্তপ্রসারী অরণ্যানীর ভয়াল মূর্ত্তি—কিছুতেই যোগপরায়ণ ভারত-বাসীর হৃদয় দমিতে পারে নাই। তিনি প্রকৃতির শক্তিপুঞ্জের মধ্যে কখন কবি হইয়া তাহার মহীয়ান্ ভাব সুখে সম্ভোগ করিতেছেন, কখন বৈদান্তিক হইয়া তাহাকে স্বপ্নবৎ অলীক বলিয়া উপেক্ষা করিতেছেন।

আর ভারতবাসী, যোগবলে অতীতকাল জানা যায়, এই বিশ্বাস করিতেন; অর্থাৎ অতীতকালের যেটুকু তাঁহার জানা আবশ্যক, তাহা যোগবলে জানা যায়, তাঁহার বিশ্বাস ছিল। তাই ইতিহাসরূপ কথাবিশেষ একটা জ্ঞাতব্যজিনিষ তাঁহার বোধ হয় নাই।

আর একটা বিশেষকারণ অনুভূত হয়। ভারতবাসী ধর্ম্মপরায়ণ, দয়ালু, কোমলহৃদয়। ইতিহাসের প্রধান প্রধান ঘটনা, যাহা পাঠ-কের হৃদয়ে প্রথমেই আঘাত করে, তাহা ধর্ম্মের কাহিনী নহে, তাহা পররাজ্যহরণ, অতি বৃহদায়তনে পরস্বলুণ্ঠন, নরহত্যা, নারীনিগ্রহ, গৃহদাহ ইত্যাদি নানাবিধ ভীষণ অত্যাচারের উৎকট পাপকাহিনী। এই পাপকাহিনীকে লিপিবদ্ধ করিলে, তাহা পাঠ করিয়া উপকারের অপেক্ষা হয় ত অপকার অধিক হইতে পারে। কেন না, যদিও ভগবানের জগতে পাপের দণ্ড অনিবার্য্য ও নিশ্চিত, তথাপি ইতিহাসে পাপের দণ্ড ও পুণ্যের পুরস্কার অনুসন্ধান করিয়া বাহির করা বড়ই দুঃসাধ্য। অতীতকালের এই পাপকাহিনীগুলি বাদ দিলে যাহা থাকে, তাহা ইতিহাস না লিখিলেও পাওয়া যায়।

সুতরাং যাহাকে লোকে ইতিহাস বলিয়া জানে, তাহা না লেখা হইলে জগতের যে একটা মস্ত ক্ষতি হয়, ইহা সাহস করিয়া বলা কঠিন।

দেখুন, ইউরোপে এতদিন ইতিহাস লিখিত হইল, তথাপি ইতিহাসদ্বারা কি নূতন তত্ত্ব উদ্ভাবিত হইয়াছে। নূতন তত্ত্বের কথা দূরে থাকুক, প্রকৃত ঘটনা যে কি হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে মতৈক্য দেখা যায় না। মনে করুন, সেদিন একটা দাঙ্গা হইয়া গেল, আদালতে মোকদ্দমা হইল, কত সাক্ষীর জবানবন্দী হইল, দুই পক্ষে অতি তীক্ষ্ণদর্শী উকিল বা ব্যারিষ্টার, তাহার উপর সুধীর বিচক্ষণ বিচারক, তথাপি প্রকৃত ঘটনা কি হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে প্রথম-আদালতে যাহা নিষ্পত্তি করিলেন, আপীল্-আদালতে তাহা ভ্রান্ত বলিয়া স্থির হইল। যখন কল্যকার প্রকৃত ঘটনা স্থির করা এত কঠিন, তখন যাহা অতি প্রাচীন দূরবর্ত্তী কালের কথা, যাহার প্রমাণ অতি হ্রস্ব, অতি সংশয়যুক্ত, নানা অভিপ্রায়ে নানা ব্যক্তি ভিন্নভিন্নরকম লিখিয়া যাইতে পারেন, তাহার প্রকৃত তথ্য নিরূপণ করা কত কঠিন! এই কারণে নেপোলিয়ন্ বলিয়াছিলেন যে; "যে রূপকথা লোকে মানিয়া লয়, তাহাকে ইতিহাস বলে।"

আবার এদিকে দেখুন, হিন্দু যুগযুগান্তরে বিশ্বাস করেন। পরব্রহ্ম সৃষ্টি করিতেছেন, আবার প্রলয় করিতেছেন। যুগ, যুগান্তর, কল্প, প্রলয়, মহাপ্রলয়াদি ধরিলে বর্ত্তমান মনুষ্যের

ইতিহাস কতটুকু। হিন্দুশাস্ত্র বিশ্বাস করিতে না চাহেন, ইউরোপীয় বিজ্ঞানের কথা ধরুন। ভূবিদ্যা আলোচনা করিলে, পৃথিবীর বয়স কত হয়। সে যে গণনা করিয়া উঠা যায় না। কত জীব সৃষ্ট হইয়া লোপ পাইল, তাহার জীবন্ত নমুনা এখন পাওয়া যায় না, কঙ্কাল-অস্থি পৃথিবীতে প্রোথিত দেখা যায়। আবার এট্‌ল্যাণ্টিস্ প্রভৃতি কত বৃহৎ ভূখণ্ড সমানব জলধিতলে নিমগ্ন হইয়াছে; কে বলিবে? সেদিন জুয়ান্ ফার্নাণ্ডেজ দ্বীপ, যাহা রবিন্সন্ ক্রুসোর আদর্শ সেল্‌কার্কের বিচরণভূমি, ভূকম্পতাড়নে নরনারীসমেত সাগরতলে কোথায় তলাইয়া গেল, কে বলিবে। এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডে কত গ্রহ, ধূমকেতু, নক্ষত্র অহরহ ফুটিতেছে, ছুটিতেছে, টুটিতেছে, চূর্ণ হইতেছে—এই অসীম ব্রহ্মাণ্ডের অবিরাম সৃষ্টিলয়লীলানৃত্যের মধ্যে কোথায় ক্ষুদ্র পৃথিবীর ক্ষুদ্র নরনারীর ইতিহাস! যোগী ব্রহ্মাণ্ড ও ব্রহ্মকে ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার অনন্তত্বে মগ্ন হইয়া, পৃথিবীর ইতিহাস, জীবজন্তুর ইতিবৃত্ত, মনুষ্যের ইতিহাস ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অনুল্লেখযোগ্য ব্যাপার বিবেচনা করেন। অথচ তিনি আপনাকে ব্রহ্মের অংশ অনুভব করিয়া 'সোঽহং'ধ্বনিতে ব্রহ্মাণ্ডকে পূরিত করেন; এবং "ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব কেবলম্" অন্তরের অন্তরে বুঝিয়া কবে, কবে তিনি ভারতে আসিয়াছেন, কবে ম্লেচ্ছজাতি ভারতজয় করিল, তাহা লিপিবদ্ধ করিবার কোন প্রয়োজন দেখেন নাই। যে জগৎ মিথ্যা, তাহার ইতিহাসও মিথ্যা। মিথ্যা-ব্যাপারের বৃত্তান্ত বিবৃত করা অপেক্ষা নির্জ্জনে জীব ও ব্রহ্মের একত্ব যাহাতে জীবনে দেখিতে পান, তাহার চেষ্টা করা ভাল বিবেচনা করিয়াছিলেন। হিন্দুজাতির ইতিহাস না থাকার কারণ কি এই? জানি না।

কিন্তু আমরা এক্ষণে যোগপরায়ণ নহি। আমাদিগের জন্য ইতিহাস আবশ্যক, আমাদিগের এই ঘোর নৈরাশ্য-অন্ধকারে আলোক আনয়ন করিবার জন্য বঙ্গের ইতিহাস আবশ্যক। কেন না, আমাদিগের এই পতিত অবস্থায়, অতীতকালের ইতিহাসে যে মহৎ বীজ আছে, তাহা বর্ত্তমানকালে বপন করিতে পারিলে ভবিষ্যতে এক মহাবৃক্ষ জন্মিয়া আমাদিগকে আশ্রয় দিবে।

তাই বঙ্কিমবাবু বঙ্গদেশের ইতিহাসের কথা, বাঙালীর মিথ্যা-কলঙ্কের কথা আলোচনা করিয়া আমাদিগকে আশ্বাসিত করিয়া গিয়াছিলেন। বঙ্কিমবাবু তাঁহার বঙ্গ-ইতিহাস-চর্চ্চায় প্রকারান্তরে বলিতেছেন, "হে ভাই, বড় ছিলে, এখন ছোট হইয়াছ, আবার বড় হইবে। বীর ছিলে, চেষ্টা করিলে আবার বীর হইতে পার। বিজয়ী ছিলে, আবার কেন বিজয়ী হইবে না? তুমি জলবায়ুদ্বারা পরাভূত ছিলে না,—তুমি জলবায়ুকে পরাজয় করিয়াছিলে, আবার পরাজয় করিবে। অজ্ঞতা বা বিদ্বেষ জাত কুৎসার টিট্‌কারিতে দমিও না। অতীতের ইতিহাস স্মরণ করিয়া, ভবিষ্যতের গৌরবময় ইতিহাস অদ্য হইতে কার্য্যে রচনা করিতে, অন্তত তাহার উপক্রমণিকা রচনা করিতে আরম্ভ কর।"

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায়।

বঙ্গদর্শন।

কংগ্রেসী কথা।

সুশাসন না স্বায়ত্তশাসন?

কংগ্রেসের আদর্শ ও কার্য্যপ্রণালীর পরিবর্ত্তন আবশ্যক কি না? প্রশ্নটা পুরাতন। কিছুদিন হইতেই নানাভাবে ইহার আলোচনা চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু এখনো বিষয়টা ঠিক পরিষ্কার হইয়াছে, এমন বলা যায় না। প্রথমে আদর্শের কথা। কংগ্রেসের বর্ত্তমান আদর্শের পরিবর্ত্তন আবশ্যক কি না; এ বিচারে প্রবৃত্ত হইবার পথেই এই বর্ত্তমান আদর্শটা কি, ইহা ভাল করিয়া বোঝা আবশ্যক। কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের সকলের মনে যে কোনো-একটা সত্য ও স্থির ধারণা আছে, এমন বোধ হয় না।

মোটামুটি বলিতে গেলে, দেশের বর্ত্তমান শাসনপ্রণালীর যথোপযুক্ত সংস্কারসাধনই কংগ্রেসের লক্ষ্য। এই শাসনযন্ত্রের পুনর্গঠন এই লক্ষ্যের বহির্ভূত। ভারতে ইংরেজের সার্ব্বভৌম প্রভুশক্তির উপরে কংগ্রেসের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত। এই প্রভুশক্তির রক্ষণাবেক্ষণাধীনে সুখ-স্বাস্থ্য-সম্পদ্ বৃদ্ধি করাই এতকাল ধরিয়া কংগ্রেসের লক্ষ্য হইয়া আছে।

জন্মাবধিই কংগ্রেসের সকল চেষ্টা এই লক্ষ্যাভিমুখ হইয়া চলিয়াছে। প্রথম পাঁচবৎসরকাল কংগ্রেসী আন্দোলনের মুখ্য বিষয় ছিল—দুটি। এক, ব্যবস্থাপকসভার সম্প্রসারণ ও সংস্কার; দ্বিতীয়, রাজকার্য্যে দেশীয়লোকের প্রতিষ্ঠা। জনসাধারণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণ ইংরেজরাজকর্ম্মচারিগণের সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া দেশের আইনকানুন রচনা করিবেন,—কংগ্রেসের প্রথম প্রার্থনা ছিল এই। আর দেশের মধ্যে যাঁহারা যোগ্য ব্যক্তি, তাঁহারা বহুলপরিমাণে সর্ব্ববিধ রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইবেন,—ইহাই ছিল কংগ্রেসের দ্বিতীয় প্রার্থনা। এই দুটিই মুখ্য প্রার্থনা ছিল। অবান্তর প্রার্থনা আরো কতকগুলি ছিল, কিন্তু কংগ্রেসের নেতৃবর্গও তৎপ্রতি প্রথমাবধিই তেমন মনোনিবেশ করেন নাই, আর আজ পর্য্যন্ত গবর্মেণ্টও তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশন, ১৮৮৭ সালে, মান্দ্রাজে হয়। সে অধিবেশনের দুটি প্রস্তাব বিশেষ উল্লেখযোগ্য,—একটি অস্ত্র-আইন রদ্ করিবার জন্য; আর একটি দেশের লোককে সখের সেনাদলে ভুক্ত করিবার জন্য। কংগ্রেসের জন্মদাতা মহামতি হিউম্ প্রথমাবধিই অস্ত্র-আইন-বিষয়ক প্রস্তাবের বিরোধী ছিলেন;

সখের সেনাসম্বন্ধীয় প্রস্তাবেও যে তাঁর খুব আগ্রহ ছিল, এমন বোধ হয় নাই। তিনি প্রকাশ্যভাবে অস্ত্র-আইন-বিষয়ক প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। একবার নয়, দুবার: —প্রথম মান্দ্রাজের অধিবেশনে, পরে প্রয়াগের অধিবেশনে, তিনি এই প্রস্তাবের গুরুতর প্রতিবাদ করেন। প্রয়াগের অধিবেশন শেষ হইলে হিউম্ যখন কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন, তখন এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আমার অনেক কথাবার্ত্তা হয়; এবং সে সময়ে প্রসঙ্গক্রমে তাঁর আপত্তির কারণ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া তিনি আমাকে স্পষ্টভাবে এ কথা বলেন যে,—

> যাঁরা সিপাহিবিদ্রোহের সময়, ১৮৫৭-৫৮ খৃষ্টাব্দে, ভারতবর্ষের রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে কেহই ধর্ম্মত 'অস্ত্র-আইন রদ্ হউক' এই প্রস্তাব অনুমোদন করিতে পারেন না।

হিউমের এই কথাতেই কংগ্রেসের মূল আদর্শ কি ছিল, ইহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যায়।

কংগ্রেসের জন্মবিবরণীও এই আদর্শের প্রতিই নির্দ্দেশ করে।

কংগ্রেসের উদ্ভাবয়িতা হিউম্, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু সে সময়ে আর একটা মহত্তর ও উন্নততর আদর্শ বাংলাদেশে অল্পে অল্পে ফুটিয়া উঠিতেছিল। সুরেন্দ্রনাথপ্রমুখ নেতৃবর্গ তখন এক উন্মাদিনী, অমৃতময়ী কল্পনার সৃষ্টি করিয়া বাংলার শিক্ষিত ও শিক্ষার্থী যুবকমণ্ডলীর চিত্তে এক নূতন আদর্শ ও আশার উন্মেষ করিতেছিলেন। ম্যাট্‌সিনী ও নব্য ইতালি, ডেভিস্ ও যুন-আয়র্লণ্ড, গুরুগোবিন্দ ও শিখ-খাল্‌সা;—এ সকলই আমাদের তখনকার রাজনৈতিক শিক্ষার প্রধান বিষয় ছিল। বঙ্গে এই সকল আলোচনা হইতে এক অভিনব রাজনৈতিক স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিতেছিল। এই আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে লইয়া, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইসহরে যখন কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয়, সে সময়ে—কলিকাতায় আলবার্টহলে ন্যাশন্যাল্ কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন হইয়াছিল। তখনো আমরা কংগ্রেসের কথা অনেকেই শুনি নাই। যাঁহারা কলিকাতার কন্‌ফারেন্সে যোগদান করেন, তাঁহাদের অনেকেরই আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, ক্রমে ঐ কন্‌ফারেন্সই ভারতে প্রজাপ্রতিনিধিসভার সূত্রপাত করিবে। তাঁহাদের অনেকেরই লক্ষ্য ছিল—রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসন। ভারতের ভবিষ্য রাজনীতিতে ইংরেজের স্থান কোথায়, ও ভারতের রাষ্ট্রযন্ত্রে ব্রিটিশরাজশক্তির অধিকার কতটুকু থাকিবে, তখনো এ প্রশ্ন উত্থাপিত হয় নাই। তবে স্বাধীন ও আত্মশাসিত ভারতের সঙ্গে যে ব্রিটিশরাজের কোনোপ্রকারের সম্বন্ধ থাকিবে না বা থাকিতে পারে না,—এমন ভাবটাও জাগ্রত হয় নাই। যেন-তেন-প্রকারেণ ব্রিটিশপ্রভুশক্তির সঙ্গে ভারতের স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসনের একটা যথাযোগ্য সঙ্গতি সাধিত হইয়া যাইবে, আমরা সকলেই মনে মনে স্বল্পবিস্তর এই বিশ্বাস পোষণ করিতাম। কিন্তু ইহাতে আমাদের মূল আদর্শ কিছুতেই সঙ্কুচিত হয় নাই। প্রত্যুত আমরা অনেকেই সেকালে মনে করিতাম যে, স্বায়ত্তশাসনই মানবসমাজে একমাত্র বিধিনির্দ্দিষ্ট শাসনপ্রণালী; অন্য কোনোপ্রকারের শাসন-

প্রণালী, যাহাতে বহুলোককে সর্ব্ববিষয়ে একের বা অল্পলোকের বশ্যতা স্বীকার করিয়া চলিতে হয়, যাহাতে পশুবল মানুষী শক্তি-স্বাধীনতার উপরে অযথা-আধিপত্য ভোগ করে বা যাহাতে দশের ভাবনা একজন বা দুজনে ভাবে, দশের বোঝা একজন বা দুজনে বহন করে; এবং দুচারজন এরূপে রাজ্যের সকল ভাবনা ভাবে ও সকল বোঝা বহন করে বলিয়া দশের শক্তিসামর্থ্য-বিকাশের যাহাতে উপযুক্ত ও যথাযথ ক্ষেত্র ও অবসর থাকে না,—সে শাসন যতই সুখকর হউক না কেন, কদাপি কল্যাণকর হইতে পারে না; তাহাতে যে মনুষ্যজীবনের সম্যক্ সফলতালাভ একেবারে অসম্ভব ও অসাধ্য,—তাহা যে ফলত শাসননামেরই অনুপযুক্ত এবং তৎপ্রতি ধর্ম্মত শাসিতের যে কোনোপ্রকারের বাধ্যবাধকতা নাই;—এ কথা, সকলে না হউক, অনেকেই মুখ ফুটিয়া বলিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। তবে ধর্ম্মত ইংরেজশাসনকে শাসন বলিয়া না মানিলেও, দেশের বর্ত্তমান মঙ্গলের ও ভবিষ্যৎ উন্নতির মুখ চাহিয়া, এই শাসনপ্রতিষ্ঠিত আইনকানুন যথাসম্ভব মানিয়া চলা যে কর্ত্তব্য, ইহাও সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিতেন। এই জন্য সম্পূর্ণ স্বাধীনতাভিমুখ হইলেও বাঙালীর এই রাজনৈতিক আদর্শ সেকালে কোনো-প্রকারে যে বর্ত্তমান রাজশক্তির প্রতি দ্রোহভাব পোষণ করিতেছিল, তাহা নহে। ইহা সর্ব্বতোভাবেই স্বাধীনতাভিমুখ ছিল, কিন্তু বিদ্রোহাত্মক ছিল না।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় যে ন্যাশন্যাল্ কন্‌ফারেন্স হয়, তাহার মূলে স্বল্পবিস্তর এই আকাঙ্ক্ষা ও এই আদর্শই বিদ্যমান ছিল। বাংলাদেশে সে সময়ে শিক্ষিত ও শিক্ষার্থী যুবকমণ্ডলীর মধ্যে যে ভাব ও আদর্শ শনৈঃশনৈ বিকশিত হইয়া উঠিতে-ছিল, তাহারই বহিরঙ্গরূপে ন্যাশন্যাল্ কন্‌-ফারেন্স জন্মগ্রহণ করে। ন্যাশন্যাল্ কন্‌-ফারেন্সের জাতকর্ম্মে কোনো বিদেশীয় রাজ-পুরুষ বা কোনো বেসরকারী ইংরেজ ব্যবসায়ী বা রাজনীতিকের সাহচর্য্য ছিল না। পাশ্চাত্য-সাধনার প্রভাবে, ইংরেজিশিক্ষার ফলস্বরূপ, বাংলার মাটি হইতেই ইহা স্বত ফুটিয়া বাহির হইয়াছিল। সে সময়ে কংগ্রেস জন্মগ্রহণ করিয়া আমাদের ক্ষুদ্রতর কন্‌ফারেন্সকে যদি আত্মসাৎ করিয়া না ফেলিত, তবে আজ শিক্ষিতভারতে কি যে শক্তিশালী রাজনৈতিক আদর্শ ও প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিত, তাহা ভাবিলেও প্রাণে অনুপম আনন্দ ও সঞ্জীবনোৎসাহ সঞ্চারিত হয়।

যে আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা লইয়া কলিকাতার ন্যাশন্যাল্ কন্‌ফারেন্স অঙ্কুরিত হইয়া উঠিয়া-ছিল, কংগ্রেসও ঠিক সেই আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, এ কথা বলিতে পারি না। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা হিউম্। আর ইহা এখন কাহারো জানিতে বাকি নাই যে, কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করিবার কালে হিউম্ তদানীন্তন বড়লাট ডফারিণের সঙ্গে এ বিষয়ে অতি নিগূঢ় পরামর্শ করিয়াছিলেন; এবং মোটামুটি কংগ্রেসপ্রতিষ্ঠাবিষয়ে লাট ডফারিণের সহানুভূতি ছিল।

ভারতের প্রজাশক্তি জাগ্রত ও প্রতিষ্ঠান-বদ্ধ হইয়া ক্রমে ব্রিটিশপ্রভুশক্তির উচ্ছেদসাধন করুক, এমন স্বজাতিদ্রোহভাব ডফারিন্ বা

হিউমের মনে কথনো স্থান পাইয়াছিল বা পাইতে পারে, ইহা কল্পনা করাও অসাধ্য বলিয়া মনে হয়। ডফারিন্ অতি অল্পকালমধ্যেই কংগ্রেসের প্রতি যে বিরূপভাব প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন, তাহাতেই তাঁহার আন্তরিক আদর্শ ও অভিপ্রায় বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যায়। আর অস্ত্র-আইন-সম্বন্ধে হিউম্ চিরকাল যে ভাব পোষণ করিয়া আসিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া তিনিও যে কংগ্রেস সম্যক্‌রূপে রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসনের আদর্শের অনুসরণ করুক, এরূপ ইচ্ছা করিতেন, এমন ধারণা জন্মে না। ডফারিণের কুটিলনীতি হিউমের মনে স্থান পাইয়াছিল, এমন কথা বলা অসঙ্গত হইবে। কিন্তু জগতের আর দশটা স্বাধীনজাতি যেমন আত্মনিষ্ঠ হইয়া আপনার সনাতন-লক্ষ্য-সাধনে নিযুক্ত রহিয়াছে, ভারতবর্ষও সেইপ্রকার ব্রিটিশবন্ধন-মুক্ত হইয়া সম্পূর্ণরূপে আত্মনিষ্ঠ ও আত্মপ্রতিষ্ঠ হউক,—এত বড় আদর্শ যে তিনিও অবিচলিতচিত্তে ধারণা করিতে পারিয়াছিলেন, এমন কথাও বলিতে পারি না। হিউমের মত উদারপ্রকৃতির ইংরেজ এদেশে আর কেহ আসিয়াছেন কি না, জানি না। কিন্তু তাঁর সদাশয়তা যতই বড় হউক না কেন, তিনি যে ইংরেজ, এ কথা তিনিও ভুলিতে পারেন নাই, আমরাও ভুলিতে পারি না। তার পর হিউম্ আযৌবন ভারতশাসনের অঙ্গীভূত হইয়া ছিলেন। হঠাৎ তাঁর পক্ষে ঐ শাসনের প্রতি একেবারে স্নেহশূন্য হওয়া একান্ত অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। চিরাভ্যস্ত সৌভাগ্যসম্ভোগের প্রতি এমন নিঃশেষ বৈরাগ্য দৈবানুগ্রহে কথন-কথন জন্মিয়া থাকে সত্য, কিন্তু হিউমের সেরূপ হইয়াছিল বলিয়া কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। তিনি ভারতবাসীকে ভালবাসেন, ইহা শতবার স্বীকার করি। তিনি ভারতের কল্যাণকামনা করেন; ভারতবাসী জনগণের সুখস্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি পাউক, ইহা তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে ইচ্ছা করেন;—এ সকলই সত্য। কিন্তু তবুও ইহা বিশ্বাস করিতে পারি না যে, আমরা যে বস্তু চাই, তিনিও ঠিক তাহাই কংগ্রেসের লক্ষ্য বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন।

ঔদার্য্যানৌদার্য্যনির্ব্বিশেষে ভারতে ব্রিটিশ-রাজনীতি সর্ব্বদাই এক লক্ষ্য ধরিয়া চলিয়াছে। ভারতে ব্রিটিশপ্রভুশক্তির অচলপ্রতিষ্ঠা সেই লক্ষ্য। ঋজু-কুটিল, কোমল-কঠোর, বিবিধ পন্থা অবলম্বন করিয়া প্রত্যেক ব্রিটিশরাজ-পুরুষই এই লক্ষ্য ধরিয়া চলিয়াছেন। কেহ বা বুদ্ধিমান্, তাই প্রজারঞ্জনের দ্বারা রাজশক্তিকে প্রজাবর্গের স্নেহমমতার মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন; আর কেহ বা স্বল্পবুদ্ধি, তাই প্রজার ইচ্ছা অনিচ্ছা ও সুখদুঃখের প্রতি উদাসীন হইয়া শুদ্ধ পশুবল, বাহুবল ও কৌশলবলে রাজশক্তিকে অপরাজেয় করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু মৃদুল-কঠোর উভয়বিধ শাসনেরই লক্ষ্য এক—ব্রিটিশপ্রভুশক্তিকে ভারতে চিরস্থায়ী করা। সর্ব্বাপেক্ষা উদারমতি ও সদাশয় যাঁহারা, তাঁহারাও প্রজার স্বত্বস্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করাকে শাসনের চরমলক্ষ্য বলিয়া কথনো মনে করেন নাই। ব্রিটিশপ্রভুশক্তিকে বদ্ধমূল করিবার জন্য যতটুকু পরিমাণে প্রজার স্বত্ব-স্বাধীনতার সম্প্রসারণ একান্ত আবশ্যক হইয়াছে, ততটুকু পরিমাণে তাঁহারা সে বিষয়ে

যত্নবান্ হইয়াছেন, কিন্তু ইহাই যে শাসনের মুখ্য উদ্দেশ্য, প্রণালীবিশেষের প্রতিষ্ঠা বা স্থায়িত্বসাধন, শাসনের চরমলক্ষ্য নহে,—এ কথা ইঁহারা কেহই কখনো মনে করেন নাই।

ভারতের ব্রিটিশশাসনকর্ত্তৃগণকে প্রধানত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারা যায়,—একদল শক্তি-উপাসক; আর-একদল বৈষ্ণবী মায়ার অনুচর। একদলের অস্ত্র—তরবারি; আর-একদলের অস্ত্র—সম্মোহন-বাণ। একদল শক্তির দ্বারা ভারতের বিশাল প্রকৃতিপুঞ্জকে অভিভূত করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন; আর-একদল বুঝিয়াছেন যে—

> গায়ে হাত বুলাইয়া মিষ্টবাক্যে আর
> বশীভূত করা যায় নরে যেপ্রকার,
> তর্জ্জনগর্জ্জনদ্বারা দেখাইয়া ভয়
> বশীভূত করা কভু সেরূপ না হয়।

তাই, তাঁহারা তর্জ্জনগর্জ্জন বর্জ্জন করিয়া সম্মোহনমন্ত্রে প্রজাবর্গকে বিবশ করিয়া রাখিতে চাহিয়াছেন।

দালহৌসি, লীটন্ প্রভৃতি সকলেই স্বল্পবিস্তর শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন; ইঁহারা সকলেই ভারতশাসনে শক্তিতন্ত্রপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছেন। মেও, রিপন্ প্রভৃতি বৈষ্ণব,—ভারতশাসনে বৈষ্ণবী মায়া বিস্তার করিতে চাহিয়াছেন। হিউম্‌ও এই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। ওয়েডার্‌বরন্, কটন্ প্রভৃতি কংগ্রেসী নেতৃবর্গ সকলেই এই দলের লোক। ভারতশাসনে বৈষ্ণবী মায়ার প্রতিষ্ঠা ইঁহাদের মুখ্য লক্ষ্য ছিল। ঐ লক্ষ্য ধরিয়াই কংগ্রেসেরও প্রতিষ্ঠা হয়।

এইজন্য, জন্মাবধিই কংগ্রেস ভারতে ব্রিটিশশাসনকে কোমল ও লোকপ্রিয় করিবার জন্য ব্যস্ত রহিয়াছে। রিপন্, হিউম্, ওয়েডার্‌বরন্, কটন্ প্রভৃতি উদারমতি ভারতবন্ধু ইংরেজগণের চিরন্তন লক্ষ্য—সুশাসন,—good government; কংগ্রেসেরও সনাতন আদর্শ—সুশাসন, সত্য স্বায়ত্তশাসন নহে। ইঁহারা স্বায়ত্তশাসন চান না, বা চান নাই যে, তা নয়। যেখানে সুশাসনের জন্য স্বায়ত্তশাসন অত্যাবশ্যক, সেখানে ইঁহারা সকলে স্বায়ত্তশাসনও চাহিয়াছেন। কিন্তু সুশাসন ইঁহাদের লক্ষ্য, স্বায়ত্তশাসন উপলক্ষ্যমাত্র।

ব্যবস্থাপকসভার সংস্কার ও সম্প্রসারণ আবশ্যক সুশাসনপ্রতিষ্ঠার জন্য;—কংগ্রেস চিরদিনই এই কথা বলিয়া আসিয়াছে। রাজা বিদেশী, রাজপ্রতিনিধি বিদেশী, প্রধান প্রধান রাজপুরুষগণ সকলেই বিদেশী। দেশের প্রকৃত-অবস্থাসম্বন্ধে ইঁহারা একেবারে অজ্ঞ না হইলেও নিতান্তই যে স্বল্পজ্ঞ, ইহা তো আর অস্বীকার করা যায় না। দেশের প্রকৃত-অবস্থানভিজ্ঞ একদল বিদেশী রাজপুরুষের দ্বারা আইনকানুন রচিত হইলে, তাহাতে কদাপি লোকের অভাব-অভিযোগ নিবারিত হইতে পারে না। অতএব সুশাসনের জন্যই ব্যবস্থাপ্রণয়নে দেশীয়লোকের সাহায্যগ্রহণ অত্যাবশ্যক। কংগ্রেসের পূর্ব্বে যে সকল ভারতবাসী সময়ে সময়ে ব্যবস্থাপকসভার সদস্য নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা অনেকেই কেবল পদমর্য্যাদাসম্পন্ন ছিলেন, দেশের প্রকৃত অবস্থা এবং ব্রিটিশশাসনের মতিগতিসম্বন্ধে তাঁহাদের সম্যক্ জ্ঞান প্রায়ই থাকিত না; আর জ্ঞান থাকিলেও তাঁহারা রাজপুরুষগণের বিরাগোৎপাদনের আশঙ্কায় কখনো মুখ ফুটিয়া প্রজাবর্গের মতা-

মত বা সুখদুঃখের কথা রাজপুরুষদিগের সম্মুখে ভালরূপে ব্যক্ত করিতে পারেন নাই। অতএব শাসনের সুব্যবস্থার জন্যই, জনগণের নির্ব্বাচিত সুশিক্ষিত ও স্বাধীনচেতা লোক যাহাতে ব্যবস্থাপকসভার সভ্য হইয়া দেশের আইনকানুনরচনায় সাহায্য করিতে পারেন, তাহার যথোপযুক্ত বন্দোবস্ত করিতে হইবে। সুশাসনের জন্যই ব্যবস্থাপকসভার সংস্কার ও সম্প্রসারণ আবশ্যক। কিয়ৎ-পরিমাণে স্বায়ত্তশাসনপ্রতিষ্ঠা ব্যতিরেকে ব্যবস্থাপকসভার যথোপযুক্ত সংস্কার অসম্ভব বলিয়া, সুশাসনের অনুরোধে, সেই পরিমাণে স্বায়ত্তশাসনও প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। ইহাই ব্যবস্থাপকসভার সংস্কার ও সম্প্রসারণ সম্বন্ধে প্রথমাবধি কংগ্রেসের লক্ষ্য ও আদর্শ হইয়া আছে।

যেমন বিধিব্যবস্থাপ্রণয়নে দেশীয়লোকের সাহায্য আবশ্যক সুশাসনের জন্য; সেইরূপ বহুলপরিমাণে দেশীয়লোককে দেশের রাজ-কার্য্যপরিচালনায় নিযুক্ত করাও আবশ্যক ঐ সুশাসনেরই জন্য। প্রথমত যথাযথভাবে রাজকার্য্যপরিচালনার জন্য প্রজাবর্গের মতি-গতি-ভাব-স্বভাব, এ সকল ভাল করিয়া জানা আবশ্যক। বিদেশী রাজপুরুষেরা কদাপি এ জ্ঞান লাভ করিতে পারেন না। আমাদের প্রকৃতি, আমাদের ধর্ম্মনীতি, আমাদের সমাজবন্ধন, আমাদের পরিবারগঠন, আমাদের ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রণালীপদ্ধতি, আমাদের ভাষা ও সাহিত্য, আমাদের সাধনা ও সভ্যতা,—এ সকলের মধ্যেই দেশের লোকচরিত্র অঙ্কিত আছে। আর বিদেশী রাজপুরুষেরা যত কেন বিদ্বান্ হউন না, এ সকলের সম্যক্‌জ্ঞান লাভ করা তাঁহাদের পক্ষে একেবারে অসম্ভব ও অসাধ্য। অতএব দেশের লোককেই সুশাসনের জন্য বহুলপরিমাণে রাজকার্য্যপরিচালনায় নিযুক্ত করিতে হইবে।

আর একটা কারণেও দেশের লোককে বহুলপরিমাণে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করা প্রয়োজন। দেশের লোক এই সকল কার্য্যে নিযুক্ত হইলে, মাহিয়ানা ও পেন্‌শন্‌হিসাবে বিদেশে এখন যে রাশীকৃত অর্থ প্রতিবৎসর চলিয়া যায়, তাহা দেশেই থাকিবে, দেশেই ব্যয় হইয়া দেশের শ্রমজীবী ও ব্যবসায়িগণের উন্নতিসাধন করিবে। আর বিদেশী অপেক্ষা অল্প বেতনে দেশীয়লোক পাওয়া যায় বলিয়া, এ উপায়ে শাসনব্যয়েরও হ্রাস হইয়া, প্রজার করভার অল্পে অল্পে লঘু করিয়া তুলিবে। ইহাতেও সুশাসনের সাহায্য হইবে।

কংগ্রেস যে দুটি মুখ্য প্রার্থনা মুখে লইয়া ভূমিষ্ঠ হয়, সে দুটিরই মূল উদ্দেশ্য ব্রিটিশ-শাসনকে উন্নত ও নিষ্কণ্টক করা; ব্রিটিশপ্রভু-শক্তিকে ভারতের প্রজাশক্তির আনুকূল্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, তাহার স্থায়িত্ববিধান করা। রিপন্‌প্রমুখ উদারমতি ইংরেজরাজ-পুরুষগণের শাসননীতিও এই লক্ষ্য অনুসরণ করিয়াই চলিয়াছিল। হিউম্ রিপনের অতি নিকট সহচর ও অনুচর ছিলেন,—তাঁহার নেতৃত্বাধীনে, তাঁহারই মানসসন্তান কংগ্রেসও যে ঐ নীতিই অবলম্বন করিয়াছিল, ইহা আর বিচিত্র কি?

কংগ্রেসী সাহিত্যে এ সম্বন্ধে যাহা-কিছু বিচার-আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার প্রধান কথা দুটি। এক—তোমরা বিদেশী, দেশের অভাব-অভিযোগ-সম্বন্ধে তোমাদের

সম্যক্ জ্ঞান নাই, সম্যক্ জ্ঞান হওয়া অসম্ভব; সুতরাং তোমাদের দ্বারা দেশের শাসনকার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না, তাহাতে আমাদের অবিরাম সাহচর্য্য আবশ্যক। দ্বিতীয়—আমরা যে শিক্ষা লাভ করিয়াছি, তাহাতে তোমাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া আমাদের স্বদেশের বিধিব্যবস্থাপ্রণয়নের সবিশেষ যোগ্যতা আমাদের জন্মিয়াছে। ইংরেজ এদেশে আসিয়া অবধিই একটা বড় আত্মীয়তা ও উদারতার কথা বলিয়া আসিতেছে। সে বারংবার বলিয়া আসিয়াছে—"আমি তোমাদের সম্পত্তি হরণ করিতে আসি নাই, রক্ষা করিতে আসিয়াছি মাত্র। তোমরা নাবালক, আমরা তোমাদের অভিভাবক ও রক্ষক মাত্র। তোমাদেরই জন্য এই ক্লেশকর নির্ব্বাসন গ্রহণ করিয়া, তোমাদের বিষয়াশয়ের শাসনসংরক্ষণ করিতেছি। তোমরা সুশিক্ষিত ও সাবালক হইলেই, ক্রমে তোমাদের সম্পত্তি তোমাদের হাতে দিয়া আমাদের এ গুরুতর দায়িত্বের বোঝা মাথা হইতে নামাইয়া নিশ্চিন্ত হইব।" আমরাও এই কথা শুনিয়া নিশ্চিন্তমনে ইংরেজের শিষ্যত্বগ্রহণ করিয়া আপনাদিগের যোগ্যতাসাধনে নিযুক্ত হইলাম। কংগ্রেসের পূর্ব্বে ইংরেজের ঐ উদার উক্তির উপরেই আমাদের সকলপ্রকারের ভবিষ্য রাজনৈতিক আশাভরসা প্রতিষ্ঠিত ছিল।

ঐ উদার উক্তির উপরেই কংগ্রেসেরও সকলপ্রকারের দাওয়া-দাবী প্রতিষ্ঠিত। রাজকার্য্যে আমাদিগের স্বদেশবাসীদিগকে প্রচুরপরিমাণে নিযুক্ত করিতে হইবে; কারণ, ১৮৩৩ সালে তোমরাই বলিয়াছিলে যে, আমরা শিক্ষা ও যোগ্যতা লাভ করিলেই তোমরা ক্রমে আমাদিগকে ঐ সকল কার্য্যে নিযুক্ত করিবে। ১৮৫৮ সালে মহারাণী ভিক্টোরিয়া ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া আবার আমাদিগকে ঐ আশ্বাস দিয়াছিলেন। আমরা শিক্ষা পাইয়াছি, আমরা যোগ্যতালাভ করিয়াছি—এখন আমাদের ন্যায্য অধিকার আমাদের হাতে ছাড়িয়া দাও।

ইংরেজের পাঠশালা হইতে ফিরিয়া-আসিয়া যখন আমরা আমাদের স্বাধিকারে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলাম, তখন আমাদের কোলাহলে উত্যক্ত হইয়া ইংরেজ বলিতে লাগিল—"আগে যোগ্যতা, পরে আকাঙ্ক্ষা; আগে উপযুক্ত হও, পরে অধিকার চাহিও।" এখনো ইংরেজ ঐ এক কথাই বলিতেছে। সেদিন উদারমতি মর্লী পর্য্যন্ত ঐ সুর ধরিয়াছিলেন। এর উত্তরে আমরাও বলিতেছি—"আমরা তো উপযুক্ত হইয়াছি, তোমরা কেবল ছল করিয়া আমাদিগকে আমাদিগের ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখিবার জন্য আমাদের যোগ্যতা অস্বীকার করিতেছ।"

ইহাই কংগ্রেসের শেষ কথা। অতএব কংগ্রেসের সকল আয়োজন ও সকল চেষ্টাই যে ইংরেজের নিকটে আমাদের নিজেদের দেশশাসনসংরক্ষণের যোগ্যতাপ্রতিপাদনে নিঃশেষিত হইবে, ইহা আর আশ্চর্য্য কি?

কিন্তু কংগ্রেসের এই শেষ কথার উপরেও আর একটা কথা আছে। সে কথাটা ক্রমে ধীরে ধীরে আমাদের মুখে ফুটিয়া উঠিতেছে। এইখানেই নবভারতের নূতন রাজনীতির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। সে কথাটি এই,—

নিজেদের শাসনসংরক্ষণের যথাযোগ্য বিধিব্যবস্থাপ্রতিষ্ঠায় ও রাজকার্য্যপরিচালনায় আমাদের একটা বিধাতৃদত্ত অধিকার আছে। এ অধিকার সহজ ও স্বাভাবিক। এ অধিকার কেহ কাহাকে দেয় না, কেহ কাহাকে দিতে পারে না। এ অধিকার সমাজধর্ম্মের নিত্য-অঙ্গ, ধর্ম্মত কেহ কাহাকেও এ অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে পারে না; আমরা যেরূপ লোক, আমাদের যেরূপ সমাজগঠন, আমাদের যেরূপ সভ্যতা ও সাধনা, আমাদের শাসন-সংরক্ষণের বিধিব্যবস্থা কখনো তদপেক্ষা বিভিন্ন হইতে পারে না,—জোর করিয়া কেহ তাহাকে তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বা বিশুদ্ধতরও করিতে পারিবে না। আর আমাদের শিক্ষাদীক্ষাভাবস্বভাবানুযায়ী রাজ্যশাসনব্যবস্থা তোমার চক্ষে হীন বা হেয় হইলেও, আমাদের অধিকারে তাহাই সর্ব্বোত্তম। তটস্থ হইয়া বিচার করিলে ইহার তরতম থাকিতে পারে, কিন্তু আমার পক্ষে ইহাই একমাত্র স্বধর্ম্ম ও পুরুষার্থসাধনের একমাত্র উপায়। এই বিধিব্যবস্থাদি অবলম্বন করিয়াই আমরা ক্রমে উন্নত হইয়া, শ্রেষ্ঠতর বিধান ও শাসনব্যবস্থা অবলম্বন ও প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিব। বর্ত্তমান অবস্থায়, অন্য বিধান ও অন্য সাধন যত কেন উন্নত হউক না, আমাদের পক্ষে তাহা নিতান্তই পরধর্ম্ম—ভয়াবহ।

এ গেল এক কথা। কিন্তু এরো উপরে আর-একটা কথাও আছে। সেটা এই যে—

আমাদের যোগ্যতা-অযোগ্যতার বিচারক তোমরা নও, তোমরা হইতে পার না। আমরা বাদী, তোমরা প্রতিবাদী। বাদী ও বিচারককে তোমরা তোমাদের সুসভ্য বিচার-বিধানে এক করিয়া ফেলিয়াছ বটে; কিন্তু প্রতিবাদী যে, সে-ই বিচারকর্ত্তা, এমন অদ্ভুত বিধান তোমাদের উন্নত ও উদার সভ্যতাতেও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

কিন্তু এ সকলের উপরেও একটা কথা আছে, সেটাই এ আলোচনায় প্রকৃতপক্ষে শেষ কথা। সে কথাটা এই যে—

অভিভাবকের অধিকার ও অজুহাত তোমাদের নিতান্তই অলীক কল্পনা। ধর্ম্মত ও লোকত সেরূপ অধিকার এক জাতির উপরে অন্য এক জাতির কখনই প্রতিষ্ঠিত হয় না,—হইতে পারে না। বিভিন্ন ও বিরোধী জাতিসকলের মধ্যে রক্ষক-রক্ষিত-সম্বন্ধ আজ পর্য্যন্ত কোনো নীতিশাস্ত্রেই প্রতিপন্ন হয় নাই। জনসমাজে একান্ত অযোগ্য ব্যক্তিকে যোগ্যতাপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত তাহার ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখিবার ব্যবস্থা আছে সত্য; কিন্তু এখানে রক্ষক ও রক্ষিত উভয়ের উপরে এক সমদর্শী রাজশক্তি বা সমাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, যে শক্তি অযোগ্যের সাময়িক অভিভাবকের বা রক্ষকের আত্মম্ভরিতা হইতে তাহার বিষয় ও অধিকারকে রক্ষা করিয়া থাকে। যেখানে এইরূপ শেষরক্ষার ব্যবস্থা নাই বা হওয়া অসম্ভব, সেখানে অযোগ্যতার অজুহাতে কাহাকেও ন্যায়ত ও ধর্ম্মত তাহার স্বাভাবিক স্বত্বস্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করিতে পারা যায় না। যেখানে এক ব্যক্তি বা এক জাতি অপর ব্যক্তি বা অপর জাতিকে এই শেষরক্ষার ব্যবস্থা অবিদ্যমানেও তাহার ন্যায্য স্বত্বস্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখে; সেখানে নীতি ও ধর্ম্মের বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়া

শুদ্ধ পশুবল বা বাহুবলেরই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সেখানে কেবল পশুবল-প্রয়োগেই এরূপ অসাধু চেষ্টা সফল হইতে পারে। আর যেখানে এরূপই ঘটে, সেখানে বঞ্চিত ব্যক্তি যতদিন না আত্মশক্তির প্রতিষ্ঠার দ্বারা তাহার অলীক অভিভাবকের শক্তিকে একান্ত অভিভূত করিতে পারিয়াছে, ততদিন অন্য কোনো উপায়ে তাহার স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হইবার সম্যক্ যোগ্যতা প্রমাণিত হয় না।

এই সকল ভাব, চিন্তা ও বিচারের ফলে দেশে এক অভিনব রাজনৈতিক আদর্শ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহার লক্ষ্য কেবল সুশাসন নহে, কিন্তু স্বায়ত্তশাসন। ইহার প্রণালী ইংরেজের সম্মুখে বাগ্‌বিতণ্ডা করিয়া শাসনকার্য্যে ব্রিটিশরাজপুরুষগণের সাহচর্য্য করিবার যোগ্যতাপ্রতিপাদন নহে, কিন্তু দেশের লোকের আত্মশক্তি, আত্মজ্ঞান ও আত্মসম্মান জাগ্রত করিয়া সর্ব্বতোভাবে রাজশক্তির সমক্ষে ও সমকক্ষে প্রজাশক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করা। এই শক্তি একবার জাগ্রত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেই কেবল, আমরা আমাদের জাতীয়-জীবনের প্রকৃত চরিতার্থতা লাভ করিতে পারিব, অন্যথা নহে।

কংগ্রেস এতকাল ধরিয়া যে আদর্শের অনুসরণ করিতেছিল, এখন তাহাকে সে আদর্শ বর্জ্জন করিয়া স্বায়ত্তশাসনের উন্নততর ও মহত্তর আদর্শ গ্রহণ করিতে হইবে। আর সুশাসনের লোভ জয় করিয়া, কঠোরতর স্বায়ত্তশাসনের জন্য মহাসাধনে নিযুক্ত হইলেই, কংগ্রেসকে পুরাতন ভিক্ষানীতি পরিহার করিয়া স্বাবলম্বন ও আত্মপ্রতিষ্ঠার পন্থা অনুসরণ করিতেই হইবে। সুশাসন যতদিন আমাদের লক্ষ্য ছিল, ততদিন যাঁহাদের উপরে শাসনভার অর্পিত আছে, তাঁহাদের মনস্তুষ্টি-সম্পাদন সমীচীন নীতি বলিয়া সহজেই পরিগণিত হইত। কিন্তু এখন স্বায়ত্তশাসন আমাদের লক্ষ্য, সুতরাং রাজপুরুষগণের কার্য্যাকার্য্যের প্রতি যথাসম্ভব উদাসীন হইয়া এখন আমাদিগকে প্রকৃতিপুঞ্জের শিক্ষাবিধান ও সংহতিসাধনে নিযুক্ত হইতে হইবে। সুশাসনের পন্থা ছিল আবেদন ও আন্দোলন; স্বায়ত্তশাসনের মূলমন্ত্র হইবে বোধন ও গঠন; —প্রজাশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করা,... প্রজাশক্তিকে বিবিধ সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের আকারে গড়িয়া তোলা।

এই সকল উপায়ে একবার দেশের প্রজাশক্তি জাগ্রত, সংহত ও সংগঠিত হইয়া রাজশক্তির সমক্ষে ও সমকক্ষে দণ্ডায়মান হইলে, দেশের জনমণ্ডলীর প্রতিনিধি ও স্বাভাবিক্ নেতৃবর্গের দেশের শাসনসংরক্ষণ করিবার যোগ্যতা ও অধিকার যুগপৎ প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হইবে। তখন আর এ বিষয়ে প্রমাণান্তরের কোনোই অপেক্ষা থাকিবে না। আর যতদিন না প্রজাশক্তি জাগ্রত ও সংহত হইয়াছে, ততদিন কোনো পরীক্ষায়, কোনো আন্দোলনে, কোনো আর্ত্তনাদে—এ যোগ্যতাও প্রমাণিত হইবে না, এ অধিকারও প্রতিষ্ঠিত হইবে না।*

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

* এই প্রবন্ধ ৮।৭মাস পূর্ব্বে লিখিত

বারাণসীর অভিমুখে।

১

মাদ্রাজে থিওসফিষ্টদের গৃহে।

"স্বর্গ বিনা ঈশ্বর, আত্মা বিনা অমরত্ব, প্রার্থনা বিনা চিত্তশুদ্ধি"...

আমাদের কথাবার্ত্তা যখন থামিয়া গেল, চরম সিদ্ধান্তের আকারে পরিব্যক্ত উপরি-উক্ত বীজমন্ত্রটি, ঘোর নিস্তব্ধতার মধ্যে, বিষাদ-গম্ভীরস্বরে আমার কর্ণে যেন ক্রমাগত ধ্বনিত হইতে লাগিল।

গৃহটি নির্জ্জন;—ময়দানের উপর, নদীর ধারে, তালীবন ও অপরিচিত একপ্রকার বৃহৎ-জাতীয় পুষ্পরাশির মধ্যে অবস্থিত, এবং সন্ধ্যার বিষাদচ্ছায়ায় আচ্ছন্ন। তখন আমরা গৃহের পুস্তকাগারে ছিলাম। জান্‌লা-শাশির মধ্য দিয়া ঘরটিতে এখনো বেশ আলো আসিতেছিল; অল্পে-অল্পে আলো কমিয়া আসিল; শাশির রঙিন কাচখণ্ডের উপর যে-সব স্বচ্ছপ্রভ ক্ষুদ্র চিত্র ছিল, তাহা ক্রমশ বিলীন হইয়া গেল;—সমস্ত মানবীয় ধর্ম্ম-মতের বাহ্যচিহ্নের এই চিত্রগুলি যেন একটা জাদুঘরে একত্র সংরক্ষিত হইয়াছে;—খৃষ্টের ক্রুস্, সলোমনের মোহর, জিহোবার ত্রিকোণ, শাক্যমুনির পদ্ম, মহাদেবের ত্রিশূল, মিশর-দেশীয় আইসিস্‌দেবের চিহ্নাবলী। ইহা মাদ্রাজস্থ থিওসফিষ্টদিগের গৃহ। আমি থিওসফিষ্টদিগের সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য্য কথা শুনিয়াছিলাম। যদিও আমি সে-সব কথায় বিশ্বাস করি নাই, তবু মনে করিলাম,—দেখি না কেন, উহাদের নিকটে যদি কোন আশার কথা শুনিতে পাই। এই আমার শেষ চেষ্টা। কিন্তু উঁহারা আমাকে কি দিতে চাহিলেন, শোনো:—বৌদ্ধধর্ম্মের সেই সুবিদিত হৃদয়হীন উদাসীনভাবের কথা,—"আমার নিজের জ্ঞানালোক!"

—"প্রার্থনা?" তাঁহারা বলিলেন—"প্রার্থনা শুনিবে কে?...মানুষের দায়িত্ব মানুষের নিজের কাছেই। মনুবচন স্মরণ করিয়া দেখ,—'মনুষ্য একাই জন্মগ্রহণ করে, একাই জীবিত থাকে, একাই মৃত হয়, কেবল ধর্ম্মই তাহার অনুগমন করে'...তবে প্রার্থনা শুনিবে কে? কাহার নিকট প্রার্থনা করিবে, তুমি যখন নিজেই ঈশ্বর? তোমার আপনার নিকটেই প্রার্থনা করিতে হইবে—তোমার নিজ কর্ম্মের দ্বারা।"

আমাদের মধ্যে একটা গভীর নিস্তব্ধতা আসিয়া পড়িল; এরূপ বিষাদময় নিস্তব্ধতা আমার জীবনে কখন দেখি নাই। সব নিস্তব্ধ—কেবল শূন্য আকাশে একএকটি করিয়া পাতা ঝরিয়া পড়িতেছে, তাহারই অস্পষ্ট মৃদু শব্দ শুনা যাইতেছে; মনে হইল,—যাঁহাদের সহিত আমার কথাবার্ত্তা হইতেছিল, তাঁহাদের নিশ্বাসবায়ুতে আমার মনের মধুর ও অস্পষ্ট

বিশ্বাসগুলি যেন একে-একে ঝরিয়া পড়িতেছে। কিন্তু তাঁহারা স্বকীয় যুক্তিবিচারে অটল,—স্বকীয় সিদ্ধান্তে বেশ সন্তুষ্ট।

যে দুইটি লোকের সহিত আমার কথা হইতেছিল, দুজনেই বেশ এদিকে আতিথেয়, সহৃদয় ও আদর-অভ্যর্থনায় সুপটু। প্রথমটি য়ুরোপীয়,—আমাদিগের নানাপ্রকার আন্দোলন ও অনিশ্চিততায় শ্রান্তক্লান্ত হইয়া ইনি বুদ্ধপ্রবর্ত্তিত সন্ন্যাস অবলম্বন করেন, এবং এক্ষণে থিওসফিষ্টসভার সভাপতি হইয়াছেন; অন্যটি একজন হিন্দু;—আমাদের য়ুরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি অর্জ্জন করিয়া ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন এবং এক্ষণে ইনি আমাদের পাশ্চাত্যদর্শনাদি কতকটা অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া থাকেন।

আমি উত্তর করিলাম,—"তুমি বলিতেছ, আমাদের অন্তরস্থ কোন-এক পদার্থ,—আমাদের ক্ষণস্থায়ী ব্যক্তিত্বের একটু অংশ,—কিয়ৎকালের জন্য মৃত্যুর আঘাতকে প্রতিরোধ করে, তাহার অকাট্য প্রমাণ তোমরা পাইয়াছ। অন্তত এই অকাট্য প্রমাণটি কি, তুমি আমাকে দেখাইতে পার?"...

তিনি বলিলেন,—"যুক্তির দ্বারা আমরা তাহা সপ্রমাণ করিব; কিন্তু চাক্ষুষ প্রমাণ যদি চাহ, তাহা আমরা দিতে পারিব না...যাহাদিগকে লোকে অযথারূপে মৃত বলে—(কেন না, আসলে কেহই মরে না) সেই মৃত ব্যক্তিকে দেখিবার জন্য বিশেষ ইন্দ্রিয় আবশ্যক, বিশেষ অবস্থা ও বিশেষ মানসিক প্রকৃতি আবশ্যক। কিন্তু আমাদের কথায় তুমি বিশ্বাসস্থাপন করিতে পার; আমরা দেখিয়াছি এবং আমাদের ন্যায় বিশ্বাসযোগ্য আরো অন্য লোকে মৃতব্যক্তিদিগের অপচ্ছায়া দেখিয়াছে এবং তাহার সমস্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছে। দেখ, এই পুস্তকাগারের এই সকল পুস্তকে ঐ সমস্ত বিবরণ পাওয়া যায়...কাল যখন তুমি আসিয়া আমাদের সঙ্গে বাস করিবে, তখন এই সকল পুস্তক পাঠ করিও।"...

আমি তবে কেন এত কষ্ট করিয়া ভারতে আসিলাম,—যে ভারত সমস্ত মানবীয় ধর্ম্মমতের পুরাতন আদিমনিবাস—যদি এই পুস্তকাগারের পুস্তকেই সমস্ত কথা জানা যাইতে পারে; মন্দিরসমূহের মধ্যে,—ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম পৌত্তলিকতার অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন; আর এখানে,—শাক্যমুনিকৃত একপ্রকার প্রত্যক্ষবাদের (Positivism) নব-সংস্করণ এবং সমস্ত পৃথিবী হইতে সংগৃহীত কতকগুলা প্রেতবাদের গ্রন্থ দেখা যাইতেছে।...

আরো খানিকটা নিস্তব্ধতার পর, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—মনে-মনে বুঝিতেছি, এবার আমি ছেলেমানুষি-কৌতুহলের নিম্নভূমিতে নামিয়া আসিতেছি—তাই ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম;—"আপনারা কি সাধু-সন্ন্যাসীদিগের সন্ধান আমাকে বলিতে পারেন,—ভারতের সেই-সব সাধু-সন্ন্যাসী, যাঁহারা সিদ্ধপুরুষ বলিয়া প্রখ্যাত, যাঁহারা নানাপ্রকার অদ্ভুতকার্য্য, এমন কি, অলৌকিক কার্য্য সাধন করিতে পারেন; অন্তত তাহা হইলে ইহা সপ্রমাণ হইতে পারে যে, এখানে এমন-কিছু আছে, যাহা আমাদের অতীত—যাহা অতিভৌতিক, যাহা অতিমানুষিক।"

আমার সম্মুখে যে হিন্দুটি বসিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার তাপসসুলভ নেত্রদ্বয় ঊর্দ্ধে

তুলিলেন; একটা মুখভঙ্গীর দ্বারা তাঁহার সূক্ষ্ম ও কঠোর মুখমণ্ডল সঙ্কুচিত হইল; তাঁহার মুখটি যেন শাদা পাগ্ড়ি দিয়া ঘেরা 'দান্তে'র (Dante) মুখস্।

—"সাধু-সন্ন্যাসী?—সাধু-সন্ন্যাসী? সাধু-সন্ন্যাসী এখন আর নাই"—তিনি উত্তর করিলেন।

এই বিষয়ে যাঁহার বিশেষ জ্ঞান আছে, তাঁহারই মুখে যখন শুনিলাম, সেরূপ সাধু-সন্ন্যাসী এখন আর নাই,—তখন এই পৃথিবীতেই যে অলৌকিক কাণ্ড দেখিব বলিয়া আশা করিয়াছিলাম, সে আশা আর রহিল না।

—"বারাণসীতেও নাই?"—আমি এই কথা ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম। আমি আশা করিয়াছিলাম, বারাণসীতে......আমি শুনিয়াছিলাম...

আমি "বারাণসী" এই নামটি উচ্চারণ করিতে ইতস্তত করিতেছিলাম; কেন না, ঐটি আমার 'হাতের রেস্তোর' শেষ তাস; যদি সেখানে গিয়াও কিছু দেখিতে না পাই।...

—"শোনো বলি। ভিক্ষু-সন্ন্যাসী, চেতনাহীন সন্ন্যাসী, হঠযোগসিদ্ধ অঙ্গবিক্ষেপকারী সন্ন্যাসী এখনো অনেক রহিয়াছে; তাহাদিগকে দেখিবার জন্য আমাদের সাহায্য তোমার প্রয়োজন হইবে না। কিন্তু যাঁহারা প্রকৃত সিদ্ধপুরুষ, যাঁহারা অষ্টসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, সেইরূপ কতকগুলি সন্ন্যাসীকে আমরা জানি। এ বিষয়েও আমাদের কথার উপরেই তোমায় বিশ্বাসস্থাপন করিতে হইবে। সেরূপ সন্ন্যাসী ভারতে ছিলেন, কিন্তু এই শতাব্দীর অবসানের সঙ্গে-সঙ্গেই তাঁহারা তিরোহিত হইয়াছেন। ভারতের সেই পুরাতন যোগিভাব আর নাই। জড়বিজ্ঞানবাদী রাজসিক পাশ্চাত্যজাতির সংসর্গে আমাদের অবনতি হইয়াছে; পাশ্চাত্য লোকেরাও আবার এক সময়ে অবনতি প্রাপ্ত হইবে; এই অবনতির হস্তে আমরা নিশ্চিন্তভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া দিয়াছি; কেন না, ইহাই জগতের অবশ্যম্ভাবী নিয়ম।...হাঁ, আমাদের দেশে সিদ্ধপুরুষ যোগিসন্ন্যাসী এক সময়ে ছিলেন; এই দেখ না, আল্মারির এই তক্তাটি শুধু তাঁহাদের বিবরণঘটিত হস্তলিপি পুঁথির জন্য সংরক্ষিত।"...

জান্লা-শার্শির উপর চিত্রিত মানবীয় সমস্ত ধর্ম্মসম্প্রদায়ের বিশেষ চিহ্নগুলি অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে; এই কঠোর পুস্তকাগারে একেই ত একটু বিষাদময় অন্ধকার ছিল, তাতে আবার রাত্রি হওয়ায়, আরো ঘোর অন্ধকারে ইহা আচ্ছন্ন হইল। থিওসফিষ্টদিগের সহিত দীর্ঘকাল বাস করিব মনে করিয়া আমি মাদ্রাজে আসিয়াছিলাম; কল্য হইতে তাঁহাদের গৃহে আমার থাকিবার কথা; কিন্তু আজ সায়াহ্নে আমি মাদ্রাজ ছাড়িয়া চলিয়া যাইব স্থির করিয়াছি, আর ফিরিয়া আসিব না। এই নাস্তিত্ব ও শূন্যবাদের কঠোর আশ্রমে বদ্ধ হইয়া থাকিব কিসের জন্য? বরং যেরূপ চিরজীবন করিয়া আসিয়াছি, এই পৃথিবীর বিচিত্র পদার্থ দেখিয়া আমার নেত্রবিনোদন করিব; এই পদার্থগুলি ক্ষণস্থায়ী হইলেও, অন্তত, এক মুহূর্ত্তের জন্যও বাস্তব। তা ছাড়া, অমরত্ব-সম্বন্ধে তাঁহাদের যেরূপ ধারণা, সেরূপ

অমরত্বের প্রমাণ পাইলেই বা কি যায়-আসে ? একবার যাহারা বাস্তবিক ভালবাসিয়াছে, দেহের বিনাশ কল্পনা করাও তাহাদের পক্ষে বিষম যন্ত্রণা। যে অমরত্বে তাহারা সন্তুষ্ট, আমাদের মত লোক সেরূপ অমরত্ব লইয়া কি করিবে ? খৃষ্টানদিগের যাহা ধ্যানের বিষয়, আমি সেইরূপ অমরত্ব চাই;—আমি চাই আমার আমিত্ব, আমার নিজত্ব, আমার বিশেষত্বটুকু বরাবর থাকিয়া যাইবে; আমি যাহাদের ভালবাসিতাম, তাহাদিগকে আবার আমি দেখিতে পাইব—পূর্ব্বের মতই তাহাদিগকে ভালবাসিব, তাহা না হইলে আর কি হইল ?

আমি যখন আবার নগরের পথ ধরিয়া চলিতে লাগিলাম, তখন কাকেরা মহা কোলাহল আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। সকলে মিলিয়া মৃত্যুর গান গাহিতেছে; এই সময়ে নিদ্রা যাইবার জন্য তাহারা দলে-দলে বৃক্ষ-শাখায় বসিয়া গিয়াছে। বরাবর সমস্ত পথটায়, বট ও তালবৃক্ষের তলদেশে, গজমুণ্ড-ধারী গণেশের ছোট-ছোট মূর্ত্তি সন্ধ্যালোকে দেখা যাইতেছে। যে সকল লোকের নিকট হইতে আমি চলিয়া আসিলাম, তাহাদের মতবাদটি এই সকল বিগ্রহেরই ন্যায় নিতান্ত শিশুজনোচিত ও অকিঞ্চিৎকর।

সন্ধ্যার সময়, ঐ সকল থিওসফিষ্টদিগের নিকট আমার অসম্মতিসূচক পত্র পাঠাইলাম। তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জানাইলাম, আর বলিলাম, "আমি যত শীঘ্র পারি, মাদ্রাজ ছাড়িব বলিয়া স্থির করিয়াছি; তাই শেষবিদায় লইবার জন্য কাল আমি তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিব।"

যাহাদিগকে আমি খুব ভালবাসিতাম, রাত্রির স্বপ্নে আমার সেই সব মৃত প্রিয়জন-দিগকে আমি পুনর্ব্বার দর্শন করিলাম; আমার শৈশবের সেই পুরাতন বিকৃতভাবাপন্ন অশুভদর্শন বাসভবনের মধ্যে সেই পাণ্ডুবর্ণ গলিত মূর্ত্তিগুলি দেখিলাম। আর এক রাত্রি,—যেরূপ জেরুস্যালেমে আমার ঘটিয়াছিল—যে সময়ে আমার প্রথমকালের বিশ্বাসগুলি চিরকালের মত ভাঙিয়া যায়—সেই রাত্রির মত আজও সমস্ত রাত্রি অশেষপ্রকার বিষাদের চিন্তা, দুর্নিবার ভয়ের চিন্তা, একটার পর একটা, মনোমধ্যে ক্রমাগত উদয় হইতে লাগিল; তাহার পর যেই প্রভাত হইল, অমনি একটা দাঁড়কাক আমার ঘরের জান্‌লায় বসিয়া, উদয়োন্মুখ সূর্য্যের সমক্ষে মৃত্যুগান গাহিয়া আমাকে জাগাইয়া দিল।

অপরাহ্ণে, বিদায় লইবার জন্য থিওসফিষ্ট-দিগের সহিত আবার সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। থিওসফিষ্টদিগের দলপতি আমার পত্র পাইয়া সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়াছিলেন; তথাপি তিনি স্নেহপূর্ণ মধুরভাবে আমাকে আদর-অভ্যর্থনা করিলেন; আমি এরূপ অভ্যর্থনা প্রত্যাশা করি নাই।

অনেকক্ষণ হস্তে হস্ত চাপিয়া তিনি বলিলেন—"খৃষ্টান, আমি ভাবিয়াছিলাম, তুমি বুঝি নাস্তিক!

"বুদ্ধদেব আমাদের জন্য যে সকল জড়-বিজ্ঞানবাদের উপদেশ রাখিয়া গিয়াছেন, আমি তোমার নিকট তাহারই ব্যাখ্যা করিয়াছিলাম; কেন না, সাধারণত এইরূপভাবেই আমরা আরম্ভ করি···তোমার আত্মার যেরূপ প্রকৃতি দেখিতেছি, তাহাতে তোমার পক্ষে গুহ্যদের-

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মই উপযোগী; আর সে গুহ্যতত্ত্ব আমাদের অপেক্ষা আমাদের বারাণসীর বন্ধুগণ ভাল জানেন; তুমি যে প্রার্থনা-উপাসনাদির কথা বলিতেছিলে,—কোন-না-কোন আকারে তুমি সেইখানেই তাহা প্রাপ্ত হইবে; কিন্তু শুধু প্রার্থনা-উপাসনাদি করিলেই যথেষ্ট হইবে না, পুণ্যসঞ্চয় করিবার জন্যও তাঁহারা তোমাকে উপদেশ করিবেন...'অন্বেষণ করিলেই প্রাপ্ত হইবে'; আমি ৪০বৎসর যাবৎ অন্বেষণ করিয়াছি; তুমি সাহসপূর্ব্বক আরো কিছু-কাল অন্বেষণ কর। আমাদের মধ্যে তুমি থাকিবার চেষ্টা কর;—না না, যাও!—আমাদের শিক্ষাদীক্ষা তোমার উপযোগী হইবে না।" তাহার পর একটু হাসিয়া বলিলেন—"তা ছাড়া, এখনো তোমার সময় আসে নাই; এখনো তুমি সংসারের ভীষণ মায়াপাশে আবদ্ধ।

—"বোধ হয় তাই।"

—"তুমি অন্বেষণ করিতেছ, কিন্তু অন্বেষণ করিয়া পাছে তুমি কিছু পাও, সেজন্যও তোমার ভয় হইতেছে।"

—"তাই বোধ হয়।"

—"আমরা তোমাকে ত্যাগের কথা বলিতেছি, আর তুমি কিনা ভোগের বাসনা করিতেছ!...তবে তুমি ভ্রমণই কর; যাও, দিল্লি দেখিয়া আইস, আগ্রা দেখিয়া আইস; যাহা তোমার ইচ্ছা হয়, যাহা তোমার ভাল লাগে, যাহাতে তোমার আমোদ হয়, তাহাই কর। শুধু এইটুকু আমাদের নিকট অঙ্গীকার কর যে, ভারত হইতে চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে তুমি আমাদের বারাণসীর বন্ধুদিগের নিকট গিয়া কিছুকাল বিশ্রাম করিবে; আমরা তাঁহাদিগকে সংবাদ দিব, এবং তাঁহারা তোমার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবেন।"...

যে হিন্দুটিকে আমি কাল দেখিয়াছিলাম, তিনি নিস্তব্ধ ছিলেন; তিনিও অনুকম্পার স্মিতহাস্য মুখে প্রকটিত করিয়া অতীব মধুর দৃষ্টিতে আমাকে দেখিতেছিলেন। এই সময়ে এই বিভিন্নজাতীয় তাপসযুগলকে সহসা অতীব উন্নত, অতীব নমনীয়, অতীব রহস্যময় ও বুদ্ধির অগম্য বলিয়া আমার মনে হইতে লাগিল। সহসা তাঁহাদের এরূপ পরিবর্ত্তন কেন হইল বুঝিতে না পারিয়া, আমি বিশ্বস্ত-ভাবে ও কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁহাদের নিকট আমার মস্তক অবনত করিলাম।

ভারত ছাড়িয়া যাইবার পূর্ব্বে, উঁহাদের বারাণসীর বন্ধুদিগের গৃহে কিছুকাল অবস্থিতি করিতে হইবে,—বেশ ত! সে ত ভাল কথাই! আমি আনন্দের সহিত এ প্রস্তাবে সম্মতি দিলাম। আমার মনে কেমন-একটা অগ্রসূচনা উপস্থিত হইল যে, সেখানকার আধ্যাত্মিক হাওয়াই আমার উপযোগী হইবে।

সর্ব্বশেষে বারাণসী; উহাকে এখন আমি হাতে রাখিলাম। আমার ভয় হয়, পাছে কোন অকাট্য প্রমাণ পাইয়া দুইটি বিভীষিকার মধ্যে একটি বিভীষিকাকে আমায় গ্রহণ করিতে হয়। হয়—চিরকালের মত ব্যর্থমনোরথ হইব; নয়—অন্বেষণ করিয়া কিছু পাইব; যদি পাই, তাহা হইলে আমার জীবনে একটা নূতন পথ উন্মুক্ত হইবে,—আমার মধুর মরীচিকাগুলি অন্তর্হিত হইবে।...

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ।

শ, ষ, স।

শ, ষ, স, এই তিনটি বর্ণের উচ্চারণ লইয়া মহাগোলযোগ। ইহাদের তিনেরই উচ্চারণ বঙ্গদেশে মূর্দ্ধন্য ষ এবং পশ্চিমাঞ্চলে দন্ত্য 'স'র ন্যায়; পশ্চিমাঞ্চলে আবার 'ষ'কে 'খ'র ন্যায়ও উচ্চারণ করা হয়। অতএব ইহাদের প্রচলিত উচ্চারণ যে ভ্রমাত্মক, তাহা বিদ্বান্ মাত্রেই বুঝিতে পারেন; কিন্তু একজন ষোল-আনা পণ্ডিত তাঁহার ছাত্রগণকে পড়াইতেছেন—তিনিও সন্ধিবৃত্তিকে ষন্ধিবৃত্তি বলিতেছেন, ছাত্রগণ তাহাই শিক্ষা করিতেছে। বিদ্যার খনি পুণ্যক্ষেত্র কাশীধামে বিদ্বত্তম মহামহোপাধ্যায় মহাশয় বসিয়া দেশদেশান্তর হইতে সমাগত বিদ্যার্থী ছাত্রগণকে বেদ, বেদাঙ্গ, ব্যাকরণ, নিরুক্তাদি শিক্ষা দিতেছেন, তিনিও শিবকে সিব বলিতেছেন। ছাত্রকে পাঠ দেওয়ার সময় বলিতেছেন ইহা তালব্য শ অর্থাৎ ইহার উচ্চারণ তালু হইতে হয়, অথচ নিজে উহাকে দন্ত হইতে দন্ত্য সকারের ন্যায় উচ্চারণ করিতেছেন। তালব্য শকারের উৎপত্তি তালু হইতে হয়, অতএব তাহার উচ্চারণ আমরা বঙ্গদেশে শিষ বলিতে শকারের যেরূপ উচ্চারণ করিয়া থাকি, প্রায় তাহাই। ইংরেজী Shallশব্দের প্রথম বর্ণদ্বয়ের যে উচ্চারণ, আমাদের 'ষ'র উচ্চারণ সেইরূপ এবং তালব্য শকারের উচ্চারণও প্রায় সেইপ্রকার, কেবল তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ ঘোরমাত্র।

মূর্দ্ধন্য ষকারের এবং তালব্য শকারের উচ্চারণ প্রায় একপ্রকার; তাহাতে যে কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে, তাহা কেবল উহাদের উচ্চারণস্থানের কিঞ্চিৎ ব্যবধানহেতু। তালব্য 'শ'র উচ্চারণ করিতে জিহ্বাগ্রকে ঘুরাইয়া মূর্দ্ধাতে লইয়া যাইতে হয়; তাহাতেই মূর্দ্ধন্য ষ অপেক্ষা তালব্য 'শ'র উচ্চারণ কিঞ্চিৎ ঘোর হইয়া থাকে, উহাদের উচ্চারণে এইমাত্র সামান্য প্রভেদ। এস্থলে একটি প্রশ্ন হইতে পারে যে, যদি উহাদের পার্থক্য এত সামান্য, তবে তালব্য 'শ' এবং মূর্দ্ধন্য 'ষ' এই দুইটি বর্ণের প্রয়োজন কি ছিল? ইহার উত্তর পরপ্রবন্ধে দেওয়া যাইবে। দন্ত্য 'স'র উচ্চারণ আমরা মূর্দ্ধন্য 'ষ'র ন্যায় করিয়া থাকি, তাহা ভ্রম; ইহার প্রকৃত উচ্চারণ আমরা স্নান, স্থান প্রভৃতি শব্দে যেরূপ করিয়া থাকি, সেইপ্রকার অর্থাৎ ইংরেজী Sর ন্যায়।

শ, ষ, স এই তিনটি বর্ণের অধিকার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র। ইতিপূর্ব্বে অনুস্বারবিসর্গশীর্ষক প্রবন্ধে পঞ্চ অনুনাসিকের যেমন পৃথক্ পৃথক্ অধিকার দেখাইয়া আসিয়াছি, এই ত্রিবর্ণেরও সেইপ্রকার এক এক বর্গে এক একটির অধিকার। তালব্য শ তালু হইতে উচ্চারিত, এইজন্য তালব্যবর্গের অর্থাৎ চবর্গের প্রথম বর্ণদ্বয়ের উপর ইহার অধিকার, উহাদের উপর মূর্দ্ধন্য ষ কিংবা দন্ত্য স কখনই আসিতে পারে না। যথা, দুশ্চর, নিশ্চয়, বহিশ্চর, দুশ্ছেদ্য ইত্যাদি। মূর্দ্ধন্য ষ মূর্দ্ধা হইতে উৎপন্ন, এই-

জন্ম তাহার অধিকার মূর্দ্ধন্যবর্গের অর্থাৎ টবর্গের প্রথম বর্ণদ্বয়ের উপর, যথা—দুষ্ট, নিষ্ঠা ইত্যাদি। ইহাদের উপর ষ ভিন্ন তালব্য শ বা দন্ত্য স কখনই বসিবে না। তার পর দন্ত্য স। ইহার অধিকার দন্ত্যবর্গের আদ্যাক্ষরদ্বয়ে, যথা—দুস্তর, নিস্তব্ধ, বহিস্তন, মনস্তাপ, শস্ত্র, সংস্থান, স্তব ইত্যাদি। ইহাদের উপর শ কিংবা ষ বসে না। এইপ্রকারে এই তিনটি বর্ণ আপন-আপন অধিকার স্থির রাখিয়াছে। ইহাদের অধিকারের বহির্ভূত যে দুইটি বর্গ রহিল, অর্থাৎ কবর্গ এবং পবর্গ, ইহারা বর্ণমালার প্রথম ও শেষ বর্গ। উহাদের উপর এবং অন্যান্য বর্ণের উপর তালব্যশকারাদি ত্রিবর্ণই স্থানে স্থানে আপন-আপন অধিকার বিস্তার করে, যথা—কবর্গে দুষ্কর, নিষ্কর, বহিষ্করণ। এই সকল শব্দে মূর্দ্ধন্য ষ, আবার মনস্কাম, সংস্কার, স্কন্ধ প্রভৃতিতে দন্ত্য স ব্যবহৃত হইল। পবর্গেও ঐরূপ, যথা—দুষ্প্রাপ্য, নিষ্পত্তি, নিস্পৃহ, শষ্প, শস্প, স্পর্শ, স্পন্দন, স্পষ্ট ইত্যাদি। অন্য বর্ণে, যথা—প্রশ্ন, স্নান, কৃষ্ণ ইত্যাদি। আমরা কি 'ত'বর্ণের উপর তালব্য শ বসাইয়া তাহার উচ্চারণ করিতে পারি না?—অবশ্য পারি, কিন্তু তাহা দুরূহ। 'চ'র উপর দন্ত্য স বসাইয়া কি স্চ বলিতে পারি না?—পারি, কিন্তু এইপ্রকার উচ্চারণ আয়াসসাধ্য, সুতরাং অস্বাভাবিক এবং ভাষার মাধুর্য্য-নাশক। এই কারণে ঋষিগণ বিভিন্ন স্থানে প্রয়োগ নিমিত্ত শকারাদি ত্রিবর্ণের সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব তালব্য শ এবং মূর্দ্ধন্য ষকারের উচ্চারণ প্রায় একপ্রকার হইলেও এক নহে এবং তাহাদের উভয়েরই প্রয়োজন আছে। এই সকল বিষয় পর্য্যালোচনা না করিয়া অনেকে বলেন, 'শকারাদি তিনটি বর্ণের প্রয়োজন কি? উহারা ত একই, উহাদের মধ্যে একটি থাকিলেই হয়!'

শকারাদি ত্রিবর্ণের উৎপত্তিস্থানানুসারে যেপ্রকার উচ্চারণ স্বাভাবিক, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে এবং তাহাই যে উহাদের প্রকৃত উচ্চারণ, তদ্বিষয়ে কোন সংশয় করার কারণ দেখিতেছি না। কিন্তু পশ্চিমদেশে মূর্দ্ধন্য ষ-কারের উচ্চারণ কোন কোন স্থলে 'খ'র ন্যায় করিয়া থাকে। কেবল করিয়া থাকে এমন নহে, ইহা ব্যাকরণে পর্য্যন্ত বিধিবদ্ধ হইয়াছে। ব্যাকরণে শ, ষ, স, এই ত্রিবর্ণের বৈদিক উচ্চারণ শ, খ, ছ, এইরূপ বিধি ব্যবস্থিত হইয়াছে। অতএব কোথায় ষ, আর কোথায় খ, ইহা এক অতি প্রয়োজনীয় আলোচ্যবিষয়। এক বর্ণের এইরূপ বিভিন্ন উচ্চারণ কখনই হইতে পারে না। ইহাদের মধ্যে একটি প্রকৃত উচ্চারণ এবং অন্যটি যে তাহার বিকৃতি, তাহার সন্দেহ নাই। অতএব কোন্‌টিকে প্রকৃত বলিব? 'ষ'র উচ্চারণ মূর্দ্ধা হইতে এবং 'খ'র উচ্চারণ কণ্ঠ হইতে। মূর্দ্ধোৎপন্ন যে বর্ণ, সে কখনই কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইতে পারে না। যদি বলা যায় যে, ঠিক 'খ' নহে, ইহা যখন অন্তস্থবর্ণমধ্যে আছে, তখন ইহা ঠিক বর্গীয় 'খ'র ন্যায় হইতে পারে না। যদি বলি যে, অন্তস্থ ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণে যেমন কোন দুইটি উচ্চারণযন্ত্রের সম্পূর্ণ সংঘাত না হইয়া আংশিক স্পর্শমাত্র হয়, 'খ'কে সেই-প্রকার করিয়া পারস্যদেশীয় 'খে'র ন্যায় উচ্চারণ করিলে যেরূপ হয়, 'ষ'র উচ্চারণ সেইপ্রকার, তাহা হইলেও তাহার উচ্চারণ কণ্ঠ্য ভিন্ন মূর্দ্ধন্য কখনই হইতে পারে না।

ষকারকে মূর্দ্ধন্য নাম দিয়া 'খ' কিংবা প্রায় খ অথবা আংশিক 'খ'র ন্যায় উচ্চারণ করা কখনই সঙ্গত হইতে পারে না। এই অসঙ্গতি-দোষ পরিহারপূর্ব্বক উচ্চারণ করিতে গেলে ষকারের উচ্চারণ তাহার বঙ্গীয় উচ্চারণ ভিন্ন অন্যকোনপ্রকার হইতে পারে না।

ষকারের এই উচ্চারণবৈষম্যের কারণ নির্দ্দেশ করা কঠিন, তবে এইমাত্র বলা যায় যে, ভাষাতত্ত্বের আলোচনা করিতে করিতে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, আর্য্যগণ ভারতবর্ষে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন পথে সমাগত হইয়াছিলেন। লোকের ধারণা এইরূপ যে, যেন তাঁহারা ঠিক এক সময়ে এক দেশ হইতে এক সঙ্গে এক সম্প্রদায়ে এদেশে আসিয়াছিলেন, এবং এক পথে যাতপাথর-(Rolling stone)-এর ন্যায় গড়াইতে গড়াইতে আদিমবাসীদিগকে দলিত করিয়া পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে ক্রমে বিস্তৃত হইয়াছিলেন। ভাষাতত্ত্বের আলোচনা করিয়া আমাদের সেই বিশ্বাস বিদূরিত হইয়াছে। দেশকালপাত্র-বিশেষে উচ্চারণের বৈষম্য ঘটে। শকারাদি বর্ণের উচ্চারণবৈষম্যের তাহাই কারণ বোধ হইতেছে। আর দেখিতেছি, (১) উচ্চারণ-ব্যতিক্রমের নিয়মানুসারে 'স'-স্থানে হ হয় এবং গ্রীস্, পারস্য ও বঙ্গদেশের পূর্ব্বাংশে এইপ্রকার উচ্চারণ প্রচলিত আছে। (২) আবার দেখিতে পাই, খ, ঘ, থ, ভ ইত্যাদি সকল মহাপ্রাণ বর্ণের স্থানেই 'হ' হইয়া থাকে, তাহার মৌলিক কারণ পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে। (৩) আরও দেখিতে পাই, 'হ'-স্থানে কচিৎ 'খ' উচ্চারণ হয়। কারণ, ঐ দুই বর্ণের উচ্চারণ-স্থান এক। যেমন ইঅ বলিতে বলিতে 'জ'র ন্যায় উচ্চারণ হইয়া পড়ে, তেম্‌নি 'হ' বলিতে বলিতে 'খ'র ন্যায় হইয়া পড়ে। 'হ'-স্থানে ঘ, থ, ভ প্রভৃতি অন্য কোন মহাপ্রাণ বর্ণ হইতে পারে না, কেবলমাত্র 'খ'ই হইতে পারে এবং হইয়া থাকে। পূর্ব্ববঙ্গে যাত্রার দলে ছেলেরা মহারাজ বলিতে মখারাজ বলে, ইহা ঠিক 'খ' নহে, পারস্যদেশীয় 'খে'র ন্যায় উচ্চারিত হয়। এইপ্রকারে পুরুষ=পুরুহ=পুরুখ। অর্থাৎ 'খ' মূর্দ্ধন্য 'ষ'র উচ্চারণব্যতিক্রম মাত্র। ইহা প্রকৃত উচ্চারণ নহে।

ভারতবর্ষ একটি মহাদেশ। আর্য্যগণ বিভিন্ন সম্প্রদায়ে নানা স্থান হইতে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এ-দেশে আসিয়া পৃথক্ পৃথক্ রাজ্য স্থাপনপূর্ব্বক এতকাল স্বতন্ত্রভাবেই বাস করিতেছিলেন। তখন বাষ্পীয় যান, বাষ্পীয় পোত, টেলিগ্রাফ প্রভৃতি ছিল না ; সুতরাং দূরতাবশত তাঁহারা পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবেই বাস করিতেছিলেন। এখন সেদিন নাই, সে দূরতা তিরোহিত হইয়া ভারতীয় আর্য্যগণ এক হইয়াছেন। এখন তাঁহাদের ভাষাবৈষম্যের কারণসকল নির্ম্মূলিত করিয়া সর্ব্বসম্মত বিশুদ্ধভাষার পরিচালন আবশ্যক। এখন কেহ ছিওরাম, কেহ শিবরাম বলিলে চলিবে না। পূর্ব্বে আমরা বঙ্গদেশে বসিয়া বাঙালীর সঙ্গে কথা বলিতাম, তাহাতে উচ্চারণদোষ হইলে কেহ ধরিবার লোক ছিল না। বাঙালী বক্তা, বাঙালী শ্রোতা তখন ছ-স্থানে স বলুক কিংবা স-স্থানে ছ বলুক, শ্রোতা-বক্তা দুই-ই যখন একভাষী, তখন তাহা কে ধরিয়াছে? এখন দেশের অবস্থা অন্যরূপ, এখন অশুদ্ধোচ্চারণ করিলে

পশ্চিমবাসিগণ আমাদের কথা বুঝিতে পারেন না এবং আমরা তাঁহাদের কথা বুঝিতে পারি না। ইহা একত্র বাসের প্রধান অন্তরায়।

ক্ষ।

ব্যঞ্জনবর্ণের শেষ অক্ষর হ, তাহার উচ্চারণ সর্ব্বত্রই সমান, ইহাতে কোন বৈষম্য নাই এবং ইহার বিশুদ্ধতার প্রতিও কোন সংশয় নাই। ক্ষ একটি যুক্তবর্ণ, ইহা ক এবং ষ এই বর্ণদ্বয়ের সংযোগে হইয়াছে। পূর্ব্বে দেখান গিয়াছে যে, 'ষ'র একপ্রকার উচ্চারণ 'খ' আছে; তদনুসারে 'ক্ষ'র উচ্চারণ 'ক'র নীচে 'খ' দিলে যাহা হয়, তাহাই এবং আমরা সেইরূপ উচ্চারণই করিয়া থাকি। ইতিপূর্ব্বে আরও বলিয়া আসিয়াছি যে, পশ্চিমে কোন কোন স্থানে 'ষ'কে 'ছ'র ন্যায় উচ্চারণ করিয়া থাকে, এইজন্য সে দেশে কোন কোন স্থলে 'ক্ষ'কে 'ক'র নীচে 'ছ' দিলে যেপ্রকার উচ্চারণ হয়, সেইপ্রকার উচ্চারণ করে; যথা—লক্ষ্মী=লক্‌ছ্‌মী। কেহ বা তাদৃশ উৎকট উচ্চারণ করিতে অক্ষম হইয়া 'লক্ষ্মী-লক্ষ্মণ'-স্থানে 'ক' লোপ করিয়া লছ্‌মী-লছ্‌মন বলিয়া থাকে। এস্থলে ক্ষ=ছ। অতএব 'ক্ষ'র প্রচলিত উচ্চারণ ত্রিবিধ, যথা—ক্‌খ, ক্‌ছ এবং ছ। কিন্তু প্রকৃত উচ্চারণ ক্‌ষ। লক্ষ্মী=লক্‌ষ্মী। কেহ মনে করিতে পারেন যে, এই উচ্চারণ-বৈষম্যে বিশেষ ক্ষতি কি আছে? এইজন্য দুইটি উদাহরণ দিতেছি।

১। ক্ষত্রিয় একটি শব্দ, ইহাকে উক্ত-প্রকার-বৈষম্যহেতু কোন প্রদেশে ক্ষত্রিয়, কোন প্রদেশে ছত্রিয় উচ্চারণ করিয়া থাকে। ক্রমে ক্ষত্রিয় এবং ছত্রিয় দুইটি শব্দ যে এক, ইহা ভুলিয়া-গিয়া লোকে এখন মনে করে, ক্ষত্রিয় এবং ছত্রিয় দুইটি বিভিন্ন জাতি। এক্ষণে যে প্রদেশে ক্ষত্রিয় বলে, তথায় অনেক ছত্রিয়-বাদী দেশের লোক আসিয়া বাস করিয়াছে এবং ছত্রিয়বাদী দেশেও ক্ষত্রিয়বাদী দেশের অনেক লোক আসিয়াছে, তথাপি তাহাদের নামের সেই বৈষম্যহেতু তাহারা বিভিন্নজাতি বলিয়া পরিগণিত।

২। উচ্চারণবৈষম্যের দোষ কতদূর গুরুতর হইতে পারে, তাহার দ্বিতীয় উদাহরণ দেখুন। পূর্ব্বে দেখান গিয়াছে যে, 'দ'-স্থানে অনেকসময় 'জ' উচ্চারণ হয় এবং 'ধ'-স্থানে ঝ হয়, যথা,—সজ্জ=সাজ, মধ্য=মাঝ, মাদুর=মাজুর ইত্যাদি। এইজন্য বৈদ্যকে বৈজ এবং বৈদ্য-নাথকে বৈজনাথ বলে। দেবগড়ে যে বৈদ্য-নাথ-শিব প্রতিষ্ঠিত আছেন, তাঁহাকে আমরা বৈদ্যনাথ বলি, পশ্চিমে বৈজনাথ বলে। বৈদ্য বা বৈজ অর্থে চিকিৎসক। চিকিৎসকের পরম গুরু যিনি, তাঁর নাম বৈদ্যনাথ, তিনি শিব। কিন্তু দকারের যে 'জ'র ন্যায় উচ্চারণ হয়, তাহা না জানিয়া বৈজনাথশব্দের ব্যুৎপত্তি-সাধন করিতে যাইয়া কোন মহাত্মা এক অপূর্ব্ব গল্পের অবতারণা করিয়াছেন। তাহা এই—"বৈজুনামে জনৈক সাঁওতাল বড় দুরাত্মা ছিল। সে প্রতিদিন উক্ত শিবের মস্তকে সম্মার্জ্জনীপ্রহার না করিয়া জলগ্রহণ করিত না। এই কার্য্যে তাহার কদাপি বিস্মৃতি বা তাচ্ছল্য ঘটে নাই। একদিন যে তাঁহার পূজা করিত, সে আসে নাই, ঠাকুর উপবাস করিয়া আছেন, এমনসময় বৈজু আসিয়া তাঁহার মস্তকে নিয়মিত সম্মার্জ্জনী প্রহার

করিতেছে। তখন শিব উহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, 'বৈজু, তুই আমার প্রিয়পাত্র, তুই আমাকে পূজা কর্। আমার পূজকগণ আমার প্রতি ভক্তিমান্ হইয়াও প্রায়ই আমার পূজা করিতে ভুলিয়া যায়, অথবা তাচ্ছল্য করে, কিন্তু তুই তোর কাজ একদিনের তরেও ভুলিয়া যাস্ না। অতএব তুই আমার নিকট ইচ্ছামত বর-গ্রহণ কর্ এবং এখন হইতে আমাকে নিয়মমত পূজা কর্।' তদবধি বৈজু ঠাকুরের সেবক হইল এবং ঠাকুরের নাম বৈজনাথ হইল।" এখন দেখুন 'দ'-স্থানে জ হয়, কেবলমাত্র এই কথাটি না জানাহেতু কতবড় এক কাল্পনিক ইতিহাসের সৃষ্টি হইয়াছে। উচ্চারণব্যতিক্রমের নিয়মানুসারে কোন্ বর্ণের স্থানে কোন্ বর্ণ হয়, তাহার জ্ঞান থাকা উল্লিখিত কারণে একান্ত আবশ্যক এবং উচ্চারণবৈষম্যের এই-প্রকার দোষ।

শ্রীশ্রীনাথ সেন।

রাজতপস্বিনী।

[জীবনীপ্রসঙ্গ]

৮

এই জীবনীপ্রসঙ্গমধ্যে এমন অনেক কথা বলিতে হইতেছে, যাহা ইহার ক্ষুদ্র লেখকের জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে অথবা নিতান্ত শৈশবে সংঘটিত। যাঁহাদের কৃপায় সে সকল বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, আমার পিতৃদেব (মহারাণীর দেওয়ান *) তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। তিনি দীর্ঘকাল রাজসংসারের পেন্‌শন্ ভোগ করিয়া একাশীবৎসর বয়সে সম্প্রতি (গত ৮ই কার্ত্তিক) স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। মহারাণীমাতার স্বামী রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ যখন নাবালক এবং কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের তত্ত্বাবধানাধীন, তখন হইতে বরাবর তিনি প্রথমে ম্যানেজার ও পরে দেওয়ানরূপে পুটিয়ার বিখ্যাত ষ্টেটের সহিত ঘনিষ্ঠসম্বন্ধ ছিলেন। কেবল রাজার পরলোকগমনের পর কয়-বৎসর অন্যত্র কর্ম্মগ্রহণ করিতে বাধ্য হন। ইহার কারণ, বিষয় পুনরায় কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের অধীন হইলে নাবালিকা রাণীর পিতা বাবু ভৈরবনাথ সান্যাল অবৈতনিক ম্যানেজার নিযুক্ত হইলেন। পিতা ও কন্যার ইচ্ছা এবং আগ্রহ ছিল যে, পিতৃদেব প্রধান-পদে থাকিয়া যান, কিন্তু ভৈরবনাথবাবু তাঁহার সমবয়স্ক ও বন্ধু বলিয়া কার্য্যক্ষেত্রে কোনরূপ অধীনতা তিনি বাঞ্ছনীয় মনে করেন নাই। সে যাহা হউক্, রাজার বয়স যখন ১১।১২বৎসর, তখন ছয়বৎসরমাত্র-বয়স্কা শরৎসুন্দরীর সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। ইহার অল্পদিন পরে রাজার মাতা

* ৺ প্রসন্নকুমার মজুমদার মহাশয়।

রাণী দুর্গাসুন্দরী ইহলোক ত্যাগ করেন এবং প্রায় দুইবৎসর পরে গবর্মেণ্ট পিতৃদেব-মহাশয়কে ষ্টেটের অছি ম্যানেজার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এইরূপে তিনি অপত্যবৎ স্নেহ এবং যত্নে এই প্রভু শিশুদম্পতির রক্ষণা-বেক্ষণ করিবার অবসর লাভ করিয়াছিলেন। যদিও দুইটা ষ্টেটের—চারি-আনির ও পাঁচ-আনির—কর্তৃত্বভার পিতৃদেবের হস্তে ছিল, রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ সাবালক হইয়া অনুরোধ করিলে তিনি আহ্লাদের সহিত তাঁহার দেওয়ানী গ্রহণ করিলেন। ইহাতেই বুঝা যাইবে, মহারাণীমাতা চিরদিন কেন তাঁহাকে পিতৃবৎ সম্মান করিতেন।

মহারাণী তাঁহার অতুলনীয় পবিত্রজীবনে যে সকল লোকহিতকর কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, দীর্ঘকাল কর্ম্মসূত্রে আমার পিতৃ-দেবকে অবশ্যই তাহার সহায়তা করিতে হইয়াছিল। সুতরাং আজ তদীয় পরলোক-গমন উপলক্ষে বিশেষভাবে যে দুইএকটি কথার উল্লেখ করিতেছি, তাহা ভরসা করি পুত্রের পিতৃস্মৃতির অর্চ্চনামাত্র বলিয়া কেহ অপ্রাসঙ্গিক মনে করিবেন না।

কবি বিদ্যাপতি বলিয়াছেন—

> সুন্দর কুলশীল, ধনী, বরযুবক,
> কি করব লোচনহীনে।
> কি করব জপতপ, দানব্রত নৈষ্টিক
> যদি করুণা নহি দীনে।

মহারাণীমাতা জীবনে অনুদিন যেমন জপতপ, দানব্রত, নিষ্ঠাচারে রত ছিলেন, দীন-জনের প্রতি তাঁহার করুণা সেইরূপ সর্ব্ব-ব্যাপিনী, অতলস্পর্শিনী ছিল, ইহা নূতন করিয়া বলিতে হইবে না। এই দীনজনের প্রতি করুণা দেওয়ানজির চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল। রামপুর বোয়ালিয়ায় (রাজশাহীতে) ম্যানে-জারির আমলে তিনি দীর্ঘকাল অকাতরে স্কুলের বালক হইতে অল্পবেতনের আমলা ও দুঃস্থ সকল শ্রেণীর ন্যূনাধিক দুইশত লোককে নিত্য যে অন্নদান করিতেন, ইহা আমার জন্মের পূর্ব্বেকার কথা। ফলত তিনি ও তাঁহার প্রতিবাসী এবং পরমসুহৃদ্ দীননাথ সিংহ মহাশয় প্রাত্যহিক অন্নদানব্যাপারে এরূপ মুক্তহস্ত ছিলেন যে, রাজশাহীতে তাঁহা-দের কথা প্রবাদ হইয়া আছে। সিংহমহাশয় আমার পিতামহের বন্ধু ছিলেন এবং পিতৃদেব তাঁহাকে পিতৃব্যবৎ জ্ঞান করিতেন। বাল্য-কালে এই দীর্ঘ সৌম্যমূর্ত্তি পরহিতরত মহা-ত্মাকে সর্ব্বদা দেখিতাম। তাঁহার যেমন দয়া, তেম্‌নি মধুর সৌজন্য ছিল। কাহারও উপর কখন বড় রাগ করিতেন না, একবার কেবল একজনের কদাচারে রুষ্ট হইয়া বিরক্তিপ্রকাশ করিয়াছিলেন। সে লোকটি কাছে বসিয়া-ছিল, বলিল, "মহাশয়, বলি, সবারই পক্ষে আপুনি দীননাথ, আর আমার পক্ষেই সিঙ্গী!" তাঁহার এক বন্ধুপুত্র—সম্বন্ধে নাতি—জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আচ্ছা ঠাকুরদাদা, আপনি জমাখরচ রাখেন না কেন?" আদরে প্রশ্ন-কর্ত্তার পিঠ চাপ্‌ড়াইয়া ঠাকুরদাদা উত্তর করিলেন, "ভাই, জমাখরচ রাখিলে যে টাকার উপর মায়া হয়!" এই মহাত্মার এবং পিতৃ-দেবের বোয়ালিয়ার কার্য্য যাহা দেখিয়াছি, তাহা আমার ভাল মনে পড়ে না, কিন্তু আমা-দের পুটিয়ার বাসার নিত্য লোকসমারোহ ভুলিবার নহে। মহারাণীমাতার নিকট দান-লিপ্সু অথবা কাজকর্ম্মপ্রার্থী যে সকল লোক

আসিত, পিতৃদেব নিজের সাধ্যমত এবং পরম সমাদরে বরাবর তাহাদের আতিথ্যসৎকার করিতেন। আহারাদিবিষয়ে আমাদের সহিত এই সব অতিথির কোন পার্থক্য থাকিত না এবং অনেকসময় এরূপ ভিড় হইত যে, আমাদের পাঠগৃহ পর্য্যন্ত তাঁহারা দখল করিয়া বসিতেন।

এই সংখ্যায় মহারাণীর কথা যাহা লিখিত হইল, তাহার অধিকাংশ পিতৃদেবের কাছে শুনিয়াছি।

পুঠিয়াগ্রামে গোপীনাথ সান্যাল মহাশয় একজন বিশেষ ক্ষমতাশালী লোক ছিলেন। চারি-আনির রাণী সূর্য্যমণি দেবী তাঁহার সহোদরা ভগিনী। তাঁহার দ্বারা অবশ্য সান্যালমহাশয়ের অনেকরূপ সাহায্য হইত। কিন্তু তিনি যেরূপ বুদ্ধিমান্ ও কার্য্যক্ষম ছিলেন, রাণীর সহায়তা না পাইলেও তাঁহার উন্নতির কোন প্রতিবন্ধক ঘটিত না। জমিদারা এবং পত্তনীতে ক্রমশ তিনি পাঁচিশহাজারটাকা লাভের সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, এবং দোলদুর্গোৎসবাদি ক্রিয়াকলাপে বিস্তর ব্যয় করিতেন। সর্ব্বাপেক্ষা অতিথিসেবায় তাঁহার বড় প্রীতি ছিল। তাঁহার দুই পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াই মারা যান, কনিষ্ঠপুত্র ভৈরবনাথ সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হইয়া পিতার যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ ও অতিথিসেবা স্থির রাখিয়াছিলেন। মহারাণী শরৎসুন্দরী তাঁহারই জ্যেষ্ঠা কন্যা, কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীসুন্দরী তাঁহার জন্মের বারবৎসর পরে ভূমিষ্ঠা হন। পিতার দেবোত্তরসম্পত্তির তিনিই এক্ষণে সেবায়েৎ।

সন ১২৬৫ সালের ২৩শে আশ্বিন মহারাণী জন্মগ্রহণ করেন। শিশুকালাবধি তিনি বড় শান্ত ও সুশীলা ছিলেন, ভারি বুদ্ধিমতী কিন্তু ধীরবুদ্ধি। অন্দরমহলে মেয়েদের কাছেই থাকিতে ভালবাসিতেন। পিতার যত্ন এবং চেষ্টায় কখন কখন বহির্ব্বাটীতে আসিলেও বেশীক্ষণ থাকিতে পারিতেন না। সেখানে পিতা প্রজাদের উপর ধমক-চমক করিলে কাঁদিতে কাঁদিতে ভিতরে পলাইতেন। একবার একজন প্রজা গুরুতর অপরাধ করায় সান্যালমহাশয়ের আদেশে প্রহৃত হইল। দেখিয়া পঞ্চমবর্ষীয়া শরৎসুন্দরী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, সেই অবধি তিনি আর বাহিরের বাটীতে আসিতেন না। একটু বেশী বয়সে হাঁটিতে শেখেন। হাঁটিতে শিখাইবার জন্য চাকরেরা তাঁর প্রিয়খাদ্য কমলালেবুর লোভ দেখাইত।

গর্ভে ধরিয়া সাতবৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহার পিতামহীর তিনি বড় স্নেহপাত্রী ছিলেন। পিতামহী মাধবপুরের ভাদুড়ীদের কন্যা, পিত্রালয় হইতে কিছু বিষয় পাইয়াছিলেন। তিনি ভারি তেজস্বিনী ছিলেন এবং রাজবাটীতে পৌত্রীর বিবাহ দিতে কিছুতে ইচ্ছুক ছিলেন না। বরং, বিবাহ হইল এই দুঃখে কিছুদিন পরে তাঁহার মৃত্যু হয়। অনিচ্ছার কারণ, এক জেলে গণক গণনা করিয়া বলিয়াছিল যে, অত্যল্প বয়সে শরৎসুন্দরীর বৈধব্য ঘটিবে। মহারাণীমাতা গল্প করিতেন যে, তাঁহার প্রতি তাঁর স্নেহের সীমা ছিল না এবং শৈশবে তিনি পিতামহীকে "ছাওয়াল" বলিতেন। রাজবাটীর ঠাকুরাণীরা বিবাহের পর শিশুদম্পতিকে লইয়া সেকালের প্রথামত খুব কৌতুক করিতেন। বালিকা স্বামীকে বলিতেন,

"লাল পাত্র।" ঠাকুরাণীরা তামাসা করিতেন, "এই তোমার বাপ!" ইত্যাদি। শরৎসুন্দরী প্রথমে বিশ্বাস করিতেন, পরে শরার পরীক্ষা করিতে করিতে পিতার দেহের চিহ্নবিশেষ দেখিতে না পাইয়া মাটীতে পাড়িয়া কাঁদিতেন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে জ্ঞান হারাইতেন। বালক রাজা ঠাকুরাণীগণের উপর বিরক্ত হইয়া ওরূপ করিতে নিষেধ করিতেন। মহারাণীর শৈশবে স্থিরবুদ্ধির উদাহরণস্বরূপ তাঁর প্রাচীনা পরিচারিকাদের বলিতে শুনিয়াছি, বিবাহের পর কাহারও নির্দ্দেশ ব্যতীত তিনি অনেকগুলি মহিলার ভিতর হইতে শাশুড়ীকে চিনিয়া প্রণাম করিয়াছিলেন। বিবাহ রাজবাটীতে হইয়াছিল। পরদিন প্রত্যুষে বালিকা স্নেহময়ী পিতামহীকে মনে করিয়া বলিয়াছিলেন, "রাত ত পোহাল, কিন্তু আমার "ছাওয়ালের" রাত ত থাকিয়া গেল।" পিত্রালয়ের দাসীদের বস্ত্রাদিতে রাজবাটীতে নিক্ষিপ্ত চুনহলুদের লাল রং দেখিয়া রক্ত ভাবিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়াছিলেন—"উহাদের মারিয়া রক্ত পাড়াইয়াছে।"

১০।১১বৎসর বয়সেই মহারাণীর হিন্দুধর্ম্মের অনুষ্ঠানে অনুরাগ ও দীনদরিদ্রের প্রতি দয়া আত্মীয়স্বজনমধ্যে বিলক্ষণ পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল কুমার যোগেন্দ্রনারায়ণ এই সময়ে কলিকাতার ওয়ার্ডস্ ইনষ্টিটিউটে বিদ্যাশিক্ষার্থ প্রেরিত হইয়াছিলেন এবং রাজবাটীতে আত্মীয় অভিভাবিকা স্ত্রীলোক কেহ ছিলেন না। অতএব বালিকা রাণীকে পিত্রালয়ে থাকিতে হইত। পুটিয়ার রাজা জগৎনারায়ণ ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী রাণী ভুবনময়ী দেবী কাশীধামে যে শিবমন্দির ও ছত্রের স্থাপনা করিয়াছিলেন, তাহার বন্দোবস্ত খরচপত্র কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের পক্ষ হইতে প্রদত্ত হইত না। শরৎসুন্দরী তখন নিতান্ত বালিকা হইলেও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাঁহাকে কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস্ হইতে খোরপোষ্ বলিয়া যে টাকা দেওয়া হয়, তাহার দ্বারা কাশীতে দেবসেবাদির ব্যয়নির্ব্বাহ হইবে। ইহা ছাড়া, তিনি যে সব নজর পাইতেন, তাহাও কখন নিজে রাখিতেন না, কাশীর খরচ জন্য পাঠাইয়া দিতেন।

ছেলেবেলায় রাজা রাণীর সঙ্গে খেলা করিতেন এবং তাঁহাকে বড় ভালবাসিতেন। কিন্তু সাবালক হওয়ার পর প্রথমযৌবনে এই স্নেহ স্থির ছিল না। সে সময়ে পাশ্চাত্যসভ্যতার নবীন অভ্যুদয়, দেশীয় সংস্কারমাত্রই বিলাতী বন্যায় ভাসিয়া যাইতেছিল। তখন বাঙলার অন্যান্য স্থানের ন্যায় রাজশাহীর ভদ্রসমাজেও স্ত্রীশিক্ষার চলন ছিল না। স্ত্রীলোকে লেখাপড়া শিখিলে অল্পবয়সে বিধবা হয়, এই কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া মহারাণীর পিতা তাঁহাকে আদৌ বিদ্যাভ্যাস করিতে দেন নাই। যোগেন্দ্রনারায়ণ ১২৬৬ সালের ফাল্গুনমাসে যখন সাবালক হইয়া বিষয়ভার গ্রহণ করিলেন, শরৎসুন্দরী তখন ত্রয়োদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। তিনি পিতৃদেবের নিকট দুঃখপ্রকাশ করিলেন যে, রাণীকে শিক্ষিতা করিবার কোন বন্দোবস্ত করা হয় নাই। সেই অবধি তাঁহার পড়াশুনার ব্যবস্থা হইল এবং ছয়মাসের ভিতর তিনি একরূপ লিখিতে পড়িতে শিখিলেন।

কিন্তু শুধু বিদ্যাশিক্ষাই যথেষ্ট নহে। স্ত্রীকে পুরামাত্রায় মেম সাজাইতে না পারিলে

সেকালে শিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত যুবকদের মন উঠিত না। লক্ষ্মী, সীতা, সাবিত্রীর ছায়াশ্রিতা হিন্দুসহধর্ম্মিণীর প্রেমপূর্ণ হৃদয় উপেক্ষা করিয়া তাঁহারা পাশ্চাত্য পৌরুষভাব-প্রধান স্ত্রীসমাজের পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং গৃহিণীগণ সেই আদর্শ সফলীকৃত করিতে না পারিলে সংসার আঁধার দেখিতেন। ওয়ার্ডস্ ইন্‌ষ্টিটিউটের বিলাতীভাবপুষ্ট নবীন যুবক রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণের ঠিক সেই দশা হইয়াছিল। তাঁহার ইচ্ছা, রাণী তাঁর সহিত অনেকের সমক্ষে কথা কন, লজ্জাশীলা তাহা পারিতেন না। হিন্দুধর্ম্মের নিষিদ্ধ আহারাদি করাইবার চেষ্টাও হইত; বলা বাহুল্য, তাহা বিফল হইয়াছিল। মাঝে মাঝে স্বামী প্রকাণ্ড দর্পণ সমক্ষে রাখিয়া কিশোরী বধূকে মেমদের হাবভাব শিখাইবার যত্ন পাইতেন, কিছুতেই লজ্জা ভাঙিত না। রাণীর অশ্রুধারা বহিত, কিছুতে বিনত চক্ষু উঠাইতেন না। রাজ্য বিষয়ের ভারগ্রহণ করার কিছুদিন পরেই নীলকর সাহেবদিগের সঙ্গে রাজশাহীস্থ অনেক জমিদার ও বহুসংখ্যক প্রজার বিবাদ উপস্থিত হইল। যোগেন্দ্রনারায়ণ ইহাতে একজন নেতা ছিলেন এবং স্থানীয় রাজকর্ম্মচারীদের দ্বারা বিচারপ্রাপ্তির সম্ভাবনা কম বুঝিয়া দৌরাত্ম্যনিবারণের উপায়বিধান জন্য দেওয়ান সঙ্গে কলিকাতায় আসিলেন। কিছুদিন পরে রাণীকেও তথায় লইয়া আসা হইল। রাজধানীতে সাবালক হওয়ার পর রাজার সেই প্রথম আগমন। দেখিতে দেখিতে কয়েকটি "বড়লোকের" সংসর্গে পড়িলেন এবং সংক্ষেপে, হিন্দুসমাজের চক্ষে যাহা-কিছু দূষণীয়, তাহাতে অভ্যস্ত হইলেন। ইহাতে বালিকা বড় ক্ষুণ্ণ হইতেন এবং প্রিয়দাসী অক্রূর দেওয়ানজিকে তাঁহার কষ্টের কথা প্রায়শ জানাইত। একদিন রাজার কেমন সখ হইল, নিজের ভুক্তাবশিষ্ট রাণীকে খাইতে বলিবেন এবং না খাইলে তাঁহাকে বিশেষরূপ শাসন করিবেন। তাহার পর পাচকব্রাহ্মণ-দ্বারা বহির্ব্বাটীতে ইচ্ছামত পাক করাইয়া অন্দরে আহার করিলেন ও পাত্রাবশিষ্ট স্ত্রীকে খাইতে বলিলেন। ত্রয়োদশবর্ষের বালিকা দৃঢ়তার সহিত উত্তর করিলেন, "আপনার ভোজনাবশিষ্ট আমি অবশ্য খাইব, কিন্তু আমার সাক্ষাতে এই অন্দরমধ্যে পাচিকা পাক করিয়া দিবে। তাহাই আপনি আহার করিলে খাইতে পারি। নচেৎ বাহিরের প্রস্তুত কিছুই আমি ছুঁইব না।" এই বিষয় লইয়া রাজার সহিত তাঁহার ঘোরতর তর্ক-বিতর্ক হইতে লাগিল এবং দাসীরা ভয় পাইল, পাছে কোন অবৈধ আচরণ হয়। দেওয়ানজির বাসা রাজবাটীর অতি সন্নিকটে ছিল এবং সেই সময়ে তিনি রাজবাটীতে উপস্থিত ছিলেন। সংবাদ পাইয়া তিনি একেবারে অন্দরমহলে প্রবেশ করিলেন এবং দাসীদের দ্বারা মহারাণীকে সরিতে বলিয়া রাজাকে তাঁহার রূঢ় ব্যবহারের জন্য অনেক উপদেশ দিলেন। সেই অবধি রাজা সহধর্ম্মিণীর প্রতি আর সেরূপ আচরণ করিতেন না।

এইরূপ অন্যায় ব্যবহারের কথা কখন কেহ মহারাণীর মুখে শুনিতে পায় নাই। কেবল পিতৃদেবের পেন্‌শনগ্রহণের দিন রোদন করিতে করিতে আমার সমক্ষে তিনি বলিয়াছিলেন, তাঁহার চিরদুঃখের কষ্টের জীবনে দেওয়ানজি চিরদিন হিতাকাঙ্ক্ষা

করিয়াছেন। স্বামীর স্মৃতি পরম ভক্তি-শ্রদ্ধার সহিত অনুদিন তিনি পূজা করিতেন। ইচ্ছা করিয়া কখন তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি দেখিতেন না, সমবয়স্কারা বা রহস্যসম্বন্ধের কেহ দেখাইলে মুখ আরক্ত হইয়া উঠিত, চক্ষু জলে পূর্ণ হইত। একদিন এক আত্মীয়া বলিতেছিলেন যে, "কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসে (ওয়ার্ডস্-ইন্‌ষ্টিটিউটে) থাকিতে রাজাকে কত কষ্ট করিতে হইয়াছিল, কত মাটী খুঁড়িতে হইয়াছিল (ইহা শিক্ষার বিষয় ছিল)। আহা! অত দুঃখের রাজ্য ভোগ হইল না।" শুনিয়া মার চক্ষু জলে ভরিয়া গেল।

শ্রী শ্রীশচন্দ্র মজুমদার।

ততঃ কিম্!

আহারসংগ্রহ ও আত্মরক্ষা করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে শিখিলেই পশুপাখীর শেখা সম্পূর্ণ হয়;—সে জীবলীলা সম্পন্ন করিবার জন্যই প্রস্তুত হয়।

মানুষ শুধু জীব নহে, মানুষ সামাজিক জীব। সুতরাং জীবনধারণ করা এবং সমাজের যোগ্য হওয়া, এই উভয়ের জন্যই মানুষকে প্রস্তুত হইতে হয়।

কিন্তু সামাজিক জীব বলিলেই মানুষের সব কথা ফুরায় না। মানুষকে আত্মারূপে দেখিলে সমাজে তাহার অন্ত পাওয়া যায় না। যাহারা মানুষকে সেইভাবে দেখিয়াছে, তাহারা বলিয়াছে, আত্মানং বিদ্ধি—আত্মাকে জান। আত্মাকে উপলব্ধি করাই তাহারা মানুষের চরমসিদ্ধি বলিয়া গণ্য করিয়াছে।

নীচের ধাপ বরাবর উপরের ধাপেরই অনুগত। সামাজিক জীবের পক্ষে শুদ্ধমাত্র জীবলীলা সমাজধর্ম্মের অনুবর্ত্তী। ক্ষুধা পাইলেই খাওয়া জীবের প্রবৃত্তি—কিন্তু সামাজিক জীবকে সেই আদিমপ্রবৃত্তি খর্ব্ব করিয়া চলিতে হয়। সমাজের দিকে তাকাইয়া অনেকসময় ক্ষুধাতৃষ্ণাকে উপেক্ষা করাই আমরা ধর্ম্ম বলি। এমন কি, সমাজের জন্য প্রাণ দেওয়া, অর্থাৎ জীবধর্ম্ম ত্যাগ করাও শ্রেয় বলিয়া গণ্য হয়। তবেই দেখা যাইতেছে, জীবধর্ম্মকে সংযত করিয়া সমাজধর্ম্মের অনুকূল করাই সামাজিক জীবের শিক্ষার প্রধান কাজ।

কিন্তু মানুষের সত্যকে যাহারা এইখানেই সীমাবদ্ধ না করিয়া পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে ইচ্ছা করে, তাহারা জীবধর্ম্ম ও সমাজধর্ম্ম উভয়কেই সেই আত্ম-উপলব্ধির অনুগত করিবার সাধনাকেই শিক্ষা বলিয়া জানে। এক কথায়, মানবাত্মার মুক্তিই তাহাদের কাছে মানবজীবনের চরমলক্ষ্য—জীবনধারণ ও সমাজরক্ষার সমস্ত লক্ষ্যই ইহার অনুবর্ত্তী।

তবেই দেখা যাইতেছে, মানুষ বলিতে যে যেমন বুঝিয়াছে, সে সেই অনুসারেই মানুষের শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তন করিতে চাহিয়াছে—কারণ, মানুষ করিয়া তোলাই শিক্ষা।

আমরা প্রাচীন সংহিতায় ছাত্রশিক্ষার যে

আদর্শ দেখিতে পাই, তাহা কবে হইতে এবং কতদূর পর্য্যন্ত দেশে চলিয়াছিল, তাহার ঐতিহাসিক বিচার করিতে আমি অক্ষম। অন্তত এইটুকু নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে, যাঁহারা সমাজের নিয়ন্তা ছিলেন, তাঁহাদের মনে শিক্ষার উদ্দেশ্য কি ছিল; তাঁহারা মানুষকে কি বলিয়া জানিতেন এবং সেই মানুষকে গড়িয়া তুলিবার জন্য কোন্ উপায়কে সকলের চেয়ে উপযুক্ত বলিয়া মনে করিয়াছিলেন।

সংসারে কিছুই নিত্য নয়, অতএব সংসার অসার, অপবিত্র এবং তাঁহাকে ত্যাগ করাই শ্রেয়, এইরূপ বৈরাগ্যধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা য়ুরোপে সাধুগণ মধ্যযুগে প্রচার করিতেন। তখন সন্ন্যাসিদলের যথেষ্ট প্রাদুর্ভাব ছিল। য়ুরোপের এখনকার ভাবখানা এই যে, সংসারটা কিছুই নয় বলিয়া মানুষের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির মধ্যে একটা চিরস্থায়ী দেবাসুরের ঝগড়া বাধাইয়া রাখিলে মনুষ্যত্বকে খর্ব্ব করা হয়। সংসারের হিতসাধন করাই সংসারীর জীবনের শেষ লক্ষ্য—ইহাই ধর্ম্মনীতি। এই ধর্ম্মনীতিকে প্রবলভাবে আশ্রয় করিতে গেলে সংসারকে মায়াছায়া বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলে না। এই সংসারক্ষেত্রে জীবনের শেষদণ্ড পর্য্যন্ত পূরাদমে কাজ করিতে পারাই বীরত্ব—লাগামজোতা অবস্থাতেই মরা অর্থাৎ কাজে বিশ্রাম না দিয়াই জীবন শেষ করা, ইংরেজের কাছে গৌরবের বিষয় বলিয়া গণ্য হয়।

সংসার যে অনিত্য এ কথা ভুলিয়া, মৃত্যু যে নিশ্চিত এ কথা মনের মধ্যে পোষণ না করিয়া, সংসারের সঙ্গে চিরন্তন-সম্বন্ধ-স্থাপনের চেষ্টা করায় য়ুরোপীয়জাতি একটা বিশেষ বল লাভ করিয়াছে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। ইহার বিপরীত অবস্থাকে ইহারা morbid অর্থাৎ রুগ্ণ অবস্থা বলিয়া থাকে। সুতরাং ইহাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য এই যে, ছাত্ররা এমন করিয়া মানুষ হইবে, যাহাতে তাহারা শেষ পর্য্যন্ত প্রাণপণবলে সংসারের কর্ম্মক্ষেত্রে লড়াই করিতে পারে। জীবনকে ইহারা সংগ্রাম বলিয়া জানে; বিজ্ঞানও ইহাদিগকে এই শিক্ষা দেয় যে, জীবিকার লড়াইয়ে যাহারা জেতে, তাহারাই পৃথিবীতে টিকিয়া যায়। একদিকে "চাইই চাই, নহিলেই নয়" মনের এই গৃধ্নু ভাবকে খুব সতেজ রাখিবার জন্য ইহাদের চেষ্টা, অপর দিকে মুঠাটাও ইহারা খুব শক্ত করিতে থাকে। আটঘাট বাঁধিয়া, রসারসি কষিয়া দশ আঙুল দিয়া ইহারা আঁটিয়া ধরিতে জানে। পৃথিবীকে কোনো অংশেই এবং কোনোমতেই ছাড়িব না, ইহাই সবলে বলিতে বলিতে মাটি কামড়াইয়া মরিয়া যাওয়া ইহাদের পক্ষে বীরের মৃত্যু। সব জানিব, সব কাড়িব, সব রাখিব, এই প্রতিজ্ঞার সার্থকতা সাধন করিবার শিক্ষাই ইহাদের শিক্ষা।

আমরা বলিয়া আসিয়াছি, "গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ"—মৃত্যু যেন চুলের ঝুঁটি ধরিয়া আছে, এই মনে করিয়া ধর্ম্মাচরণ করিবে। য়ুরোপের সন্ন্যাসীরাও যে এ কথা বলে নাই, তাহা নহে এবং সংসারীকে ভয় দেখাইবার জন্য মৃত্যুর বিভীষিকাকে তাহারা সাহিত্যে, চিত্রে এবং নানাস্থানে প্রত্যক্ষ করিবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু আমাদের প্রাচীন সংহিতার মধ্যে যে ভাবটা দেখা যায়, তাহার একটু বিশেষত্ব আছে।

সংসারের সঙ্গে আমার সম্বন্ধের অন্ত নাই,

এমন মনে করিয়া কাজ করিলে কাজ ভাল হয় কি মন্দ হয়, সে পরের কথা—কিন্তু ইহাতে সন্দেহ নাই যে, সে কথা মিথ্যা। সংসারে আমাদের সমুদয় সম্বন্ধেরই যে অবসান আছে, এত বড় সত্য কথা আর কিছুই নাই। প্রয়োজনের খাতিরে গালি দিয়া সত্যকে মিথ্যা বলিয়া চালাইলেও সে সমানে আপনার কাজ করিয়া যায়;—সোনার রাজদণ্ডকেই যে রাজা চরম বলিয়া জানে, তাহারও হাতে হইতে চরমে সেই রাজদণ্ড ধূলায় খসিয়া পড়ে; লোকালয়ে প্রতিষ্ঠালাভকেই যে ব্যক্তি একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া জানে, সমস্ত জীবনের সমস্ত চেষ্টার শেষে তাহাকে সেই লোকালয় একলা ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হয়। বড় বড় কীর্ত্তি লুপ্ত হইয়া যায় এবং বড় বড় জাতিকেও উন্নতির নাট্যমঞ্চ হইতে প্রদীপ নিবাইয়া-দিয়া রঙ্গলীলা সমাধা করিতে হয়। এ সব অত্যন্ত পুরাতন কথা, তবু ইহা কিছুমাত্র মিথ্যা নহে।

সকল সম্বন্ধেরই অবসান হয়, কিন্তু তাই বলিয়া অবসান হইবার পূর্ব্বে তাহাকে অস্বীকার করিলে ত চলে না। অবসানের পরে যাহা অসত্য, অবসানের পূর্ব্বে ত তাহা সত্য। যাহা যে পরিমাণে সত্য, তাহাকে সেই পরিমাণে যদি না মানি, তবে, হয় সে আমাদিগকে কানে ধরিয়া মানাইবে, নয় ত কোনোদিন কোনোদিক্ দিয়া সুদসুদ্ধ শোধ করিয়া লইবে।

ছাত্র বিদ্যালয়ে চিরদিন পড়ে না, পড়ার একদিন অবসান হয়ই। কিন্তু যতদিন বিদ্যালয়ে আছে, ততদিন সে যদি পড়াটাকে যথার্থভাবে স্বীকার করিয়া লয়, তবেই পড়ার অবসানটা প্রকৃত হয়,—তবেই বিদ্যালয় হইতে নিষ্কৃতি তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ হয়। যদি সে জোর করিয়া বিদ্যালয় হইতে অবসর লয়, তবে চিরদিন ধরিয়া অসম্পূর্ণ বিদ্যার ফল তাহাকে ভোগ করিতে হয়। পথ গম্যস্থান নয়, এ কথা ঠিক;—পথের সমাপ্তিই আমাদের লক্ষ্য, কিন্তু আগে পথটাকে ভোগ না করিলে তাহার সমাপ্তিটাই অসম্ভব হইয়া পড়ে।

তবেই দেখা যাইতেছে, জগতের সম্বন্ধগুলিকে আমরা ধ্বংস করিতে পারি না, তাহাদের ভিতর দিয়া গিয়া তাহাদিগকে উত্তীর্ণ হইতে পারি। অর্থাৎ সকল সম্বন্ধ যেখানে আসিয়া মিলিয়াছে, সেইখানে পৌঁছিতে পারি। অতএব, ঠিকভাবে এই ভিতর দিয়া যাওয়াটাই সাধনা—কোনো সম্বন্ধকে নাই বলিয়া বিমুখ হওয়াই সাধনা নহে। পথকে যদি বৈরাগ্যের জোরে ছাড়িয়া দাও, অপথে তবে সাতগুণ বেশি ঘুর খাইয়া মরিতে হইবে।

জর্ম্মান্ মহাকবি গ্যয়টে তাঁহার ফাউষ্ট নাটকে দেখাইয়াছেন—যে ব্যক্তি মানবপ্রবৃত্তিকে উপবাসী রাখিয়া সংসারের লীলাভূমি হইতে উচ্চে নিভৃতে বসিয়া জ্ঞানসংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত ছিল, সংসারের ধূলার উপরে বহুজোরে আছাড় খাইয়া তাহাকে কেমনতর শক্ত জ্ঞান লাভ করিতে হইয়াছিল। মুক্তির প্রতি অসময়ে অযথা লোভ করিয়া যেটুকু ফাঁকি দিতে যাইব, সেটুকু ত শোধ করিতেই হইবে, তাহার উপরে আবার ফাঁকির চেষ্টার জন্য দণ্ড আছে। বেশি তাড়াতাড়ি করিতে গেলেই বেশি বিলম্ব ঘটিয়া যায়।

বস্তুত গ্রহণ এবং বর্জ্জন, বন্ধন এবং বৈরাগ্য, এই দুটাই সমান সত্য—একের মধ্যেই অন্যটির বাসা, কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া

সত্য নহে। দুইকে যথার্থরূপে মিলাইতে পারিলেই তবে পূর্ণতা লাভ করিতে পারা যায়। শঙ্কর ত্যাগের এবং অন্নপূর্ণা ভোগের মূর্ত্তি—উভয়ে মিলিয়া যখন একাঙ্গ হইয়া যায়, তখনই সম্পূর্ণতার আনন্দ। আমাদের জীবনে যেখানেই এই শিব ও শিবানীর বিচ্ছেদ, যেখানেই বন্ধন ও মুক্তির একত্রে প্রতিষ্ঠা নাই, যেখানেই অনুরাগ ও বৈরাগ্যের বিরোধ ঘটিয়াছে সেইখানেই যত অশান্তি, যত নিরানন্দ। সেইখানেই আমরা লইতে চাই, দিতে চাই না; সেইখানেই আমরা নিজের দিকে টানি, অন্যের দিকে তাকাই না; সেইখানেই আমরা যাহাকে ভোগ করি, তাহার আর অন্ত দেখিতে পাই না,—অন্ত দেখিলে বিধাতাকে ধিক্কার দিয়া হাহাকার করিতে থাকি; সেখানেই কর্ম্মে আমাদের প্রতিযোগিতা, ধর্ম্মেও আমাদের বিদ্বেষ—সেখানেই কোনো-কিছুরই যেন স্বাভাবিক পরিণাম নাই, অপঘাতমৃত্যুতেই সমস্ত ব্যাপারের অকস্মাৎ বিলোপ।

জীবনটাকে না হয় যুদ্ধ বলিয়াই গণ্য করা গেল। এই যুদ্ধব্যাপারে যদি কেবল ব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করিবার বিদ্যাই আমাদের শেখা থাকে, ব্যূহ হইতে বাহির হইবার কৌশল আমরা না জানি, তবে সপ্তরথী ঘিরিয়া যে আমাদিগকে মারিবে। সেরূপ মরিয়াও আমরা বীরত্ব দেখাইতে পারি, কিন্তু যুদ্ধে জয় ত তাহাকে বলে না। অপর পক্ষে, যাহারা ব্যূহের মধ্যে একেবারে প্রবেশ করিতেই বিরত, সেই কাপুরুষদের বীরের সদ্গতি নাই। প্রবেশ করা এবং বাহির হওয়া, এই দুয়ের দ্বারাতেই জীবনের চরিতার্থতা।

প্রাচীন সংহিতাকারগণ হিন্দুসমাজে হরগৌরীকে অভেদাঙ্গ করিতে চাহিয়াছিলেন—বিশ্বচরাচর যে গ্রহণ ও বর্জ্জন, যে আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ, যে কেন্দ্রানুগ ও কেন্দ্রাতিগ, যে স্ত্রী ও পুরুষ ভাবের নিয়ত সামঞ্জস্যের উপর প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া সত্য ও সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে, সমাজকে তাঁহারা প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সকল দিকে সেই বৃহৎ সামঞ্জস্যের উপরে স্থাপিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। শিব ও শক্তির, নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তির সম্মিলনই সমাজের একমাত্র মঙ্গল, এবং শিব ও শক্তির বিরোধই সমাজের সমস্ত অমঙ্গলের কারণ, ইহাই তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন।

এই সামঞ্জস্যকে আশ্রয় করিতে হইলে প্রথমে মানুষকে সত্যভাবে দেখিতে হইবে। অর্থাৎ তাহাকে কোনো-একটা বিশেষ প্রয়োজনের দিক্ হইতে দেখিলে চলিবে না। আমরা যদি আম্রকে অম্বল খাওয়ার দিক্ হইতে দেখি, তাহা হইলে তাহাকে সমগ্রভাবে দেখি না; এইজন্য তাহার স্বাভাবিক পরিণামে বাধা ঘটাই; তাহাকে কাঁচা পাড়িয়া আনিয়া তাহার কশিটাকে মাটি করিয়া দিই। গাছকে যদি জ্বালানী কাঠ বলিয়াই দেখি, তবে তাহার ফলফুলপাতার কোনো তাৎপর্য্যই দেখিতে পাই না। তেম্নি মানুষকে যদি রাজ্যরক্ষার উপায় মনে করি, তবে তাহাকে সৈনিক করিয়া তুলিব, তাহাকে যদি জাতীয়সমৃদ্ধিবৃদ্ধির হেতু বলিয়া গণ্য করি, তবে তাহাকে বণিক্ করিবার একান্ত চেষ্টা করিব—এম্নি করিয়া আমাদের আবহমান সংস্কার অনুসারে যেটাকেই আমরা পৃথিবীতে সকলের চেয়ে

অভিলষিত বলিয়া জানি, মানুষকে তাহারই উপকরণমাত্র বলিয়া দেখিব ও সেই প্রয়োজন-সাধনকেই মানুষের সার্থকতা বলিয়া মনে করিব। এমন করিয়া দেখাতে কোনো হিত হয় না, তাহা নহে—কিন্তু সামঞ্জস্য নষ্ট হইয়া শেষকালে অহিত আসিয়া পড়ে—এবং যাহাকে তারা মনে করিয়া আকাশে উড়াই, তাহা খানিকক্ষণ ঠিক তারার মতই ভঙ্গী করে, তাহার পরে পুড়িয়া ছাই হইয়া মাটিতে পড়িয়া যায়।

আমাদের দেশে একদিন মানুষকে সমস্ত প্রয়োজনের চেয়ে কিরূপ বড় করিয়া দেখা হইয়াছিল, তাহা সাধারণে প্রচলিত একটি চাণক্যশ্লোকেই দেখা যায়—

ত্যজেদেকং কুলস্যার্থে গ্রামস্যার্থে কুলং ত্যজেৎ।
গ্রামং জনপদস্যার্থে আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ॥

মানুষের আত্মা কুলের চেয়ে, গ্রামের চেয়ে, দেশের চেয়ে, সমস্ত পৃথিবীর চেয়ে বড়। অন্তত কাহারও চেয়ে ছোট নয়। প্রথমে মানুষের আত্মাকে এইরূপে সমস্ত দেশিক ও ক্ষণিক প্রয়োজন হইতে পৃথক্ করিয়া তাহাকে বিশুদ্ধ ও বৃহৎ করিয়া দেখিতে হইবে, তবেই সংসারের সমস্ত প্রয়োজনের সঙ্গে তাহার সত্য-সম্বন্ধ, জীবনের ক্ষেত্রের মধ্যে তাহার যথার্থ স্থান, নির্ণয় করা সম্ভবপর হয়।

আমাদের দেশে তাই করা হইয়াছিল; শাস্ত্রকারগণ মানুষের আত্মাকে অত্যন্ত বড় করিয়া দেখিয়াছিলেন। মানুষের মর্য্যাদার কোথাও সীমা ছিল না, ব্রহ্মের মধ্যেই তাহার সমাপ্তি। আর যাহাতেই মানুষকে শেষ করিয়া দেখ, তাহাকে মিথ্যা করিয়া দেখা হয়—তাহাকে citizen করিয়া দেখ, কিন্তু কোথায় আছে city আর কোথায় আছে সে, cityতে তাহার পর্য্যাপ্তি নহে; তাহাকে patriot করিয়া দেখ, কিন্তু দেশেই তাহার শেষ পাওয়া যায় না, দেশ ত জলবিম্ব; সমস্ত পৃথিবীই বা কি!

ভর্ত্তৃহরি, যিনি এক সময়ে রাজা ছিলেন, তিনি বলিয়াছেন—

প্রাপ্তাঃ শ্রিয়ঃ সকলকামদুঘাস্ততঃ কিং
ন্যস্তং পদং শিরসি বিদ্বিষতাং ততঃ কিম্।
সম্পাদিতাঃ প্রণয়িনো বিভবৈস্ততঃ কিং
কল্পস্থিতাস্তনুভৃতাং তনবস্ততঃ কিম্॥

সকলকাম্যফলপ্রদ লক্ষ্মীকেই না হয় লাভ করিলে, তাহাতেই বা কি; শত্রুদের মাথার উপরেই না হয় পা রাখিলে, তাহাতেই বা কি; না হয় বিভবের বলে বহু সুহৃদ্ সংগ্রহ করিলে, তাহাতেই বা কি; দেহধারীদের দেহগুলিকে না হয় কল্পকাল বাঁচাইয়া রাখিলে, তাহাতেই বা কি!

অর্থাৎ এই সমস্ত কামনার বিষয়ের দ্বারা মানুষকে খাটো করিয়া দেখিলে চলিবে না, মানুষ ইহার চেয়েও বড়। মানুষের সেই যে সকলের চেয়ে বড় সত্য, যাহা অনাদি হইতে অনন্তের অভিমুখ, তাহাকে মনে রাখিলে তবেই তাহার জীবনকে সজ্ঞানভাবে সম্পূর্ণতার পথে চালনা করিবার উপায় করা যাইতে পারে। কিন্তু মানুষকে যদি সংসারের জীব বলিয়াই মানি, তবে তাহাকে সংসারের প্রয়োজনের মধ্যেই আবদ্ধ করিয়া ছোট করিয়া ছাঁটিয়া-কাটিয়া লই।

আমাদের দেশের প্রাচীন মনীষীরা মানুষের আত্মাকে বড় করিয়া দেখিয়াছিলেন, বলিয়া তাঁহাদের জীবনযাত্রার আদর্শ য়ুরোপের

সহিত স্বতন্ত্র হইয়াছে—তাঁহারা জীবনের শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত খাটিয়া মরাকে গৌরবের বিষয় মনে করেন নাই—কর্ম্মকেই তাঁহারা শেষলক্ষ্য না করিয়া কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মকে ক্ষয় করাই চরম সাধনার বিষয় বলিয়া জানিয়াছিলেন। আত্মার মুক্তিই যে প্রত্যেক মানুষের একমাত্র শ্রেয়, এ বিষয়ে তাঁহাদের সন্দেহ ছিল না।

য়ুরোপে স্বাধীনতার গৌরব সকল সময়েই গাওয়া হইয়া থাকে। এই স্বাধীনতার অর্থ আহরণ করিবার স্বাধীনতা, ভোগ করিবার স্বাধীনতা, কাজ করিবার স্বাধীনতা। এ স্বাধীনতা বড় কম জিনিষ নয়—এ সংসারে ইহাকে রক্ষা করিতে অনেক শক্তি এবং আয়োজন আবশ্যক হয়। কিন্তু প্রাচীন ভারতবর্ষ ইহার প্রতিও অবজ্ঞা করিয়া বলিয়াছিল—ততঃ কিম্! এ স্বাধীনতাকে সে স্বাধীনতা বলিয়াই স্বীকার করে নাই। ভারতবর্ষ কামনার উপরে,—কর্ম্মের উপরেও স্বাধীন হইতে চাহিয়াছিল।

কিন্তু স্বাধীন হইলাম মনে করিলেই ত স্বাধীন হওয়া যায় না—নিয়ম অর্থাৎ অধীনতার ভিতর দিয়া না গেলে স্বাধীন হওয়া যায় না। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাকে যদি বড় মনে কর, তবে সৈনিকরূপে অধীন হইতে হইবে, বণিক্‌রূপে অধীন হইতে হইবে। ইংলণ্ডে যে কত লক্ষ সৈনিক আছে, তাহারা কি স্বাধীন? মনুষ্যত্বকে যে তাহারা মানুষমারা কলে পরিণত করিয়াছে, তাহারা সজীব বন্দুকমাত্র। কত লক্ষ মজুর খনির অন্ধ রসাতলে, কারখানার অগ্নিকুণ্ডে থাকিয়া ইংলণ্ডের রাজশ্রীর পায়ের তলায় বুকের রক্ত দিয়া আল্‌তা পরাইতেছে—তাহারা কি স্বাধীন? তাহারা ত নির্জ্জীব কলের সজীব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। য়ুরোপে স্বাধীনতার ফলভোগ করিতেছে কয়জন? তবে স্বাধীনতা কাহাকে বল? Individualism অর্থাৎ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য য়ুরোপের সাধনার বিষয় হইতে পারে, কিন্তু ব্যক্তির পরতন্ত্রতা এত বেশি কি অন্যত্র দেখা গিয়াছে?

ইহার উত্তরে একটা স্বতোবিরোধী কথা বলিতে হয়। পরতন্ত্রতার ভিতর দিয়াই স্বাতন্ত্র্যে যাইবার পথ। বাণিজ্যে তুমি যত-বড় লাভের টাকা আনিতে চাও, তত-বড় মূলধনের টাকা ফেলিতে হইবে। টাকা কিছুই খাটিতেছে না, কেবলি লাভ করিতেছে, ইহা হয় না। স্বাতন্ত্র্য তেম্‌নি সুদের মত, বিপুল পরতন্ত্রতা খাটাইয়া তবে সেইটুকু লাভ হইতেছে—আগাগোড়া সমস্তটাই লাভ, আগাগোড়া সমস্তই স্বাধীনতা, এ কখনো সম্ভবপর নহে।

আমাদের দেশেরও সাধনার বিষয় ছিল Individualism—ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। কিন্তু সে ত কোনো ছোটখাটো স্বাতন্ত্র্য নয়। সেই স্বাতন্ত্র্যের আদর্শ একেবারে মুক্তিতে গিয়া ঠেকিয়াছে। ভারতবর্ষ প্রত্যেক লোককে জীবনের প্রতিদিনের ভিতর দিয়া, সমাজের প্রত্যেক সম্বন্ধের ভিতর দিয়া সেই মুক্তির অধিকার দিবার চেষ্টা করিয়াছে। য়ুরোপে যেমন কঠোর পরতন্ত্রতার ভিতর দিয়া স্বাতন্ত্র্য বিকাশ পাইতেছে, আমাদের দেশেও তেম্‌নি নিয়মসংযমের নিবিড় বন্ধনের ভিতর দিয়াই মুক্তির উপায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সেই মুক্তির পরিণামকে লক্ষ্য হইতে বাদ দিয়া যদি কেবল-

নিয়মসংযমকেই একান্ত করিয়া দেখি, তবে বলিতেই হয়, আমাদের দেশে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের খর্ব্বতা বড় বেশি।

আসল কথা, কোনো দেশের যখন দুর্গতির দিন আসে, তখন সে মুখ্যজিনিষটাকে হারায়, অথচ গৌণটা জঞ্জাল হইয়া জায়গা জুড়িয়া বসে। তখন পাখী উড়িয়া পালায়, খাঁচা পড়িয়া থাকে। আমাদের দেশেও তাই ঘটিয়াছে। আমরা এখনো নানাবিধ বাঁধাবাঁধি মানিয়া চলি, অথচ তাহার পরিণামের প্রতি লক্ষ্য নাই। মুক্তির সাধনা আমাদের মনের মধ্যে,—আমাদের ইচ্ছার মধ্যে নাই, অথচ তাহার বন্ধনগুলি আমরা আপাদমস্তক বহন করিয়া বেড়াইতেছি। ইহাতে আমাদের দেশের যে মুক্তির আদর্শ, তাহা ত নষ্ট হইতেছেই; য়ুরোপের যে স্বাধীনতার আদর্শ, তাহার পথেও পদে পদে বাধা পড়িতেছে। সাত্ত্বিকতার যে পূর্ণতা তাহা ভুলিয়াছি, রাজসিকতার যে ঐশ্বর্য্য তাহাও দুর্লভ হইয়াছে, কেবল তামসিকতার যে নিরর্থক অভ্যাসগত বোঝা তাহাই বহন করিয়া নিজেকে অকর্ম্মণ্য করিয়া তুলিতেছি। অতএব এখনকার দিনে আমাদের দিকে তাকাইয়া যদি কেহ বলে, ভারতবর্ষের সমাজ মানুষকে কেবল আচারে-বিচারে আটেঘাটে বন্ধন করিবারই ফাঁদ, তবে নে রাগ হইতে পারে, কিন্তু জবাব দেওয়া কঠিন হয়। পুকুর যখন শুকাইয়া গেছে, তখন তাহাকে যদি কেহ গর্ত্ত বলে, তবে তাহা আমাদের পৈতৃক-সম্পত্তি হইলেও চুপ করিয়া থাকিতে হয়। আসল কথা, সরোবরের পূর্ণতা এককালে যতই সুগভীর ছিল, শুষ্ক অবস্থায় তাহার রিক্ততার গর্ত্তটাও ততই প্রকাণ্ড হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষেও মুক্তির লক্ষ্য যে একদা কত সচেষ্ট ছিল, তাহা এখনকার দিনের নিরর্থক বাঁধাবাঁধি, অনাবশ্যক আচারবিচারের দ্বারাই বুঝা যায়! য়ুরোপেও কালক্রমে যখন শক্তির হ্রাস হইবে, তখন বাঁধনের অসহ্য ভারের দ্বারাই তাহার পূর্ব্বতন স্বাতন্ত্র্যচেষ্টার পরিমাপ হইবে। এখনি কি ভার অনুভব করিয়া সে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছে না? এখনি কি তাহার উপায় ক্রমশ উদ্দেশ্যকে ছাড়াইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে না?

কিন্তু সে তর্ক থাক্; আসল কথা এই, যদি লক্ষ্য সজাগ থাকে, তবে নিয়মসংযমের বন্ধনই মুক্তির একমাত্র উপায়। ভারতবর্ষ একদিন নিয়মের দ্বারা সমাজকে খুব করিয়া বাঁধিয়াছিল। 'মানুষ সমাজের মধ্য দিয়া সমাজকে ছাড়াইয়া যাইবে বলিয়াই বাঁধিয়াছিল। ঘোড়াকে তাহার সওয়ার লাগাম দিয়া বাঁধে কেন, এবং নিজেই বা তাহার সঙ্গে রেকাবের দ্বারা বদ্ধ হয় কেন—ছুটিতে হইবে বলিয়া, দূরের লক্ষ্যস্থানে যাইতে হইবে বলিয়া। ভারতবর্ষ জানিত, সমাজ মানুষের শেষলক্ষ্য নহে, মানুষের চির-অবলম্বন নহে—সমাজ হইয়াছে মানুষকে মুক্তির পথে অগ্রসর করিয়া দিবার জন্য। সংসারের বন্ধন ভারতবর্ষ বরঞ্চ বেশি করিয়াই স্বীকার করিয়াছে তাহার হাত হইতে বেশি করিয়া নিষ্কৃতি পাইবার অভিপ্রায়ে।

এইরূপে বন্ধন ও মুক্তি, উপায় ও উদ্দেশ্য, উভয়কেই মান্য করিবার কথা প্রাচীন উপনিষদের মধ্যেও দেখা যায়। ঈশোপনিষৎ বলিতেছেন :—

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে অবিদ্যামুপাসতে ।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ ॥

যাহারা কেবলমাত্র অবিদ্যা অর্থাৎ সংসারের উপাসনা করে, তাহারা অন্ধতমসের মধ্যে প্রবেশ করে ; তদপেক্ষাও ভূয় অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করে তাহারা, যাহারা কেবলমাত্র ব্রহ্মবিদ্যায় নিরত।

বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে ॥

বিদ্যা এবং অবিদ্যা উভয়কেই যিনি একত্র করিয়া জানেন, তিনি অবিদ্যাদ্বারা মৃত্যু হইতে উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যাদ্বারা অমৃত প্রাপ্ত হন।

মৃত্যুকে প্রথমে উত্তীর্ণ হইতে হইবে, তাহার পরে অমৃতলাভ। সংসারের ভিতর দিয়া এই মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হইতে হয়। কর্ম্মের মধ্যে প্রবৃত্তিকে যথার্থভাবে নিযুক্ত করিয়া আগে সেই প্রবৃত্তিকে ও কর্ম্মকে ক্ষয় করিয়া ফেলা, তার পরে ব্রহ্মলাভের কথা— সংসারকে বলপূর্ব্বক অস্বীকার করিয়া কেহ অমৃতের অধিকার পাইতে পারে না।

কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে ॥

কর্ম্ম করিয়া শতবৎসর ইহলোকে জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিবে,—হে নর, তোমার পক্ষে ইহার আর অন্যথা নাই ; কর্ম্মে লিপ্ত হইবে না, এমন পথ নাই।

মানুষকে পূর্ণতালাভ করিতে হইলে পরিপূর্ণ জীবন এবং সম্পূর্ণ কর্ম্মের প্রয়োজন হয়। জীবন সম্পূর্ণ হইলেই জীবনের প্রয়োজন নিঃশেষ হইয়া যায়, কর্ম্ম সমাপ্ত হইলেই কর্ম্মের বন্ধন শিথিল হইয়া আসে।

জীবনকে ও জীবনের অবসানকে, কর্ম্মকে ও কর্ম্মের সমাপ্তিকে এইরূপ অত্যন্ত সহজভাবে গ্রহণ করিতে হইলে যে কথাটি মনে রাখিতে হইবে, তাহা ঈশোপনিষদের প্রথম-শ্লোকেই রহিয়াছে :—

ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ ।

ঈশ্বরের দ্বারা এই জগতের সমস্ত যাহা-কিছু আচ্ছন্ন জানিবে—এবং

তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্‌ ॥

তিনি যাহা ত্যাগ করিতেছেন—তিনি যাহা দিতেছেন, তাহাই ভোগ করিবে, অন্য কাহারো ধনে লোভ করিবে না।

সংসারকে যদি ব্রহ্মের দ্বারা আচ্ছন্ন বলিয়া জানিতে পারি, তাহা হইলে সংসারের বিষ কাটিয়া যায়—তাহার সঙ্কীর্ণতা দূর হইয়া তাহার বন্ধন আমাদিগকে আঁটিয়া ধরে না। এবং সংসারের ভোগকে ঈশ্বরের দান বলিয়া গ্রহণ করিলে কাড়াকাড়ি-মারামারি থামিয়া যায়।

এইরূপে সংসারকে, সংসারের সুখকে, কর্ম্মকে ও জীবনকে ব্রহ্ম-উপলব্ধির সঙ্গে যুক্ত করিয়া খুব বড় করিয়া জানাটা হইল সমাজ-রচনার, জীবননির্ব্বাহের গোড়াকার কথা।

ভারতবর্ষ এই ভূমার সুরেই সমাজকে বাঁধিবার চেষ্টা করিয়াছিল। সমাজকে বাঁধিয়া মানুষের আত্মাকে মুক্তি দিবার চেষ্টা করিয়াছিল। শরীরকে অপবিত্র বলিয়া পীড়া দিতে চায় নাই, সমাজকে কলুষিত বলিয়া পরিহার করিতে চায় নাই, জীবনকে অনিত্য বলিয়া অবজ্ঞা করিতে চায় নাই—সে সমস্তকেই ব্রহ্মের দ্বারা অখণ্ড-পরিপূর্ণ করিতে চাহিয়াছিল।

য়ুরোপে মানুষের জীবনের দুইটি ভাগ দেখা যায়। এক শেখার অবস্থা—তাহার পরে সংসারের কাজ করিবার অবস্থা। এই-খানেই শেষ।

কিন্তু কাজজিনিষটাকে ত কোনো-কিছুর শেষ বলা যায় না। লাভই শেষ। শক্তিকে শুদ্ধমাত্র খাটাইয়া চলাই ত শক্তির পরিণাম নহে, সিদ্ধিতে পৌঁছানই পরিণাম। আগুনে কেবল ইন্ধন চাপানোই ত লক্ষ্য নহে, রন্ধনেই তাহার সার্থকতা। কিন্তু য়ুরোপ মানুষকে এমন-কোনো জায়গায় লক্ষ্যস্থাপন করিতে দেয় নাই, কাজ যেখানে তাহার স্বাভাবিক পরিণামে আসিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিতে পারে। টাকা সংগ্রহ করিতে চাও, সংগ্রহের ত শেষ নাই; জগতের খবর জানিতে চাও, জানার ত অন্ত নাই;—সভ্যতাকে progress বলিয়া থাক, প্রোগ্রেস্‌শব্দের অর্থই এই দাঁড়াইয়াছে যে, কেবলি পথে চলা, কোথাও ঘরে না পৌঁছানো। এইজন্য জীবনকে না-শেষের মধ্যে হঠাৎ শেষ করা, না-থামার মধ্যে হঠাৎ থামিয়া যাওয়া য়ুরোপের জীবনযাত্রা। Not the game but the chase – শিকার পাওয়া নহে, শিকারের পশ্চাতে অনুধাবন করাই য়ুরোপের কাছে আনন্দের সারভাগ বলিয়া গণ্য হয়।

যাহা হাতে পাওয়া যায়, তাহাতে সুখ নাই, এ কথা কি আমরাও বলি না? আমরাও বলি—

> নিঃস্বো বষ্টি শতং শতী দশশতং লক্ষং সহস্রাধিপো
> লক্ষেশঃ ক্ষিতিপালতাং ক্ষিতিপতিশ্চক্রেশ্বরত্বং পুনঃ।
> চক্রেশঃ পুনরিন্দ্রতাং সুরপতির্ব্রাহ্মং পদং বাঞ্ছতি
> ব্রহ্মা বিষ্ণুপদং হরিঃ শিবপদং ত্বাশাবধিং কো গতঃ॥

এক কথায়, যে যাহা পায়, তাহাতে তাহার আশা মিটে না—যতই বেশি পাও না কেন, তাহার চেয়ে বেশি পাইবার দিকে মন ছুটে। তবে আর কাজের অন্ত হইবে কেমন করিয়া? পাওয়াতে যখন চাওয়ার শেষ নহে, তখন অসম্পূর্ণ আশার মধ্যে অসমাপ্ত কর্ম্ম লইয়া মরাই মানুষের একমাত্র গতি বলিয়া মনে হয়।

এইখানে ভারতবর্ষ বলিয়াছেন, আর সমস্ত পাওয়ার এই লক্ষণ বটে, কিন্তু এক জায়গায় পাওয়ার সমাপ্তি আছে। সেইখানেই যদি লক্ষ্যস্থাপন করি, তবে কাজের অবসান হইবে, আমরা ছুটি পাইব। কোনোখানেই চাওয়ার শেষ নাই, জগৎটা এতবড় একটা ফাঁকি,—জীবনটা এতবড় একটা পাগলামি হইতেই পারে না। মানুষের জীবনসঙ্গীতে কেবলি অবিশ্রাম তানই আছে, আর, কোনো জায়গা-তেই সম নাই, এ কথা আমরা মানি না। অবশ্য এ কথা বলিতে হইবে, তান যতই মনোহর হউক, তাহার মধ্যে গানের অকস্মাৎ শেষ হইলে রসবোধে আঘাত লাগে—সমে আসিয়া শেষ হইলে সমস্ত তানের লীলা নিবিড় আনন্দের মধ্যে পরিসমাপ্ত হয়।

ভারতবর্ষ তাই কাজের মাঝখানে জীবনকে মৃত্যুর দ্বারা হঠাৎ বিচ্ছিন্ন হইতে উপদেশ দেন নাই। পূরাদমের মধ্যেই সাঁকো ভাঙিয়া হঠাৎ অতলে তলাইয়া যাইতে বলেন নাই, তাহাকে ইষ্টিশনে আনিয়া পৌঁছাইয়া দিতে চাহিয়াছেন। সংসার কোনোদিন সমাপ্ত হইবে না, এ কথা ঠিক; জীবসৃষ্টির আরম্ভ হইতে আজ পর্য্যন্ত উন্নতি-অবনতির ঢেউ-খেলার মধ্য দিয়া সংসার চলিয়া আসিতেছে,

তাহার বিরাম নাই। কিন্তু প্রত্যেক মানুষের সংসারলীলার যখন শেষ আছে, তখন মানুষ যদি একটা সম্পূর্ণতার উপলব্ধিকে না জানিয়া প্রস্থান করে, তবে তাহার কি হইল?

বাহিরে কিছুর শেষ নাই, কেবলি একটা হইতে আর একটা বাড়িয়াই চলিয়াছে। এই চিরচলমান বহিঃসংসারের দোলায় দুলিয়া আমরা মানুষ হইয়াছি—আমার পক্ষে একদিন সে দোলার কাজ ফুরাইলেও কোনোদিন একেবারে তাহার কাজ শেষ হইবে না। এই কথা মনে করিয়া, আমার যতটুকু সাধ্য, এই প্রবাহের পথকে আগে ঠেলিয়া দিতে হইবে। ইহার জ্ঞানের ভাণ্ডারে আমার সাধ্যমত জ্ঞান, ইহার কর্ম্মের চক্রে আমার সাধ্যমত বেগ সঞ্চার করিয়া দিতে হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া বাহিরের এই অশেষের মধ্যে আমিসুদ্ধ ভাসিয়া গেলে নষ্ট হইতে হইবে। অন্তরের মধ্যে একটা সমাধার পন্থা আছে। বাহিরে উপকরণের অন্ত নাই, কিন্তু অন্তরে সন্তোষ আছে; বাহিরে দুঃখবেদনার অন্ত নাই, কিন্তু অন্তরে ধৈর্য্য আছে; বাহিরে প্রতিকূলতার অন্ত নাই, কিন্তু অন্তরে ক্ষমা আছে; বাহিরে লোকের সহিত সম্বন্ধভাবের অন্ত নাই, কিন্তু অন্তরে প্রেম আছে; বাহিরে সংসারের অন্ত নাই, কিন্তু আত্মাতে আত্মা সম্পূর্ণ। একদিকের অশেষের দ্বারাতেই আর একদিকের অখণ্ডতার উপলব্ধি পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। গতির দ্বারাতেই স্থিতিকে মাপিয়া লইতে হয়।

এইজন্য ভারতবর্ষ মানুষের জীবনকে যেরূপে বিভক্ত করিয়াছিলেন, কর্ম্ম তাহার মাঝখানে ও মুক্তি তাহার শেষে।

দিন যেমন চার স্বাভাবিক অংশে বিভক্ত—পূর্ব্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ণ এবং সায়াহ্ন, ভারতবর্ষ জীবনকে সেইরূপ চারি আশ্রমে ভাগ করিয়াছিল। এই বিভাগ স্বভাবকে অনুসরণ করিয়াই হইয়াছিল। আলোক ও উত্তাপের ক্রমশ বৃদ্ধি এবং ক্রমশ হ্রাস যেমন দিনের আছে, তেম্‌নি মানুষেরও ইন্দ্রিয়শক্তির ক্রমশ উন্নতি এবং ক্রমশ অবনতি আছে। সেই স্বাভাবিক ক্রমকে অবলম্বন করিয়া ভারতবর্ষ জীবনের আরম্ভ হইতে জীবনান্ত পর্য্যন্ত একটি অখণ্ড তাৎপর্য্যকে বহন করিয়া লইয়া গেছে। প্রথমে শিক্ষা, তাহার পরে সংসার, তাহার পরে বন্ধনগুলিকে শিথিল করা, তাহার পরে মুক্তি ও মৃত্যুর মধ্যে প্রবেশ;—ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও প্রব্রজ্যা।

আধুনিককালে আমরা জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর একটা বিরোধ অনুভব করি। মৃত্যু যে জীবনের পরিণাম, তাহা নহে, মৃত্যু যেন জীবনের শত্রু। জীবনের পর্ব্বে পর্ব্বে আমরা অক্ষমভাবে মৃত্যুর সঙ্গে ঝগড়া করিয়া চলিতে থাকি। যৌবন চলিয়া গেলেও আমরা যৌবনকে টানাটানি করিয়া রাখিতে চাই। ভোগের আগুন নিবিয়া আসিতে থাকিলেও আমরা নানাপ্রকার কাঠখড় জোগাইয়া তাহাকে জাগাইয়া রাখিতে চাই। ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস হইয়া আসিলেও আমরা প্রাণপণে কাজ করিতে চেষ্টা করি। মুষ্টি যখন স্বভাবতই শিথিল হইয়া আসে, তখনো আমরা কোনোমতেই কোনো-কিছুর দখল ছাড়িতে চাই না। প্রভাত ও মধ্যাহ্ন ছাড়া আমাদের জীবনের আর কোনো অংশকে আমরা কিছুতেই স্বীকার করিতে ইচ্ছা করি না। অবশেষে যখন আমাদের চেয়ে প্রবলতর শক্তি

কানে ধরিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য করায়, তখন হয় বিদ্রোহ, নয় বিষাদ উপস্থিত হয়—তখন আমাদের সেই পরাভব কেবল রণে ভঙ্গরূপেই পরিণত হয়, তাহাকে কোনো কাজে লাগাইতেই পারি না। যে পরিণাম-গুলি নিশ্চয় পরিণাম, তাহাদিগকে সহজে গ্রহণ করিবার শিক্ষা হয় নাই বলিয়া কিছুই নিজে ছাড়িয়া দিই না, সমস্ত নিজের কাছ হইতে কাড়িয়া লইতে দিই। সত্যকে অস্বীকার করি বলিয়া পদে পদেই সত্যের নিকট পরাস্ত হইতে থাকি।

কাঁচা আম শক্ত বোঁটা লইয়া ডালকে খুব জোরে আকর্ষণ করিয়া আছে, তাহার অপরিণত আঁটির গায়ে তাহার অপরিণত শাঁস আঁটিয়া লাগিয়া আছে। কিন্তু প্রত্যহ সে যতটুকু পাকিতেছে, ততটুকু পরিমাণে তাহার বোঁটা ঢিলা হইতেছে, তাহার আঁটি শাঁস হইতে আল্‌গা, সমস্ত ফলটা গাছ হইতে পৃথক্ হইয়া আসিতেছে। ফল যে একদিন গাছের বাঁধন হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইয়া যাইবে, ইহাই তাহার সফলতা—গাছকে চিরকাল আঁটিয়া ধরিয়া থাকিলেই সে ব্যর্থ। ফলের মত আমাদের ইন্দ্রিয়শক্তিও একদিন সংসারের ডাল হইতে সমস্ত রস আকর্ষণ করিয়া লইয়া শেষকালে এই ডালকে ত্যাগ করিয়া ধূলিসাৎ হয়। ইহা জগতের নিয়মেই হয়, ইহার উপরে আমাদের হাত নাই। কিন্তু ভিতরে যেখানে আমাদের স্বাধীন মনুষ্যত্ব, যেখানে আমাদের ইচ্ছাশক্তির লীলা, সেখানকার পরিণতির পক্ষে ইচ্ছাশক্তিই একটা প্রধান শক্তি। এঞ্জিনের বয়লারের গায়ে যে অপমান যন্ত্রটা আছে, তাহার পারা স্বভাবের নিয়মেই ওঠে বা নামে, কিন্তু ভিতরের আগুনের আঁচটাকে এই সঙ্কেত বুঝিয়া বাড়াইব কি কমাইব, তাহা এঞ্জি-নিয়ারের ইচ্ছার উপরেই নির্ভর করে। আমাদের ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাসবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রবৃত্তির উত্তেজনা ও কর্ম্মের উৎসাহকে বাড়াইব কি কমাইব, তাহা আমা-দের হাতে। সেই যথাসময়ে বাড়ানো-কমানোর দ্বারাতেই আমরা সফলতালাভ করি।

পাকা ফলে একদিকে বোঁটা দুর্ব্বল ও শাঁস আল্‌গা হইতে থাকে বটে, তেম্‌নি অন্য-দিকে তাহার আঁটি শক্ত হইয়া নূতন প্রাণের সম্বল লাভ করিতে থাকে। আমাদের মধ্যেও সেই হরণ-পূরণ আছে। আমাদেরও বাহিরে হ্রাসের সঙ্গে ভিতরে বৃদ্ধির যোগ আছে। কিন্তু ভিতরের কাজে মানুষের নিজের ইচ্ছা বলবান্ বলিয়া এই বৃদ্ধি, এই পরিণতি আমা-দের সাধনার অপেক্ষা রাখে। সেইজন্যই দেখিতে পাই, দাঁত পড়িল, চুল পাকিল, শরীরের তেজ কমিল, মানুষ তাহার আয়ুর শেষপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল, তবু কোনো-মতেই সহজে সংসার হইতে আপন বোঁটা আল্‌গা হইতে দিল না—প্রাণপণে সমস্ত আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিল, এমন কি, মৃত্যুর পরেও সংসারের ক্ষুদ্র বিষয়েও তাহার ইচ্ছাই বলবান্ রহিবে, ইহা লইয়া জীবনের শেষ-মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত চিন্তা করিতে লাগিল। আধুনিক-কাল ইহাকে গর্ব্বের বিষয় মনে করে, কিন্তু ইহা গৌরবের বিষয় নহে।

ত্যাগ করিতেই হইবে এবং ত্যাগের দ্বারাই আমরা লাভ করি। ইহা জগতের

মর্ম্মগত সত্য। ফুলকে পাপ্‌ড়ি খসাইতেই হয়, তবে ফল ধরে, ফলকে ঝরিয়া পড়িতেই হয়, তবে গাছ হয়। গর্ভের শিশুকে গর্ভাশ্রয় ছাড়িয়া পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হইতে হয়। ভূমিষ্ঠ হইয়া শরীরে-মনে সে নিজের মধ্যে বাড়িতে থাকে, তখন তাহার আর কোনো কর্ত্তব্য নাই। তাহার ইন্দ্রিয়শক্তি, তাহার বুদ্ধি-বিদ্যা বাড়ার একটা সীমায় আসিলে তাহাকে আবার নিজের মধ্য হইতে সংসারের মধ্যে ভূমিষ্ঠ হইতে হয়। এইখানে পুষ্ট শরীর, শিক্ষিত মন ও সবল প্রবৃত্তি লইয়া সে পরিবার ও প্রতিবেশীদের মাঝখানে নিবিষ্ট হয়। ইহাই তাহার দ্বিতীয়শরীর, তাহার বৃহৎ-কলেবর। তাহার পরে শরীর জীর্ণ ও প্রবৃত্তি ক্ষীণ হইয়া আসে, তখন সে আপনার বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও অনাসক্ত প্রবীণতা লইয়া আপন ক্ষুদ্রসংসার হইতে বৃহত্তর সংসারে জন্মগ্রহণ করে; তাহার শিক্ষা, জ্ঞান ও বুদ্ধি একদিকে সাধারণমানবের কাজে লাগিতে থাকে, অন্যদিকে সে অবসন্নপ্রায় মানব-জীবনের সঙ্গে নিত্যজীবনের সম্বন্ধ স্থাপন করিতে থাকে। তাহার পরে পৃথিবীর নাড়ির বন্ধন সম্পূর্ণ ক্ষয় করিয়া দিয়া সে অতি সহজে মৃত্যুর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায় ও অনন্ত-লোকের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে। এইরূপে সে শরীর হইতে সমাজে, সমাজ হইতে নিখিলে, নিখিল হইতে অধ্যাত্মক্ষেত্রে মানবজন্মকে শেষপরিণতি দান করে।

প্রাচীন সংহিতাকারগণ আমাদের শিক্ষাকে, আমাদের গার্হস্থ্যকে অনন্তের মধ্যে সেই শেষ পরিণামের অভিমুখ করিতে চাহিয়াছিলেন। সমস্ত জীবনকে জীবনের পরিণামের অনুকূল করিতে চাহিয়াছিলেন। সেইজন্য আমাদের শিক্ষা কেবল বিষয়শিক্ষা,—কেবল গ্রন্থশিক্ষা ছিল না, তাহা ছিল ব্রহ্মচর্য্য। নিয়মসংযমের অভ্যাসদ্বারা এমন একটি বললাভ হইত, যাহাতে ভোগ এবং ত্যাগ উভয়ই আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক হইত। সমস্ত জীবনই নাকি ধর্ম্মাচরণ, কারণ, তাহার লক্ষ্য ব্রহ্মের মধ্যে মুক্তি, সেইজন্য সেই জীবন বহন করিবার শিক্ষাও ধর্ম্মব্রত ছিল। এই ব্রত শ্রদ্ধার সহিত, ভক্তির সহিত, নিষ্ঠার সহিত অতি সাবধানে যাপন করিতে হইত। মানুষের পক্ষে যাহা একমাত্র পরমসত্য, সেই সত্যকে সম্মুখে রাখিয়া বালক তাহার জীবনের পথে প্রবেশ করিবার জন্য প্রস্তুত হইত।

বাহিরের শক্তির সঙ্গে ভিতরের শক্তির সামঞ্জস্যক্রিয়া প্রাণের লক্ষণ বলিয়া কথিত হইয়াছে। গাছপালায় এই সামঞ্জস্যের কাজ যন্ত্রের মত ঘটে। আলোকের, বাতাসের, খাদ্যরসের উত্তেজনার প্রতিক্রিয়ার দ্বারা তাহার প্রাণের কাজ চলিতে থাকে। আমা-দের দেহেও সেইরূপ ঘটে। জিহ্বায় খাদ্য-সংযোগের উত্তেজনায় আপনি রস ক্ষরিয়া আসে, পাকযন্ত্রেও খাদ্যের সংস্পর্শে সহজেই পাকরসের উদ্রেক হয়। আমাদের শরীরের প্রাণক্রিয়া বাহিরের বিশ্বশক্তির সহজ প্রতিক্রিয়া।

কিন্তু আমাদের আবার মন বলিয়া,—ইচ্ছা বলিয়া আর একটা পদার্থ যোগ হওয়াতে প্রাণের উপর আর একটা উপসর্গ বাড়িয়া গেছে। খাইবার অন্যান্য উত্তেজনার সঙ্গে খাইবার আনন্দ একটা আসিয়াছে। তাহাতে করিয়া আহারের কাজটা শুধু আমাদের

আবশ্যকের কাজ নহে, আমাদের খুসির কাজ হইয়া উঠিয়াছে। ইহাতে প্রকৃতির কাজের সঙ্গে আমাদের একটা মানসিক সম্বন্ধ বাড়িয়া গেছে। দেহের সঙ্গে দেহের বাহিরের শক্তির একটা সামঞ্জস্য প্রাণের মধ্যে ঘটিতেছে, আবার তাহার সঙ্গে ইচ্ছাশক্তির একটা সামঞ্জস্য মনের মধ্যে ঘটিতেছে। ইহাতে মানুষের প্রকৃতি-যন্ত্রের সাধনা বড় শক্ত হইয়া উঠিয়াছে। বিশ্বশক্তির সঙ্গে প্রাণশক্তির সুর অনেকদিন হইতে বাঁধিয়া চুকিয়া গেছে, সেজন্য বড় ভাবিতে হয় না, কিন্তু ইচ্ছাশক্তির সুরবাঁধা লইয়া আমাদিগকে অহরহ ঝঞ্চট পোহাইতে হয়। খাদ্যসম্বন্ধে প্রাণশক্তির আবশ্যক হয় ত ফুরাইল, কিন্তু আমাদের ইচ্ছার তাগিদ শেষ হইল না—শরীরের আবশ্যকসাধনে সে যে আনন্দ পাইল, সেই আনন্দকে সে আবশ্যকের বাহিরেও টানিয়া লইয়া যাইতে চেষ্টা করিল—সে নানা কৃত্রিম উপায়ে বিমুখরসনাকে রসসিক্ত করিতে ও শ্রান্ত পাকযন্ত্রকে উত্তেজিত করিতে লাগিল, এম্নি করিয়া বাহিরের সহিত প্রাণের এবং প্রাণের সহিত মনের একতানতা নষ্ট করিয়া সে নানা অনাবশ্যক চেষ্টা, অনাবশ্যক উপকরণ ও শাখাপল্লবায়িত দুঃখের সৃষ্টি করিয়া চলিল। আমাদের যাহা প্রয়োজন, তাহার সংগ্রহই যথেষ্ট দুরূহ, তাহার উপরে ভূরিপরিমাণ অনাবশ্যকের বোঝা চাপিয়া সেই আবশ্যকের আয়োজনও কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। শুধু তাহাই নয়—ইচ্ছা যখন একবার স্বভাবের সীমা লঙ্ঘন করে, তখন কোথাও তাহার আর থামিবার কারণ থাকে না, তখন সে "হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে"—কেবল সে চাই চাই করিয়া বাড়িয়াই চলে। পৃথিবীতে নিজের এবং পরের পনের-আনা দুঃখের কারণ ইহাই। অথচ এই ইচ্ছাশক্তিকেই বিশ্বশক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্যে আনাই আমাদের পরমানন্দের হেতু। এই-জন্য, ইচ্ছাকে নষ্ট করা আমাদের সাধনার বিষয় নহে, ইচ্ছাকে বিশ্ব-ইচ্ছার সঙ্গে একসুরে বাঁধাই আমাদের সকল শিক্ষার চরমলক্ষ্য। গোড়ায় তাহা যদি না করি, তবে আমাদের চঞ্চল মনে জ্ঞান লক্ষ্যভ্রষ্ট, প্রেম কলুষিত এবং কর্ম্ম বৃথা পরিভ্রান্ত হইতে থাকে। জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম্ম বিশ্বের সহিত সহজ মিলনে মিলিত না হইয়া আমাদের আভ্যন্তরী ইচ্ছার কৃত্রিম সৃষ্টিসকলের মধ্যে মরীচিকা-অনুসরণে নিযুক্ত হইতে থাকে।

এইজন্য আমাদের আয়ুর প্রথম ভাগে ব্রহ্মচর্য্যপালনদ্বারা ইচ্ছাকে তাহার যথা-বিহিত সীমার মধ্যে সহজে সঞ্চরণ করিবার অভ্যাস করাইতে হইবে। ইহাতেই আমাদের বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানসপ্রকৃতির সুর বাঁধা হইয়া আসিবে। তাহার পরে সেই সুরে তোমার সাধ্যমত ও ইচ্ছামত যে-কোনো রাগিণী বাজাও না কেন, সত্যের সুরকে, মঙ্গলের সুরকে, আনন্দের সুরকে আঘাত করিবে না।

এইরূপে শিক্ষার কাল যাপন করিয়া সংসারধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

মনু বলিয়াছেন:—

ন তথৈতানি শক্যন্তে সংনিয়ন্তমসেবয়া।
বিষয়েষু প্রজুষ্টানি যথা জ্ঞানেন নিত্যশঃ॥

বিষয়ের সেবা না করিয়া সেরূপ সংযমন করা যায় না, বিষয়ে নিযুক্ত থাকিয়া জ্ঞানের দ্বারা নিত্যশ যেমন করিয়া করা যায়।

অর্থাৎ বিষয়ে নিযুক্ত না হইলে জ্ঞান পূর্ণতালাভ করে না, এবং যে সংযম জ্ঞানের দ্বারা লব্ধ নহে, তাহা পূর্ণসংযম নহে—তাহা জড় অভ্যাস বা অনভিজ্ঞতার অন্তরালমাত্র—তাহা প্রকৃতির মূলগত নহে, তাহা বাহ্যিক।

সংযমের সঙ্গে প্রবৃত্তিকে চালনা করিবার শিক্ষা ও সাধনা থাকিলেই কর্ম্ম, বিশেষত মঙ্গলকর্ম্ম করা সহজ ও সুখসাধ্য হয়। সেই অবস্থাতেই গৃহাশ্রম জগতের কল্যাণের আধার হইয়া উঠে। সেই অবস্থাতেই গৃহাশ্রম মানুষের মুক্তিপথে অগ্রসর হইবার বাধা নহে, সহায় হয়। সেই অবস্থাতেই গৃহস্থ যে-কোনো কর্ম্ম করেন, তাহা সহজে ব্রহ্মকে সমর্পণ করিয়া আনন্দিত হইতে পারেন। গৃহের সমস্ত কর্ম্ম যখন মঙ্গলকর্ম্ম হয়,—তাহা যখন ধর্ম্মকর্ম্ম হইয়া উঠে, তখন সেই কর্ম্মের বন্ধন মানুষকে বাঁধিয়া একেবারে জর্জ্জরীভূত করিয়া দেয় না। যথাসময়ে সে বন্ধন অনায়াসে স্খলিত হইয়া যায়, যথাসময়ে সে কর্ম্মের একটা স্বাভাবিক পরিসমাপ্তি আপনি আসে।

আয়ুর দ্বিতীয় ভাগকে এইরূপে সংসার-ধর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া শরীরের তেজ যখন হ্রাস হইতে থাকিবে, তখন এ কথা মনে রাখিতে হইবে যে, এই ক্ষেত্রের কাজ শেষ হইল—সেই খবরটা আসিল। শেষ হইল খবর পাইয়া চাকুরি-বরখাস্ত হতভাগার মত নিজেকে দীন বলিয়া দেখিতে হইবে না। আমার সমস্ত গেল, ইহাকেই অনুশোচনার বিষয় করিলে চলিবে না, এখন আরও বড়পরিধিবিশিষ্ট ক্ষেত্রের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে বলিয়া সেইদিকে আশার সহিত,—বলের সহিত মুখ ফিরাইতে হইবে। যাহা গায়ের জোরের, যাহা ইন্দ্রিয়শক্তির, যাহা প্রবৃত্তিসকলের ক্ষেত্র ছিল, তাহা এবারে পিছনে পড়িয়া রহিল—সেখানে যাহা-কিছু ফসল জন্মাইয়াছি, তাহা কাটিয়া মাড়াই করিয়া গোলা-বোঝাই করিয়া দিয়া এ মজুরি শেষ করিয়া চলিলাম—এবার সন্ধ্যা আসিতেছে—আপিসের কুঠরী ছাড়িয়া বড় রাস্তা ধরিতে হইবে। ঘরে না পৌঁছিলে ত চরমশান্তি নাই। যেখানে যত-কিছু সহিলাম, কত-কিছু খাটিলাম, সে কিসের জন্য? ঘরের জন্য ত? সেই ঘরই ভূমা—সেই ঘরই আনন্দ—যে আনন্দ হইতে আমরা আসিয়াছি, যে আনন্দে আমরা যাইব। তা যদি না হয়, তবে ততঃ কিম্‌, ততঃ কিম্‌, ততঃ কিম্‌!

তাই গৃহাশ্রমের কাজ সারিয়া সন্তানের হাতে সংসারের ভার সমর্পণ করিয়া এবার বড় রাস্তায় বাহির হইবার সময়। এবার বাহিরের খোলা বাতাসে বুক ভরিয়া লইতে হইবে—খোলা আকাশের আলোতে দৃষ্টিকে নিমগ্ন এবং শরীরের সমস্ত রোমকূপকে পুলকিত করিতে হইবে। এবার একদিক্‌কার পালা সমাধা হইল। আঁতুড়ঘরে নাড়ি কাটা পড়িল, এখন অন্য জগতের মধ্যে স্বাধীন সঞ্চরণের অধিকার লাভ করিতে হইবে।

শিশু গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইলেও সম্পূর্ণ স্বাধীন হইবার পূর্ব্বে কিছুকাল মাতার কাছে-কাছেই থাকে। বিযুক্ত হইয়াও যুক্ত থাকে, সম্পূর্ণ বিযুক্ত হইবার জন্য প্রস্তুত হয়। বান-প্রস্থ-আশ্রমও সেইরূপ। সংসারের গর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াও বাহিরের দিক্‌ হইতে সংসারের সঙ্গে সেই তৃতীয়-আশ্রমধারীর যোগ থাকে। বাহিরের দিক্‌ হইতে সে সংসারকে আপনার জীবনের সঞ্চিত

জ্ঞানের ফলদান করে এবং সংসার হইতে সহায়তা গ্রহণ করে। এই দান-গ্রহণ সংসারীর মত একান্তভাবে করে না, মুক্ত-ভাবে করে।

অবশেষে আয়ুর চতুর্থভাগে এমন দিন আসে, যখন এই বন্ধনটুকুও ফেলিয়া একাকী সেই পরম একের সম্মুখীন হইতে হয়। মঙ্গল-কর্ম্মের দ্বারা পৃথিবীর সমস্ত সম্বন্ধকে পূর্ণ-পরিণতি দান করিয়া আনন্দস্বরূপের সহিত চিরন্তন সম্বন্ধকে লাভ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হয়। পতিব্রতা স্ত্রী যেমন সমস্তদিন সংসারের নানা লোকের সহিত নানা সম্বন্ধ পালন করিয়া নানা কর্ম্ম সমাধা করিয়া স্বামীরই কর্ম্ম করেন, স্বামীরই সম্বন্ধ যথার্থ-ভাবে স্বীকার করেন; অবশেষে দিন-অবসান হইলে একে একে কাজের জিনিষগুলি তুলিয়া-রাখিয়া, কাজের কাপড় ছাড়িয়া, গা ধুইয়া, কর্ম্মস্থানের চিহ্ন মুছিয়া নির্ম্মল মিলনবেশে একাকিনী স্বামীর সহিত একমাত্র পূর্ণসম্বন্ধের অধিকার গ্রহণ করিবার জন্য নির্জ্জনগৃহে প্রবেশ করেন, সমাপ্তকর্ম্ম পুরুষ সেইরূপ প্রথমে একে একে কাজের জীবনের সমস্ত খণ্ডতা ঘুচাইয়া-দিয়া অসীমের সহিত সম্মি-লনের জন্য প্রস্তুত হইয়া অবশেষে একাকী সেই একের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হন এবং সম্পূর্ণ জীবনকে এই পরিপূর্ণ সমাপ্তির মধ্যে অখণ্ড সার্থকতা দান করেন। এইরূপেই মানবজীবন আদ্যোপান্ত সত্য হয়, জীবন মৃত্যুকে লঙ্ঘন করিতে বৃথা চেষ্টা করে না ও মৃত্যু শত্রুপক্ষের ন্যায় জীবনকে আক্রমণ করিয়া বলপূর্ব্বক পরাস্ত করে না। জীবনকে আর আমরা যেমন করিয়াই খণ্ডবিখণ্ড-বিক্ষিপ্ত করি—অন্য যে-কোনো অভিপ্রায়কেই আমরা চরম বলিয়া জ্ঞান করি এবং তাহাকে আমরা দেশ-উদ্ধার, লোকহিত বা যে-কোনো বড় নাম দিই না কেন, তাহার মধ্যে সম্পূর্ণতা থাকে না-তাহা আমাদিগকে মাঝপথে অকস্মাৎ পরিত্যাগ করে, তাহার মধ্য হইতে এই প্রশ্নই কেবলি বাজিতে থাকে—ততঃ কিম্, ততঃ কিম্, ততঃ কিম্। আর ভারতবর্ষ চারি আশ্রমের মধ্য দিয়া মানুষের জীবনকে বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ়বয়স ও বার্দ্ধক্যের স্বাভাবিক বিভাগের অনুগত করিয়া অধ্যায়ে অধ্যায়ে যেরূপ একমাত্র সমাপ্তির দিকে লইয়া গিয়াছেন, তাহাতে বিশাল বিশ্বসঙ্গীতের সহিত মানুষের জীবন অবিরোধে সম্মিলিত হয়। বিদ্রোহ-বিরোধ থাকে না; অশিক্ষিত প্রবৃত্তি আপনার উপযুক্ত স্থানকাল বিস্মৃত হইয়া যে সকল গুরুতর অশান্তির সৃষ্টি করিতে থাকে, তাহারই মধ্যে বিভ্রান্ত ও নিখিলের সহিত সহজ-সত্যসম্বন্ধ-ভ্রষ্ট হইয়া পৃথিবীর মধ্যে উৎপাতস্বরূপ হইয়া উঠিতে হয় না।

আমি জানি, এইখানে একটা প্রশ্ন উদয় হইবে যে, একটা দেশের সকল লোককেই কি এই আদর্শে গড়িয়া তোলা যায়? তাহার উত্তরে আমি এই কথা বলি যে, যখন ঘরে আলো জ্বলে, তখন কি পিলসুজ হইতে আরম্ভ করিয়া পলিতা পর্য্যন্ত প্রদীপের সমস্তটাই জ্বলে? জীবনযাপনসম্বন্ধে, ধর্ম্মসম্বন্ধে যে দেশের যে-কোনো আদর্শই থাক্ না কেন, তাহা সমস্ত দেশের মুখাগ্রভাগেই উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পায়। কিন্তু পলিতার ডগাটামাত্র জ্বলাকেই সমস্ত দীপের জ্বলা বলে। তেম্নি দেশের এক অংশমাত্র যে ভাবকে পূর্ণরূপে

আরম্ভ করেন, সমস্ত দেশেরই তাহা লাভ। বস্তুত সেই অংশটুকুমাত্রকে পূর্ণতা দিবার জন্য সমস্ত দেশকে প্রস্তুত হইতে হয়, সমস্ত সমাজকে অনুকূল হইতে হয়—ডালের আগায় ফল ধরাইতে গাছের শিকড় এবং গুঁড়িকে সচেষ্ট থাকিতে হয়। ভারতবর্ষে যদি এমন দিন আসে যে, আমাদের দেশের মান্যশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা সর্ব্বোচ্চ সত্য এবং সর্ব্বোচ্চ মঙ্গলকেই আর সমস্ত খণ্ড প্রয়োজনের উর্দ্ধে তুলিয়া চিরজীবনের সাধনার সামগ্রী করিয়া রাখেন, তবে তাঁহাদের সাধনা ও সার্থকতা সমস্ত দেশের মধ্যে একটা বিশেষ গতি, একটা বিশেষ শক্তি সঞ্চার করিবেই। একদিন ভারতবর্ষে ঋষিরা যখন ব্রহ্মের সাধনায় রত ছিলেন, তখন সমস্ত আর্য্যসমাজের মধ্যেই—রাজকার্য্যে, যুদ্ধে, বাণিজ্যে, সাহিত্যে, শিল্পে, ধর্ম্মার্চ্চনায়—সর্ব্বত্রই সেই ব্রহ্মের সুর বাজিয়াছিল, কর্ম্মের মধ্যে মোক্ষের ভাব বিরাজ করিয়াছিল—ভারতবর্ষের সমস্ত সমাজস্থিতি মৈত্রেয়ীর ন্যায় বলিতেছিল, "যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্।" সে বাণী চিরদিনের মতই নীরব হইয়া গেছে এম্‌নিই যদি আমাদের ধারণা হয়, তবে আমাদের এই মৃতসমাজকে ব্রত-উপকরণ জোগাইয়া বৃথা সেবা করিয়া মরিতেছি কেন? তবে ত এই মুহূর্ত্তেই আপাদমস্তকে পরজাতির অনুকরণ করাই আমাদের পক্ষে শ্রেয়—কারণ, পরিণামহীন ব্যর্থতার বোঝা অকারণে বহিয়া পড়িয়া থাকার চেয়ে সজীবভাবে কিছু-একটা হইয়া উঠার চেষ্টা করা ভাল। কিন্তু এ কথা কখনই মানিব না। আমাদের প্রকৃতি মানিবে না। যতই দুর্গতি হউক্, আমাদের অন্তরতম স্থান এমনভাবে তৈরি হইয়া আছে যে, কোনো অসম্পূর্ণ অধিকারকে আমাদের মন পরমলাভ বলিয়া সায় দিতে পারিবে না। এখনো যদি কোনো সাধক তাঁহার জীবনের যন্ত্রে সংসারের সকল চাওয়া, সকল পাওয়ার চেয়ে উচ্চতর সপ্তকে একটা বড় সুর বাজাইয়া তোলেন, সেটা আমাদের হৃদয়ের তারে তখনি প্রতিঝঙ্কৃত হইতে থাকে—তাহাকে আমরা ঠেকাইতে পারি না। প্রতাপ এবং ঐশ্বর্য্যের প্রতিযোগিতাকে আমরা যত-বড় কণ্ঠে যত-বড় করিয়াই প্রচার করিবার চেষ্টা করিতেছি, আমরা সমস্ত মনপ্রাণ দিয়া তাহা গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। তাহা আমাদের মনের বহির্দ্বারে একটা গোলমাল পাকাইয়া তুলিয়াছে মাত্র। আমাদের সমাজে আজকাল বিবাহ প্রভৃতি ক্রিয়াকর্ম্মে দেশী রসুনচৌকির সঙ্গে সঙ্গে একইকালে গড়ের বাদ্য বাজানো হয় দেখিতে পাই। ইহাতে সঙ্গীত ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া কেবল একটা সুরের গণ্ডগোল হইতে থাকে। এই বিষম গণ্ডগোলের ঝঞ্ঝনার মধ্যে মনোযোগ দিলেই বুঝা যায় যে, রসুনচৌকির বৈরাগ্যগাম্ভীর্য্যমিশ্রিত করুণ সাহানাই আমাদের উৎসবের চিরন্তন হৃদয়ের মধ্য হইতে বাজিতেছে, আর গড়ের বাদ্য তাহার প্রচণ্ড কাংস্যকণ্ঠ ও স্ফীতোদর জয়ঢাকটা লইয়া কেবলমাত্র ধনের অহঙ্কার, কেবলমাত্র ফ্যাশানের আড়ম্বরকে অভ্রভেদী করিয়া সমস্ত গভীরতর, অন্তরতর সুরকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে। তাহা আমাদের মঙ্গল-অনুষ্ঠানের মধ্যে একটা গর্ব্বপরিপূর্ণ অসামঞ্জস্যকেই অত্যুৎকট করিয়া তুলিতেছে—তাহা আমাদের উৎসবের চিরদিনের বেদনার সঙ্গে আপনার

সুর মিলাইতেছে না। আমাদের জীবনের সকল দিকেই এমনিতর একটা খাপছাড়া জোড়াতাড়া-ব্যাপার ঘটিতেছে। য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রতাপ ও ঐশ্বর্য্যের আয়োজন আমাদের দৃষ্টিকে মুগ্ধ করিয়াছে; তাহার অসঙ্গত ও ক্ষীণ অনুকরণের দ্বারা আমরা আমাদের আড়ম্বর-আস্ফালনের প্রবৃত্তিকে খুব দৌড় করাইতেছি; আমাদের দেউড়ির কাছে তাহার বড় জয়ঢাকটা কাঠি পিটাইয়া খুবই শব্দ করিতেছে, কিন্তু যে আমাদের অন্তঃপুরের খবর রাখে, সে জানে, সেখানকার মঙ্গলশঙ্খ এই বাহ্যাড়ম্বরের ধমকে নীরব হইয়া যায় নাই। ভাড়া করা গড়ের বাদ্য একসময় যখন গড়ের মধ্যে ফিরিয়া যায়, তখনো ঘরের এই শঙ্খ আকাশে উৎসবের মঙ্গলধ্বনি ঘোষণা করে। আমরা ইংরেজের রাষ্ট্রনীতি, সমাজ-নীতি, বাণিজ্যনীতির উপযোগিতা খুব করিয়া স্বীকার ও প্রচার করিতেছি, কিন্তু তাহাতে কোনোমতেই আমাদের সমস্ত হৃদয়কে পূর্ণভাবে আকর্ষণ করিতেছে না। আমরা সকলের চেয়ে বড় সুর যাহা শুনিয়াছি, এ সুর যে তাহাকে আঘাত করিতেছে—আমাদের অন্তরাত্মা এক জায়গায় ইহাকে কেবলি অস্বীকার করিতেছে।

আমরা কোনোদিন এমনতর হাটের মানুষ ছিলাম না। আজ আমরা হাটের মধ্যে বাহির হইয়া ঠেলাঠেলি ও চীৎকার করিতেছি—ইতর হইয়া উঠিয়াছি, কলহে মাতিয়াছি, পদ ও পদবী লইয়া কাড়াকাড়ি করিতেছি, বড় অক্ষরের ও উচ্চকণ্ঠের বিজ্ঞাপনের দ্বারা নিজেকে আর পাঁচজনের চেয়ে অগ্রসর করিয়া ঘোষণা করিবার প্রাণপণ চেষ্টা চলিতেছে। অথচ ইহা একটা নকল। ইহার মধ্যে সত্য অতি অল্পই আছে। ইহার মধ্যে শান্তি নাই, গাম্ভীর্য্য নাই, শিষ্টতা-শীলতার সংযম নাই, শ্রী নাই। এই নকলের যুগ আসিবার পূর্ব্বে আমাদের মধ্যে এমন একটা স্বাভাবিক মর্য্যাদা ছিল যে, দারিদ্র্যেও আমাদিগকে মানাইত, মোটাভাত-মোটা-কাপড়ে আমাদের গৌরব নষ্ট করিতে পারিত না। কর্ণ যেমন তাঁহার কবচকুণ্ডল লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তখনকার দিনে আমরা সেইরূপ একটা স্বাভাবিক আভি-জাত্যের কবচ লইয়াই জন্মিতাম। সেই কবচেই আমাদিগকে বহুদিনের অধীনতা ও দুঃখদারিদ্র্যের মধ্যেও বাঁচাইয়া রাখিয়াছে—আমাদের সম্মান নষ্ট করিতে পারে নাই। কারণ, আমাদের সে সম্মান বাহিরের আহরণ-করা ধন ছিল না, সে আমাদের অন্তরের সামগ্রী ছিল। সেই সহজাত কবচখানি আমাদের কাছ হইতে কে ভুলাইয়া লইল। ইহাতেই আমাদের আত্মরক্ষার উপায় চলিয়া গেছে। এখন আমরা বিশ্বের মধ্যে লজ্জিত। এখন আমাদের বেশে-ভূষায়, আয়োজনে-উপকরণে একটু কোথাও কিছু খাটো পড়িয়া গেলেই আমরা আর মাথা তুলিতে পারি না। সম্মান এখন বাহিরের জিনিষ হইয়া পড়িয়াছে, তাই উপাধির জন্য, খ্যাতির জন্য আমরা বাহিরের দিকে ছুটিয়াছি, বাহিরের আড়ম্বরকে কেবলি বাড়াইয়া তুলিতেছি, এবং কোথাও একটু-কিছু ছিদ্র বাহির হইবার উপক্রম হইলেই তাহাকে মিথ্যার তালি দিয়া ঢাকা দিবার চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু ইহার অন্ত কোথায়? যে

ভদ্রতা আমাদের অন্তরের সামগ্রী ছিল, তাহাকে আজ যদি বাহিরে টানিয়া জুতার দোকান, কাপড়ের দোকান, ঘোড়ার হাট এবং গাড়ির কারখানায় ঘোরাইতে আরম্ভ করি, তবে কোথায় লইয়া-গিয়া তাহাকে বলিব, বস্, হইয়াছে, এখন বিশ্রাম কর! আমরা সন্তোষকেই সুখের পূর্ণতা বলিয়া জানিতাম; কারণ, সন্তোষ অন্তরের সামগ্রী—এখন সেই সুখকে যদি হাটে-হাটে ঘাটে-ঘাটে খুঁজিয়া ফিরিতে হয়, তবে কবে বলিতে পারিব, সুখ পাইয়াছি! এখন আমাদের ভদ্রতাকে সস্তা কাপড়ে অপমান করে, বিলাতী গৃহসজ্জার অভাবে উপহাস করে, চেকবহির অঙ্কপাতের ন্যূনতায় তাহার প্রতি কলঙ্কপাত করে—এমন ভদ্রতাকে মজুরের মত বহন করিয়া গৌরববোধ করা যে কত লজ্জাকর, তাহাই আমরা ভুলিতে বসিয়াছি। আর যে সকল পরিণামহীন উত্তেজনা উন্মাদনাকে আমরা সুখ বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছি, তাহার দ্বারা আমাদের মত বহির্বিষয়ে পরাধীন জাতিকে অন্তঃকরণেও দাসানুদাস করিয়াছে।

কিন্তু তবু বলিতেছি, এই উপসর্গ এখনো আমাদের মজ্জার মধ্যে প্রবেশ করে নাই। এখনো ইহা বাহিরেই পড়িয়া আছে; এবং বাহিরে আছে বলিয়াই ইহার কলরব এত বেশি—সেইজন্যই ইহার এত আতিশয্য ও অতিশয়োক্তির প্রয়োজন হয়। এখনো এ আমাদের গভীরতর স্বভাবের অনুগত হয় নাই বলিয়াই সন্তরণমূঢ়ের সাঁতারকাটার মত ইহাকে লইয়া আমাদিগকে এমন উন্মত্তের ন্যায় আস্ফালন করিতে হয়।

কিন্তু একবার কেহ যদি আমাদের মধ্যে দাঁড়াইয়া যথার্থ অধিকারের সহিত এ কথা বলেন যে, "অসম্পূর্ণ প্রয়াসে, উন্মত্ত প্রতিযোগিতায়, অনিত্য ঐশ্বর্য্যে আমাদের শ্রেয় নহে—জীবনের একটি পরিপূর্ণ পরিণাম আছে, সকল কর্ম্ম,—সকল সাধনার একটি পরিপূর্ণ পরিসমাপ্তি আছে, এবং সেই পরিণাম,—সেই পরিসমাপ্তিই আমাদের প্রত্যেকের একমাত্র চরম চরিতার্থতা;—তাহার নিকটে আর সমস্তই তুচ্ছ"—তবে আজও এই হাটবাজারের কোলাহলের মধ্যেও আমাদের সমস্ত হৃদয় সায় দিয়া উঠে, বলে, "সত্য, ইহাই সত্য, ইহার চেয়ে সত্য আর কিছুই নাই।" তখন, ইস্কুলে যে সকল ইতিহাসের পড়া মুখস্থ করিয়াছিলাম; কাড়াকাড়ি-মারামারির কথা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিমানকেই সর্ব্বোচ্চ সিংহাসনে নররক্ত দিয়া অভিষেক করিবার কথা, অত্যন্ত ক্ষীণ-খর্ব্ব হইয়া আসে; তখন লালকুর্ত্তিপরা অক্ষৌহিণী সেনার দম্ভ, উদ্ধত-মাস্তুল বৃহদাকার যুদ্ধজাহাজের ঔদ্ধত্য আমাদের চিত্তকে আর অভিভূত করে না;—আমাদের মর্ম্মস্থলে ভারতবর্ষের বহুযুগের একটি সজলজলদগম্ভীর ওঙ্কারধ্বনি নিত্যজীবনের আদিসুরটিকে জগতের সমস্ত কোলাহলের ঊর্দ্ধে জাগাইয়া তুলে। ইহাকে আমরা কোনোমতেই অস্বীকার করিতে পারিব না; যদি করি, তবে ইহার পরিবর্ত্তে আমরা এমন কিছুই পাইব না, যাহার দ্বারা আমরা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইব, যাহার দ্বারা আমরা আপনাকে রক্ষা করিতে পারিব। আমরা কেবলি তরবারির ছটা, বাণিজ্যের ঘটা, কলকারখানার রক্তচক্ষু এবং স্বর্গের প্রতিস্পর্দ্ধী যে ঐশ্বর্য্য উত্তরোত্তর আপনার

উপকরণস্তূপকে উচ্চে তুলিয়া আকাশের সীমা মাপিবার ভাণ করিতেছে, তাহার উৎকট-মূর্ত্তি দেখিয়া সমস্ত মনে-প্রাণে কেবলি পরাস্ত-পরাভূত হইতে থাকিব, কেবলি সঙ্কুচিত-শঙ্কিত হইয়া পৃথিবীর রাজপথে ভিক্ষাসম্বল দীনহীনের মত ফিরিয়া বেড়াইব।

অথচ এ কথাও আমি কোনোমতেই স্বীকার করি না যে, আমরা যাহাকে শ্রেয় বলিতেছি, তাহা কেবল আমাদের পক্ষেই শ্রেয়। আমরা অক্ষম বলিয়া ধর্ম্মকে দায়ে পড়িয়া বরণ করিতে হইবে, তাহাকে দারিদ্র্যগোপন করিবার একটা কৌশলস্বরূপে গ্রহণ করিতে হইবে, এ কথা কখনই সত্য নহে। প্রাচীন সংহিতাকার মানবজীবনের যে আদর্শ আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন, তাহা কেবলমাত্র কোনো-একটি বিশেষজাতির বিশেষ অবস্থার পক্ষেই সত্য, তাহা নহে। ইহাই একমাত্র সত্য আদর্শ, সুতরাং ইহাই সকল মানুষেরই পক্ষে মঙ্গলের হেতু। প্রথম বয়সে শ্রদ্ধার দ্বারা, সংযমের দ্বারা, ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা প্রস্তুত হইয়া দ্বিতীয় বয়সে সংসার-আশ্রমে মঙ্গলকর্ম্মে আত্মাকে পরিপুষ্ট করিতে হইবে; তৃতীয় বয়সে উদারতর ক্ষেত্রে একে একে সমস্ত বন্ধন শিথিল করিয়া অবশেষে আনন্দের সহিত মৃত্যুকে মোক্ষের নামান্তররূপে গ্রহণ করিবে —মানুষের জীবনকে এমন করিয়া চালাইলেই তবে তাহার আদ্যন্তসঙ্গত পূর্ণতাৎপর্য্য পাওয়া যায়। তবেই সমুদ্র হইতে যে মেঘ উৎপন্ন হইয়া পর্ব্বতের রহস্যগূঢ় গুহা হইতে নদীরূপে বাহির হইল, সমস্ত যাত্রাশেষে আবার তাহাকে সেই সমুদ্রের মধ্যেই পূর্ণতররূপে সম্মিলিত হইতে দেখিয়া তৃপ্তিলাভ করি। মাঝপথে যেখানেই হউক, তাহার অকস্মাৎ অবসান অসঙ্গত, অসমাপ্ত। এ কথা যদি অন্তরের সঙ্গে বুঝিতে পারি, তবে বলিতেই হইবে, এই সত্যকেই উপলব্ধি করিবার জন্য সকল জাতিকেই নানা পথ দিয়া নানা আঘাতে ঠেকিয়া বারংবার চেষ্টা করিতেই হইবে। ইহার কাছে বিলাসীর উপকরণ, নেশনের প্রতাপ, রাজার ঐশ্বর্য্য, বণিকের সমৃদ্ধি, সমস্তই গৌণ; মানুষের আত্মাকে জয়ী হইতে হইবে, মানুষের আত্মাকে মুক্ত হইতে হইবে, তবেই মানুষের এতকালের সমস্ত চেষ্টা সার্থক হইবে— নহিলে ততঃ কিম্, ততঃ কিম্, ততঃ কিম্!*

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

* ওভারটুন্ হলে আহূত আলোচনাসমিতির বিশেষ অধিবেশনে লেখককর্ত্তৃক পঠিত ও বঙ্গদর্শনে প্রথম প্রকাশিত।

রাইবনীদুর্গ।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

বাঙ্গালাদেশে বর্গীর হাঙ্গামায় যাঁহারা সহায়তা করিয়াছিলেন, উড়িষ্যার দেওয়ান মীরহবীব তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। প্রবাদ যে, তিনিই মহারাষ্ট্রীয়গণকে আহ্বান করিয়া আনিয়াছিলেন। ইহার মূলে কোন সত্য আছে কি না, প্রচলিত-ইতিহাস-পাঠে তাহা হৃদয়ঙ্গম হয় না। তবে তাঁহার জীবনী আলোচনা করিলে কথাটা একটু পরিষ্কার হইয়া আসে।

মীরহবীবের প্রাথমিক জীবনকাহিনী তেমন সর্ব্বজনপরিচিত নহে। তিনি সিরাজ-বাসী এবং হুগলীতে সামান্য ব্যবসা করিতেন, ইহা ছাড়া আর কিছু বড় জানা যায় না। লোকে দেখিত, এই ব্যক্তি অত্যন্ত বুদ্ধিমান্, কিন্তু বর্ণজ্ঞানবিহীন। অথচ পারসীভাষায় এরূপ চমৎকার কথা কহিতে সক্ষম যে, তাহা কেবল উচ্চশ্রেণীর পাণ্ডিত্যেই সম্ভব। ক্রমে তিনি নবাব সুজার জামাতা দ্বিতীয় মুর্শিদকুলীর অনুগ্রহভাজন হইলেন। শেষোক্ত ঢাকার নায়েবনাজিম নিযুক্ত হইলে মীরহবীবকে সঙ্গে লইয়া গেলেন এবং কিছুদিনমধ্যে তাঁহাকে নায়েব-দেওয়ানের পদে উন্নীত করিলেন। এইরূপে এই কর্ম্মিষ্ঠ এবং প্রভুপরায়ণ যুবকের অদৃষ্ট খুলিয়া গেল।

কার্য্যক্ষেত্রে দেখা গেল, নিজের উন্নতির জন্য মীরহবীবের অকরণীয় কিছু নাই। জালালপুরের জমিদার সুবউল্লাকে বিশ্বাস-ঘাতকতাপূর্ব্বক নিধন করিয়া তাহার সম্পত্তি-হরণ এবং ত্রিপুরার নির্ব্বাসিত রাজপুত্রের সহিত বন্ধুত্ব-অছিলায় সে রাজ্য আক্রমণ করিয়া চণ্ডীগড় ও জয়ন্তীদুর্গ লুণ্ঠন তাঁহার চরিত্রের দুরপনেয় কলঙ্ক। কিন্তু ভগবানের প্রহেলিকা-ময় এই সংসারে নিত্য যেমন ঘটিয়া থাকে, এই দুই ঘটনা—বিশেষত ত্রিপুরাবিজয়—তাঁহার সৌভাগ্যশ্রীকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিল। দিল্লীর দরবারে পর্য্যন্ত তিনি সুপরিচিত হইয়া উঠিলেন।

ইহার পর উড়িষ্যায় তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র পরিবর্ত্তিত হইল। সুজাখাঁর আহম্মদতকী-নামক যে পুত্র উৎকলপ্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন, তাঁহার মৃত্যু হইলে জামাতা মুর্শিদ-কুলীকে সেখানকার নায়েবনাজিম করিয়া পাঠান হইল। বলা বাহুল্য, মীরহবীব তখন মনিবের দক্ষিণহস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, সঙ্গে না গেলে চলিল না।

তকীখাঁর আমলে উড়িষ্যাবাসীরা অত্যন্ত উৎপীড়িত হইয়াছিল। তাঁহার অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া পুরীর সেবাইৎ রাজা দণ্ডদেব পর্য্যন্ত দেশত্যাগী হইয়া গিয়াছিলেন। উৎকলরাজ্যের বাহিরে চিল্কাহ্রদের অপর তীরে প্রাসাদনির্ম্মাণ করিয়া তিনি তথায় বাস করিতেছিলেন। আর নিকটস্থ পাহাড় দুর্লঙ্ঘ্য ও নিরাপদ্ জানিয়া জগন্নাথদেবমূর্ত্তি তদুপরি স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহাতে সমস্ত ভারতবর্ষে হুলুস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল, এবং পুরুষোত্তমে যাত্রিসমাগম বন্ধ হওয়ায়

উড়িষ্যার রাজস্ব অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। মুর্শিদকুলী হৃদয়বান্ লোক ছিলেন,—প্রজারঞ্জন যে মুখ্য রাজধর্ম্ম, ইহা তিনি বুঝিতেন। হৃদয়ের সঙ্গে মীরহবীবের সম্পর্ক বড় ছিল না, কিন্তু প্রভুর চিত্ত তিনি নখদর্পণে দেখিতেন। তাঁহাকে পরামর্শ দিয়া পুরীরাজকে নিমন্ত্রণ করাইলেন এবং এমন কৌশলে ভয়-মিত্রতায় বশীভূত করিয়া লইলেন যে, দণ্ডদেব দারুব্রহ্ম সহ পুরীমন্দিরে প্রত্যাগত হইতে আপত্তি করিলেন না। প্রধানত এই ঘটনায় মুর্শিদকুলী ও তাঁহার মন্ত্রী অল্পদিনমধ্যে সমগ্র হিন্দুস্থানে অতীব লোকপ্রিয় হইয়াছিলেন। উড়িষ্যায় বাস্তবিক প্রজার সর্ব্ববিধ সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান করিয়া সকল শ্রেণীর প্রতিপত্তিশালী লোকদিগকে তাঁহারা অনুরক্ত-ভক্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন।

গিরিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে নবাব সরফরাজের সহায়তায় যে সকল বীর অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, মীরহবীব তাহার একজন। কিন্তু তিনি স্বয়ং সমরাঙ্গনে প্রাণপাত করার অপেক্ষা রাজনৈতিক কৌশলে আলিবর্দ্দীকে জীবন্তে পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া প্রভূত অর্থোপার্জ্জনের উপায়চিন্তায় অধিকতর ব্যাপৃত ছিলেন। তীক্ষ্ণধী আলিবর্দ্দীর ইহা অজ্ঞাত ছিল না। মীরহবীবের বুদ্ধিমত্তা এবং কার্য্যকুশলতার পরিচয় তিনি অনেকবার পাইয়াছিলেন। উত্তরকালে সেই সিরাজ্‌যুবক বঙ্গের ইতিহাস-বেলায় পদাঙ্ক মুদ্রিত করিয়া যাইবেন, ইহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। গিরিয়ায় বিজয়শ্রীতে মণ্ডিত হইয়া তিনি মীরহবীবের খোঁজখবর করেন নাই, এমন নহে। কিন্তু শঠতায় বৃদ্ধ সেই যুবকের সমকক্ষ ছিলেন না। সরফরাজ হস্তিপৃষ্ঠে নিহত হইলেন দেখিয়াই মীরহবীব ছদ্মবেশে সদলে রণক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। বীরধর্ম্মী ঘোসখাঁর মত আত্মোৎসর্গের মহানুভাবকতা তাঁহার ছিল না।

ক্ষমতা এবং বিত্তলোভ মীরহবীবচরিত্রের প্রধান উপকরণ। আলিবর্দ্দী অকস্মাৎ বঙ্গসিংহাসন অধিকার করিয়া তাহার অন্তরায় হইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। অতএব নূতন নবাবের প্রতি মর্ম্মান্তিক আক্রোশ ও ঘৃণা মীরহবীবের পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। আর, আলিবর্দ্দীখাঁকে বিপন্ন, এমন কি, উৎখাত করিবার উদ্দেশে মহারাষ্ট্রীয় অভিযানকে সাদরে আহ্বান করাও তাঁহার পক্ষে বিচিত্র নহে।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

দুর্দ্দানাবেগম নবাব সুজাউদ্দীনের উপযুক্ত কন্যা। তিনি সুবা-বাঙ্‌লার প্রতিভাবান্ প্রথম নবাব কুলীখাঁ বা মুর্শিদকুলীখাঁর একমাত্র দুহিতা জননী জিন্নেতুন্নেসা-বেগমের ন্যায় ধর্ম্মপরায়ণা ও পতিব্রতা ছিলেন, অথচ মাতার ন্যায় স্বামীর চরিত্রদৌর্ব্বল্যে বিরক্ত হইয়া হাল ছাড়িয়া দিবার পাত্রী ছিলেন না।

মীরহবীবের বুদ্ধিমত্তা এবং কার্য্যকুশলতায় প্রভু যেরূপ সন্তুষ্ট ছিলেন, প্রভুপত্নী তদীয় দুর্জ্জয় লোভ ও ধর্ম্মজ্ঞানশূন্যতার জন্য সেই পরিমাণে তাঁহাকে ঘৃণা করিতেন। দূরদর্শী মীরহবীব ইহা জানিতে পারিয়া পূর্ব্বাহ্নে সাবধান হইতেছিলেন। প্রভুর করুণায় তাঁহার অশেষ বিশ্বাস থাকিলেও তিনি দীর্ঘকালের সাহচর্য্যে মুর্শিদকুলীকে মেরুদণ্ড-বিহীন-চরিত্র এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী বেগমের অঞ্চলতাড়িত বলিয়া জানিতেন। ইহার উপর যখন দেখিলেন, দুর্দ্দানাবেগম জামাতা

বাখরখাঁর সহায়তায় তাঁহার ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি সংযত করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তখন আর আশ্রয়দাতা চিরপ্রতিপালক মুর্শিদকুলীর প্রতি কর্ত্তব্যজ্ঞান অটল রাখিতে পারিলেন না। আলিবর্দ্দী বাঙ্‌লার সিংহাসন অধিকার করিলে সর্ব্বাগ্রে তিনি মানসচক্ষে দেখিতে পাইলেন, একটু স্থির হইয়া বসিতে পারিলেই নূতন নবাব মুর্শিদকুলীর উচ্ছেদ-সাধন করিবেন। অল্পজলের মাছ হইলে উড়িষ্যার এই কৌশলী দেওয়ান গিরিয়ার যুদ্ধাবসানে নবাবসাহেবের শরণাপন্ন হইতেন। কিন্তু তিনি কণ্টকের দ্বারা কণ্টকোৎপাটনের অভিসন্ধি স্থির করিয়া উৎকলে ফিরিয়া গেলেন। জগন্নাথবিগ্রহ পুরীমন্দিরে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করিয়া মুর্শিদকুলী সমগ্র হিন্দু-সমাজের যে সাধুবাদ ও শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়া-ছিলেন, প্রভুর অজ্ঞাতসারে মীরহবীব তাহা কাজে লাগাইবার এই দিব্য সুযোগ উপেক্ষা করিলেন না। ইহার ফলে মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি রঘুজীর সহিত সঙ্গোপনে তাঁহার অনেক চিঠিপত্রবিনিময় হইল। বাঙ্‌লায় বর্গীর হাঙ্গামার মূল কথা ইহাই।

এদিকে নবাব আলিবর্দ্দীখাঁও নিশ্চিন্ত ছিলেন না। উড়িষ্যার নায়েবনাজীম নামে মুর্শিদকুলী হইলেও কার্য্যত মীরহবীবই সর্ব্বেসর্ব্বা, ইহা জানিয়া পূর্ব্বাহ্ণে তিনি এক কৌশল অবলম্বন করিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র এবং জামাতা নোয়াজিস আহাম্মদ ঢাকার নায়েবনাজীম হওয়ার কয়মাস পরে মুর্শিদাবাদ-দরবারে প্রচার হইল যে, ভূতপূর্ব্ব নায়েব-নাজীমের আমলে নায়েব-দেওয়ান বিস্তর তহবিল তছরুপাত করিয়াছে। অমনি মুর্শিদকুলীর প্রতি আদেশ হইল, মীরহবীবকে "ফেলফোর" হিসাবনিকাশের জন্য ঢাকায় পাঠান হয়।

দুর্দ্দানাবেগম এই তহবিল-তছরুপাতের কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া স্বামীকে বুঝাইলেন যে, তাহা অসম্ভব নহে। মুর্শিদকুলী বেগমের সঙ্গে অনেক তর্কবিতর্ক করিলেন। শেষে তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইল যে, সরকারের 'নিমকহালাল' হইলে 'নকুরিয়া' মীর হবীবের পক্ষে দেখিতে দেখিতে প্রভূত ধনরত্নের অধিপতি হওয়া সম্ভব হইত না। দেওয়ান প্রভুকে কিছুতে সমঝাইতে পারিলেন না যে, ইহা তাঁহাকেই পদচ্যুত করার প্রথম "চাল"মাত্র এবং ঊর্ণনাভের লূতাতন্তুবিন্যাস ক্রমশ ঘনীভূত হইয়া উঠিবে।

যাহা হউক, এই সময় হইতে প্রভুভৃত্যে পূর্ব্বের সে প্রীতিবন্ধন ক্রমশ শিথিল হইয়া আসিতেছিল। মীরহবীব হিসাবনিকাশের কাগজ প্রস্তুতের ভাণ করিয়া ঢাকাগমন বিলম্বিত করিতে লাগিলেন। এদিকে আলিবর্দ্দীর রাজত্বকাল একবৎসর পূর্ণ হইল।

মীরহবীবকে করায়ত্ত করা প্রায় অসাধ্য বুঝিয়া নূতন নবাব তখন অসহিষ্ণু হইয়া উঠিলেন। কুলীখাঁকে অতঃপর তিনি যে সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ ইতিপূর্ব্বে করিয়াছি।

ক্রমশ।

অবশেষ।

বসন্ত চলিয়া যায় থাকে ফুলময়ী স্মৃতি,
কোকিলার গান ;
হাহা করে তপ্তবায়ু জ্বালাময় নিদাঘের
হ'লে অবসান!

বরষা কাঁদিয়া যায়, থাকে তার মেঘধ্বনি,
শূন্য হাহাকার,
শরত বিদায় নিলে, তৃণে পড়ি থাকে তার
নয়ন-আসার।

রবি যবে ডুবে যায়, রক্ত মেঘে থাকে তার
দীপ্ত অনুরাগ।
যামিনী পোহায় যবে, ফুলে ফুলে থাকে তার
স্বপনের রাগ!

সরসী শুকায় যবে, থাকে তার পঙ্কজের
বিস্মৃত কাহিনী!
ফুল যবে ঝরি' যায়, থাকে পড়ি তরুতলে
ছায়া উদাসিনী।

কবি যাবে, রবে তার ফুলে ফুলে রূপতৃষা,
নিশ্বাস বাতাসে!
কবি যাবে, মেঘে মেঘে বিচিত্র কল্পনা তার
ভাসিবে আকাশে।
কবি যাবে, রবে তার চির মধুময় গান
তরু-মর্ম্মরে;
কবি যাবে, নদী তার অনাবিল প্রেমরাশি
বহিবে সাগরে।

শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়।

বঙ্গদর্শন

শান্তং শিবমদ্বৈতম্। *

অনন্ত বিশ্বের প্রচণ্ড শক্তিসংঘ দশদিকে ছুটিয়াছে, যিনি শান্তং, তিনি কেন্দ্রস্থলে ধ্রুব হইয়া অচ্ছেদ্য শান্তির বল্গা দিয়া সকলকেই বাঁধিয়া রাখিয়াছেন, কেহ কাহাকেও অতিক্রম করিতে পারিতেছে না। মৃত্যু চতুর্দ্দিকে সঞ্চরণ করিতেছে কিন্তু কিছুই ধ্বংস করিতেছে না, জগতের সমস্ত চেষ্টা স্ব স্ব স্থানে একমাত্র প্রবল কিন্তু তাহাদের সকলের মধ্যে আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য ঘটিয়া অনন্ত আকাশে এক বিপুল সৌন্দর্য্যের বিকাশ হইতেছে। কতই ওঠা-পড়া, কতই ভাঙাচোরা চলিতেছে, কত হানাহানি, কত বিপ্লব, তবু লক্ষ লক্ষ বৎসরের অবিশ্রাম আঘাত-চিহ্ন বিশ্বের চিরনূতন মুখচ্ছবিতে লক্ষ্যই করিতে পারি না। সংসারের অনন্ত চলাচল, অনন্ত কোলাহলের মর্ম্মস্থান হইতে নিত্যকাল এক মন্ত্র ধ্বনিত হইতেছে শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তিঃ। যিনি শান্তং, তাঁহারই আনন্দমূর্ত্তি চরাচরের মহাসনের উপরে ধ্রুবরূপে প্রতিষ্ঠিত।

আমাদের অন্তরাত্মাতেও সেই "শান্তং" যে নিয়ত বিরাজ করিতেছেন, তাঁহার সাক্ষাৎ-লাভ হইবে কি উপায়ে? সেই শান্তস্বরূপের উপাসনা করিতে হইবে কেমন করিয়া? তাঁহার শান্তরূপ আমাদের কাছে প্রকাশ হইবে কবে?

আমরা নিজেরা শান্ত হইলেই সেই শান্ত-স্বরূপের আবির্ভাব আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হইবে। আমাদের অতি ক্ষুদ্র অশান্তিতে জগতের কতখানি যে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, তাহা কি লক্ষ্য করিয়া দেখি নাই? নিভৃত নদীতীরে প্রশান্ত সন্ধ্যায় আমরা দুজনমাত্র লোক যদি কলহ করি, তবে সায়াহ্নের যে অপরিমেয় স্নিগ্ধ নিঃশব্দতা আমাদের পদতলের তৃণাগ্র হইতে আরম্ভ করিয়া সুদূরতম নক্ষত্রলোক পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে, দুটিমাত্র অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তির অতি ক্ষুদ্র কণ্ঠের কলকলায় তাহা আমরা অনুভবও করিতে পারি না। আমার মনের এতটুকু ভয়ে জগৎচরাচর বিভীষিকাময় হইয়া উঠে, আমার মনের এতটুকু লোভে আমার নিকটে সমস্ত বৃহৎ সংসারের মুখশ্রীতে যেন বিকার ঘটে। তাই বলিতেছি, যিনি শান্তং, তাঁহাকে সত্যভাবে অনুভব করিব কি করিয়া, যদি আমি শান্ত না হই? আমাদের অন্তঃকরণের চাঞ্চল্য কেবল নিজের তরঙ্গগুলাকেই বড় করিয়া

---

* বোলপুর শান্তিনিকেতন আশ্রমে ৭ই পৌষের উৎসবে পঠিত।

দেখায়, তাহারই কল্লোল বিশ্বের অন্তরতম বাণীকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।

নানাদিকে আমাদের নানা প্রবৃত্তি যে উদ্দাম হইয়া ছুটিয়াছে, আমাদের মনকে তাহারা, একবার এপথে একবার ওপথে ছিঁড়িয়া লইয়া চলিয়াছে, ইহাদের সকলকে দৃঢ়রশ্মিদ্বারা সংযত করিয়া, সকলকে পরস্পরের সহিত সামঞ্জস্যের নিয়মে আবদ্ধ করিয়া অন্তঃকরণের মধ্যে কর্ত্তৃত্বলাভ করিলে, চঞ্চল পরিধির মাঝখানে অচঞ্চল কেন্দ্রকে স্থাপিত করিয়া নিজেকে স্থির করিতে পারিলে, তবেই এই বিশ্বচরাচরের মধ্যে যিনি শান্তং, তাঁহার উপাসনা, তাঁহার উপলব্ধি সম্ভব হইতে পারে।

জীবনের হ্রাসকে, শক্তির অভাবকে আমরা শান্তি বলিয়া কল্পনা করি। জীবনহীন শান্তি ত মৃত্যু, শক্তিহীন শান্তি ত লুপ্তি। সমস্ত জীবনের সমস্ত শক্তির অচলপ্রতিষ্ঠ আধারস্বরূপ যাহা বিরাজ করিতেছে, তাহাই শান্তি; অদৃশ্য থাকিয়া সমস্ত সুরকে যিনি সঙ্গীত, সমস্ত ঘটনাকে যিনি ইতিহাস করিয়া তুলিতেছেন, একের সহিত অন্যের যিনি সেতু, সমস্ত দিনরাত্রি-মাসপক্ষ-ঋতুসংবৎসর চলিতে চলিতেও যাঁহার দ্বারা বিধৃত হইয়া আছে, তিনিই শান্তম্। নিজের সমস্ত শক্তিকে যে সাধক বিক্ষিপ্ত না করিয়া ধারণ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার নিকটে এই পরম শান্তস্বরূপ প্রত্যক্ষ।

বাষ্পই যে রেলগাড়ি চালায়, তাহা নহে, বাষ্পকে যে স্থিরবুদ্ধি লৌহশৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়াছে, সে-ই গাড়ি চালায়। গাড়ির কলটা চলিতেছে, গাড়ির চাকাগুলা ছুটিতেছে, তবুও গাড়ির মধ্যে গাড়ির এই চলাটাই কর্ত্তা নহে, সমস্ত চলার মধ্যে অচল হইয়া যে আছে, যথেষ্টপরিমাণ চলাকে যথেষ্টপরিমাণ না-চলার দ্বারা যে ব্যক্তি প্রতিমুহূর্ত্তে স্থিরভাবে নিয়মিত করিতেছে, সেই কর্ত্তা। একটা বৃহৎ কারখানার মধ্যে কোনো অজ্ঞলোক যদি প্রবেশ করে, তবে সে মনে করে, এ একটা দানবীয় ব্যাপার; চাকার প্রত্যেক আবর্ত্তন, লৌহদণ্ডের প্রত্যেক আস্ফালন, বাষ্পপুঞ্জের প্রত্যেক উচ্ছ্বাস তাহার মনকে একেবারে বিভ্রান্ত করিতে থাকে, কিন্তু অভিজ্ঞব্যক্তি এই সমস্ত নড়াচড়া-চলাফিরার মূলে একটি স্থির শান্তি দেখিতে পায়—সে জানে ভয়কে অভয় করিয়াছে কে, শক্তিকে সফল করিতেছে কে, গতির মধ্যে স্থিতি কোথায়, কর্ম্মের মধ্যে পরিণামটা কি। সে জানে এই শক্তি যাহাকে আশ্রয় করিয়া চলিতেছে, তাহা শান্তি, সে জানে যেখানে এই শক্তির সার্থক পরিণাম, সেখানেও শান্তি। শান্তির মধ্যে সমস্ত গতির, সমস্ত শক্তির তাৎপর্য্য পাইয়া সে নির্ভয় হয়, সে আনন্দিত হয়।

এই জগতের মধ্যে যে প্রবল প্রচণ্ড শক্তি কেবলমাত্র শক্তিরূপে বিভীষিকা, 'শান্তং' তাহাকেই ফলে-ফুলে প্রাণে-সৌন্দর্য্যে মঙ্গলময় করিয়া তুলিয়াছেন। কারণ, যিনি শান্তং, তিনিই শিবম্। এই শান্তস্বরূপ জগতের সমস্ত উদ্দামশক্তিকে ধারণ করিয়া একটি মঙ্গললক্ষ্যের দিকে লইয়া চলিয়াছেন। শক্তি এই শান্তি হইতে উদ্গত ও শান্তির দ্বারা বিধৃত বলিয়াই তাহা মঙ্গলরূপে প্রকাশিত। তাহা ধাত্রীর মত নিখিলজগৎকে অনাদিকাল হইতে অনিদ্রভাবে প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই রক্ষা করিতেছে। তাহা সকলের মাঝখানে আসীন হইয়া বিশ্বসংসারের ছোট হইতে বড় পর্য্যন্ত

প্রত্যেক পদার্থকে পরস্পরের সহিত অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধবন্ধনে বাঁধিয়া তুলিতেছে। পৃথিবীর ধূলিকণাটুকুও লক্ষযোজনদূরবর্ত্তী সূর্য্যচন্দ্র-গ্রহতারার সঙ্গে নাড়ির যোগে যুক্ত। কেহ কাহারো পক্ষে অনাবশ্যক নহে। এক বিপুল পরিবার, এক বিরাট্ কলেবররূপে নিখিল বিশ্ব তাহার প্রত্যেক অংশ-প্রত্যংশ, তাহার প্রত্যেক অণুপরমাণুর মধ্য দিয়া একই রক্ষণসূত্রে, একই পালনসূত্রে গ্রথিত। সেই রক্ষণী শক্তি, সেই পালনী শক্তি নানা মূর্ত্তি ধরিয়া জগতে সঞ্চরণ করিতেছে; মৃত্যু তাহার এক রূপ, ক্ষতি তাহার এক রূপ, দুঃখ তাহার এক রূপ; সেই মৃত্যু, ক্ষতি ও দুঃখের মধ্য দিয়াও নবতর প্রকাশের লীলা আনন্দে অভিব্যক্ত হইয়া উঠিতেছে। জন্মমৃত্যু, সুখদুঃখ, লাভক্ষতি, সকলেরই মধ্যেই "শিবং" শান্তরূপে বিরাজমান। নহিলে এ সকল ভার এক মুহূর্ত্ত বহন করিত কে! নহিলে আজ যাহা সম্বন্ধবন্ধনরূপে আমাদের পরস্পরকে আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছে, তাহা যে আঘাত করিয়া আমাদিগকে চূর্ণ করিয়া ফেলিত! যাহা আলিঙ্গন, তাহাই যে পীড়ন হইয়া উঠিত। আজ সূর্য্য আমার মঙ্গল করিতেছে, গ্রহতারা আমার মঙ্গল করিতেছে, জল-স্থল-আকাশ আমার মঙ্গল করিতেছে, যে বিশ্বের একটি বালুকণাকেও আমি সম্পূর্ণ জানি না, তাহারই বিরাট্ প্রাঙ্গণে আমি ঘরের ছেলের মত নিশ্চিন্তমনে খেলা করিতেছি; আমিও যেমন সকলের, সকলেও তেমনি আমার—ইহা কেমন করিয়া ঘটিল? যিনি এই প্রশ্নের একটিমাত্র উত্তর, তিনি নিখিলের সকল আকর্ষণ, সকল সম্বন্ধ, সকল কর্ম্মের মধ্যে নিগূঢ় হইয়া, নিস্তব্ধ হইয়া সকলকে রক্ষা করিতেছেন। তিনি শিবম্।

এই শিবস্বরূপকে সত্যভাবে উপলব্ধি করিতে হইলে আমাদিগকেও সমস্ত অশিব পরিহার করিয়া শিব হইতে হইবে। অর্থাৎ শুভকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। যেমন শক্তিহীনতার মধ্যে শান্তি নাই, তেম্নি কর্ম্মহীনতার মধ্যে মঙ্গলকে কেহ পাইতে পারে না। ঔদাসীন্যে মঙ্গল নাই। কর্ম্মসমুদ্র মন্থন করিয়াই মঙ্গলের অমৃত লাভ করা যায়। ভালমন্দের দ্বন্দ্ব, দেবদৈত্যের সংঘাতের ভিতর দিয়া দুর্গম সংসারপথের দুরূহ বাধাসকল কাটাইয়া তবে সেই মঙ্গলনিকেতনের দ্বারে গিয়া পৌঁছিতে পারি—শুভকর্ম্মসাধনদ্বারা সমস্ত ক্ষতিবিপদ্ ক্ষোভবিক্ষোভের ঊর্দ্ধে নিজের অপরাজিত হৃদয়ের মধ্যে মঙ্গলকে যখন ধারণ করিব, তখনি জগতের সকল কর্ম্মের, সকল উত্থানপতনের মধ্যে সুস্পষ্ট দেখিতে পাইব, তিনি রহিয়াছেন, যিনি শান্তং, যিনি শিবম্। তখন ঘোরতর দুর্লক্ষণ দেখিয়াও ভয় পাইব না; নৈরাশ্যের ঘনান্ধকারে আমাদের সমস্ত শক্তিকে যেখানে পরাস্ত দেখিব, সেখানেও জানিব, তিনি রাখিয়াছেন, যিনি শিবম্।

তিনি অদ্বৈতম্। তিনি অদ্বিতীয়, তিনি এক।

সংসারের সব-কিছুকে পৃথক্ করিয়া, বিচিত্র করিয়া গণনা করিতে গেলে বুদ্ধি অভিভূত হইয়া পড়ে, আমাদিগকে হার মানিতে হয়। তবু ত সংখ্যার অতীত এই বৈচিত্র্যের মহাসমুদ্রের মধ্যে আমরা পাগল হইয়া যাই নাই, আমরা ত চিন্তা করিতে

পারিতেছি; অতি ক্ষুদ্র আমরাও এই অপরিসীম বৈচিত্র্যের সঙ্গে ত একটা ব্যবহারিক সম্বন্ধ পাতাইতে পারিয়াছি। প্রত্যেক ধূলিকণাটির সম্বন্ধে আমাদিগকে ত প্রতিমুহূর্ত্তে স্বতন্ত্র করিয়া ভাবিতে হয় না, সমস্ত পৃথিবীকে ত আমরা একসঙ্গে গ্রহণ করিয়া লই, তাহাতে ত কিছুই বাধে না। কত বস্তু, কত কর্ম্ম, কত মানুষ; কত লক্ষকোটি বিষয় আমাদের জ্ঞানের মধ্যে বোঝাই হইতেছে; কিন্তু সে বোঝার ভারে আমাদের হৃদয়মন ত একেবারে পিষিয়া যায় না? কেন যায় না? সমস্ত গণনাতীত বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যসঞ্চার করিয়া তিনি যে আছেন, যিনি একমাত্র, যিনি অদ্বৈতম্। তাই সমস্ত ভার লঘু হইয়া গেছে। তাই মানুষের মন আপনার সকল বোঝা নামাইয়া নিষ্কৃতি পাইবার জন্য অনেকের মধ্যে খুঁজিয়া ফিরিতেছে তাঁহাকেই, যিনি অদ্বৈতম্। আমাদের সকলকে লইয়া যদি এই এক না থাকিতেন, তবে আমরা কেহ কাহাকেও কিছুমাত্র জানিতাম কি? তবে আমাদের পরস্পরের মধ্যে কোনোপ্রকারের আদানপ্রদান কিছুমাত্র হইতে পারিত কি? তবে আমরা পরস্পরের ভার ও পরস্পরের আঘাত এক মুহূর্ত্তও সহ্য করিতে পারিতাম কি? বহুর মধ্যে ঐক্যের সন্ধান পাইলেই তবে আমাদের বুদ্ধির শ্রান্তি দূর হইয়া যায়, পরের সহিত আপনার ঐক্য উপলব্ধি করিলে তবেই আমাদের হৃদয় আনন্দিত হয়। বাস্তবিক প্রধানত আমরা যাহা-কিছু চাই, তাহার লক্ষ্যই এই ঐক্য। আমরা ধন চাই, কারণ, এক ধনের মধ্যে ছোটবড় বহুতর বিষয় ঐক্যলাভ করিয়াছে; সেইজন্য বহুতর বিষয়কে প্রত্যহ পৃথক্‌রূপে সংগ্রহ করিবার দুঃখ ও বিচ্ছিন্নতা ধনের দ্বারাই দূর হয়। আমরা খ্যাতি চাই, কারণ, এক খ্যাতির দ্বারা নানা লোকের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ একেবারেই বাঁধিয়া যায়—খ্যাতি যাহার নাই, সকল লোকের সঙ্গে সে যেন পৃথক্। ভাবিয়া দেখিলে দেখিতে পাইব, পার্থক্য যেখানে, মানুষের দুঃখ সেখানে, ক্লান্তি সেখানে; কারণ, মানুষের সীমা সেখানেই। যে আত্মীয়, তাহার সঙ্গ আমাকে শ্রান্ত করে না; যে বন্ধু, সে আমার চিত্তকে প্রতিহত করে না; যাহাকে আমার নহে বলিয়া জানি, সেই আমাকে বাধা দেয়, সেই, হয় অভাবের, নয় বিরোধের কষ্ট দিয়া আমাকে কিছু-না-কিছু পীড়িত করে। পৃথিবীতে আমরা সমস্ত মিলনের মধ্যে, সমস্ত সম্বন্ধের মধ্যে ঐক্যবোধ করিবামাত্র যে আনন্দ অনুভব করি, তাহাতে সেই অদ্বৈতকে নির্দ্দেশ করিতেছে। আমাদের সকল আকাঙ্ক্ষার মূলেই জ্ঞানে-অজ্ঞানে সেই অদ্বৈতের সন্ধান রহিয়াছে। অদ্বৈতই আনন্দ।

এই যিনি অদ্বৈতং, তাঁহার উপাসনা করিব কেমন করিয়া? পরকে আপন করিয়া, অহমিকাকে খর্ব্ব করিয়া, বিরোধের কাঁটা উৎপাটন করিয়া, প্রেমের পথ প্রশস্ত করিয়া। আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পশ্যতি—সকল প্রাণীকে আত্মবৎ যে দেখে, সেই যথার্থ দেখে। কারণ, সে জগতের সমস্ত পার্থক্যের মধ্যে পরম সত্য যে অদ্বৈতং, তাঁহাকেই দেখে। অন্যকে যখন আঘাত করিতে যাই, তখন সেই অদ্বৈতের উপলব্ধিকে হারাই, সেইজন্য তাহাতে দুঃখ দিই ও দুঃখ পাই; নিজের স্বার্থের দিকেই যখন তাকাই, তখন সেই অদ্বৈতং প্রচ্ছন্ন হইয়া যান, সেইজন্য স্বার্থসাধনার মধ্যে এত মোহ, এত দুঃখ।

জ্ঞানে, কর্ম্মে ও প্রেমে শান্তকে, শিবকে ও অদ্বৈতকে উপলব্ধি করিবার একটি পর্য্যায় উপনিষদের ‘শান্তং শিবমদ্বৈতম্’ মন্ত্রে কেমন নিগূঢ়ভাবে নিহিত আছে, তাহাই আলোচনা করিয়া দেখ।

প্রথমে শান্তম্। আরম্ভেই জগতের বিচিত্র-শক্তি মানুষের চোখে পড়ে। যতক্ষণ শান্তিতে তাহার পর্য্যাপ্তি দেখিতে না পাই, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কত ভয়, কত সংশয়, কত অমূলক কল্পনা। সকল শক্তির মূলে যখন অমোঘ নিয়মের মধ্যে দেখিতে পাই শান্তং, তখন আমাদের কল্পনা শান্তি পায়। শক্তির মধ্যে তিনি নিয়মস্বরূপ, তিনি শান্তম্। মানুষ আপন অন্তঃকরণের মধ্যেও প্রবৃত্তিরূপিণী অনেকগুলি শক্তি লইয়া সংসারে প্রবেশ করে; যতক্ষণ তাহাদের উপর কর্ত্তৃত্বলাভ না করিতে পারে, ততক্ষণ পদে পদে বিপদ্, ততক্ষণ দুঃখের সীমা নাই। অতএব এই সমস্ত শক্তিকে শান্তির মধ্যে সংবরণ করিয়া আনাই মানুষের জীবনের সর্ব্বপ্রথম কাজ। এই সাধনায় যখন সিদ্ধ হইব, তখন জলে-স্থলে-আকাশে সেই শান্তস্বরূপকে দেখিব, যিনি জগতের অসংখ্য শক্তিকে নিয়মিত করিয়া অনাদি-অনন্তকাল স্থির হইয়া আছেন। এইজন্য আমাদের জীবনের প্রথম আশ্রম ব্রহ্মচর্য্য—শক্তির মধ্যে শান্তিলাভের সাধনা।

পরে শিবম্। সংযমের দ্বারা শক্তিকে আয়ত্ত করিতে পারিলেই তবে কর্ম্ম করা সহজ হয়। এইরূপে কর্ম্ম যখন আরম্ভ করি, তখন নানা লোকের সঙ্গে নানা সম্বন্ধে জড়াইয়া পড়িতে হয়। এই আত্মপরের সংস্রবেই যত ভালমন্দ, যত পাপপুণ্য, যত আঘাতপ্রতিঘাত। শান্তি যেমন নানা শক্তিকে যথোচিতভাবে সংবরণ করিয়া তাহাদের বিরোধভঞ্জন করিয়া দেয়—তেম্নি সংসারে আত্মপরের শতসহস্র সম্বন্ধের অপরিসীম জটিলতার মধ্যে কে সামঞ্জস্য স্থাপন করে? মঙ্গল। শান্তি না থাকিলে জগৎপ্রকৃতির প্রলয়, মঙ্গল না থাকিলে মানবসমাজের ধ্বংস। শান্তকে শক্তিসঙ্কুল জগতে উপলব্ধি করিতে হইবে, শিবকে সম্বন্ধ-সঙ্কুল সংসারে উপলব্ধি করিতে হইবে। তাঁহার শান্তস্বরূপকে জ্ঞানের দ্বারা ও তাঁহার শিব-স্বরূপকে শুভকর্ম্মের দ্বারা মনে ধারণা করিতে হইবে। আমাদের শাস্ত্রে বিধান আছে, প্রথমে ব্রহ্মচর্য্য, পরে গার্হস্থ্য,—প্রথমে শিক্ষার দ্বারা প্রস্তুত হওয়া, পরে কর্ম্মের দ্বারা পরিপক্ক হওয়া। প্রথমে শান্তং, পরে শিবম্।

তার পরে অদ্বৈতম্। এইখানেই সমাপ্তি। শিক্ষাতেও সমাপ্তি নয়, কর্ম্মেও সমাপ্তি নয়। কেনই বা শিখিব, কেনই বা খাটিব? একটা কোথাও ত তাহার পরিণাম আছে। সেই পরিণাম অদ্বৈতম্। তাহাই নিরবচ্ছিন্ন প্রেম, তাহাই নির্ব্বিকার আনন্দ। মঙ্গলকর্ম্মের সাধনায় যখন কর্ম্মের বন্ধন ক্ষয় হইয়া যায়, অহঙ্কারের তীব্রতা নষ্ট হইয়া আসে, যখন আত্মপরের সমস্ত সম্বন্ধের বিরোধ ঘুচিয়া যায়, তখনই নম্রতাদ্বারা, ক্ষমার দ্বারা, করুণার দ্বারা প্রেমের পথ প্রস্তুত হইয়া আসে। তখন অদ্বৈতম্। তখন সমস্ত সাধনার সিদ্ধি, সমস্ত কর্ম্মের অবসান। তখন মানবজীবন তাহার প্রারম্ভ হইতে পরিণাম পর্য্যন্ত পরিপূর্ণ;—কোথাও সে আর অসঙ্গত, অসমাপ্ত, অর্থহীন নহে।

হে পরমাত্মন্, মানবজীবনের সকল

প্রার্থনার অভ্যন্তরে একটিমাত্র গভীরতম প্রার্থনা আছে, তাহা আমরা বুদ্ধিতে জানি বা না জানি, তাহা আমরা মুখে বলি বা না বলি, আমাদের ভ্রমের মধ্যেও, আমাদের দুঃখের মধ্যেও, আমাদের অন্তরাত্মা হইতে সে প্রার্থনা সর্ব্বদাই তোমার অভিমুখে পথ খুঁজিয়া চলিতেছে। সে প্রার্থনা এই যে, আমাদের সমস্ত জ্ঞানের দ্বারা যেন শান্তকে জানিতে পারি, আমাদের সমস্ত কর্ম্মের দ্বারা যেন শিবকে দেখিতে পাই, আমাদের সমস্ত প্রেমের দ্বারা যেন অদ্বৈতকে উপলব্ধি করি। ফললাভের প্রত্যাশা সাহস করিয়া তোমাকে জানাইতে পারি না, কিন্তু আমার আকাঙ্ক্ষা এইমাত্র যে, সমস্ত বিঘ্ন-বিক্ষেপ-বিকৃতির মধ্যেও এই প্রার্থনা যেন সমস্ত শক্তির সহিত সত্যভাবে তোমার নিকট উপস্থিত করিতে পারি। অন্য সমস্ত বাসনাকে ব্যর্থ করিয়া হে অন্তর্যামিন্ আমার এই প্রার্থনাকেই গ্রহণ কর যে, আমি কদাপি যেন জ্ঞানে, কর্ম্মে, প্রেমে উপলব্ধি করিতে পারি যে, তুমি শান্তং শিবম্ অদ্বৈতম্।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সৌন্দর্য্যবোধ।

প্রথম বয়সে ব্রহ্মচর্য্যপালন করিয়া নিয়মে-সংযমে জীবনকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। ভারতবর্ষের এই প্রাচীন উপদেশের কথা তুলিতে গেলে অনেকের মনে এই তর্ক উঠিবে, "এ যে বড় কঠোর সাধনা। ইহার দ্বারা না হয় খুব একটা শক্ত মানুষ তৈরি করিয়া তুলিলে, না হয় বাসনার দড়িদড়া ছিঁড়িয়া মস্ত একজন সাধুপুরুষ হইয়া উঠিলে, কিন্তু এ সাধনায় রসের স্থান কোথায়? কোথায় গেল সাহিত্য, চিত্র, সঙ্গীত? মানুষকে যদি পুরা করিয়া তুলিতে হয়, তবে সৌন্দর্য্য-চর্চ্চাকে ফাঁকি দেওয়া চলে না।"

এ ত ঠিক কথা। সৌন্দর্য্য ত চাই। আত্মহত্যা ত সাধনার বিষয় হইতে পারে না, আত্মার বিকাশই সাধনার লক্ষ্য। বস্তুত শিক্ষাকালে ব্রহ্মচর্য্যপালন শুষ্কতার সাধনা নয়। ক্ষেত্রকে মরুভূমি করিয়া তুলিবার জন্য চাষা খাটিয়া মরে না। চাষা যখন লাঙল দিয়া মাটি বিদীর্ণ করে, মই দিয়া ঢেলা দলিয়া গুঁড়া করিতে থাকে, নিড়ানী দিয়া সমস্ত ঘাস ও গুল্ম উপ্‌ড়াইয়া ক্ষেত্রটাকে একেবারে শূন্য করিয়া ফেলে, তখন আনাড়ি লোকের মনে হইতে পারে, জমিটার উপর উৎপীড়ন চলিতেছে। কিন্তু এম্‌নি করিয়াই ফল ফলাইতে হয়। তেম্‌নি যথার্থভাবে রসগ্রহণের অধিকারী হইতে গেলে গোড়ায় কঠিন চাষেরই দরকার। রসের পথেই পথ ভুলাইবার অনেক উপসর্গ আছে। সে পথে সমস্ত বিপদ্ এড়াইয়া পূর্ণতালাভ করিতে যে চায়, নিয়মসংযম তাহারই বেশি আবশ্যক। রসের জন্যই এই নীরসতা স্বীকার করিয়া লইতে হয়।

মানুষের দুর্ভাগ্য এই যে, উপলক্ষ্যের দ্বারা

লক্ষ্য প্রায়ই চাপা পড়ে; সে গান শিখিতে চায়, ওস্তাদী শিখিয়া বসে; ধনী হইতে চায়, টাকা জমাইয়া কৃপাপাত্র হইয়া ওঠে; দেশের হিত চায়, কমিটিতে রেজোল্যুশন্ পাস্ করিয়াই নিজেকে কৃতার্থ মনে করে।

তেম্‌নি নিয়মসংযমটাই চরম লক্ষ্যের সমস্ত জায়গা জুড়িয়া বসিয়া আছে, এ আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই। নিয়মটাকেই যাহারা লাভ, যাহারা পুণ্য মনে করে, তাহারা নিয়মের লোভে একেবারে লুব্ধ হইয়া উঠে। নিয়মলোলুপতা বড়্‌রিপুর জায়গায় সপ্তম রিপু হইয়া দেখা দেয়।

এটা মানুষের জড়ত্বের একটা লক্ষণ। সঞ্চয় করিতে সুরু করিলে মানুষ আর থামিতে চায় না। বিলাতের কথা শুনিতে পাই, সেখানে কত লোক পাগলের মত কেবল দেশবিদেশের ছাপমারা ডাকের টিকিট সংগ্রহ করিতেছে, সেজন্য সন্ধানের এবং খরচের অন্ত নাই। এইরূপ সংগ্রহবায়ুদ্বারা ক্ষেপিয়া উঠিয়া কেহ বা চিনের বাসন, কেহ বা পুরাতন জুতা সংগ্রহ করিয়া মরিতেছে। উত্তরমেরুর ঠিক কেন্দ্রস্থানটিতে গিয়া কোনোমতে একটা ধ্বজা পুঁতিয়া আসিতে হইবে, সেও এম্‌নি একটা ব্যাপার। সেখানে বরফের ক্ষেত্র ছাড়া আর কিছু নাই কিন্তু মন নিবৃত্ত হইতেছে না— কে সেই মেরুমরুর কেন্দ্রবিন্দুটির কত মাইল কাছে যাইতেছে, তাহারই অঙ্কপাতের নেশা পাইয়া বসিয়াছে। পাহাড়ে যে যত ফুট উচ্চে উঠিয়াছে, সে ততটাকেই একটা লাভ বলিয়া গর্ব্ব করিতেছে; এই শূন্য লাভের জন্য নিজে মরিতেছে এবং কত অনিচ্ছুক মজুরদিগকে জোর করিয়া মারিতেছে, তবু থামিতে চাহিতেছে না।

অপব্যয় এবং ক্লেশ যতই বেশি, প্রয়োজনহীন সঞ্চয় ও পরিণামহীন জয়লাভের গৌরবও তত বেশি বলিয়া বোধ হয়। নিয়মসাধনার লোভও ক্লেশের পরিমাণ খতাইয়া আনন্দভোগ করে। কঠিন শয্যায় শুইয়া যদি সুরু করা যায়, তবে মাটিতে বিছানা পাতিয়া, পরে একখানিমাত্র কম্বল বিছাইয়া, পরে কম্বল ছাড়িয়া শুধু মাটিতে শুইবার লোভ ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতে থাকে। কৃচ্ছ্রসাধনটাকেই লাভ মনে করিয়া শেষকালে আত্মঘাতে আসিয়া দাঁড়ি টানিতে হয়। ইহা আর-কিছু নয়, নিবৃত্তিকেই একটা প্রচণ্ড প্রবৃত্তি করিয়া তোলা, গলার ফাঁস ছিঁড়িবার চেষ্টাতেই গলায় ফাঁস আঁটিয়া মরা।

অতএব কেবলমাত্র নিয়মপালন করাটাকেই যদি লোভের জিনিব করিয়া তোলা যায়, তবে কঠোরতার চাপ কেবলই বাড়াইয়া তুলিয়া স্বভাব হইতে সৌন্দর্য্যবোধকে একেবারে পিষিয়া বাহির করা যাইতে পারে, সন্দেহ নাই। কিন্তু পূর্ণতালাভের প্রতিই লক্ষ্য রাখিয়া সংযমচর্চ্চাকেও যদি ঠিকমত সংযত করিয়া রাখিতে পারি, তবে মনুষ্যত্বের কোনো উপাদানই আঘাত পায় না, বরঞ্চ পরিপুষ্ট হইয়া উঠে।

কথাটা এই যে, ভিতমাত্রই শক্ত হইয়া থাকে, না হইলে তাহা আশ্রয় দিতে পারে না। যাহা-কিছু ধারণ করিয়া থাকে, যাহা আকৃতিদান করে, তাহা কঠিন। মানুষের শরীর যতই নরম হোক্ না কেন, যদি শক্ত হাড়ের উপরে তাহার পত্তন না হইত, তবে সে একটা পিণ্ড হইয়া থাকিত, তাহার চেহারা খুলিতই না। তেম্‌নি জ্ঞানের ভিত্তিটাও শক্ত,

আনন্দের ভিত্তিটাও শক্ত। জ্ঞানের ভিত্তি যদি শক্ত না হইত, তবে ত সে কেবল খাপছাড়া স্বপ্ন হইত, আর আনন্দের ভিত্তি যদি শক্ত না হইত, তবে তাহা নিতান্তই পাগ্‌লামি মাত্‌লামি হইয়া উঠিত!

এই যে শক্ত ভিত্তি, ইহাই সংযম। ইহার মধ্যে বিচার আছে, বল আছে, ত্যাগ আছে, ইহার মধ্যে নির্ম্মম দৃঢ়তা আছে। ইহা দেবতার মত এক হাতে বর দেয়, আর এক হাতে সংহার করে। এই সংযম গড়িবার বেলাও যেমন দৃঢ়, ভাঙিবার বেলাও তেম্‌নি কঠিন। সৌন্দর্য্যকে পূরামাত্রায় ভোগ করিতে গেলে এই সংযমের প্রয়োজন; নতুবা প্রবৃত্তি অসংযত থাকিলে শিশু ভাতের থালা লইয়া যেমন অন্নব্যঞ্জন কেবল গায়ে মাখিয়া মাটিতে ছড়াইয়া বিপরীত কাণ্ড করিয়া তোলে, অথচ অল্পই তাহার পেটে যায়— ভোগের সামগ্রী লইয়া আমাদের সেই দশা হয়; আমরা কেবল তাহা গায়েই মাখি, লাভ করিতে পারি না।

সৌন্দর্য্যসৃষ্টি করাও অসংযত কল্পনাবৃত্তির কর্ম্ম নহে। সমস্ত ঘরে আগুন লাগাইয়া দিয়া কেহ সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালায় না। একটুতেই আগুন হাতের বাহির হইয়া যায় বলিয়াই ঘর আলো করিতে আগুনের উপর দখল রাখা চাই। প্রবৃত্তিসম্বন্ধেও সে কথা খাটে। প্রবৃত্তিকে যদি একেবারে পূরামাত্রায় জ্বলিয়া উঠিতে দিই, তবে যে-সৌন্দর্য্যকে কেবল রাঙাইয়া তুলিবার জন্য তাহার প্রয়োজন, তাহাকে জ্বালাইয়া ছাই করিয়া তবে সে ছাড়ে, ফুলকে তুলিতে গিয়া তাহাকে ছিঁড়িয়া ধূলায় লুটাইয়া দেয়।

এ কথা সত্য, সংসারে আমাদের ক্ষুধিত প্রবৃত্তি যেখানে পাত পাড়িয়া বসে, তাহার কাছাকাছি প্রায়ই একটা সৌন্দর্য্যের আয়োজন দেখিতে পাওয়া যায়। ফল যে কেবল আমাদের পেট ভরায়, তাহা নহে, তাহা স্বাদে, গন্ধে, দৃশ্যে সুন্দর। কিছুমাত্র সুন্দর যদি না-ও হইত, তবু আমরা তাহাকে পেটের দায়েই খাইতাম। আমাদের এত বড় একটা গরজ থাকা সত্ত্বেও কেবল পেট ভরাইবার দিক্ হইতে নয়, সৌন্দর্য্যভোগের দিক্ হইতেও সে আমাদিগকে আনন্দ দিতেছে। এটা আমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত লাভ।

জগতে সৌন্দর্য্য বলিয়া এই যে আমাদের একটা উপ্‌রি পাওনা, ইহা আমাদের মনকে কোন্‌দিকে চালাইতেছে? ক্ষুধাতৃপ্তির ঝোঁকটাই যাহাতে একেশ্বর হইয়া না ওঠে, যাহাতে আমাদের মন হইতে তাহার ফাঁস একটু আল্‌গা হয়, সৌন্দর্য্যের সেই চেষ্টা দেখিতে পাই। চণ্ডী ক্ষুধা অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া বলিতেছে, তোমাকে খাইতেই হইবে, ইহার উপরে আর কোনো কথা নাই। অম্‌নি সৌন্দর্য্যলক্ষ্মী হাসিমুখে সুধাবর্ষণ করিয়া অত্যুগ্র প্রয়োজনের চোখরাঙানিকে আড়াল করিয়া দিতেছেন, পেটের জ্বালাকে নীচের তলায় রাখিয়া উপরের মহালে আনন্দভোজের মনোহর আয়োজন করিতেছেন। অনিবার্য্য প্রয়োজনের মধ্যে মানুষের একটা অবমাননা আছে, কিন্তু সৌন্দর্য্য নাকি প্রয়োজনের বাড়া, এইজন্য সে আমাদের অপমান দূর করিয়া দেয়। সৌন্দর্য্য আমাদের ক্ষুধাতৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই সর্ব্বদা একটা উচ্চতর সুর লাগাইতেছে বলিয়াই, যাহারা একদিন অসংযত বর্ব্বর ছিল,

তাহারা আজ মানুষ হইয়া উঠিয়াছে,—যে কেবল ইন্দ্রিয়েরই দোহাই মানিত, সে আজ প্রেমের বশ মানিয়াছে। আজ ক্ষুধা লাগিলেও আমরা পশুর মত রাক্ষসের মত যেমন-তেমন করিয়া খাইতে বসিতে পারি না—শোভনতাটুকু রক্ষা না করিলে আমাদের খাইবার প্রবৃত্তিই চলিয়া যায়। অতএব এখন আমাদের খাইবার প্রবৃত্তিই একমাত্র নহে, শোভনতা তাহাকে নরম করিয়া আনিয়াছে। আমরা ছেলেকে লজ্জা দিয়া বলি, ছিছি অমন লোভীর মত খাইতে আছে! সেরূপ খাওয়া দেখিতে কুশ্রী। সৌন্দর্য্য আমাদের প্রবৃত্তিকে সংযত করিয়া আনিয়াছে। জগতের সঙ্গে আমাদের কেবলমাত্র প্রয়োজনের সম্বন্ধ না রাখিয়া আনন্দের সম্বন্ধ পাতাইয়াছে। প্রয়োজনের সম্বন্ধে আমাদের দৈন্য, আমাদের দাসত্ব আনন্দের সম্বন্ধেই আমাদের মুক্তি।

তবেই দেখা যাইতেছে, পরিণামে সৌন্দর্য্য মানুষকে সংযমের দিকেই টানিতেছে। মানুষকে সে এমন একটি অমৃত দিতেছে, যাহা পান করিয়া মানুষ ক্ষুধার রূঢ়তাকে দিনে দিনে জয় করিতেছে। অসংযমকে অমঙ্গল বলিয়া পরিত্যাগ করিতে যাহার মনে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, সে তাহাকে অসুন্দর বলিয়া ইচ্ছা করিয়া ত্যাগ করিতে চাহিতেছে।

সৌন্দর্য্য যেমন আমাদিগকে ক্রমে ক্রমে শোভনতার দিকে, সংযমের দিকে আকর্ষণ করিয়া আনিতেছে, সংযমও তেম্নি আমাদের সৌন্দর্য্যভোগের গভীরতা বাড়াইয়া দিতেছে। স্তব্ধভাবে নিবিষ্ট হইতে না জানিলে আমরা সৌন্দর্য্যের মর্ম্মস্থান হইতে রস উদ্ধার করিতে পারি না। একপরায়ণা সতী স্ত্রীই ত প্রেমের যথার্থ সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে পারে, স্বৈরিণী ত পারে না। সতীত্ব সেই চাঞ্চল্যবিহীন সংযম, যাহার দ্বারা গভীরভাবে প্রেমের নিগূঢ়রস লাভ করা সম্ভব হয়। আমাদের সৌন্দর্য্য-প্রিয়তার মধ্যেও যদি সেই সতীত্বের সংযম না থাকে, তবে কি হয়? সে কেবলই সৌন্দর্য্যের বাহিরে বাহিরে চঞ্চল হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়; মত্ততাকেই আনন্দ বলিয়া ভুল করে; যাহাকে পাইলে সে একেবারে সব ছাড়িয়া স্থির হইয়া বসিতে পারিত, তাহাকে পায় না। যথার্থ সৌন্দর্য্য সমাহিত সাধকের কাছেই প্রত্যক্ষ, লোলুপ ভোগীর কাছে নহে। যে লোক পেটুক, সে ভোজনের রসজ্ঞ হইতে পারে না।

পৌষ্যরাজা ঋষিকুমার উতঙ্ককে কহিলেন, যাও অন্তঃপুরে যাও, সেখানে মহিষীকে দেখিতে পাইবে। উতঙ্ক অন্তঃপুরে গেলেন, কিন্তু মহিষীকে দেখিতে পাইলেন না। অশুচি হইয়া কেহ সতীকে দেখিতে পাইত না—উতঙ্ক তখন অশুচি ছিলেন।

বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্য্যের, সমস্ত মহিমার অন্তঃপুরে যে সতী, যে লক্ষ্মী বিরাজ করিতেছেন, তিনিও আমাদের সমুখেই আছেন, কিন্তু শুচি না হইলে দেখিতে পাইব না। যখন বিলাসে হাবুডুবু খাই, ভোগের নেশায় মাতিয়া বেড়াই, তখন বিশ্বজগতের আলোকবসনা সতীলক্ষ্মী আমাদের দৃষ্টি হইতে অন্তর্ধান করেন।

এ কথা ধর্ম্মনীতিপ্রচারের দিক্ হইতে বলিতেছি না; আনন্দের দিক্ হইতে—যাহাকে ইংরেজীতে আর্ট বলে—তাহারই তরফ হইতে বলিতেছি। আমাদের শাস্ত্রেও বলে, কেবল ধর্ম্মের জন্যে নয়, সুখের জন্যও সংযত হইবে। সুখার্থী সংযতো ভবেৎ। অর্থাৎ

ইচ্ছার যদি চরিতার্থতা চাও, তবে ইচ্ছাকে শাসনে রাখ—যদি সৌন্দর্য্যভোগ করিতে চাও, তবে ভোগলালসাকে দমন করিয়া শুচি হইয়া শান্ত হও। প্রবৃত্তিকে যদি দমন করিতে না জানি, তবে প্রবৃত্তিরই চরিতার্থতাকে আমরা সৌন্দর্য্যবোধের চরিতার্থতা বলিয়া ভুল করি— যাহা চিত্তের জিনিষ, তাহাকে দুই হাতে করিয়া দলিয়া মনে করি, যেন তাহাকে পাইলাম। এইজন্যই বলিয়াছি, সৌন্দর্য্যবোধ ঠিকমত উদ্বোধনের জন্য ব্রহ্মচর্য্যের সাধনাই আবশ্যক।

যাঁহাদের চোখে ধূলা দেওয়া শক্ত, তাঁহারা হঠাৎ সন্দিগ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিবেন, এ যে একেবারে কবিত্ব আসিয়া পড়িল। তাঁহারা বলিবেন, সংসারে ত আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই, যে-সকল কলাকুশল গুণীরা সৌন্দর্য্যসৃষ্টি করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা অনেকেই সংযমের দৃষ্টান্ত রাখিয়া যান নাই। তাঁহাদের জীবনচরিতটা পাঠ্য নহে। অতএব কবিত্ব রাখিয়া এই বাস্তব সত্যটার আলোচনা করা দরকার।

আমার বক্তব্য এই যে, বাস্তবকে আমরা এত বেশি বিশ্বাস করি কেন? কারণ, সে প্রত্যক্ষগোচর। কিন্তু অনেকস্থলেই মানুষের সম্বন্ধে আমরা যাহাকে বাস্তব বলি, তাহার বেশির ভাগই আমাদের অপ্রত্যক্ষ। একটুখানি দেখিতে পাই বলিয়া মনে করি সবটাই যেন দেখিতে পাইলাম, এইজন্য মানুষঘটিত বাস্তববৃত্তান্ত লইয়া একজন যাহাকে শাদা বলে, আর একজন তাহাকে মেটে বলিলেও বাঁচিতাম, তাহাকে একেবারে কালো বলিয়া বসে। নেপোলিয়নকে কেহ বলে দেবতা, কেহ বলে দানব। আকবরকে কেহ বলে উদার প্রজাহিতৈষী, কেহ বলে তাঁহার হিন্দুপ্রজার পক্ষে তিনিই যত নষ্টের গোড়া। কেহ বলেন বর্ণভেদেই আমাদের হিন্দুসমাজ রক্ষা করিয়াছে, কেহ বলে বর্ণভেদের প্রথাই আমাদিগকে একেবারে মাটি করিয়া দিল। অথচ উভয় পক্ষেই বাস্তবসত্যের দোহাই দেয়।

বস্তুত মানুষঘটিত ব্যাপারে একই জায়গায় আমরা অনেক উল্টাকাণ্ড দেখিতে পাই। মানুষের দেখা-অংশের মধ্যে যে সকল বৈপরীত্য প্রকাশ পায়, মানুষের না-দেখা অংশের মধ্যেই নিশ্চয় তাহার একটা নিগূঢ় সমন্বয় আছে;— অতএব আসল সত্যটা যে প্রত্যক্ষের উপরেই ভাসিয়া বেড়াইতেছে, তাহা নহে, অপ্রত্যক্ষের মধ্যেই ডুবিয়া আছে—এইজন্যই তাহাকে লইয়া এত তর্ক, এত দলাদলি এবং এইজন্যই একই ইতিহাসকে দুই বিরুদ্ধপক্ষে ওকালতনামা দিয়া থাকে।

জগতের কলানিপুণ গুণীদের সম্বন্ধেও যেখানে আমরা উল্টাকাণ্ড দেখিতে পাই, সেখানেও বাস্তবসত্যের বড়াই করিয়া হঠাৎ কিছু বিরুদ্ধ কথা বলিয়া বসা যায় না। সৌন্দর্য্যসৃষ্টি দুর্ব্বলতা হইতে, চঞ্চলতা হইতে, অসংযম হইতে ঘটিতেছে, এটা যে একটা অত্যন্ত বিরুদ্ধ কথা। বাস্তবসত্য সাক্ষ্য দিলেও আমরা বলিব, নিশ্চয় সকল সাক্ষীকে হাজির পাওয়া যায় নাই, আসল সাক্ষীটি পালাইয়া বসিয়া আছে। যদি দেখি কোনো ডাকাতের দল খুবই উন্নতি করিতেছে, তবে সেই বাস্তবসত্যের সহায়ে এরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, দস্যুবৃত্তিই উন্নতির উপায়। তখন এই কথা বিনা প্রমাণেই বলা যাইতে পারে যে, দস্যুদের

আপাতত যেটুকু উন্নতি দেখা যাইতেছে, তাহার মূল কারণ নিজেদের মধ্যে ঐক্য, অর্থাৎ দলের মধ্যে পরস্পরের প্রতি ধর্ম্মরক্ষা; আবার এই উন্নতি যখন নষ্ট হইবে, তখন এই ঐক্যকেই নষ্ট হইবার কারণ বলিয়া বসিব না, তখন বলিব অন্যের প্রতি অধর্ম্মাচরণই তাহাদের পতনের কারণ। যদি দেখি একই লোক বাণিজ্যে প্রচুর টাকা করিয়া ভোগে তাহা উড়াইয়া দিয়াছেন, তবে এ কথা বলিব না যে, যাহারা টাকা নষ্ট করিতে পারে, টাকা-উপার্জ্জনের পন্থা তাহারাই জানে; বরং এই কথাই বলিব টাকা রোজগার করিবার ব্যাপারে এই লোকটি হিসাবী ছিলেন, সেখানে তাঁহার সংযম ও বিবেচনাশক্তি সাধারণ লোকের চেয়ে অনেক বেশি ছিল; আর টাকা উড়াইবার বেলা তাঁহার উড়াইবার ঝোঁক হিসাবের বুদ্ধিকে ছাড়াইয়া গিয়াছে।

কলাবান্ গুণীরাও যেখানে বস্তুত গুণী, সেখানে তাঁহারা তপস্বী; সেখানে যথেচ্ছাচার চলিতে পারে না; সেখানে চিত্তের সাধনা ও সংযম আছেই। অল্প লোকই এমন পুরাপুরি বলিষ্ঠ যে, তাঁহাদের ধর্ম্মবোধকে ষোলো-আনা কাজে লাগাইতে পারেন। কিছু-না-কিছু ভ্রষ্টতা আসিয়া পড়ে। কারণ, আমরা সকলেই হীনতা হইতে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছি, চরমে আসিয়া দাঁড়াই নাই। কিন্তু জীবনে আমরা যে-কোনো স্থায়ী বড়জিনিষ গড়িয়া তুলি, তাহা আমাদের অন্তরের ধর্ম্মবুদ্ধির সাহায্যেই ঘটে, ভ্রষ্টতার সাহায্যে নহে। গুণী ব্যক্তিরাও যেখানে তাঁহাদের কলারচনা স্থাপন করিয়াছেন, সেখানে তাঁহাদের চরিত্রই দেখাইয়াছেন; যেখানে তাঁহাদের জীবনকে নষ্ট করিয়াছেন, সেখানে চরিত্রের অভাব প্রকাশ পাইয়াছে। সেখানে, তাঁহাদের মনের ভিতরে ধর্ম্মের একটি সুন্দর আদর্শ আছে, রিপুর টানে তাহার বিরুদ্ধে গিয়া পীড়িত হইয়াছেন। গড়িয়া তুলিতে সংযম দরকার হয়, নষ্ট করিতে অসংযম। ধারণা করিতে সংযম চাই, আর মিথ্যা বুঝিতেই অসংযম।

এখানে কথা উঠিবে, তবেই ত একই মানুষের মধ্যে সৌন্দর্য্যবিকাশের ক্ষমতা ও চরিত্রের অসংযম একত্রেই থাকিতে পারে; তবে ত দেখি, বাঘে-গোরুতে এক ঘাটেই জল খায়।

বাঘে-গোরুতে এক ঘাটে জল খায় না বটে, কিন্তু সে কখন্? যখন বাঘও পূর্ণতা পাইয়া উঠিয়াছে, গোরুও পূর্ণগোরু হইয়াছে। শিশু-অবস্থায় উভয়ে এক সঙ্গে খেলা করিতেও পারে—বড় হইলে বাঘও ঝাঁপ দিয়া পড়ে, গোরুও দৌড় দিতে চেষ্টা করে।

তেম্‌নি সৌন্দর্য্যবোধের যথার্থ পরিণত-ভাব কখনই প্রবৃত্তির বিক্ষোভ, চিত্তের অসংযমের সঙ্গে একক্ষেত্রে টিঁকিতে পারে না। পরস্পর পরস্পরের বিরোধী।

যদি বল কেন বিরোধী, তাহার কারণ আছে। বিশ্বামিত্র বিধাতার সঙ্গে আড়াআড়ি করিয়া একটা জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সেটা তাঁহার ক্রোধের সৃষ্টি, দম্ভের সৃষ্টি,—সুতরাং সেই সৃষ্টি বিধাতার জগতের সঙ্গে মিশ খাইল না—তাহাকে স্পর্দ্ধা করিয়া আঘাত করিতে লাগিল—খাপছাড়া সৃষ্টিছাড়া হইয়া রহিল, চরাচরের সঙ্গে সুর মিলাইতে পারিল

না—অবশেষে পীড়া দিয়া পীড়া পাইয়া সেটা মরিল।

আমাদের প্রবৃত্তি উগ্র হইয়া উঠিলে বিধাতার জগতের বিরুদ্ধে নিজে যেন সৃষ্টি করিতে থাকে। তখন চারিদিকের সঙ্গে তাহার আর মিল খায় না। আমাদের ক্রোধ, আমাদের লোভ নিজের চারিদিকে এমন সকল বিকার উৎপাদন করে, যাহাতে ছোটই বড় হইয়া উঠে, বড়ই ছোট হইয়া যায়, যাহা ক্ষণকালের, তাহাকেই চিরকালের বলিয়া মনে হয়, যাহা চিরকালের, তাহা চোখেই পড়ে না। যাহার প্রতি আমাদের লোভ জন্মে, তাহাকে আমরা এম্‌নি অসত্য করিয়া গড়িয়া তুলি যে, জগতের বড় বড় সত্যকে সে আচ্ছন্ন করিয়া দাঁড়ায়, চন্দ্রসূর্য্যতারাকে সে ম্লান করিয়া দেয়। ইহাতে আমাদের সৃষ্টি বিধাতার সঙ্গে বিরোধ করিতে থাকে।

মনে কর নদী চলিতেছে; তাহার প্রত্যেক ঢেউ স্বতন্ত্র হইয়া মাথা তুলিলেও তাহারা সকলে মিলিয়া সেই এক সমুদ্রের দিকে গান করিতে করিতে চলিতেছে। কেহ কাহাকেও বাধা দিতেছে না। কিন্তু ইহার মধ্যে যদি কোথাও পাক পড়িয়া যায়, তবে সেই ঘূর্ণা এক জায়গাতেই দাঁড়াইয়া উন্মত্তের মত ঘুরিতে থাকে,—চলিবার বাধা দিয়া ডুবাইবার চেষ্টা করে; সমস্ত নদীর যে গতি, যে অভিপ্রায়, তাহাতে ব্যাঘাত জন্মাইয়া সে স্থিরত্বও লাভ করে না, অগ্রসর হইতেও পারে না।

আমাদের কোন-একটা প্রবৃত্তি উন্মত্ত হইয়া উঠিলে সেও আমাদিগকে নিখিলের প্রবাহ হইতে টানিয়া-লইয়া একটা বিন্দুর উপরেই ঘুরাইয়া মারিতে থাকে। আমাদের চিত্ত সেই একটা কেন্দ্রের চারিদিকেই বাঁধ পড়িয়া তাহার মধ্যেই আপনার সমস্ত বিসর্জ্জন করিতে ও অন্যের সমস্ত নষ্ট করিতে চায়। এই উন্মত্ততার মধ্যে একদল লোক একরকমের সৌন্দর্য্য দেখে। এমন কি, আমার মনে হয়, য়ুরোপীয় সাহিত্যে এই পাক-খাওয়া প্রবৃত্তির ঘূর্ণীনৃত্যের প্রলয়োৎসব,—যাহার কোনো পরিণাম নাই, যাহার কোথাও শান্তি নাই,—তাহাতেই যেন বেশি সুখ পাইয়াছে। কিন্তু ইহাকে আমরা শিক্ষার সম্পূর্ণতা বলিতে পারি না, ইহা স্বভাবের বিকৃতি। সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে দেখিলে যাহাকে হঠাৎ মনোহর বলিয়া বোধ হয়, নিখিলের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিলেই তাহার সৌন্দর্য্যের বিরোধ চোখে ধরা পড়ে। মদের বৈঠকে মাতাল জগৎসংসারকে ভুলিয়া-গিয়া নিজেদের সভাকে বৈকুণ্ঠপুরী বলিয়া মনে করে, কিন্তু অপ্রমত্ত দর্শক চারিদিকের সংসারের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিলেই তাহার বীভৎসতা বুঝিতে পারে। আমাদের প্রবৃত্তিরও উৎপাত যখন ঘটে, তখন সে একটা অস্বাভাবিক দীপ্তিলাভ করিলেও বৃহৎ বিশ্বের মাঝখানে তাহাকে ধরিয়া দেখিলেই তাহার কুশ্রীতা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। এম্‌নি করিয়া স্থিরভাবে যে ব্যক্তি বড়র সঙ্গে ছোটকে, সমগ্রের সঙ্গে প্রত্যেককে মিলাইয়া দেখিতে না জানে, সে উত্তেজনাকেই আনন্দ ও বিকৃতিকেই সৌন্দর্য্য বলিয়া ভ্রম করে। এইজন্যই সৌন্দর্য্যবোধকে পূর্ণভাবে লাভ করিতে হইলে চিত্তের শান্তি চাই; তাহা অসংযমের দ্বারা হইবার জো নাই।

সৌন্দর্য্যবোধের সম্পূর্ণতা কোন্‌দিকে চলিয়াছে, তাহাই দেখা যাক্‌।

ইহা দেখা গেছে, বর্ব্বরজাতি যাহাকে সুন্দর বলিয়া আদর করে, সভ্যজাতি তাহাকে দূরে ফেলিয়া দেয়। ইহার প্রধান কারণ, বর্ব্বরের মন যেটুকু ক্ষেত্রের মধ্যে আছে, সভ্যলোকের মন সেটুকু ক্ষেত্রের মধ্যে নাই। ভিতরে ও বাহিরে, দেশে ও কালে সভ্যজাতির জগৎটাই যে বড় এবং তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অত্যন্ত বিচিত্র। এইজন্যই বর্ব্বরের জগতে ও সভ্যের জগতে বস্তুর মাপ এবং ওজন এক হইতেই পারে না।

ছবিসম্বন্ধে যে ব্যক্তি আনাড়ি, সে একটা পটের উপরে খুব খানিকটা রংচং বা গোলগাল আকৃতি দেখিলেই খুসি হইয়া উঠে। ছবিকে সে বড় ক্ষেত্রে রাখিয়া দেখিতেছে না। এখানে তাহার ইন্দ্রিয়ের রাশ টানিয়া ধরিবে, এমন কোন উচ্চতর বিচারবুদ্ধি নাই। গোড়াতেই যাহা তাহাকে আহ্বান করে, তাহারই কাছে সে আপনাকে ধরা দিয়া বসে। রাজবাড়ীর দেউড়ির দরোয়ানজির চাপরাস ও চাঁপদাড়ি দেখিয়া তাহাকেই সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি মনে করিয়া সে অভিভূত হইয়া পড়ে, দেউড়ি পার হইয়া সভায় যাইবার কোনো প্রয়োজন সে অনুভব করিতেই পারে না। কিন্তু যে লোক এত বড় গ্রাম্য নহে, সে এত সহজে ভোলে না। সে জানে, দরোয়ানের মহিমাটা হঠাৎ খুব বেশি করিয়া চোখে পড়ে বটে, কারণ চোখে পড়ার বেশি মহিমা যে তাহার নাই। রাজার মহিমা কেবলমাত্র চোখে পড়িবার বিষয় নহে, তাহাকে মন দিয়াও দেখিতে হয়। এইজন্য রাজার মহিমার মধ্যে একটা শক্তি আছে, গাম্ভীর্য্য আছে।

অতএব যে ব্যক্তি সমজ্‌দার, ছবিতে সে একটা রংচঙের ঘটা দেখিলেই অভিভূত হইয়া পড়ে না। সে মুখের সঙ্গে গৌণের, মাঝখানের সঙ্গে চারিপাশের, সমুখের সঙ্গে পিছনের একটা সামঞ্জস্য খুঁজিতে থাকে। রংচঙে চোখ ধরা পড়ে, কিন্তু সামঞ্জস্যের সুষমা দেখিতে মনের প্রয়োজন। তাহাকে গভীরভাবে দেখিতে হয়, এইজন্য তাহার আনন্দ গভীরতর।

এই কারণে অনেক গুণী দেখা যায়,—বাহিরের ক্ষুদ্র লালিত্যকে যাঁহারা আমল দিতে চান না; তাঁহাদের সৃষ্টির মধ্যে যেন একটা কঠোরতা আছে। তাঁহাদের ধ্রুপদের মধ্যে খেয়ালের তান নাই। হঠাৎ তাহার বাহিরের রিক্ততা দেখিয়া ইতর লোকে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে চাহে; অথচ সেই নির্ম্মল রিক্ততার গভীরতর ঐশ্বর্য্যই বিশিষ্টলোকের চিত্তকে বৃহৎ আনন্দ দান করে।

তবেই দেখা যাইতেছে, শুধু চোখের দৃষ্টি নহে, তাহার পিছনে মনের দৃষ্টি যোগ না দিলে সৌন্দর্য্যকে বড় করিয়া দেখা যায় না। এই মনের দৃষ্টি লাভ করা বিশেষ শিক্ষার কর্ম্ম।

মনেরও আবার অনেক স্তর আছে। কেবল বুদ্ধিবিচার দিয়া আমরা যতটুকু দেখিতে পাই, তাহার সঙ্গে হৃদয়ভাব যোগ দিলে ক্ষেত্র আরো বাড়িয়া যায়—ধর্ম্মবুদ্ধি যোগ দিলে আরো অনেকদূর চোখে পড়ে, অধ্যাত্মদৃষ্টি খুলিয়া গেলে দৃষ্টিক্ষেত্রের আর সীমা পাওয়া যায় না।

অতএব যে দেখাতে আমাদের মনের বড় অংশ অধিকার করে, সেই দেখাতেই আমরা বেশি তৃপ্তি পাই। ফুলের সৌন্দর্য্যের চেয়ে

মানুষের মুখ আমাদিগকে বেশি টানে, কেন না, মানুষের মুখে শুধু আকৃতির সুষমা নয়, তাহাতে চেতনার দীপ্তি, বুদ্ধির স্ফূর্ত্তি, হৃদয়ের লাবণ্য আছে, তাহা আমাদের চৈতন্যকে, বুদ্ধিকে, হৃদয়কে দখল করিয়া বসে। তাহা আমাদের আছে শীঘ্র ফুরাইতে চায় না।

আবার মানুষের মধ্যে যাঁহারা নরোত্তম, ধরাতলে যাঁহারা ঈশ্বরের মঙ্গলস্বরূপের প্রকাশ, তাঁহারা আমাদের মনের এতদূর পর্য্যন্ত টান দেন, সেখানে আমরা নিজেরাই 'নাগাল পাই না। এইজন্য যে-রাজপুত্র মনুষের দুঃখ-মোচনের উপায়চিন্তা করিতে রাজ্য ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন, তাঁহার মনোহারিতা মানুষকে কত কাব্য, কত চিত্ররচনায় লাগাইয়াছে, তাহার সীমা নাই।

এইখানে সন্দিগ্ধ লোকেরা বলিবেন, সৌন্দর্য্য হইতে যে ধর্ম্মনীতির কথা আসিয়া পড়িল! দুটোতে ঘোলাইয়া দিবার দরকার কি! যাহা ভালো, তাহা ভালো এবং যাহা সুন্দর, তাহা সুন্দর। ভালো আমাদের মনকে একরকম করিয়া টানে, সুন্দর আমাদের মনকে আর-একরকম করিয়া টানে—উভয়ের আকর্ষণ-প্রণালীর ভিন্নতা আছে বলিয়াই ভাষায় দুটোকে দুই নাম দিয়া থাকে। যাহা ভালো তাহার প্রয়োজনীয়তা আমাদিগকে মুগ্ধ করে, আর যাহা সুন্দর, তাহা যে কেন মুগ্ধ করে, সে আমরা জানি না।

এ সম্বন্ধে আমার বলিবার একটা কথা এই যে, মঙ্গল আমাদের ভাল করে বলিয়াই যে তাহাকে আমরা ভাল বলি, ইহা বলিলে সবটা বলা হয় না। যথার্থ যে মঙ্গল, তাহা আমাদের প্রয়োজনসাধন করে এবং তাহা সুন্দর;—অর্থাৎ প্রয়োজনসাধনের উর্দ্ধেও তাহার একটা অহেতুক আকর্ষণ আছে। নীতি-পণ্ডিতেরা জগতের প্রয়োজনের দিক্ হইতে নীতি উপদেশ দিয়া মঙ্গলপ্রচার করিতে চেষ্টা করেন এবং কবিরা মঙ্গলকে তাহার অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যমূর্ত্তিতে লোকের কাছে প্রকাশ করিয়া থাকেন।

বস্তুত মঙ্গল যে সুন্দর, সে আমাদের প্রয়োজনসাধন করে বলিয়া নহে। ভাত আমাদের কাজে লাগে, কাপড় আমাদের কাজে লাগে, ছাতা-জুতা আমাদের কাজে লাগে; ভাতকাপড়-ছাতাজুতা আমাদের মনে সৌন্দর্য্যের পুলক সঞ্চার করে না। কিন্তু লক্ষ্মণ রামের সঙ্গে সঙ্গে বনে গেলেন, এই সংবাদে আমাদের মনের মধ্যে বীণার তারে যেন একটা সঙ্গীত বাজাইয়া তোলে। ইহা সুন্দর ভাষাতেই, সুন্দর ছন্দেই, সুন্দর করিয়া সাজাইয়া স্থায়ী করিয়া রাখিবার বিষয়। ছোট ভাই বড় ভাইয়ের সেবা করিলে সমাজের হিত হয় বলিয়া যে এ কথা বলিতেছি, তাহা নহে, ইহা সুন্দর বলিয়াই। কেন সুন্দর? কারণ, মঙ্গলমাত্রেরই সমস্ত জগতের সঙ্গে একটা গভীরতম সামঞ্জস্য আছে, সকল মানুষের মনের সঙ্গে তাহার নিগূঢ় মিল আছে। সত্যের সঙ্গে মঙ্গলের সেই পূর্ণসামঞ্জস্য দেখিতে পাইলেই তাহার সৌন্দর্য্য আর আমাদের অগোচর থাকে না। করুণা সুন্দর, ক্ষমা সুন্দর, প্রেম সুন্দর;—শতদলপদ্মের সঙ্গে, পূর্ণিমার চাঁদের সঙ্গে তাহার তুলনা হয়; শতদলপদ্মের মত, পূর্ণিমার চাঁদের মত নিজের মধ্যে এবং চারিদিকের জগতের মধ্যে তাহার একটি বিরোধহীন সুষমা আছে;—সে নিখি-

লের অনুকূল এবং নিখিল তাহার অনুকূল। আমাদের পুরাণে লক্ষ্মী কেবল সৌন্দর্য্য এবং ঐশ্বর্য্যের দেবী নহেন, তিনি মঙ্গলের দেবী। সৌন্দর্য্যমূর্ত্তিই মঙ্গলের পূর্ণমূর্ত্তি এবং মঙ্গলমূর্ত্তিই সৌন্দর্য্যের পূর্ণস্বরূপ।

সৌন্দর্য্যে ও মঙ্গলে যে জায়গায় মিল আছে, সে জায়গাটা বিচার করিয়া দেখা যাক্।

আমরা প্রথমেই দেখাইয়াছি, সৌন্দর্য্য প্রয়োজনের বাড়া। এইজন্য তাহাকে আমরা ঐশ্বর্য্য বলিয়া মানি। এইজন্য তাহা আমাদিগকে নিছক স্বার্থসাধনের দারিদ্র্য হইতে প্রেমের মধ্যে মুক্তি দেয়।

মঙ্গলের মধ্যেও আমরা সেই ঐশ্বর্য্য দেখি। যখন দেখি, কোনো বীরপুরুষ ধর্ম্মের জন্য স্বার্থ ছাড়িয়াছেন, প্রাণ দিয়াছেন, তখন এমন একটা আশ্চর্য্য পদার্থ আমাদের চোখে পড়ে, যাহা আমাদের সুখদুঃখের চেয়ে বেশি, আমাদের স্বার্থের চেয়ে বড়, আমাদের প্রাণের চেয়ে মহৎ। মঙ্গল নিজের এই ঐশ্বর্য্যের জোরে ক্ষতি ও ক্লেশকে ক্ষতি ও ক্লেশ বলিয়া গণ্যই করে না। স্বার্থের ক্ষতিতে তাহার ক্ষতি হইবার জো নাই। এইজন্য সৌন্দর্য্য যেমন আমাদিগকে স্বেচ্ছাকৃত ত্যাগে প্রবৃত্ত করে, মঙ্গলও সেইরূপ করে। সৌন্দর্য্য জগদ্ব্যাপারের মধ্যে ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যকে প্রকাশ করে, মঙ্গলও মানুষের জীবনের মধ্যে তাহাই করিয়া থাকে; মঙ্গল, সৌন্দর্য্যকে শুধু চোখের দেখা নয়, শুধু বুদ্ধির বোঝা নয়, তাহাকে আরো ব্যাপক, আরো গভীর করিয়া মানুষের কাছে আনিয়া দিয়াছে; তাহা ঈশ্বরের সামগ্রীকে অত্যন্তই মানুষের সামগ্রী করিয়া তুলিয়াছে। বস্তুত মঙ্গল মনুষ্যের নিকটবর্ত্তী অন্তরতর সৌন্দর্য্য; এইজন্যই তাহাকে আমরা অনেকসময় সহজে সুন্দর বলিয়া বুঝিতে পারি না—কিন্তু যখন বুঝি, তখন আমাদের প্রাণ বর্ষার নদীর মত ভরিয়া উঠে। তখন আমরা তাহার চেয়ে রমণীয় আর কিছুই দেখি না।

ফুলপাতা, প্রদীপের মালা এবং সোনারূপার থালি দিয়া যদি ভোজের জায়গা সাজাইতে পার, সে ত ভালই, কিন্তু নিমন্ত্রিত যদি যজ্ঞকর্ত্তার কাছ হইতে সমাদর না পায়,—হৃদ্যতা না পায়, তবে এ সমস্ত ঐশ্বর্য্য ও সৌন্দর্য্য তাহার কাছে রোচে না, কারণ এই হৃদ্যতাই অন্তরের ঐশ্বর্য্য, অন্তরের প্রাচুর্য্য। হৃদ্যতার মিষ্টহাস্য, মিষ্টবাক্য, মিষ্টব্যবহার এমন সুন্দর যে, তাহা কলার পাতাকেও সোনার থালার চেয়ে বেশি মূল্য দেয়। সকলের কাছেই যে দেয়, এ কথাও বলিতে পারি না। বহু আড়ম্বরের ভোজে অপমানস্বীকার করিয়াও প্রবেশ করিতে প্রস্তুত, এমন লোকও অনেক দেখা যায়। কেন দেখা যায়? কারণ, ভোজের বড় তাৎপর্য্য, বৃহৎ সৌন্দর্য্য সে বোঝে না। বস্তুত খাওয়াটা বা সজ্জাটাই ভোজের প্রধান অঙ্গ নহে। কুঁড়ির পাপ্‌ড়িগুলি যেমন নিজের মধ্যেই কুঞ্চিত, তেম্‌নি স্বার্থরত মানুষের শক্তি নিজের দিকেই চিরদিন সঙ্কুচিত, একদিন তাহার বাঁধন ঢিলা করিয়া তাহাকে পরাভিমুখ করিবামাত্র ফোটাফুলের মত বিশ্বের দিকে তাহার মিলনমাধুর্য্যময় অতি সুন্দর বিস্তার ঘটে— যজ্ঞের সেই ভিতরদিক্‌টার গভীরতর মঙ্গলসৌন্দর্য্য যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ দেখিতে পায় না, তাহার কাছে ভোজ্যপেয়ের প্রাচুর্য্য ও সাজসজ্জার আড়ম্বরই

বড় হইয়া উঠে। তাহার অসংযত প্রবৃত্তি, তাহার দানদক্ষিণা-পানভোজনের অতিমাত্র লোভ যজ্ঞের উদার মাধুর্য্যকে ভাল করিয়া দেখিতে দেয় না।

শাস্ত্রে বলে, শক্তস্য ভূষণং ক্ষমা। ক্ষমাই শক্তিমানের ভূষণ। কিন্তু ক্ষমাপ্রকাশের মধ্যেই শক্তির সৌন্দর্য্য-অনুভব ত সকলের কর্ম্ম নহে। বরঞ্চ সাধারণ মূঢ়লোকেরা শক্তির উপদ্রব দেখিলেই তাহার প্রতি শ্রদ্ধা-বোধ করে। লজ্জা স্ত্রীলোকের ভূষণ। কিন্তু সাজসজ্জার চেয়ে এই লজ্জার সৌন্দর্য্য কে দেখিতে পায়? যে ব্যক্তি সৌন্দর্য্যকে সঙ্কীর্ণ করিয়া দেখে না। সঙ্কীর্ণ প্রকাশের তরঙ্গ-ভঙ্গ যখন বিস্তীর্ণ প্রকাশের মধ্যে শান্ত হইয়া গেছে, তখন সেই বড় সৌন্দর্য্যকে দেখিতে হইলে উচ্চভূমি হইতে প্রশস্তভাবে দেখা চাই। তেমন করিয়া দেখার জন্য মানুষের শিক্ষা চাই, গাম্ভীর্য্য চাই, অন্তরের [illegible] চাই।

আমাদের দেশের প্রাচীন কবিরা গর্ভিণী নারীর সৌন্দর্য্যবর্ণনায় কোথাও কুণ্ঠাপ্রকাশ করেন নাই। য়ুরোপের কবি এখানে একটা লজ্জা ও দীনতা বোধ করেন। বস্তুত গর্ভিণী রমণীর যে কান্তি, সেটাতে চোখের উৎসব তেমন নাই। নারীত্বের চরম সার্থকতালাভ যখন আসন্ন হইয়া আসে, তখন তাহারই প্রতীক্ষা নারীমূর্ত্তিকে গৌরবে ভরিয়া তোলে। এই দৃশ্যে চোখের বিলাসে যেটুকু কম পড়ে, মনের ভক্তিতে তাহার চেয়ে অনেক বেশি পূরণ করিয়া দেয়। সমস্ত বৃষ্টি ঝরিয়া-পড়িয়া শরতের যে হাল্কা মেঘ বিনা কারণে গায়ে হাওয়া লাগাইয়া উড়িয়া বেড়ায়, তাহার উপরে যখন অস্তসূর্য্যের আলো পড়ে, তখন রঙের ছটায় চোখ ধাঁদিয়া যায়। কিন্তু আষাঢ়ের যে নূতন ঘন মেঘ পয়স্বিনী কালো গাভী-টির মত আসন্ন বৃষ্টির ভারে একেবারে মন্থর হইয়া পড়িয়াছে; যাহার পুঞ্জ-পুঞ্জ সজলতার মধ্যে বর্ণবৈচিত্র্যের চাপল্য কোথাও নাই, সে আমাদের মনকে চারিদিক্ হইতে এমন করিয়া ঘনাইয়া ধরে যে, কোথাও যেন কিছু ফাঁক রাখে না। ধরণীর তাপশান্তি, শস্য-ক্ষেত্রের দৈন্যনিবৃত্তি, নদীসরোবরের কৃশতামোচ-নের উদার আশ্বাস তাহার স্নিগ্ধ নীলিমার মধ্যে যে মাখানো;—মঙ্গলময় পরিপূর্ণতার গম্ভীর মাধুর্য্যে সে স্তব্ধ হইয়া থাকে। কালিদাস ত বসন্তের বাতাসকে বিরহী যক্ষের দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারিতেন। এ কার্য্যে তাহার হাতযশ আছে বলিয়া লোকে রটনা করে; বিশেষত উত্তরে যাইতে হইলে দক্ষিণা-বাতাসকে কিছুমাত্র উজানে যাইতে হইত না। কিন্তু কবি প্রথম-আষাঢ়ের নূতন মেঘকেই পছন্দ করিলেন সে যে জগতের তাপ নিবারণ করে—সে কি শুধু প্রণয়ীর বার্ত্তা প্রণয়িনীর কানের কাছে প্রলপিত করিবে? সে যে সমস্ত পথটার নদী-গিরি-কাননের উপর বিচিত্র পূর্ণতার সঞ্চার করিতে করিতে যাইবে। কদম্ব ফুটিবে, জম্বুকুঞ্জ ভরিয়া উঠিবে, বলাকা উড়িয়া চলিবে, ভরা নদীর জল ছলছল করিয়া তাহার কূলের বেত্রবনে আসিয়া ঠেকিবে, এবং জনপদ-বধূর ভ্রূবিলাসহীন প্রীতিস্নিগ্ধলোচনের দৃষ্টিপাতে আষাঢ়ের আকাশ যেন আরো জুড়াইয়া যাইবে। বিরহীর বার্ত্তাপ্রেরণকে সমস্ত পৃথিবীর মঙ্গল-ব্যাপারের সঙ্গে পদে-পদে গাঁথিয়া-গাঁথিয়া তবে কবির সৌন্দর্য্যরসপিপাসু চিত্ত তৃপ্তিলাভ করিয়াছে।

কবির সৌন্দর্য্যরসপিপাসু চিত্ত তৃপ্তিলাভ করিয়াছে।

কুমারসম্ভবের কবি অকালবসন্তের আকস্মিক উৎসবে, পুষ্পশরের মোহবর্ষণের মধ্যে হরপার্ব্বতীর মিলনকে চূড়ান্ত করিয়া তোলেন নাই। স্ত্রীপুরুষের উন্মত্ত সংঘাত হইতে যে আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, সেই প্রলয়াগ্নিতে আগে তিনি শান্তিধারা বর্ষণ করিয়াছেন, তবে ত মিলনের প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলেন। কবি গৌরীর প্রেমের সর্ব্বাপেক্ষা কমনীয়মূর্ত্তি তপস্যার অগ্নির দ্বারাই উজ্জ্বল করিয়া দেখাইয়াছেন। সেখানে বসন্তের পুষ্পসম্পদ্ ম্লান, কোকিলের মুখরতা স্তব্ধ। অভিজ্ঞানশকুন্তলেও প্রেয়সী যেখানে জননী হইয়াছেন, বাসনার চাঞ্চল্য যেখানে বেদনার তপস্যায় গাম্ভীর্য্যলাভ করিয়াছে, যেখানে অনুতাপের সঙ্গে ক্ষমা আসিয়া মিলিয়াছে, সেইখানেই রাজদম্পতির মিলন সার্থক হইয়াছে। প্রথম মিলনে প্রলয়, দ্বিতীয় মিলনেই পরিত্রাণ। এই দুই কাব্যেই শান্তির মধ্যে, মঙ্গলের মধ্যে যেখানেই কবি সৌন্দর্য্যের সম্পূর্ণতা দেখাইয়াছেন, সেখানেই তাঁহার তূলিকা বর্ণবিরল, তাঁহার বীণা অপ্রমত্ত।

বস্তুত সৌন্দর্য্য যেখানেই পরিণতিলাভ করিয়াছে, সেখানেই সে আপনার প্রগল্‌ভতা দূর করিয়া দিয়াছে। সেখানেই ফুল আপনার বর্ণগন্ধের বাহুল্যকে ফলের গূঢ়তর মাধুর্য্যে পরিণত করিয়াছে; সেই পরিণতিতেই সৌন্দর্য্যের সহিত মঙ্গল একাঙ্গ হইয়া উঠিয়াছে।

সৌন্দর্য্য ও মঙ্গলের এই সম্মিলন যে দেখিয়াছে, সে ভোগবিলাসের সঙ্গে সৌন্দর্য্যকে কখনই জড়াইয়া রাখিতে পারে না। তাহার জীবনযাত্রার উপকরণ সাদাসিধা হইয়া থাকে; সেটা সৌন্দর্য্যবোধের অভাব হইতে হয় না, প্রকর্ষ হইতেই হয়। অশোকের প্রমোদ-উদ্যান কোথায় ছিল? তাঁহার রাজবাড়ীর ভিতের কোনো চিহ্নও ত দেখিতে পাই না। কিন্তু অশোকের রচিত স্তূপ ও স্তম্ভ বুদ্ধগয়ার বোধিবটমূলের কাছে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার শিল্পকলাও সামান্য নহে। যে পুণ্যস্থানে ভগবান্ বুদ্ধ মানবের দুঃখনিবৃত্তির পথ আবিষ্কার করিয়াছিলেন, রাজচক্রবর্ত্তী অশোক সেইখানেই, সেই পরমমঙ্গলের স্মরণক্ষেত্রেই কলাসৌন্দর্য্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। নিজের ভোগকে এই পূজার অর্ঘ্য তিনি এমন করিয়া দেন নাই। এই ভারতবর্ষে কত দুর্গম গিরিশিখরে, কত নির্জ্জন সমুদ্রতীরে কত দেবালয়, কত কলাশোভন পুণ্যকীর্ত্তি দেখিতে পাই, কিন্তু হিন্দুরাজাদের বিলাসভবনের স্মৃতিচিহ্ন কোথায় গেল? রাজধানী-নগর ছাড়িয়া অরণ্যপর্ব্বতে এই সমস্ত সৌন্দর্য্যস্থাপনার কারণ কি? কারণ আছে। সেখানে মানুষ নিজের সৌন্দর্য্যসৃষ্টির দ্বারা নিজের চেয়ে বড়র প্রতিই বিস্ময়পূর্ণ ভক্তি প্রকাশ করিয়াছে। মানুষের রচিত সৌন্দর্য্য দাঁড়াইয়া আপনার চেয়ে বড় সৌন্দর্য্যকে দুই হাত তুলিয়া অভিবাদন করিতেছে; নিজের সমস্ত মহত্ত্ব দিয়া নিজের চেয়ে মহত্তরকেই নীরবে প্রচার করিতেছে। মানুষ এই সকল কারুপরিপূর্ণ নিস্তব্ধভাষার দ্বারা বলিয়াছে—দেখ, চাহিয়া দেখ, যিনি সুন্দর তাঁহাকে দেখ, যিনি মহান্ তাঁহাকে দেখ! সে এ কথা বলিতে চাহে নাই যে, আমি কত

বড় ভোগী, সেইটে দেখিয়া লও! সে বলে নাই, জীবিত অবস্থায় আমি যেখানে বিহার করিতাম সেখানে চাও, মৃত অবস্থায় আমি যেখানে মাটিতে মিশাইয়াছি সেখানেও আমার মহিমা দেখ! জানি না, প্রাচীন হিন্দুরাজারা নিজেদের প্রমোদভবনকে তেমন করিয়া অলঙ্কৃত করিতেন কি না; অন্তত ইহা নিশ্চয় যে, হিন্দুজাতি সেগুলিকে সমাদর করিয়া রক্ষা করে নাই;—যাহাদের গৌরবপ্রচারের জন্য তাহারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাদের সঙ্গেই আজ সে সমস্ত ধূলায় মিশাইয়াছে! কিন্তু মানুষের শক্তি, মানুষের ভক্তি যেখানে নিজের সৌন্দর্য্যরচনাকে ভগবানের মঙ্গলরূপের বামপার্শ্বে বসাইয়া ধন্য হইয়াছে, সেখানে সেই মিলনমন্দিরগুলিকে অতি দুর্গমস্থানেও আমরা রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছি। মঙ্গলের সঙ্গেই সৌন্দর্য্যের, বিষ্ণুর সঙ্গেই লক্ষ্মীর মিলন পূর্ণ। সকল সভ্যতার মধ্যেই এই ভাবটি প্রচ্ছন্ন আছে। এক দিন নিশ্চয় আসিবে, যখন সৌন্দর্য্য ব্যক্তিগত স্বার্থের দ্বারা বদ্ধ, ঈর্ষার দ্বারা বিদ্ধ, ভোগের দ্বারা জীর্ণ হইবে না, শান্তি ও মঙ্গলের মধ্যে নির্ম্মলভাবে স্ফূর্ত্তি পাইবে। সৌন্দর্য্যকে আমাদের বাসনা হইতে, লোভ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া না দেখিতে পাইলে তাহাকে পূর্ণভাবে দেখা হয় না। সেই অশিক্ষিত অসংযত অসম্পূর্ণ দেখায় আমরা যাহা দেখি, তাহাতে আমাদিগকে তৃপ্তি দেয় না, তৃষ্ণাই দেয়; খাদ্য দেয় না, মদ খাওয়াইয়া আহারের স্বাস্থ্যকর অভিরুচি পর্য্যন্ত নষ্ট করিতে থাকে।

এই আশঙ্কাবশতই নীতিপ্রচারকেরা সৌন্দর্য্যকে দূর হইতে নমস্কার করিতে উপদেশ দেন। পাছে লোকসান হয় বলিয়া লাভের পথ মাড়াইতেই নিষেধ করেন। কিন্তু যথার্থ উপদেশ এই যে, সৌন্দর্য্যের পূর্ণ অধিকার পাইব বলিয়াই সংযমসাধন করিতে হইবে। ব্রহ্মচর্য্য সেইজন্যই—পরিণামে শুষ্কতালাভের জন্য নহে।

সাধনার কথা যখন উঠিল, তখন প্রশ্ন হইতে পারে, এ সাধনার সিদ্ধি কি? ইহার শেষ কোন্‌খানে? আমাদের অন্যান্য কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারি, কিন্তু সৌন্দর্য্যবোধ কিসের জন্য আমাদের মনে স্থান পাইয়াছে?

এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে সৌন্দর্য্যবোধের রাস্তাটা কোন্‌দিকে চলিয়াছে, সে কথাটার আর একবার সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

সৌন্দর্য্যবোধ যখন শুদ্ধমাত্র আমাদের ইন্দ্রিয়ের সহায়তা লয়, তখন যাহাকে আমরা সুন্দর বলিয়া বুঝি, তাহা খুবই স্পষ্ট, তাহা দেখিবামাত্রই চোখে ধরা পড়ে। সেখানে আমাদের সমুখে একদিকে সুন্দর ও আর-একদিকে অসুন্দর, এই দুইয়ের দ্বন্দ্ব একেবারে সুনির্দ্দিষ্ট। তার পরে বুদ্ধিও যখন সৌন্দর্য্যবোধের সহায় হয়, তখন সুন্দর-অসুন্দরের ভেদটা দূরে গিয়া পড়ে। তখন যে জিনিষ আমাদের মনকে টানে, সেটা হয় ত চোখ মেলিবামাত্রই দৃষ্টিতে পড়িবার যোগ্য বলিয়া মনে না হইতেও পারে। আরম্ভের সহিত শেষের, প্রধানের সহিত অপ্রধানের, এক অংশের সহিত অন্য অংশের গূঢ়তর সামঞ্জস্য দেখিয়া যেখানে আমরা আনন্দ পাই, সেখানে আমরা চোখভুলানো সৌন্দর্য্যের দাসখত তেমন

করিয়া আর মানি না। তার পরে কল্যাণবুদ্ধি যেখানে যোগ দেয়, সেখানে আমাদের মনের অধিকার আরো বাড়িয়া যায়—সুন্দর-অসুন্দরের দ্বন্দ্ব আরো ঘুচিয়া যায়। সেখানে কল্যাণী সতী সুন্দর হইয়া দেখা দেন, কেবল রূপসী নহে। যেখানে ধৈর্য্য-বীর্য্য-ক্ষমা-প্রেম আলো ফেলে, সেখানে রংচঙের আয়োজন-আড়ম্বরের কোনো প্রয়োজনই আমরা বুঝি না। কুমারসম্ভবকাব্যে ছদ্মবেশী মহাদেব তাপসী উমার নিকট শঙ্করের রূপগুণবয়সবিভবের নিন্দা করিলেন, তখন উমা কহিলেন, "মমাত্র ভাবৈকরসং মনঃ স্থিতম্"—তাঁহার প্রতি আমার মন একমাত্র ভাবের রসে অবস্থান করিতেছে। সুতরাং আনন্দের জন্য আর কোনো উপকরণের প্রয়োজনই নাই। ভাবরসে সুন্দর-অসুন্দরের কঠিনবিচ্ছেদ দূরে চলিয়া যায়।

তবু মঙ্গলের মধ্যেও একটা দ্বন্দ্ব আছে। মঙ্গলের বোধ ভালমন্দের একটা সংঘাতের অপেক্ষা রাখে। কিন্তু এমনতর দ্বন্দ্বের মধ্যে কিছুর পরিসমাপ্তি হইতে পারে না। পরিণাম এক বই দুই নহে। নদী যতক্ষণ চলে, ততক্ষণ তাহার দুই কূলের প্রয়োজন হয়; কিন্তু যেখানে তাহার চলা শেষ হয়, সেখানে একমাত্র অকূলসমুদ্র। নদীর চলার দিক্‌টাতে দ্বন্দ্ব, সমাপ্তির দিক্‌টাতে দ্বন্দ্বের অবসান। আগুন জ্বালাইবার সময় দুই কাঠে ঘষিতে হয়, শিখা যখন জ্বলিয়া উঠে, তখন দুই কাঠের ঘর্ষণ বন্ধ হইয়া যায়। আমাদের সৌন্দর্য্যবোধও সেইরূপ ইন্দ্রিয়ের সুখকর ও অসুখকর, জীবনের মঙ্গলকর ও অমঙ্গলকর, এই দুয়ের ঘর্ষণের দ্বন্দ্বে স্ফুলিঙ্গবিক্ষেপ করিতে করিতে একদিন যদি পূর্ণভাবে জ্বলিয়া উঠে, তবে তাহার সমস্ত আংশিকতা ও আলোড়ন নিরস্ত হয়।

তখন কি হয়? তখন দ্বন্দ্ব ঘুচিয়া-গিয়া সমস্তই সুন্দর হয়, তখন সত্য ও সুন্দর একই কথা হইয়া উঠে। তখনই বুঝিতে পারি, সত্যের যথার্থ উপলব্ধিমাত্রই আনন্দ, তাহাই চরম সৌন্দর্য্য।

এ কথাটাকে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতে পারিব কি না, জানি না, কিন্তু চেষ্টা করিয়া না দেখিলে অপরাধ হইবে।

মানুষকে দুই কূল বাঁচাইয়া চলিতে হয়; তাহার নিজের স্বাতন্ত্র্য এবং সকলের সঙ্গে মিল,—দুই বিপরীত কূল। দুটির মধ্যে একটিকেও বাদ দিলে আমাদের মঙ্গল নাই।

স্বাতন্ত্র্যজিনিষটা যে মানুষের পক্ষে বহুমূল্য, তাহা মানুষের ব্যবহারেই বুঝা যায়। ধন দিয়া, প্রাণ দিয়া নিজের স্বাতন্ত্র্যকে বজায় রাখিবার জন্য মানুষ কিনা লড়াই করিয়া থাকে।

নিজের বিশেষত্বকে সম্পূর্ণ করিবার জন্য সে কোথাও কোনো বাধা মানিতে চায় না। ইহাতে যেখানে বাধা পায়, সেইখানেই তাহার বেদনা লাগে। সেইখানেই সে ক্রুদ্ধ হয়, লুব্ধ হয়, হনন করে, হরণ করে।

কিন্তু আমাদের স্বাতন্ত্র্য ত অবাধে চলিতে পারে না। প্রথমত, সে যে-সকল মালমসলা, যে-সকল ধনজন লইয়া আপনার কলেবর গড়িয়া তুলিতে চায়, তাহাদেরও স্বাতন্ত্র্য আছে; আমাদের ইচ্ছামত কেবল গায়ের জোরে তাহাদিগকে নিজের কাজে লাগাইতে পারি না। তখন আমাদের স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে

তাহাদের স্বাতন্ত্র্যের একটা বোঝাপড়া চলিতে থাকে। সেখানে বুদ্ধির সাহায্যে, বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা একটা আপোষ করিয়া লই। সেখানে পরের স্বাতন্ত্র্যের খাতিরে নিজের স্বাতন্ত্র্যকে কিছুপরিমাণে খাটো করিয়া না আনিলে একেবারে নিষ্ফল হইতে হয়। তখন কেবলই স্বাতন্ত্র্য মানিয়া নয়, নিয়ম মানিয়া জয়ী হইতে চেষ্টা হয়।

কিন্তু এটা দায়ে পড়িয়া করা—ইহাতে সুখ নাই। একেবারেই যে সুখ নাই, তাহা নহে। বাধাকে যথাসম্ভব নিজের প্রয়োজনের অনুগত করিয়া আনিতে যে বুদ্ধি ও যে শক্তি খাটে, তাহাতেই সুখ আছে। অর্থাৎ কেবল পাইবার সুখ নয়, খাটাইবার সুখ। ইহাতে নিজের স্বাতন্ত্র্যের জোর, স্বাতন্ত্র্যের গৌরব অনুভব করা যায়—বাধা না পাইলে তাহা করা যাইত না। এইরূপে যে অহঙ্কারের উত্তেজনা জন্মে, তাহাতে আমাদের জিতিবার ইচ্ছা, প্রতিযোগিতার চেষ্টা বাড়িয়া উঠে। পাথরের বাধা পাইলে ঝরণার জল যেমন ফেনাইয়া ডিঙাইয়া উঠিতে চায়, তেম্নি পরস্পরের বাধায় আমাদের পরস্পরের স্বাতন্ত্র্য ঠেলিয়া ফুলিয়া উঠে।

যাই হোক্, ইহা লড়াই। বুদ্ধিতে বুদ্ধিতে, শক্তিতে শক্তিতে, চেষ্টায় চেষ্টায় লড়াই। প্রথমে এই লড়াই বেশির ভাগ গায়ের জোরই খাটাইত,—ভাঙিয়া-চুরিয়া কাজ-উদ্ধারের চেষ্টা করিত। ইহাতে যাহাকে চাই, তাহাকেও ছারখার করা হইত; যে চায়, সেও ছারখার হইত, অপব্যয়ের সীমা থাকিত না। তাহার পরে বুদ্ধি আসিয়া কর্ম্মকৌশলের অবতারণা করিল। সে গ্রন্থি ছেদন করিতে চাহিল না, গ্রন্থি মোচন করিতে বসিল। এ কাজটা ইচ্ছার অন্ধতা বা অধৈর্য্যের দ্বারা হইবার জো নাই; শান্ত হইয়া, সংযত হইয়া, শিক্ষিত হইয়া ইহাতে প্রবৃত্ত হইতে হয়। এখানে জিতিবার চেষ্টা নিজের সমস্ত অপব্যয় বন্ধ করিয়া, নিজের বলকে গোপন করিয়া, বলী হইয়াছে। ঝরণা যেমন উপত্যকায় পড়িয়া কতকটা বেগ সংবরণ করিয়া প্রশস্ত হইয়া উঠে—আমাদের স্বাতন্ত্র্যের বেগ তেম্নি বাহুবল ছাড়িয়া বিজ্ঞানে আসিয়া আপনার উগ্রতা ছাড়িয়া উদারতা লাভ করে।

ইহা আপনিই হয়। জোর কেবল নিজেকেই জানে, অন্যকে মানিতে চায় না। কিন্তু বুদ্ধি কেবল নিজের স্বাতন্ত্র্য লইয়া কাজ করিতে পারে না। অন্যের মধ্যে তাহাকে প্রবেশ করিয়া সন্ধান করিতে হয়—অন্যকে সে যতই বেশি করিয়া বুঝিতে পারিবে, ততই নিজের কাজ-উদ্ধার করিতে পারিবে। অন্যকে বুঝিতে গেলে, অন্যের দরজায় ঢুকিতে গেলে নিজেকে অন্যের নিয়মের অনুগত করিতেই হয়। এইরূপে স্বাতন্ত্র্যের চেষ্টা জয়ী হইতে গিয়াই নিজেকে পরাধীন না করিয়া থাকিতে পারে না।

এ পর্য্যন্ত কেবল প্রতিযোগিতার রণক্ষেত্রে আমাদের পরস্পরের স্বাতন্ত্র্যের জয়ী হইবার চেষ্টাই দেখা গেল। ডারউয়িনের প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনতত্ত্ব এই রণভূমিতে লড়াইয়ের তত্ত্ব—এখানে কেহ কাহাকেও রেয়াৎ করে না, সকলেই সকলের চেয়ে বড় হইতে চায়।

কিন্তু ক্রপট্‌কিন্ প্রভৃতি আধুনিক বিজ্ঞানবিৎরা দেখাইতেছেন যে, পরস্পরকে জিতিবার চেষ্টা, নিজেকে টেঁকাইয়া রাখিবার

চেষ্টাই প্রাণিসমাজের একমাত্র চেষ্টা নয়। দল বাঁধিবার, পরস্পরকে সাহায্য করিবার ইচ্ছা, ঠেলিয়া উঠিবার চেষ্টার চেয়ে অল্প প্রবল নহে; বস্তুত নিজের বাসনাকে খর্ব্ব করিয়াও পরস্পরকে সাহায্য করিবার ইচ্ছাই প্রাণীদের মধ্যে উন্নতির প্রধান উপায় হইয়াছে।

তবেই দেখিতেছি, একদিকে প্রত্যেকের স্বাতন্ত্র্যের স্ফূর্ত্তি এবং অন্যদিকে সমগ্রের সহিত সামঞ্জস্য, এই দুই নীতিই একসঙ্গে কাজ করিতেছে। অহঙ্কার এবং প্রেম, বিকর্ষণ এবং আকর্ষণ সৃষ্টিকে একসঙ্গে গড়িয়া তুলিতেছে।

স্বাতন্ত্র্যেও পূর্ণতালাভ করিব এবং মিলনেও নিজেকে পূর্ণভাবে সমর্পণ করিব, ইহা হইলেই মানুষের সার্থকতা ঘটে। অর্জ্জন করিয়া আমার পুষ্টি হইবে এবং বর্জ্জন করিয়া আমার আনন্দ হইবে, জগতের মধ্যে এই দুই বিপরীত নীতির মিলন দেখা যাইতেছে। ফলত, নিজেকে যদি পূর্ণ করিয়া না সঞ্চিত করি, তবে নিজেকে পূর্ণরূপে দান করিব কি করিয়া! সে কতটুকু দান হইবে! যত বড় অহঙ্কার, তাহা বিসর্জ্জন করিয়া তত বড় প্রেম।

এই যে আমি, অতি ক্ষুদ্র আমি, এত বড় জগতের মাঝখানেও সেই আমি স্বতন্ত্র। চারিদিকে কত তেজ, কত বেগ, কত বস্তু, কত ভার, তাহার আর সীমা নাই, কিন্তু আমার অহঙ্কারকে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চূর্ণ করিতে পারে নাই, আমি এতটুকু হইলেও স্বতন্ত্র। আমার যে অহঙ্কার সকলের মধ্যেও ক্ষুদ্র-আমাকে ঠেলিয়া রাখিয়াছে, এই অহঙ্কার যে ঈশ্বরের ভোগের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। ইহা নিঃশেষ করিয়া তাঁহাকে দিয়া ফেলিলে তবেই যে আনন্দের চূড়ান্ত। ইহাকে জাগাইবার সমস্ত দুঃসহ দুঃখের তবেই যে অবসান। ভগবানের এই ভোগের সামগ্রীটিকে নষ্ট করিয়া ফেলিবে কে?

আমাদের স্বাতন্ত্র্যকে ঈশ্বরে সম্পূর্ণ সমর্পণ করিবার পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থায় যত-কিছু দ্বন্দ্ব। তখনই একদিকে স্বার্থ, আর একদিকে প্রেম; একদিকে প্রবৃত্তি, আর একদিকে নিবৃত্তি। সেই দোলায়মান অবস্থায়, এই দ্বন্দ্বের মাঝখানেই যাহা সৌন্দর্য্যকে ফুটাইয়া তোলে, যাহা ঐক্যের আদর্শ রক্ষা করে, তাহাকেই বলি মঙ্গল। যাহা একদিকে আমার স্বাতন্ত্র্য, অন্যদিকে অন্যের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিয়াও পরস্পরের আঘাতে বেসুর বাজাইয়া তোলে না, যাহা স্বতন্ত্রকে এক সমগ্রের শান্তি দান করে, যাহা দুই অহঙ্কারকে এক সৌন্দর্য্যের পরিণয়সূত্রে বাঁধিয়া দেয়, তাহাই মঙ্গল। শক্তি স্বাতন্ত্র্যকে বাড়াইয়া তোলে, মঙ্গল স্বাতন্ত্র্যকে সুন্দর করে, প্রেম স্বাতন্ত্র্যকে বিসর্জ্জন দেয়। মঙ্গল সেই শক্তি ও প্রেমের মাঝখানে থাকিয়া প্রবল অর্জ্জনকে একান্ত বিসর্জ্জনের দিকেই অগ্রসর করিতে থাকে। এই দ্বন্দ্বের অবস্থাতেই মঙ্গলের রশ্মি লাগিয়া মানবসংসারে সৌন্দর্য্য প্রাতঃসন্ধ্যার মেঘের মত বিচিত্র হইয়া উঠে।

নিজের সঙ্গে পরের, স্বার্থের সঙ্গে প্রেমের যেখানে সংঘাত, সেখানে মঙ্গলকে রক্ষা করা বড় সুন্দর এবং বড় কঠিন। কবিত্ব যেমন সুন্দর তেমনি সুন্দর, এবং কবিত্ব যেমন কঠিন তেমনি কঠিন।

কবি যে ভাষায় কবিত্বপ্রকাশ করিতে

চায়, সে ভাষা ত তাহার নিজের সৃষ্টি নহে। কবি জন্মিবার বহুকাল পূর্ব্বেই সে ভাষা আপনার একটা স্বাতন্ত্র্য ফুটাইয়া তুলিয়াছে। কবি যে ভাবটি যেমন করিয়া ব্যক্ত করিতে চায়, ভাষা ঠিক তেমনটি করিয়া রাশ মানে না। তখন কবির ভাবের স্বাতন্ত্র্য এবং ভাবপ্রকাশের উপায়ের স্বাতন্ত্র্যে একটা দ্বন্দ্ব হয়। যদি সেই দ্বন্দ্বটা কেবল দ্বন্দ্ব-আকারেই পাঠকের চোখে পড়িতে থাকে, তবে পাঠক কাব্যের নিন্দা করে, বলে, ভাষার সঙ্গে ভাবের মিল হয় নাই। এমন স্থলে কথাটার অর্থগ্রহ হইলেও তাহা হৃদয়কে তৃপ্ত করিতে পারে না। যে কবি ভাবের স্বাতন্ত্র্য এবং ভাষার স্বাতন্ত্র্যের অনিবার্য্য দ্বন্দ্বকে ছাপাইয়া সৌন্দর্য্যরক্ষা করিতে পারেন, তিনি ধন্য হন। যেটা বলিবার কথা, তাহা পুরা বলা কঠিন, ভাষার বাধাবশত কতক বলা যায় এবং কতক বলা যায় না—কিন্তু তবু সৌন্দর্য্যকে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে, কবির এই কাজ। ভাবের যেটুকু ক্ষতি হইয়াছে, সৌন্দর্য্য তাহার চেয়ে অনেক বেশি পূরণ করিয়া দেয়।

তেম্‌নি আমাদের স্বাতন্ত্র্যকে সংসারের মধ্যে প্রকাশ করিতেছি; সে সংসার ত আমার নিজের হাতে গড়া নয়; সে আমাকে পদে পদে বাধা দেয়। যেমনটি হইলে সকল দিকে আমার পুরা বিকাশ হইতে পারিত, তেমন আয়োজনটি চারিদিকে নাই; সুতরাং সংসারে আমার সঙ্গে বাহিরের দ্বন্দ্ব আছেই। কাহারো জীবনে সেই দ্বন্দ্বটাই কেবলি চোখে পড়িতে থাকে; সে কেবলি বেসুরই বাজাইয়া তোলে। আর কোনো কোনো গুণী সংসারে এই অনিবার্য্য দ্বন্দ্বের মধ্যেই সঙ্গীত সৃষ্টি করেন, তিনি তাঁহার সমস্ত অভাব ও ব্যাঘাতের উপরেই সৌন্দর্য্য রক্ষা করেন। মঙ্গলই সেই সৌন্দর্য্য। সংসারের প্রতিঘাতে তাঁহাদের অবাধ স্বাতন্ত্র্যবিকাশের যে ক্ষতি হয়, মঙ্গল তাহার চেয়ে অনেক বেশি পূরণ করিয়া দেয়। বস্তুত দ্বন্দ্বের বাধাই মঙ্গলের সৌন্দর্য্যকে প্রকাশিত হইয়া উঠিবার অবকাশ দেয়; স্বার্থের ক্ষতিই ক্ষতিপূরণের প্রধান উপায় হইয়া উঠে।

এম্‌নি করিয়া দেখা যাইতেছে, স্বাতন্ত্র্য আপনাকে সফলতা দিবার জন্যই আপনারই খর্ব্বতা স্বীকার করিতে থাকে; নহিলে তাহা বিকৃতিতে গিয়া পৌঁছে এবং বিকৃতি বিনাশে গিয়া উপনীত হইবেই। স্বাতন্ত্র্য যেখানে মঙ্গলের অনুসরণ করিয়া প্রেমের দিকে না গেছে, সেখানে সে বিনাশের দিকেই চলিতেছে। অতিবৃদ্ধিদ্বারা সে বিকৃতিপ্রাপ্ত হইলে বিশ্বপ্রকৃতি তাহার বিরুদ্ধ হইয়া উঠে; কিছুদিনের মত উপদ্রব করিয়া তাহাকে মরিতেই হয়।

অতএব মানুষের স্বাতন্ত্র্য যখন মঙ্গলের সহায়তায় সমস্ত দ্বন্দ্বকে নিরস্ত করিয়া দিয়া সুন্দর হইয়া উঠে, তখনই বিশ্বাত্মার সহিত মিলনে সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জ্জনের জন্য সে প্রস্তুত হয়। বস্তুত আমাদের দুর্দ্দান্ত স্বাতন্ত্র্য মঙ্গলসোপান হইতে প্রেমে উত্তীর্ণ হইয়া তবেই সম্পূর্ণ হয়,—সমাপ্ত হয়।

এই প্রেম বলিতে কি বুঝায়? না, সত্য যেখানে আমাদের কাছে এতই নিরতিশয় সত্য যে, তাহাই আনন্দ।

এই চঞ্চল সংসারে আমরা সত্যের আস্বাদ কোথায় পাই? যেখানে আমাদের মন বসে। রাস্তার লোক আসিতেছে-যাইতেছে, তাহারা আমাদের কাছে ছায়া; তাহাদের

উপলব্ধি আমাদের কাছে নিতান্ত ক্ষীণ বলিয়াই তাহাদের মধ্যে আমাদের আনন্দ নাই। বন্ধুর সত্য আমাদের কাছে গভীর, সেই সত্য আমাদের মনকে আশ্রয় দেয়; বন্ধুকে যতখানি সত্য বলিয়া জানি, সে আমাদিগকে ততখানি আনন্দ দেয়। যে দেশ আমার নিকট ভূবৃত্তান্তের অন্তর্গত একটা নামমাত্র, সে দেশের লোক সে দেশের জন্য প্রাণ দেয়। তাহারা দেশকে অত্যন্ত সত্যরূপে জানিতে পারে বলিয়াই তাহার জন্য প্রাণ দিতে পারে। মূঢ়ের কাছে যে বিদ্যা বিভীষিকা, বিদ্বানের কাছে তাহা পরমানন্দের জিনিষ, বিদ্বান্ তাহা লইয়া জীবন কাটাইয়া দিতেছে। তবেই দেখা যাইতেছে, যেখানেই আমাদের কাছে সত্যের উপলব্ধি, সেইখানেই আমরা আনন্দকে দেখিতে পাই। সত্যের অসম্পূর্ণ উপলব্ধিই আনন্দের অভাব। কোনো সত্যে যেখানে আমাদের আনন্দ নাই, সেখানে আমরা সেই সত্যকে জানি মাত্র, তাহাকে পাই না।

এইরূপে বুঝিলে সত্যের অনুভূতি ও সৌন্দর্য্যের অনুভূতি এক হইয়া দাঁড়ায়।

মানবের সমস্ত সাহিত্য, সঙ্গীত, ললিতকলা জানিয়া এবং না জানিয়া এইদিকেই চলিতেছে। মানুষ তাহার কাব্যে, চিত্রে, শিল্পে সত্যমাত্রকেই উজ্জ্বল করিয়া তুলিতেছে। পূর্ব্বে যাহা চোখে পড়িত না বলিয়া আমাদের কাছে অসত্য ছিল, কবি তাহাকে আমাদের দৃষ্টির সাম্‌নে আনিয়া আমাদের সত্যের রাজ্যের, আনন্দের রাজ্যের সীমানা বাড়াইয়া দিতেছেন। সমস্ত তুচ্ছকে, অনাদৃতকে মানুষের সাহিত্য প্রতিদিন সত্যের গৌরবে আবিষ্কার করিয়া কলাসৌন্দর্য্যে চিহ্নিত করিতেছে। যে কেবলমাত্র পরিচিত ছিল, তাহাকে বন্ধু করিয়া তুলিতেছে। যাহা কেবলমাত্র চোখে পড়িত, তাহার উপরে মনকে টানিতেছে।

আধুনিক কবি বলিয়াছেন, "Truth is beauty, beauty truth"—আমাদের শুভ্রবসনা কমলালয়া দেবী সরস্বতী একাধারে "Truth" এবং "Beauty" মূর্ত্তিমতী। উপনিষদ্‌ও বলিতেছেন—"আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি", যাহা-কিছু প্রকাশ পাইতেছে, তাহাই তাঁহার আনন্দরূপ, তাঁহার অমৃতরূপ। আমাদের পদতলের ধূলি হইতে আকাশের নক্ষত্র পর্য্যন্ত সমস্তই truth এবং সমস্তই beauty, সমস্তই আনন্দরূপমমৃতম্।

সত্যের এই আনন্দরূপ, অমৃতরূপ দেখিয়া সেই আনন্দকে ব্যক্ত করাই কাব্যসাহিত্যের লক্ষ্য। সত্যকে যখন শুধু আমরা চোখে দেখি, বুদ্ধিতে পাই, তখন নয়, কিন্তু যখন তাহাকে হৃদয় দিয়া পাই, তখনি তাহাকে সাহিত্যে প্রকাশ করিতে পারি। তবে কি সাহিত্য কলাকৌশলের সৃষ্টি নহে, তাহা কেবল হৃদয়ের আবিষ্কার? ইহার মধ্যে সৃষ্টিরও একটা ভাগ আছে। সেই আবিষ্কারের বিস্ময়কে, সেই আবিষ্কারের আনন্দকে হৃদয় আপনার ঐশ্বর্য্যদ্বারা ভাষায় বা ধ্বনিতে বা বর্ণে চিহ্নিত করিয়া রাখে,—ইহাতেই সৃষ্টিনৈপুণ্য—ইহাই সাহিত্য, ইহাই সঙ্গীত, ইহাই চিত্রকলা।

মরুভূমির বালুময় বিস্তারের মাঝখানে দাঁড়াইয়া মানুষ তাহাকে দুই পিরামিডের

বিস্ময়চিহ্নের দ্বারা চিহ্নিত করিয়াছে ; নির্জ্জন দ্বীপের সমুদ্রতটকে মানুষ পাহাড়ের গায়ে কারুকৌশলপূর্ণ গুহা খুদিয়া চিহ্নিত করিয়াছে, বলিয়াছে, ইহা আমার হৃদয়কে তৃপ্ত করিল ; এই চিহ্নই বম্বাইয়ের হস্তিগুহা। পূর্ব্বমুখে দাঁড়াইয়া মানুষ সমুদ্রের মধ্যে সূর্য্যোদয়ের মহিমা দেখিল, অমনি বহুশতক্রোশ দূর হইতে পাথর আনিয়া সেখানে আপনার করজোড়ের চিহ্ন রাখিয়া দিল, তাহাই কণারকের মন্দির। সত্যকে যেখানে মানুষ নিবিড়রূপে অর্থাৎ আনন্দরূপে, অমৃতরূপে উপলব্ধি করিয়াছে, সেইখানেই আপনার একটা চিহ্ন কাটিয়াছে। সেই চিহ্নই কোথাও বা মূর্ত্তি, কোথাও বা মন্দির, কোথাও বা তীর্থ, কোথাও বা রাজধানী। সাহিত্যও এই চিহ্ন। বিশ্বজগতের যে-কোনো ঘাটেই মানুষের হৃদয় আসিয়া ঠেকিতেছে, সেইখানেই সে ভাষা দিয়া একটা স্থায়ী তীর্থ বাঁধাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে—এম্‌নি করিয়া বিশ্বতটের সকল স্থানকেই সে মানবযাত্রীর হৃদয়ের পক্ষে ব্যবহার-যোগ্য, উত্তরণযোগ্য করিয়া তুলিতেছে। এম্‌নি করিয়া মানুষ জলে-স্থলে-আকাশে, শরতে-বসন্তে-বর্ষায়, ধর্ম্মে-কর্ম্মে-ইতিহাসে অপরূপ চিহ্ন কাটিয়া-কাটিয়া সত্যের সুন্দর মূর্ত্তির প্রতি মানুষের হৃদয়কে নিয়ত আহ্বান করিতেছে। দেশে-দেশে কালে-কালে এই চিহ্ন, এই আহ্বান কেবলি বিস্তৃত হইয়া চলিতেছে। জগতের সর্ব্বত্রই মানুষ সাহিত্যের দ্বারা হৃদয়ের এই চিহ্নগুলি যদি না কাটিত, তবে জগৎ আমাদের কাছে আজ কত সঙ্কীর্ণ হইয়া থাকিত, তাহা আমরা কল্পনাই করিতে পারি না। আজ এই চোখে-দেখা কানে-শোনা জগৎ যে বহুল-পরিমাণে আমাদের হৃদয়ের জগৎ হইয়া উঠিয়াছে, ইহার প্রধান কারণ মানুষের সাহিত্য হৃদয়ের আবিষ্কারচিহ্নে জগৎকে মণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে।

সত্য যে পদার্থপুঞ্জের স্থিতি ও গতির সামঞ্জস্য, সত্য যে কার্য্যকারণপরম্পরা, সে কথা জানাইবার অন্য শাস্ত্র আছে—কিন্তু সাহিত্য জানাইতেছে, সত্যই আনন্দ, সত্যই অমৃত। সাহিত্য উপনিষদের সেই মন্ত্রকে অহরহ ব্যাখ্যা করিয়া চলিয়াছে—"রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দীভবতি।" তিনিই রস ; এই রসকে পাইয়াই মানুষ আনন্দিত হয়।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

হর্ষবর্দ্ধন।

বৌদ্ধধর্ম্মের শেষ অভ্যুত্থান ও চৈনিক সংস্রব।

হর্ষের ইতিহাসের উপাদান।—অশোকবর্দ্ধনের পর হইতে ভারতে বৌদ্ধধর্ম্ম ক্রমশ ক্ষীণতাপ্রাপ্ত হইলেও, চীন প্রভৃতি দেশসমূহে ইহার ভিত্তি ক্রমশ দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতে থাকায়, ধর্ম্মতথ্যানুসন্ধানার্থ বহুসংখ্যক চীনপরিব্রাজক ভারতে আগমনপূর্ব্বক বৌদ্ধধর্ম্মের কেন্দ্রগুলি পর্য্যবেক্ষণ ও বহুসংখ্যক ধর্ম্মগ্রন্থাদি সংগ্রহ করিয়া স্বদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তারসাধনে যথেষ্ট সহায়তা করিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদিগের অনেকেরই ভ্রমণবৃত্তান্ত অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ চীনপরিব্রাজক হিউয়েন্-সাং তীর্থযাত্রা উপলক্ষে (৬৩০—৬৪৫ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত) ১৫বৎসর যাবৎ ভারতের নানাস্থানে পরিভ্রমণ ও অবস্থান করিয়া বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার বন্ধু হ্বুই-লি ভ্রমণবৃত্তান্তের পরিশিষ্টরূপে তদীয় জীবনচরিত লিখিয়া তদানীন্তন-ভারতবিষয়ক আরও কতকগুলি অবশ্যজ্ঞাতব্য তথ্য জগতের গোচরার্থ প্রকটিত করিয়া গিয়াছেন। তীর্থযাত্রীদিগের দ্বারা ও দূতের আদানপ্রদাননিবন্ধন সংগৃহীত ভারতসংক্রান্ত তত্ত্বাবলী তাৎকালিক চীনের ইতিহাসেও বহুলপরিমাণে বিদ্যমান রহিয়াছে। পক্ষান্তরে, বাণভট্টনামক হর্ষবর্দ্ধনের সভাস্থিত স্বনামপ্রসিদ্ধ সংস্কৃতগ্রন্থকার হর্ষচরিতনামক গ্রন্থে মহারাজ হর্ষের রাজসভা, শাসন ও আচারব্যবহারসংক্রান্ত অনেকগুলি অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া ইতিহাসের উপাদানীভূত নানা তথ্যের আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত বাঁশখেরা, মধুবন, গঞ্জাম প্রভৃতি স্থানের তাম্রশাসনাদির সাহায্যেও হর্ষবর্দ্ধনের বংশাবলী ও বিজয়াদির কতকটা পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, হিন্দুরাজ্যের শেষ একচ্ছত্র অধীশ্বরের ইতিবৃত্তানুশীলনোপযোগী উপকরণের নিতান্ত অসদ্ভাব নাই।

প্রভাকরবর্দ্ধন ও রাজ্যবর্দ্ধন।—উপযুক্ত সন্তানের জনকজননী বলিয়া যাঁহারা জগতে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া গিয়াছেন, কুরুক্ষেত্রপ্রদেশের (বর্ত্তমান কর্ণালের) অন্তঃপাতী স্থাণ্বীশ্বর-(থানেশ্বর)-নগরের অধিপতি প্রভাকরবর্দ্ধন ও তদীয় মহিষী যশোমতী তাঁহাদিগের অন্যতম। প্রভাকরের মাতা প্রসিদ্ধ গুপ্তরাজবংশোদ্ভূতা, সুতরাং মাতামহবংশের ন্যায় তাঁহারও রাজ্যবিস্তারাভিলাষ উদ্দীপিত হওয়ায়, পঞ্জাবস্থিত হূনদিগকে জয় এবং চিনাব ও ঝিলমনদীর মধ্যবর্ত্তী গুর্জ্জররাজ্য অধিকার করিয়া, যৌবনসীমায় নবাধিরূঢ় কুমার রাজ্যবর্দ্ধনকে (৬০৪ খৃঃ অঃ) হূনদমনার্থ উত্তরপশ্চিম সীমান্তে প্রেরণ করেন; এবং তাঁহার অপেক্ষাও ছয় বৎসরের কনিষ্ঠ রাজকুমার হর্ষবর্দ্ধন অশ্বারোহী সেনার অধিনায়কপদে বৃত হইয়া অগ্রজের অনুগমনে আদিষ্ট হন। রাজপুত্র

হর্ষ হিমালয়ের সানুদেশে উপনীত হইয়া স্বভাবের শোভায় মুগ্ধ হইয়া যে সময়ে মৃগয়াদি-ব্যাপারে আমোদপ্রমোদে রত ছিলেন, সেই সময়ে মহারাজ প্রভাকর মুমূর্ষু অবস্থায় উপনীত অবগত হইয়া সত্বরগমনে রাজধানী প্রত্যাবর্ত্তন করেন। অতঃপর প্রভাকরবর্দ্ধনের মৃত্যু হইলে, কেহ কেহ হর্ষবর্দ্ধনকেই রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিবার ষড়্‌যন্ত্র করিতে থাকেন, কিন্তু রাজ্যবর্দ্ধন অচিরে প্রত্যাগত হওয়ায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে জ্যেষ্ঠই পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হন। এই সময়ে মালবরাজকর্ত্তৃক তাঁহাদিগের ভগিনীপতি কান্যকুব্জাধীশ্বর নিহত ও ভগিনী রাজ্যশ্রী লৌহশৃঙ্খলে নিগড়িত অবগত হইয়া মহারাজ রাজ্যবর্দ্ধন দশসহস্র অশ্বারোহী লইয়া মালবনৃপতিকে আক্রমণ ও যুদ্ধে বিনাশ করিয়া সমুচিত প্রতিশোধ লন, কিন্তু মালবেশ্বরের ঘনিষ্ঠবন্ধু গৌড়রাজ শশাঙ্ক গুপ্তমন্ত্রণাচ্ছলে আহ্বানপুরঃসর রাজ্যবর্দ্ধনের গুপ্তহত্যা সাধন করিয়া মিত্রবধের অতি ঘৃণিত প্রতিহিংসা গ্রহণ করেন। অতঃপর পতির ও ভ্রাতার শোকে একান্ত বিহ্বলা রাজ্যশ্রী অধিকতর বিপৎপাতের সম্ভাবনা আশঙ্কা করিয়া নিতান্ত নিরাশ্রয় ও অনন্যোপায় হইয়াই বিন্ধ্যপর্ব্বতে পলায়ন করিয়া, স্ত্রীজাতির পরমনিধি সতীত্বরত্ন রক্ষা করেন।

হর্ষের রাজ্যলাভ ও উন্নতিসাধনে যত্ন।—মহারাজ রাজ্যবর্দ্ধনের সন্তানসন্ততিলাভোচিত বয়ঃপ্রাপ্তির পূর্ব্বেই মৃত্যু হওয়ায়, তদীয় অনুজ হর্ষবর্দ্ধনই রাজাসনের ন্যায্য একমাত্র অধিকারী বিবেচিত হইলেও, প্রজার রাজা মনোনীত করিবার আংশিক অধিকার থাকা প্রযুক্তই হউক, বা ভ্রাতৃবিয়োগশোকে মহীপালোচিত-আড়ম্বর-স্বীকারে অনিচ্ছাবশতই হউক, সার্দ্ধপঞ্চবর্ষ যাবৎ হর্ষ 'কুমার শিলাদিত্য' নামেই আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া রাজ্যশাসন করেন। অবশেষে (৬১২ খৃঃ অঃ) 'মহারাজাধিরাজ শ্রীহর্ষ' আখ্যা গ্রহণপূর্ব্বক অভিষিক্ত হন। শিলাদিত্যসংবৎসর নামে যে অব্দ ভারতের কোন কোন স্থানে প্রচলিত আছে, তাহা হর্ষবর্দ্ধনের অভিষেকসময় হইতে গণিত না হইয়া, কুমার শিলাদিত্যের রাজ্যভারগ্রহণ ৬০৬—৭ খৃঃ অঃ) হইতেই গণিত হয়। রাজ্যলাভের পর ভগিনী রাজ্যশ্রীর অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়া, বনবাসী অনার্য্যদিগের সাহায্যে বিন্ধ্যারণ্যানীমধ্যে প্রবেশলাভ করিয়া হতাশাপ্রযুক্ত জীবনত্যাগে উদ্যতা রাজ্যশ্রীকে অগ্নিপ্রবেশ হইতে রক্ষা করেন। অতঃপর ভ্রাতৃবধের প্রতিশোধগ্রহণোদ্দেশে গৌড়রাজ্য আক্রমণ করায় বৌদ্ধধর্ম্মবিদ্বেষী শশাঙ্ক প্রাণভয়ে পলায়ন করেন। এই সময়ে থানেশ্বর ও কনোজের যুক্তরাজ্যের অধীশ্বরের সৈন্য ৫সহস্র হস্তী, ২০সহস্র অশ্বারোহী ও ৫০সহস্র পদাতি মাত্র ছিল। পূর্ব্বকালপ্রচলিত চতুরঙ্গবলের প্রধান অঙ্গ রথের যুদ্ধে তাদৃশ উপযোগিতা উপলব্ধি না করিয়া, হর্ষ সমরোপকরণরূপে তাহার ব্যবহার রহিত করিয়া দেন। হিউয়েন্-সাং বলেন, রাজ্যভারগ্রহণ হইতে সার্দ্ধপঞ্চবর্ষ কাল হস্তীর আস্তরণ ও অশ্বের বল্গাদি উন্মোচন না করিয়া তিনি পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম প্রদেশসমূহ জয় করিয়া বেড়ান। এই নিদারুণ কষ্ট ও উৎকট রণশ্রমের পর উত্তরপশ্চিম সীমান্ত ও (সম্ভবত) বঙ্গবিজয়ের অব্যবহিত পরে, তাঁহার সেনা বৃদ্ধিলাভ করিয়া,

একলক্ষ অশ্বারোহী ও ষষ্টিসহস্র হস্তীতে পরিণত হয়। ত্রিশ বৎসরের পর (৬৪৩ খৃঃ অঃ) হর্ষ বঙ্গোপসাগরের পশ্চিমকূলে অবস্থিত আধুনিক গঞ্জামপ্রদেশ পর্য্যন্ত অধিকার বিস্তার করেন। কিন্তু (৬২০ খৃঃ অঃ) দাক্ষিণাত্যাধিপতি চালুক্যবংশোদ্ভব দ্বিতীয় পুলিকেশী মহারাজ-হর্ষ-কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া বিজয়লাভ করায় ও হর্ষের নিকট নতিস্বীকার না করায় দক্ষিণাপথে স্বীয় প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সুতরাং নর্ম্মদার দক্ষিণতীরে হর্ষের অধিকার বিস্তৃতিলাভ না করায়, নর্ম্মদা ও তাহার সমরেখা হর্ষের বিস্তৃত সাম্রাজ্যের দক্ষিণসীমারূপে ও নেপালজয়ে হিমালয়ই উত্তরসীমারূপে নির্দ্দিষ্ট হয়। ক্রমে অপরাপর প্রবল রাজ্যগুলিও তাঁহার অধীনতা স্বীকার করে। কাশ্মীররাজ বুদ্ধদন্ত-অর্পণে, বলভীমহীপাল হর্ষের অনুযাত্রিকের পদস্বীকারে ও কামরূপাধিপতি নতিস্বীকারে বাধ্য হইয়াছিলেন। বিজিত রাজ্যগুলির শাসনভার তত্তদ্দেশীয় পরাজিত নরপতিবর্গের হস্তেই ন্যস্ত হইত। মহারাজ হর্ষ আভিজাত্যাভিমানীদিগের উপরই সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত না থাকিয়া, রাজকীয় সমস্ত কার্য্যই স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ করিতে চেষ্টা করিতেন এবং এইজন্য বর্ষা ব্যতীত সমস্ত ঋতুতেই বিস্তৃত সাম্রাজ্যের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পরিভ্রমণ করিয়া দুষ্কৃতের দণ্ড ও সুকৃতের পুরস্কার করিয়া বেড়াইতেন। বীল বলেন, সেকালে বস্ত্রনির্ম্মিতগৃহ-(তাঁবু)-নির্ম্মাণপ্রণালী আবিষ্কৃত না হওয়ায় রাজ্য-পরিদর্শনসময়ে রাজার বাসোপযোগী ভবন শর ও বৃক্ষশাখা দ্বারা নির্ম্মিত ও ব্যবহারান্তে অগ্নিপ্রদানপূর্ব্বক ভস্মসাৎ করা হইত।

রাজ্যশাসন ও শিক্ষাবিষয়ক সুব্যবস্থা।—হিউয়েন্-সাং ও তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী চীন-পরিব্রাজক ফা-হিয়ান্, ভারতীয় শাসনপ্রণালী যে সম্পূর্ণ লোকহিতকারিতার উপরই সংস্থাপিত, তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীনযুগের দুষ্মন্ত-দিলীপাদির ন্যায় মহারাজাধিরাজ শ্রীহর্ষও উৎপন্ন শস্যের ষষ্ঠভাগমাত্র রাজস্বস্বরূপ গ্রহণ করিতেন। রাজকর্ম্মচারীদিগের বৃত্তি ভূমিদান-দ্বারাই নির্দ্ধারিত হইত, কিন্তু পূর্ত্তবিভাগের জন্য স্বতন্ত্র বেতন নির্দ্দিষ্ট ছিল। তাঁহার সময়ে প্রজাদিগের দেয় কর অতি অল্প ও সাধারণ লোকহিতকর কার্য্যের জন্য গৃহীত শ্রমও অতি সামান্য থাকায়, প্রকৃতিপুঞ্জ পরমসুখে কালাতিপাত করিত। রাজার দানে সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বী লোকই তুল্য অধিকারী বিবেচিত হইত। হিউয়েন্-সাং পথে একাধিকবার লুণ্ঠিত হওয়ায় যদিও অনুমিত হয়, সেসময়কার পথ ফা-হিয়ানের ন্যায় পথিকের পক্ষে নিতান্ত নিরাপদ্ ছিল না, তথাপি গুরুতর-অপরাধ-কারীর সংখ্যা যে নিতান্ত বিরল ছিল, তাহার ভূরি-ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। সাধারণ অপরাধের জন্য কারাদণ্ডই বিহিত ছিল, গুরুতর অপরাধের কঠিনদণ্ডস্বরূপ নাসিকা, কর্ণ ও হস্তপদাদি ছেদনের কঠোর বিধানও বিদ্যমান ছিল। পিতামাতার প্রতি অবজ্ঞা-প্রদর্শনও নির্ব্বাসনোপযোগী অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হইত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপরাধসমূহ অর্থদণ্ডেই প্রশমিত হইত। জল, অগ্নি, তৌল বা বিষের সাহায্যে দৈববিচারেরও প্রচলন

ছিল। চৈন পরিব্রাজকের অনুমোদনপাঠে অনুমিত হয়, তৎকালের সুসভ্য চীনেও এ-জাতীয় প্রথা প্রচলিত ছিল। প্রাদেশিক রাজপুরুষেরা সদসৎকার্য্য ও বিপৎসম্পদের ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন, বোধ হয় ইহা হইতেই রাজকীয় ইতিবৃত্ত সঙ্কলিত হইত। বিদ্যাচর্চ্চা ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধশ্রমণগণের মধ্যেই বহুলপরিমাণে পরিদৃষ্ট হইত। মহারাজ শ্রীহর্ষ স্বয়ং একজন সুলেখক বলিয়া সংস্কৃতজ্ঞদিগের নিকট পরিচিত। বৈয়াকরণ-নিবন্ধ ব্যতীত তিনখানি সংস্কৃত নাটিকা তৎকর্ত্তৃক রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। ইহাদের ভাষাদির আলোচনায় বোধ হয় সংস্কৃত তখনও কথিতভাষার আসন সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করে নাই। এই তিনখানির মধ্যে দ্বিতীয় নাটিকায় হর্ষবর্দ্ধনের বৌদ্ধধর্ম্মানুরক্তির কতকটা ছায়া পরিলক্ষিত হয়। বাঁশখেরা-শিলালিপিতে "স্বহস্তো মম মহারাজাধিরাজশ্রীহর্ষস্য" (অর্থাৎ মহারাজাধিরাজ শ্রীহর্ষের হস্তাক্ষর) এই কয়েকটি শব্দ খোদিত আছে। তাহার মধ্যে স্ব, স্ত, ম, শ্রী, স্য এই অক্ষরগুলি বঙ্গীয় বর্ণমালারই অনুরূপ বলিয়াই প্রতীতি জন্মে। ইহাদিগের মধ্যে কোন বর্ণেরই প্রচলিত দেবনাগরের সহিত বিশেষ কোন সাদৃশ্যই পরিদৃষ্ট হয় না। ইহাতেই অনুমিত হয়, প্রাচীন সংস্কৃতবর্ণমালা ক্রমে রূপান্তরিত হইয়া তৎকালে এই আকারে পরিণত হইয়া পরবর্ত্তী বঙ্গীয় বর্ণমালারই উপজীব্যরূপে পরিগৃহীত হইয়া থাকিবে।* শ্রীহর্ষ নিজে বিদ্বান্ হইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন নাই, তিনি একজন বিশেষ বিদ্যোৎসাহীও ছিলেন। তাঁহারই অভিভাবকতাধীনে থাকিয়া মহাকবি বাণভট্ট সুপ্রসিদ্ধ কাদম্বরী ও হর্ষচরিত নামক সংস্কৃতগ্রন্থদ্বয় প্রণয়ন করেন।

ধর্ম্মবিশ্বাস ও পরহিতানুষ্ঠান।—৩৭বৎসর যুদ্ধবিগ্রহের পর মৌর্য্যরাজ অশোকের ন্যায় বৈরাগ্যপ্রবণ হইয়া মহারাজ হর্ষও অবশেষে ধর্ম্মালোচনায় মতিস্থাপন এবং শেষজীবন ধর্ম্মানুষ্ঠানেই অতিবাহিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। পরোপকারকেই মহাধর্ম্ম জানিয়া জীবহিংসার একান্ত প্রতিষেধ, গ্রামে ও নগরে ধর্ম্মশালাসংস্থাপন ও তাহাতে চিকিৎসক ও পথ্যাদির সুব্যবস্থা এবং হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় মতানুমোদিত ধর্ম্মনিকেতন সংস্থাপন করেন। রাজবংশ প্রধানত শিবসূর্য্যোপাসক হইলেও, রাজ্যবর্দ্ধন ও রাজ্যশ্রী বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়ায়, হর্ষবর্দ্ধনের হৃদয়েও বৌদ্ধমত ক্রমশ আধিপত্য বিস্তার করে। নবীন ধর্ম্মবিশ্বাসের নূতন উৎসাহে অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি বহুসংখ্যক বৌদ্ধ বিহার ও স্তূপ নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। চৈন পরিব্রাজকের মতে, তাহাতে প্রায় দুইসহস্র ভিক্ষু বাস করিতেন। তিনি প্রথমত বৌদ্ধধর্ম্মের হীনায়ন ও পরে হিউয়েন্-সাংএর উপদেশক্রমে মহায়নশাখাবলম্বী হন। রাজ্যশ্রী সম্মতীয়সম্প্রদায়ানুসারিণী ছিলেন।

* যাঁহারা বঙ্গাক্ষরের নবীনত্ব ও তদ্বিনিময়ে ভারতবাসিসাধারণের ব্যবহারোপযোগী একমাত্র বর্ণমালারূপে দেবনাগরপ্রচলনের একান্ত পক্ষপাতী, তাঁহারা যেন অন্তত একবার এই শিলালিপিটির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবেন, বাঙালীর অক্ষরগুলি কাহারও ঘরগড়া কালিকার জিনিষ নহে। বঙ্গীয় বর্ণমালায় প্রাচীনত্বের দাবিটা নিতান্ত অলীক কি না, তাহা বোধ হয় বর্ত্তমান শিলালিপির এই কয়েকটামাত্র অক্ষর আলোচনা করিলেই হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে।

হর্ষচরিতের ভদন্তসাক্ষাৎকারপ্রস্তাবে তাঁহার বৌদ্ধধর্ম্মানুরক্তির প্রথম প্রমাণ পাওয়া যায়। সম্ভবত তাঁহারই আগ্রহাতিশয্যে তদীয় পতির ভূতপূর্ব্ব রাজধানী কনোজনগরে বৌদ্ধোৎসবের আয়োজন করা হয়। তাঁহার বৌদ্ধসন্ন্যাসীর সহিত নিঃসঙ্কোচে কথোপকথন ও হর্ষবর্দ্ধনের পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া হিউয়েন-সাং-ব্যাখ্যাত-বিচারাদিশ্রবণে অনুমিত হয়, এখনকার দক্ষিণাত্যের ন্যায় হর্ষের সময়ে আর্য্যাবর্ত্তেও স্ত্রীজাতির অবরোধপ্রথার কোন নিদর্শনই বিদ্যমান ছিল না। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগবশত বোধ হয়, ধর্ম্মবিচারকালে হিউয়েন-সাংএর প্রতি হর্ষের অযথা পক্ষপাতিত্ব পরিদৃষ্ট হইত, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বিদ্বেষবিষপরিশূন্য হইয়া সকল ধর্ম্মকেই সাম্যের চক্ষে দেখিয়া, যাহাতে সকলে স্বাধীনভাবে স্ব-স্ব-অবলম্বিত মতের অনুবর্ত্তন করিতে পারে, হর্ষের তৎপক্ষে বিশেষ দৃষ্টি ছিল। মুলতানের নিকট নবনির্ম্মিত বিহারে কতকগুলি বিভিন্নধর্ম্মাবলম্বী তার্কিক সমবেত হইলে, হর্ষের আদেশে তাহাতে অগ্নি প্রদত্ত হওয়ায় ভারতে পারশীক ও শাকগণের ধর্ম্মসম্প্রদায় একেবারে নির্ম্মূলিত হইয়া যায়—বৌদ্ধ ঐতিহাসিক তারনাথের এই উক্তি নিতান্ত অমূলক। বলবৎ প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত একান্ত ভিত্তিহীন অলীক কল্পনার আবেশে হর্ষের ন্যায় উদারপ্রকৃতি ধর্ম্মপ্রাণ নরপতির উন্নতমস্তকে এরূপ নীচজনোচিত ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িকতামূলক কলঙ্ক আরোপ করিতে প্রবৃত্তি হয় না। কেহ করিলেও, সাধারণের তাহা বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না।

কনোজের বৌদ্ধোৎসব ও প্রয়াগের মহামেলা।—বঙ্গে অবস্থানকালে হর্ষের সহিত হিউয়েন্-সাংএর সাক্ষাৎকারলাভ হয়। ৯০ দিনের পথশ্রমের পর, তাঁহারা কামরূপাধিপতি কুমারের সমভিব্যাহারে হর্ষের নিকট-আত্মীয় বলভীরাজ, কুমার ও অন্যান্য ১৮ জন নরপতিকর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া বৌদ্ধোৎসবে যোগদানার্থ হর্ষের তাৎকালিক রাজধানী কান্যকুব্জনগরে প্রবিষ্ট হন। সুরম্য উৎসবস্থলের মধ্যভাগে ৬৬হস্ত উচ্চে অবস্থিত ও হর্ষের আকৃতির পরিমাণবিশিষ্ট বুদ্ধমূর্ত্তি স্থাপিত ছিল। তুই-হস্ত উচ্চ অপর একটি বুদ্ধমূর্ত্তির মস্তকে শক্রবেশী হর্ষ চন্দ্রাতপ ধারণ করিয়া ও ব্রহ্মাবেশী কামরূপরাজ চামরব্যজন করিতে করিতে—বিংশতি ভূপতি ও তিনশত হস্তীতে পরিবেষ্টিত হইয়া—উৎসবস্থলে উপনীত হইবার সময় পথিপার্শ্বস্থ জনসমূহে মণি, মুক্তা ও স্বর্ণনির্ম্মিত পুষ্প বিতরণার্থ প্রক্ষিপ্ত হইত। অনন্তর রাজা স্বহস্তে বৌদ্ধমূর্ত্তির অভিষেককার্য্য সম্পন্ন করিয়া স্বীয় স্কন্ধে বহনপূর্ব্বক নির্দ্দিষ্টস্থানে স্থাপন করিতেন। ইহার পর জনসমূহকে ভোজন করাইয়া, পরে ধর্ম্মবিচার চলিত। কিন্তু প্রায় একপক্ষের যুক্তিতেই তাহার পর্য্যবসান হইত। এই উৎসব উপলক্ষে অস্থায়িভাবে নির্ম্মিত বৌদ্ধবিহারে হঠাৎ অগ্নিসংযোগ হওয়াতে মহারাজ শ্রীহর্ষ অগ্নিপ্রশমনদর্শনমানসে সমীপস্থ স্তূপোপরি অধিরূঢ় হইলে, তাঁহার প্রাণনাশার্থ ছুরিকাহস্তে এক ব্যক্তি ধৃত হওয়ায়, সে প্রকাশ করে, বৌদ্ধদিগের প্রতি তাঁহার অতিরিক্ত-পক্ষপাতিত্ব-প্রযুক্ত উত্তেজিত ব্রাহ্মণগণ তাহাকে নরপতির প্রাণবিনাশে নিযুক্ত করিয়াছেন। এই অভিযোগে

অভিযুক্ত পাঁচশত ব্রাহ্মণ রাজপুরুষপ্রদত্ত যন্ত্রণা সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়াই এই মিথ্যা-রোপিত দোষ স্বীকার করায় নির্ব্বাসনদণ্ডে দণ্ডিত হন। * উৎসবান্তে হিউয়েন্-সাং গৃহপ্রত্যাগমনে ব্যগ্রতা প্রদর্শন করিলেও, পাঞ্চবার্ষিক-উৎসব-দর্শনার্থ অভ্যর্থিত হইয়া সম্রাট্ সমভিব্যাহারে প্রয়াগগমন করেন। পাঁচবৎসর অন্তর গ্রীষ্মঋতুতে ৭৫দিন যাবৎ গঙ্গাযমুনাসঙ্গমসন্নিহিত সৈকতদেশে এই মেলা হইত। হিউয়েন্-সাং যে মহামেলা পরিদর্শন করেন, তাহা এই শ্রেণীর ষষ্ঠ। অভাবগ্রস্ত দরিদ্র ও সন্ন্যাসীদিগকে পাঁচ-বৎসরের সঞ্চিত অর্থবিতরণই এই মহামেলার প্রধান উদ্দেশ্য, সুতরাং রাজকীয় ঔদার্য্যাতিশয়-তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বলিয়া এই উৎসবশ্রেণী জগতের ইতিবৃত্তে অতুলনীয় হইয়া রহিয়াছে। এই মহোৎসবদর্শনার্থ উত্তরভারতের বা হিন্দুস্থানের সমগ্র রাজন্য ও ব্রাহ্মণবর্গ নিমন্ত্রিত হইতেন। পর্ণনির্ম্মিত একটি প্রশস্ত কুটীরে বুদ্ধমূর্ত্তি স্থাপিত হইয়া তাঁহার উদ্দেশে বহুমূল্য বসনভূষণাদি বিতরিত এবং সূর্য্য ও শিবের মূর্ত্তির প্রতিও ঐরূপ সম্মান প্রদর্শিত হইত। এ সময়ে হর্ষ বৌদ্ধধর্ম্মে নিরতিশয় শ্রদ্ধাবান্ হইলেও, আধুনিক সংস্কারক ও তাঁহাদিগের সাম্প্রদায়িকদিগের ন্যায় হিন্দুর দেবদেবীর প্রতি কদাচ অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেন না। তিনি যে এরূপ সুনিয়মে এতাদৃশ বিস্তৃত সাম্রাজ্যে এত অনায়াসে ঈদৃশ সুশাসন বিস্তার করিতে পারিয়াছিলেন, বোধ হয়, সকলের প্রতি সমপ্রাণতাপ্রদর্শনই তাহার অন্যতম কারণ। হিন্দুদেবারাধনার পর, দশসহস্র বৌদ্ধশ্রমণকে মূল্যবান্ উপহার প্রদত্ত হইত। তদনন্তর ২৩দিন পর্য্যন্ত তদনুরূপ দানাদির দ্বারা বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণেরও সৎকার করা হইত। অবশেষে জৈন প্রভৃতি ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীকেও যথাযোগ্য দ্রব্যাদি বিতরণ করা হইত। দূরদেশাগত ভিক্ষুক, অনাথ, দীনদুঃখিগণও দানাদিতে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিত। হিউয়েন্-সাং বলেন, অবশিষ্ট-দ্রব্যাদি-দানের পর রাজাধিরাজ শ্রীহর্ষ স্বকীয় রাজপরিচ্ছদ ও আভরণাদি উন্মোচনপূর্ব্বক দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিয়া তাঁহার ভগিনী রাজ্যশ্রীর নিকট হইতে পুরাতন বসন ভিক্ষা লইয়া, সমস্ত রাজকোষ ধর্ম্মার্থ নিঃশেষিত হওয়ায়, মহান্ চিত্তপ্রসাদ লাভ করিয়া বুদ্ধদেবসমীপে সাতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিতেন। উৎসবাবসানে হিউয়েন্-সাং স্বদেশপ্রতিগমনে উদ্যত হইলে, তাঁহার পাথেয়রূপে প্রচুর অর্থাদি উপঢৌকন দিয়া উধিতনামক একজন সামন্তরাজকে জলন্ধর-নগর পর্য্যন্ত তাঁহার অনুগমন করিতে আদেশ করেন। প্রত্যাবর্ত্তনকালে তিনি বোধিসত্ত্ব শাক্যসিংহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পাঁচটি নিদর্শন, সুবর্ণ, রজত ও চন্দনকাষ্ঠ নির্ম্মিত বুদ্ধের প্রতি-মূর্ত্তিপুঞ্জ ও ৬৫৭খানি পৃথক্ পৃথক্ হস্তলিখিত পুস্তক সংগ্রহ করিয়া চীনে লইয়া যান ও তাহার মধ্যে ৭২খানির চৈনভাষায় অনুবাদ করিয়া (৬৬৪খৃঃ অঃ) পরলোকগমন করেন।

* এই বিংশ শতাব্দীর উন্নত সভ্যতার দিনেও পুলিসনির্য্যাতনে কত শত নিরপরাধই যে বৃথা দণ্ডে দণ্ডিত হইতেছে, তাহা প্রত্যেক সামাজিকই ব্যথিতান্তঃকরণে প্রত্যহ প্রত্যক্ষ করিতেছেন। দুঃখের বিষয়, লর্ড কর্জ্জনের পুলিসসংশোধনপ্রয়াসও অন্যান্য কমিশনের ন্যায় বাগাড়ম্বরের গণ্ডি অতিক্রম করিয়া কার্য্যকারিতার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারিল না।

হর্ষের মৃত্যু ও চৈন সংঘর্ষ।—মহারাজাধিরাজ শ্রীহর্ষ সভ্যতাসৌধের উন্নতশিখরে আরূঢ় চীনবাসীদিগের ধর্ম্মবিষয়ক সহানুভূতির সঙ্গে সঙ্গেই রাজনীতিক সংস্রবও ঘনিষ্ঠভাবে রক্ষা করিবার জন্য সবিশেষ মনোযোগী ছিলেন। তাহার নিদর্শনস্বরূপ চীনসম্রাটের সহিত দূতের আদানপ্রদান বিশেষরূপে চলিত। হিউয়েন-সাং এর ভারতাবস্থানকালেই একজন ব্রাহ্মণদূত চীনে গমন করিয়া, চীনাধিপতির উত্তর সহ তাঁহার প্রেরিত একদল দূত সমভিব্যাহারে (৬৪৩ খৃঃ অঃ) ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পরবৎসরও পুনরায় পূর্ব্বপ্রেরিত দূতদলের সহকারী অধিনায়ক ওয়াং-হিউয়েন্-সি ত্রিংশৎ অশ্বারোহী সহিত দৌত্যে বৃত হইয়া ভারতাগমন করেন, কিন্তু তাঁহাদিগের মগধে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই (৬৪৮ খৃঃ অঃ) মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন মানবলীলা সংবরণ করেন। এতাদৃশ প্রতাপশালী নৃপতির মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তাঁহার উপযুক্ত বংশধরের অভাবে দেশমধ্যে অরাজকতার নানাবিধ লক্ষণ পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। ক্রমে অর্জ্জুননামক হর্ষের একজন অমাত্য সুযোগ বুঝিয়া প্রভুর সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিল। এইরূপ সময়ে চৈন দূতদল ভারতে উপনীত হইলে, অর্জ্জুনাদেশে তাহাদের অধিকাংশই বিনাশপ্রাপ্ত হয়। ওয়াং অবশিষ্ট কয়েকজন লইয়া রাত্রিযোগে নেপালাভিমুখে পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা পান। চীনসম্রাটের জামাতা তিব্বতরাজ গাম্পো এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, নেপালরাজের সপ্তসহস্র সেনার সহিত স্বকীয় একসহস্র অশ্বারোহী সৈন্য তাহাদিগের সাহায্যার্থ প্রেরণ করিয়া তাহাদিগের প্রতিহিংসাপ্রবৃত্তি প্রদীপ্ত করিয়া দিয়া, সেই মহা-অনলে ভারত ভস্মীভূত করিতে বদ্ধপরিকর হন। তাহারা প্রবলবেগে ত্রিহুতনগর অবরুদ্ধ করিয়া তিনসহস্র ভারতবর্ষীয়ের মস্তক ছিন্ন ও দশসহস্রের সজীবদেহ নদীজলে নিমজ্জিত করে। অর্জ্জুন সুযোগক্রমে পলায়ন করিয়া পুনরায় সৈন্যসংগ্রহপুরঃসর যুদ্ধে অগ্রসর হইলে বন্দিরূপে ধৃত হইয়া পরে চীনে নীত হয়। পরবর্ত্তী বিগ্রহেও ওয়াং-হিউয়েন্-সি একসহস্রের গ্রীবাচ্ছেদনপূর্ব্বক রাজপ্রাসাদ অবরোধ করিয়া ত্রিশসহস্রপরিমিত গার্হস্থ্য পশু লুণ্ঠন করেন। কথিত আছে, এইরূপ অত্যাচারের পুনরভিনয়-আশঙ্কায় নিতান্ত ভীতিবিহ্বল হইয়াই ৫৮০টি প্রাচীরপরিবেষ্টিত নগর তাহাদিগের নিকট নতিস্বীকার করিয়া কথঞ্চিৎ অব্যাহতিলাভ করে। অনন্তর সদর্পে চীনে প্রতিগমন করিয়া, (৬৫৭ খৃঃ অঃ) পুনরায় বৌদ্ধতীর্থাদিতে কৃতজ্ঞতাপ্রদর্শন উপলক্ষে, ওয়াং তৃতীয়বার ভারতাগমন করিয়া বৈশালী ও বুদ্ধগয়ায় পরিচ্ছদাদিদানের পর হিন্দুকুশ ও পামীরের পথে স্বদেশে প্রস্থান করেন। হিউয়েন্-সাং এর বিবরণপাঠে অবগত হওয়া যায়, ভারতবর্ষের বহির্ভূত রাজ্যাদির সহিত ভারতের সহৃদয়তামূলক রাজনীতিক সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত, হর্ষ সবিশেষ যত্নবান্ থাকিতেন। ফা-হিয়ান্ হইতে আরম্ভ করিয়া হিউয়েন্-সাং পর্য্যন্ত যে কত বৌদ্ধ যাত্রিক ধর্ম্মোপলক্ষে ভারতাগমনপুরঃসর বৌদ্ধতীর্থাদিভ্রমণ ও অশেষবিধ জ্ঞান সঙ্কলন করিয়া তাৎকালিক বৌদ্ধজগতের শীর্ষস্থানীয়

চীনে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এমন কি, হর্ষের মহাসাম্রাজ্য বিধ্বস্ত হওয়ার পরও (৬৭১ খৃঃ অঃ) ইট্‌-সিংনামক অপর একজন চৈন তীর্থযাত্রী ভারতের নানা-স্থানে পর্য্যটন ও একাধিকক্রমে দশবৎসর যাবৎ (৬৭৫—৮৪) নালন্দ-মহাবিদ্যালয়ে অবস্থান করিয়া জ্ঞানরাশি-অর্জ্জনের পর স্বকীয় অভিজ্ঞতোপলব্ধ ভারতসংক্রান্ত বিবরণ (৬৯৫ খৃঃ অঃ) লিপিবদ্ধ করিয়া চীনে প্রতিগমন করেন।

শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়।

বারাণসী-অভিমুখে।

২

গোধূলি-আলোকে জগন্নাথমন্দির।

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পীঠস্থান একটি পুরাতন নগরে, সমস্ত হইতে দূরে, সৈকতভূমি ও বালুকাস্তূপের মধ্যে, বঙ্গোপসাগরের ধারে, জগন্নাথের বিরাট্‌ মন্দির অধিষ্ঠিত।

ভারতের মধ্যদেশ হইতে যাত্রা করিয়া, সূর্য্যাস্তসময়ে এইখানে আসিয়া পৌঁছিলাম। আমার গাড়িটা সহসা নিঃশব্দ হইল,—যেন মখ্‌মলের উপর দিয়া চলিতে লাগিল;—আমরা এখন বালুরাশির মধ্যে আসিয়াছি। নিঃশব্দতা-দ্বারা জানাইয়া-দিয়া, নীল রেখার আকারে সমুদ্র আমাদের সম্মুখে প্রকাশিত হইল।

বালুকাস্তূপরাশির উপর, ক্যাক্‌টস্‌-(cactus)-ঝোপের ভিতরে, প্রথমে ধীবরদিগের কতকগুলি ইতস্ততোবিক্ষিপ্ত কুটীর। তাহার পরেই জগন্নাথের মন্দির দৃষ্টিপথে পতিত হইল। তালপাতায়-ছাওয়া হাজার-হাজার ধূসরবর্ণ খোড়ো-ঘরের ঊর্দ্ধে,—রাশি-রাশি কোঠা-বাড়ীর মধ্যে, মন্দিরের চূড়াটি সমুত্থিত; বিশেষত এই সামুদ্রিক ভূভাগে, আকাশভেদ করিয়া মন্দিরচূড়া অতি উচ্চে উঠিয়াছে বলিয়া, মন্দিরের এই দৃশ্যটি অতীব অপূর্ব্ব; চতুষ্পার্শ্বের আর-সমস্ত পদার্থ উহার পাদদেশে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বলিয়া মনে হইতেছে। চূড়ার আকারটি দীর্ঘ এবং উহার মাঝখানটা যেন ফুলিয়া উঠিয়াছে;—যেন একটা কুমীরের অণ্ডকে—একটা বৃহদাকার অণ্ডকে মাটীর উপর দাঁড় করান হইয়াছে। চূড়াটি শুভ্র; তাহার উপর ইষ্টক-গোলাপী রঙের একপ্রকার শিরাজাল, ইহা ভিন্ন আর-কোন অলঙ্কার নাই। চূড়ার উপরে যে-সকল পিতলের চাক্‌তি ও সূচ্যগ্র তাম্রখণ্ড ভল্ল-মুকুটরূপে শোভা পাইতেছে, সে সমস্ত গণনার মধ্যে না আনিলেও চূড়াটি দুইশত ফীট্‌ উচ্চ। গঙ্গা-মোহানার অন্বেষণে, জাহাজগুলা যখন বহিঃ-সমুদ্র দিয়া চলিতে থাকে, তখন এই মন্দিরটি তাহাদের নজরে পড়ে; এবং সামুদ্রিক নক্‌-

সায়, দিগ্‌দর্শনের চিহ্নরূপে ইহা অঙ্কিত রহিয়াছে। কিন্তু এই স্থানের উপকূলে নোঙর ফেলিবার সুবিধা নাই; সুতরাং নাবিকগণ, দূর দিগন্তপটে অঙ্কিত একটি চিত্র ভিন্ন, এই পুরাতন মন্দিরসম্বন্ধে আর কিছুই অবগত নহে।

একটা চওড়া ও সোজা রাস্তা মন্দির পর্য্যন্ত গিয়াছে। যে সময়ে আমি পৌঁছিলাম, রাস্তাটা লোকে লোকাকীর্ণ। কিন্তু এখানকার ভারত যেন একটু বন্যভাবাপন্ন;—বিদেশীকে দেখিলে এখনো যেন বিস্মিত হয়;—বিদেশীকে দেখিবার জন্য পথপরিবর্ত্তন করে, শিশুরা পিছনে-পিছনে চলিতে থাকে। নগ্ন লোকগুলা, সমুদ্রবায়ুর প্রভাবে একটু কালো হইয়া গিয়াছে; মল্‌মল্‌-ওড়নায় আচ্ছাদিত রমণীগণের পায়ে এত অধিক মল্‌-নূপুর যে, তাহার ভারে তাহাদের গমন মন্থর হইয়া পড়িয়াছে; হস্তের প্রকোষ্ঠ হইতে স্কন্ধ পর্য্যন্ত এত অধিক বলয়-বাজুবন্ধ যে, দেখিলে মনে হয়, যেন তাহাদের সমস্ত হাত আগাগোড়া একটা রৌপ্য কিংবা তাম্রকোষের মধ্যে আবদ্ধ। এখানকার কোন ক্ষুদ্র গৃহই রঙের চিত্রে একেবারে আচ্ছন্ন নহে; গৃহের চূনকাম-করা শুধু মুখভাগের উপর দেবদেবীর মূর্ত্তি অঙ্কিত; কাহারও দেহ নীল, কাহারও দেহ লাল, কাহারও মুখে নিষ্ঠুরভাব—এইরূপ সারি-সারি বরাবর চলিয়াছে; Thebes কিংবা Memphis—নগরের "ফ্রেস্‌কো"-চিত্রে যেরূপ মূর্ত্তিগুলি সজ্জিত, ইহা কতকটা সেই ধরণের। তা ছাড়া, গৃহের গঠনরীতি মিশরকে স্মরণ করাইয়া দেয়—সেইরূপ অনুচ্চ ও স্থূল ধরণের, সেইরূপ পোস্তার গাঁথুনি, সেইরূপ থাম, সেইরূপ গুরুভার দেয়াল—যাহা ভারাতিশয্যে পশ্চাতে ঝুঁকিয়া রহিয়াছে।

মন্দিরটি একটি বিশাল ভীষণ দুর্গবিশেষ; চতুষ্পার্শ্বে উচ্চ দন্তুর চতুষ্কোণ প্রাকার; প্রত্যেক পার্শ্বের মধ্যস্থলে একএকটি দ্বার। যে রাস্তা দিয়া আমরা এখন পদব্রজে চলিতেছি, মন্দিরের প্রধান দ্বারটি সেই রাস্তার ঠিক সোজাসুজি। দ্বারের দুই পার্শ্বে দুইটা প্রকাণ্ড প্রস্তরময় পশুমূর্ত্তি; পশুর চোখদুটা গোলাকার, নাক থ্যাবড়া ও মুখের 'হাঁ' ভীষণ। এই দুই পশুমূর্ত্তির মাঝখান দিয়া একটি বৃহৎ শুভ্র সোপান মন্দিরের উপর উঠিয়াছে; সোপানের ধাপগুলা শ্যামবর্ণ নগ্নকায় লোকদিগের যাতায়াতে ভারাক্রান্ত।

বলা বাহুল্য, এই মন্দিরে আমার প্রবেশাধিকার নাই। মন্দিরের সম্মুখস্থ সানের উপর যেই আমি ধৃষ্টতাসহকারে পদার্পণ করিয়াছি, অমনি কতকগুলি পুরোহিত আমাকে একটু পিছনে হটিয়া যাইতে—একটু দূরে গিয়া সেই বালির উপর দাঁড়াইতে অনুনয় করিল;—যাহার উপর সকলেরই অধিকার আছে, সমুদ্রের সেই বেলাভূমি,—সমুদ্রের সেই বালুকারাশি, যাহাতে করিয়া জগন্নাথপুরীর সমস্ত রাস্তা তূলাভরা গদির মত 'থস্‌থসে' বলিয়া মনে হয়।

কিন্তু এই চতুষ্কোণ ভীষণ প্রাকারটি লঙ্ঘন করিয়া ভিতরে যাইতে না পারিলেও উহা প্রদক্ষিণ করিবার আমার অধিকার আছে। ঐ প্রাকারের প্রত্যেক দিকে বরাবর এক-একটা বীথি চলিয়া গিয়াছে; তাহার দুই ধারে শুষ্ক মৃত্তিকানির্ম্মিত গৃহাবলী। এই

পুরাতন গৃহগুলা গুরুভার ঘনপিণ্ডাকৃতি; উহার দেয়াল ভিতর-দিকে ঝোঁকা; গৃহের মুখভাগের উপর সারি-সারি দেবদানবের প্রতিকৃতি প্রায়ই নীল ও লাল রঙে চিত্রিত, তাহার শিখরদেশে যে বারণ্ডা স্থাপিত—সেই বারণ্ডা পর্য্যন্ত একটা ক্ষয়গ্রস্ত সিঁড়ি উঠিয়াছে। এই সময়ে সায়াহ্নের শৈত্য-মাধুর্য্য উপভোগ করিবার জন্য রজতবলয়বিভূষিতা হিন্দুরমণীগণ ঐ বারণ্ডায় বসিয়া সমস্ত নিরীক্ষণ করিতেছে অথবা আপন-আপন ভাবে ভোর হইয়া রহিয়াছে। ওড়নার স্বচ্ছ ভাঁজের মধ্য হইতে তাহাদিগকে বড়ই সুন্দর দেখাইতেছে।

যে সময়ে আমি মন্দির প্রদক্ষিণ করিতেছি, কতকগুলি ক্ষুদ্র বালিকা আমার পিছনে-পিছনে চলিয়াছে;—অক্লান্ত তাহাদের কৌতূহল। উহাদের যে সর্দ্দার, তাহার বয়স হদ্দ ৮বৎসর, সকলেই বেশ সুন্দর-সুশ্রী; তাহাদের নেত্রযুগল কজ্জলরেখায় দীর্ঘীকৃত হইয়া কৃষ্ণ-কুন্তলে মিশিয়া গিয়াছে; তাহাদের দৃষ্টি অতীব সরল। তাহাদের কানে সোনার কানবালা, নাকে নথ্।

রাত্রির পূর্ব্বেই বহুল যাত্রীর সমাগম হইবে জানিয়া, আমি সেই প্রতীক্ষায় ধীরে-ধীরে মন্দির প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলাম। মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে, বীথিটি খুবই নির্জ্জন। যদি এই বালিকাগুলি আমার পথের সাথী হইয়া আমার সঙ্গে-সঙ্গে না থাকিত, তাহা হইলে এই বীথিটি আরও বিষাদময় বলিয়া বোধ হইত, সন্দেহ নাই। উহারা আমার দুইফীট্ অন্তরে থাকিয়া সঙ্গে-সঙ্গে চলিয়াছে; আমি যেখানে থামিতেছি, উহারাও সেইখানে থামিতেছে; যখন আমি দ্রুত চলিতেছি, উঁহারাও নূপুর ঝঙ্কৃত করিয়া দীর্ঘপদক্ষেপে চলিতেছে।

গোলাপী রেখা-জালে বিভূষিত বৃহৎ মন্দিরচূড়াটি বরাবরই আমা হইতে সমান দূরে রহিয়া যাইতেছে; কেন না, উহা প্রাচীর-বদ্ধ চতুষ্কোণ প্রাঙ্গণের কেন্দ্রবর্ত্তী; উহা আমার অলঙ্ঘনীয়; আমি উহার চতুর্দ্দিক্ প্রদক্ষিণ করিতেছি মাত্র। কিন্তু আরও অন্য কতকগুলি ছোট-ছোট মন্দির ভিতরদিকে প্রাচীরে ঠেস্ দিয়া রহিয়াছে,—সেই সকল মন্দির আমি নিকট হইতে দেখিতে পাইতেছি। এই সকল মন্দিরের চূড়া কুষ্মাণ্ডাকৃতি অথবা কুম্ভীরের অণ্ডের ন্যায়,—কিন্তু একটু কালিমাগ্রস্ত, 'ফাট্-ধরা' ও অতীব জরাজীর্ণ। কেবল, মধ্যস্থলের বৃহৎ মন্দিরচূড়াটি—যাহা দূর হইতে দেখা যায়,—তাহাই ধবধবে শাদা, ও নূতন-টাট্‌কা বলিয়া মনে হয়, কিন্তু উহার ধরণটা আমাদের একেবারেই অপরিচিত! উহার গঠন যেরূপ বর্ব্বর-ধরণের, যেরূপ 'ছেলেমান্‌ষি'-ধরণের, উহার উপরে যেরূপ পিত্তলবিম্ব ও ঝক্‌মকে তীক্ষ্ণাগ্র ধাতুখণ্ড দৃষ্ট হয়, তাহাতে মনে হয়, যেন উহা অন্য গ্রহ-নিবাসী কিংবা চন্দ্রনিবাসী লোককর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে!। উহা বিহঙ্গকুলের আবাসস্থান। ইহারই মধ্যে উহারা সান্ধ্যভ্রমণে বহির্গত হইয়া আকাশে অবাধে ঘোরপাক্ দিতেছে।

আমি ও এই ক্ষুদ্র বালিকাগুলি—আমরা এই নিষিদ্ধ ঘেরের তৃতীয় দিকে আসিয়া পৌঁছিলাম। চতুষ্পার্শ্বের গৃহছাদ সুন্দরী রমণীগণকর্ত্তৃক বিভূষিত হইয়াছে; রাস্তার উপর বাজার বসিয়াছে; বাজারে রং-করা মল্‌মল্-বস্ত্র, শস্যদানা, ফলফুল বিক্রয় হইতেছে।

আমরা নীচে রহিয়াছি—আমাদের নিকট সূর্য্য অস্তমিত; কিন্তু বৃহৎ মন্দিরচূড়াটি সূর্য্যকে এখনো দেখিতে পাইতেছে;—উহার সমস্ত অংশই গোলাপী আভায় উদ্ভাসিত।

মনে হইল, পবিত্র বানরদিগের সান্ধ্য-ভ্রমণের ঠিক এই সময়। উহাদের মধ্যে প্রথমটি পবিত্র প্রাচীরের উপরে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং প্রাচীরের একটি দন্তুর অংশের উপর উঠিয়া-বসিয়া গা চুল্‌কাইতে লাগিল। প্রাচীরের শিখরদেশে দেবদানবের ছোট-ছোট মূর্ত্তি ইতস্তত খোদিত রহিয়াছে; বানরটা যদি না নড়িত, তাহা হইলে উহাকে উহাদেরই একটি বলিয়া মনে হইত, সন্দেহ নাই। তাহার পর, আর একটা বানর বাহির হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী অন্য এক দন্তুর-অংশের অগ্রভাগে আসিয়া বসিল; এইরূপে তিনটা, পরে চারিটা বানর আসিয়া বসিল; প্রাকারের দন্তুরাংশগুলি কপিবৃন্দে বিভূষিত হইল।

অতি শীঘ্রই বেলা পড়িয়া আসিল; ধূসর ও পুরাতন মন্দিরের শুধু চূড়ার অগ্রভাগটি গোলাপী-আভায় রঞ্জিত হইয়া রহিল। প্রাচীরের উপর,—প্রস্তরবর্ণের বানর, বানরবর্ণের ছোট-ছোট খোদিত প্রস্তরমূর্ত্তি ও শকুনবৃন্দ। আকাশে—কাক ও পায়রার ঝাঁক্ বৃহৎ চক্রাকারে পাক্ দিতে দিতে, ক্রমে তাহাদের কক্ষপথ সঙ্কীর্ণ করিয়া আনিয়া, চূড়াশিখরস্থ পিত্তলবিম্বের চারিধারে ঘুরিতে আরম্ভ করিল।

এইবার বানরদিগের প্রস্থান করিবার সময়। উহাদের মধ্যে একটা বানর পিছ্‌লাইতে পিছ্‌লাইতে নীচে নামিয়া মাটীর উপর লাফাইয়া পড়িল; এবং ধৃষ্টতাসহকারে রাস্তা পার হইয়া বিক্রেতাদলের মধ্যে গিয়া উপস্থিত হইল; বিক্রেতাগণ পথ ছাড়িয়া দিল। অন্য বানরগুলা তাহার পিছনে-পিছনে সারিবন্দি হইয়া চার পায়ে চলিতে লাগিল। দেখিলে মনে হয়, যেন কতকগুলা কুকুর,—কেবল পিছনের পা তাহাদের অপেক্ষা বেশী উচ্চ—উর্দ্ধপুচ্ছ হইয়া লাফাইতে লাফাইতে চলিয়াছে। যাইতে যাইতে প্রথম বানরটা বাজারের ঝুড়ি হইতে একটা কুল চুরি করিল; পরবর্ত্তী বানরগুলাও সেই একস্থান হইতেই ঐরূপ চুরি করিল; দোকানদার প্রতিবারই কোন আপত্তি না করিয়া তাহাদের অভিবাদন করিল। এক্ষণে উহারা চটুলভাবে একটা বাড়ীর গা বাহিয়া উঠিয়া দূরে চলিয়া গেল এবং ছাদের উপর দিয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়া পড়িল।

বহির্দিকে, মন্দিরপ্রাকারের গায়ে, তালতরুর ডালপালা ও দর্ম্মা দিয়া নির্ম্মিত প্রহরিস্থানের ন্যায় একটা ঘরে পাণ্ডবের একটা মূর্ত্তি,—দুইমানুষপ্রমাণ উচ্চ, দেখিতে ভীষণ, কৃষ্ণবর্ণ, লম্বা-লম্বা দাঁত, হাঁ করিয়া রহিয়াছে। একজন বৃদ্ধ পুরোহিত একটা পাদপীঠের উপর উঠিয়া তাহার গলায় হলুদে ফুলের মালা পরাইয়া দিল; তাহার সম্মুখে একটা প্রদীপ জ্বালিল, একটা ছোট ঘণ্টা বাজাইল, প্রণাম করিল, তাহার পর একটা মশারির মধ্যে বদ্ধ করিয়া, তাহাকে আবার প্রণাম করিতে করিতে প্রস্থান করিল। কি-একটা দ্রুতগামী ও দুর্লক্ষ্য জিনিষের হাওয়া আমার মুখে লাগিল! একটা বাদুড় অসময়ে বাহির হইয়া, খুব নিম্নদেশে উড়িয়া বেড়াইতেছে; জনতার মধ্যে বেশ বিশ্বস্তভাবে যাওয়া-আসা করিতেছে।

মন্দিরচূড়ার অগ্রবিন্দুতে শেষ গোলাপী আভাটুকু এখনো রহিয়াছে; ইহাই পূজার সময়; মন্দির জনকোলাহলে ও বাদ্যনিনাদে পূর্ণ হইল। উভয়ই মিশ্রভাবে আমার কানে আসিয়া পৌঁছিল। ঐ গুপ্তস্থানের অভ্যন্তর-প্রদেশে না জানি কি কাণ্ড হইতেছে! না জানি কোন্ প্রতিমা (অবশ্যই খুব ভীষণ) এক্ষণে সান্ধ্যপূজা গ্রহণ করিতেছে। মন্দিরেরই মত লোকদিগের যে আত্মা আমার নিকট দুরধিগম্য, সেই আত্মা হইতে না জানি কিরূপ আকারে প্রার্থনা উত্থিত হইতেছে!...

সে যাই হোক্,—একটা বানর, ভ্রমণে পরাঙ্মুখ হইয়া, নিম্নে লেজ ঝুলাইয়া, বহির্লোকের দিকে পিঠ ফিরাইয়া, মন্দিরপ্রাকারের শিখরদেশে একাকী বসিয়া আছে; এবং ঐ ঊর্দ্ধে মন্দিরচূড়ার উপরে দিবসের মুমূর্ষু দশা বিষণ্ণভাবে নিরীক্ষণ করিতেছে। যে সকল পায়রা ও কাক আকাশে ঘোরপাক্ দিতেছিল, এক্ষণে উহারা ঘুমাইবার জন্য মন্দির-চূড়ায় আশ্রয় লইয়াছে। ঐ প্রকাণ্ড চূড়াটার সমস্ত শিরাজাল, সমস্ত খোঁচখাঁচ এক্ষণে ঐ সকল পক্ষীর সমাগমে কালো হইয়া গিয়াছে; পাখীরা এখনো পাখার ঝাপ্টা দিতেছে। শুধু ছায়ারেখা ছাড়া বানরটার আর-কিছুই এখন আমি দেখিতে পাইতেছি না। তাহার পৃষ্ঠদেশ ঠিক মানুষেরই মত, তাহার ক্ষুদ্র মস্তক চিন্তামগ্ন; প্রকাণ্ড মন্দির-চূড়ার ঈষৎ-গোলাপী-মিশ্রিত পাণ্ডুবর্ণ 'জমি'র উপর, বানরের পৃথক্ দুইটা কান পরিস্ফুট-ভাবে প্রকাশ পাইতেছে।...

আবার যেন সেই নিঃশব্দ পাখার বাতাস আমি অনুভব করিলাম; বাদুড়টা যে কক্ষ-পথে ঘুরিতেছিল, তাহার কোন পরিবর্ত্তন না করিয়া এখনো সেই পথে যাতায়াত করিতেছে।

বানরটা বৃহৎ মন্দিরচূড়া দেখিতেছে; আমি বানরটাকে দেখিতেছি; সেই ছোট মেয়েগুলি আমাকে দেখিতেছে, এবং আমাদের সকলেরই মধ্যে দুর্বোধ্যতার একটা বিশাল খাত প্রসারিত রহিয়াছে।...

এক্ষণে আমি মন্দিরের মুখ্য প্রবেশদ্বারের নিকটস্থ সেই সৈকতভূমিতে আসিয়াছি, যেখানে জগন্নাথপুরীর সর্ব্বাপেক্ষা লম্বা রাস্তাটা আসিয়া মিলিত হইয়াছে। তীর্থযাত্রীরা আসিতেছে বলিয়া খবর হইয়াছে, তাহারা প্রায় নজরে আসিয়াছে। তাহাদের সহিত মিলিত হইবার জন্য, প্রতি মিনিটেই জনতার বৃদ্ধি হইতেছে।

সেই পবিত্র গাভীবৃন্দও এইখানে রহিয়াছে,—উহারা জনতার মধ্যে বিচরণ করিতেছে। উহাদের মধ্যে একটা গরু, যাহাকে শিশুরা খুব আদর করিতেছে—সেই গরুটা প্রকাণ্ডকায়, একেবারে ধব্‌ধবে শাদা, ও খুব বৃদ্ধা। একটা ছোট কালো গরু, তাহার পাঁচটা পা; একটা ধূসর রং-এর গরু, তাহার ছয়টা পা; এই অতিরিক্ত পা-গুলা এত ছোট যে, উহা মাটী পর্য্যন্ত পৌঁছে না—অসাড় মৃত অঙ্গের মত গরুর গায়ের উপর ঝুলিয়া রহিয়াছে।

ঐ হোথা রাস্তার শেষপ্রান্তে, তীর্থযাত্রী-দিগকে দেখা যাইতেছে। সংখ্যায় দুইতিন শত হইবে। উহারা রং-করা বাখারির বড়-বড় চ্যাপ্টা ছাতা ধরিয়া আছে; এই জগন্নাথপুর সন্ধ্যার সময় এইরূপ ছাতা খুলিয়া রহিয়াছে

দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়; কটি হইতে ভিক্ষার ঝুলি ও তাম্রকমণ্ডলু ঝুলিতেছে; বক্ষের উপর কতকগুলা মাদুলি কতকগুলা রুদ্রাক্ষমালা জটাপটি হইয়া রহিয়াছে; গাত্র ও মুখমণ্ডল ভস্মাচ্ছন্ন; উহারা খুব তাড়াতাড়ি চলিয়াছে, পরমারাধ্য মন্দিরচূড়াটি দর্শনমাত্রে যেন জ্বর-বিকারের ঝোঁকে তাড়াতাড়ি চলিয়াছে।

মন্দিরের প্রবেশদ্বারের উপরিস্থ নহবৎ-খানায়, যাত্রীদিগের স্বাগত-অভ্যর্থনা-উদ্দেশে নহবৎ বাজিতে আরম্ভ হইয়াছে; উপরে ঢাকঢোলের বাদ্য, তাহার সহিত লোকদিগের দীর্ঘোচ্চারিত জয়ধ্বনি ও শুভশঙ্খের বিকট নিনাদ মিলিত হইয়া দিগ্‌বিদিক্‌ প্রতিধ্বনিত করিতেছে।

উহারা তাড়াতাড়ি,—খুব তাড়াতাড়ি চলিয়াছে। মন্দিরসম্মুখস্থ সৈকতভূমিতে আসিয়া উহারা ছাতা, বোঁচ্‌কা-বুঁচ্‌কি, ঝোলা-ঝুলি মাটীর উপর ফেলিয়া গন্তব্য-পথে চলিতে লাগিল; বিকট প্রস্তরমূর্ত্তিগুলা যে দ্বার রক্ষা করিতেছে, সেই প্রবেশদ্বারের মধ্য দিয়া তুমুল কোলাহল সহকারে উহারা প্রবেশ করিল, বিকারগ্রস্তের ন্যায় উন্মত্ত হইয়া সিঁড়ির উপর উঠিতে লাগিল, এবং অবারিতদ্বার মন্দিরের মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল।

এখন রাত্রি হইয়াছে, পান্থশালার অন্বেষণে আমি চলিলাম। ভারতীয় নগর-মাত্রেই দেখা যায়, এই পান্থশালাগুলি প্রায়ই সহর হইতে দূরে—সহরের বাহিরে অবস্থিত।

সৈকতময় একটি ক্ষুদ্র নির্জ্জনস্থানে একটা পান্থশালা পাইলাম। স্বচ্ছ সুন্দর মধুময় রাত্রি। সমুদ্রের দোলনশব্দ শুনা যাইতেছে; সমুদ্র-উপকূলমাত্রেই এইরূপ শব্দ শোনা যায়। জগন্নাথের মন্দির কিংবা মন্দিরের সেই অপূর্ব্ব চূড়া আর দেখা যাইতেছে না; ঐ হোথায় নীলাভ ছায়ার মধ্যে তৎসমস্তই ডুবিয়া গিয়াছে। এখানকার সামুদ্রিক গন্ধ, বালির উপর যে সকল ছোট-ছোট বুনো চারা যেন গালিচা বিছাইয়া রাখিয়াছে, সেই সকল চারা-সমুত্থিত সৌরভ,—অতীব বিষণ্ণভাবে আমার শৈশবের জন্মস্থানকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে; বঙ্গোপসাগরের ধারে, আমার সেই (Ile d' Oleron ওলূরোঁ-দ্বীপের সাগর-তটকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে।...

একমাত্র তাহারাই ভ্রমণের সমস্ত মাধুর্য্য, ভ্রমণের সমস্ত কঠোরতা অনুভব করিতে পারে, যাহাদের অন্তরের অন্তস্তলে স্বকীয় জন্মস্থানের প্রতি একটা দুর্ব্বিজয় আসক্তি বিদ্যমান।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রাজতপস্বিনী।

[জীবনীপ্রসঙ্গ]

৯

মহারাণীমাতার চরিত্রে অনন্যসাধারণ একটা সমন্বয় ছিল। একাধারে তিনি জ্ঞান-যোগিনী প্রবীণার প্রগাঢ় ধর্ম্মভাব এবং নিতান্ত সরলা বালিকার বিমল রহস্যপ্রিয়তার সমন্বয় করিতে পারিয়াছিলেন। শিশুদের প্রতি তাঁর আচরণ কিরূপ মধুর স্নেহময় ছিল, তাহার পরিচয় কিছু-কিছু ইতিপূর্ব্বে দিয়াছি। শৈলেশচন্দ্র যখন নিতান্ত বালক, পুটিয়া-বঙ্গবিদ্যালয়ের ছাত্রদের লইয়া প্রতি-বৎসর সরস্বতীপূজা করা তাহার একটি কাজ ছিল। মহারাণী ইহাদের তখনকার উৎসাহ দেখিয়া ভারি আনন্দলাভ করিতেন। শৈলেশ চাঁদা-আদায়ের জন্য তাঁহার কাছে গেলে "শৈলেশের কন্যাদায় উপস্থিত" বলিয়া হাস্য-পরিহাস করিতেন এবং দুইতিনদিন পরে যখন আর ছেলেদের সাধ্যে কুলাইত না, তখন প্রয়োজনীয় সমস্ত খরচপত্র দিতেন। কাদো-ময়দাওয়ালীর সঙ্গেই তাঁহার আমোদটা সচরাচর জমিত ভাল। কাদো অনেকদিন হইতে বাবুর বাড়ীতে ও রাজবাটীতে ময়দা সরবরাহ করিত। মহারাণীর চেয়ে সে বয়সে প্রায় দ্বিগুণ বড়। জীবজন্তুর মধ্যে "কান্তাই"কে (শতপদী বা শতপাদিকা, রাজশাহী-অঞ্চলে ইহাকে "কেন্নো" বলে) তাহার বড় ভয়,—চক্ষে দেখা দূরে থাক্, কেহ সেই কর্ণজলৌকার প্রসঙ্গ করিলেও সে আতঙ্কে পাগলের মত হইত। তখন সে কি বলিত, কি করিত, তাহার কিছুই ঠিকানা থাকিত না। পুরাতন দাসীরা ইহাতে মহা বিরক্ত হইত, তাহাদের বিশ্বাস যে, মাকে দেখাইবার জন্য সে সেরূপ নকল করিতেছে। কিন্তু বাস্তবিকই সে ভয়ে জ্ঞান হারাইত। মহারাণী তাহাকে বড় দয়া করিতেন এবং চিরদিন সে রাজসংসারে রীতিমত প্রতিপালিত হইত। ভয় পাইলে অথবা কোনরূপ রহস্য করিলে তাহার মূর্ত্তি কেমন-একটা হাস্যকর কিম্ভূত-কিমাকার ধারণ করিত, তিনি তাহাতে আনন্দানুভব করিতেন। কোথাও একটা "কান্তাই" দেখিতে পাইলে কাদোকে আদর করিয়া কাছে ডাকিতেন এবং আশ্চর্য্য-কিছু দেখাইবার ছলে সেখানে লইয়া যাইতেন। বেচারী কতকটা কৌতূহলবশে কতক বা সন্দেহান্দোলিত চিত্তে তাঁহার অনুবর্ত্তন করিত, তার পর "কেন্নো"র উপর চক্ষু পড়িবামাত্র চীৎকার করিয়া উঠিত। মা বড় সহজে কাহারও সেবাগ্রহণ করিতেন না, কিন্তু সন্ধ্যার পূর্ব্বে বা পরে কাদো রাজ-বাটীতে আসিলে সহসা পদে বেদনা অনুভব করিতেন এবং কাতরভাবে তাহাকে একটু পদসেবা করিতে বলিতেন। পা টিপিতে টিপিতে

কাদো নানা গল্প জুড়িয়া দিত, কিন্তু মার পদাঙ্গুলির অবকাশপথে করসঞ্চালন করিতে আরম্ভ করিয়াই কিসের স্পর্শে ভয়ে লাফাইয়া উঠিত! সে আর কিছুই নহে, দেখা যাইত মহারাণী ছোট ছোট কদলীপত্রের নল প্রস্তুত করিয়া অঙ্গুলিতে লুকাইয়া রাখিয়াছেন। কাদো তাহা "কেন্নো" ছাড়া আর কিছু হইতে পারে, এমন ভাবিতেই পারিত না। এই জীববিশেষের বিভীষিকার সঙ্গে তাহার আরো দুইএকটা উপসর্গ ছিল, যেমন তোৎলামি, এবং এক কথা বলিতে গিয়া নিজের অজ্ঞাতে অন্য কথা বলা। মহারাণীকে সচরাচর সে বলিত "মা জননী।" কিন্তু যদি বলিতে ইচ্ছা করিত "মার শ্রীচরণে প্রতিপালিত হইতেছি," বলিয়া ফেলিত "মা আমার শ্রীচরণে" ইত্যাদি! তাহার এই সব কথা শুনিতে ও বলিতে তিনি ভালবাসিতেন। একদিন এক আত্মীয়া বলিতেছিলেন যে, মা আগে আমোদ করিয়া কাদোর পদধূলি লইতেন। মা হাসিলেন, কাদো বলিল, "তাই ত আমার কপালে এত দুঃখু।" সেই আত্মীয়া মহারাণীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "বাস্তবিক কর্ত্তা, আপনি কাশী-প্রয়াগের কথা ছাড়িয়া কেন কাদোকে পূজা করেন না?" মা হাসিলেন, বলিলেন, "সত্য কাদো, তুমি কোন উচ্চস্থানে বসিয়া থাক!" এই সব কথায় তাহার মূর্ত্তি বড় হাস্যজনক হইয়া উঠিত।

পিত্রালয়ে গেলে মহারাণী ঠিক বালিকার মতই ব্যবহার করিতেন। একদিন সেখানে প্রাতে তাঁহার কাছে বসিয়া আছি, ভৃত্য আসিয়া কয়জনের হাজিরী জানাইল। তাঁহার শরীর তখন অসুস্থ, কবিরাজমহাশয়ও দেখিতে আসিয়াছিলেন। সহজে চিকিৎসকের নিয়মাধীন হইতে তিনি কখন ভালবাসিতেন না, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ভৃত্য ত্রৈলোক্যকে বলিলেন, "আমায় বিরক্ত করিও না। দরবারের কথা এ বাড়ীতে কেন?"

আর একদিন পিত্রালয় হইতে ফিরিয়া হাসিতে হাসিতে মা গল্প করিতেছিলেন যে, ও-বাড়ী গিয়া কামরাঙা, আমড়া ও হরিফল খাইয়াছিলেন! হাস্যের উদ্দেশ্য, রাজবাটীতে অসুখের সময় এ স্বাধীনতা থাকার সম্ভাবনা ছিল না! আমায় বলিলেন, "হরিফল তুমি বুঝিবে না। তোমাদের দেশে নাকি নেওয়ার বলে!" আমি সুধাইলাম, তিনি জানিলেন কিরূপে? মা উত্তর করিলেন, "সে-বার কলিকাতায় গিয়া কুকুর (ও-বাড়ীর কোকনের) হাম হইয়াছিল। প্রতিবেশিনী কয়জন বৃদ্ধা আসিয়া উহারই ডাল দিয়া ঝাড়িতে বলিয়াছিল। প্রথমে বুঝিতে পারি নাই, পরে বুঝিয়াছিলাম।" আমি বলিলাম, "আমাদের বাসায় একটা আমড়াগাছ আছে।" মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, তার আমড়া মিষ্ট?" আমি হাসিলাম—"তা ত বলিতে পারি না।" মাও হাসিলেন। সেদিন চারি-আনির বাড়ীতে ত্রৈলোক্যকে দিয়া মহারাণী কতকগুলি শাকসবজী পাঠাইয়াছিলেন। ত্রৈলোক্য ফিরিলে কৌতূহলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি কি জিনিষ দেওয়া হইল, কি তাঁহারা বলিলেন", ইত্যাদি।

লেফটেনাণ্ট গভর্ণর টম্‌সন্‌সাহেবের রাজশাহীপরিদর্শনের কিছুদিন পূর্ব্বের কথা। পিতৃদেব তখন পেন্‌শন্ লইয়াছেন। আমরা শুনিয়াছিলাম, রাজার মৃত্যুকালে তিনি তথায়

ম্যাজিষ্ট্রেট্‌-কলেক্টর ছিলেন। মহারাণী বলিতেছিলেন, "ইনিই যদি তিনি হন, তবে আমার কাছে তাঁহার কতকগুলি পত্র আছে। এই সাহেবই চেষ্টা করিয়াছিলেন, যাহাতে বিষয় কোর্ট অব্‌ ওয়ার্ডসে না যায়। তিনি আমাদের কথা সব জানেন। যদি জিজ্ঞাসাপত্র করেন, তবে এমন পুরাণ লোক ষ্টেটে এখন কেহ নাই যে, উত্তর দিতে পারে। অবশ্য দেওয়ানজি সব জানেন।" আমি সেই কাগজপত্রগুলি একবার দেখিতে চাহিলাম। কিন্তু সেদিন মোহর ও পুরাতন কাগজাদির রক্ষক ঈশান সেন মহাশয় না আসায় দেখা হইল না। বেলা অধিক হইল, আমরা উঠিলাম। মাও আমাদের সঙ্গে হলে আসিলেন। সিঁড়িতে কাদো আমায় বলিতেছিল, "আমায় কতকগুলি আমড়া দিবেন ত?" মা শুনিয়া তাহার সঙ্গে বালিকার মত রহস্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

ঐ বৎসর শ্রাবণমাসের শেষে হঠাৎ কুমারের ইচ্ছা হইল, মহারাণীমাতাকে সঙ্গে লইয়া শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করিবেন। মা সে তীর্থ পূর্ব্বেই দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা ছাড়া, কতকগুলি কারণে সহসা সেভাবে পর্য্যটনে বাহির হওয়া বাঞ্ছনীয় জ্ঞান করেন নাই। কিন্তু কুমারকে বুঝাইয়া-সুঝাইয়া নিবৃত্ত করিতে পারিতেছিলেন না। কথাটা ২।৪ দিনে প্রকাশ হইলে তাঁর আশ্রিতদের কেমন আশঙ্কা জন্মিল, তিনি শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিতে চলিলেন, আর ফিরিবেন না। তাহারা তাঁহাকে সহস্রপ্রকারের প্রশ্ন করিয়া এবং কাঁদিয়া-কাটিয়া আকুল করিয়া তুলিল। কাদোও কাঁদিতেছিল, কিন্তু তাহার ভাষা মনের ভাবপ্রকাশে বাদ সাধিতেছিল। মা না হাসিয়া থাকিতে পারিলেন না, বলিলেন, "ঘোর দুঃখেও তোমার কথায় হাসি পায়!"

অবগাহনস্নান চিরদিন মার বড় প্রিয় ছিল। গঙ্গাসাগরস্নানে গিয়া কয়দিন প্রথামত আত্মীয়স্বজনদের স্মরণ করিতে করিতে এত ডুব দিয়াছিলেন যে, তাহাই তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গের প্রথম কারণ বলিয়া অনুমিত হয়। বড় অসুখের সময় এই স্নান বন্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াও চিকিৎসকমহাশয়েরা সর্ব্বদা সফল-মনোরথ হইতেন না। কবিরাজের হাত দেখা শেষ হইলেই দাসী তাঁর শিক্ষামত বলিত, "আজ স্নান করিবেন?" কবিরাজমহাশয় বারংবার নিষেধ করিয়া উত্তর পাইতেন, "গরমজলে আজ স্নান করিব, কাল আর করিব না।" তাঁর অসুস্থাবস্থায় একদিন শুনিলাম যে, মা আজ পুষ্করিণীতে স্নান করিবেন। আমি বলিলাম, "উহাতে অসুখ করিবে ত?" মা সে কথা হাসিয়া উড়াইলেন। চাকরাণীরা বলিতে লাগিল, "অনেকক্ষণ জলে থাকা হয়, সহজে মা উঠিতে চান না।" মা বলিলেন, "বেশ ত আমোদ, জলে খুব আরাম পাই। বোধ হয়, জলের উপর বেশ ঘুমান যায়।"

একদিন বধূরাণীর অলঙ্কারগুলি আমরা সকলে দেখিতেছিলাম। মহারাণীমাতার এক ঠাকুরাণীদিদি তাহা দেখিতে চাহিলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম, "দেখুন, আপনাদের সময় এ সব ছিল না। দেখুন, দেখিয়া আবার এখনকার বউ হইতে সাধ যায় কি না?" তিনি সে সব দেখিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন।

মা হাসিলেন, বলিলেন, "ঠাকুরমা, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন যে!"

তাঁহার চক্ষুলজ্জা বড় বেশী জানিয়া স্বার্থপর লোকেরা অনায়াসে আপনাদের কার্য্য সিদ্ধ করিয়া লইত। মা সব বুঝিতেন, কিছু বলিতে পারিতেন না। একদিন বলিতেছিলেন যে, "যদি প্রয়োজনবশত কখন কোকার তহবিল হইতে টাকা আনাইয়া লই, এক·দিয়া কর্ম্মচারী আর লিখিয়া রাখে। জানিয়াও শেষে লজ্জায় আমি আর কিছু বলিতে পারি না। উৎসব সরকারের শাশুড়ী পাগল হইয়া বলিয়াছিল, 'সবারও কথা নয়, কবারও কথা নয়।' পাগলমানুষ, কথা বলিয়াছিল ভাল। আমারও তাই হয়েছে!"

১২৮৯সালের আশ্বিনমাসে একদিন বেলা যখন প্রায় সাড়ে এগারটা, ত্রৈলোক্য মাকে জানাইল, প্রধান কর্ম্মচারীদের কেহ কেহ বাহিরে আসিয়াছেন, মাকে একবার কাছারীতে বসিতে হইবে। হাতের কাজ শেষ করিয়া মহারাণী একটু হাসিলেন এবং বলিলেন, "চল, হাজিরী দিয়া আসি গে!"

৩রা কার্ত্তিক পূজার সময় কলিকাতা যাওয়ার দিন রাত্রি প্রায় চারিদণ্ড পর্য্যন্ত কুমার গোপালেন্দ্রনারায়ণ সহ মহারাণী-মাতার নিকট উপস্থিত ছিলাম। একজন কর্ম্মচারীকে বিশেষ প্রয়োজনবশত ডাকিতে পাঠান হইয়াছিল। সংবাদ আসিল, তার জ্বর হইয়াছে—আজ কোনওপ্রকারে আসিতে সে অক্ষম। মা হাসিলেন, বলিলেন, "আজ সময় ভাল নয় বুঝি?" পরে বলিলেন "* * ডাক্তার মদ খাইলে ঐ কথা বলিয়া পাঠাইত!"

একদিন ও-বাড়ীর একজন পুরাতন কর্ম্মচারীর সঙ্গে কোন আত্মীয়া গল্পচ্ছলে বলিতেছিলেন যে, "মা সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, পিত্রালয়ের ভাগ্য ফিরিল, যাই তাঁহার জন্ম হইল।" কথাটা মহারাণীর কানে গেল। হাসিয়া তিনি বলিলেন, "লক্ষ্মীই বটে, যেখানে গিয়াছি, সেইখানেই সব উড়িয়া গিয়াছে।"

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার।

দ্বৈতভাব।

অন্নে পূর্ণা হে ধরণি! তুমি অন্নপূর্ণারূপ ধরি'
অপূর্ব্ব তোমার রূপে রাখিয়াছ বিশ্ব আলো করি'।
নানা রসে নানা গন্ধে বিরচিয়া কত না আহার
স্নেহময় দর্ব্বী ধরি পরিবেষ কর অনিবার।
তোমারে হেরিয়া শ্রান্ত বীজিছে গো সুমন্দ পবন
কৃতজ্ঞ নিখিলচিত্ত যেন তব করে আরাধন।
নমি নব-রৌদ্ররক্তাম্বরধরা কল্যাণী ধরণী
নানারত্নবিভূষণা ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনী জননী।

তোমারে ঘেরিয়া ঐ নাচিছে যে দিগন্ত ভরিয়া
উৎক্ষিপ্ত আনন্দরঙ্গে মহা।সন্ধু মূরতি ধরিয়া
ওই কি গো শিবমূর্ত্তি ? সর্ব্বরিক্ত অনন্ত ভীষণ
বিজড়িত সর্ব্বগাত্রে ফেনময় সর্পবিভূষণ।
মহানীলবক্ষশালী—আকণ্ঠ লবণে জরজর
জ্ঞানহারা তব প্রেমে নিরন্তর নাচে তীব্রতর।
তরঙ্গ-ডম্বরু তুলি আনমনে কেবলি বাজায়
চন্দ্র ভালে শোভে—ভোলা ব্যাঘ্রচর্ম্ম ফেলিল কোথায় ?

শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের বিশেষত্ব।*

কাব্যশাস্ত্র দুই শ্রেণীতে বিভক্ত,—দৃশ্য এবং শ্রব্য। নাট্যসাহিত্য দৃশ্যকাব্যের অন্তর্গত। উভয় শ্রেণীর কাব্যের লক্ষ্যই এক,—লোক-শিক্ষা। শ্রব্যকাব্য দুরূহ বলিয়া সকলের অধিগম্য নহে; দৃশ্যকাব্য সেরূপ নহে,—তাহা সকলের পক্ষেই সরল। কারণ,—দৃশ্যকাব্য অভিনয়াত্মক। যাহারা পদপদার্থমর্য্যাদা হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ, তাহারাও অভিনয়দর্শন করিয়া ভাবার্থসংগ্রহ করিতে সমর্থ হয়। যাহা সকল কাব্যের প্রধান লক্ষ্য, তাহা দৃশ্যকাব্যে সহজে পরিস্ফুট হইতে পারে। এইজন্যই দৃশ্যকাব্য অভিনয়াত্মক। ইহার প্রধান বিষয় লোকব্যবহার। তাহা লোকশিক্ষার অলিখিত মহাগ্রন্থ। গ্রন্থপাঠেও লোকশিক্ষা সুসম্পন্ন হইয়া থাকে; বরং কোন কোন বিষয়ে লোকশিক্ষার পক্ষে তাহাই প্রধান বা একমাত্র উপায়। কিন্তু গ্রন্থপাঠ করিয়া লোকব্যবহার শিক্ষা করা সকল সময়ে সকলের পক্ষে সহজ বা প্রীতিপ্রদ হইতে পারে না। তাহাতে সময়ক্ষয় হয়;—সকলে তাহার জন্য অধিক সময় ক্ষয় করিতে পারে না। তাহাতে অধ্যয়নক্লেশ স্বীকার করিতে হয়;—সকল অবস্থায় সকলের পক্ষে সকল সময়ে তাহা সম্ভব হইতে পারে না। গ্রন্থপাঠে যাহা বহুক্লেশে বহুযত্নে বহুকালে আয়ত্ত করিতে হয়, তাহা অনেকসময়ে বিস্মৃত হইতে বিলম্ব ঘটে না। লোকব্যবহার লক্ষ্য করাইয়া সেই সকল তত্ত্বের শিক্ষাদান করিতে পারিলে, তাহা অক্লেশে অল্পকালে মানবহৃদয়পটে চিরমুদ্রিত হইয়া থাকে। দাতার সস্নিগ্ধ দৃষ্টিসম্পাতে দীনের প্রতি দয়ার মাহাত্ম্য এবং মাধুর্য্য হৃদয়পটে কেমন দৃঢ়মুদ্রিত হইয়া যায়! স্নেহময়ী জননীর একটিমাত্র দীর্ঘনিশ্বাসে মাতৃস্নেহের ছবি কেমন সজীবভাবে ফুটিয়া উঠে! লোকব্যবহারের মধ্যে এইরূপ

* রাজশাহী নাট্যসমিতির বার্ষিক অধিবেশনে প্রদত্ত বক্তৃতার সংক্ষিপ্তসার।

কত দৃশ্য নিয়ত লোকলোচনে প্রতিভাত হয়; লোকে তাহা লক্ষ্য করিতে জানে না। জানিলে, বিশ্বনাট্যের ন্যায় কোন্ নাট্য;—তাহাতেই লোকসমাজের সকল শিক্ষা সুসম্পন্ন হইতে পারিত। জানে না বলিয়াই, দৃশ্যকাব্যের অভিনয়ব্যাপার তাহাদের সম্মুখে বিশ্বনাট্যের দৃশ্যপট উদ্ঘাটিত করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে।

ইহাই যে ভারতীয় নাট্যসাহিত্যের লক্ষ্য, নাট্যাচার্য্য ভরতমুনি নাট্যশাস্ত্রের মুখবন্ধে নাট্যোৎপত্তিপ্রসঙ্গে তাহা বিশদভাবে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।

"তস্মাৎ সৃজাপরং বেদং পঞ্চমং সার্ব্ববর্ণিকম্।"

"অতএব সকল বর্ণের—সর্ব্বসাধারণের তুল্যভাবে শিক্ষালাভের উপায়স্বরূপ—অপর (পঞ্চম) বেদের সৃষ্টি করুন", এই বলিয়া দেবরাজ লোকপিতামহের শরণাপন্ন হইলে, ব্রহ্মা নাট্যবেদের রচনা করিয়াছিলেন। নাট্যশাস্ত্রের এই আখ্যায়িকা কবিকল্পিত হইলেও, ইহাতেই ভারতীয় নাট্যসাহিত্যের উৎপত্তির কথা আখ্যায়িকাচ্ছলে বিবৃত রহিয়াছে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ নাট্যোৎপত্তির অন্যরূপ ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়া থাকেন। তাঁহারা অনুমান করেন,—পুরাকালের অসভ্যসমাজকে যাগযজ্ঞে আকৃষ্ট ও নিবিষ্ট রাখিবার উদ্দেশ্যে নৃত্যগীতের অবতারণা করা হইত, তাহা হইতেই নাট্যের উৎপত্তি। সকল দেশেই সেই কথা,—ভারতবর্ষেও তাহাই,—সেই জন্য নৃত্য-শব্দ হইতে নাট্য-শব্দ, তাহা অসংস্কৃত! এই অনুমানমূলক ব্যাখ্যা নূতন বটে। ইহা ভারতীয় সংস্কৃতসাহিত্যে অপরিজ্ঞাত। বিদেশীগত অভিনব পণ্যদ্রব্যের ন্যায় ইহা সুলভ এবং চাকচিক্যময়; সুতরাং এই অনুমান এক্ষণে আমাদের শিক্ষিতসমাজেও সমাদরলাভ করিতেছে!

নৃত্য এবং নাট্য এক নহে,—উভয়ের মধ্যে ব্যুৎপত্তিগত সংস্রব নাই, বিষয়গত আংশিক সাদৃশ্য থাকিলেও, পার্থক্যের অভাব নাই। নাট্যে নৃত্য আছে,—তাহা নাট্যের অঙ্গীভূত। নৃত্যে নাট্য নাই। অতি পুরাতন ভারতীয় সাহিত্যেও নৃত্য এবং নাট্য পৃথক্‌ভাবে উল্লিখিত রহিয়াছে।

লোকব্যবহার লক্ষ্য করাইয়া লোকশিক্ষার উপায়নির্দ্দেশ করাই যে নাট্যসাহিত্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য, তাহা নাট্যশাস্ত্রে সুস্পষ্ট প্রতিভাত। প্রথম নাট্যবস্তু দেবাসুরের সমরকলহের লোকব্যবহার। তাহা পাপপুণ্যের সমরলীলা। প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সংস্কৃতনাট্যসাহিত্যের সকল রচনাযুগেই নানা আখ্যানবস্তুর ভিতর দিয়া সেই এক কথাই নানাভাবে বর্ণিত। এই পাপপুণ্যের মহাসমর সংসারের একমাত্র কঠিন সংগ্রাম। জীবমাত্র ইহাতে লিপ্ত হইতে বাধ্য। ইহাতে জয়লাভ করিতে পারিলে, ইহপরলোকের পরম কল্যাণ; ইহাতে পরাভূত হইলে, ইহপরলোকের সকল কল্যাণ পরাভূত হইয়া যায়। ইহা সকলের পক্ষেই মহাশিক্ষা। যাহারা গ্রন্থপাঠে অসমর্থ, তাহারা কি এই মহাশিক্ষালাভে বঞ্চিত রহিবে? এই কথা যখনই ভারতবর্ষের ঋষিসমাজকে চিন্তাযুক্ত করিয়াছিল, তখনই সার্ব্ববর্ণিক পঞ্চমবেদের সৃষ্টি হইয়াছিল। নাট্যাচার্য্য যে আখ্যায়িকার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে এই কথাই সূচিত হইয়া রহিয়াছে।

ভারতীয় নাট্যসাহিত্যের ন্যায় বিপুল নাট্য-

সাহিত্য অন্ত কোনও সভ্যসমাজে দেখিতে পাওয়া যায় না। সে সাহিত্য এরূপ বিপুলাকার ধারণ করিয়াছিল যে, দশ শ্রেণীর রূপক এবং অষ্টাদশ শ্রেণীর উপরূপকে তাহা বিভক্ত হইয়া রহিয়াছে। অথচ এই বিপুল নাট্যসাহিত্যের সকল গ্রন্থেই এক কথা,—কোন গ্রন্থেই পাপের জয়, পুণ্যের পরাজয় দেখিতে পাওয়া যায় না। নাট্যশাস্ত্র সেরূপ গ্রন্থরচনার প্রশ্রয় প্রদান করে নাই। ইহাই ভারতীয় নাট্যসাহিত্যের সর্ব্বপ্রধান উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব,—এই বিশেষত্ব সমগ্র নাট্যসাহিত্যে পরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছে।

নাট্যবস্তু বিয়োগান্ত হইলে, তাহাতে পাপের জয়, পুণ্যের পরাজয় অভিব্যক্ত হয়। অভিনয়শেষে যবনিকা পতিত হইলে রঙ্গভূমি যেমন আঁধারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, দর্শকচিত্তও সেইরূপ আঁধারে আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। সংসারে এরূপ দৃশ্য বিরল নহে,—সেখানে পাপের জয়, পুণ্যের পরাজয় প্রতি পদে লোকলোচনের সম্মুখীন হইয়া লোকচিত্ত অবসন্ন করিয়া থাকে। কিন্তু তাহাই কি শেষ,—ইহলোকই কি একমাত্র লোক? মানবচক্ষু ইহপরলোকের ব্যবধান ভেদ করিয়া সম্মুখে অধিকদূর দৃষ্টিসঞ্চালন করিতে পারে না; বরং অনেকসময়ে দৃশ্যমান লোকব্যবহারে পাপের জয়, পুণ্যের পরাজয় লক্ষ্য করিয়া পথভ্রান্ত হইয়া পড়ে। ভারতীয় নাট্যসাহিত্য ইহপরলোকের ব্যবধান ভেদ করে, পাপপুণ্যের মহাসমরক্ষেত্রের শেষ দৃশ্যপট উদ্ঘাটিত করিয়া পুণ্যের জয়, পাপের পরাজয় দেখাইয়া দিয়া, আনন্দরসে দর্শকচিত্ত অভিষিঞ্চিত করিয়া দেয়। তাহা সেইজন্যই পরিণাম-রমণীয়।

এইজন্য নাট্যশাস্ত্রে নাট্যবস্তু পঞ্চসন্ধিসমন্বিত বলিয়া উল্লিখিত। নাটক এবং প্রকরণের আখ্যায়িকায় সেই পঞ্চ সন্ধি সুস্পষ্টভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। একটির পর একটি,—প্রথম হইতে দ্বিতীয়, দ্বিতীয় হইতে তৃতীয়, তৃতীয় হইতে চতুর্থ, এবং চতুর্থ হইতে পঞ্চম,—এই পঞ্চ সন্ধির ভিতর দিয়া নাট্যবস্তু প্রবাহিত, মিলনানন্দে তাহার সর্ব্বশেষ পরিসমাপ্তি। মানবজীবনও এই পঞ্চসন্ধিসমন্বিত মহানাটক;—লোকব্যবহারেও এই পঞ্চসন্ধি বর্ত্তমান। মানবজীবনে ও লোকব্যবহারে সকল সময়ে ইহলোকের সংক্ষিপ্ত কার্য্যকলাপের মধ্যে সকল সন্ধিগুলি দেখিতে পাওয়া যায় না, অনেক সময়ে শেষ সন্ধিতে উপনীত হইবার পূর্ব্বেই যবনিকা পতিত হইয়া থাকে। তজ্জন্যই কখন-কখন কেবল পাপের জয়, পুণ্যের পরাজয় দেখিতে পাওয়া যায়,—হয় ত আর একটু অভিনয় চলিলেই শেষসন্ধি দেখিতে পাওয়া যাইত; সেখানে গিয়া আবার দেখিতাম,—পরিণামে পুণ্যের জয় অনিবার্য্য। ইহাই ভারতবর্ষের চিরপুরাতন অন্ধবিশ্বাস,—তাহা এখনও একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই।

> "প্রারম্ভশ্চ প্রযত্নশ্চ তথা প্রাপ্তেশ্চ সম্ভবঃ।
> নিয়তা চ ফলপ্রাপ্তিঃ ফলযোগশ্চ পঞ্চমঃ॥"

মানবজীবনের সকল আশা ফলযোগ, তাহা সহসা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তাহার জন্য প্রারম্ভ এবং প্রযত্ন চাই; তাহাতে প্রাপ্তিসম্ভাবনা সমুপস্থিত হয়, কিন্তু কখন-কখন এই পাইলাম—এই পাইয়াছি—করিতে করিতেও ফলপ্রাপ্তি সংঘটিত হয় না; কখন বা তাহার সম্ভাবনা পর্য্যন্তও বিলুপ্ত হইয়া গেল বলিয়া বোধ হয়; তাহার পর সহিষ্ণু হইয়া অপেক্ষা

করিতে জানিলে, ফলযোগ আসিয়া পরিণামে আনন্দে আপ্লুত করিয়া দেয়। সকল কার্য্যেরই এইরূপ গতি।

সর্ব্বস্যৈব হি কার্য্যস্য প্রারব্ধস্য ফলার্থিভিঃ।
এতা অনুক্রমেণৈব পঞ্চাবস্থা ভবন্তি হি॥"

ফলযোগের আশাই সকল মানবের প্রধান আশা। তাহার জন্য পুণ্যার্থী সকল প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে যত্ন করিয়া থাকেন। সকলের জীবনেই একদিন-না-একদিন এই স্বাভাবিক পুণ্যপিপাসা উপস্থিত হইয়া থাকে। পুণ্য কি, তাহা জানে না,—তথাপি তাহাকে লাভ করিবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়া থাকে। ইহাই মানবজীবনের প্রথম সন্ধি। যাহার জীবনে এই ঔৎসুক্য জন্মিল না, তাহার জীবন ব্যর্থ হইয়া গেল। যাহার জীবনে ঔৎসুক্য জন্মিলেও তাহার জন্য প্রযত্ন জন্মিল না, তাহারও ফলপ্রাপ্তি অসম্ভব হইয়া গেল। যে ঔৎসুক্য প্রদর্শন করিল, যত্নচেষ্টার ত্রুটি করিল না, ফলপ্রাপ্তির সম্ভাবনা দেখিয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, তাহাকেও হঠাৎ আবার বিমর্ষ হইয়া পড়িতে হইল, 'আসি আসি' করিয়া কাম্যফল আসিল না;—নানা ঘটনায় বিলম্ব ঘটিয়া গেল। সমুচিত প্রতীক্ষার পর,—বুঝি বা সমুচিত পরীক্ষার পর ভিন্ন, কাম্যফল সহসা উপস্থিত হয় না। নাট্যসাহিত্যের ভাষায় এই পঞ্চ সন্ধির পাঁচটি পারিভাষিক নাম পরিকল্পিত হইয়াছে—

"মুখং প্রতিমুখং চৈব গর্ভো বিমর্শ এব চ।
তথা নির্বহণং চেতি নাটকে পঞ্চ সন্ধয়ঃ॥"

নাট্যসাহিত্যের মধ্যে নাটকই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর,—তাহাতে এই পাঁচটি সন্ধিই বর্ত্তমান। তাহার নাম—মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্শ এবং নির্বহণ। যে সন্ধির নাম মুখ, তাহাতে কেবল নাট্যবীজের সমুৎপত্তি,—তাহা হইতেই আখ্যায়িকার সূত্রপাত হয়। দুষ্মন্তের মৃগয়া অভিজ্ঞানশকুন্তলের সমগ্র আখ্যায়িকার বীজরূপে উৎপন্ন হইয়াছিল। মৃগয়া না ঘটিলে মৃগানুসরণ ঘটিত না;—আশ্রমমৃগ না হইলে ঋষিশিষ্য নিষেধ করিতেন না;—তাঁহার মুখে 'আশ্রম অতি নিকটে অবস্থিত' এই সমাচার জ্ঞাত না হইলে আশ্রমদর্শন ঘটিত না;—আশ্রমদর্শন না ঘটিলে, কোন ঘটনাই উপস্থিত হইতে পারিত না। সুতরাং যাহার পারিভাষিক নাম মুখ, তাহাই আখ্যানবস্তুর প্রকৃত বীজ। যে সন্ধিতে এই বীজ উদ্ঘাটিত হয়, তাহার নাম প্রতিমুখ,—মুখের পরেই প্রতিমুখ আসিয়া উপস্থিত হয়। যে সন্ধিতে সেই বীজ কখন প্রকাশ্যভাবে, কখন বা অলক্ষিত অবস্থায় পরিপুষ্ট হইতে থাকে, তাহার নাম গর্ভ। যে সন্ধির নাম বিমর্শ, তাহাতে ফলযোগের ব্যাঘাত অথবা বিলম্বমাত্র। শেষে নির্বহণ—ফলযোগ। যে-কোন সংস্কৃতনাটকে এই পঞ্চসন্ধির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

নাটকের ন্যায় প্রকরণেও এই পঞ্চসন্ধি বিদ্যমান। দশ শ্রেণীর মধ্যে নাটক এবং প্রকরণ নামক প্রধান দুই শ্রেণী পূর্ণাঙ্গ। অপর আট শ্রেণী সেরূপ পূর্ণাঙ্গ নহে। ডিম এবং সমবকারে চারিটি সন্ধি,—ব্যায়োগ এবং ঈহামৃগে তিনটি সন্ধি,—প্রহসন, বীথি, অঙ্ক এবং ভাণে দুইটিমাত্র সন্ধি। ইহাই নাট্যশাস্ত্রের সুপরিচিত রচনাপ্রণালী। ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়—দশরূপকের কোন শ্রেণীর নাট্যেই একটিমাত্র সন্ধি নাই; তাহাতে নাট্য হইতে

পারে না। আবার কোন শ্রেণীর নাট্যেই শেষ সন্ধির অভাব নাই; তাহাতেও নাট্য হইতে পারে না। সুতরাং নাট্যশাস্ত্রানুসারে বিয়োগান্ত নাট্যবস্তু নিতান্ত অসম্ভব। সকলের শেষেই ফলযোগ,—পাপের পরাজয়, পুণ্যের জয়। তাহাই নাট্যাখ্য পঞ্চমবেদের সর্ব্বপ্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়।

লোকশিক্ষার বিশেষ উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া, নাট্যসাহিত্যকে কেবল দৃশ্যমান লোকব্যবহারের ছায়ারূপে চিত্রিত করিলে, এরূপ ঘটিতে পারিত না। কেবল অসভ্য অশিক্ষিত জনসংঘকে কোন কৌশলে যাগযজ্ঞের সভায় নিবিষ্ট করিয়া রাখিবার জন্য নাট্যসাহিত্য কল্পিত হইয়া থাকিলে, তাহার মূলপ্রকৃতিতে এই সকল রচনারীতি দেখিতে পাওয়া যাইত না। যেখানে মধ্যপথে অকস্মাৎ নাট্যবস্তুর পরিসমাপ্তি ঘটে, সেখানেই তাহা বিয়োগান্ত হইয়া পড়ে। তাহা দৃশ্যমান লোকব্যবহারের অনুরূপ হইতে পারে,—স্বাভাবিক বলিয়াও প্রশংসালাভ করিতে পারে,—অথবা লোকসমাজের অকৈতব চিত্র বলিয়া জগদ্বিখ্যাত হইয়া উঠিতে পারে;—কিন্তু তাহার শিক্ষা কোন্ শ্রেণীর শিক্ষা?

এই কথা জিজ্ঞাসা করিবামাত্র প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতার মূল আদর্শের পার্থক্য পরিস্ফুট হয়। সম্ভোগ এবং সংযম মানবসমাজের সম্মুখে দুইটি বিভিন্ন পথের মত দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। বৈদিকসাহিত্যে তাহারই নাম প্রেয় এবং শ্রেয়,—একটি সম্ভোগাত্মক, অপরটি নিরতিশয় সংযমাত্মক, তন্মধ্যে সম্ভোগ আপাতমধুর, সংযম পরিণামে পরম কল্যাণদায়ক। বেদ বলেন—ধীর ব্যক্তি এই দুই পথের পার্থক্য লক্ষ্য করিয়া থাকেন। যাঁহারা এইরূপে পার্থক্য লক্ষ্য করিয়া শ্রেয়কে অবলম্বন করেন, তাঁহারাই কাম্যফল লাভ করেন; যাঁহারা প্রেয়কে গ্রহণ করেন, তাঁহারা কাম্যফল লাভ করিতে পারেন না। নাট্যসাহিত্যেও সেই কথা। লোকশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইলে, সেই কথাই শিখাইতে হয়। ভারতীয় নাট্যসাহিত্য সেই কথা শিখাইবে বলিয়াই বিয়োগান্ত হয় নাই, সে পথ সর্ব্বপ্রযত্নে পরিহার করিয়াছে। পাশ্চাত্য নাট্যসাহিত্যের আদর্শ গ্রীক্‌নাট্যসাহিত্য; তাহার প্রধান গৌরব বিয়োগান্ত আখ্যানবস্তু;—তাহাতে পাপের জয়, পুণ্যের পরাজয়! তাহা স্বাভাবিক, তাহা সরস, কিন্তু তাহা লোকশিক্ষার পক্ষে মিষ্ট বিষ।

সংস্কৃতনাট্যসাহিত্যের এইরূপ বিশেষত্ববিজ্ঞাপক সমুন্নত আদর্শ বর্ত্তমান থাকিলেও, বঙ্গীয় নাট্যসাহিত্য ও নাট্যাভিনয় পাশ্চাত্য রীতির অনুকরণ লইয়া এখনও বিমুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে। নাট্যশাস্ত্রের কঠিন শাসনে এই শ্রেণীর নাট্যসাহিত্যকে সমাদর প্রদর্শন করা যায় না। তাহাতে জাতীয়শিক্ষা সুদূরপরাহত হইয়া পড়ে, অজ্ঞাতসারে ভারতীয় ভাব বিনষ্ট হইয়া যায়, অলক্ষিতভাবে পাশ্চাত্যভাব লোকসমাজকে পথভ্রান্ত করিয়া দেয়। এখনও তাহারই উদ্দামনৃত্যে বঙ্গীয় রঙ্গস্থল টলটলায়মান;—সুকুমার সাহিত্যের মর্য্যাদারক্ষক রসজ্ঞ দর্শকের অভাবে ইহার গতিরোধের উপায় হইতেছে না। অভিনয় যেখানে বৃত্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সেখানে সংস্কারের পথ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু

নগরে নগরে যে সকল নাট্যসমিতি কেবল বিশুদ্ধ-আনন্দ-বিতরণের ও লোকশিক্ষার উদ্দেশ্যে অভিনয়কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া থাকে, সেখানেও সংস্কারের পথ চিররুদ্ধ হইয়া থাকিবে কেন? যেখানে বিদ্যালয়ের বালকগণ অভিনয়শিক্ষার্থ অনুমতি ও উৎসাহ লাভ করে, সেখানেও স্বদেশের আদর্শ পরিত্যক্ত হইবে কেন?

নাট্যসাহিত্য এবং নাট্যাভিনয় যদি তাহার সুপরিজ্ঞাত পুরাতন প্রণালী অবলম্বন করে, তাহাতে ভারতীয় আদর্শ সুরক্ষিত হইবে। তাহা এতদিন বিনা বিচারে প্রত্যাখ্যাত হইয়া আসিয়াছে। রঙ্গস্থল বিদেশের মুখশ পরিয়া বিকৃতভাবে দণ্ডায়মান হইয়া কিরূপ হাস্যরসের উদ্রেক করিতেছে, তাহার প্রতি জনসমাজের দৃষ্টি পতিত হইবামাত্র করুণরসের আবির্ভাব হয়। কি ছিলাম কি হইয়াছি,—কি করিতে আসিয়া কি করিতেছি,—ইহার নিকট অন্য রস বিলুপ্ত হইয়া যায়।

রঙ্গালয় সমাজসংস্কারের পক্ষে বিদ্যালয়ের ন্যায় মর্য্যাদালাভের অধিকারী। তাহা মর্য্যাদালাভ করিতে পারে নাই, বরং কোন কোন স্থলে সজ্জনগণের ঘৃণার পাত্র হইয়া রহিয়াছে। নাট্যশাস্ত্রের অধ্যয়ন-অধ্যাপনার সূত্রপাত হইলে, ভারতীয় রঙ্গালয় আবার মর্য্যাদালাভ করিতে পারে। যদি কখন সেই শুভদিনের অভ্যুদয় হয়, তখন এই সকল কথা সহজে হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন হইবে না। এখন এ সকল কথা অনেকের নিকটে বাতুলতা বলিয়া প্রতিভাত হইতে পারে। কারণ, পাশ্চাত্য আদর্শই আমাদের নিকট এখনও নাট্যাভিনয়ের শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলিয়া পূজা প্রাপ্ত হইতেছে।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

জাপান।

কচ-দেবযানী-কথা আজি পড়ে মনে
হেরিয়া তোমারে ওগো বিজয়ী জাপান,
যবে স্বর্গপুরী ছাড়ি করিলা প্রয়াণ
বৃহস্পতিসুত কচ অসাধ্যসাধনে,
—লভিবারে সঞ্জীবনী বিদ্যা সুকৌশলে
দৈত্যগুরু ভার্গবেরে নিজবশে আনি—
কি সংযম, কি সাধনা, কি তপস্যাবলে
লভিলা অভীষ্ট নিজ! মিথ্যা দেবযানী
পেতেছিল মায়াজাল ঘেরিয়া তাঁহারে।
তেমনি তুমি গো প্রাচ্য-বীরেন্দ্র-কেশরী,

পশিয়া প্রতীচ্যগুরু-বিজ্ঞান-আগারে,
পশ্চিমের দিক্‌বধূর মায়া পরিহরি,
শিখি' নিলে অগ্নিবাণ, দিলে চূর্ণ করি'
পাশ্চাত্যের দর্পগিরি শতধা বিদরি!

শ্রীসু—

শেষ-কথা।

বলা হয় নাই সব—আছে শেষ-কথা!
বলিয়াছি কত কি-যে সুখ-দুখ-ব্যথা
সুদিনের—দুর্দ্দিনের; কত আঁচা-আঁচি,
বিশ্রম্ভ-আলাপ কত;—তবু খুঁজিয়াছি—
সব বলা হয় নাই, শেষ বুঝি আছে!
বিমুগ্ধনয়নে তাই থাকি কাছে-কাছে,—
বলিব বলিব ভাবি, মিটে না তিয়াষ!
কোকিল যে গেয়ে ফিরে সারা মধুমাস,
কোথা তার শেষ-গীত? কলধ্বনি তুলি
বহে নদী, গেছে সেও শেষ-কথা ভুলি;
আকুল উচ্ছ্বাস তাই নিরবধি তার!
মেঘমন্দ্রমাঝে শুনি সেই হাহাকার,—
সেও গো নিষ্ফল! সারা বরষা যাপন
গুমরি-গুমরি করে, কোথা সমাপন?

শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়।

মহাপুরুষ।*

জগতে যে সকল মহাপুরুষ ধর্ম্মসম্প্রদায় স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা যাহা দিতে চাহিয়াছেন, তাহা আমরা নিতে পারি নাই, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে। শুধু পারি নাই যে, তাহা নয়, আমরা এক লইতে হয়ত আর লইয়া বসিয়াছি। ধর্ম্মের আসনে সাম্প্রদায়িকতাকে বরণ করিয়া হয়ত নিজেকে সার্থক জ্ঞান করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আছি।

তাহার একটা কারণ, আমাদের গ্রহণ করিবার শক্তি সকলের একরকমের নয়। আমার মন যে পথে সহজে চলে, অন্যের মন সে পথে বাধা পায়। আমাদের এই মানসিক বৈচিত্র্যকে একাকার করিয়া সকল মানুষের জন্যই একই বাঁধা রাজপথ বানাইয়া দিবার চেষ্টা আমাদের মনে আসে। কারণ, তাহাতে কাজ সহজ হইয়া যায়। সে চেষ্টা এ পর্য্যন্ত সফল হয় নাই। সফল হওয়া যে অসাধ্য, তাহাও আমরা ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই। সেইজন্য যে পথে আমি চলিয়া অভ্যস্ত বা আমার পক্ষে যাহা সহজ, সেই পথই যে সকলের একমাত্র পথ নয়, কাহারো পক্ষে যে তাহা দুর্গম হইতে পারে, এ কথা আমরা মনেও করিতে পারি না। এইজন্যই, এই পথেই সব মানুষকে টানা আমরা জগতের একমাত্র মঙ্গল বলিয়া মনে করি। এই টানাটানিতে কেহ আপত্তিপ্রকাশ করিলে আমরা আশ্চর্য্য বোধ করি, মনে করি—সে লোকটা, হয়, ইচ্ছা করিয়া নিজের হিত পরিত্যাগ করিতেছে, নয়, তাহার মধ্যে এমন একটা হীনতা আছে, যাহা অবজ্ঞার যোগ্য।

কিন্তু ঈশ্বর আমাদের মনের মধ্যে গতি-শক্তির যে বৈচিত্র্য দিয়াছেন, আমরা কোনো কৌশলেই তাহাকে একাকার করিয়া দিতে পারিব না। গতির লক্ষ্য এক, কিন্তু তাহার পথ অনেক। সব নদীই সাগরের দিকে চলিয়াছে, কিন্তু সবাই এক নদী হইয়া চলে নাই। চলে না, সে আমাদের ভাগ্য।

ঈশ্বর কোনোমতেই আমাদের সকলকেই একটা বাঁধা পথে চলিতে দিবেন না। ক[illegible]-য় সে চোখ বুজিয়া আমরা একচক্রের

* মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের শ্রাদ্ধসভায় পঠিত।

পশ্চাতে আর একজন চলিব, ঈশ্বর আমাদের পথকে এত সহজ কোনোদিন করিবেন না। কোনো ব্যক্তি—তাঁহার যত বড় ক্ষমতাই থাক্, পৃথিবীর সমস্ত মানবাত্মার জন্য নিশ্চেষ্ট জড়ত্বের সুগমতা চিরদিনের জন্য বানাইয়া দিয়া যাইবেন, মানুষের এমন দুর্গতি বিশ্ববিধাতা কখনই সহ্য করিতে পারেন না।

এইজন্য প্রত্যেক মানুষের মনের গভীরতর স্তরে ঈশ্বর একটি স্বাতন্ত্র্য দিয়াছেন; অন্তত সেখানে একজনের উপর আর একজনের কোনো অধিকার নাই। সেখানেই তাহার অমরতার বীজকোষ বড় সাবধানে রক্ষিত; সেইখানেই তাহাকে নিজের শক্তিতে নিজে সার্থক হইতে হইবে। সহজের প্রলোভনে এই জায়গাটার দখল যে ব্যক্তি ছাড়িয়া দিতে চায়, সে লাভে-মূলে সমস্তই হারায়। সেই ব্যক্তিই ধর্ম্মের বদলে সম্প্রদায়কে, ঈশ্বরের বদলে গুরুকে, বোধের বদলে গ্রন্থকে লইয়া চোখ বুজিয়া বসিয়া থাকে। শুধু বসিয়া থাকিলেও বাঁচিতাম, দল বাড়াইবার চেষ্টায় পৃথিবীতে অনেক ব্যর্থতা এবং অনেক বিরোধের সৃষ্টি করে।

এইজন্য বলিতেছিলাম, মহাপুরুষেরা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করিয়া যান, আর আমরা তাহার মধ্য হইতে সম্প্রদায়টাই লই, ধর্ম্মটা লই না। কারণ, বিধাতার বিধানে ধর্ম্মজিনিষটাকে নিজের স্বাধীনশক্তির দ্বারাই পাইতে হয়, অন্যের কাছ হইতে তাহা আরামে ভিক্ষা মাগিয়া লইবার জো নাই। কোনো সত্যপদার্থই আমরা আর কাহারো কাছ হইতে কেবল হাত পাতিয়া চাহিয়া পাইতে পারি না। যেখানে সহজ রাস্তা ধরিয়া ভিক্ষা করিতে গিয়াছি, সেখানেই ফাঁকিতে পড়িয়াছি। তেমন করিয়া যাহা পাইয়াছি, তাহাতে আত্মার পেট ভরে নাই, কিন্তু আত্মার জাত গিয়াছে।

তবে ধর্ম্মসম্প্রদায়ব্যাপারটাকে আমরা কি চোখে দেখিব? তাহাকে এই বলিয়াই জানিতে হইবে যে, তাহা তৃষ্ণা মিটাইবার জল নহে, তাহা জল খাইবার পাত্র। সত্যকার তৃষ্ণা যাহার আছে, সে জলের জন্যই ব্যাকুল হইয়া ফিরে, সে উপযুক্ত সুযোগ পাইলে গণ্ডূষে করিয়াই পিপাসানিবৃত্তি করে। কিন্তু যাহার পিপাসা নাই, সে পাত্রটাকেই সব চেয়ে দামী বলিয়া জানে। সেইজন্যই জল কোথায় পড়িয়া থাকে, তাহার ঠিক নাই, পাত্র লইয়াই পৃথিবীতে বিষম মারামারি বাধিয়া যায়। তখন যে ধর্ম্ম বিষয়বুদ্ধির ফাঁস আলগা করিবে বলিয়া আসিয়াছিল, তাহা জগতে একটা নূতনতর বৈষয়িকতার সূক্ষ্মতর জাল সৃষ্টি করিয়া বসে, সে জাল কাটানো শক্ত।

ধর্ম্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতারা নিজের নিজের সাধ্যানুসারে আমাদের জন্য, মাটির হোক আর সোনার হোক, এক একটা পাত্র গড়িয়া দিয়া যান। আমরা যদি মনে করি, সেই পাত্রটা গড়িয়া-দিয়া যাওয়াই তাঁহাদের মাহাত্ম্যের সব চেয়ে বড় পরিচয়, তবে সেটা আমাদের ভুল হইবে। কারণ পাত্রটি আমাদের কাছে যতই প্রিয় এবং যতই সুবিধাকর হউক, তাহা কখনই পৃথিবীর সকলেরই কাছে সমান প্রিয় এবং সমান সুবিধাকর হইতে পারে না। ভক্তির মোহে

অন্ধ হইয়া, দলের গর্ব্বে মত্ত হইয়া, এ কথা ভুলিলে চলিবে না। কথামালার গল্প সকলেই জানেন—শৃগাল থালায় ঝোল রাখিয়া সারসকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল, লম্বা ঠোঁট লইয়া সারস তাহা খাইতে পারে নাই। তার পর সারস যখন সরুমুখ চোঙের মধ্যে ঝোল রাখিয়া শৃগালকে ফিরিয়া নিমন্ত্রণ করিল, তখন শৃগালকে ক্ষুধা লইয়াই ফিরিতে হইয়াছিল। সেইরূপ এমন সর্ব্বজনীন ধর্ম্মসমাজ আমরা কল্পনা করিতে পারি না, যাহা তাহার মত ও অনুষ্ঠান লইয়া সকলেরই বুদ্ধি, রুচি ও প্রয়োজনকে পরিতৃপ্ত করিতে পারে।

অতএব শাস্ত্রীয় ধর্ম্মমত ও আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মসমাজ স্থাপনের দিক্ হইতে পৃথিবীর ধর্ম্মগুরুদিগকে দেখা তাঁহাদিগকে ছোট করিয়া দেখা। তেমন করিয়া কেবল দলের লোকেরাই দেখিতে পারে এবং তাহাতে করিয়া কেবল দলাদলিকেই বাড়াইয়া তোলা হয়। তাঁহাদের মধ্যে নিশ্চয়ই এমন একটি দেখিবার আছে, যাহা লইয়া সকল দেশে সকল কালে সকল মানুষকেই আহ্বান করা যায়। যাহা প্রদীপপাত্র নহে, যাহা আলো।

সেটি কি? না, যেটি তাঁহারা নিজেরা পাইয়াছেন। যাহা গড়িয়াছেন, তাহা নহে। যাহা পাইয়াছেন, সে ত তাঁহাদের নিজের সৃষ্টি নহে, যাহা গড়িয়াছেন, তাহা তাঁহাদের নিজের রচনা।

আজ যাঁহার স্মরণার্থ আমরা সকলে এখানে সমবেত হইয়াছি, তাঁহাকেও যাহাতে কোনো একটা দলের দিক্ হইতে না দেখি, ইহাই আমার নিবেদন। সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের সম্প্রদায়ের ধ্বজাকেই সর্ব্বোচ্চ করিয়া ধরিতে গিয়া পাছে গুরুকেও তাহার কাছে খর্ব্ব করিয়া দেন, এ আশঙ্কা মন হইতে কিছুতেই দূর হয় না—অন্তত আজিকের দিনে নিজেদের সেই সঙ্কীর্ণতা তাঁহার প্রতি যেন আরোপ না করি।

অবশ্যই, কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহার প্রকৃতির বিশেষত্ব নানারূপে দেখা দিয়াছে। তাঁহার ভাষায়, তাঁহার ব্যবহারে, তাঁহার কর্ম্মে তিনি বিশেষভাবে নিজেকে আমাদের কাছে প্রকাশ করিয়াছেন—তাঁহার সেই স্বাভাবিক বিশেষত্ব জীবনচরিত-আলোচনা-কালে উপাদেয়, সন্দেহ নাই। সেই আলোচনায় তাঁহার সংস্কার, তাঁহার শিক্ষা, তাঁহার প্রতি তাঁহার দেশের ও কালের প্রভাবসম্বন্ধীয় সমস্ত তথ্য আমাদের কৌতূহলনিবৃত্তি করে। কিন্তু সেই সমস্ত বিশেষভাবকে আচ্ছন্ন করিয়া-দিয়া তাঁহার জীবন কি আর কাহাকেও আমাদের কাছে প্রকাশ করিতেছে না? আলো কি প্রদীপকে প্রকাশ করিবার জন্য, না প্রদীপ আলোকে প্রচার করিবার জন্য? তিনি যাঁহাকে দেখিতেছেন ও দেখাইতেছেন, যদি আজ সেইদিকেই আমাদের সমস্ত দৃষ্টি না যায়, আজ যদি তাঁহার নিজের বিশেষত্বের দিকে আমাদের দৃষ্টি কোনো অংশে ঠেকিয়া যায়, তবে গুরুর অবমাননা হইবে।

মহর্ষি একদিন পরিপূর্ণ-ভোগের মাঝখানে জাগিয়া-উঠিয়া বিলাসমন্দিরের সমস্ত আলোকে অন্ধকার দেখিয়াছিলেন। সেইদিন তিনি তৃষার্ত্তচিত্ত লইয়া পিপাসা মিটাইবার জন্য দুর্গমপথে যাত্রা করিয়াছিলেন, সে কথা সকলেই জানেন। যেখান হইতে অমৃত উৎস

নিঃসৃত হইয়া সমস্ত জগৎকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে, সেই তীর্থস্থানে তিনি না গিয়া ছাড়েন নাই। সেই তীর্থের জল তিনি আমাদের জন্যও পাত্রে ভরিয়া আনিয়াছিলেন। এ পাত্র আজ বাদে কাল ভাঙিয়া যাইতেও পারে, তিনি যে ধর্ম্মসমাজ দাঁড় করাইয়াছেন, তাহার বর্ত্তমান আকৃতি স্থায়ী না হইতেও পারে; কিন্তু তিনি সেই যে অমৃত-উৎসের ধারে গিয়া নিজের জীবনকে ভরিয়া লইয়াছেন, ইহাই আমাদের প্রত্যেকের লাভ। এই লাভ নষ্ট হইবে না, শেষ হইবে না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ঈশ্বরকে আর কাহারো হাত দিয়া আমরা পাইব না। তাঁহার কাছে নিজে যাইতে হইবে, তাঁহাকে নিজে পাইতে হইবে। দুঃসাধ্য হয় সেও ভাল, বিলম্ব হয় তাহাতে ক্ষতি নাই। অন্যের মুখে শুনিয়া, উপদেশ পাইয়া, সমাজবিহিত অনুষ্ঠান পালন করিয়া আমরা মনে করি, যেন আমরা চরিতার্থতা লাভ করিলাম, কিন্তু সে ত ঘটির জল, সে ত উৎস নহে। তাহা মলিন হয়, তাহা ফুরাইয়া যায়, তাহাতে আমাদের সমস্ত জীবন অভিষিক্ত হয় না এবং তাহা লইয়া আমরা বিষয়িলোকের মতই অহঙ্কার ও দলাদলি করিতে থাকি। এমন ঘটির জলে আমাদের চলিবে না—সেই উৎসের কাছে আমাদের প্রত্যেককেই যাইতে হইবে—ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের নিজের একান্ত সম্বন্ধ তাঁহার সম্মুখে গিয়া আমাদিগকে নিজে স্বীকার করিতে হইবে। সম্রাট যখন আমাকে দরবারে ডাকেন, তখন প্রতিনিধি পাঠাইয়া কি কাজ সারিতে পারি? ঈশ্বর যে আমাদের প্রত্যেককে ডাক দিয়াছেন, সেই ডাকে সাড়া দিয়া একেবারে সম্পূর্ণভাবে তাঁহার কাছে আত্মসমর্পণ করিতে না পারিলে কোনোমতেই আমাদের সার্থকতা নাই!

মহাপুরুষদের জীবন হইতে এই কথাটাই আমরা জানিতে পারি। যখন দেখি, তাঁহারা হঠাৎ সকল কাজ ফেলিয়া তাড়াতাড়ি ছুটিয়াছেন, তখন বুঝিতে পারি, তবে ত আহ্বান আসিতেছে,—আমরা শুনিতে পাই নাই, কিন্তু তাঁহারা শুনিতে পাইয়াছেন। তখন চারিদিকের কোলাহল হইতে ক্ষণকালের জন্য মনটাকে টানিয়া লই, আমরাও কান পাতিয়া দাঁড়াই। অতএব মহাপুরুষদের জীবন হইতে আমরা প্রথমে স্পষ্ট জানিতে পারি, আত্মার প্রতি পরমাত্মার আহ্বান কতখানি সত্য। এই জানিতে পারাটাই লাভ।

তার পর আর একদিন তাঁহাদিগকে দেখিতে পাই, সুখে-দুঃখে তাঁহারা শান্ত, প্রলোভনে তাঁহারা অবিচলিত, মঙ্গলব্রতে তাঁহারা দৃঢ়প্রতিষ্ঠ। দেখিতে পাই, তাঁহাদের মাথার উপর দিয়া কত ঝড় চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু তাঁহাদের হাল ঠিক আছে; সর্ব্বস্বক্ষতির সম্ভাবনা তাঁহাদের সম্মুখে বিভীষিকারূপে আবির্ভূত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহারা অনায়াসেই তাহাকে স্বীকার করিয়া ন্যায়পথে ধ্রুব হইয়া আছেন; আত্মীয়বন্ধুগণ তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিতেছে কিন্তু তাঁহারা প্রসন্নচিত্তে সে সকল বিচ্ছেদ বহন করিতেছেন; তখনই আমরা বুঝিতে পারি, আমরা কি পাই নাই, আর তাঁহারা কি পাইয়াছেন। সে কোন্ শান্তি, কোন্ বল,

কোন্ সম্পদ্! তখন বুঝিতে পারি, আমাদিগকেও নিতান্তই কি পাওয়া চাই, কোন্ লাভে আমাদের সকল অন্বেষণ শান্ত হইয়া যাইবে।

অতএব মহাপুরুষদের জীবনে আমরা প্রথমে দেখি তাঁহারা কোন্ আকর্ষণে সমস্ত ত্যাগ করিয়া চলিয়াছেন; তাহার পরে দেখিতে পাই, কোন্ লাভে তাঁহাদের সমস্ত ত্যাগ সার্থক হইয়াছে। এই দিকে আমাদের মনের জাগরণটাই আমাদের লাভ। কারণ, এই জাগরণের অভাবেই কোনো লাভই সম্পন্ন হইতে পারে না।

তার পরে যদি ভাবিয়া দেখি, পাইবার ধন কোথায় পাওয়া যাইবে, কেমন করিয়া পাইব, তবে এই প্রশ্নই করিতে হইবে, তাঁহারা কোথায় গিয়াছেন, কেমন করিয়া পাইয়াছেন!

মহর্ষির জীবনে এই প্রশ্নের কি উত্তর পাই? দেখিতে পাই, তিনি তাঁহার পূর্ব্বতন সমস্ত সংস্কার, সমস্ত আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া একেবারে রিক্তহস্তে বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। সমাজের প্রচলিত প্রথা তাঁহাকে ধরিয়া রাখে নাই, শাস্ত্র তাঁহাকে আশ্রয় দেয় নাই। তাঁহার ব্যাকুলতাই তাঁহাকে পথ দেখাইয়া চলিয়াছে। সে পথ তাঁহার নিজেরই প্রকৃতির গভীর গোপন-পথ। সব পথ ছাড়িয়া সেই পথ তাঁহাকে নিজে আবিষ্কার করিয়া লইতে হইয়াছে। এ আবিষ্কার করিবার ধৈর্য্য ও সাহস তাঁহার থাকিত না, তিনিও পাঁচজনের পথে চলিয়া ধর্ম্ম না হউক ধার্ম্মিকতা লাভ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতেন। কিন্তু তাঁহার পক্ষে যে না পাইলে নয় হইয়া উঠিয়াছিল, সেইজন্য তাঁহাকে নিজের পথ নিজেকে বাহির করিতে হইয়াছিল। সেজন্য তাঁহাকে যত দুঃখ, যত তিরস্কার হউক, সমস্ত স্বীকার করিতে হইয়াছিল—ইহা বাঁচাইবার জো নাই। ঈশ্বর যে তাহাই চান। তিনি বিশ্বের ঈশ্বর হইয়াও আমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে একটি নিতান্ত একমাত্র স্বতন্ত্র সম্বন্ধে ধরা দিবেন—সেইজন্য আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে তিনি একটি দুর্ভেদ্য স্বাতন্ত্র্যকে চারিদিকের আক্রমণ হইতে নিয়ত রক্ষা করিয়াছেন—এই অতি নির্ম্মল নির্জ্জন-নিভৃত স্বাতন্ত্র্যের মধ্যেই তাঁহার সঙ্গে আমাদের মিলনের স্থান নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। সেইখানকার দ্বার যখন আমরা নিজের চেষ্টায় খুলিয়া তাঁহার কাছে আমাদের সেই চরম স্বাতন্ত্র্যের অধিকার একেবারে ছাড়িয়া দিব, বিশ্বের মধ্যে যাহা আমি ছাড়া আর কাহারো নহে, সেইটেই যখন তাঁহার কাছে সমর্পণ করিতে পারিব, তখনই আর আমার কিছু বাকি থাকিবে না, তখনই তাঁহাকে পাওয়া হইবে। এই যে আমাদের স্বাতন্ত্র্যের দ্বার, ইহার প্রত্যেকের চাবি স্বতন্ত্র; একজনের চাবি দিয়া আর একজনের দ্বার খুলিবে না। পৃথিবীতে যাঁহারা ঈশ্বরকে না পাওয়া পর্য্যন্ত থামেন নাই, তাঁহারা সকলেই ব্যাকুলতার নির্দ্দেশ মানিয়া নিজের চাবি নিজে যেমন করিয়া পারেন সন্ধান করিয়া বাহির করিয়াছেন। কেবল পরের প্রতি নির্ভর করিয়া আলস্যবশত এ যাঁহারা না করিয়াছেন, তাঁহারা কোনো একটা ধর্ম্মমত, ধর্ম্মগ্রন্থ বা ধর্ম্মসম্প্রদায়ে আসিয়া ঠেকিয়াছেন ও সেই-

খানেই তরঙ্গিত হইয়া উঠিয়া কলরব করিতেছেন, শেষ পর্য্যন্ত গিয়া পৌছেন নাই।

আমাদের শক্তি যদি ক্ষীণ হয়, আমাদের আকাঙ্ক্ষা যদি সত্য না হয়, তবে আমরা শেষ পর্য্যন্ত কবে গিয়া পৌছিব জানি না—কিন্তু মহাপুরুষদের জীবন যেদিন আলোচনা করিতে বসিব, সেদিন যেন সেই শেষলক্ষ্যের কথাটাই সম্মুখে রাখি—তাঁহাদের স্মৃতি যেন আমাদিগকে পারের ঘাটের আলো দেখায়—তাহাকে যেন আমরা কোনোদিন সাম্প্রদায়িক অভিযানের মশাল করিয়া না তুলি। তাঁহাদের দৃষ্টান্ত আমাদিগকে বন্ধন হইতে উদ্ধার করিয়া দিবে, পরবশতা হইতে উত্তীর্ণ করিয়া দিবে, আমাদিগকে নিজের সত্যশক্তিতে, সত্যচেষ্টায়, সত্যপথে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিবে; আমাদিগকে ভিক্ষা দিবে না, সন্ধান দিবে; আশ্রয় দিবে না, অভয় দিবে; অনুসরণ করিতে বলিবে না, অগ্রসর হইতে উৎসাহিত করিবে। এক কথায়, মহাপুরুষ তাঁহার নিজের রচনার দিকে আমাদিগকে টানিতেছেন না, ঈশ্বরের দিকে আহ্বান করিতেছেন। আজ আমরা যেন মনকে স্তব্ধ করি, শান্ত করি;—যাহা প্রতিদিন ভাঙিতেছে-গড়িতেছে, যাহা লইয়া তর্ক-বিতর্ক-বিরোধ-বিদ্বেষের অন্ত নাই, যেখানে মানুষের বুদ্ধির, রুচির, অভ্যাসের অনৈক্য, সে সমস্তকেই মৃত্যুর সম্মুখে যেন আজ ক্ষুদ্র করিয়া দেখিতে পারি; কেবল আমাদের আত্মার যে শক্তিকে ঈশ্বর আমাদের জীবনমৃত্যুর নিত্যসম্বলরূপে আমাদিগকে দান করিয়াছেন, তাঁহার যে বাণী আমাদের সুখে-দুঃখে, উত্থানে-পতনে, জয়ে-পরাজয়ে চিরদিন আমাদের অন্তরাত্মায় ধ্বনিত হইতেছে, তাঁহার যে সম্বন্ধ নিগূঢ়রূপে, নিত্যরূপে, একান্তরূপে আমারই, তাহাই আজ নির্ম্মলচিত্তে উপলব্ধি করিব; মহাপুরুষের সমস্ত সাধনা যাঁহাতে সার্থক হইয়াছে, সমাপ্ত হইয়াছে; সমস্ত কর্ম্মের খণ্ডতা, সমস্ত চেষ্টার ভঙ্গুরতা, সমস্ত প্রকাশের অসম্পূর্ণতা যে এক পরম পরিণামের মধ্যে পরিপূর্ণ হইয়াছে, সেই দিকেই আজ আমাদের শান্তদৃষ্টিকে স্থির রাখিব। সম্প্রদায়ের লোকদিগকে এই কথা বিশেষভাবে স্মরণ করাইয়া-দিয়া আমরা সেই পরলোকগত মহাত্মার নিকট আমাদের বিনম্র হৃদয়ের শ্রদ্ধা নিবেদন করি, তাঁহার স্মৃতিশিখরের উর্দ্ধে করজোড়ে সেই ধ্রুবতারার মহিমা নিরীক্ষণ করি—যে শাশ্বতজ্যোতি সম্পদ্‌বিপদের দুর্গম সমুদ্রপথের মধ্য দিয়া দীর্ঘদিনের অবসানে তাঁহার জীবনকে তাহার চরম বিশ্রামের তীর্থে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অপ্রত্যাশা।

ফুটে' ফুল ঝরে' যায়,
সে ত কিছু নাহি চায়,
শুকায় পড়িয়া।
ঘুরি' বায়ু দ্বার-দ্বার
ফিরে যায় শতবার
কিছু না চাহিয়া।

সন্ধ্যা যে রবিরে চায়,
কবে তার দেখা পায়?
তবু চেয়ে থাকে!
বসন্ত চলিয়া যায়,
তবু পিক কেন গায়
সহকার-শাখে?

চাহিব না,—চাহি নাই,
সেই সুখ, চাহি তাই,
নাহি যার শেষ!
তেমনি আগ্রহ-ভরা,
তেমনি পাগল-করা,
কাহারো উদ্দেশ।

সেই আপনাতে ভুল,
তেমনি অজ্ঞাত মূল—
কেন—বুঝি না'ক!
'ভালবাসি'—তাই জানি,
'ভালবাসি'—তাই মানি,
কেন খুঁজি না'ক।

শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়।

ফলের বাগান।

ফলের বাগান প্রস্তুত করিতে হইলে, গাছ-বসানোর উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। অনেক বাগানেই গাছ খুব ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া লাগানো হয়, যতটা ফাঁক করে লাগানো উচিত, তাহা সকলে বুঝেন না। গাছ বসাইবার সময় মনে হয়, অল্প স্থানে যত অধিক গাছ বসানো যাবে, বুঝি ফলও তত বেশী ফলিবে। আমরা যখন দুতিন-বছরের চারা লাগাই, তখন মনে করি, এই ত যথেষ্ট জায়গা রহিয়াছে, এর চেয়েও আবার দূরে দূরে চারা বসাইবার দরকার কি। সেই চারাগুলো বড় হইলে যে কতটা জায়গা অধিকার করিবে, তা আমরা তখন ভাবিতেই পারি না। এইজন্য চোখের আন্দাজের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করিয়া সাধারণত গাছ কত বড় হয়, তাহার মাপ লইয়া হিসাবমত গাছবসানো উচিত।

এখানকার কলেজের (College of Agriculture, University of Illinois U. S. A,) বাগানে আমরা কতকগুলা গাছের মাপ লইয়াছিলাম। আমকাঁঠাল-গাছ এদেশের বাগানে নাই, আপেলগাছ লইয়া মাপ আরম্ভ করিয়াছিলাম। ইহাতে দেখা গিয়াছিল, আপেলগাছ বড় হইলে ডালপালায় সাধারণত চারিদিকে ১৬ হইতে ১৮ ফিট্ পর্য্যন্ত জায়গা অধিকার করে। ইহা হইতে বুঝা যায়, আপেলগাছ যদি ৩২ হইতে ৩৬ ফিট্ অন্তর লাগানো যায়, তবেই বড় হইলে সেগুলা বেশ ফাঁক্‌ফাঁক্ থাকে, ডালে-ডালে ঠেকাঠেকি হয় না।

এই ত গেল ডালে-ডালে ঠেকার কথা। এখন দেখা যাউক, শিকড়ে-শিকড়ে যাহাতে ঠেকাঠেকি না হয়, তাহার জন্যই বা কতটা ফাঁক রাখার দরকার। আমরা সাধারণত মনে করি, গাছের ডালে-ডালে না ঠেকার জন্যই বুঝি গাছ খানিকটা দূরে-দূরে বসানোর দরকার; কিন্তু গাছের ডাল অপেক্ষা শিকড় যে অনেক অধিকদূর পর্য্যন্ত ছড়ায়, সে কথা আমাদের মনে আসে না। ডালে-ডালে ঠেকিলে গাছের খুব অধিক অনিষ্ট হয় না, কিন্তু এক গাছের শিকড় যদি আর এক গাছের শিকড়ের নিকট যায়, তাহা হইলে পরস্পরের মধ্যে খাবার লইয়া টানাটানি পড়ে, ফলে কোন গাছই পূর্ণমাত্রায় খাবার না পাইয়া বাড়িতে পায় না ও ফলও দিতে পারে না।

গাছের ডালই বা কতদূর যায় এবং শিকড়ই বা কতদূর ছড়ায়, আমরা তাহার কতকগুলা মাপ লইয়াছিলাম, নিম্নে তাহার একটা তালিকা দেওয়া হইল।

	গাছ হইতে ডালের দূরত্ব।	মূল হইতে শিকড়ের দূরত্ব।
১ম গাছ	২$\frac{১}{২}$ ফিট্‌	৩$\frac{১}{২}$ ফিট্‌
২য় ,,	২$\frac{৩}{৪}$,,	৫$\frac{১}{২}$,,
৩য় ,,	২$\frac{৩}{৪}$,,	৬$\frac{১}{২}$,,
৪র্থ ,,	২$\frac{১}{২}$,,	৪ ,,
৫ম ,,	২$\frac{১}{৪}$,,	৪$\frac{১}{২}$,,
৬ষ্ঠ ,,	৩ ,,	৪$\frac{১}{২}$,,

এই তালিকা হইতে দেখা যাইবে, গাছের ডাল অপেক্ষা শিকড় অনেকদূর পর্য্যন্ত ছড়াইয়া থাকে। সুতরাং ডালে-ডালে ঠেকিতেছে না, অতএব গাছ ঠিক্‌ বসানো হইয়াছে, এপ্রকার মনে করা যে কত ভুল, তাহা ইহা হইতে আমরা বেশ বুঝিতে পারি। শিকড় ছড়াইবার জন্য যতখানি স্থান আবশ্যক, তাহা দিয়া গাছ বসাইলে, প্রত্যেক গাছই বাড়িবার সুযোগ পাইয়া যায়। এখানে আপেলগাছ সচরাচর ৪০ বা ৪৫ ফিট্‌ অন্তর লাগানো হয়। আমগাছ আপেলগাছ অপেক্ষা অনেক বড়, সেজন্য আমের আরো খানিকটা ফাঁক দরকার।

বলা বাহুল্য, সকল স্থানেই ঐ হিসাবে গাছবসানো উচিত নয়। কোথাও মাটির দোষে গাছ অধিক বড় হয় না, আবার কোথাও সেগুলি শীঘ্রই বাড়িয়া উঠে। সুতরাং মাটির উর্ব্বরাশক্তি দেখিয়া হিসাবের একটুআধটু পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক।

আমাদের দেশের ছোটবাগানের অনেক ফলই ঝড়ে পড়িয়া যায়। এখানে সেই ক্ষতি নিবারণের জন্য বাগানের যে ধার দিয়া ঝড় আসে বা অধিক হাওয়া দেয়, সেই-দিকে ঘনঘন করিয়া তিনসারি গাছ লাগানো হইয়া থাকে। যে সকল গাছ অল্প যত্নে জন্মায় ও শীঘ্র বাড়িয়া বেশ ঝোপের মত হইয়া দাঁড়ায়, তাহাই লাগানো হয়। ঝড়নিবারণের এই ব্যবস্থাকে ইংরাজিতে Windbreak বলে। ফল-পড়া নিবারণ করা ছাড়া, ইহা দ্বারা আরো কয়েকটি উপকার পাওয়া যায়, যথাঃ—

১। গ্রীষ্মকালে গরম বাতাসেও মাটিকে সরস রাখা।

২। যে সকল ডাল ফলভরে নত হইয়া পড়ে, তাহাদিগকে ঝড় হইতে রক্ষা করা।

৩। বাগানের গাছগুলিকে সোজা হইয়া বাড়িবার সাহায্য করা।

৪। কাঁচা ফলকে শুষ্ক হইতে না দেওয়া।

৫। কখন কখন শীঘ্র ফল পাকাইবার সাহায্য করা।

৬। বাগানের শোভাবর্দ্ধন করা।

আজকাল এ অঞ্চলে একদল লোক বলিতেছেন, গাছ খুব ঘনঘন করিয়া বাগানে বসানো আবশ্যক, কারণ জঙ্গলে গাছ খুব ঘনঘন হইয়াই জন্মায়। সেখানে মানুষ কোদাল-কুড়ালি দিয়া আবাদ করিতে যায় না, অথচ গাছ বেশ বড় হইয়া উঠে। এই দলের লোকগুলার কথা কতটা কাজের, তাহা একটু আলোচনা করা যাউক। জঙ্গলে গাছ অযত্নে কেন বাড়ে, তাহা দেখিতে গেলে সেখানকার ঘন গাছগুলার বুড় বড়

ডালপালার দিকে আমাদের সর্ব্বপ্রথমে নজর পড়ে। ডালপালায় জঙ্গলের মাটির উপর রোদবাতাস লাগিতে দেয় না, কাজেই মাটি বেশ সরস থাকে, এবং গাছের পাকা পাতা ঝরিয়া-পড়িয়া সারের কাজ করে। এই সকল সুবিধা বাগানে পাওয়া যায় না সত্য, কিন্তু বাগানের গাছ ও জঙ্গলের গাছের লক্ষ্য যে সম্পূর্ণ পৃথক্, তাহা জঙ্গলের পক্ষপাতিগণ ভুলিয়া যান। "জঙ্গলের গাছ কোনগতিকে পাশের ছোট গাছগুলার খাদ্য কাড়িয়া-লইয়া ও তাহাদিগকে মারিয়া-ফেলিয়া নিজের বংশ ও অস্তিত্ব বজায় রাখে। বাগানের গাছে বড় বড় ডালপালার দরকার হয় না, যাহাতে গাছে শীঘ্র শীঘ্র বড় বড় ফল অল্প চেষ্টায় প্রচুরপরিমাণে ফলিতে পারে, বাগানের অধিকারিমাত্রেরই সেইদিকে নজর থাকে। সুতরাং জঙ্গলের হিসাবে বাগানের গাছগুলার তদ্বির করিলে, বাগানগুলার মালিকগণকে যে কত ঠকিতে হয়, তাহা সহজেই বুঝা যায়। ঘোর জঙ্গলের গাছে কখনও প্রত্যেক বৎসরে ফল হয় না, একবৎসর-দুইবৎসর অন্তর ফল ধরে। যে লোক দুইবৎসর অন্তর একটা গাছে গোটা-কতক ফল পাইয়াই সন্তুষ্ট থাকেন, তাঁহাকে অবশ্য গাছের জঙ্গল রচনা করিতে বলাই ভাল। রীতিমত চাষ করিয়া বৎসর-বৎসর কি অসম্ভব-রকম ফল পাওয়া যায়, সে না দেখিলে বিশ্বাসই করা যায় না। সেদিন আমরা একটা আপেলবাগানে গিয়াছিলাম, তাহার ছোট ছোট প্রত্যেক গাছ হইতে চারি-ব্যারেল (Barrel) আপেল পাড়িতে দেখা গেল। ইহার একমাত্র কারণ যত্ন।

চাষের উপকারিতার সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিতে পাইতেছি। সেগুলির মধ্যে কয়েকটি-মাত্র নিম্নে লেখা হইল :—

১। চাষদ্বারা—

(ক) মাটি গুঁড়াইয়া যায়, কাজেই শিকড়ের সর্ব্বাঙ্গ মাটির স্পর্শে আসে এবং গাছগুলা অধিক খাদ্যসংগ্রহের সুবিধা পায়।

(খ) মাটি আল্গা হইয়া পড়ায় শিকড়-গুলা খুব বাড়িতে পারে।

(গ) মাটি গুঁড়াইয়া যাওয়ায় অত্যধিক গরম বা ঠাণ্ডায় শিকড়ের ক্ষতি করিতে পারে না; বা শিকড়ের গোড়ায় অধিক জল জমিয়া গাছের অনিষ্ট করে না।

(ঘ) মাটি বেশ সরস থাকে।

(ঙ) একবার মাটি ভিজিলে শীঘ্র তাহা শুষ্ক হয় না।

২। গাছের শিকড়গুলা যে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় মাটি হইতে খাদ্যসংগ্রহ করে, চাষদ্বারা তাহা বাড়িয়া উঠে। কারণ চাষে,

(ক) মাটির ভিতরকার খাদ্যগুলা খুব আল্গা অবস্থায় শিকড়ের কাছে আসিয়া পড়ে।

(খ) বাতাস হইতে নাইট্রোজেন্ সংগ্রহ করিবার সুবিধা হয়।

(গ) মাটিতে যেসকল পাতা বা সার পোঁতা থাকে, সেগুলা পচিবার সুবিধা পায়।

(ঘ) নীচের সারালো মাটি উপরে উঠে ও উপরকার সারালো মাটি অবস্থাবিশেষে নীচে নামিয়া শিকড়গুলার কাছাকাছি হয়।

অনেকের বিশ্বাস, সার দিলেই বুঝি গাছের যত্ন করা শেষ হইল। কিন্তু এটা বড় ভুল।

সারের সম্পূর্ণ উপকার পাইতে হইলে চাষ দিয়া জমি ঝুরঝুরে রাখা আবশ্যক। গাছকে খাবার দিলেই আবাদ শেষ হয় না, যাহাতে গাছ খাবার খাইতে পারে, তাহারো ব্যবস্থা আবশ্যক। একটা পাথরের ভিতর গাছের যাহা-কিছু খাদ্য, সবই আছে, কিন্তু কঠিন পাথর খাইয়া গাছ কখনই বাড়িতে পারে না। আমাদের দেশে ফলের বাগানে কখন্ কতবার লাঙল দেওয়া আবশ্যক, তাহা এখন হইতে বলিতে পারি না। এখানে বসন্তে বরফ গলিয়া গেলেই একবার বা দুইবার খুব ভাল করে' লাঙল দেয় এবং তার পর প্রত্যেক বৃষ্টির পরেই উপর-উপর খুঁড়িয়া দেয়। আগষ্টের পর আর খোঁড়াখুঁড়ির ব্যাপার থাকে না। চারা লাগাইবার পরেই প্রথমবৎসর খুব ভাল করিয়া লাঙল দেওয়া আবশ্যক, ইহাতে গাছের শিকড় মাটির নীচে যাইবার সুবিধা পায়, উপরে-উপরে ছড়াইয়া পড়ে না।

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে খুব ফাঁক-ফাঁক করিয়া বাগানে গাছ লাগাইলে, চারা-বাগানে অনেক জমি খালি পড়িয়া থাকার সম্ভাবনা। এই সকল জমিতে প্রথম দুইতিনবৎসর সরিষা ও মসিনা প্রভৃতি ফসল অনায়াসে লাগানো যাইতে পারে। শস্যের লোভে যাহাতে গাছের অনিষ্ট না হয়, তাহা সর্ব্বদা মনে রাখা আবশ্যক। প্রথম বৎসরে গাছের চারিদিকে অন্তত তিনফিট পর্য্যন্ত খালি রাখা দরকার। তার পর প্রত্যেক বৎসর দুই এক ফুট করিয়া ঐ খালি জায়গা বাড়ানো দরকার। যে সকল স্থানে অধিক বৃষ্টি হয় না, এবং মাটি খুব শুষ্ক, সেখানে কোন শস্য না লাগানোই ভাল। তা ছাড়া, গাছ ফলবান্ হইলে শস্যবপন নিষিদ্ধ। যদি এই অবস্থায় কেহ বাগানে শস্যবপন করেন, তবে ফল ধরিবার পূর্ব্বেই সেই গাছগুলাকে মারিয়া জমিতে ফেলিয়া রাখিলে ভাল হয়, কারণ ইহাতে জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করে।

নানাপ্রকার শস্য জন্মাইবার জন্য আমাদের দেশে জমিতে সার দিবার প্রথা আছে, কিন্তু ফলের বাগানে সার দিবার উপর যে আমাদের খুব দৃষ্টি আছে, এ কথা বলা যায় না। ফলের বাগানে শস্যক্ষেত্রের তুলনায় যে কত বেশি সারের দরকার, নিম্নের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে। হিসাব করিলে দেখা যায়, আপেলগাছে (১৩ হইতে ৩৩ বৎসর পর্য্যন্ত) কুড়িবৎসর কালে নিম্নলিখিত খাদ্যগুলি মাটি হইতে ফল-পাতা ইত্যাদির গঠনের জন্য সংগ্রহ করে,—

নাইট্রোজেন	—২৪৯ সের কেবল পাতার জন্য।	—২৬০ সের কেবল ফলের জন্য।
ফস্ফরিক্ এসিড	—৬১ সের পাতার জন্য।	—১৭ সের ফলের জন্য।
পটাস্	২২০ সের পাতার জন্য।	৩৬৪ সের কেবল ফলের জন্য।

পূর্ব্বোক্ত তিনটি প্রধান সামগ্রীর মূল্য প্রায় ৬২৫ টাকা।

জমিতে গম বুনিলে ঐ কুড়ি বৎসরে যে সকল সামগ্রী মাটি হইতে ফলে ও পাতায় যায়, তাহার মূল্যের হিসাব করিলে প্রায় ৩৮৫ টাকা হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, গমের ক্ষেত্রে কুড়িবৎসর কাল খোরাক দিতে যে খরচ হয়, ফলের

গাছের খোরাক জোগাইতে তাহা অপেক্ষা প্রায় ২৪০ টাকা অধিক খরচ পড়ে। এই হিসাব দেখিলে হঠাৎ মনে হইতে পারে, ফলের বাগানে এত খরচ করা অন্যায়, কিন্তু বাগান হইতে যদি কেহ লাভবান্ হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে ঐ হিসাবে খরচ করিতেই হইবে।

এদেশে সাধারণত তিনপ্রকার সারের প্রচলন আছে,—

১। Fertilizer

২। সাধারণ সার।

৩। Green manure অর্থাৎ কাঁচা সার।

আমাদের দেশে প্রথম শ্রেণীর সারের ব্যবহার খুব কম। দ্বিতীয় শ্রেণীর সারের মধ্যে গোবর ও আস্তাবলের আবর্জ্জনা, গাছে নাইট্রোজেন্ জোগাইবার পক্ষে খুব ভাল, তা ছাড়া, ইহাতে জমিরও উপকার হয়। ফলে পটাস্ (*potash*) জিনিসটা খুব প্রয়োজনীয়। এজন্য কাঠের বা পাতার ছাই মন্দ নয়।

তৃতীয় শ্রেণীর সারের উপর আজকাল সকলেরই খুব দৃষ্টি। অনেক পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, খুব খারাপ জমিতে যদি দুই-চারি বৎসর ভাল করে' সীম, বরবটি, ছোলা, মটর বা ধঞ্চে প্রভৃতি শুঁটিওয়ালা ফসল লাগাইয়া চষিয়া ফেলা যায়, তবে জমি খুব ভাল হইয়া দাঁড়ায়। এই কাঁচা সার দেওয়ার রীতি আমাদের দেশে সম্পূর্ণ নূতন নয়। কাঁচা সারের জন্য জমিতে ফসল লাগাইয়া শস্যের আশা করা উচিত নয়,—যখন ক্ষেত্রের গাছে ফুল ধরিবে, তখন চাষ দিয়া পাতা, ডাঁটা, ফুল, সকলই মাটির সঙ্গে মিশাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য; জমি যে সময় সরস থাকে না, তখন কাঁচা সারের ফসল লাগাইলে জমি আরো শুষ্ক হইয়া যায়, এজন্য এদেশে বর্ষাকালে ঐগুলা লাগায়।

শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
College of Agriculture.
University of Illinois
U. S. America.

আনন্দরূপ।*

সত্যং জ্ঞানমনন্তম্। তিনি সত্য, তিনি জ্ঞান, তিনি অনন্ত। এই অনন্ত সত্যে, অনন্ত জ্ঞানে তিনি আপনাতে আপনি বিরাজিত। সেখানে আমরা তাঁহাকে কোথায় পাইব? সেখান হইতে যে বাক্যমন নিবৃত্ত হইয়া আসে।

কিন্তু উপনিষদ্ এ কথাও বলেন যে, এই সত্যং জ্ঞানমনন্তম্ আমাদের কাছে প্রকাশ পাইতেছেন। তিনি অগোচর নহেন। কিন্তু তিনি কই প্রকাশ পাইতেছেন? কোথায়?

আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি। তাঁহার আনন্দরূপ অমৃতরূপ আমাদের কাছে প্রকাশ পাইতেছে? তিনি যে আনন্দিত, তিনি যে রসস্বরূপ, ইহাই আমাদের নিকট প্রকাশমান।

কোথায় প্রকাশমান?—এ প্রশ্ন কি জিজ্ঞাসা করিতে হইবে? যাহা অপ্রকাশিত, তাহার সম্বন্ধেই প্রশ্ন চলিতে পারে, কিন্তু যাহা প্রকাশিত, তাহাকে "কোথায়" বলিয়া কে সন্ধান করিয়া বেড়ায়?

প্রকাশ কোন্‌খানে? এই যে চারিদিকে যাহা দেখিতেছি, তাহাই যে প্রকাশ। এই যে সম্মুখে, এই যে পার্শ্বে, এই যে অধোতে, এই যে ঊর্দ্ধে—এই যে কিছুই গুপ্ত নাই। এ যে সমস্তই সুস্পষ্ট। এ যে আমার ইন্দ্রিয়-মনকে অহোরাত্রি অধিকার করিয়া রহিয়াছে। স এবাধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ। এই ত প্রকাশ, এ ছাড়া আর প্রকাশ কোথায়?

এই যে যাহাকে আমরা প্রকাশ বলিতেছি, এ কেমন করিয়া হইল? তাঁহার ইচ্ছায়, তাঁহার আনন্দে, তাঁহার অমৃতে। আর ত কোনো কারণ থাকিতেই পারে না। তিনি আনন্দিত, সমস্ত প্রকাশ এই কথাই বলিতেছে। যাহা-কিছু আছে, এ সমস্তই তাঁহার আনন্দরূপ, তাঁহার অমৃতরূপ—সুতরাং ইহার কিছুই অপ্রকাশ হইতে পারে না। তাঁহার আনন্দকে কে আচ্ছন্ন করিবে? এমন মহান্ধকার কোথায় আছে? ইহার কণাটিকেও ধ্বংস করিতে পারে, এমন শক্তি কার! এমন মৃত্যু কোথায়? এ যে অমৃত।

সত্যং জ্ঞানমনন্তম্। তিনি বাক্যের মনের অতীত। কিন্তু অতীত হইয়া রহিলেন কৈ? এই যে দশদিকে তিনি আনন্দরূপে আপনাকে একেবারে দান করিয়া ফেলিতেছেন। তিনি ত লুকাইলেন না। যেখানে আনন্দে অমৃতে তিনি অজস্র ধরা দিয়াছেন, সেখানে প্রাচুর্য্যের অন্ত কোথায়, সেখানে

* বোলপুর শান্তিনিকেতন আশ্রমে ৭ই পৌষের উৎসবসভায় পঠিত।

বৈচিত্র্যের যে সীমা নাই, সেখানে কি ঐশ্বর্য্য, কি সৌন্দর্য্য! সেখানে আকাশ যে শতধা বিদীর্ণ হইয়া আলোকে আলোকে নক্ষত্রে নক্ষত্রে খচিত হইয়া উঠিল, সেখানে রূপ যে কেবলি নূতন নূতন, সেখানে প্রাণের প্রবাহ যে আর ফুরায় না। তিনি যে আনন্দরূপে নিজেকে নিয়তই দান করিতে বসিয়াছেন—লোকে-লোকান্তরে সে দান আর ধারণ করিতে পারিতেছে না—যুগে-যুগান্তরে তাহার আর অন্ত দেখিতে পাই না। কে বলে, তাঁহাকে দেখা যায় না; কে বলে, তিনি শ্রবণের অতীত; কে বলে, তিনি ধরা দেননা। তিনিই যে প্রকাশমান—আনন্দ-রূপমমৃতং যদ্বিভাতি। সহস্র চক্ষু থাকিলেও যে দেখিয়া শেষ করিতে পারিতাম না, সহস্র কর্ণ থাকিলেও শোনা ফুরাইত কবে! যদি ধরিতেই চাও, তবে বাহু কতদূর বিস্তার করিলে সে ধরার অন্ত হইবে। এ যে আশ্চর্য্য! মানুষজন্ম লইয়া এই নীল আকাশের মধ্যে কি চোখই মেলিয়াছি! এ কি দেখাই দেখিলাম! দুটি কর্ণপুট দিয়া অনন্ত রহস্যলীলাময় স্বরের ধারা অহরহ পান করিয়া যে ফুরাইল না! সমস্ত শরীরটা যে আলোকের স্পর্শে, বায়ুর স্পর্শে, স্নেহের স্পর্শে, প্রেমের স্পর্শে, কল্যাণের স্পর্শে বিদ্যুৎতন্ত্রীখচিত অলৌকিক বীণার মত বারংবার স্পন্দিত-ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিতেছে! ধন্য হইলাম, আমরা ধন্য হইলাম—এই প্রকাশের মধ্যে প্রকাশিত হইয়া ধন্য হইলাম—পরিপূর্ণ আনন্দের এই আশ্চর্য্য অপরিমেয় প্রাচুর্য্যের মধ্যে, বৈচিত্র্যের মধ্যে, ঐশ্বর্য্যের মধ্যে আমরা ধন্য হইলাম! পৃথিবীর ধূলির সঙ্গে, তৃণের সঙ্গে, কীটপতঙ্গের সঙ্গে গ্রহতারাসূর্য্যচন্দ্রের সঙ্গে আমরা ধন্য হইলাম।

ধূলিকে আজ ধূলি বলিয়া অবজ্ঞা করিয়ো না, তৃণকে আজ তৃণজ্ঞান করিয়ো না,—তোমার ইচ্ছায় এ ধূলিকে পৃথিবী হইতে মুছিতে পার না, এ ধূলি তাঁহার ইচ্ছা; তোমার ইচ্ছায় এ তৃণকে অবমানিত করিতে পার না, এ শ্যামল তৃণ তাঁহারই আনন্দ মূর্ত্তিমান্। তাঁহার আনন্দপ্রবাহ আলোকে উচ্ছ্বসিত হইয়া আজ বহুলক্ষক্রোশ দূর হইতে নবজাগরণের দেবদূতরূপে তোমার সুপ্তির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, ইহাকে ভক্তির সহিত অন্তঃকরণে গ্রহণ কর, ইহার স্পর্শের যোগে আপনাকে সমস্ত আকাশ ব্যাপ্ত করিয়া দাও।

আজ প্রভাতের এই মুহূর্ত্তে পৃথিবীর অর্দ্ধ ভূখণ্ডে নবজাগ্রত সংসারে কর্ম্মের কি তরঙ্গই জাগিয়া উঠিয়াছে! এই সমস্ত প্রবল প্রয়াস, এই সমস্ত বিপুল উদ্‌যোগে যত পুঞ্জ-পুঞ্জ সুখদুঃখ-বিপৎসম্পদ্ গ্রামে-গ্রামে নগরে-নগরে দূরে-দূরান্তরে হিল্লোলিত-ফেনায়িত হইয়া উঠিতেছে, সমস্তই কেবল তাঁহার ইচ্ছা, তাঁহার আনন্দ, ইহাই জানিয়া পৃথিবীর সমস্ত লোকালয়ের কর্ম্মকলরবের সঙ্গীতকে একবার স্তব্ধ হইয়া অধ্যাত্মকর্ণে শ্রবণ কর—তার পরে সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়া বল—সুখে-দুঃখে তাঁহারই আনন্দ, লাভে-ক্ষতিতে তাঁহারই আনন্দ, জন্মে-মরণে তাঁহারই আনন্দ,—সেই "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চ"—ব্রহ্মের আন-

নকে যিনি জানেন, তিনি কাহা হইতেও ভয়প্রাপ্ত হন না।

ক্ষুদ্র স্বার্থ ভুলিয়া, ক্ষুদ্র অহমিকা দূর করিয়া তোমার নিজের অন্তঃকরণকে একবার আনন্দে জাগাইয়া তোল—তবেই আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি—আনন্দরূপে অমৃতরূপে যিনি চতুর্দ্দিকেই প্রকাশ পাইতেছেন, সেই আনন্দময়ের উপাসনা সম্পূর্ণ হইবে। কোনো ভয়, কোনো সংশয়, কোনো দীনতা মনের মধ্যে রাখিয়ো না; আনন্দে প্রভাতে জাগ্রত হও, আনন্দে দিনের কর্ম্ম কর, দিবাবসানে নিঃশব্দ স্নিগ্ধ অন্ধকারের মধ্যে আনন্দে আত্মসমর্পন করিয়া দাও! কোথাও যাইতে হইবে না, কোথাও খুঁজিতে হইবে না, সর্ব্বত্রই যে আনন্দরূপে তিনি বিরাজ করিতেছেন, সেই আনন্দরূপের মধ্যে তুমি আনন্দলাভ করিতে শিক্ষা কর—যাহা-কিছু তোমার সম্মুখে উপস্থিত, পূর্ণ আনন্দের সহিত তাহাকে স্বীকার করিয়া লইবার সাধনা কর—

"সম্পদে সঙ্কটে থাক কল্যাণে
থাক আনন্দে নিন্দা-অপমানে।
সবারে ক্ষমা করি থাক আনন্দে
চির-অমৃত-নির্ঝরে শান্তিরসপানে।"

নিজের এই ক্ষুদ্র চোখের দীপ্তিটুকু যদি আমরা নষ্ট করিয়া ফেলি, তবে আকাশভরা আলোক আর দেখিতে পাই না; তেমনি আমাদের ছোট মনের ছোট ছোট বিষাদ-অবসাদ-নৈরাশ্যনিরানন্দ আমাদিগকে অন্ধ করিয়া দেয়—আনন্দরূপমমৃতং আমরা আর দেখিতে পাই না—নিজের কালিমাদ্বারা আমরা একেবারে পরিবেষ্টিত হইয়া থাকি, চারিদিকে কেবল ভাঙাচোরা, কেবল অসম্পূর্ণতা, কেবল অভাব দেখি;—কানা যেমন মধ্যাহ্নের আলোকে কালো দেখে, আমাদেরও সেই দশা ঘটে। একবার চোখ যদি খোলে, যদি দৃষ্টি পাই, হৃদয়ের মধ্যে নিমেষের মধ্যেও যদি সেই আনন্দ সপ্তকে-সপ্তকে বাজিয়া উঠে,—যে আনন্দে জগদ্ব্যাপী আনন্দের সমস্ত সুর মিলিয়া যায়, তবে যেখানেই চোখ পড়ে, সেখানে তাঁহাকেই দেখি—আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি। বধে-বন্ধনে, দুঃখে-দারিদ্র্যে অপকারে-অপমানেও তাঁহাকেই দেখি—আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি। তখন মুহূর্ত্তেই বুঝিতে পারি, প্রকাশমাত্রই তাঁহারই প্রকাশ—এবং প্রকাশমাত্রই আনন্দরূপমমৃতম্। তখন বুঝিতে পারি, যে-আনন্দে আকাশে-আকাশে আলোক উদ্ভাসিত, আমাতেও সেই পরিপূর্ণ আনন্দেরই প্রকাশ—সেই আনন্দে আমি কাহারো চেয়ে কিছুমাত্র ন্যূন নহি, আমি সকলেরই সমান, আমি জগতের সঙ্গে এক। সেই আনন্দে আমার ভয় নাই, ক্ষতি নাই, অসম্মান নাই। আমি আছি, কারণ আমাতে পরিপূর্ণ আনন্দ আছেন, কে তাহার কণামাত্রও অপলাপ করিতে পারে! এমন কি ঘটনা ঘটিতে পারে, যাহাতে তাহার লেশমাত্র ক্ষুণ্ণতা হইবে! তাই আজ আনন্দের দিনে, আজ উৎসবের প্রভাতে আমরা যেন সমস্ত অন্তরের সহিত বলিতে পারি—এষাস্য পরমা গতিঃ এষাস্য পরমা সম্পৎ; এষোঽস্য পরমো লোক এষোঽস্য পরম আনন্দঃ—এবং প্রার্থনা করি, যেন সেই আনন্দের এমন একটু অংশ লাভ করিতে পারি, যাহাতে সমস্ত জীবনের

প্রত্যেক দিনে সর্ব্বত্র তাঁহাকেই স্বীকার করি, ভয়কে নয়, দ্বিধাকে নয়, শোককে নয়—তাঁহাকেই স্বীকার করি—আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি। তিনি প্রচুররূপে আপনাকে দান করিতেছেন, আমরা প্রচুররূপে গ্রহণ করিতে পারিব না কেন? তিনি প্রচুর ঐশ্বর্য্যে এই যে দিগ্‌দিগন্ত পূর্ণ করিয়া রহিয়াছেন, আমরা সঙ্কুচিত হইয়া, দীন হইয়া, অতি ক্ষুদ্র আকাঙ্ক্ষা লইয়া সেই অবারিত ঐশ্বর্য্যের অধিকার হইতে নিজেকে বঞ্চিত করিব কেন? হাত বাড়াও! বক্ষকে বিস্তৃত করিয়া দাও! দুই হাত ভরিয়া, চোখ ভরিয়া, প্রাণ ভরিয়া অবাধ আনন্দে সমস্ত গ্রহণ কর! তাঁহার প্রসন্নদৃষ্টি যে সর্ব্বত্র হইতেই তোমাকে দেখিতেছে—তুমি একবার তোমার দুই চোখের সমস্ত জড়তা, সমস্ত বিষাদ মুছিয়া ফেল—তোমার দুই চক্ষুকে প্রসন্ন করিয়া চাহিয়া দেখ, তখনি দেখিবে, তাঁহারি প্রসন্নসুন্দর কল্যাণমুখ তোমাকে অনন্তকাল রক্ষা করিতেছে—সে কি প্রকাশ, সে কি সৌন্দর্য্য, সে কি প্রেম, সে কি আনন্দরূপমমৃতম্! যেখানে দানের লেশমাত্র কৃপণতা নাই, সেখানে গ্রহণে এমন কৃপণতা কেন! ওরে মূঢ়, ওরে অবিশ্বাসি, তোর সম্মুখেই সেই আনন্দমুখের দিকে তাকাইয়া সমস্ত প্রাণমনকে প্রসারিত করিয়া পাতিয়া ধর্—বলের সহিত বল্—"অল্প নহে, আমার সবই চাই, ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি। তুমি যতটা দিতেছ, আমি সমস্তটাই লইব। আমি ছোটটার জন্য বড়টাকে বাদ দিব না, আমি একটার জন্য অন্যটা হইতে বঞ্চিত হইব না, আমি এমন সহজ ধন লইব, যাহা দশদিক্ ছাপাইয়া আছে,—যাহার অর্জ্জনে আনন্দ, রক্ষণে আনন্দ, যাহার বিনাশ নাই, যাহার জন্য জগতে কাহারো সঙ্গে বিরোধ করিতে হয় না! তোমার যে প্রেম নানা দেশে, নানা কালে, নানা রসে, নানা ঘটনায় অবিশ্রাম আনন্দে-অমৃতে বিকাশিত, কোথাও যাহার প্রকাশের অন্ত নাই, তাহাকেই একান্তভাবে উপলব্ধি করিতে পারি, এমন প্রেম তোমার প্রসাদে আমার অন্তরে অঙ্কুরিত হইয়া উঠুক্!

যেখানে সমস্তই দেওয়া হইতেছে, সেখানে কেবল পাওয়ার ক্ষমতা হারাইয়া যেন কাঙালের মত না ঘুরিয়া বেড়াই! যেখানে আনন্দরূপমমৃতং তুমি আপনাকে স্বয়ং প্রকাশিত করিয়া রহিয়াছ, সেখানে চির-জীবন আমার এমন বিভ্রান্তি না ঘটে যে, সর্ব্বদাই সর্ব্বত্রই তোমাকে দেখিয়াও না দেখি এবং কেবল শোকদুঃখ, শ্রান্তিজরা, বিচ্ছেদক্ষতি লইয়া হাহাকার করিতে করিতে সংসার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যাই!

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিশ্বসাহিত্য।

আমাদের অন্তঃকরণে যত-কিছু বৃত্তি আছে, সে কেবল সকলের সঙ্গে যোগস্থাপনের জন্য। এই যোগের দ্বারাই আমরা সত্য হই, সত্যকে পাই। নহিলে আমি আছি বা কিছু আছে, ইহার অর্থই থাকে না।

জগতে সত্যের সঙ্গে আমাদের এই যে যোগ, ইহা তিন প্রকারের। বুদ্ধির যোগ, প্রয়োজনের যোগ, আর আনন্দের যোগ। ইহার মধ্যে বুদ্ধির যোগকে এক প্রকার প্রতিযোগিতা বলা যাইতে পারে। সে যেন ব্যাধের সঙ্গে শিকারের যোগ। সত্যকে বুদ্ধি যেন প্রতিপক্ষের মত নিজের রচিত একটা কাঠগড়ায় দাঁড় করাইয়া জেরা করিয়া করিয়া তাহার পেটের কথা টুক্‌রা-টুক্‌রা ছিনিয়া বাহির করে। এইজন্য সত্যসম্বন্ধে বুদ্ধির একটা অহঙ্কার থাকিয়া যায়। সে যে পরিমাণে সত্যকে জানে, সেই পরিমাণে আপনার শক্তিকে অনুভব করে। তার পরে প্রয়োজনের যোগ। এই প্রয়োজনের অর্থাৎ কাজের যোগে সত্যের সঙ্গে আমাদের শক্তির একটা সহযোগিতা জন্মে। এই গরজের সম্বন্ধে সত্য আরো বেশি করিয়া আমাদের কাছে আসে। কিন্তু তবু তাহার সঙ্গে আমাদের পার্থক্য ঘোচে না। ইংরেজ-সওদাগর যেমন একদিন নবাবের কাছে মাথা নীচু করিয়া ভেট দিয়া কাজ আদায় করিয়া লইয়াছিল এবং কৃতকার্য্য হইয়া শেষকালে নিজেই সিংহাসনে চড়িয়া বসিয়াছে— তেম্‌নি সত্যকে ব্যবহারে লাগাইয়া কাজ উদ্ধার করিয়া শেষকালে মনে করি, আমরাই যেন জগতের বাদশাগিরি পাইয়াছি! তখন আমরা বলি, প্রকৃতি আমাদের দাসী, জল বায়ু-অগ্নি আমাদের বিনা-বেতনের চাকর।

তার পরে আনন্দের যোগ। এই সৌন্দর্য্যের বা আনন্দের যোগে সমস্ত পার্থক্য ঘুচিয়া যায়—সেখানে আর অহঙ্কার থাকে না—সেখানে নিতান্ত ছোটর কাছে, দুর্ব্বলের কাছে আপনাকে একেবারে সঁপিয়া দিতে আমাদের কিছুই বাধে না। সেখানে মথুরার রাজা বৃন্দাবনের গোয়ালিনীর কাছে আপনার রাজমর্য্যাদা লুকাইবার আর পথ পায় না। যেখানে আমাদের আনন্দের যোগ, সেখানে আমাদের বুদ্ধির শক্তিকেও অনুভব করি না—কর্ম্মের শক্তিকেও অনুভব করি না—সেখানে শুদ্ধ আপনাকেই অনুভব করি;—মাঝখানে কোনো আড়াল বা হিসাব থাকে না।

এক কথায়, সত্যের সঙ্গে বুদ্ধির যোগ আমাদের ইস্কুল, প্রয়োজনের যোগ আমাদের আপিস্, আনন্দের যোগ আমাদের ঘর। ইস্কুলেও আমরা সম্পূর্ণভাবে থাকি না, আপিসেও আমরা সম্পূর্ণভাবে ধরা দিই না, ঘরেই আমরা বিনা বাধায় নিজের সমস্তটাকে ছাড়িয়া-দিয়া বাঁচি। ইস্কুল নিরলঙ্কার, আপিস্ নিরাভরণ, আর ঘরকে কত সাজসজ্জায় সাজাইয়া থাকি।

এই আনন্দের যোগ ব্যাপারখানা কি?

না, পরকে আপনার করিয়া জানা, আপনাকে পরের করিয়া জানা। যখন তেমন করিয়া জানি, তখন কোনো প্রশ্ন থাকে না। এ কথা আমরা কথনো জিজ্ঞাসা করি না যে, আমি আমাকে কেন ভালবাসি, আমার আপনার অনুভূতিতেই যে আনন্দ। সেই আমার অনুভূতিকে অন্যের মধ্যেও যখন পাই, তখন এ কথা আর জিজ্ঞাসা করিবার কোনো প্রয়োজনই হয় না যে, তাহাকে আমার কেন ভাল লাগিতেছে।

যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীকে বলিয়াছিলেন—

"নবা অরে পুত্রস্ত কামায় পুত্রঃ প্রিয়ো ভবতি আত্মনস্ত কামায় পুত্রঃ প্রিয়ো ভবতি। নবা অরে বিত্তস্ত কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবতি আত্মনস্ত কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবতি।"

পুত্রকে চাহি বলিয়াই যে পুত্র প্রিয় হয়, তাহা নহে, আত্মাকে চাহি বলিয়াই পুত্র প্রিয় হয়। বিত্তকে চাহি বলিয়াই যে বিত্ত প্রিয় হয়, তাহা নহে, আত্মাকে চাহি বলিয়াই বিত্ত প্রিয় হয়। ইত্যাদি।

এ কথার অর্থ এই, যাহার মধ্যে আমি নিজেকেই পূর্ণতর বলিয়া বুঝিতে পারি, আমি তাহাকেই চাই। পুত্র আমার অভাব দূর করে—তাহার মানে, আমি পুত্রের মধ্যে আমাকে আরো পাই। তাহার মধ্যে আমি যেন আমিতর হইয়া উঠি। এইজন্য সে আমার আত্মীয়, আমারে আত্মাকে আমার বাহিরেও সে সত্য করিয়া তুলিয়াছে। নিজের মধ্যে যে সত্যকে অত্যন্ত নিশ্চিতরূপে অনুভব করিয়া প্রেম অনুভব করি, পুত্রের মধ্যেও সেই সত্যকে সেইমতই অত্যন্ত অনুভব করাতে আমার সেই প্রেম বাড়িয়া উঠে।

সেইজন্য একজন মানুষ যে কি, তাহা জানিতে গেলে সে কি ভালবাসে, তাহা জানিতে হয়। ইহাতেই বুঝা যায়, এই বিশ্বজগতে কিসের মধ্যে সে আপনাকে লাভ করিয়াছে, কতদূর পর্য্যন্ত সে আপনাকে ছড়াইয়া দিয়াছে। যেখানে আমার প্রীতি নাই, সেখানেই আমার আত্মা তাহার গণ্ডির সীমারেখায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

শিশু বাহিরে আলো দেখিলে বা কিছু-একটা চলাফেরা করিতেছে দেখিলে আনন্দে হাসিয়া উঠে, কলরব করে। সে এই আলোকে, এই চাঞ্চল্যে আপনারই চেতনাকে অধিকতর করিয়া পায়—এইজন্যই তাহার আনন্দ।

কিন্তু ইন্দ্রিয়বোধ ছাড়াও ক্রমে যখন তাহার চেতনা হৃদয়মনের নানা স্তরে ব্যাপ্ত হইতে থাকে, তখন শুধু এতটুকু আন্দোলনে তাহার আনন্দ হয় না। একেবারে হয় না, তাহা নহে, অল্প হয়।

এম্‌নি করিয়া মানুষের বিকাশ যতই বড় হয়, সে ততই বড়-রকম করিয়া আপনার সত্যকে অনুভব করিতে চায়।

এই যে নিজের অন্তরাত্মাকে বাহিরে অনুভব করা, এটা প্রথমে মানুষের মধ্যেই মানুষ অতি সহজে এবং সম্পূর্ণরকমে করিতে পারে। চোখের দেখায়, কানের শোনায়, মনের ভাবায়, কল্পনার খেলায়, হৃদয়ের নানান্ টানে মানুষের মধ্যে সে স্বভাবতই নিজেকে পুরাপুরি আদায় করে। এইজন্য মানুষকে জানিয়া, মানুষকে টানিয়া, মানুষের কাজ করিয়া সে এমন কানায়-কানায় ভরিয়া উঠে। এইজন্যই দেশে এবং কালে যে মানুষ, যত বেশি মানুষের মধ্যে আপনার আত্মাকে

মিলাইয়া নিজেকে উপলব্ধি ও প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন, তিনি ততই মহৎ-মানুষ। তিনি যথার্থই মহাত্মা। সমস্ত মানুষেরই মধ্যে আমার আত্মার সার্থকতা, এ যে ব্যক্তি কোনো-না-কোনো সুযোগে কিছু-না-কিছু বুঝিতে পারিয়াছে, তাহার ভাগ্যে মনুষ্যত্বের ভাগ কম পড়িয়া গেছে। সে আত্মাকে আপনার মধ্যে জানাতেই আত্মাকে ছোট করিয়া জানে।

সকলের মধ্যেই নিজেকে জানা,—আমাদের মানবাত্মার এই যে একটা স্বাভাবিক ধর্ম্ম, স্বার্থ তাহার একটা বাধা, অহঙ্কার তাহার একটা বাধা; সংসারে এই সকল নানা বাধায় আমাদের আত্মার সেই স্বাভাবিক গতিস্রোত খণ্ডখণ্ড হইয়া যায়; মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যকে আমরা অবাধে দেখিতে পাই না।

কিন্তু জানি, কেহ কেহ তর্ক করিবেন, মানবাত্মার যেটা স্বাভাবিক ধর্ম্ম, সংসারে তাহার এত লাঞ্ছনা কেন? যেটাকে তুমি বাধা বলিয়া উড়াইয়া দিতেছ—যাহা স্বার্থ, যাহা অহঙ্কার, তাহাকেই বা স্বাভাবিক ধর্ম্ম না বলিবে কেন?

বস্তুত অনেকে তাহা বলিয়াও থাকে। কেন না, স্বভাবের চেয়ে স্বভাবের বাধাটাই বেশি করিয়া চোখে পড়ে। দুইচাকার গাড়িতে মানুষ যখন প্রথম চড়া অভ্যাস করে, তখন চলার চেয়ে পড়াটাই তাহার ভাগ্যে বেশি ঘটে। সেই সময়ে কেহ যদি বলে, লোকটা চড়া অভ্যাস করিতেছে না, পড়াই অভ্যাস করিতেছে, তবে তাহা লইয়া তর্ক করা মিথ্যা। সংসারে স্বার্থ এবং অহঙ্কারের ধাক্কা ত পদে পদেই দেখিতে পাই, কিন্তু তাহার ভিতর দিয়াও মানুষের নিগূঢ় স্বধর্ম্মরক্ষার চেষ্টা অর্থাৎ সকলের সঙ্গে মিলিবার চেষ্টা যদি না দেখিতে পাই, যদি পড়াটাকেই স্বাভাবিক বলিয়া তকরার করি, তবে সে নিতান্তই কলহ করা হয়।

বস্তুত যে ধর্ম্ম আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক, তাহাকে স্বাভাবিক বলিয়া জানিবার জন্যই, তাঁহাকে তাহার পূরা দমে কাজ জোগাইবার জন্যই তাহাকে বাধা দিতে হয়। সেই উপায়েই সে নিজেকে সচেতনভাবে জানে—এবং তাহার চৈতন্য যতই পূর্ণ হয়, তাহার আনন্দও ততই নিবিড় হইতে থাকে। সকল বিষয়েই এইরূপ।

এই যেমন বুদ্ধি। কার্য্যকারণের সম্বন্ধ ঠিক করা বুদ্ধির একটা ধর্ম্ম। সহজপ্রত্যক্ষ জিনিষের মধ্যে সে যতক্ষণ তাহা সহজেই করে, ততক্ষণ সে নিজেকে যেন পূরাপূরি দেখিতেই পায় না। কিন্তু বিশ্বজগতে কার্য্যকারণের সম্বন্ধগুলি এতই গোপনে তলাইয়া আছে যে, তাহা উদ্ধার করিতে বুদ্ধিকে নিয়তই প্রাণপণে খাটিতে হইতেছে। এই বাধা কাটাইবার খাটুনিতেই বুদ্ধি বিজ্ঞানদর্শনের মধ্যে নিজেকে খুব নিবিড় করিয়া অনুভব করে—তাহাতেই তাহার গৌরব বাড়ে। বস্তুত ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিলে বিজ্ঞানদর্শন আর কিছুই নহে, বিষয়ের মধ্যে বুদ্ধির নিজেকেই উপলব্ধি। সে নিজের নিয়ম যেখানে দেখে, সেখানে সেই পদার্থকে এবং নিজেকে একত্র করিয়া দেখে। ইহাকেই বলে বুঝিতে পারা। এই দেখাতেই বুদ্ধির আনন্দ। নহিলে আপেলফল যে কারণে মাটিতে পড়ে, সূর্য্য সেই কারণেই পৃথিবীকে টানে, এ কথা বাহির করিয়া মানুষের এত খুসি হইবার

কোনো কারণ ছিল না। টানে ত টানে, আমার তাহাতে কি? আমার তাহাতে এই, জগৎচরাচরের এই ব্যাপক ব্যাপারকে আমার বুদ্ধির মধ্যে পাইলাম—সর্ব্বত্রই আমার বুদ্ধিকে অনুভব করিলাম। আমার বুদ্ধির সঙ্গে ধূলি হইতে সূর্য্যচন্দ্রতারা সবটা মিলিল। এম্‌নি করিয়া অন্তহীন জগৎরহস্য মানুষের বুদ্ধিকে বাহিরে টানিয়া-আনিয়া মানুষের কাছে তাহাকে বেশি করিয়া প্রকাশ করিতেছে—নিখিল চরাচরের সঙ্গে মিলাইয়া আবার তাহা মানুষকে ফিরাইয়া দিতেছে। সমস্তের সঙ্গে এই বুদ্ধির মিলনই জ্ঞান। এই মিলনেই আমাদের বোধশক্তির আনন্দ।

তেম্‌নি সমস্ত মানুষের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আপনার মনুষ্যত্বের মিলনকে পাওয়াই মানবাত্মার স্বাভাবিক ধর্ম্ম এবং তাহাতেই তাহার যথার্থ আনন্দ। এই ধর্ম্মকে পূর্ণ-চেতনরূপে পাইবার জন্যই অন্তরে-বাহিরে কেবলি বিরোধ ও বাধার ভিতর দিয়াই তাহাকে চলিতে হয়। এইজন্যই স্বার্থ এত প্রবল, আত্মাভিমান এত অটল, সংসারের পথ এত দুর্গম। এই সমস্ত বাধার ভিতর দিয়া যেখানে মানবের ধর্ম্ম সমুজ্জল হইয়া পূর্ণসুন্দররূপে সবলে নিজেকে প্রকাশ করে, সেখানে বড় আনন্দ। সেখানে আমরা আপনাকেই বড় করিয়া পাই।

মহাপুরুষদের জীবনী এইজন্যই আমরা পড়িতে চাই। তাঁহাদের চরিত্রে আমাদের নিজের বাধাযুক্ত আচ্ছন্ন প্রকৃতিকেই মুক্ত ও প্রসারিত দেখিতে পাই। ইতিহাসে আমরা আমাদেরই স্বভাবকে নানা লোকের মধ্যে নানা দেশে নানা কালে নানা ঘটনায় নানা পরিমাণে ও নানা আকারে দেখিয়া রস পাইতে থাকি। তখন আমি স্পষ্ট করিয়া বুঝি বা না বুঝি, মনের মধ্যে স্বীকার করিতে থাকি সকল মানুষকে লইয়াই আমি এক—সেই ঐক্য যতটা-মাত্রায় আমি ঠিক-মত অনুভব করিব, ততটা-মাত্রায় আমার মঙ্গল, আমারি আনন্দ।

কিন্তু জীবনীতে ও ইতিহাসে আমরা সমস্তটা আগাগোড়া স্পষ্ট দেখিতে পাই না। তাহাও অনেক বাধায়, অনেক সংশয়ে ঢাকা পড়িয়া আমাদের কাছে দেখা দেয়। তাহার মধ্য দিয়াও আমরা মানুষের যে পরিচয় পাই, তাহা খুব বড়, সন্দেহ নাই; কিন্তু সেই পরিচয়কে আবার আমাদের মনের মত করিয়া, তাহাকে আমাদের সাধ মিটাইয়া সাজাইয়া চিরকালের মত ভাষায় ধরিয়া রাখিবার জন্য আমাদের অন্তরের একটা চেষ্টা আছে। তেম্‌নি করিতে পারিলে তবেই সে যেন বিশেষ করিয়া আমার হইল। তাহার মধ্যে সুন্দর ভাষায়, সুরচিত নৈপুণ্যে আমার প্রীতিকে প্রকাশ করিতেই সে মানুষের হৃদয়ের সামগ্রী হইয়া উঠিল। সে আর এই সংসারের আনাগোনার স্রোতে ভাসিয়া গেল না।

এম্‌নি করিয়া, বাহিরের যে সকল অপরূপ প্রকাশ,—তাহা সূর্য্যোদয়ের ছটা হউক্ বা মহৎ চরিত্রের দীপ্তি হউক্ বা নিজের অন্তরের আবেগ হউক্,—যাহা-কিছু ক্ষণে-ক্ষণে আমাদের হৃদয়কে চেতাইয়া তুলিয়াছে, হৃদয় তাহাকে নিজের একটা সৃষ্টির সঙ্গে জড়িত করিয়া আপনার বলিয়া তাহাকে আঁকড়িয়া রাখে। এম্‌নি করিয়া সেই সকল উপলক্ষ্যে

সে আপনাকেই বিশেষ করিয়া প্রকাশ করে।

সংসারে মানুষ যে আপনাকে প্রকাশ করিতেছে, সেই প্রকাশের দুইটি মোটা ধারা আছে। একটা ধারা মানুষের কর্ম্ম, আর একটা ধারা মানুষের সাহিত্য। এই দুই ধারা একেবারে পাশাপাশি চলিয়াছে। মানুষ আপনার কর্ম্মরচনায় এবং ভাবরচনায় আপনাকে ঢালিয়া দিয়াছে। ইহারা উভয়ে উভয়কে পূরণ করিতে করিতে চলিয়াছে। এই দুয়ের মধ্য দিয়াই ইতিহাসে ও সাহিত্যে মানুষকে পুরাপুরি জানিতে হইবে।

কর্ম্মক্ষেত্রে মানুষ তাহার দেহ-মন-হৃদয়ের সমস্ত শক্তি ও অভিজ্ঞতা লইয়া গৃহ, সমাজ, রাজ্য ও ধর্ম্মসম্প্রদায় গড়িয়া তুলিতেছে। এই গড়ার মধ্যে, মানুষ যাহা জানিয়াছে, যাহা পাইয়াছে, যাহা চায়, সমস্তই প্রকাশ পাইতেছে। এম্‌নি করিয়া মানুষের প্রকৃতি জগতের সঙ্গে জড়াইয়া-গিয়া নানাপ্রকার রূপ ধরিয়া সকলের মাঝখানে আপনাকে দাঁড় করাইয়া তুলিতেছে। এম্‌নি করিয়া, যাহা ভাবের মধ্যে ঝাপ্‌সা হইয়া ছিল, ভবের মধ্যে তাহা আকারে জন্ম লইতেছে; যাহা একের মধ্যে ক্ষীণ হইয়া ছিল, তাহা অনেকের মধ্যে নানা-অঙ্গ-বিশিষ্ট বড় ঐক্য পাইতেছে। এইরূপে ক্রমে এমন হইয়া উঠিতেছে যে, প্রত্যেক স্বতন্ত্র মানুষ এই বহুদিনের ও বহুজনের গড়া ঘর, সমাজ, রাজ্য ও ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ভিতর দিয়া ছাড়া নিজেকে স্পষ্ট করিয়া, পুরা করিয়া প্রকাশ করিতেই পারে না। এই সমস্তটাই মানুষের কাছে মানুষের প্রকাশরূপ হইয়া উঠিয়াছে। এমন অবস্থা না হইলে তাহাকে আমরা সভ্যতা অর্থাৎ পূর্ণমনুষ্যত্ব বলিতেই পারি না। রাজ্যেই বল, সমাজেই বল, যে ব্যাপারে আমরা একএকজন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, একের সঙ্গে সকলের যোগ নাই, সেইখানেই আমরা অসভ্য। এইজন্য সভ্যসমাজে রাজ্যে আঘাত লাগিলে সেই রাজ্যের প্রত্যেক লোকের বৃহৎ কলেবরটাতে আঘাত লাগে; সমাজ কোনোদিকে সঙ্কীর্ণ হইলে সেই সমাজের প্রত্যেক লোকের আত্মবিকাশ আচ্ছন্ন হইতে থাকে। মানুষের সংসারক্ষেত্রের এই সমস্ত রচনা যে পরিমাণে উদার হয়, সেই পরিমাণে, সে আপনার মনুষ্যত্বকে অবাধে প্রকাশ করিতে পারে। যে পরিমাণে সেখানে সঙ্কোচ আছে, প্রকাশের অভাবে মানুষ সেই পরিমাণে সেখানে দীন হইয়া থাকে; কারণ, সংসার কাজের উপলক্ষ্য করিয়া মানুষকে প্রকাশেরই জন্য এবং প্রকাশই একমাত্র আনন্দ।

কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে মানুষ এই যে আপনাকেই প্রকাশ করে, এখানে প্রকাশ করাটাই তাহার আসল লক্ষ্য নয়—ওটা কেবল গৌণ-ফল। গৃহিণী ঘরের কাজের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করেন বটে, কিন্তু প্রকাশ করাটাই তাঁহার মনের স্পষ্ট উদ্দেশ্য নয়। গৃহকর্ম্মের ভিতর দিয়া তিনি তাঁহার নানা অভিপ্রায় সাধন করেন; সেই সকল অভিপ্রায় কাজের উপর হইতে ঠিক্‌রাইয়া-আসিয়া তাঁহার প্রকৃতিকে আমাদের কাছে বাহির করিয়া দেয়।

কিন্তু সময় আছে—যখন মানুষ মুখ্যতই আপনাকে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করে। মনে কর যেদিন ঘরে বিবাহ, সেদিন একদিকে বিবাহের কাজটা সারিবার জন্য আয়োজন

চলিতে থাকে, আবার অন্যদিকে শুধু কাজ-সারা নহে, হৃদয়কে জানাইয়া দিবারও প্রয়োজন ঘটে; সেদিন ঘরের লোক ঘরের মঙ্গলকে ও আনন্দকে সকলের কাছে ঘোষণা না করিয়া দিয়া থাকিতে পারে না। ঘোষণার উপায় কি? বাঁশী বাজে, দীপ জ্বলে, ফুল-পাতার মালা দিয়া ঘর সাজানো হয়। সুন্দর ধ্বনি, সুন্দর গন্ধ, সুন্দর দৃশ্যের দ্বারা, উজ্জ্বলতার দ্বারা হৃদয় আপনাকে শতধারার ফোয়ারার মত চারিদিকে ছড়াইয়া ফেলিতে থাকে। এম্‌নি করিয়া নানাপ্রকার ইঙ্গিতে আপনার আনন্দকে সে অন্যের মধ্যে জাগাইয়া-তুলিয়া সেই আনন্দকে সকলের মধ্যে সত্য করিতে চায়।

মা তাঁহার কোলের শিশুর সেবা না করিয়া থাকিতে পারেন না। কিন্তু শুধু তাই নয়—কেবল কাজ করিয়া নয়, মায়ের স্নেহ আপনা-আপনি বিনা কারণে আপনাকে বাহিরে ব্যক্ত করিতে চায়। তখন সে কত খেলায়, কত আদরে, কত ভাষায়, ভিতর হইতে ছাপাইয়া উঠিতে থাকে। তখন সে শিশুকে নানা রঙের সাজে সাজাইয়া, নানা গহনা পরাইয়া নিতান্তই বিনা প্রয়োজনে নিজের প্রাচুর্য্যকে প্রাচুর্য্যদ্বারা, মাধুর্য্যকে সৌন্দর্য্যদ্বারা বাহিরে বিস্তার না করিয়া থাকিতে পারে না।

ইহা হইতে এই বুঝা যাইতেছে যে, আমাদের হৃদয়ের ধর্ম্মই এই। সে আপনার আবেগকে বাহিরের জগতের সঙ্গে মিলাইয়া দিতে চায়। সে নিজের মধ্যে নিজে পূরা নহে। অন্তরের সত্যকে কোনোপ্রকারে বাহিরে সত্য করিয়া তুলিলে তবে সে বাঁচে। যে বাড়ীতে সে থাকে, সে বাড়ীটি তাহার কাছে কেবল ইঁটকাঠের ব্যাপার হইয়া থাকে না—সে বাড়ীটিকে সে বাস্তু করিয়া তুলিয়া তাহাতে হৃদয়ের রং মাখাইয়া দেয়। যে দেশে হৃদয় বাস করে, সে দেশ তাহার কাছে মাটি-জল-আকাশ হইয়া থাকে না—সেই দেশ তাহার কাছে ঈশ্বরের জীবধাত্রীরূপকে জননীভাবে প্রকাশ করিলে তবে সে আনন্দ পায়, নহিলে হৃদয় আপনাকে বাহিরে দেখিতে পায় না। এমন না ঘটিলে হৃদয় উদাসীন হয় এবং ঔদাসীন্য হৃদয়ের পক্ষে মৃত্যু।

সত্যের সঙ্গে হৃদয় এম্‌নি করিয়া কেবলি রসের সম্পর্ক পাতায়। রসের সম্বন্ধ যেখানে আছে, সেখানে আদানপ্রদান আছে। আমাদের হৃদয়লক্ষ্মী জগতের যে কুটুম্ববাড়ী হইতে যেমন সওগাদ পায়, সেখানে তাহার অনুরূপ সওগাদটি না পাঠাইতে পারিলে তাহার গৃহিণীপনায় যেন ঘা লাগে। এইরূপ সওগাদের ডালায় নিজের কুটুম্বিতাকে প্রকাশ করিবার জন্য তাহাকে নানা মালমস্‌লা লইয়া, ভাষা লইয়া, স্বর লইয়া, তুলি লইয়া, পাথর লইয়া সৃষ্টি করিতে হয়। ইহার সঙ্গে সঙ্গে যদি তাহার নিজের কোনো প্রয়োজন সারা হইল ত ভালই, কিন্তু অনেক সময়ে সে আপনার প্রয়োজন নষ্ট করিয়াও কেবল নিজেকে প্রকাশ করিবার জন্য ব্যগ্র। সে দেউলে হইয়াও আপনাকে ঘোষণা করিতে চায়। মানুষের প্রকৃতির মধ্যে এই যে প্রকাশের বিভাগ, ইহাই তাহার প্রধান বাজে-খরচের বিভাগ—এইখানেই বুদ্ধি-খাতাঞ্চিকে বারংবার কপালে করাঘাত করিতে হয়।

হৃদয় বলে, আমি অন্তরে যতখানি, বাহিরেও ততখানি সত্য হইব কি করিয়া? তেমন

সামগ্রী, তেমন সুযোগ বাহিরে কোথায় আছে? সে কেবলি কাঁদিতে থাকে যে, আমি আপনাকে দেখাইতে অর্থাৎ আপনাকে বাহিরে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিতেছি না। ধনী হৃদয়ের মধ্যে যখন আপনার ধনিত্ব অনুভব করে, তখন সেই ধনিত্ব বাহিরে প্রকাশ করিতে গিয়া কুবেরের ধনকেও সে ফুঁকিয়া দিতে পারে। প্রেমিক হৃদয়ের মধ্যে যখন যথার্থ প্রেম অনুভব করে, তখন সেই প্রেমকে প্রকাশ অর্থাৎ বাহিরে সত্য করিয়া তুলিবার জন্য সে ধনপ্রাণমান সমস্তই এক নিমেষে বিসর্জ্জন করিতে পারে। এম্‌নি করিয়া বাহিরকে অন্তরের ও অন্তরকে বাহিরের সামগ্রী করিবার একান্ত ব্যাকুলতা হৃদয়ের কিছুতেই ঘুচে না। বলরামদাসের একটি পদে আছে—

"তোমায় হিয়ার ভিতর হৈতে কে কৈল বাহির।"

অর্থাৎ প্রিয়বস্তু যেন হৃদয়ের ভিতরকারই বস্তু—তাহাকে কে যেন বাহিরে আনিয়াছে—সেইজন্য তাহাকে আবার ভিতরে ফিরাইয়া লইবার জন্য এতই আকাঙ্ক্ষা।—আবার ইহার উল্টাও আছে। হৃদয় আপনার ভিতরের আকাঙ্ক্ষা ও আবেগকে যখন বাহিরের কিছুতে প্রত্যক্ষ করিতে না পারে, তখন অন্তত সে নানা উপকরণ লইয়া নিজের হাতে তাহার একটা প্রতিরূপ গড়িবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে। এম্‌নি করিয়া জগৎকে আপনার ও আপনাকে জগতের করিয়া তুলিবার জন্য হৃদয়ের ব্যাকুলতা কেবলি কাজ করিতেছে। নিজেকে বাহিরে প্রকাশ করা এই কাজেরই একটি অঙ্গ। সেইজন্য এই প্রকাশ-ব্যাপারে হৃদয় মানুষকে সর্ব্বস্ব খোয়াইতেও রাজি করিয়া আনে।

বর্ব্বর সৈন্য যখন লড়াই করিতে যায়, তখন সে কেবলমাত্র শত্রুপক্ষকে হারাইয়া দিবার জন্যই ব্যস্ত থাকে না। তখন সে সর্ব্বাঙ্গে রংচং মাখিয়া, চীৎকার করিয়া, বাজনা বাজাইয়া তাণ্ডবনৃত্য করিয়া চলে—ইহা অন্তরের হিংসাকে বাহিরে মূর্ত্তিমান্ করিয়া তোলা। এ না হইলে হিংসা যেন পূরা হয় না। হিংসা, অভিপ্রায়সিদ্ধির জন্য যুদ্ধ করে, আর আত্মপ্রকাশের তৃপ্তির জন্য এই সমস্ত বাজে-কাণ্ড করিতে থাকে।

এখনকার পাশ্চাত্যযুদ্ধেও জিগীষার আত্মপ্রকাশের জন্য বাজনাবাদ্য, সাজসরঞ্জাম যে একেবারেই নাই, তাহা নয়। তবু এই সকল আধুনিক যুদ্ধে বুদ্ধির চালেরই প্রাধান্য ঘটিয়াছে, ক্রমেই মানবহৃদয়ের ধর্ম্ম ইহা হইতে সরিয়া আসিতেছে। ইজিপ্টে দরবেশের দল যখন ইংরেজসৈন্যকে আক্রমণ করিয়াছিল, তখন তাহারা কেবল লড়াইয়ে জিতিবার জন্যই মরে নাই। তাহারা অন্তরের উদ্দীপ্ত তেজকে প্রকাশ করিবার জন্যই শেষ ব্যক্তিটি পর্য্যন্ত মরিয়াছিল। লড়াইয়ে যাহারা কেবল জিতিতেই চায়, তাহারা এমন অনাবশ্যক কাণ্ড করে না। আত্মহত্যা করিয়াও মানুষের হৃদয় আপনাকে প্রকাশ করিতে চায়! এত-বড় বাজে-খরচের কথা কে মনে করিতে পারে।

আমরা যে পূজা করিয়া থাকি, তাহা বুদ্ধিমানেরা এক ভাবে করে, ভক্তিমানেরা আর-এক ভাবে করে। বুদ্ধিমান্ মনে করে, পূজা করিয়া ভগবানের কাছ হইতে সদ্গতি আদায় করিয়া লইব, আর ভক্তিমান্ বলে, পূজা না করিলে আমার ভক্তির পূর্ণতা হয়

না—ইহার আর কোনো ফল নাই থাকুক্, হৃদয়ের ভক্তিকে বাহিরে স্থান দিয়া তাহাকেই পূরা আশ্রয় দেওয়া হইল। এইরূপে ভক্তি পূজার মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করিয়া নিজেকেই সার্থক করে। বুদ্ধিমানের পূজা সুদে টাকা খাটানো—ভক্তিমানের পূজা একেবারেই বাজে-খরচ। হৃদয় আপনাকে প্রকাশ করিতে গিয়া লোকসানকে একেবারে গণ্যই করে না।

বিশ্বজগতের মধ্যেও যেখানে আমরা আমাদের হৃদয়ের এই ধর্ম্মটি দেখি, সেখানেই আমাদের হৃদয় আপনিই আপনাকে ধরা দিয়া বসে, কোনো কথাটি জিজ্ঞাসা করে না। জগতের মধ্যে এই বেহিসাবী বাজে-খরচের দিক্‌টা সৌন্দর্য্য। যখন দেখি, ফুল কেবলমাত্র বীজ হইয়া উঠিবার জন্যই তাড়া লাগাইতেছে না, নিজের সমস্ত প্রয়োজনকে ছাপাইয়া সুন্দর হইয়া ফুটিতেছে; মেঘ কেবল জল ঝরাইয়া কাজ সারিয়া তাড়াতাড়ি ছুটি লইতেছে না, রহিয়া-বসিয়া বিনা প্রয়োজনে রঙের ছটায় আমাদের চোখ কাড়িয়া লইতেছে; গাছগুলা কেবল কাঠি হইয়া শীর্ণ কাঙালের মত বৃষ্টি ও আলোকের জন্য হাত বাড়াইয়া নাই, সবুজ শোভার পুঞ্জ পুঞ্জ ঐশ্বর্য্যে দিগ্বধূদের ডালি ভরিয়া দিতেছে; যখন দেখি, সমুদ্র যে কেবল জলকে মেঘরূপে পৃথিবীর চারিদিকে প্রচার করিয়া দিবার একটা মস্ত আপিস্, তাহা নহে, সে আপনার তরল নীলিমার অতলস্পর্শ ভয়ের দ্বারা ভীষণ; এবং পর্ব্বত কেবল ধরাতলে নদীর জল জোগাইয়াই ক্ষান্ত নহে, সে যোগনিমগ্ন রুদ্রের মত ভয়ঙ্করকে আকাশ জুড়িয়া নিস্তব্ধ করিয়া রাখিয়াছে; তখন জগতের মধ্যে আমরা হৃদয়ধর্ম্মের পরিচয় পাই। তখন চিরপ্রবীণ বুদ্ধি মাথা নাড়িয়া প্রশ্ন করে, জগৎ জুড়িয়া এত অনাবশ্যক চেষ্টার বাজে-খরচ কেন? চিরনবীন হৃদয় বলে, কেবলমাত্র আমাকে ভুলাইবার জন্যই—আর ত কোনো কারণ দেখি না। হৃদয়ই জানে, জগতের মধ্যে একটি হৃদয় কেবলই আপনাকে প্রকাশ করিতেছে। নহিলে সৃষ্টির মধ্যে এত রূপ, এত গান; এত হাবভাব, এত আভাস-ইঙ্গিত, এত সাজসজ্জা কেন? হৃদয় যে ব্যবসাদারীর কৃপণতায় ভোলে না, সেইজন্যই তাহাকে ভুলাইতে জলে-স্থলে-আকাশে পদে-পদে প্রয়োজনকে গোপন করিয়া এত অনাবশ্যক আয়োজন। জগৎ যদি রসময় না হইত, তবে আমরা নিতান্তই ছোট হইয়া অপমানিত হইয়া থাকিতাম; আমাদের হৃদয় কেবলি বলিত, জগতের যজ্ঞে আমারই নিমন্ত্রণ নাই। কিন্তু সমস্ত জগৎ তাহার অসংখ্য কাজের মধ্যেও রসে ভরিয়া-উঠিয়া হৃদয়কে এই মধুর কথাটি বলিতেছে যে, আমি তোমাকে চাই। নানারকম করিয়া চাই; হাসিতে চাই, কান্নাতে চাই; ভয়ে চাই, ভরসায় চাই; ক্ষোভে চাই, শান্তিতে চাই।

এম্‌নি জগতের মধ্যেও আমরা দুটা ব্যাপার দেখিতেছি—একটা কাজের প্রকাশ, একটা ভাবের প্রকাশ। কিন্তু কাজের ভিতর দিয়া যাহা প্রকাশ হইতেছে, তাহাকে সমগ্ররূপে দেখা ও বোঝা আমাদের কর্ম্ম নয়। ইহার মধ্যে যে অমেয় জ্ঞানশক্তি আছে, আমাদের জ্ঞান দিয়া তাহার কিনারা পাওয়া যায় না।

কিন্তু ভাবের প্রকাশ একেবারে প্রত্যক্ষ-প্রকাশ। সুন্দর যাহা, তাহা সুন্দর। বিরাট্ যাহা, তাহা মহান্। রুদ্র যাহা, তাহা ভয়ঙ্কর। জগতের যাহা রস, তাহা একেবারে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে এবং আমাদের হৃদয়ের রসকে বাহিরে টানিয়া আনিতেছে। এই মিলনের মধ্যে লুকোচুরি যতই থাক্, বাধাবিঘ্ন যতই ঘটুক্, তবু প্রকাশ ছাড়া এবং মিলন ছাড়া ইহার মধ্যে আর কিছুই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

তবেই দেখিতেছি, জগৎসংসারে ও মানব-সংসারে একটা সাদৃশ্য আছে। ঈশ্বরের সত্যরূপ-জ্ঞানরূপ জগতের নানা কাজে প্রকাশ পাইতেছে, আর তাঁহার আনন্দরূপ জগতের নানা রসে প্রত্যক্ষ হইতেছে। কাজের মধ্যে তাঁহার জ্ঞানকে আয়ত্ত করা শক্ত—রসের মধ্যে তাঁহার আনন্দকে অনুভব করায় জটিলতা নাই। কারণ, রসের মধ্যে তিনি যে নিজেকে প্রকাশই করিতেছেন।

মানুষের সংসারেও আমাদের জ্ঞানশক্তি কাজ করিতেছে, আমাদের আনন্দশক্তি রসের সৃষ্টি করিয়া চলিতেছে। কাজের মধ্যে আমাদের আত্মরক্ষার শক্তি, আর রসের মধ্যে আমাদের আত্মপ্রকাশের শক্তি। আত্ম-রক্ষা আমাদের পক্ষে প্রয়োজনীয়, আর আত্মপ্রকাশ আমাদের প্রয়োজনের বেশি।

প্রয়োজনে প্রকাশকে এবং প্রকাশে প্রয়োজনকে বাধা দেয়, যুদ্ধের উদাহরণে তাহা দেখাইয়াছি। স্বার্থ বাজে-খরচ করিতে চায় না, অথচ বাজে-খরচেই আনন্দ আত্মপরিচয় দেয়। এইজন্যই স্বার্থের ক্ষেত্রে, আপিসে আমাদের আত্মপ্রকাশ যতই অল্প হয়, ততই তাহা শ্রদ্ধেয় হইয়া থাকে, এবং এইজন্যই আনন্দের উৎসবে স্বার্থকে যতই বিস্মৃত হইতে দেখি, উৎসব ততই উজ্জ্বল হইতে থাকে।

তাই সাহিত্যে মানুষের আত্মপ্রকাশে কোনো বাধা নাই। স্বার্থ সেখান হইতে দূরে। দুঃখ সেখানে আমাদের হৃদয়ের উপর চোখের জলের বাষ্প সৃজন করে, কিন্তু আমাদের সংসারের উপর হস্তক্ষেপ করে না; ভয় আমাদের হৃদয়কে দোলা দিতে থাকে, কিন্তু আমাদের শরীরকে আঘাত করে না; সুখ আমাদের হৃদয়ে পুলকস্পর্শ সঞ্চার করে, কিন্তু আমাদের লোভকে নাড়া দিয়া অত্যন্ত জাগাইয়া তোলে না। এইরূপে মানুষ আপনার প্রয়োজনের সংসারের ঠিক পাশে-পাশেই একটা প্রয়োজন-ছাড়া সাহিত্যের সংসার রচনা করিয়া চলিয়াছে। সেখানে সে নিজের বাস্তব কোনো ক্ষতি না করিয়া নানা রসের দ্বারা আপনার প্রকৃতিকে নানারূপে অনুভব করিবার আনন্দ পায়,—আপনার প্রকাশকে বাধাহীন করিয়া দেখে। সেখানে দায় নাই, সেখানে খুসি। সেখানে পেয়াদা-বরকন্দাজ নাই, সেখানে স্বয়ং মহারাজা।

এইজন্য সাহিত্যে আমরা কিসের পরিচয় পাই? না, মানুষের যাহা প্রাচুর্য্য, যাহা ঐশ্বর্য্য, যাহা তাহার সমস্ত প্রয়োজনকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে। যাহা তাহার সংসারের মধ্যেই ফুরাইয়া যাইতে পারে নাই।

এইজন্যই, ইতিমধ্যে আমার একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছি, ভোজনরস যদি-চ পৃথিবীতে ছোট ছেলে হইতে বুড়া পর্য্যন্ত সকলেরই কাছে সুপরিচিত, তবু সাহিত্যে তাহা প্রহসন ছাড়া অন্যত্র তেমন করিয়া স্থান পায় নাই। কারণ,

সে রস আহারের তৃপ্তিকে ছাপাইয়া উছলিয়া উঠে না। পেটটি পূরাইয়া একটি জলদগম্ভীর "আঃ—" বলিয়াই তাহাকে হাতে-হাতেই নগদ-বিদায় করিয়া দিই। সাহিত্যের রাজ-দ্বারে তাহাকে দক্ষিণার জন্য নিমন্ত্রণপত্র দিই না। কিন্তু যাহা আমাদের ভাঁড়ারঘরের ভাঁড়ের মধ্যে কিছুতেই কুলায় না, সেই সকল রসের বন্যাই সাহিত্যের মধ্যে ঢেউ তুলিয়া কলধ্বনি করিতে করিতে বহিয়া যায়। মানুষ তাহাকে কাজের মধ্যেই নিঃশেষ করিয়া দিতে পারে না বলিয়াই ভরা-হৃদয়ের বেগে সাহিত্যের মধ্যে তাহাকে প্রকাশ করিয়া তবে বাঁচে।

এইরূপ প্রাচুর্য্যেই মানুষের যথার্থ প্রকাশ। মানুষ যে ভোজনপ্রিয়, তাহা সত্য বটে, কিন্তু মানুষ যে বীর, ইহাই সত্যতম। মানুষের এই সত্যের জোর সাম্‌লাইবে কে? তাহা ভাগীরথীর মত পাথর গুঁড়াইয়া, ঐরাবতকে ভাসাইয়া, গ্রাম-নগর-শস্যক্ষেত্রের তৃষ্ণা মিটাইয়া একেবারে সমুদ্রে গিয়া পড়িয়াছে। মানুষের বীরত্ব মানুষের সংসারের সমস্ত কাজ সারিয়া-দিয়া সংসারকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে।

এম্‌নি করিয়া স্বভাবতই মানুষের যাহা-কিছু বড়, যাহা-কিছু নিত্য, যাহা সে কাজে-কর্ম্মে ফুরাইয়া ফেলিতে পারে না, তাহাই মানুষের সাহিত্যে ধরা পড়িয়া আপনা-আপনি মানুষের বিরাট্‌রূপকেই গড়িয়া তুলে।

আরো একটি কারণ আছে। সংসারে যাহাকে আমরা দেখি, তাহাকে ছড়াইয়া দেখি —তাহাকে এখন একটু তখন একটু, এখানে একটু সেখানে একটু দেখি—তাহাকে আরো দশটার সঙ্গে মিশাইয়া দেখি। কিন্তু সাহিত্যে সেই সকল ফাঁক, সেই সকল মিশাল থাকে না। সেখানে যাহাকে প্রকাশ করা হয়, তাহার উপরেই সমস্ত আলো ফেলা হয়। তখনকার মত আর-কিছুকেই দেখিতে দেওয়া হয় না। তাহার জন্য নানা কৌশলে এমন একটি স্থান তৈরি করিয়া দেওয়া হয়, যেখানে সে-ই কেবল দীপ্যমান।

এমন অবস্থায় এমন জমাট স্বাতন্ত্র্যে, এমন প্রখর আলোকে যাহাকে মানাইবে না, তাহাকে আমরা স্বভাবতই এ জায়গায় দাঁড় করাই না। কারণ, এমন স্থানে অযোগ্যকে দাঁড় করাইলে তাহাকে লজ্জিত করা হয়। সংসারের নানা আচ্ছাদনের মধ্যে পেটুক তেমন করিয়া চোখে পড়ে না —কিন্তু সাহিত্য-মঞ্চের উপর তাহাকে একাগ্র আলোকে ধরিয়া দেখাইলে সে হাস্যকর হইয়া উঠে। এইজন্য মানুষের যে প্রকাশটি তুচ্ছ নয়— মানবহৃদয় যাহাকে করুণায় বা বীর্য্যে, রুদ্রতায় বা শান্তিতে আপনার উপযুক্ত প্রতিনিধি বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত না হয়, যাহা কলানৈপুণ্যের বেষ্টনীর মধ্যে দাঁড়াইয়া নিত্যকালের অনিমেষ দৃষ্টিপাত মাথা তুলিয়া সহ্য করিতে পারে, স্বভাবতই মানুষ তাহাকেই সাহিত্যে স্থান দেয়; নহিলে তাহার অসঙ্গতি আমাদের কাছে পীড়াজনক হইয়া উঠে। রাজা ছাড়া আর কাহাকেও সিংহাসনের উপর দেখিলে আমাদের মনে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়।

কিন্তু সকল মানুষের বিচারবুদ্ধি বড় নয়, সকল সমাজও বড় নয়, এবং একএকটা সময় আসে, যখন ক্ষণিক ও ক্ষুদ্র মোহে মানুষকে ছোট করিয়া দেয়। তখন সেই দুঃসময়ের

বিকৃত দর্পণে ছোট জিনিষ বড় হইয়া দেখা দেয় এবং তখনকার সাহিত্যে মানুষ আপনার ছোটকেই বড় করিয়া তোলে—আপনার কলঙ্কের উপরেই স্পর্দ্ধার সঙ্গে আলো ফেলে। তখন কলার বদলে কৌশল, গৌরবের জায়গায় গর্ব্ব এবং টেনিসনের আসনে কিপ্লিঙের আবির্ভাব হয়।

কিন্তু মহাকাল বসিয়া আছেন। তিনি ত সমস্তই ছাঁকিয়া লইবেন। তাঁহার চালুনির মধ্য দিয়া যাহা ছোট, যাহা জীর্ণ, তাহা গলিয়া ধূলায় পড়িয়া ধূলা হইয়া যায়। নানা কাল ও নানা লোকের হাতে সেই সকল জিনিষই টেঁকে,—যাহার মধ্যে সকল মানুষই আপনাকে দেখিতে পায়। এম্‌নি করিয়া বাছাই হইয়া যাহা থাকিয়া যায়, তাহা মানুষের সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের ধন।

এম্‌নি করিয়া ভাঙিয়া গড়িয়া সাহিত্যের মধ্যে মানুষের প্রকৃতির, মানুষের প্রকাশের একটি নিত্যকালীন আদর্শ আপনি সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে। সেই আদর্শই নূতন যুগের সাহিত্যেরও হাল ধরিয়া থাকে। সেই আদর্শমতই যদি আমরা সাহিত্যের বিচার করি, তবে সমগ্র মানবের বিচারবুদ্ধির সাহায্য লওয়া হয়।

এইবার আমার আসল কথাটি বলিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে; সেটি এই—সাহিত্যকে দেশকালপাত্রে ছোট করিয়া দেখিলে ঠিকমত দেখাই হয় না। আমরা যদি এইটে বুঝি যে, সাহিত্যে বিশ্বমানবই আপনাকে প্রকাশ করিতেছে, তবে সাহিত্যের মধ্যে আমাদের যাহা দেখিবার, তাহা দেখিতে পাইব। যেখানে সাহিত্যরচনায় লেখক উপলক্ষ্যমাত্র না হইয়াছে, সেখানে তাহার লেখা নষ্ট হইয়া গেছে। যেখানে লেখক নিজের ভাবনায় সমগ্র মানুষের ভাব অনুভব করিয়াছে, নিজের লেখায় সমগ্র মানুষের বেদনা প্রকাশ করিয়াছে, সেইখানেই তাহার লেখা সাহিত্যে জায়গা পাইয়াছে। তবেই সাহিত্যকে এইভাবে দেখিতে হইবে যে, বিশ্বমানব রাজমিস্ত্রি হইয়া এই মন্দিরটি গড়িয়া তুলিতেছেন; লেখকেরা নানা দেশ ও নানা কাল হইতে আসিয়া তাহার মজুরের কাজ করিতেছে। সমস্ত ইমারতের প্ল্যান্‌টা কি, তাহা আমাদের কারো সাম্‌নে নাই বটে, কিন্তু যেটুকু ভুল হয়, সেটুকু বারবার ভাঙা পড়ে;—প্রত্যেক মজুরকে তাহার নিজের স্বাভাবিক ক্ষমতা খাটাইয়া নিজের রচনাটুকুকে সমগ্রের সঙ্গে খাপ্ খাওয়াইয়া সেই অদৃশ্য প্ল্যানের সঙ্গে মিলাইয়া যাইতে হয়; ইহাতেই তাহার ক্ষমতা প্রকাশ পায় এবং এইজন্যই তাহাকে সাধারণ মজুরের মত কেহ সামান্য বেতন দেয় না, তাঁহাকে ওস্তাদের মত সম্মান করিয়া থাকে।

আমার উপরে যে আলোচনার ভার দেওয়া হইয়াছে, ইংরেজিতে আপনারা তাহাকে Comparative Literature নাম দিয়াছেন। বাংলায় আমি তাহাকে বিশ্বসাহিত্য বলিব।

কর্ম্মের মধ্যে মানুষ কোন্ কথা বলিতেছে? তাহার লক্ষ্য কি, তাহার চেষ্টা কি, ইহা যদি বুঝিতে হয়, তবে সমগ্র ইতিহাসের মধ্যে মানুষের অভিপ্রায়ের অনুসরণ করিতে হয়—আকবরের রাজত্ব বা গুজরাটের ইতিবৃত্ত বা এলিজাবেথের চরিত্র, এমন করিয়া আলাদা-আলাদা দেখিলে কেবল খবর-জানার কৌতূহলনিবৃত্তি হয় মাত্র। যে জানে, আক-

বর বা এলিজাবেথ উপলক্ষ্যমাত্র; যে জানে, মানুষ সমস্ত ইতিহাসের মধ্য দিয়া নিজের গভীরতম অভিপ্রায়কে নানা সাধনায়, নানা ভুল ও নানা সংশোধনে সিদ্ধ করিবার জন্য কেবলি চেষ্টা করিতেছে; যে জানে, মানুষ সকল দিকেই সকলের সহিত বৃহৎভাবে যুক্ত হইয়া নিজেকে মুক্তি দিবার প্রয়াস পাইতেছে; যে জানে, স্বতন্ত্র, নিজেকে রাজতন্ত্রে ও রাজতন্ত্র হইতে গণতন্ত্রে সার্থক করিবার জন্য যুঝিয়া মরিতেছে;—মানব বিশ্বমানবের মধ্যে আপনাকে ব্যক্ত করিবার জন্য; ব্যষ্টি, সমষ্টির মধ্যে আপনাকে উপলব্ধি করিবার জন্য নিজেকে লইয়া কেবলি ভাঙাগড়া করিতেছে; সে ব্যক্তি মানুষের ইতিহাস হইতে, লোকবিশেষকে নহে, সেই নিত্য-মানুষের নিত্যসচেষ্ট অভিপ্রায়কে দেখিবারই চেষ্টা করে। সে কেবল তীর্থের যাত্রীদের দেখিয়াই ফিরিয়া আসে না—সমস্ত যাত্রীরা যে একমাত্র দেবতাকে দেখিবার জন্য নানাদিক্ হইতে আসিতেছে, তাঁহাকে দর্শন করিয়া তবে সে ঘরে ফেরে।

তেম্নি সাহিত্যের মধ্যে মানুষ আপনার আনন্দকে কেমন করিয়া প্রকাশ করিতেছে, এই প্রকাশের বিচিত্রমূর্ত্তির মধ্যে মানুষের আত্মা আপনার কোন্ নিত্যরূপ দেখাইতে চায়, তাহাই বিশ্বসাহিত্যের মধ্যে যথার্থ দেখিবার জিনিষ। সে আপনাকে রোগী, না ভোগী, না যোগী, কোন্ পরিচয়ে পরিচিত করিতে আনন্দবোধ করিতেছে; জগতের মধ্যে মানুষের আত্মীয়তা কতদূর পর্য্যন্ত সত্য হইয়া উঠিল, অর্থাৎ সত্য কতদূর পর্য্যন্ত তাহার আপনার হইয়া উঠিল, ইহাই জানিবার জন্য এই সাহিত্যের জগতে প্রবেশ করিতে হইবে। ইহাকে কৃত্রিম রচনা বলিয়া জানিলে হইবে না; ইহা একটি জগৎ; ইহার তত্ত্ব আমাদের কোনো ব্যক্তিবিশেষের আয়ত্তাধীন নহে; বস্তুজগতের মত ইহার সৃষ্টি চলিয়াছেই; অথচ সেই অসমাপ্ত সৃষ্টির অন্তরতম স্থানে একটি সমাপ্তির আদর্শ অচল হইয়া আছে।

সূর্য্যের ভিতরের দিকে বস্তুপিণ্ড আপনাকে তরল-কঠিন নানা ভাবে গড়িতেছে, সে আমরা দেখিতে পাই না—কিন্তু তাহাকে ঘিরিয়া আলোকের মণ্ডল সেই সূর্য্যকে কেবলি বিশ্বের কাছে ব্যক্ত করিয়া দিতেছে। এইখানেই সে আপনাকে কেবলি দান করিতেছে, সকলের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করিতেছে। মানুষকে যদি আমরা সমগ্রভাবে এম্নি করিয়া দৃষ্টির বিষয় করিতে পারিতাম, তবে তাহাকে এইরূপ সূর্য্যের মতই দেখিতাম। দেখিতাম, তাহার বস্তুপিণ্ড ভিতরে-ভিতরে ধীরে-ধীরে নানা স্তরে বিন্যস্ত হইয়া উঠিতেছে; আর তাহাকে ঘিরিয়া একটি প্রকাশের জ্যোতির্ম্মণ্ডলী নিয়তই আপনাকে চারিদিকে বিকীর্ণ করিয়াই আনন্দ পাইতেছে। সাহিত্যকে মানুষের চারিদিকে সেই ভাষা-রচিত প্রকাশমণ্ডলীরূপে একবার দেখ। এখানে জ্যোতির ঝড় বহিতেছে, জ্যোতির উৎস উঠিতেছে, জ্যোতির্বাষ্পের সংঘাত ঘটিতেছে।

লোকালয়ের পথ দিয়া চলিতে চলিতে যখন দেখিতে পাও, মানুষের অবকাশ নাই; মুদী দোকান চালাইতেছে; কামার লোহা পিটিতেছে; মজুর বোঝা লইয়া চলিয়াছে; বিষয়ী আপনার খাতার হিসাব মিলাইতেছে;

সেই সঙ্গে আর-একটা জিনিষ চোখে দেখিতে পাইতেছ না, কিন্তু একবার মনে মনে দেখ ;—এই রাস্তার দুই ধারে ঘরে-ঘরে দোকানে-বাজারে অলিতে-গলিতে কত শাখায়-প্রশাখায় রসের ধারা কত পথ দিয়া কত মলিনতা, কত সঙ্কীর্ণতা, কত দারিদ্র্যের উপরে কেবলি আপনাকে প্রসারিত করিয়া দিতেছে; রামায়ণ-মহাভারত, কথা-কাহিনী, কীর্ত্তন-পাঁচালি বিশ্বমানবের হৃদয়সুধাকে প্রত্যেক মানবের কাছে দিনরাত বাঁটিয়া দিতেছে; নিতান্ত তুচ্ছলোকের ক্ষুদ্র কাজের পিছনে রামলক্ষ্মণ আসিয়া দাঁড়াইতেছেন; অন্ধকার বাসার মধ্যে পঞ্চবটীর করুণামিশ্রিত হাওয়া বহিতেছে; মানুষের হৃদয়ের সৃষ্টি, হৃদয়ের প্রকাশ মানুষের কর্ম্মক্ষেত্রের কাঠিন্য ও দারিদ্র্যকে তাহার সৌন্দর্য্য ও মঙ্গলের কঙ্কণ-পরা দুটি হাত দিয়া বেড়িয়া রহিয়াছে। সমস্ত সাহিত্যকে সমস্ত মানুষের চারিদিকে একবার এম্‌নি করিয়া দেখিতে হইবে। দেখিতে হইবে, মানুষ আপনার বাস্তবসত্তাকে ভাবের সত্তায় নিজের চতুর্দ্দিকে আরো অনেকদূর পর্য্যন্ত বাড়াইয়া লইয়া গেছে। তাহার বর্ষার চারদিকে কত গানের বর্ষা, কাব্যের বর্ষা, কত মেঘদূত, কত বিদ্যাপতি বিস্তীর্ণ হইয়া আছে; তাহার ছোট ঘরটির সুখদুঃখকে সে কত চন্দ্রসূর্য্যবংশীয় রাজাদের সুখদুঃখের কাহিনীর মধ্যে বড় করিয়া তুলিয়াছে; তাহার ঘরের মেয়েটিকে ঘিরিয়া গিরিরাজকন্যার করুণা সর্ব্বদা সঞ্চরণ করিতেছে; কৈলাসের দরিদ্রদেবতার মহিমার মধ্যে সে আপনার দারিদ্র্যদুঃখকে প্রসারিত করিয়া দিয়াছে; এইরূপে অনবরত মানুষ আপনার চারিদিকে যে বিকিরণ সৃষ্টি করিতেছে, তাহাতে বাহিরে যেন নিজেকে নিজে ছাড়াইয়া নিজেকে নিজে বাড়াইয়া চলিতেছে। যে মানুষ অবস্থার দ্বারা সঙ্কীর্ণ, সেই মানুষ নিজের ভাবসৃষ্টিদ্বারা নিজের এই যে বিস্তার রচনা করিতেছে, সংসারের চারিদিকে যাহা একটি দ্বিতীয় সংসার, তাহাই সাহিত্য।

এই বিশ্বসাহিত্যে আমি আপনাদের পথ-প্রদর্শক হইব, এমন কথা মনেও করিবেন না। নিজের নিজের সাধ্য অনুসারে এ পথ আমাদের সকলকে কাটিয়া চলিতে হইবে। আমি কেবল এইটুকু বলিতে চাহিয়াছিলাম যে, পৃথিবী যেমন আমার ক্ষেত এবং তোমার ক্ষেত এবং তাঁহার ক্ষেত নহে; পৃথিবীকে তেমন করিয়া জানা অত্যন্ত গ্রাম্য-ভাবে জানা—তেম্‌নি সাহিত্য আমার রচনা, তোমার রচনা এবং তাঁহার রচনা নহে; আমরা সাধারণত সাহিত্যকে এম্‌নি করিয়াই গ্রাম্যভাবেই দেখিয়া থাকি। সেই গ্রাম্য সঙ্কীর্ণতা হইতে নিজেকে মুক্তি দিয়া বিশ্ব-সাহিত্যের মধ্যে বিশ্বমানবকে দেখিবার লক্ষ্য আমরা স্থির করিব—প্রত্যেক লেখকের রচনার মধ্যে একটি সমগ্রতাকে গ্রহণ করিব, এবং সেই সমগ্রতার মধ্যে সমস্ত মানুষের প্রকাশচেষ্টার সম্বন্ধ দেখিব, এই সঙ্কল্প স্থির করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।*

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

* জাতীয় শিক্ষাপরিষদে পঠিত।

মৃত্যু।

আচার্য্য বসুর আবিষ্কার।

"মৃত্যু"—কোন লোকেরই এ কথাটির যথার্থ অর্থবোধ নাই, তবুও কে জানে, শুনিলে কেন মনে এত ভয় আসে। একজন মহাবিজ্ঞ ভাবুক লিখে গেছেন—"যেমন ছেলেরা অন্ধকারে যাইতে স্বভাবতই ভয় পায়, মানুষের মৃত্যুভয়ও সেইরূপ।" কিন্তু আমার তা মনে হয় না। অন্ধকারে ভাবি-বিপদ্-আশঙ্কার যে ভয় হয়, সে ভয় এখানে তত নাই। প্রিয়জন ও প্রিয়বস্তু হইতে বিচ্ছিন্ন হইতেছি, এই ভয়ই এস্থলে আসল বলিয়া মনে হয়।

এই বিষম অবস্থাটির তত্ত্বজিজ্ঞাসা সকলের মনেই একদিন-না-একদিন উঠিয়াছে। আমার নিজের কথা তো অতি শিশু-অবস্থাতেই মনে পড়ে। যখন আমার জানিত একটি ছেলে মারা যাওয়াতে তা'র মা কাতর হ'য়ে কাঁদ্‌ছিলেন,—কি যে হইল, তা বিশেষ কিছু উপলব্ধি করিতে না পারিয়াও মনে হচ্ছিল, যে গিয়াছে, সে আর আসিবে না।

কোথায় ও কি-ভাবে সে থাকবে, তা তখনও মীমাংসা করি নাই। থাকিবে, এ ধ্রুবসত্য বলিয়া জানা ছিল। পরে যখন পরলোক ভূতপ্রেত ইত্যাদির কথা শিখিলাম, তখন যে সে সেইরূপ কোনও অবস্থাতেই থাকিবে—এই সংস্কারই ছিল, কখনও কোন সন্দেহ আসে নাই।

ক্রমে শিখিলাম, কর্ম্মফলে পরলোকে সুখ ও দুঃখ, সদ্গতি ও অধোগতি হয়।—স্বর্গ ও নরকের কথা। পরলোকে মিলনের কথা। —আরও কল্পনাপ্রসূত কত কথা—যাহা এখন আর ভাবিয়া দেখিলে তত মনে লাগে না।

আমার মনের ধারণাগুলি ক্রমে ক্রমে স্তরে স্তরে যেমন বদ্‌লাইয়াছে—সকলেরই এক-সময়-না একসময় তেম্‌নি হইয়া থাকে—সমগ্র মানব জাতিরও তাহাই হইয়াছে।

এইরূপ সাধারণ কথায় একেবারে বিশ্বস্ত না হইয়া—মানব যে এই সকল জ্ঞানের আরও উচ্চ সোপানে উঠিতে প্রয়াসী হইয়াছেন সেই প্রয়াসেরই একটু ইতিবৃত্ত এখানে দিতেছি। এ প্রবন্ধে পুরাণ মতের কিছু আলোচনা করিয়া আজকাল নূতন প্রবর্ত্তিত মতের কিছু আভাস দিব।

এক সম্প্রদায়ের বিশ্বাস, খাঁচায় যেমন পাখী থাকে, দেহে তেম্‌নি আত্মার অধিষ্ঠান—মৃত্যুকালে আত্মা দেহ ছাড়িয়া স্থানান্তরে উড়িয়া যায়। দেহটি জড় অবস্থায় পতিত থাকে ও ধ্বংস হয়, কিন্তু অমর আত্মা স্থানান্তরে বিদ্যমান থাকেন।

আর এক সম্প্রদায়ের বিশ্বাস, এঞ্জিন্ যেমন ঠিক্ থাকিলেই তবে তাহার কার্য্য চলে, বিকল হইলে তাহার সকল কার্য্য

থামিয়া যায় -দেহ বিকল হইলেও আত্মার অবস্থা সেইরূপ হইয়া থাকে। তাহারও অস্তিত্ব সঙ্গে সঙ্গেই লোপ পায়।

শেষোক্ত মতটি সচরাচর বিশ্বাস হয় না, এমন কি, মনে আনিতেও কষ্ট হয়। সে বিগত অস্তিত্বের স্মৃতিটুকু যে তখনও আমাদের মনে জাগিয়া থাকে।—দেহরূপ তাহার আধুনিক আধার খসিয়া গেলেও তাহাকে এক অজানা অনিশ্চিত স্থানে রাখিয়া আমরা আশ্বস্ত থাকি। স্মৃতিলোপ সম্ভব নয়, তেমনি আত্মালোপও অসম্ভব। সেই কারণেই পরে দেহান্তরে বিশ্বাস আসিল। আত্মা জন্মের পর জন্ম পরিগ্রহ করিয়া চলিয়া যান। কর্ম্ম অনুসারে ভালমন্দ জন্ম লইয়া অমর আত্মা অনন্তপথে চলিতে থাকেন।

যেমন স্মৃতিটুকু অনিবার্য্য, তেমনি "অনন্ত" কথাটিও অনমুমেয়। তারও অবসান চাই। সুতরাং "নির্ব্বাণ", "পরব্রহ্মেলীন" ইত্যাদি বিশ্বাস আপনিই আসিয়া পড়ে। সবই বিশ্বাস, সবই মনের ভাব, সবই শিক্ষারই রূপান্তর। দেখাইয়া বুঝাইবার, এর মধ্যে কিছুই নাই।

তবে এটুকুমাত্র দেখান যায়। যখন একটি কোষ ভাগ হইয়া দুটি হয়, তখন কোষটির অস্তিত্ব এক হিসাবে লীন হইল—Reproduction by "fission"। কিন্তু তাহারই দেহসমষ্টি লইয়া—নূতন দুটি কোষের অস্তিত্ব। কেহই মরিল না, কিছুই বাদ গেল না, বা মৃতদেহের মত অপচয় হইল না। কিন্তু এটি ছাড়াও একটি কোষ হইতে কোষের সংখ্যাবৃদ্ধি হওয়ায় আরও কয়টি প্রণালী আছে। ইহার মধ্যে একটিতে—প্রথম কোষের গা হইতে একটি ক্ষুদ্র অংশ খসিয়া পড়ে, Reproduction by "budding" পরে আরএকটি ও আবার একটি, এইরূপ হইয়া এই প্রতি ক্ষুদ্র অংশগুলি আবার আয়তনে বৃদ্ধি পাইয়া প্রথম কোষটির আকৃতি পায় ও সেইরূপই ব্যবহার করিতে থাকে। কিন্তু প্রথম কোষটি যদিও মোটের উপর বজায় থাকে বটে তবু বারবার সন্তান-উৎপাদনের ক্লান্তিতে ক্রমে নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়ে।—এইখানে মৃত্যু আসিল। জীবন্ত দেহের পরিশিষ্ট খানিকটা এখানে লোকসান হইল। প্রথমটিতে মাতার অস্তিত্ব কন্যাদ্বয়ে বিলীন হয়—দ্বিতীয়টিতে কিন্তু তা ছাড়াও এক অংশ জীব হইতে জড়ে পরিণত হয়। মৃত্যুর পর অস্তিত্বের এই সকল ছাড়া আর কিছুই ইন্দ্রিয়গোচর নহে।

এই গেল এক কোষবিশিষ্ট জীবদেহের কথা। পক্ষী, গো, মানুষ প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর জীবের দেহ বহু কোষে গঠিত। তার পক্ষেও এ নিয়ম সমান। কতক অংশ অপত্যরূপে থাকিয়া যায়—অপর অংশ মৃতদেহে পরিণত হয়। কিন্তু এতক্ষণ দেহের এই শেষোক্ত অংশটুকুকে যে শক্তিতে সজীব রাখিয়াছিল, সেই শক্তি গেল কোথায়। সে শক্তিটুকুর আর বিকাশ নাই কেন—ডাকলে সে সাড়া আর পাওয়া যায় না কেন—তার, কি বিশেষত্ব হইয়াছে ?

এই প্রশ্ন অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে, যদিও সমগ্র দেহটির সাড়া দিবার শক্তি নাই, দেহের সজীব পরমাণু বা কোষগুলি এখনও সায় দেয়, এখনও সজীব আছে। প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গিয়াছে—তবুও

দেখা যায়, সদ্যোমৃত দেহের অন্ত্র সকল সচল ও খাদ্যহজমে রত। তড়িৎপ্রবাহ দিলে তখনও মাংসপেশী সঙ্কুচিত হয়। ক্রমে সমস্ত দেহের সর্ব্বাংশের সামঞ্জস্য অভাবে সে ক্ষমতাও ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া থাকে। কোষগুলি সবই মরিয়া যায় ও আপরমাণু দেহটি জড় হইয়া পড়ে।

অতএব দেখা গেল, সমস্ত দেহের জীবন যখন বাহির হইয়া গেছে—তাঁর পরমাণুগুলি তখনও মরে নাই। যাদের লইয়া তার জীবন, তারা অনেকে সশরীরে এখনও বিদ্যমান। তবে সে দেহ ছাড়িয়া তখনি-তখনি পৃথক্ এক আত্মা যাবে কোথা।

শুনেছিলাম, এইরূপ অবস্থায় অন্ধকার ঘরে মৃতদেহের ফটো তুলিলে এক অদৃশ্য রশ্মি actinic rays. সম্ভূত তাহার প্রস্থানশীল সূক্ষ্মশরীরের ছবি পাওয়া যায়। সিনেট্ সাহেব "পাইওনিয়র" কাগজের সম্পাদক ছিলেন—তিনি এই সকল ভৌতিক ব্যাপারের আলোচনা করিয়া "Spirit Photography" অর্থাৎ আত্মার ফটোগ্রাফ লওয়ার সম্বন্ধে একখানি বই লিখিয়াছেন। এই সকল মহৎ তত্ত্ব প্রমাণ করিয়া দিতে পারেন, এইরূপ উপযুক্তবোধে কিন্তু যাঁর কাছে গিয়াছি—নিরাশ হইয়া ফিরিতে হইয়াছে। Spirit invoke বা 'ভূতনাবান-ব্যাপারও এইরূপ। এ দুরূহ বিষয় মীমাংসার জন্য লোকের কাছ হ'তে কত আশার কথা শুনা যায়, কিন্তু কিছুই এ পর্য্যন্ত শেষ অবধি টিকে নাই।

তাই নিরাশ হইয়া এ পথে আসিয়া খুঁজিয়াছি।

এ পথটি কি? সেই অতি বিস্ময়কর জীবনমৃত্যু বিষয়েরই আলোচনা। কিন্তু ভিন্ন প্রকারে আলোচিত। যে সকল প্রমাণ চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের গোচর ও অকাট্য এবং যাহা দেখিলে বা শুনিলে সহজেই বুঝা যায়।—ডাক্তার বসুর "উদ্ভিদের সাড়া" নামক পুস্তকে এ বিষয়ের বিশেষ আলোচনা আছে।

সাড়া পাওয়াই জীবনের প্রধান লক্ষণ। এখানে "সাড়া" মানে শব্দ করিয়া সাড়া জ্ঞাপন করা নহে। নড়িয়া বা সঙ্কুচিত হইয়া, বা তড়িৎপ্রবাহ ছুটাইয়া পরিবর্ত্তন জ্ঞাপন করা। যখন শত ডাকেও সাড়া পাওয়া যায় না তখনই বুঝিতে হইবে জীবনের অবসান হইয়াছে। এই সাড়া জ্ঞাপন করিবার জন্য তিনি একটি অদ্ভুত উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। তাহাতে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতম সাড়াও জানা যায়। সে যন্ত্রটি আর কিছুই নয়। একটি তড়িৎমান যন্ত্রের সহিত সজীব কি নির্জ্জীব দেখিবার জন্য যে পদার্থটি পরীক্ষা করা হইতেছে সেই পদার্থটি সংযুক্ত রাখা। এই পদার্থটির ঠিক মধ্যস্থান ছাড়া কোনও স্থান উত্তেজিত করিলে তড়িৎমান যন্ত্রের কাটা নড়িয়া সাড়া জ্ঞাপন করায়। উত্তেজনা যত বেশী সাড়াও তত অধিক পাওয়া যায় এবং উত্তেজনা যত কম সাড়াও তত অল্প। আবার সেই জিনিষটিরও উত্তেজনা শক্তি বাড়ান কমান যায়—বাড়াইলে অতি অল্প উত্তেজনাতেও তাহার সাড়া সুস্পষ্ট হয়। সুরা সিঞ্চন করিলে এইরূপ ঘটে—আবার ক্লোরোফরম প্রভৃতি ঔষধ দিলে সাড়া কমিয়া যায়। আর বিষ-প্রয়োগে সাড়া চিরকালের জন্য তিরোহিত হয়—অর্থাৎ জিনিষটি মরিয়া যায়।

এইরূপে পরীক্ষা করিলে দেখা যায় জিনিষটি যাহাই হউক না কেন—জীবদেহের স্নায়ুখণ্ড, বা গাছের লতাতন্তু বা সূক্ষ্ম নরম ডাল, বা একখণ্ড লোহার তার—তারের সাড়া সকল প্রকারেই সমান। জীবগণ যেমন সজীব ও ডাকিলে সাড়া দেয়, গাছও তেমনি দিতে পারে। এমন কি লোহা প্রভৃতি ধাতুদেরও সে গুণ আছে। অতএব তাহারা সকলেই সজীব, মানুষেরই মত সুরাপান করিয়া তাহারাও উত্তেজিত ও মাতাল হয়, ক্লোরোফরম শুঁকিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়ে ও বিষপান করিয়া মরিয়া যায়। অর্থাৎ জীবন মরণ শুধু জীবেরই একায়ত্ত নহে। বিশ্বের সকল পদার্থেরই জীবন মরণ আছে।

বিষয়টি অতি বড় ও ছবি দিয়া বুঝাইতে হইবে বলিয়া বারান্তরের জন্ম রাখিলাম। তখন বিস্তারিতরূপে দেখা যাইবে—যে প্রতি কার্য্যেই জীব ও জড়ে কমবেশী একরূপই ব্যবহার করে। এমন কি মৃত্যুর সময় যে "খাবিখাওয়া" মানুষের ও উচ্চ শ্রেণীর জীবে এমন সুস্পষ্ট দেখা যায়। উদ্ভিদ ও ধাতুতেও তাঁহা ঘটিয়া থাকে। সজীব অবস্থা বড়ই চঞ্চল অবস্থা—অর্থাৎ সজীব জিনিষের পরমাণুগুলি অনবরত নড়িতেছে। নির্জ্জীব অবস্থায় এই চঞ্চলতা বন্ধ হইয়া যায়—পরমাণুগুলি পরস্পরের সঙ্গে আবদ্ধ হইয়া অনড় হইয়া পড়ে তাই তখন সাড়া পাওয়া যায় না। এরূপ ভাবে দেখিতে গেলে জীবন মরণে কেবলমাত্র এইই প্রভেদ।

শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক।

রাজতপস্বিনী।

[জীবনীপ্রসঙ্গ]

১০

কথাপ্রসঙ্গে একদিন আমি মহারাণীমাতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, প্রথমে তিনি কি কি পুস্তক পড়িয়াছিলেন? উত্তর—"কাদম্বরী", "মনঃশিক্ষা", আর "মহাভারত।" "মনঃশিক্ষা" আমার দেখা ছিল না, পুনশ্চ সুধাইলাম, "সে বই পড়িয়া আপনার অনেক উপকার হইয়াছিল?" মা বলিলেন, "তাহাতে মনের প্রতি অনেক উপদেশ আছে। তুমি পড়িবে? আচ্ছা, আমি খুঁজিয়া দিব।"

রাজার দূরসম্পর্কীয় প্রচণ্ড মহাশয় ষ্টেটের একজন পুরাতন প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। অপ্রিয়বাদী বলিয়া তিনি কখন সর্ব্বসাধারণের অনুরাগ আকর্ষণ করিতে পারেন নাই। এবং ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে যে ঔদার্য্য মহারাণীর

চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল, তাহা তাঁহার একেবারে ছিল না। যাহা হউক, চিরদিন তিনি ষ্টেটের হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন এবং শেষবয়সে পেন্‌শন্ লাভ করিয়া কাশীতে বাস করিতেন। বালবিধবা মহারাণীমাতার ধর্ম্মানুরাগ যাহাতে অনুদিন বর্দ্ধিত হয়, পিতা ভৈরবনাথের স্বর্গারোহণের পর এই ঘোর বৈষয়িক অথচ গোঁড়া ব্রাহ্মণবৃদ্ধের সেই চেষ্টা ও যত্ন ছিল। মা সেজন্য যখন-তখন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বলিতেন, "প্রচণ্ড মহাশয় যে উপকার করিয়াছেন, তাহা কখন ভুলিবার নহে। তাঁর ঋণ শোধ হয় না।"

আমি একদিন তাঁহাকে বলিতেছিলাম যে, বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি, বঙ্কিমবাবু বড় মাতৃভক্ত, মার ইচ্ছামত সৎকার্য্যে অনেক টাকা তিনি দিয়াছেন। মহারাণী—"আজও কি তাঁর মা জীবিত?" উত্তর—"না।" এই কথায় বাল্যশিক্ষা ও সন্তানচরিত্রে পিতামাতার প্রভাবের কথা উঠিল। আমি সুধাইলাম, "আপনি আপনার পিতৃদেব এবং শিরোমণিমহাশয়ের কাছে কি ধর্ম্মোপদেশ লাভ করিয়াছেন? উত্তর—"অবশ্য পিতৃদেবের কাছে বেশী, তবে শিরোমণিমহাশয়ের কাছেও কতক-কতক বটে।" আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, "তাঁহারা কি কাছে বসিয়া ধর্ম্মোপদেশ দিতেন? রামতনুবাবু নিজের পুত্র কন্যা এবং আত্মীয়বন্ধুদের ঐরূপে শিক্ষা দেন। মহারাণী বলিলেন,—"তোমার কাছে তাঁহার কথা ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছি বটে। না, সেরূপ নয়। পিত্রালয়ে সর্ব্বদা পূজা হয়,—সে সব দেখিয়াও শিখিতাম।

সাহেবগঞ্জষ্টেশনে জলবায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য যখন দ্বিতীয়বার আমি যাই, তখন শীতের প্রারম্ভে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সেখানে আগমন করিয়া গঙ্গাবক্ষে বোটে কয়দিন বাস করিয়াছিলেন। আমি প্রায় প্রত্যহ তাঁহাকে প্রণাম করিতে যাইতাম এবং তাঁহার প্রাতর্ভ্রমণের সহচর ছিলাম। কথায়-কথায় একদিন ব্রহ্মচারিণী মহারাণী শরৎসুন্দরীর প্রসঙ্গ উপস্থিত হইল। মহর্ষি সংবাদপত্রে তাঁহার দানশীলতার পরিচয় মধ্যে মধ্যে পাইতেন কিন্তু এই রাজতপস্বিনীর আদর্শজীবনের কথা তাঁহার শ্রুতিগোচর ছিল না। আমার মুখে শুনিয়া স্মিতমুখে বলিলেন, "শরৎকুমারী নামে আমার এক কন্যা ছিলেন!" পুটিয়ায় ফিরিয়া গিয়া আমি মাতার নিকট সে গল্প করিলাম। তিনি সেই ঋষিকল্প সত্যব্রত মহাত্মার বিষয় অনেক শুনিয়াছিলেন, বিশেষত পিতৃঋণশোধের অবসরে ইদানীন্তনকালে যে ধর্ম্মবুদ্ধি এবং ত্যাগস্বীকারের দৃষ্টান্ত মহর্ষি দেখাইয়াছিলেন, শতমুখে তাহার সাধুবাদ করিতেন। আমার সাক্ষাতের কথা সবিস্তারে জিজ্ঞাসা করিলেন এবং আপনাকে তদীয় কন্যাস্থানীয়া জানিয়া উৎফুল্ল হইলেন।

সকলপ্রকার সদ্দৃষ্টান্ত ও সৎকথায় তিনি বাক্যে এবং কার্য্যে যেরূপ অনুরাগ প্রকাশ করিতেন, তাঁহার চরিত্রের মহত্ত্ব এবং মাধুর্য্য তাহাতেই সচরাচর ফুটিয়া উঠিত। আমার কৈশোরের বন্ধু শ্রীমান্ কিশোরীমোহন চৌধুরী এখন রাজশাহীতে একজন গণনীয় জমিদার এবং ব্যবহারাজীব। দত্তকগৃহীতা মাতার প্রতি তাঁহার ঠিক্ গর্ভধারিণী জননীর ন্যায় ভক্তি ও ব্যবহারের কথা আশ্রিতা ব্রাহ্মণ-

বিধবাদের মুখে সর্ব্বদা মহারাণী শুনিতে পাইতেন এবং আমাদের সমক্ষে কতবার তাঁহাকে সুখ্যাতি করিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। আমি ছুটীর পর বোয়ালিয়ায় গিয়া কিশোরীকে সে সব কথা শুনাইতাম এবং তাহার সলজ্জমুখে উৎসাহের জ্যোতি দেখিয়া আনন্দিত হইতাম।

সাবালক হইবার কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই কুমার বৈষয়িক কার্য্য কিছু কিছু দেখিতে শুনিতেছিলেন। সেজন্য মহারাণী পূর্ব্বের মত সব ব্যাপারে জড়িত হইতে আর ইচ্ছা করিতেন না। একদিন প্রাতে অন্দরে গিয়া দেখি, আত্মীয়-স্বজন এবং পুরাতন কর্ম্মচারীদের ভিতর যাঁহারা মাতার সহিত কথা কহিতেন, এমন ৫।৬ জন পুরুষ উপস্থিত। নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা চলিতেছিল। কিছু পরে তাঁহার দূরসম্পর্কীয় এক খুল্লতাত এবং কর্ম্মচারী দস্তখৎ করাইবার জন্য রোকড় আনিতে অনুমতি চাহিলেন। মহারাণী অস্বীকার করিলেন, কেহ কেহ অনুরোধ করিলে, বলিলেন, "আমি তাতে দস্তখৎ করিব না।" কেহ বলিল, একবার দেখিয়া দিন। উত্তর—দস্তখৎ না করিলে দেখা না দেখা সমান।" * * * দত্ত বলিয়া বসিলেন, "কাহাকেও আজ্ঞা করুন।" মা হাসিয়া একজন বর্ণজ্ঞানহীন চাকরের নাম করিলেন। ইহাতে দত্তজী কত লোকের নাম করিল যাহারা মূর্খ অথচ মনিবের অনুগ্রহে কৃতী হইয়াছে। একটু সুযোগ পাইয়া খুল্লতাত রোকড়ে দস্তখৎ করার অনুরোধটি পুনরুক্ত করিলেন এবং ইহাও জানাইলেন যে কুমার মহাশয়ও তাহা বলিয়াছেন। মা বলিলেন, কুমার ত আর আমার গুরুতর লোক নয় যে কথা না শুনিলে পাপ হইবে।"

ঐ দিন কথায় কথায় * * * রাণী ঠাকুরাণীর গল্প উঠিল, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর দেহ, কেবল ওষ্ঠদ্বয় ও দন্তে পারিপাট্যের অভাব বলিয়া তিনি মুখে কাপড় দিয়া থাকেন। স্বামীর উইল সম্বন্ধে তিনি মহারাণী মাতাকে বলিয়াছিলেন যে তাঁর কাছে দুই উইল আছে, নকল ও জাল। নাবালকের লেখা বলিয়া আসলখানা সন্দেহ বশত কার্য্যকর নয়। মা বলিলেন "অধিকাংশ উইলই ঐরূপ।" * * রাজার উইলের কথা তুলিলেন। বলিলেন "সে উইলে একটি মাত্র অক্ষর লেখা হইয়াছিল। কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি শুনিয়াছেন যে মৃত্যুর অন্তত ২৪ ঘণ্টা পূর্ব্বের লিখিত না হইলে উইল গ্রাহ্য হইবে না। তা একটু ভাল বটে, কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টা পূর্ব্বেই বা জ্ঞান থাকে কৈ? বলিলেন গিরিধর রায় চারি আনির উইল লিখিয়াছিলেন, এখানকার উইলও তাঁহার লেখা। ভাগ্যে জায়গীরের মাহাল কয়খানি লিখিয়া দিয়াছিলেন। * * ত্রৈলোক্য বলিল "সে কথা বলিয়া কাজ নাই মা!" উত্তর—"অন্যায় কথা ত বলিতেছি না। সকল উইলেই পোষ্যপুত্র গ্রহণের বিধি দেয়, ভয় কিছু নাই।" মহারাণী মৃদুহাস্য করিলেন। • • •

কোন আত্মীয়ার পীড়া হইয়াছিল, হাত দেখিবার জন্য কবিরাজ মহাশয় অন্দরে আসিলেন, মহারাণীমাতার গৃহের এক পাট বন্ধ হইল; সেদিকে আত্মীয়া বসিয়া হাত দেখাইবেন। মা কাছের সম্বাদ পত্র

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা এবং মাসিক পত্র কয়খানি লইয়া ভিন্ন দিকে সরিয়া গেলেন,—নহিলে কবিরাজ মহাশয় দেখিতে পান। হাত দেখার কথায় গল্প উঠিল যে * * * কাছে ও সব কিছু নাই, তাঁহার সর্ব্ব শরীর ভিন্ন বস্ত্রে ঢাকা হয়, তার পর হাত দেখান হয়। মহারাণী বলিলেন "উহাতে ত দেখা যায় মানুষটা মোটা কি সরু।"

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার।

বারাণসী-অভিমুখে।

৩

মোগলবিভবের ধবল প্রভা।

আমাদের দেশের ন্যায় ভারতবর্ষেও, রেল-ডাকগাড়ি আজ আকাশকে যেন দগ্ধ করিয়া চলিয়াছে। জগন্নাথ হইতে—বঙ্গোপসাগরের প্রান্তদেশ হইতে ছাড়িয়া, উত্তরাঞ্চলের সেই একঘেয়ে সমতলভূমি ভেদ করিয়া, বারাণসী অতিক্রম করিয়া, (যাহার জন্য আমার মন চঞ্চল হইয়া রহিয়াছে, এবং যেখানে আবার আমাকে পিছাইয়া আসিতে হইবে) আবার আমি সেই প্রদেশে আসিয়া পড়িয়াছি,—যেখানে দুর্ভিক্ষের শুষ্কবায়ু নিশ্বসিত হইতেছে। আমি মুসলমান-আগ্রায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি।

আমার মত যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ্যিক ভারত হইতে আইসে, প্রথমেই একটা খুব পরিবর্ত্তন তার চোখে ঠ্যাকে; ধর্ম্মাধিষ্ঠানসমূহের যে চিত্র তার মনে অঙ্কিত ছিল, তাহা রূপান্তর প্রাপ্ত হয়; মস্‌জিদ্, মন্দিরের স্থান অধিকার করে। বিরাট্ কাণ্ডের পর, অতিপ্রাচুর্য্যের পর—সুসংযতা ক্ষুদ্রকায়া তন্বী শিল্পকলার সহসা আবির্ভাব হয়। স্তূপাকৃতি পদার্থসমূহের বদলে, পুরাণবর্ণিত দেবদানবের উদ্দাম প্রমোদচিত্রের বদলে, আগ্রার এই সমস্ত ভজনালয় শুভ্র মার্ব্বেলপ্রস্তরে মণ্ডিত এবং ঐ মার্ব্বেলের শুভ্রতার মধ্যে জ্যামিতিক-আকারের কতকগুলি বিশুদ্ধ নক্‌সা আড়াআড়িভাবে পরস্পরের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট; চক্‌চকে পাথরের গায়ে শুধু কতকগুলি সাদাসিধা ফুল ইতস্তত অঙ্কিত।

মহামোগল! আজ এই নামটি ঔপন্যাসিক বলিয়া মনে হয়—প্রাচ্যদেশীয় কোন পুরাতন গল্পের সামিল বলিয়া মনে হয়।

পৃথিবীর মধ্যে বিশালতম সাম্রাজ্যের অধিস্বামী সেই মহামহিম নৃপতিগণ এইখানেই বাস করিতেন। তাঁহারা কতকগুলি প্রকাণ্ড প্রাসাদ পশ্চাতে রাখিয়া গিয়াছেন;—কেবল; তাঁহাদের আমলে উঁহাদের এরূপ ভগ্নদশা ও

দৈন্যদশা উপস্থিত হয় নাই। উহাদের মধ্যে একটি প্রাসাদ হইতে সমস্ত আগ্রা দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

তপ্তধূলিসমাকীর্ণ, কাক-চিল-শকুনি-সমাচ্ছন্ন আকাশের নীচে, সেকালের পুরাতন ও সুবিশাল আগ্রাসহর প্রসারিত।

আজ যে সময়ে এই সহরে প্রবেশ করিলাম, একদল বরযাত্রী বাহির হইতেছিল; ২০টা প্রকাণ্ড ঢাক তাহাদের আগে-আগে চলিয়াছে; বরটির বয়স ১৬বৎসর;—জরির কাজ-করা লাল মখ্‌মলের পোষাক-পরা; একটা শাদা-রঙের ঘোটকীর উপর আরূঢ়; একটি ছোট অদৃশ্য 'কনে' পাল্কির মধ্যে বদ্ধ; তাহার পশ্চাতে একদল ভৃত্য—দানসামগ্রীতে পূর্ণ সোনার গিল্টি-করা কতকগুলা ক্ষুদ্র সিন্দুক মাথায় লইয়া চলিয়াছে। সর্ব্বশেষে, জরির আস্তরণে ঢাকা বরের খাট চারিজনের স্কন্ধে মহা-আড়ম্বর-সহকারে চলিয়াছে।

অতি-উচ্চ অতি-পুরাতন গৃহের শীর্ষদেশ হইতে বারণ্ডা ও 'হাওয়াখানা'-ঘর বাহির হইয়াছে; নীচের কুট্টিমভূমির উপর নানা-প্রকার জিনিষের বিক্রেতাগণ উপবিষ্ট, সেখানে রাশিরাশি রেশমী কাপড় ও চুম্‌কি ঝিক্‌মিক্ করিতেছে; প্রথম-তলায়, নর্ত্তকী ও বারাঙ্গনাগণ মুক্ত গবাক্ষের ধারে বসিয়া আছে; উহাদের কালো চোখের মদালস দৃষ্টি বেশ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে; উপরে কতকগুলি লোক রহিয়াছে; ঘরের দ্বার রুদ্ধ ছাদের উপর বড় বড় শকুনি অষ্ট-প্রহর বসিয়া আছে; কিংবা কতকগুলা বানর সপরিবারে বসিয়া, লেজ ঝুলাইয়া, লোকের গমনাগমন নিরীক্ষণ করিতেছে ও চিন্তায় মগ্ন রহিয়াছে—বানরেরা বহুশতাব্দী হইতে আগ্রা দখল করিয়া বসিয়াছে; উহারা টিয়াপাখীদের মত ছাদের উপর মুক্তভাবে অবস্থিতি করে; ধ্বংসদশাপন্ন কোন কোন অঞ্চল, প্রায় উহাদের নিমিত্তই ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে; সেখানে উহারা বাগান-বাগিচা লুণ্ঠন করিয়া, চতুষ্পার্শ্বস্থ হাটবাজার লুণ্ঠন করিয়া, নির্ব্বিবাদে রাজত্ব করে।

এই আগ্রার প্রাসাদটিকে দূর হইতে দেখিলে মনে হয় যেন একটা পর্ব্বত,—ধূসর-লোহিত প্রস্তরপিণ্ডে নির্ম্মিত এবং প্রাকারের ভীষণ দন্তুর চূড়াগুলির দ্বারা কণ্টকিত।

যখন কারাগারসদৃশ গুরুপিণ্ডাকার রক্তবর্ণ এই প্রাকারাবলী নিরীক্ষণ করি, তখন মনে এই প্রশ্নটি স্বতই উপস্থিত হয়,—এই সকল বিলাসী বাদশারা, কেমন করিয়া এই প্রাকারবেষ্টিত স্থানটিকে স্বকীয় খাম্‌-খেয়ালী বিলাসবিভবের লীলাক্ষেত্ররূপে নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন। সে যাই হোক্—নদীর পাশ দিয়া—জুম্মামস্‌জিদের পাশ দিয়া এই লোহিত পর্ব্বতটিকে প্রদক্ষিণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, Alhumbra-প্রাসাদের মত, শাদাপাথরের স্বপ্নময় লঘুধরণের একটি প্রাসাদ এই বিরাট্ দুর্গের উপর স্থাপিত; এবং তলদেশের কঠোর স্থূলপিণ্ডাকার গাঁথুনি হইতে এই প্রাসাদটি এতটা বিভিন্ন যে, এই বৈপরীত্য দেখিয়া সহসা বিস্মিত হইতে হয়। ঐ উপরে মহামোগল এবং তাঁহার সুলতানেরা বাস করিতেন; এবং প্রায় অন্তরীক্ষবাসী হইয়া, দুরধিগম্য হইয়া, শুভ্র-স্বচ্ছ প্রস্তর-রাশির মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া, সমস্ত রাজ্য শাসন করিতেন।

ছুঁচাল-খিলান-বিশিষ্ট দ্বারের মধ্য দিয়া খিলানঘরের মধ্য দিয়া, একপ্রকার সুড়ঙ্গ-পথের মধ্য দিয়া, 'তেহারা' পুরু প্রাকার পার হইয়া, তবে ভিতরে প্রবেশ করিতে হয়। বড়-বড় সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে হয়;—চারিদিকে সেই একই রক্তাভ ধূসরবর্ণ।

তাহার পরেই সহসা স্বচ্ছ পাণ্ডুবর্ণ;—নীরব ও শুভ্র ভাস্বরতা; এইবার মার্ব্বেলের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি।

শুভ্র সান্, শুভ্র প্রাচীর, শুভ্র স্তম্ভ, শুভ্র খিলানঘর, ছাদের ধারে খোদাই-কাজ-করা যে প্রস্তরময় গরাদে-বেষ্টন রহিয়াছে এবং যেখান হইতে দূর-দিগন্ত পরিলক্ষিত হয়, তাহাও শুভ্র;—সমস্তই শুভ্র। কেবলমাত্র, অমল-ধবল দেয়ালের গায়ে ইতস্তত কতকগুলি ফুল—'agat' ও 'Parphyre' পাথরের ফুল—উৎকীর্ণ রহিয়াছে; কিন্তু ঐ সমস্ত ফুল এত সূক্ষ্ম, এত মৃদুপ্রভ, এত বিরলবিন্যস্ত যে, এই প্রাসাদস্থ তুষারশুভ্রতার কোন বৈলক্ষণ্য হয় না। যেদিন এখানকার শেষ-বাদ্‌শা এই স্থান হইতে নির্ব্বাসিত হন, সেইদিন যেমনটি ছিল,—এই পরিত্যক্ত অবস্থার মধ্যেও, এই মরু-নিস্তব্ধতার মধ্যেও ঐ সমস্ত ঠিক্‌ তেম্‌নি টাট্‌কা, তেম্‌নি শুভ্র-স্বচ্ছ রহিয়াছে। মার্ব্বেলের উপর কালের হস্ত অতি বিলম্বে প্রকটিত হয়, তাই এই অপূর্ব্বসুন্দর জিনিষগুলি দেখিতে এমন ক্ষণভঙ্গুর ও সুকুমার হইয়াও, আমাদের নিকট ধ্রুবনিত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

ঐ উপরে কৃত্রিম পর্ব্বতের উপর, প্রাকার-বদ্ধ প্রকাণ্ড দুর্গের কেন্দ্রস্থলে, একটি বিষণ্ণ উদ্যান সংস্থাপিত। উহার চতুর্দ্দিকে বড়-বড় দ্বারপ্রকোষ্ঠ। যে জমাট্-প্রস্তরচূর্ণের দ্বারা ভূগর্ভের খিলান-ঘর নির্ম্মিত হইয়া থাকে, ঐ সকল দ্বারপ্রকোষ্ঠ সেইরূপ মাল-মস্‌লায় গঠিত কৃত্রিম গুহার প্রবেশপথ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কিন্তু এই সকল কৃত্রিম গুহার আকারে বিশুদ্ধ জ্যামিতিক রেখাবিন্যাসের সুষমতা পরিলক্ষিত হয়। বৃহৎ খিলানের প্রত্যেক ক্ষুদ্র অলঙ্কারটি পর্য্যন্ত, ক্ষুদ্র খিলানের ক্ষুদ্র খুব্‌রি-কাটা থরটি পর্য্যন্ত, 'চুল-চেরা' সমান মাপে গঠিত। সূক্ষ্ম কালো জালি-কাটা সৌধ-অলঙ্কারের কিনারার সূতাটি মনে হয় যেন তুলি দিয়া আঁকা, কিন্তু আসলে সেইস্থলে Onyx-মণি অতীব নিপুণভাবে বসান হইয়াছে।

এই ভাস্বর অথচ বিষণ্ণ দালানগুলি একেবারেই অবারিত; এক দালান হইতে আর এক দালানে অবাধে যাতায়াত করা যায়; অথবা সারি-সারি অবারিত খিলানদ্বার দিয়া একেবারেই অলিন্দের উপর আসিয়া পড়া যায়। যখন ভাবি, কি সতর্ক সন্দিগ্ধতার সহিত পূর্ব্বে এই স্থানটি নিম্নস্থ ভীষণ প্রাকারাদির দ্বারা সংরক্ষিত হইয়াছিল, তখন খোলা-খালা বিশ্বস্তভাবের এই সমস্ত নিদর্শন নিতান্ত অলীক বলিয়া মনে হয়। তা, ছাড়া, এইখানে একটা আম্‌দরবারের ময়দান আছে; এই মুক্তস্থানে রাজদরবার বসিত। এই স্থানের অনাড়ম্বর সরলতা মার্জ্জিতরুচির পরিচায়ক; কেবল, পাথরের উপর যে খোদাই-কাজগুলি দেখা যায়, তাহা একেবারে নিখুঁত। এইখানে প্রায় কিছুই নাই; মোগল-বাদ্‌শার জন্য কেবল একটি কালো-পাথরের সিংহাসন রহিয়াছে; তাহার পাশে, বিদুষকের জন্য

একটা শাদা মার্ব্বেলের আসনপীঠ ;—ইহা ছাড়া আর কিছুই নাই। (মনে হয়, সেকালে রাজদরবারের এতটা গাম্ভীর্য্য ছিল যে, লোকের চিত্তভার লাঘব করিবার জন্য বিদূষকের অধিষ্ঠান আবশ্যক হইত। সকলেই জানে, আজকালকার রাষ্ট্রীয় মহাসভায় এই কাজের জন্য কোন বিশেষ লোকের প্রয়োজন হয় না।)

বাদ্‌শার স্নানাগার শুভ্র—বলা বাহুল্য, একেবারে তুষারশুভ্র ; আর তাহাতে কত জটিল রেখাবিন্যাস, কত ছোট-ছোট খিলান পরস্পরের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট, সহস্র-ভাঁজ-বিশিষ্ট কত ছুঁচাল খিলান, খুদিয়া বাহির-করা বহু ঘর-কাটা শব্দযোনি কত খিলানমণ্ডপ, তাহার আর সংখ্যা নাই ; মার্ব্বেল-দেয়ালের উপর একএকটা ফুলের ডাল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত —যাহার এক-একটি টুক্‌রাই পরমাশ্চর্য্য ; —উহা স্বর্ণ ও lapis-মণি দিয়া উৎকীর্ণ।

যে সমস্ত প্রাকার এই অট্টালিকাকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে—সেই প্রাকারাবলীর শেষ প্রান্তভাগে, জুম্মামস্‌জিদের পাশে—খোলা ময়দানের পাশে, কত ছোট-ছোট হাওয়াখানা, লঘু-গঠনের ছোট-ছোট কত চতুষ্কমণ্ডপ ; সেখান হইতে সমস্ত সহর দৃষ্টিগোচর হয় ; এই সমস্ত গৃহ সুলতানাদিগের জন্য, অন্দর-মহলের সমস্ত বেগমদের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। প্রাসাদের এই অঞ্চলেই, মার্ব্বেলের জালি-কাজের, জাফ্রি-কাজের বাহার খুলিয়াছে। দেয়ালের সর্ব্বাংশের মধ্য দিয়াই তুমি দেখিতে পাইবে, কিন্তু তোমাকে কেহই দেখিতে পাইবে না। এই দেয়ালগুলা আপাদমস্তক যে সব অখণ্ড প্রস্তরফলকে নির্ম্মিত, সেই সব প্রস্তরফলকে এত সূক্ষ্ম ছিদ্র কাটা যে, দূর হইতে মনে হয়, যেন সরু-সরু সুন্দর থামের মধ্যে শাদা জরির জাল টানা রহিয়াছে। কিন্তু এই সব কারুকার্য্য—যাহা সহসা ভঙ্গুর ও ক্ষণস্থায়ী বলিয়া মনে হয়—আসলে উহা খুবই পাকাপোক্ত ; একটা মানুষ বিপুল অর্থক্ষয় করিয়া কত স্থায়ী ও সুন্দর জিনিষ নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ—ইহাই তাহার একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

এই বিরাট্ বাসগৃহের নিম্নস্থ গাঁথুনিসমূহের মধ্যে, যে নৈসর্গিক শৈলের উপর ইহা স্থাপিত সেই শৈলের মধ্যে, আরো কত দালান সুকৌশলে সন্নিবেশিত; আরো কত অর্দ্ধচ্ছায়া-চ্ছন্ন স্থান অধিষ্ঠিত, যাহার বিরাট্ মহিমার মধ্যে কি-জানি কেমন-একটা গুপ্তভাবের আভাস পাওয়া যায়। তন্মধ্যে, প্রধানা সুল্‌তানার স্নানাগারের মধ্যে প্রবেশ করিলে কেমন-একটা সুড়ঙ্গ-সুলভ শৈত্য অনুভব করা যায় ; সেখানে আলোকের একটু ক্ষীণ রশ্মিমাত্র প্রবেশ করে ; ইহা যেন জাদুকরের এক-প্রকার মন্ত্রপূত গুহাবিশেষ, উহার খিলান-মণ্ডপের কাজ দেখিলে মনে হয়, ঠিক্ যেন বৃষ্টিধারা ঠাণ্ডায় জমিয়া গিয়াছে ; উহার দেয়ালগুলা অতিসূক্ষ্ম দর্পণকাচে খচিত ; আর্দ্রতা ও যবক্ষারের প্রভাবে এই সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র কাচখণ্ডগুলির 'জলুস্' কমিয়া গিয়াছে ; চুন্‌কি-বসানো কোন পুরাতন জরির কাপড়ের মত 'ম্যাড়্‌মেড়ে' হইয়া পড়িয়াছে।

পূর্ব্বকালে, ভারতের রূপযৌবনসম্পন্না সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরীরাই এই অবরোধের মধ্যে বাস করিত ; এবং এই সকল সানু, এই

সকল বিশ্রামমঞ্চ—যাহার অমল ধবলতা কালও কলুষিত করিতে পারে নাই—উহারা বহুকাল যাবৎ ঐ সব বাছা-বাছা শ্যামাঙ্গিনী ললনার গাত্রস্পর্শ উপভোগ করিয়াছে।

বিজয়ী মোগলদের আসিবার বহুশতাব্দী পূর্ব্বে এইখানে একটি দুর্গ ছিল; মোগলেরা আসিয়া এই দুর্গে দুইটি নূতন জিনিষের আমদানি করিয়াছে;—দুগ্ধধবল মর্ম্মরপ্রস্তর ও জ্যামিতিক রেখাবিন্যাসের অলঙ্কারপদ্ধতি। এই সকল দালানে এখনো ধূসর-লোহিত বর্ণের খোদাই-কাজ দেখা যায়; এই সকল কাজ বহুপুরাতন—জৈনরাজাদিগের আমলের। ছায়ান্ধকার সিঁড়ি দিয়া নামিয়া, গুরুভার স্থূল প্রস্তররাশির মধ্য দিয়া এমন এক স্থানে আসিয়া পড়িলাম; যাহা অতীব ভীতিজনক ও শোকাবহ ঘটনায় পূর্ণ;—সেই সব অন্ধকূপ, যেখানে হতভাগ্য লোকসকল বিষাক্ত ভীষণ সর্পের মুখে পরিত্যক্ত হইত;—একটা কক্ষ, যেখানে সুলতানাদিগকে ফাঁসি দেওয়া হইত; এবং তাহার পর, তাহাদের মৃতদেহ এমন একটা কূপের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইত—যাহার অন্তঃসলিল নদীর সহিত মিশিয়া গিয়াছে; কতকগুলা অতলস্পর্শ কালো গর্ত্ত;—কতকগুলা সুড়ঙ্গ, যাহার ভিতর দিয়া যাইতে সাহস হয় না এবং যেখানে হয় অস্থিরাশি, নয় ধনভাণ্ডার লাভ করা যায়।—উপরে যে অমল-ধবল প্রাসাদরূপ পদ্মটি ফুটিয়া আছে, তাহারই যেন তমসাচ্ছন্ন শিকড়গুলা মাটী ফুঁড়িয়া পাতালগভীরে প্রবেশ করিয়াছে।

তমসাচ্ছন্ন আনুসঙ্গিক-ঘরগুলির উপর পুনর্ব্বার উঠিয়া, আবার সেই সব জালি-কাজ-করা চতুষ্কমণ্ডপে ফিরিয়া আসিলাম;—এই সূক্ষ্ম-খোদিত চতুষ্কগুলি প্রাকারবপ্রের ধারে খাড়া হইয়া রহিয়াছে এবং উহাদের গবাক্ষগুলা ফাঁকায় বাহির হইয়া আসিয়াছে। আমি কতকটা গয়ংগচ্ছভাবে সেই সব দ্বার-গৃহে দাঁড়াইয়া রহিলাম—যেখানে অতীত-কালের সুন্দরীরা কিংবা কৃত্রিম-পর্ব্বত-শিখরস্থ অবরুদ্ধ সুলতানারা, গগনবিহারী ভ্রাম্যমাণ বিহঙ্গদের ভ্রমণপথেরও ঊর্দ্ধদেশ হইতে, জালি-কাটা মার্ব্বেল-ফলকের মধ্য দিয়া কিংবা থামের ফাঁক দিয়া চতুর্দ্দিক্‌ নিরীক্ষণ করিতেন; এখানকার সমস্তই চারু-সূক্ষ্ম কারুকার্য্যে বিভূষিত; এখানকার সমস্ত খোদাইকার্য্যে ধৈর্য্যের পরাকাষ্ঠা লক্ষিত হয়; শাদা 'জমির' উপর মণিখচিত, ছোট ছোট ফুল ইতস্তত ছড়ান রহিয়াছে; অন্যাংশ অপেক্ষা এই অংশটি আরো বেশী শাদা বলিয়া মনে হয়—সর্ব্বত্রই যেন একপ্রকার বিষাদের ধবল কিরণ বিচ্ছুরিত।

আজ আমরা এখানকার যতটা উজাড়-ভাব দেখিতেছি, অবশ্য সেকালে সুলতানারা সে ভাব দেখেন নাই। তখনও এই সব সমভূমি গড়াইয়া-গড়াইয়া অনন্তের মধ্যে বিলীন ছিল; তখনও এই একই নদী সুদূরে আঁকিয়া-বাঁকিয়া চলিয়াছিল, কিন্তু তখন উহার উপর দিয়া দুর্ভিক্ষের শুষ্কনিশ্বাস বহিয়া যায় নাই; তখন সমস্ত দেশ মৃত্যুর কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন হয় নাই। ঐ সকল চতুষ্কমণ্ডপের উপর হইতে সুন্দরীরা নিম্নস্থ উৎসব-আমোদ নিরীক্ষণ করিতেন; তাঁহা-দের চিত্তবিনোদনার্থ যে বাঘের লড়াই ও হাতীর লড়াই হইত, তাহাই তাঁহারা

অবলোকন করিতেন; কিন্তু এখন সেই ক্রীড়াভূমি কণ্টকগুল্মে আচ্ছন্ন, বৃক্ষলতায় আচ্ছন্ন; অনাবৃষ্টির শুষ্কতায়, এই সব বৃক্ষলতা এক্ষণে পল্লববিরহিত; এই সায়াহ্নে গ্রীষ্মের জলন্ত উত্তাপ যদি না থাকিত, তাহা হইলে শীতঋতুর আবির্ভাব হইয়াছে বলিয়া সহজেই মনে হইত।

এখানে পাখীতে-পাখীতে একেবারে আচ্ছন্ন; এত পাখী ভারতের আর কোন প্রদেশে নাই। পাখীর কণ্ঠস্বর ছাড়া আর কোন শব্দই এখন আমার কানে আসিতেছে না। এই সব গৃহছাদের নিস্তব্ধতা উহাদেরই চীৎকারে ভরপুর; এই সব শব্দযোনি ধবল মার্ব্বেল উহাদেরই চীৎকারে প্রতিধ্বনিত। সন্ধ্যা নিকটবর্ত্তী হইলে, পক্ষীদের মধ্যে স্থাননির্ব্বাচনের মহাধুম পড়িয়া যায়। আমার নিম্নস্থ ঐ গাছটি কাকে-কাকে ভরিয়া একেবারে কালো হইয়া যাইতেছে; আর একটি গাছ টিয়াপাখীতে আচ্ছন্ন;—মরা-গাছের ডালের উপর যেন কতকগুল সবুজ পাতা গজাইয়া উঠিয়াছে। ধবলকায় চিল, বড়-বড় 'হাড়া' শকুনি, চতুষ্পদ পশুদের মত ভূমির উপর বিচরণ করিতেছে।

দূরস্থ সমভূমির উপর ছোট ছোট ধবল গম্বুজ দেখা যাইতেছে; কোন চিত্রই, কোন বস্ত্রই, মার্ব্বেলের এই স্বচ্ছ ধবলতার অনুকরণ করিতে পারে না। যে ধূলার কুজ্ঝটিকায় সমস্ত ভূমি আচ্ছন্ন এবং যাহা সন্ধ্যাগমে নীল বর্ণ অথবা ইন্দ্রধনুর বিচিত্রবর্ণ ধারণ করে, সেই কুজ্ঝটিকার মধ্য হইতে,—স্থানে-স্থানে এই স্বচ্ছ ধবলতা ফুটিয়া বাহির হইতেছে। পূর্ব্বে ঐ সব উচ্চ প্রাসাদ বেগমদিগের নিবাস-গৃহ ছিল; জরির পাড়ওয়ালা ওড়না পরিয়া, মণিরত্নে বিভূষিত হইয়া, সুন্দর বক্ষোদেশ অনাবৃত করিয়া ঐ সব সুন্দরী ঐখানে বিচরণ করিত। ঐ সব গম্বুজের মধ্যে তাজের গম্বুজ-টাই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ—সেই অতুলনীয় তাজ,—যেখানে মহা-সুলতানা মম্তাজি-মহল ২৭০ বৎসর হইতে মহানিদ্রায় নিমগ্না।

সকলেই তাজ দেখিয়াছে, সকলেই তাজের বর্ণনা করিয়াছে—সেই তাজ, যাহা পৃথিবীর একটি আদর্শস্থানীয় পরমাশ্চর্য্য পদার্থ।

ক্ষুদ্রায়তন চিত্রে, 'মিনা'র কারুকার্য্যে,—ঝকমকে-শ্রীপচ্‌কল্‌কা- বিভূষিত- উষ্ণীষধারিণী মম্তাজি-মহলের * মুখশ্রী এখনো সংরক্ষিত;—সেই মুখশ্রী, যাহা নিজ পতি সুলতানের এতটা প্রেম উদ্দীপিত করিয়াছিল যে, তিনি সেই প্রেমে বিমুগ্ধ হইয়া এ-হেন অশ্রুতপূর্ব্ব মূর্ত্তিমতী মহিমাচ্ছটার মধ্যে মৃত্যুকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন।

দুর্গের ন্যায় প্রাকারবদ্ধ একটি বৃহৎ গোরস্থান-উদ্যানের মধ্যে তাজ অবস্থিত; এরূপ প্রকাণ্ড অমল-ধবল মর্ম্মরপ্রস্তরস্তূপ জগতে আর দ্বিতীয় নাই। উদ্যানের প্রাচীর ধূসর-লোহিত-বর্ণ; বিশাল ঘেরের চারি কোণে বহির্দ্বারের মাথা ছাড়াইয়া শ্বেতপ্রস্তরখচিত যে সব উচ্চ গম্বুজ উঠিয়াছে, তাহাও ধূসর-লোহিত-বর্ণ। তাল ও সাইপ্রেস্-ঝাউর পংক্তি, জলের চৌবাচ্ছাগুলা, সুচ্ছায় yoke-elm-বৃক্ষ-শ্রেণী,—সমস্তই একেবারে ঠিক্ সরল-রেখায়

* শাজাহানবাদশার পত্নী; বিবাহ হইবার চৌদ্দবৎসর পরে, অষ্টম সন্তান প্রসব করিয়া, ১৬২৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

স্থাপিত। এবং ঐ পশ্চাৎ-প্রান্তে কল্পনার আদর্শমূর্ত্তি এই সমাধিমন্দিরটি মহাগৌরবে রাজসিংহাসনে বিরাজমান; এই সমস্ত হরিৎ-শ্যামল উদ্ভিজ্জের মধ্যে, উহার তুষার-ধবলতা আরো যেন ফুটিয়া উঠিয়াছে। একটা ধবল প্রস্তরপীঠের উপর একটা প্রকাণ্ড গম্বুজ এবং 'ক্যাথিড্রাল্'-গির্জ্জার চূড়া অপেক্ষাও উচ্চ চারিটা 'মিনার'-স্তম্ভ স্থাপিত রহিয়াছে। ঐ সমস্তের রেখাবিন্যাস কি প্রশান্ত, কি বিশুদ্ধ! উহার মধ্যে কি শান্তিময় সামঞ্জস্যের ভাব! কি উচ্চধরণের সহজ সরলতা! উহার সমস্তই বিরাট্-পরিমাণে গঠিত; এবং এরূপ প্রস্তরে নির্ম্মিত, যাহাতে লেশমাত্র দাগ নাই— ধূসর-পাণ্ডু রঙের একটি শিরাও নাই।

তাহার পর, নিকটে গিয়া দেখা যায়, অতি সুকুমার-ধরণের লতা-পাতার কাজ দেয়াল বাহিয়া উঠিয়াছে, কার্ণিসের ধার দিয়া গিয়াছে, দ্বারের চারিধার ঘিরিয়া আছে; 'মিনারেটের' উপর গড়াইয়া চলিয়াছে; খুব সরু সরু কালো মার্ব্বেলের টুকরা বসাইয়া এই সব লতাপাতা রচিত হইয়াছে। যে গম্বুজটি সুলতানার অন্তিমশয্যাকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে, সেই ৭৫-ফীট্-উচ্চ মধ্য-গম্বুজের নিম্নস্থ স্থানটিতে সহজ সরলতার আতিশয্য,—ধবল-মহিমার পরাকাষ্ঠা পরিলক্ষিত হয়। আশ্চর্য্য! যেখানে অন্ধকার হইবার কথা, সেখানেও আলোক; যেন ধবলতার সমস্ত কিরণ একস্থানে পুঞ্জীভূত হইয়াছে; মার্ব্বেলের এই মহা-আকাশে কি-জানি কেমন-একটা অপূর্ব্ব-অস্ফুট স্বচ্ছতা বিদ্যমান। ধূসর-মুক্তাবর্ণ শিরাজালে ঈষৎ লাঞ্ছিত উচ্চ দেয়ালের গায়ে আর কিছুই নাই; কেবল ছোট-ছোট কতকগুলা দন্তুর খিলান এমন বেমালুমভাবে বাহির হইয়াছে যে, উহাদিগকে রেখাচিত্র বলিয়া মনে হয়। বিশাল গম্বুজের ভিতর-পিঠে আর কিছুই নাই —কেবল জ্যামিতিক-রেখায় বিন্যস্ত খুদিয়া-বাহির-করা বহুল খুবরি-কাটা ঘর। কেবল তলদেশে,—এই সব সুন্দর দেয়ালের চারিধারে পদ্মফুলের যেন একটা কেয়ারী রচিত হইয়াছে; যেন উহার বৃন্তগুলা ভূমি হইতে উঠিয়াছে এবং উহার খুদিয়া-বাহির-করা পাপ্ড়িগুলা ঝরিয়া পড়িতেছে...আধুনিক পাশ্চাত্য শিল্পকলা ন্যূনাধিকপরিমাণে এই ভূষণের অনুকরণ করিয়াছে, কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে এইপ্রকার সৌধ-অলঙ্কার খুবই প্রচলিত ছিল।

সমস্ত আশ্চর্য্য পদার্থের মধ্যে আশ্চর্য্যতম পদার্থ সেই ধবল পাথরের 'গরাদে', যাহা স্বচ্ছ দালানের মধ্যস্থলে সমাধিপ্রস্তরটিকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে; এ সমস্ত কতকগুলি 'খাড়া' মার্ব্বেল-ফলক; উহাতে এত সূক্ষ্ম জালি-কাটা কাজ যে, মনে হয়, যেন গজদন্ত-ফলকে ফোঁড় কাটা; উহার চারিধারে সেই ছোট-ছোট ফুলের মালার পাড়; Lapis, ফিরোজা, পদ্মরাগ, porphyre প্রভৃতি মণি বসাইয়া এই সকল ফুল রচিত হইয়াছে।

এই ধবল গম্বুজটির শব্দযোনিতা এত অধিক যে, মনে একটু ভয়ের সঞ্চার হয়;— উহার প্রতিধ্বনি যেন আর থামে না। যদি কেহ 'আল্লা'র নাম উচ্চারণ করে, তাহার সেই অতিবর্দ্ধিত কণ্ঠস্বর কয়েক সেকেণ্ড পর্য্যন্ত স্থায়ী হয় এবং 'অর্গ্যানে'র আওয়াজের মত আকাশে উহার রেশ চলিতে থাকে—যেন আর শেষ হয় না।

৯০মাইল আরো উত্তরে, দিল্লিনগরের ভীষণ প্রাকারের পশ্চাদ্ভাগে, মোগল বাদ্‌শাদিগের আর একটি প্রাসাদ; উহা বিভব-মহিমায় আগ্রার প্রাসাদকেও অতিক্রম করে।

বড়-বড় ছুঁচাল-খিলান-সমন্বিত দিল্লির এই প্রাসাদটি একটা অদৃশ্য পুরাতন উদ্যানের মধ্যে অধিষ্ঠিত; চারিদিক্ রুদ্ধ; উহার দন্তুর অত্যুচ্চ প্রাকারাবলী দর্শকের মনে বিষাদময় ঘোর কারাগারের ভাব আনিয়া দেয়।

কিন্তু উহা যে-সে কারাগার নহে—উহা দৈত্যদানবের কিংবা পরীদিগের কারাগার; সুকুমার শিল্পগরিমায় কোন মানবপ্রাসাদ উহার সমকক্ষ হইতে পারে না। বলা বাহুল্য, উহারও সমস্তই ধবল মার্ব্বেলে নির্ম্মিত; সমস্তই খুদিয়া বাহির-করা;—গুম্বুজের প্রকাণ্ড ভিতর-পিঠ প্রস্তরচূর্ণের মস্‌লায় নির্ম্মিত। কিন্তু ইহার এই স্থায়ী ধবলতার সহিত সোনার রং প্রচুরপরিমাণে মিশিয়াছে। মার্ব্বেলের চেক্‌নাই-এর উপর সোনার কাজ বসাইলে তাহার যে একটা বিশেষ 'খোল্‌তাই' হয়, তাহা সকলেই জানে। দেয়ালের ও গম্বুজের ভিতর-পিঠে যে সব অগণ্য লতাপাতার অতি সূক্ষ্ম কাজ খুদিয়া বাহির করা হইয়াছে, তাহা স্বর্ণ দিয়া রঞ্জিত।

দেয়ালের যে-সকল বড়-বড় ফুকর দিয়া বিষণ্ণ উদ্যানটি দেখা যায়, শুধু সেই সকল ফুকরের মধ্য-দিয়াই যাহা-কিছু আলো ভিতরে প্রবেশ করে। স্তম্ভশ্রেণী ও খাঁজ-কাটা খিলান—একটার-পর-একটা সারি-সারি বরাবর চলিয়া-গিয়া, দূর প্রান্তের আর্দ্ধচ্ছায়াচ্ছন্ন নীলিমার গর্ভে বিলীন হইয়াছে, কিন্তু সমস্ত প্রাসাদটিতে ধবল-প্রস্তরের শুভ্র স্বচ্ছতা পূর্ণভাবে বিরাজমান।

যে দালানে সিংহাসন ছিল (সেই জনশ্রুত নিরেট স্বর্ণপিণ্ড ও পান্নার সিংহাসন), সেই সমস্ত দালানটি শাদা ও সোনালি রঙের। তা ছাড়া, উচ্চ মার্ব্বেল-দেয়ালে গোলাপগুচ্ছ বিকীর্ণ; চীনাংশুকের ফুলকাটা কাজের মত উহাতে টক্‌টকে গোলাপ ও ফিঁকা গোলাপের আভা অতি সুন্দররূপে মিশ্রিত হইয়াছে। এবং আজকাল আমাদের দেশে যাহাকে 'নূতন শিল্পকলা' বলে, সেই শিল্পকলার পদ্ধতি অনুসারে প্রত্যেক পাপ্‌ড়িটির চারিধার দিয়া সূক্ষ্ম সোনালি পাড় বেমালুমভাবে চলিয়া গিয়াছে। তা ছাড়া, lapis-ও-ফিরোজা-রচিত নীলরঙের ফুলও ইতস্তত ছড়ান রহিয়াছে।...আমাদের স্থূলধরণের 'screen'-পর্দ্দার বদলে ভারতবর্ষে যে জালি-কাটা মার্ব্বেল-ফলকের ব্যবহার ছিল, সেইরূপ জালি-কাটা মার্ব্বেল-ফলকের মধ্য দিয়া দালানের পর দালান ক্রমাগত দৃষ্টিপথে পতিত হইতেছে।

প্রাচীরবদ্ধ উদ্যানের তরুকুঞ্জে দুর্ভিক্ষ-বায়ুর উৎপীড়ন স্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে;—শরতের বায়ুর মত উহা উদ্যানতরুর শেষ পাতাগুলা চতুর্দ্দিকে উড়াইয়া দিতেছে; আজ ঐ সব মরা-পাতা ঘূর্ণাবাতাসে উড়িয়া এই মহানিস্তব্ধ প্রাসাদের মধ্যেও আসিয়া পড়িতেছে। উদ্যানের একটি গাছে এখনো ফুল ফুটিয়া আছে; বড়-বড় লাল ফুল বৃষ্টিধারার মত ঐ বৃক্ষ হইতে ঝরিয়া সমস্ত ধবল-কুট্টিম—সিংহাসন-দালানের সেই অপূর্ব্ব প্রস্তর-কুট্টিমটিকে ছাইয়া ফেলিয়াছে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রাইবনীদুর্গ।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

চিল্কাহ্রদের তীরে পুরীরাজ দণ্ডদেবাচার্য্য দারুব্রহ্মসহ যখন অবস্থিতি করিতেছিলেন, পুরুষোত্তমমাহাত্ম্য আপনা হইতে তথায় কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল। নানাদেশের সংসার-বিরাগী সন্ন্যাসিগণ নূতন তীর্থে সমবেত হইতে-ছিলেন এবং কেহ কেহ সেখানে অচল-অটল হইয়া বসিবার ভরসায় আশ্রমস্থাপনের ব্যবস্থা করিতেছিলেন। ইঁহাদের ভিতর সশিষ্য বিমলানন্দগিরি ইতিপূর্ব্বে কয়বার নীলাচলে আসিয়া রাজসভায় সুপরিচিত ছিলেন।

এই সন্ন্যাসী ময়ূরভঞ্জাধিপতি রাজা চক্রাধিপ ভঞ্জের গুরুভাই ছিলেন এবং সর্ব্বদা তাঁহার হিতাকাঙ্ক্ষা করিতেন। মীরহবীব ধর্ম্ম-কর্ম্মের ধার বড় ধারিতেন না। কিন্তু নিজের ভবিষ্যৎ উন্নতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সকল শ্রেণীর শক্তিশালী ব্যক্তির সহিত আলাপ-পরিচয় রাখিতেন। গোঁড়ামি তাঁহার এক-বারে ছিল না এবং ধর্ম্মের ভাণ যথেষ্ট ছিল। উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করিয়া ছদ্মবেশে তিনি চিল্কাহ্রদের তীরে দিন-কত "ফকিরী" করিবার জন্য প্রভুর অনুমতি পাইলেন। "ফকীর" সাজিয়া তথায় তিনি আর সকলকে ভুলাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন, কিন্তু বিমলানন্দ-গিরির কাছে ধরা পড়িলেন। বিমলানন্দ সন্ন্যাসিকুলে চাণক্য;—নূতন তীর্থে সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া বসিবার ফিকিরে ছিলেন। দেখিলেন, মীরহবীব রাজনীতিতে অলৌকিক ব্যক্তি; তাঁহাকে অসন্তুষ্ট করিয়া নীলাচল-অঞ্চলে বসবাসও অসম্ভব। সংক্ষেপে উভয়ের পরিচয় অল্পদিনে বন্ধুত্বে পরিণত হইল এবং সকল কাজে উভয়ে উভয়ের সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

বিমলানন্দগিরির পরামর্শ ও সহায়তা লাভ না করিলে মীরহবীব দণ্ডদেবকে পুরীতে ফিরাইয়া আনিতে পারিতেন কি না, সন্দেহ। এই ঘটনায় দেওয়ানজীর তিনি দক্ষিণহস্তস্বরূপ হইয়া উঠিলেন। উড়িষ্যা-প্রদেশের রাজন্যবর্গমধ্যে গিরিমহাশয় অল্পাধিক-পরিমাণে সকলের সঙ্গেই সংসৃষ্ট হইয়াছিলেন। মীরহবীব এইরূপে নিজের লক্ষ্যসিদ্ধির অমোঘ উপায় লাভ করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষাও বলীয়ান্ হইয়া উঠিলেন।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ।

রাধাচরণকে আমরা ঐতিহাসিক আবর্ত্তে কোথায় হারাইয়া ফেলিয়াছি। কিন্তু বাল্যা-বধি যে আপনার পথ আপনি খনন করিতে অভ্যস্ত, জীবনসংগ্রামে জয়লাভ করা তাহার পক্ষে কঠিন নহে।

মাতৃশোকবিহ্বল রাধাচরণ আশ্রয়স্থান ছাড়িয়া পুরীর অভিমুখে অনির্দ্দিষ্টগতিতে অগ্রসর হইতেছিল। পথে বালেশ্বরের সন্নিকটে বিমলানন্দগিরির সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ

হইল। তিনি দুঃস্থ বালকের কমনীয় মূর্ত্তিতে আকৃষ্ট হইলেন এবং তার পর বরাবর সঙ্গে রাখিয়া প্রধানশিষ্যপদে তাহাকে বরণ করিলেন। প্রায় বিশবৎসর সদ্‌গুরুর সঙ্গলাভ, ভারতবর্ষের প্রায় সকলতীর্থপর্য্যটন এবং যথাসম্ভব শাস্ত্রালোচনা করিয়া রাধাচরণ গুরুদেব-সঙ্গে নীলাচলে গেল। বিমলানন্দ প্রিয়শিষ্যকে কিছুদিন কাশীধামে বিদ্যাশিক্ষার্থ রাখিয়া দেশভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন এবং সেই সময়ে দুইবার পুরুষোত্তমে আগমন করেন। অতএব উৎকল তাঁহার কাছে সুপরিচিত হইলেও রাধাচরণের পক্ষে দীর্ঘকালের ব্যবধানবশত নূতন মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইল।

মীরহবীব বিমলানন্দগিরির সৌহার্দ্দ লাভ করিয়া দেখিলেন, গুরুর ন্যায় শিষ্যকেও হাত না করিলে তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধি হইবে না। গুরু উপদেষ্টা মাত্র। তদীয় উপদেশকে কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে রাধাচরণের মত বুদ্ধিমান্ এবং কর্ম্মঠ শিষ্যের প্রয়োজন। গিরিমহাশয় দেওয়ানপ্রবরের মোহজালে ক্রমশ জড়ীভূত হইতেছিলেন, তাঁহাকে অদেয় কিছু ছিল না। প্রিয়শিষ্যকে কিছুদিন কাছছাড়া করিয়া মীরহবীবের সঙ্কল্পসিদ্ধির উন্নয়ন তাঁহার অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া মনে হইল। ইহার ফলে গুরুদেবের নিকট পরিচয়পত্র লইয়া প্রথমেই রাধাচরণ ময়ূরভঞ্জরাজ্যে উপস্থিত হইল।

রাজা চক্রাধিপ ভঞ্জ রাধাচরণকে গুরুতর রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। ইহা তাহার জীবনের ইষ্টকার্য্য না হইলেও গুরুর আদেশ অবশ্যপ্রতিপাল্য। বহুকাল পরে জীবনের মধ্যাহ্নসময়ে বাল্যলীলাভূমির নিকটে আসিয়া রাধাচরণের হৃদয় উদ্বেল হইল। মনে মনে স্থির করিল, যত শীঘ্র সম্ভব, একবার বনকুঞ্জে বেড়াইয়া আসিবে।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

মানুষের জীবনে একএকটি যুগ, গুনিতে দ্বাদশ-বর্ষ মাত্র,—বড় কম সময় নহে। রাধাচরণের বাল্যজীবনকাহিনী আমরা কতকটা সবিস্তারে বলিয়াছি, কিন্তু বিশ-বৎসরের ঘটনা প্রায় একনিশ্বাসে সাঙ্গ করিতে হইয়াছে। ইহাতে এই বিগতযৌবন ক্ষুদ্র লেখকবেচারীর প্রতি উপন্যাসপ্রিয় তরুণ পাঠকপাঠিকার বিরাগ বোধ হয় অবশ্যম্ভাবী। কেন না, দেখিতে দেখিতে সেই উদ্দাম চঞ্চলপ্রকৃতির বালক ত্রিশের কোটায় পা দিল, অথচ তাহার জীবন-প্রবাহ কখন উদ্বেল কি পঙ্কিল হয় নাই, সংসারে ইহা কি সম্ভব ?

সকল দেশেই অসাধারণ লোকের বাল্য-জীবনের সহিত অসামান্য ঘটনাবলীর সমাবেশ-চেষ্টা দেখিতে পাই। পক্ষিকুলায়লুণ্ঠনপ্রিয় ৮।১০বছরের ছেলে তালগাছে উঠিয়া দংশনোদ্যত ভীষণ সর্পকবল হইতে প্রত্যুৎপন্ন-বুদ্ধিবলে কিরূপে রক্ষা পাইয়াছিল, আমাদের দেশে এই চলিতগল্প ৫।৭জন সেকালের মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত এবং গুণিলোকের জীবনকাহিনীমূলে স্থান পাইয়াছে। ক্ষুধিত ভীষণ অজগর বালকের কোমল দক্ষিণবাহু পুচ্ছবন্ধনে বেষ্টন করিয়াছে, সে বামকরে গলদেশ আয়ত্ত করিয়া সেই ভাবে আকাশস্পর্শি-তালীস্কন্ধে দেহভার রক্ষা করিতেছে; তার পর তালীশাখার ক্ষুরধার দংষ্ট্রামুখে উদ্যতফণা

বিচ্ছিন্ন করিয়া অবিচলিতচিত্তে নামিয়া আসিল দেখিয়া সন্ন্যাসী তাহাকে মন্ত্র দিলেন এবং পরে সে বড়লোক হইল। বিমলানন্দগিরি এবং তাঁহার বুদ্ধিমান্ শিষ্যের সম্বন্ধে তেম্‌নি একটা কিছু ইতিহাস সঙ্কলন করিতে পারিলে অনেক পরিশ্রম বাঁচিয়া যাইত। কিন্তু কি করিব? সকল জীবনস্রোতই কিছু এক খাতে প্রবাহিত হয় না।

বাস্তবিক মাতৃশোক কিশোর রাধাচরণের জীবনে যে পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছিল, তাহার পরবর্ত্তী কয়েক বৎসরের শিক্ষাদীক্ষা সেই বিধাতৃবিহিত রুদ্রশাসনের পরিণতিমাত্র গিরিমহাশয় প্রথমদর্শনে তাহার মুখচ্ছবিতে যে কারুণ্যবিজড়িত শান্ত মহিমার দীপ্তি লক্ষ্য করিয়াছিলেন, ভাবুক ঝটিকাবর্ত্তের পর সুনীল আকাশে, বর্ষাবিধৌত দূর্ব্বাদলে এবং ঘন হরিৎ-পত্রে সেই কমনীয়তাই দেখিতে পান। সেই মুহূর্ত্তে বিমলানন্দ বিশ্বপ্রেমিকের চক্ষে বিশ্ব-বাৎসল্যের মাধুর্য্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাই নিঃসম্পর্কীয় পথের বালকের উপর যে স্নেহ তাঁহার তখন উদয় হইয়াছিল, সমস্ত জীবনে কখন তাহার লাঘব হয় নাই।

মৌনী।

রুদ্ধ-ওষ্ঠাধর-মাঝে রসনা নির্ব্বাক্‌
মৌন-দৌবারিক-সম রুধিয়া অর্গল
বেদনা অধীর দীপ্ত উদ্দাম চঞ্চল
হৃদয়ের দৃঢ় বলে আগুলি দাঁড়াক্‌।
থাক্‌ থাক্‌ কর্ম্মহীন নিরর্থক বাণী
শরতের শূন্য মেঘে মিথ্যা গরজনি
বৃথা, দেব-শূন্য-রথ ল'য়ে টানাটানি
কঙ্করমুখর পথে শুধু চক্রধ্বনি!
নিদাঘের জ্বালাময় মধ্যাহ্নের মত
নীরবে শুষিয়া লহ শক্তি আপনার
নিখিলের পূর্ণবক্ষ হ'তে অবিরত।
জলদমেদুর শ্যাম নভ বরিষার
যেদিন আসিবে বন্যা-বজ্রানল ল'য়ে
মেঘমন্দ্রে সেই দিন গেয়ো জয়ী হয়ে।

শ্রী—

বঙ্গদর্শন।

সাহিত্যসম্মিলন।*

সকলেই জানেন, গত বৎসর চৈত্রমাসে বরিশাল সাহিত্য-সম্মিলন-সভা আহ্বান করিয়াছিল। সেই আহ্বানের মধ্যে বিচ্ছিন্ন বাংলাদেশের হৃদয়বেদনা ছিল। সে আহ্বানকে আমরা উপেক্ষা করিতে পারি নাই।

তার পর হঠাৎ অকালে ঝড় উঠিয়া সেই সভাকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছিল, তাহাও সকলে জানেন। সংসারে শুভকর্ম্ম সকল সময়ে নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় না। বিঘ্নই অনেক সময়ে শুভকর্ম্মের কর্ম্মকে রোধ করিয়া শুভকে উজ্জ্বলতর করিয়া তোলে। ফলের বীজ যেখানে পড়ে, সেইখানেই অঙ্কুরিত হইতে যদি না পায়, ঝড়ে যদি তাহাকে অন্যত্র উড়াইয়া লইয়া যায়, তবু সে ব্যর্থ হয় না, উপযুক্ত সুযোগে ভালই হইয়া থাকে।

কিন্তু কলিকাতা বড়ই কঠিন স্থান। এ ত বরিশাল নয়। এ যে রাজবাড়ীর শানবাঁধানো আঙিনা। এখানে কেবল কাজ, কৌতুক ও কৌতূহল, আনাগোনা এবং উত্তেজনা। এখানে হৃদয়ের বীজ অঙ্কুরিত হইবে কোথায়? জিজ্ঞাসা করি, এখানে হৃদয় দিয়া মিলনসভাকে আহ্বান করিতেছে কে? এ সভার কোনো প্রয়োজন কি কেহ বেদনার সহিত নিজের অন্তরের মধ্যে অনুভব করিয়াছে? এখানে ইহা নানা আয়োজনের মধ্যে একটিমাত্র, সর্ব্বদাই নানাপ্রকারে জনতা-মহারাজের মন ভুলাইয়া রাখিবার একশত অনাবশ্যক ব্যাপারের মধ্যে এটি একশত এক।

জনতা-মহারাজকে আমিও যথেষ্ট সম্মান করি, কিন্তু কিঞ্চিৎ দূর হইতে করিতে ইচ্ছা করি। তাঁহার সেবক-পরিচারকের অভাব নাই। আমিও মাঝে মাঝে তাঁহার দ্বারে হাজিরা দিয়াছি, হাততালির বেতনও আদায় করিয়া লইয়াছি, কিন্তু সত্য কথাই বলিতেছি, সে বেতনে চিরদিন পেট ভরে না; এখন ছুটি লইবার সময় হইয়াছে।

বর্ত্তমান সভার কর্ত্তৃপক্ষদের কাছে কাতরকণ্ঠে ছুটির দরখাস্ত করিয়াছিলাম। তাঁহারা আমার পূর্ব্বেকার নোকরী স্মরণ করিয়া দরখাস্ত নামঞ্জুর কবিয়াছেন। তাঁহারা কেহ

* ভারতীয় শিল্পপ্রদর্শনীক্ষেত্রে গত সাহিত্যসম্মিলন উপলক্ষে পঠিত।

সে কি কথা? নাই ত কি? এ যজ্ঞে আমরাই সকলের বেশি মর্য্যাদা দাবী করিব। দেশলক্ষ্মীর দক্ষিণহস্ত হইতে শ্বেতচন্দনের ফোঁটা আমরাই সকলের আগে আদায় করিয়া ছাড়িব। ইহাতে কেহ ঝগড়া করিতে আসিলে চলিবে না। আমাদের অন্য ভাইরা, যাঁহারা সুদীর্ঘকাল পশ্চিমমুখে আসন করিয়া পাষাণদেবতার বধির কানটার কাছে কাঁসরঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে ডান হাতটাকে একেবারে অবসন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন, তাঁহারাই যে আমাদিগকে পিছনে ঠেলিয়া আজ প্রধান হইয়া দাঁড়াইবেন, এ আমরা সহ্য করিব কেন। স্বদেশের মিলনক্ষেত্রে একদিন যখন কাহারো কোনো সাড়াশব্দ ছিল না, যখন ইহাকে শ্মশান বলিয়া ভ্রম হইত, তখন সাহিত্যই কোদাল কাঁধে করিয়া ইহার পথ পরিষ্কার করিতে বাহির হইয়াছিল। সেই পথ বাংলার উত্তরে দক্ষিণে, পূর্ব্বে-পশ্চিমে বিস্তৃত হইয়াছে। সেই পথকে ক্রমশই চওড়া করিয়া পৃথিবীর অন্যান্য বড় বড় পণ্যপ্রবাহী রাজপথগুলির সঙ্গে মিলাইয়া দিবার আয়োজন কে করিয়াছিল?

একবার ভাবিয়া দেখুন, বাঙালীকে আমরা যে বাঙালী বলিয়া অনুভব করিতেছি, তাহা মানচিত্রে কোনো কৃত্রিম রেখার জন্য নহে। বাঙালীর ঐক্যের মূলসূত্রটি কি? আমরা এক ভাষায় কথা কই। আমরা দেশের এক প্রান্তে যে বেদনা অনুভব করি, ভাষার দ্বারা দেশের অপর সীমান্তে তাহা সঞ্চার করিয়া দিতে পারি - রাজা তাঁহার সমস্ত সৈন্যদল খাড়া করিয়া, তাঁহার রাজদণ্ডের সমস্ত বিভীষিকা উদ্যত করিয়াও ইহা পারেন না। শতবৎসর পূর্ব্বে আমাদের পূর্ব্বপুরুষ যে গান গাহিয়া গিয়াছেন, শতবৎসর পরেও সেই গান বাঙালীর কণ্ঠ হইতে উৎপাটিত করিতে পারে, এত-বড় তরবারি কোনো রাজাস্ত্রশালায় আজো শাণিত হয় নাই। এ কি সামান্য শক্তি আমাদের প্রত্যেক বাঙালীর হাতে আছে! এ শক্তি ভিক্ষালব্ধ নহে। ভূমিষ্ঠ হইবার পরক্ষণ হইতেই জননীর সুধাকণ্ঠ হইতে স্নেহবিগলিত এই শক্তি আমরা আনন্দের সহিত সমস্ত মনপ্রাণ দিয়া আকর্ষণ করিয়া লইয়াছি এবং এই চিরন্তন শক্তিযোগে সমস্ত দূরত্ব লঙ্ঘন করিয়া, অপরিচয়ের সমস্ত বাধা ভেদ করিয়া আজ এই সভাতলে, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের, উপস্থিত ও অনাগতের, সমস্ত বাঙালীকে আপন উদ্বেল হৃদয়ের সম্ভাষণ জানাইবার অধিকারী হইয়াছি।

বাঙালীর সঙ্গে বাঙালীকে গাথিবার জন্য কতকাল ধরিয়া বঙ্গসাহিত্য হৃদয়তন্তুনির্ম্মিত নানারঙের একটা বিপুল মিলনজাল রচনা করিয়া আসিয়াছে। আজ তাহা আমাদের এত বেশি অঙ্গীভূত হইয়া গেছে যে, তাহা আমাদের শিরা পেশি প্রভৃতির মত আমাদের চোখেই পড়িতে চায় না। এদিকে রাজকীয় মন্ত্রণাসভায় দুইএকজন দেশীয়-মন্ত্রি-নিয়োগ বা পৌরসভায় দুইচারিজন দেশীয়-প্রতিনিধি-নির্ব্বাচনের শূন্যগর্ভ বিড়ম্বনাকেই আমরা পরম সৌভাগ্য বলিয়া গণ্য করি। ঔষধ যতই কটু হয়, তাহাকে ততই হিতকর বলিয়া ভ্রম হয়—যে চেষ্টায় যত বেশি ব্যর্থ কষ্ট, তাহার ফলটুকুকে ততই অধিক বলিয়া আমরা মনে করি। কারণ, ভাঙাপথে তৈলহীন গোরুর গাড়ির চাকার মত পণ্ডশ্রমই সব চেয়ে বেশি

শব্দ করিতে থাকে—তাহার অস্তিত্ব এক মুহূর্ত্ত ভুলিয়া থাকা কঠিন।

কিন্তু কাজের সময় হঠাৎ দেখিতে পাই, যাহা সত্য,—যাহা কষ্টকল্পনা নহে—তাহার শক্তি অধিক, অথচ তাহা নিতান্ত সহজ। আমরা বিদেশী ভাষায় পরের দরবারে এতকাল যে ভিক্ষা কুড়াইলাম, তাহাতে লাভের অপেক্ষা লাঞ্ছনার বোঝাই বেশি জমিল, আর দেশী ভাষায় স্বদেশীর হৃদয়দরবারে যেম্‌নি হাত পাতিলাম, অম্‌নি মুহূর্ত্তের মধ্যেই মাতা যে আমাদের মুঠা ভরিয়া দিলেন। সেইজন্য আমি বিবেচনা করি, অদ্যকার বাংলাভাষার দল যদি গদিটা দখল করিয়া বসে, তবে আর সকলকে সেটুকু স্বীকার করিয়া যাইতে হইবে—মনে রাখিতে হইবে, এই মিলনোৎসবের "বন্দে মাতরং" মহামন্ত্রটি বঙ্গসাহিত্যেরই দান।

এ কথা বিশেষরূপে মনে রাখিবেন যে, সাহিত্যই মানুষের যথার্থ মিলনের সেতু। কেন যে, তাহার কারণ এখানে বিবৃত করিয়া বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

আমাদের দেশে বলিয়াছেন—"বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্"—রসাত্মক বাক্যই কাব্য। বস্তুত কাব্যের সংজ্ঞা আর কিছুই হইতে পারে না। রস জিনিষটা কি? না, যাহা হৃদয়ের কাছে কোনো-না-কোনো ভাবে প্রকাশ পায়, তাহাই রস, শুদ্ধ জ্ঞানের কাছে যাহা প্রকাশ পায়, তাহা রস নহে। কিন্তু সকল রসই কি সাহিত্যের বিষয়? তাহা ত দেখিতে পাই না। ভোজনব্যাপারে যে সুখসঞ্চার হয়, তাহার মত ব্যাপকরস মানবসমাজে আর নাই, শিশু হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই ইহার অধিকার। তবু ত রসনাতৃপ্তির আনন্দ সাহিত্যে কেবলমাত্র বিদূষককে আশ্রয় করিয়া নিজেকে হাস্যকর করিয়াছে। গীতিকাব্যের ছন্দে তাহার রসলীলা প্রকাশ পায় নাই, মহাকাব্যের মহাসভা হইতে সে তিরস্কৃত। অথচ গোপনে অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, কবিজাতি স্বভাবতই ভোজনে অপটু বা মিষ্টান্নে অরসিক, শত্রুপক্ষেও এমন অপবাদ দেয় না।

ইহার একটা কারণ আছে। ভোজনের তৃপ্তিটুকু উদরপূরণের প্রয়োজনে প্রায়ই নিঃশেষ হইয়া যায়। তাহা আর উদ্বৃত্ত থাকে না। যে রস উদ্বৃত্ত থাকে না, সে আপনাকে প্রকাশ করিবার জন্য ব্যাকুল হয় না। যেটুকু বৃষ্টি মাটির মধ্যেই শুষিয়া যায়, তাহা ত আর স্রোতের আকারে বহিয়া যাইতে পারে না। এই কারণেই রসের সচ্ছলতায় সাহিত্য হয় না, রসের উচ্ছলতায় সাহিত্যের সৃষ্টি।

কতকগুলি রস আছে, যাহা মানুষের প্রয়োজনকে অনেকদূর পর্য্যন্ত ছাপাইয়া উৎসারিত হইয়া উঠে। তাহার মুখ্যধারা আমাদের আবশ্যকে নিঃশেষ হয় এবং গৌণধারা নানাপ্রকার ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করিতে চায়। বীরপুরুষ মুখ্যভাবে তরবারিকে আপনার অস্ত্র বলিয়া জানে, কিন্তু বীরত্বগৌরব সেইটুকুতেই তৃপ্ত থাকিতে পারে নাই, সে তরবারিতে কারুকার্য্য ফলাইয়াছে। কলু নিজের ঘানিকে কেবলমাত্র কাজের ঘানি করিয়াই সন্তুষ্ট—তাহার মধ্যে গৌণপ্রকাশ কিছুই নাই। ইহাতে প্রমাণ হয়, ঘানি কলুর মনে সেই ভাবের উদ্রেক করিতে পারে নাই, যাহা আবশ্যক

শেষ করিয়াও অনাবশ্যককে আপনার আনন্দ ব্যক্ত করে। এই রসের অতিরিক্ততাই সঙ্গীতকে, ছন্দকে, নানাপ্রকার ললিতকলাকে আশ্রয় করিতে চায়। তাহাই ব্যবহারের অতীত অহেতুক হইয়া অনির্ব্বচনীয়রূপে আপনাকে প্রকাশ করিতে চায়। নায়কনায়িকার যে প্রেম কেবলমাত্র দর্শনস্পর্শনের মধ্যেই গাহিয়া উঠে :—

জনম অবধি হম রূপ নেহারিনু,
নয়ন না তিরপিত ভেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু,
তবু হিয় জুড়ন না গেল॥

—তার সে মুহূর্ত্তকালের দেখা-শুনা কেবল সেই মুহূর্ত্তটুকুর মধ্যে নিজেকে ধারণ করিতে পারে না বলিয়াই লক্ষ লক্ষ যুগের আকাঙ্ক্ষা সঙ্গীতের মধ্যে সৃষ্টি না করিয়া বাঁচে না।

অতএব যে রস মানবের সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজনমাত্রকে অতিক্রম করিয়া বাহিরের দিকে ধাবিত হয়, তাহাই সাহিত্যরস। এইরূপ, প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পৎকেই আমরা ঐশ্বর্য্য বলিয়া থাকি। সাহিত্য মানবহৃদয়ের ঐশ্বর্য্য। ঐশ্বর্য্যেই সকল মানুষ সম্মিলিত হয়—যাহা অতিরিক্ত, তাহাই সর্ব্বসাধারণের।

ময়ূরশরীরের যে উদ্যমটা অতিরিক্ত, তাহাই তাহার বিপুল পুচ্ছে অনাবশ্যক বর্ণচ্ছটায় বিচিত্র হইয়া উঠে—এই কলাপশোভা ময়ূরের একলার নহে, তাহা বিশ্বের। প্রভাতের আলোকে পাখীর আনন্দ যখন তাহার আহার-বিহারের প্রয়োজনকে ছাপাইয়া উঠিতে থাকে, তখনি সেই গানের অপরিমিত ঐশ্বর্য্যে পাখী বিশ্বসাধারণের সহিত নিজের যোগস্থাপন করে। সাহিত্যেও তেম্নি মানুষ আষাঢ়ের মেঘের মত যে রসের ধারা এবং যে জ্ঞানের ভার নিজের প্রয়োজনের মধ্যে আর ধারণ করিয়া রাখিতে পারে না, তাহাকেই বিশ্বমানবের মধ্যে বর্ষণ করিতে থাকে। এই উপায়েই সাহিত্যের দ্বারাই হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়, মনের সঙ্গে মন মিলিত হইয়া মানুষ ক্রমাগত স্বকীয়, এমন কি, স্বজাতীয় স্বাতন্ত্র্যের ঊর্দ্ধে বিপুল বিশ্বমানবে পরিণত হইবার অভিমুখে চলিয়াছে। এই কারণেই আমি মনে করি, আমাদের ভাষায় "সাহিত্য" শব্দটি সার্থক। ইহাতে আমরা নিজের অত্যাবশ্যককে অতিক্রম করিয়া উদারভাবে মানুষের ও বিশ্বপ্রকৃতির সাহিত্য লাভ করি।

কোনো দেশে যখন অতিমাত্রায় প্রয়োজনের কাড়াকাড়ি পড়িয়া যায়, তখন সেখানে সাহিত্য নির্জ্জীব হইয়া পড়ে। কারণ, প্রয়োজন পরকে আঘাত করে, পরকে আকর্ষণ করে না! জর্ম্মণিতে যখন লেসিং, গ্যেটে, শিলর, হাইনে, হেগেল, কাণ্ট, হুম্বোল্ড্ সাহিত্যের অমরাবতী সৃজন করিয়াছিল, তখন জর্ম্মণির বাণিজ্যতরী-রণতরী ঝড়ের মেঘের মত পাল ফুলাইয়া পৃথিবী আচ্ছন্ন করিতে ছুটে নাই। আজ বৈশ্যযুগে জর্ম্মণির যতই মেদবৃদ্ধি হইতেছে, ততই তাহার সাহিত্যের হৃৎপিণ্ড বলহীন হইয়া পড়িতেছে। ইংরেজও আজ নিজের ভাণ্ডার পূরণ করা, দুর্ব্বলকে দুর্ব্বলতর করা এবং সমস্ত পৃথিবীতে একমাত্র অ্যাংলোস্যাক্শন্ মহিমাকেই গণ্ডারের নাসাগ্র-স্থিত একশৃঙ্গের মত ভীষণভাবে উদ্যত রাখাকেই ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য করিয়াছে, তাই সেখানে সাহিত্যরঙ্গভূমিতে "একে একে

"নিবিছে দেউটি" এবং আজ প্রায় "নীরব রবাব বীণা মুরজ মুরলী।"

ইহা হইতে বুঝিতে হইবে, যে সকল ভাব বিশ্বমানবের অভিমুখীন, তাহাই সাহিত্যকে জীবনদান করে। বৈষ্ণবধর্ম্মপ্লাবনের সময় বিশ্বপ্রেম যেদিন বাংলাদেশে মানুষের মধ্যে সমস্ত কৃত্রিম সঙ্কীর্ণতার বেড়া ভাঙিয়া-দিয়া উচ্চ-নীচ-শুচি-অশুচি সকলকেই এক ভগবানের আনন্দলোকে আহ্বান করিল, সেই-দিনকার বাংলাদেশের গান বিশ্বের গান হইয়া জগতের নিত্যসাহিত্যে স্থান পাইয়াছে। কিন্তু শুষ্কধর্ম্ম যখন সর্ব্বমানবের মহেশ্বরকে দূরে রাখিয়া মানুষের মধ্যে কেবল বাচবিচার এবং ভেদবিভেদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সীমাবিভাগ করিতে ব্যগ্র হয়, তখন সাহিত্যের রসপ্লাবন শুষ্ক হইয়া যায়, কেবল তর্কবিতর্ক-বাদবিবাদের ধূলা উড়িয়া আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।

বৈষ্ণবকাব্যই আমাদের দেশের সাহিত্যকে প্রথম রাজসভার সঙ্কীর্ণ আশ্রয় হইতে বৃহৎ-ভাবে জনসমাজের মধ্যে বাহির করিয়া আনিল। পর্ব্বতের গুহা ভেদ করিয়া ঝরণা বাহির হইল। কিন্তু নানা দিক্ হইতে নানা ধারা আসিয়া না জুটিলে নদী হয় না। আজ বাংলায় গদ্যে-পদ্যে সম্মিলিত সাহিত্য বাঙালী-জনসাধারণের হৃদয় হইতে বিচিত্র ভাবস্রোত, বিবিধ জ্ঞানপ্রবাহ অহরহ আকর্ষণ করিয়া পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এই সাহিত্যেই বাংলার উত্তরদক্ষিণ-পূর্ব্বপশ্চিম সমস্ত প্রদেশ নিরন্তর আপনাকে মিলিত করিতেছে। নিখিল বাঙালীর এই হৃদয়সঙ্গমস্থলই বাঙালীর সর্ব্ব-প্রধান মিলনতীর্থ। এই তীর্থেই আমাদের জাগ্রত-দেবতার নিত্য অধিষ্ঠান হইবে এবং এইখানেই আমরা আমাদের সমস্ত যত্ন, প্রীতি ও নৈপুণ্যের দ্বারা এমন ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করিব, যেখানে চিরদিন আমাদের উত্তরকালীন যাত্রিগণ আশ্রয়লাভ করিতে পারিবে।

সাহিত্যের নামে আমরা আজ এই যে মিলনের সভা আহ্বান করিয়াছি, এই মিলনের বিশেষ সার্থকতা প্রমাণ করিবার জন্য সাহি-ত্যের মূলতত্ত্বের প্রতি আপনাদের মনোযোগ প্রবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলাম। রাজনৈতিক মিলনের মধ্যে বিরোধের বীজ আছে, তাহাতে পরজাতির সহিত সংঘাত আছে, কিন্তু আমা-দের সাহিত্যের মিলন বিশুদ্ধ মিলন—তাহাতে পরের প্রতি বিরোধদৃষ্টি দিবার কোনো প্রয়োজন নাই, তাহা একান্তভাবে স্বজাতির কল্যাণকর। বঙ্গসাহিত্যে বাঙালী নিজের যে পরিচয় পাইয়াছে, তাহা তাহার আত্মশক্তি হইতেই উদ্ভূত, এই কারণে সাহিত্যসম্মিলনে আমরা ক্ষুণ্ণ অভিমানের দর্পে অন্যের প্রতি তর্জ্জনগর্জ্জন করিয়া তৃপ্তিলাভের চেষ্টা করিব না। দুর্ভাগ্যক্রমে বর্ত্তমানে আমাদের এমন সময় আসিয়াছে, যখন নানা পীড়নে নানা তাড়নায় আমরা পরসংঘাতের বেদনা এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভুলিতে পারিতেছি না—এরূপ অবস্থা ব্যাধির অবস্থা। এমন অবস্থায় আমাদের প্রকৃতি তাহার স্বাভাবিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে পারে না। কিন্তু পরজাত বেদনা ক্ষণকালের জন্য ভুলিয়া নিজের মধ্যে আমরা যদি শান্তি ও প্রতিষ্ঠা অনুভব করিতে চাই, যদি নানা দুর্যোগের মধ্যেও আশার ধ্রুবতারাকে উজ্জ্বলরূপে দেখিয়া আমরা বর-লাভ করিতে ইচ্ছা করি, তবে এই সাহিত্যের সম্মিলনই তাহার উপায়। যেখানে বেদনা,

সেইখানেই স্বভাবত বারংবার হাত পড়ে বটে, কিন্তু ব্যথাকে বারংবার স্পর্শদ্বারা ব্যথিততর করিয়া তোলাই আরোগ্যের উপায় নহে। সেই বিশেষ বেদনাকে ভুলিয়া সমস্ত দেহের আভ্যন্তরিক স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নপ্রয়োগ করিলে যথাসময়ে এই বেদনা ক্ষীণ হইয়া আসে। আমাদিগকেও এইরূপ চিকিৎসা অবলম্বন করিতে হইবে—দিনরাত্রি কেবল অসুখের প্রতিই সমস্ত লক্ষ্য নিবদ্ধ রাখিলে আমাদের কল্যাণ হইবে না। যেখানে আমাদের বল, যেখানে আমাদের গৌরব, সেখানেই সর্ব্বপ্রযত্নে আমাদের চেতনাকে জাগ্রত করিয়া তুলিলে তবেই আমাদের মধ্যে প্রকৃত স্বাস্থ্যসঞ্চার হইতে থাকিবে।

কিন্তু এ সব ত গেল ভাবের কথা—কাজের কথা কি আমাদের সভার মধ্যে পাড়িবার কোনো স্থান নাই?

সাধারণভাবে মানুষের মধ্যে পরস্পর প্রীতিস্থাপন কল্যাণকর, সন্দেহ নাই; সাহিত্যিকদের মধ্যেও প্রীতিবন্ধন যদি ঘনিষ্ঠ হয়, সে ত ভাল কথা—কিন্তু বিশেষভাবে সাহিত্যিকদের মধ্যেই প্রীতিবিস্তারের যে বিশেষ ফল আছে, তাহা মনে করি না। অর্থাৎ লেখকগণ পরস্পরকে ভালবাসিলেই যে তাঁহাদের রচনাকার্য্যের বিশেষ উপকার ঘটে, এমন কথা বলা যায় না। ব্যবসায়হিসাবে সাহিত্যিকগণ বিচ্ছিন্ন, স্বস্বপ্রধান—তাঁহারা পরস্পর পরামর্শ করিয়া, জোট করিয়া সাহিত্যের যৌথকারবার করেন না। তাঁহারা প্রত্যেকে নিজের প্রণালীতে, নিজের মন্ত্রে নিজের সরস্বতীর সেবা করিয়া থাকেন। যাঁহারা দশের পন্থা অনুসরণ করিয়া পুঁথিগত বাঁধামন্ত্রে কাজ সারিতে চান, দেবী কখনই তাঁহাদিগকে অমৃতফল দান করেন না। সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা অনিষ্টকর।

কার্য্যগতিকে যাঁহারা এইরূপ একাধিপত্যদ্বারা পরিবেষ্টিত, কোনো কোনো স্থলে তাঁহাদের মধ্যে পরিচয় ও প্রীতির অভাব, এমন কি, ঈর্ষা-কলহের সম্ভাবনা ঘটে। এক ব্যবসায়ে প্রতিযোগিতার ভাব দূর করা দুঃসাধ্য। মনুষ্যস্বভাবে অনেক সঙ্কীর্ণতা ও বিরূপতা আছে, তাহার সংশোধন প্রত্যেকের আন্তরিক ব্যক্তিগত চেষ্টার বিষয়—কোনো কৃত্রিম প্রণালীদ্বারা তাহার প্রতিকার সম্ভবপর হইলে আমাদের অদ্যকার উদ্যোগের অনেক পূর্ব্বে সত্যযুগ ফিরিয়া আসিত।

দ্বিতীয় কথা, মাতৃভাষার উন্নতি। গৃহের উন্নতি বলিলেই গৃহস্থের উন্নতি বুঝায়, তেম্নি ভাষার উন্নতির অর্থই সাহিত্যের উন্নতি, সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি ছাড়া অন্য কোনো উপায়েই ভাষা সমৃদ্ধিলাভ করিতে পারে না। কিন্তু কি করিলে সাহিত্যের উন্নতিবিধান হইতে পারে, সে ভাবনা মনে উদয় হইলেও ভাবিয়া তাহার কিনারা পাওয়া কঠিন। অনাবৃষ্টির দিনে কি করিলে মেঘের আবির্ভাব হইবে, সে চিন্তা মনে আসে; কিন্তু কি করিলে মেঘের সৃষ্টি হইতে পারে, তাহার সিদ্ধান্ত করা যায় না। কয়েকজনে দল বাঁধিয়া কেবল কয়েকটা রসারসিতে টান মারিলেই যে প্রতিভার রঙ্গক্ষেত্রে ঠিক আমাদের ইচ্ছামত সময়েই যবনিকা উঠিয়া যাইবে, এমনতর আশা করা যায় না।

তবে একটা কথা আছে। যেমন আমরা মানুষ গড়িতে পারি না বটে, কিন্তু তাহার বসনভূষণ গড়িতে পারি, তেম্নি সাহিত্যের গঠন-

কার্য্যে পরামর্শপূর্ব্বক হস্তক্ষেপ করা যায় না বটে, কিন্তু তাহার আয়োজনকার্য্য একেবারে আমাদের আয়ত্তাতীত নহে। ব্যাকরণ, অভিধান, ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি সংগ্রহ করা দলবদ্ধ চেষ্টার দ্বারা সাধ্য।

চেষ্টার সূত্রপাত পূর্ব্ব হইতেই হইয়াছে; অনুকূল সময় উপস্থিত হইলেই এই উদ্যোগের গৌরব একদিন সকলের নিকট সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে এবং বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ যে স্বদেশের কত অন্তরঙ্গ ও অন্যান্য বহুতর লোকখ্যাত মুখর অনুষ্ঠানের অপেক্ষা যে কত মহৎ এবং সত্য, একদিন তাহা নিঃসংশয়ে সপ্রমাণ হইবে।

আমাদের দেশের পুরাবৃত্ত, ভাষাতত্ত্ব, লোকবিবরণ প্রভৃতি সমস্তই এপর্য্যন্ত বিদেশী পণ্ডিতেরা সংগ্রহ এবং আলোচনা করিয়া আসিয়াছেন।

বিদেশী বলিয়া তাঁহাদের চেষ্টা অসম্পূর্ণ এবং ভ্রমসঙ্কুল হইতে পারে, এই কারণেই যে আমি আক্ষেপ করিতেছি, তাহা নহে। দেশে থাকিয়া দেশের বিবরণ সংগ্রহ করিতে আমরা একেবারে উদাসীন, এমন লজ্জা আর নাই। ইহা আমাদের পক্ষে কত-বড় একটা গালি, তাহা আমরা অনুভব করি না। বেদনাসম্বন্ধে সংজ্ঞা না থাকা যেমন রোগের চরম অবস্থা, তেমনি যখন হীনতার লক্ষণগুলিসম্বন্ধে আমাদের চেতনাই থাকে না, তখনই বুঝিতে হইবে, দুর্গতিপ্রাপ্ত জাতির এই লজ্জাহীনতাই চরম লজ্জার বিষয়। আমাদের দেশে এই একান্ত অসারতার ছোট-বড় প্রমাণ সর্ব্বদাই দেখিতে পাই। বাঙালী হইয়া বাঙালীকে, পিতাভ্রাতা-আত্মীয়স্বজনকে ইংরেজিতে পত্র লেখা যে কত-বড় লাঞ্ছনা, তাহা আমরা অনুভবমাত্র করি না;—আমরা যখন অসংযত করতালিদ্বারা স্বদেশী বক্তাকে এবং হিপ্‌হিপ্‌ হুররে ধ্বনিতে স্বদেশী মান্যব্যক্তিকে উৎসাহ জানাইয়া থাকি, তখন সেই কর্ণকটু বিজাতীয় বর্ব্বরতায় আমরা কেহ সঙ্কোচমাত্র বোধ করি না;—যে সকল অশ্রদ্ধাপরায়ণ পরদেশীর কোনো প্রকার আমোদ-আহ্লাদে, সমাজকৃত্যে আমাদের কোনোদিন কোনো আদর, কোনো আহ্বান নাই, তাহাদিগকে আমাদের দেবপূজায় ও বিবাহাদি শুভকর্ম্মে গড়ের বাদ্য সহকারে প্রচুর মদ্যমাংস সেবন করানোকে উৎসবের অঙ্গ বলিয়া আমরা গণ্য করি, ইহার বীভৎসতা আমাদের হৃদয়ের কোথাও বাজে না। তেম্‌নি আমরা আজ অন্তত বিশপঁচিশবৎসর পরের সিংহদ্বারে মুষ্টিভিক্ষার জন্য প্রতিদিন নিষ্ফলযাত্রা করিয়া নিজেকে দেশহিতৈষী বলিয়া নিঃসংশয়ে স্থির করিয়াছি, অথচ দেশের দিকে একবার ফিরিয়াও তাকাই না, ইহাও একটা অজ্ঞানকৃত প্রহসন। দেশের বিবরণ জানিতে, তাহার ভাষা, ভূগোল, ইতিবৃত্ত, জীবজন্তু, উদ্ভিদ, মনুষ্য, তাহার কথাকাহিনী, ধর্ম্মসাহিত্যসম্বন্ধে সমস্ত রহস্য স্বচেষ্টায় উদ্ঘাটন করিতে লেশমাত্র উৎসাহ বা কৌতূহল অনুভব করি না। যে দেশকে আক্রমণ করিতে হইবে, সে দেশের সমস্ত তথ্যানুসন্ধান করা শত্রুপক্ষের কত আবশ্যক, তাহা আমরা জানি; আর যে দেশের হিতসাধন করিতে হইবে, সেই দেশকেই কি জানার কোনো প্রয়োজন নাই?

কিন্তু প্রয়োজনের কথা কেন তুলিব? যাঁহারা দেশ শাসন করেন, তাঁহারা প্রয়োজনের গরজে দেশের বৃত্তান্ত সংগ্রহ করেন; আর

যাঁহারা দেশকে ভালবাসেন বলিয়া থাকেন, তাঁহাদের কি ভালবাসার গরজ নাই? তাঁহারা কি দেশের অন্তঃপুরে নিজে প্রবেশ করিবেন না সেখানকার সমস্ত সংবাদের জন্য থরন্টন্-হাণ্টারের মুখের দিকে নিতান্ত নির্লজ্জভাবে নিরুপায় নির্ব্বোধের মত তাকাইয়া থাকিবেন?

বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ স্বদেশের ভাষাতত্ত্ব, প্রাচীন সাহিত্য, কথা এবং সমস্ত বিবরণ সংগ্রহ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। দেশের হিতসাধনের ইহাই স্থায়িভিত্তিস্থাপন। এই কারণেই, সাহিত্যপরিষদের অস্তিত্ব সর্ব্বসাধারণের নিকট উৎকটরূপে প্রকাশমান না হইলেও এই সভাকে আমি অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করি। এক এক বৎসরে পর্য্যায়ক্রমে বাংলার এক এক প্রদেশে এই সভার সাংবৎসরিক অধিবেশনের অনুষ্ঠান করিবার জন্য আমি কিছুকাল হইল প্রস্তাব করিয়াছিলাম, সে প্রস্তাব পরিষৎ গ্রহণ করিয়াছিলেন। অদ্য বরিশাল-সাহিত্য-সম্মিলনের আহ্বানে সাহিত্যপরিষদের সেই প্রাদেশিক অধিবেশনের প্রথম আরম্ভ হওয়াতে আমি আশান্বিত হইয়াছি।

যে প্রদেশে সাহিত্যপরিষদের সাংবৎসরিক অধিবেশন হইবে, প্রধানত সেই প্রদেশের উপভাষা, ইতিহাস, প্রাকৃতসাহিত্য, লোক-বিবরণ প্রভৃতি সম্বন্ধে তথ্যসংগ্রহ ও আলোচনা হইতে থাকিলে অধিবেশনের উদ্দেশ্য প্রচুররূপে সফল হইবে। সেখানকার প্রাচীন দেবালয়, দীঘি ও ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থানের ফোটোগ্রাফ এবং প্রাচীন পুঁথি, পুরালিপি, প্রাচীনমুদ্রা প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া প্রদর্শনী হইলে কত উপকার হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। এই উপলক্ষে স্থানীয় লোকপ্রচলিত যাত্রাগান প্রভৃতির আয়োজন করা কর্ত্তব্য হইবে।

কিন্তু সাংবৎসরিক উৎসব উপলক্ষে একদিনেই কাজ শেষ করিলে চলিবে না। বাংলাদেশের প্রত্যেক প্রদেশেই সাহিত্য-পরিষদের একটি করিয়া শাখা স্থাপিত হওয়া আবশ্যক। এই সকল শাখাসভা অন্যান্য সাধারণ বিষয়ের আলোচনা ছাড়া প্রধানত তন্নতন্নরূপে স্থানীয় সমস্ত বিবরণ এবং রক্ষণ-যোগ্য প্রাচীন পুঁথি ও ঐতিহাসিক সামগ্রী সংগ্রহ করিবেন।

স্বদেশী-বিবরণ-সংগ্রহে আমি একদিন সাহিত্যপরিষদে ছাত্রগণকে আহ্বান করিয়াছিলাম। এইরূপে স্বচেষ্টায় দেশের হিতসাধনের উদ্দেশে স্বদেশের আবেদন ছাত্রশালার দ্বারে উপস্থিত করিবার জন্য সাহিত্যপরিষদের ন্যায় প্রবীণ মণ্ডলীকে অনুরোধ করিতে আমি সাহস করিয়াছিলাম। তখনো স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত হয় নাই।

সেদিনকার অভিভাষণের উপসংহারে বলিয়াছিলাম—"জননি, সময় নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, স্কুলের ছুটি হইয়াছে, সভা ভাঙিয়াছে, এইবার তোমার কুটীরপ্রাঙ্গণের অভিমুখে তোমার ক্ষুধিত সন্তানের পদধ্বনি শুনা যাইতেছে! এখন বাজাও তোমার শঙ্খ, জ্বালো তোমার প্রদীপ, তোমার প্রসারিত শীতল পাটির উপরে আমাদের ছোট-বড় সকল ভাইয়ের মিলনকে তোমার অশ্রুগদ্গদ আশীর্ব্বচনের দ্বারা সার্থক করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাক।"

তখন আমাদের সময় যে কত নিকটবর্ত্তী হইয়াছিল, তাহা আমাদের ভাগ্যবিধাতাই

নিশ্চিতরূপে জানিতেছিলেন। কিন্তু এখনো আমাদের গর্ব্ব করিবার দিন আসে নাই, চেষ্টা করিবার দিন দেখা দিয়াছে মাত্র। যে সকল কাজ প্রতিদিন করিবার, এবং প্রতিমুহূর্ত্তে বাহির হইতে যাহার পুরস্কার পাইবার নহে; যাহার প্রধান বাধা বাহিরের প্রতিকূলতা নহে, আমাদেরই জড়ত্ব, দেশের প্রতি আমাদেরই আন্তরিক ঔদাসীন্য—সেই সকল কাজেই আশাপথে নূতনপ্রবৃত্ত তরুণ জীবনগুলিকে উৎসর্গ করিতে হইবে। সেইজন্য বিশেষ করিয়া আজ ছাত্রদের দিকে চাহিতেছি। এ সভায় ছাত্রসম্প্রদায়ের যাঁহারা উপস্থিত আছেন, আমি তাঁহাদিগকে বলিতে পারি, প্রৌঢ়বয়সের শিখরদেশে আরোহণ করিয়াও আমি ছাত্রগণকে সুদূর প্রবীণত্বের চক্ষে একদিনও ছোট করিয়া দেখি নাই।

বয়স্কমণ্ডলীর মধ্যে যখন দেখিতে পাই, তাঁহারা পুঁথিগত বিদ্যা লইয়াই আছেন; প্রত্যক্ষ ব্যাপারের সজীব শিক্ষাকে তাঁহারা আমল দেন না; যখন দেখি, চিরাভ্যস্ত একই চক্রপথে শতসহস্রবার পরিভ্রান্ত হইবার এবং চিরোচ্চারিত বাক্যগুলিকেই উচ্চকণ্ঠে পুনঃপুন আবৃত্তি করিবার প্রতি তাঁহাদের অবিচলিত নিষ্ঠা, তখন ছাত্রদিগের জ্যোতিঃপিপাসু বিকাশোন্মুখ তারুণ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই আমি চিত্তের অবসাদ দূর করিয়াছি। দেশের ভবিষ্যৎকে যাঁহারা জীবনের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে বহন করিয়া অম্লানতেজে শনৈঃশনৈ উদয়পথে অধিরোহণ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে অনুনয়সহকারে বলিতেছি, অন্যান্য শিক্ষার সহিত স্বদেশের সকল বিষয়ে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের শিক্ষা যদি তাঁহাদের না জন্মে, তবে তাঁহারা কেবল পণ্ডপাণ্ডিত্য লাভ করিবেন, জ্ঞানলাভ করিবেন না। এদেশ হইতে কৃষিজাত ও খনিজ দ্রব্য দূরদেশে গিয়া ব্যবহার্য্য-পণ্য-আকারে রূপান্তরিত হইয়া এদেশে ফিরিয়া আসে;—পণ্যসম্বন্ধে এইরূপ দুর্ব্বল পরনির্ভরতা পরিত্যাগ করিবার জন্য সমাজ দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছেন। বস্তুত ঔদাসীন্য ও অজ্ঞতাবশত দেশের বিধাতৃদত্ত সামগ্রীকে যদি আমরা ব্যবহারেই না লাগাইতে পারি, তবে দেশের দ্রব্যে আমাদের কোন অধিকারই থাকে না, আমরা কেবল মজুরিমাত্র করি। আমাদের এই লজ্জাজনক দৈন্য দূর করার সম্বন্ধে ছাত্রদের মনে কোনো দ্বিধা নাই। কিন্তু জ্ঞানের সম্বন্ধেও ছাত্রদিগকে এই একইভাবে সচেতন হইতে হইবে। দেশের বিষয়ে আমাদের যাহা-কিছু শিক্ষণীয়, বিদেশীর হাত দিয়া প্রস্তুত হইয়া বিদেশীর মুখ দিয়া উচ্চারিত হইলে তবেই তাহা আমরা কণ্ঠস্থ করিব, দেশের জ্ঞানপদার্থে আমাদের স্বায়ত্ত অধিকার থাকিবে না, দেবী ভারতীকে আমরা বিলাতী স্বর্ণকারের গহনা পরাইতে থাকিব, এ দৈন্য আমরা আর কতদিন স্বীকার করিব! আজ আমাদের যে ছাত্রগণ দেশী মোটা-কাপড় পরিতেছেন ও স্বহস্তে তাঁত-বোনা শিখিতেছেন, তাঁহাদিগকে দেশের সমস্ত বৃত্তান্তসংগ্রহেও স্বদেশী হইতে হইবে। প্রত্যেক ছাত্র অবকাশকালে নিজের নিবাসপ্রদেশের ধর্ম্মকর্ম্ম, ভাষা, সাহিত্য, বাণিজ্য, লোকব্যবহার, ইতিহাস, জনশ্রুতির বিবরণ সাধ্যমত আহরণ করিতে চেষ্টা করিবেন। এ কথা মনে রাখিতে হইবে, ইহাদের সকলেরই সংগ্রহ যে আমাদের সাহিত্যে ব্যবহারযোগ্য হইবে, তাহা নহে, কিন্তু এই

উপায়ে স্বাধীন জ্ঞানার্জ্জনের উদ্যম তাঁহাদের গ্রন্থভারক্লিষ্ট মনের জড়তা দূর করিয়া দিবে এবং দেশের কোনো পদার্থকেই তুচ্ছজ্ঞান না করিবার এবং দেশী সমস্ত জিনিষই নিজে দেখিবার, শুনিবার ও বুঝিবার চেষ্টা তাঁহাদিগকে যথার্থ স্বদেশপ্রীতির দিকে অগ্রসর এবং স্বদেশসেবার জন্য প্রস্তুত করিবে। কোনো প্রীতিই সম্পূর্ণ অকৃত্রিম ও পরিপক্ক হইতেই পারে না,—যদি তাহা প্রত্যক্ষজ্ঞানের উপরে প্রতিষ্ঠিত না হয়। ভালবাসা অক্লান্তযত্নে জানিতে ইচ্ছা করে এবং জানা হইলে ভালবাসা আরও সত্য ও সুগভীর হয়। আমাদের স্বদেশপ্রেমের সেই ভিত্তির অভাব আছে এবং আমাদের মনে সেই ভিত্তিরচনার জন্য যদি দুর্নিবার আগ্রহ উপস্থিত না হয়, তবে যেন আমরা স্বদেশপ্রেমের অভিমান না করি। যদি এই প্রেমের অভিমানী হইবার প্রকৃত অধিকার আমরা না লাভ করিতে পারি, তবে স্বদেশ আমাদের স্বদেশ নহে। জ্ঞানের দ্বারা, প্রেমের দ্বারা, সেবার দ্বারা, পরিপূর্ণ ব্যবহারের দ্বারাই অধিকার লাভ করা যায়। জগতে যে জাতি দেশকে ভালবাসে, সে অনুরাগের সহিত স্বদেশের সমস্ত সন্ধান নিজে রাখে, পরের পুঁথির প্রত্যাশায় তাকাইয়া থাকে না, স্বদেশের সেবা যথাসাধ্য নিজে করে, কেবল পরের কর্ত্তব্যবোধকে জাগ্রত করিবার উপায় সন্ধান করে না, এবং দেশের সমস্ত সম্পৎকে নিজের সম্পূর্ণ ব্যবহারে আনিতে চেষ্টা করে, বিদেশী ব্যবসায়ীর অশুভাগমনের প্রতীক্ষায় নিজেকে পথের কাঙাল করিয়া রাখে না। তাই আজ আমি আমাদের ছাত্রগণকে বলিতেছি, দেশের উপরে সর্ব্বাগ্রে সর্ব্বপ্রযত্নে জ্ঞানের অধিকার বিস্তার কর, তাহার পরে প্রেমের এবং কর্ম্মের অধিকার সহজে প্রশস্ত হইতে থাকিবে।

আজ আমি বাংলাদেশের দুই বিভিন্ন কালের উদয়াস্তসন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া, হে ছাত্রগণ, কবির বাণী স্মরণ করিতেছি—

যাত্যেকতোহস্তশিখরং পতিরোষধীনাম্
আবিষ্কৃতারুণপুরঃসর একতোঽর্কঃ ॥

এখন আমাদের কালের শীতরশ্মি চন্দ্রমা অস্তমিত হইতেছে, তোমাদের কালের তেজ-উদ্ভাসিত সূর্য্যোদয় আসন্ন—তোমরা তাহারই অরুণসারথি। আমরা ছিলাম দেশের সুপ্তিজালজড়িত নিশীথে; অন্যত্র হইতে প্রতিফলিত ক্ষীণ জ্যোতিতে আমরা দীর্ঘরাত্রি অপরিস্ফুট ছায়ালোকের মায়া বিস্তার করিতেছিলাম। আমাদের সেই কর্ম্মহীন কালে কত অলীক বিভ্রম এবং অকারণ আতঙ্ক দিগন্তব্যাপী অস্পষ্টতার মধ্যে প্রেতের মত সঞ্চরণ করিতেছিল। আজ তোমরা পূর্ব্বগগনে নিজের আলোকে দীপ্তিমান্ হইয়া উঠিতেছ। এখনো জল-স্থল-আকাশ নিস্তব্ধ হইয়া নবজীবনের পূর্ণবিকাশের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছে; অনতিকাল পরেই গৃহে-গৃহে পথে-পথে কর্ম্মকোলাহল জাগ্রত হইয়া উঠিবে। এই কর্ম্মদিনের প্রখরদীপ্তি দেশের সমস্ত রহস্য ভেদ করিবে—ছোট-বড় সমস্তই তোমাদের তীক্ষ্ণদৃষ্টির সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। তখন তোমাদের কবিবিহঙ্গগণ আকাশে যে গান গাহিবে, তাহাতে অবসাদের আবেশ ও সুপ্তির জড়িমা থাকিবে না—তাহা প্রত্যক্ষ আলোকের আনন্দে, তাহা করতললব্ধ সত্যের উৎসাহে সহস্র জীবন হইতে সহস্র ধারায়

উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবে। এই জ্যোতির্ম্ময় আশাদীপ্ত প্রভাতকে সুমহান্ সুন্দর পরিণামে বহন করিয়া লইবার ভার তোমাদের হস্তে সমর্পণ করিয়া আমরা বিদায়ের নেপথ্যপথে যাত্রা করিতে উদ্যত হইলাম। তোমাদের উদয়পথ মেঘনির্ম্মুক্ত হউক, এই আমাদের আশীর্ব্বাদ।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তীর্থদর্শন।

আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্।
নিষ্ঠা বৃত্তিস্তপো দানং নবধা কুললক্ষণম্॥

কুলীন পূর্ব্বপুরুষগণের মধ্যে পরম্পরাগত এই শ্লোকটি বাল্যকালেই মুখে মুখে শিখিয়াছিলাম। পূর্ব্বপুরুষগণের কুলীনত্বের সঙ্গে সঙ্গেই কুলীনের লক্ষণগুলি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম, ইহাই বরাবর বিশ্বাস। তবে তীর্থদর্শনটা ঠিক সহজাত সংস্কারের দলে পড়ে না,—ইহা পুরুষকারসাপেক্ষ, এইটা বুঝিয়া নিজের কুলীনত্ব পাকা করিবার অভিপ্রায়ে—to make assurance double sure—তীর্থযাত্রা করা মনস্থ করিলাম এবং বিষয়কর্ম্ম হইতে কিয়ৎকালের জন্য অবসর পাইয়া পূজার ছুটিতে সেই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে উদ্যোগী হইলাম। সঙ্কল্প পবিত্র বারাণসীধামে প্রয়াণ। এই তীর্থযাত্রার কিঞ্চিৎ বিবরণ দিলে বোধ হয় পাঠকগণের বিশেষ অপ্রীতিকর হইবে না। তীর্থ করিয়া নিজমুখে তাহার শ্লাঘা করিতে নাই, এইরূপ একটা শিষ্টাচারের কথা শুনা যায় বটে। কিন্তু এই প্রবন্ধের সহস্রদোষসত্ত্বেও বোধ হয় কোনস্থলে লেখকের আত্মশ্লাঘাদোষ প্রকটিত হইবে না।

* * * *

এককালে খ্রীষ্টীয়জগতে বিশ্বাস ছিল যে, তীর্থদর্শনে পুণ্যসঞ্চয় হয় ও আধ্যাত্মিক উন্নতি ঘটে। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া সহস্র সহস্র লোক নানা ক্লেশ সহ্য করিয়া পরিত্রাতা যীশুর জন্মস্থান, লীলাক্ষেত্র ও সমাধিস্তম্ভ দর্শনে আপনাদিগকে ধন্য জ্ঞান করিয়াছেন, য়ুরোপের তামসযুগের ইতিহাসে এরূপ উদাহরণ বিরল নহে। বিখ্যাত ধর্ম্মযুদ্ধ crusade-গুলি এই ধর্ম্মপ্রবৃত্তির তাড়নাতেই ঘটিয়াছিল, ইহা অবশ্য ইতিহাসজ্ঞের অবিদিত নহে। এখন খ্রীষ্টীয় প্রকৃতি ও আদর্শ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; য়ুরোপীয় জগতে আর বড় কেহ তীর্থভ্রমণের উপকারিতা উপলব্ধি করেন না। য়ুরোপ এখন সভ্য! আর য়ুরোপের নিকট শিক্ষাদীক্ষা লাভ করিয়া য়ুরোপের মন্ত্রশিষ্য উচ্চশিক্ষাভিমানী আমরাই বা কি বলিয়া এই বিংশশতাব্দীতে ঘোরতর কুসংস্কারের প্রশ্রয়

দিব, এ ভাবনাটা যে একবারও মনে আসে নাই, ইহা বলিলে সত্যের মর্য্যাদারক্ষা হইবে না। অতএব এস্থলে একটা কৈফিয়ত আবশ্যক হইয়া পড়িল।

আপাতত যাত্রা বন্ধ করিয়া নজির খুঁজিতে বসিলাম। অল্পে অল্পে মনে পড়িল, একখানি ইংরেজী কেতাবে এইরূপ একটা কথা পড়িয়াছিলাম, ম্যারাথন্-থার্ম্মপলীর বীর-মাটীতে দাঁড়াইয়া যে পাষণ্ডের মন বীররসে আপ্লুত হয় না, সে প্রকৃতই কৃপার পাত্র। ঠিক কথা। এই কথাটাই ত একটু বদ্‌লাইয়া বেশ বলা চলে,—তীর্থক্ষেত্রের স্থানমাহাত্ম্যে, ইংরেজীতে বলিতে গেলে associationএর প্রভাবে, মনে ধর্ম্মভাবের সজীবতা সঞ্চারিত হয়। তখন বুঝিলাম, তীর্থযাত্রাটা ঘোর কুসংস্কার নহে, reasonএর কষ্টিপাথরে কষিলেও ইহার মাহাত্ম্য অক্ষুণ্ণ থাকে। এতক্ষণে মনের বোঝা নামিল, হিতাহিতজ্ঞানের (conscience) মৃদু-ভৎসনা বন্ধ হইল, rationalistএর চাপা-হাসি ও নাসিকাকুঞ্চনের ভয় থাকিল না। এইবার হাঁফ ছাড়িয়া যাত্রা করি। বোম্বাই-মেল ছাড়িতে আর বড় বিলম্ব নাই।

* * * *

আধুনিক বিজ্ঞান ভৌতিকশক্তির প্রভাবে দেশকাল লোপ করিতে বসিয়াছে। বাষ্পীয় যান, বৈদ্যুতিক তার জগতে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। ইহার ফলে সহস্র সুবিধা ঘটিয়াছে, স্বীকার করি। কিন্তু সেটা যে পূরা লাভ, তাহা ঠিক হলপ করিয়া বলিতে পারি না। রেলের বাবুরা অনুগ্রহছুটি ও ফ্রী-পাস্ পাইয়া দশাহের মধ্যে বৃদ্ধা মাতা বা পিসিমাকে লইয়া গয়ায় পিণ্ডদান করিয়া আসিতেছেন; উকীলমুন্‌সেফ প্রভৃতি পদস্থ ব্যক্তিরা পূজার দীর্ঘ অবকাশে 'সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ' করিয়া হাঁফ ছাড়িতেছেন; শীঘ্র, সস্তা ও সুবিধার কল্যাণে রাজা-মজুর সকলেই কাশী-গয়া-প্রয়াগ-মথুরা-বৃন্দাবন ঘুরিয়া শারীর ও মানস চক্ষু সার্থক করিতেছেন। কিন্তু সেকালে তীর্থদর্শনে যে সাত্ত্বিক ভাবটি ছিল, তাহা কি একালের এই রেলষ্টীমারের যুগে দেখিতে পাওয়া যায়? তখনকার দিনে লোকে সুদূর বঙ্গদেশ হইতে শতশতক্রোশদূরবর্ত্তী কাশী-গয়া-প্রয়াগ করিতে যাইত;—কতক পথ নৌকাযোগে, কতক বা গরুর গাড়িতে, আবার কতক পদব্রজে ছয়মাস নয়মাসে পৌছিত। ইহাতে সময় অনেক লাগিত, অর্থব্যয় বিলক্ষণ হইত, শারীরিক কষ্টের ত কথাই নাই, পথে বিপদাশঙ্কাও ষোল-আনা ছিল। কিন্তু সে কষ্ট, সে উদ্বেগ, সে সহস্র অসুবিধার একটা আধ্যাত্মিক উপকারিতা ছিল। তীর্থযাত্রার দিন হইতেই যাত্রীরা সংযম অভ্যাস করিত, সকলেই তদ্গতচিত্তে এক মহান্ উদ্দেশ্যে দীর্ঘপথ বাহিয়া মনের আনন্দে চলিত। তখনকার দিনে লোকে সঙ্গী খুঁজিত, দশজনে একত্র হইয়া এক উদ্দেশ্যে এক পথে বাহির হইয়া পড়িত। তাহাতে সকলেরই প্রাণ একটা মধুর অথচ গম্ভীর সুরে বাঁধা হইত। পরস্পরের মধ্যে একটা অন্তরঙ্গভাব জমিয়া যাইত, পরের সুখে-দুঃখে সমবেদনা জন্মিত, সকলেই পরস্পরের সাহায্য করিত। এই প্রীতি হইতে চিত্তশুদ্ধি ঘটিত, নীচ স্বার্থপরতা ঈর্ষাদ্বেষ হৃদয় হইতে বিদায় লইত এবং তাহার ফলে তীর্থদর্শনের প্রকৃত ফল সহজেই সকলের করায়ত্ত হইত।

আর এখনকার দিনে—রেলগাড়িতে

উঠিয়াই কেহ দরজায় চাবি লাগাইতেছেন; কেহ পোঁট্‌লাপুঁট্‌লি চারিদিকে ছড়াইয়া সমস্ত জায়গা অধিকার করিয়া লইতেছেন,—যেন গাড়িখানি তাঁহার পৈতৃক মৌরুসী সম্পত্তি; কেহ পা ছড়াইয়া বসিয়া প্রবেশদ্বার আটক করিয়া বিশ্বম্ভরমূর্ত্তিতে বসিয়া আছেন,—কাহার সাধ্য, বীর হনুমানের লাঙ্গুলের ন্যায় সেই চরণযুগল ঠেলিয়া সরায়-নড়ায়? আবার কেহ বা পেঁটরা বাক্‌স গাদা করিয়া কৃত্রিম barricadeএর সৃষ্টিতে রণচাতুর্য্যের বাহাদুরি লইতেছেন, আর কেহ বা রীতিমত সম্মুখযুদ্ধ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া প্রবেশদ্বার আগুলিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, অন্য লোকে প্রবেশ করিতে গেলেই যমদ্বারের প্রহরী সারমেয়ের ন্যায় বিকট হুঙ্কার করিয়া উঠিতেছেন। সোজা কথায় বলিতে গেলে, আজকালকার লোক স্বার্থপর, স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় ও সঙ্কীর্ণহৃদয়, পাঁচজনের সঙ্গে মিলিয়া-মিশিয়া থাকিতে চাহে না; সকলেই আত্মসুখতৎপর, আপন-আপন সুবিধা খুঁজিয়া বেড়ায়, পরকে ফাঁকি দিয়া নিজে সুখী হইব, ইহাই তাহাদের ধ্যানজ্ঞান। হায়, ইহারাই আবার পুণ্যার্জ্জনের জন্য তীর্থযাত্রা করিয়াছে! যাহারা ধর্ম্মের প্রথমসূত্র বিশ্বপ্রেম শেখে নাই, তাহারাই আবার বিশ্বনাথের মস্তকস্পর্শ করিয়া কৈবল্যলাভ করিবে? কি দুরাশা! পরকে আপদে-বিপদে সাহায্য করা দূরে থাকুক্, যদি কোন সরলপ্রকৃতির যাত্রী কাহারও নিকট রেলসংক্রান্ত একটা সংবাদ চাহে, তবে সকলেই সেই নিরীহ ব্যক্তিটিকে অবজ্ঞামিশ্রিত কৃপার চক্ষে দেখেন। কেন না, তাঁহারা সকলেই চার-চার পয়সা খরচ করিয়া একএকখানি time-table কিনিয়াছেন, হিল্লীদিল্লীর খবর তাঁহাদের করতলন্যস্ত-আমলকবৎ; তাঁহারা কাহারও নিকট কোন খবর চাহেনও না, কাহাকে কোন খবর দিতেও প্রস্তুত নহেন; ছিপি-আঁটা কর্পূরের শিশির মত বসিয়া আছেন, পাছে বুদ্ধিশুদ্ধি উবিয়া যায়।

* * * *

এই ত গেল পথের সুখ। এখন ধান-ভানা ছাড়িয়া শিবের গীত ধরা যাউক। তীর্থক্ষেত্রে প্রবেশমাত্র যমদূতের ন্যায় পাণ্ডাগণের আক্রমণ,—কেবল পয়সার জন্য খিটিমিটি। এই অর্থগৃধ্নু শকুনিগৃধ্রের দল আবার দেবালয়ের সেবায়ত! এই পাপিষ্ঠগণের সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডায় হৃদয়মন কলুষিত হয়, ইহাতে কোথায় বা থাকে ধর্ম্মভাব, কোথায় বা থাকে চিত্তশুদ্ধি! শুনিয়াছিলাম, দেবদেব বিশ্বেশ্বরের আরতি দেখিলে হৃদয়ে উদাত্তভাবের উদয় হয়, পাষণ্ডের মনও গলিয়া যায়। সেখানে গিয়া কি দেখিলাম? প্রাণ ভরিয়া দেবদর্শন করিতে চাও, তবে ঘুষ বা ঘুষি চাই। তীর্থযাত্রাকালে রেলগাড়িতেও তাই, তীর্থভ্রমণকালে দেবালয়েও তাই। ভিড় ঠেলিয়া শ্বাস রুদ্ধ করিয়া ঘুষ বা ঘুষির সাহায্যে স্থান করিয়া লওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহাতে ভক্তিরসের আবির্ভাব হইবার ত কথা নয়। তবে যিনি 'সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা' ভক্তিবিভোর হইয়া থাকেন, তিনি অবশ্য সেই ঠেলাঠেলি ধাক্কাধাক্কিতে মহাকালের ত্রিশূলাস্ফালনের ছায়া দেখিয়া রোমাঞ্চিত হইয়া উঠেন। যাঁহার মন সর্ব্বদাই ভক্তিরসে আর্দ্র, তাঁহার পক্ষে সকল স্থলেই সাত্ত্বিকভাবের উদয় হওয়া স্বাভাবিক। সেরূপ সিদ্ধপুরুষের

কথা স্বতন্ত্র! কিন্তু বিজাতীয় শিক্ষাদীক্ষায় যাহাদের ভক্তির উৎস শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, তাহাদের সেই উৎস উৎসারিত হইলে বুঝিতাম যে, প্রকৃতই বিশ্বেশ্বরমাহাত্ম্য অসীম—'তন্মহত্বং মহত্বম্'।

আজকাল ইংরেজনিন্দা ও স্বদেশানুরাগ সমার্থবোধক হইয়া উঠিয়াছে। এই ইংরেজবিদ্বেষ ও স্বজাত্যনুরাগের দিনে খ্রীষ্টান ইংরেজের প্রশংসা ও হিন্দুসমাজের নিন্দা করিলে পাঠকগণের বিরাগভাজন হইতে হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু সত্যের ও ন্যায়ের অনুরোধে বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, খ্রীষ্টান ইংরেজের গির্জ্জায় কি সুশৃঙ্খলা, নিরুপদ্রবতা ও প্রগাঢ় শান্তি বিরাজমান, আর হিন্দুর দেবমন্দিরে কি ঠেলাঠেলি, কি ভিড়, কি হট্টগোল! এই মূর্ত্ত শব্দকল্লোলও সাকারোপাসনার একটা অঙ্গ নাকি? আমরাই আবার হিন্দুধর্ম্মের আধ্যাত্মিকতা লইয়া আস্ফালন করি ও খ্রীষ্টানজগতের ঘোর materialism লইয়া টিট্‌কারী দিই। মহান্ত ও সেবায়তগণের কলুষিত চরিত্র ও বিকট তাণ্ডবলীলা দেখিয়া আমাদের চৈতন্য হয় না, আর সরকারবাহাদুর Religious Endowment Act পাস্ করিতে গেলে আমরা 'জাতি গেল, ধর্ম্ম গেল, সমাজবন্ধন টুটিল' বলিয়া চীৎকার করিতে লজ্জিত হই না। তাই বলি, এই উৎকট স্বদেশীয়তার দিনে পরমুখপ্রেক্ষী না হইয়া ঘরের গলদ সারিয়া লইতে, তীর্থকলঙ্ক দূর করিতে হিন্দুসাধারণের সজীব ও সচেষ্ট হওয়া উচিত। আর যদি আমরা এই সামাজিক সংস্কার সাধন করিতে অপটু হই, তবে অভিমান ত্যাগ করিয়া সরকারবাহাদুরের হাতে এই ভার সরাসর সঁপিয়া দিয়া আমাদের জাতীয় অক্ষমতা স্বীকার করাই শ্রেয় নহে কি? সতীদাহ, গঙ্গাসাগরে সন্তানবিসর্জ্জন প্রভৃতি নৃশংসপ্রথা উৎসাদন করিতে আমাদিগকে বিধর্ম্মী রাজার শরণাপন্ন হইতে হইয়াছিল, এ কথা ভুলিলে চলিবে না। হাজারও চীৎকার করি আর স্বদেশীভাণ করি, আজও তাহাই আমাদের জাতির উপযুক্ত পথ। স্বাবলম্বন এ জাতির কোষ্ঠীতে লেখে নাই।

স্নানের ঘাটগুলির মধ্যে দশাশ্বমেধঘাট সর্ব্বপ্রধান। এই ঘাটে যত স্ত্রীপুরুষ স্নান করে, এত বোধ হয় আর কোন ঘাটেই নহে। তন্মধ্যে বাঙালীর সংখ্যাই বেশী। প্রাতে ও সন্ধ্যায় সারিসারি স্ত্রীপুরুষ ঘাটে আসনে বসিয়া সন্ধ্যাহ্নিক করিতেছেন, কেহ কেহ বা সাধুসন্ন্যাসীদের সহিত ধর্ম্মালাপ করিতেছেন, এ দৃশ্যটি অতি পবিত্র। বিজয়াদশমীর দিন বিসর্জ্জনের জন্য সমস্ত প্রতিমা এই ঘাটে আনীত হয়। সহস্র সহস্র কুলবধূ নিকটস্থ অট্টালিকাসমূহের গবাক্ষ বা ছাদ হইতে উৎসুকনয়নে প্রতিমা দেখিতেছে, সে দৃশ্যটি পরমরমণীয়। তৎকালে ঘাটে পুরুষেরও বিলক্ষণ জনতা হয়। এখানকার গঙ্গাজল সুস্নিগ্ধ, স্নানে শরীর জুড়ায় এবং চিত্তে অভূতপূর্ব্ব শান্তি ও পবিত্রতার উদয় হয়; তাই মনে হয়, স্নানে পাপক্ষয় হওয়ার কথাটা নিতান্ত পৌরাণিক উপকথা না হইতেও পারে। ঘাটের অবস্থা দেখিয়া কিন্তু ব্যথিত হইতে হয়। ঘাটের উপরিভাগ ও সোপানশ্রেণী মনুষ্যমূত্রের গন্ধে এবং কুক্কুরবিষ্ঠায় (ইহার মধ্যে মনুষ্যকুক্কুরও আছে) অশ্রদ্ধা ও বিতৃষ্ণা জন্মাইয়া দেয়। গঙ্গাস্নানে যাতা-

রাস্তের গলিগুলিরও এই দুর্দ্দশা। ইহা হিন্দু-সমাজের নিতান্ত লজ্জার বিষয়। মিউনি-সিপ্যালিটির ত দেখিতেছি এদিকে যত্ন নাই। শুনিয়াছি, কাশীস্থ হিন্দুসমাজ নিষ্ঠাবান্; বাঙালীকে অনাচারী বলিয়া আমাদের 'পশ্চিমা' জ্ঞাতিগণ টিট্‌কারী দেন, কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের কেন্দ্রস্থল সুপবিত্র বারাণসীধামের অপরিচ্ছন্নতা-বিষয়ে তাঁহারা এত নিশ্চেষ্ট কেন? এই সকল স্থলেই হিন্দুজাতি ও খ্রীষ্টান ইংরেজজাতির মধ্যে প্রভেদ বেশ বুঝিতে পারা যায়।

কাশীতে নানারূপ অনাচার-ব্যভিচার অহরহ আচরিত হইতেছে। অনেক কলুষিত-চরিত্র নরনারী এখানে আশ্রয় লইতেছে ও 'যেষাং কুত্র গতির্নাস্তি তেষাং বারাণসী গতিঃ' এই বাণীর সার্থকতা সম্পাদন করিতেছে। এই কারণে অনেক ইংরেজী শিক্ষিতলোকের এই স্থানের উপর একটা বিষম অশ্রদ্ধা আছে। কিন্তু আমার মনে একদিনের তরেও সেরূপ অশ্রদ্ধার উদ্রেক হয় নাই। পবিত্র জাহ্নবী-সলিলে বিষ্ঠামূত্র-আবর্জ্জনাদি পড়িতেছে, তাহাতে কি জাহ্নবীবারির পবিত্রতা নষ্ট হয়? পতিতপাবনী সুরধুনীর ন্যায় বিশ্বনাথের পুরীও পাপীর সংস্পর্শে কলঙ্কিত হয় নাই, বরং পাপীদিগকে নিজক্রোড়ে স্থান দিয়া তাহাদের পাপক্ষালনের পথ দেখাইতেছে।

হিন্দুজাতির অন্যতম কীর্ত্তি মানমন্দিরের দুর্দ্দশা দেখিলে চক্ষে জল আসে,—হিন্দুজাতি যে সত্যসত্যই অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িয়াছে, তাহার আর দ্বিতীয় প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। হিন্দুজাতি অন্যনিরপেক্ষ হইয়া জ্যোতিষশাস্ত্রে কতদূর উন্নতিলাভ করিয়াছিল, তাহার অকাট্যপ্রমাণ এই মানমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত যন্ত্রনিচয়। কিন্তু মানমন্দিরের নিম্নতল এখন গোশালায় পরিণত হইয়াছে, গোমূত্র ও গোময়ের গন্ধে সমস্ত পুরী আমোদিত। এই সকল দেখিলেই হৃদয়ঙ্গম হয় যে, প্রাচীন হিন্দুজাতি সকল বিষয়েরই ধর্ম্মের সহিত সংযোগ রাখিয়া কি দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন। এই মানমন্দিরের যদি ধর্ম্মের সঙ্গে সামান্যমাত্রও সংযোগ থাকিত, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির মধ্যে যদি একটি পাষাণবিগ্রহ দেবতারূপে স্থাপিত হইতেন, তাহা হইলে এই মানমন্দিরের চেহারা ফিরিয়া যাইত। Pure intellectএর ব্যাপারে সাধারণলোকের মন কখনই আকৃষ্ট হয় না। তাই আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ গ্রহণ, তিথি, নক্ষত্র, ঋতু-পরিবর্ত্তন প্রভৃতি প্রাকৃতিক ঘটনার সঙ্গে ধর্ম্মের সূত্র গাঁথিয়া দিয়া সেগুলির দিকে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের অমোঘ উপায় বিধান করিয়া গিয়াছেন। আমরা অদূরদর্শী হইয়া পড়িয়াছি, তাই আধুনিক সভ্যতার প্রসাদে সেগুলিকে কুসংস্কার বলিয়া উড়াইয়া দিই।

দেবদর্শনে হৃদয় বিমল আনন্দ, বিস্ময় ও ভক্তিরসে আপ্লুত হয় নাই। এখানকার পনর-আনা দেববিগ্রহই পাষাণময় শিবলিঙ্গ। বিশ্বেশ্বর, কেদারেশ্বর, নকুলেশ্বর, তিলভাণ্ডেশ্বর, পাতালেশ্বর, পুষ্পদন্তেশ্বর, সকলেরই সেই এক ধাঁচা; গঠনে কোন কারিকুরীর চিহ্ন নাই, মন্দিরগুলির ভিতরেও কোন কারুকার্য্য বা গঠনপরিপাট্য নাই, সহজ মানবমনে কোন বিরাট্‌ভাবের উদ্রেক করিবার শক্তি এই পাষাণখণ্ডের ও পাষাণস্তূপের নাই। মানবজাতির ইতিহাসে এমন একদিন ছিল, যখন "গুঁড়িকাষ্ঠ-নুড়ি-শিলা ভক্তিপথে নেয়ে" হইলেই মানব-

মন কৃতার্থ হইত। এ সমস্ত সেই বহুপ্রাচীন-যুগের নিদর্শন-(relic)-হিসাবে মূল্যবান্, সন্দেহ নাই; কিন্তু আধুনিক মানবের মনে এতই পরিবর্ত্তন হইয়াছে যে, এই পাষাণ-বিগ্রহে তাহার তৃপ্তি হয় না। তাহার উপর আবার এই লিঙ্গমূর্ত্তিতে শারীরতত্ত্বের যে ব্যাপারটি রূপিত হইয়াছে, তাহাতে আধুনিক মানবমনে জুগুপ্সা ও লজ্জার উদয় হয়, ধর্ম্ম-সাধনের কোন সহায়তা হয় না। কবিত্ব-প্রবণ হৃদয়ে বড় জোর ল্যাটিন্‌কবি Lucretiusএর ভীনস্-স্তোত্র স্মরণ করাইয়া দেয়, এই পর্য্যন্ত। Phallus worshipএর দিন-কাল চলিয়া গিয়াছে; তবে বিশাল হিন্দুধর্ম্মে নাকি ধর্ম্মের সকল স্তরই অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশ্রিত, বৈদিক ঋকের প্রকৃতিপূজা, উপনিষদের নির্গুণব্রহ্মোপাসনা, পৌরাণিক বিগ্রহসেবা, অবতারবাদ, apotheosis, anthropomorphism, প্রেতপূজা, পিতৃগণের প্রেতাত্মার পূজা, গাছপাথরের পূজা ইত্যাদি সকল তত্ত্বই ইহার অন্তর্নিবিষ্ট; সকল শ্রেণীর অধিকারীর জন্য ইহা সৃষ্ট, 'ভাবনা যাদৃশী যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী' ইহার মূলমন্ত্র, তাই আধ্যাত্মিক জীবনে চরম উন্নতি লাভ করিয়াও হিন্দুজাতি ধর্ম্মসাধনায় লিঙ্গপূজার জন্যও স্থান রাখিয়াছেন; আধুনিক হিসাবে ইহা অবশ্য কুরুচি-ব্যঞ্জক বলিয়াই বিবেচিত হইবে। যাহা হউক, এ সকল পরমতত্ত্বের রহস্যোদ্ভেদে প্রযত্নশীল না হইয়া সোজাসুজি মনের কথাটা বলিয়া ফেলি। কল্পনায় আঁকিয়াছিলাম যে, বিশ্বজীবের প্রতিনিধিস্বরূপ দেবদেব বিশ্বেশ্বর ভিখারীবেশে অন্নপূর্ণার দ্বারে দণ্ডায়মান, আর বিশ্বজীবের অন্নদাত্রী মহামায়া অন্নপূর্ণা স্বর্ণহাতা দিয়া স্বর্ণস্থালী হইতে অমৃতস্বাদু পায়সান্ন দিতেছেন, মুখশ্রীতে অনন্ত করুণা; সেই পায়সভোজনে অনন্ত জীবের অনন্ত ক্ষুধা অনন্তকালের জন্য প্রশমিত হয়—'Whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst.'

আর এখানে আসিয়া দেখিলাম, সম্পূর্ণ অন্যরূপ, তখন Wordsworthএর And is this—Yarrow? শীর্ষক কবিতাটি মনে পড়িল। তবে শুনিলাম, সুবর্ণময় বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা ও আছেন, তাঁহারা কেবল উৎসববিশেষে লোকলোচনের বিষয়ীভূত হন।* অন্য যে দুইচারিটি অন্য প্রকারের দেবমূর্ত্তি দেখিলাম, তাহারও গঠনপ্রণালীতে মনের তৃপ্তি হইল না। আমাদের প্রদেশে (নবদ্বীপে) কুম্ভকারেরা সামান্য মৃত্তিকাদ্বারা যে সুঠাম দেবদেবীমূর্ত্তি গড়ে, তাহার তুলনায় এ সমস্ত মূর্ত্তিকে নিতান্ত crude ও পারিপাট্যবিহীন না বলিয়া থাকা যায় না। আর যাঁহারা য়ুরোপীয় শিক্ষাদীক্ষা লাভ করিয়া প্রাচীন গ্রীক্‌জাতির ও মধ্যযুগের ইতালীয় জাতির ভাস্কর্য্য ও চিত্র-শিল্পের পরিচয় পাইয়াছেন, এই সমস্ত মূর্ত্তি-দর্শনে তাঁহাদের কতদূর আশাভঙ্গ হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়।†

* এই প্রবন্ধ লেখার পর লেখকের ভাগ্যে দেওয়ালী উপলক্ষে সেই কাঞ্চনমূর্ত্তি দেখা ঘটিয়াছে এবং তাহাতে লেখকের কল্পনাবৃত্তিও কিয়ৎপরিমাণে চরিতার্থ হইয়াছে। তবে সাধারণত যাত্রীরা সে দৃশ্যে বঞ্চিত, কাজেই প্রবন্ধোক্ত বাক্যের প্রত্যাহার নিষ্প্রয়োজন।

† সমস্ত দেবমন্দির ও দেববিগ্রহ দেখিয়া মনে যে বিস্ময় ও হর্ষের উদয় না হইয়াছে, Queen's Collegeএর

সকল মূর্ত্তি দেখি নাই, দেখিবার সুবিধাও হয় নাই। সত্য কথা বলিতে কি, অনবরত শিবলিঙ্গ দেখিয়া দেখিয়া নিতান্ত একঘেয়ে বোধ হওয়ায় আর তত ঘুরিবার প্রবৃত্তিও হয় নাই। শাস্ত্রের মতে যিনি 'শরীরার্দ্ধং স্মৃতা', তাঁহারই উপর দেবদর্শনের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত ছিলাম; তাহাতে লোকসানও হয় নাই, কেন না, তিনিই ত 'পুণ্যাপুণ্যফলে সমা'। এইটুকু কেবল প্রণিধান করিলাম যে, বারাণসীধাম সর্ব্বতীর্থের সংক্ষিপ্তসার (epitome), অসিসঙ্গম হইতে আরম্ভ করিয়া বরণাসঙ্গম পর্য্যন্ত পরিক্রমণ করিলে হিন্দুশাস্ত্রোক্ত প্রধান প্রধান সকল দেবদেবীরই দর্শনলাভ ঘটে। হিন্দুস্থানের প্রকৃত রাজধানী বারাণসী, কলিকাতা নহে, এ কথার সত্যতা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছি। আরও একটি কারণে এই কথা হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়াছে। হিন্দুস্থানে যুগে যুগে যে সকল ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তৎসমুদয়ের সঙ্ঘর্ষ ও সমন্বয় এইখানেই ঘটিয়াছে। সৌর, গাণপত্য, শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি হিন্দুধর্ম্মের বিশেষ বিশেষ শাখা ত আছেই, ইহা ছাড়া বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে হিন্দুধর্ম্মের সঙ্ঘর্ষের পরিচয় বারাণসীধাম হইতে কয়েকমাইল দূরে সারনাথনামক স্থানে পরিস্ফুটরূপে পাওয়া যায়। বৌদ্ধস্তূপের অনতিদূরে সারনাথেশ্বরনামক শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠা দেখিয়া উভয় ধর্ম্মের সঙ্ঘর্ষ ও সমন্বয়ের সুন্দর ইতিহাস পাওয়া যায়। এদিকে আবার প্রাচীন বিশ্বেশ্বরের মন্দির মুসলমানের মস্‌জিদে পরিণত হইয়াছে এবং বিন্দুমাধবের মন্দিরের পার্শ্বেই মুসলমানের মস্‌জিদের অভ্রভেদী চূড়া (ইহাকেই অজ্ঞ লোকে 'বেণীমাধবের চূড়া' বলে) রহিয়াছে, ইহাতে আর্য্যধর্ম্ম ও ইস্‌লামধর্ম্মের সঙ্ঘর্ষ ও সমন্বয়ের সুস্পষ্ট পরিচয় দেয়। এখনও কাশীর মধ্যস্থলে খ্রীষ্টানের গির্জ্জা ও হিন্দুর শিবমন্দির পাশাপাশি উচ্চচূড়া উত্তোলন করিতেছে, ইহাতেও হিন্দুস্থানের আধুনিক ধর্ম্মভেদের বিলক্ষণ আভাস পাওয়া যায়। তাই বলিতেছিলাম, হিন্দুস্থানের প্রকৃত রাজধানী ও সংক্ষিপ্তসার এই বারাণসীধাম, ঐতিহাসিকের চক্ষে ইহার interest অসীম।

* * * *

পূর্ব্বে বলিয়াছি বটে, দেববিগ্রহ বা দেবমন্দির, ঘাট বা রাস্তা দেখিয়া মনে তত তৃপ্তি হয় নাই। তথাপি বলিব, যে কয়দিন কাশীবাস করিয়াছিলাম, মনের শান্তিতে কাটাইয়াছিলাম। কেন, জিজ্ঞাসা করিলে খোলসা উত্তর দিতে পারিব না। প্রত্নতত্ত্বে কখন অনুরাগী নহি, কাজেই কাশীর প্রাচীনতায় ও ঐতিহাসিক রহস্যে মনে এই ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহা সাহস করিয়া বলিতে পারি না। পুণ্যসঞ্চয়ে তাদৃশ উৎসাহ দেখাই নাই, কাজেই পুণ্যার্জ্জনে মনস্তুষ্টি হইয়াছিল, এ কথাও পাপমুখে বলিতে প্রবৃত্তি হয় না। কাশীতে

স্থাপত্যশিল্প দেখিয়া তাহা হইয়াছে। তবে এ কথাটা সাহস করিয়া বলিতে পারি না, পাছে পাঠকমহাশয় উপহাস করিয়া বলিয়া উঠেন—এক বিধবা জগন্নাথদর্শনে গিয়া কেবল সূতার নাটাই ঘুরিতে দেখিয়াছিলেন, শিক্ষা-ব্যবসায়ীও সেইরূপ দেবদর্শন করিতে গিয়াও নিজের ব্যবসার কথা ভুলেন নাই। তবে ভরসা আছে, যিনি Queen's college এ কথার স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, তিনি কথাটা নেহাৎ হাসিয়া উড়াইয়া দিবেন না।

খাদ্যসুখ আছে বটে, কিন্তু কলিকাতাবাসী অম্লরোগীর পক্ষে সেটা বিশেষ একটা সুসংবাদ নহে, কাজেই মিষ্টরসে রসনা সুতৃপ্ত হইয়াছে বলিয়া কাশীর গুণগান করিতেছি বলিলেও সত্যের অপলাপ হয়। কাশীর দৃশ্য নয়নমনোরঞ্জন বটে,—রেলগাড়িতে বসিয়াই রাজঘাটষ্টেশনে না পৌঁছিতেই গঙ্গাবক্ষোবিলম্বী সেতুবন্ধের উপর হইতে ক্রোশব্যাপী অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি যে বিচিত্র পুরী দেখা যায়, তাহাতেই প্রাণমন কাড়িয়া লয়। এরূপ দৃশ্য সমগ্র জগতেও অতুলনীয়। পূর্ণিমা-রজনীতে দশাশ্বমেধঘাটে কূলে কূলে জল, সেই জলে অর্দ্ধপ্রোথিত প্রস্তরমন্দিরের চাতাল হইতেও আবার এই রমণীয় দৃশ্য প্রাণ ভরিয়া দেখিয়াছি। জ্যোৎস্নারাত্রে জাহ্নবীসলিলসঞ্চারী নৌকা হইতেও এই দৃশ্য নয়নগোচর হইয়াছে। কাশীপ্রবেশকালে এই দৃশ্য প্রাণমন অধিকার করে এবং ইহারই প্রভাবে সমস্ত মধুময় হইয়া উঠে; অগণিত মন্দিরচূড়া, পাথরের দ্বিতল, ত্রিতল, চৌতল ভবন, ভিত্তিগাত্রে বিচিত্র চিত্রাবলী, গোটা-পাথর-মোড়া গলিরাস্তা, কোথাও উচ্চ, কোথাও নিম্ন, গঙ্গাতটে যেন গঙ্গাগর্ভ হইতে উত্থিত হইতেছে এরূপ সুরম্য অত্যুচ্চ অট্টালিকাশ্রেণী, অসংখ্য পাষাণ-সোপানশ্রেণী, আর পুরীর পাশ দিয়া বাঁকিয়া ভাগীরথী কুলকুলরবে বহিতেছেন, এ সমস্তই কাশীর দৃশ্যকে লোভনীয় করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু এই মনোলোভা পুরীশোভা দেখিয়াই ত মনে এইরূপ সুখের ফোয়ারা খেলার কথা নহে, আরও ত অনেক দেশে অনেক সুন্দর সহর, সুরম্য হর্ম্ম্য, পুণ্যবতী স্রোতস্বতী দেখিয়াছি, কৈ আর কোথাও ত মনে এরূপ ভাবের উদয় হয় নাই। তাই মনে হয়, বৈদিক ঋষি, পুরাণবর্ণিত রাজা প্রভৃতি প্রাচীনকালের মহাপুরুষগণ হইতে আরম্ভ করিয়া এই ঘোর কলিকালে ত্রৈলঙ্গস্বামী, ভাস্করানন্দস্বামী, বিশুদ্ধানন্দস্বামী প্রভৃতি মহাপুরুষগণ পর্য্যন্ত যে সকল সিদ্ধপুরুষ এই পবিত্র পুরীতে বিচরণ করিয়াছেন, তাঁহাদের চরণরজ এই পুরীর প্রত্যেক ধূলিকণার রেণুতে রেণুতে মিশ্রিত রহিয়াছে, সেই চরণ-রেণুর স্পর্শে স্পর্শে আমাদের হৃদয়মন বিমল শান্তিতে ভরিয়া যায়, প্রাণে কেমন একটা বৈরাগ্যের ভাব আসে, পুণ্যভূমি ছাড়িতে চোখে জল আসে, হৃদয়ে শূন্যতার অনুভব হয়;—আমরা স্থূলদৃষ্টিতে বুঝিয়া উঠিতে পারি না, কেন এমন হয়?

* * * * *

এই চাকরিগতপ্রাণ অধম লেখকের আজ কাশীবাসের শেষদিন। সায়াহ্ণ উপস্থিত, দশাশ্বমেধঘাটে কাষ্ঠবেদিকায় আসীন হইয়া কেহ সাধুসন্ন্যাসীর সহিত ধর্ম্মালাপে ব্যাপৃত, কেহ সন্ধ্যাবন্দনাদিতে রত; কাষ্ঠবেদিকার এক পাশে ক্রিয়াকাণ্ডহীন নব্যতন্ত্রের লেখক বিষণ্ণমনে বসিয়া আছেন। সূর্য্যাস্তকালের আকাশের রক্তিমরাগ দেখিতে দেখিতে বিলীন হইল, গঙ্গাতটে, গঙ্গাজলে, পরপারবর্ত্তী বনানী-মধ্যে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল, লেখকের হৃদয়ও কি যেন-কি-এক অব্যক্ত বিষাদে ভরিয়া গেল, এই শান্তিপবিত্রতানিলয় পুণ্যনিকেতন ছাড়িয়া যাইতে হইবে বলিয়া হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়িল। আত্মতত্ত্ববিহীন জনের পক্ষে পশুর ন্যায় এই মূকশোকই একমাত্র সম্বল।

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রাচীন সামাজিক চিত্র

বহুবিবাহনিরোধের চেষ্টা ও বিফলতা।

বৈদিকসাহিত্য আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, সে সময়ে সমাজে বহুবিবাহের বহুলপ্রচার ছিল। সপত্নীগণ পরস্পরের প্রভাব বিনষ্ট করিবার জন্য যেরূপ চেষ্টা করিতেন, ঋগ্বেদে তৎসম্বন্ধে অনেকগুলি মন্ত্র দৃষ্ট হয়। এই সকল মন্ত্র অবলম্বন করিয়া কল্পসূত্রকারগণ বিশেষ বিশেষ বিধি প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। প্রবন্ধান্তরে এ বিষয় আলোচনা করিবার ইচ্ছা থাকিল। পরবর্ত্তী সময়ে এই বহুবিবাহপদ্ধতিকে নিরোধ করিবার চেষ্টা করিয়াও যে কোন ফল পাওয়া যায় নাই, তাহারই একটি কৌতুকাবহ চিত্র বর্ত্তমান প্রবন্ধে পাঠকগণের নিকট উপস্থিত করিতেছি।

চিরপ্রচলিত বহুবিবাহপদ্ধতিকে শাস্ত্রকারগণ একবাক্যে সহসা নিষেধ করিতে না পারিলেও, কৌশলে তাহা করিয়া গিয়াছেন। যে প্রকারে হউক, দ্বিতীয় দারগ্রহণ পর্য্যন্ত তাঁহারা বেশ অনুমোদন করিয়াছেন, চতুর্থ দারপরিগ্রহও তাঁহারা নিষেধ করেন নাই। কিন্তু তৃতীয় দারগ্রহণ নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন—'মোহ বা অজ্ঞানেও রতিসিদ্ধির নিমিত্ত তৃতীয়াকে বিবাহ করিবে না ; কেন না, তৃতীয়া মানবীর সহিত সংসর্গ হইলে নষ্ট হইতে হয়।'—'তৃতীয়াকে বিবাহ করিলে, ঐ কন্যা বিধবা হয়।'—ইত্যাদি। * কিন্তু এই বচনানুসারে বহুদিন কার্য্য চলে নাই। বহুবিবাহপক্ষপাতিগণ নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারিলেন না। তাঁহারা দেখিলেন, প্রাচীনগণ তৃতীয়বিবাহ নিষেধ করিয়াছেন, চতুর্থবিবাহ ত নিষেধ করেন নাই। অতএব তাঁহারা বস্তুত তৃতীয়-বিবাহকে চতুর্থরূপে প্রমাণ করিবার জন্য বদ্ধ-পরিকর হইলেন ও তাহাতে অদ্ভুত বুদ্ধি-কৌশল প্রদর্শন করিলেন।

শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন, তৃতীয় 'মানুষী'কে বিবাহ করিতে হইবে না, অতএব মানুষী ভিন্ন অপর কাহাকেও বিবাহ করিলে কোন দোষ হইতে পারে না, অথচ শাস্ত্রবাক্যও পালন

---

* "উদ্বহেদ্রতিসিদ্ধ্যর্থং তৃতীয়াং ন কদাচন।
মোহাদজ্ঞানতো বাপি যদি গচ্ছেৎ তু মানবীম্।
নশ্যত্যেব ন সন্দেহো গার্গস্য বচনং যথা॥"

মৎস্যপুরাণ।

"তৃতীয়াং যদি চোদ্বাহেৎ তর্হি সা বিধবা ভবেৎ।"

পারস্কর-গৃহ্যসূত্রের গদাধরভাষ্য ও নির্ণয়সিন্ধুধৃত সংগ্রহগ্রন্থবচন।

করা হইবে। এই ভাবিয়া তাঁহারা ব্যবস্থা করিলেন যে, যে ব্যক্তি তৃতীয়বার দারগ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে, তাহাকে প্রথমে 'অর্ক'-বৃক্ষকে বিবাহ করিয়া পরে মানবীকে বিবাহ করিতে হইবে। এইরূপ করিলে তৃতীয়-বিবাহ হইল অর্কবৃক্ষের সহিত এবং মানবীর সহিত বিবাহ হইল চতুর্থ। শাস্ত্রকারগণ চতুর্থ মানবীবিবাহ নিষেধ করেন নাই। তাঁহাদের বচন এই :—

"তৃতীয়াং যদি চোদ্বাহেৎ তর্হি সা বিধবা ভবেৎ।
চতুর্থাদিবিবাহার্থং তৃতীয়েঽর্কং সমুদ্বহেৎ।" *

'যদি তৃতীয়া মানবীকে বিবাহ করা যায়, তবে সে বিধবা হয় (অর্থাৎ 'বিবাহকারীর মৃত্যু হয়); অতএব চতুর্থ প্রভৃতি বিবাহের জন্য তৃতীয়বিবাহস্থানে অর্কবৃক্ষকে বিবাহ করিবে।'

এই অর্কবিবাহের পদ্ধতি নিম্নলিখিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। শনিবার বা রবিবারে হস্তানক্ষত্রযোগে, অথবা অপর কোন শুভদিনের পূর্ব্বাহ্নে গ্রামের পূর্ব্ব বা উত্তর দিকে পুষ্পফল-যুক্ত অর্কবৃক্ষের তলে যথাবিধি স্থণ্ডিলাদি নির্ম্মাণ করিতে হইবে। এই সময়ে বিবাহ-কর্ত্তা স্নান করিয়া রক্তবসন ধারণ করিবেন ও রক্তচন্দনাদিদ্বারা ভূষিত হইবেন। স্থণ্ডিলাদি-নির্ম্মাণের পর বিবাহার্থী অর্কবৃক্ষের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া প্রার্থনা করিবেন—'হে ত্রিলোকবাসিন্ সপ্তহয়যুক্ত সূর্য্য, আপনি ছায়ার সহিত অবস্থান করেন, আপনি আমার তৃতীয়বিবাহজাত দোষ নিবারণ করিয়া সুখ উৎপাদন করুন।' † অনন্তর সেই অর্কবৃক্ষে ছায়াসহিত সূর্য্যকে অধিষ্ঠিত চিন্তা করিয়া তত্তন্মন্ত্রে বস্ত্র, মাল্য ও গন্ধ প্রভৃতি দ্বারা তাঁহাদের পূজা করিতে হয়। এই পূজার নৈবেদ্য গুড়োদন। পূজার সময় অর্কবৃক্ষকে শ্বেতবস্ত্রদ্বারা বেষ্টিত করিয়া তদুপরি কার্পাস-তন্তুদ্বারা পুনর্ব্বার বেষ্টন করা বিধেয়। অর্চ্চনা শেষ হইলে অর্কবৃক্ষকে প্রদক্ষিণ করিয়া এই মন্ত্রটি জপ করিতে হয়—

"মম প্রীতিকরা চেয়ং ময়া সৃষ্টা পুরাতনী।
অর্কজা ব্রহ্মণা সৃষ্টা অস্মাকং পরিরক্ষতু॥"

'এই যে পুরাতনী অর্ককন্যাকে পূর্ব্বে ব্রহ্মা ও পরে আমি সৃষ্টি করিয়াছি, যিনি আমাকে প্রীতিপ্রদান করিতেছেন, তিনি আমাদিগকে রক্ষা করুন।'

জপের শেষে পুনর্ব্বার বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে প্রদক্ষিণ করিতে হয়—

"নমস্তে মঙ্গলে দেবি নমঃ সবিতুরাত্মনে।
ত্রাহি মাং কৃপয়া দেবি পত্নীত্বং মে ইহাগতা॥
অর্ক ত্বং ব্রহ্মণা সৃষ্টঃ সর্ব্বপ্রাণিহিতায় চ।
বৃক্ষাণামাদিভূতস্ত্বং দেবানাং প্রীতিবর্দ্ধনঃ।
তৃতীয়োদ্বাহজং পাপং মৃত্যুং চাশু বিনাশয়॥

'হে মঙ্গলকারিণি, হে দেবি, আপনাকে নমস্কার; আপনি সবিতার আত্মস্বরূপ, আপনাকে নমস্কার। হে দেবি, করুণাপূর্ব্বক আপনি আমার পত্নীত্ব গ্রহণ করিয়া আমাকে রক্ষা করুন। হে অর্ক, সর্ব্বপ্রাণীর মঙ্গলের জন্য ব্রহ্মা আপনাকে সৃষ্টি করিয়াছেন; আপনি সমস্ত বৃক্ষের মধ্যে শ্রেষ্ঠভূত এবং আপনি দেবগণের প্রীতিবর্দ্ধন করিয়া থাকেন,

* পূর্ব্বোক্ত-গ্রন্থদ্বয়-ধৃত সংগ্রহগ্রন্থবচন।

† ত্রিলোকবাসিন্ সপ্তাশ্ব ছায়য়া সহিতো রবে।
তৃতীয়োদ্বাহনং দোষং নিবারয় সুখং কুরু॥"

আমার তৃতীয়বিবাহোৎপন্ন দোষ ও মৃত্যুকে সত্বরে বিনাশ করুন।'

অনন্তর অর্ককন্যাপ্রদানের জন্য পূর্ব্ববৃত আচার্য্য যথাবিধি বরকে গন্ধ, মাল্য বস্ত্র, উষ্ণীষ, যজ্ঞোপবীত ও হস্তকর্ণাদিবিভূষণ অর্পণ করিয়া অর্ককন্যা সম্প্রদান করিবেন। কন্যাসম্প্রদানে ত্রিপুরুষের নাম ও গোত্রের উল্লেখ আবশ্যক। অর্ককন্যার গোত্র হইতেছে কাশ্যপ, প্রপিতামহ আদিত্য, পিতামহ সবিতা ও পিতা স্বয়ং আচার্য্য। * আচার্য্য এই মন্ত্রে কন্যাসম্প্রদান করিবেন -

'অর্ককন্যামিমাং বিপ্র যথাশক্তি বিভূষিতাম্।
গোত্রায় শর্ম্মণে তুভ্যং দত্তাং বিপ্র সমাশ্রয়॥'

'হে বিপ্র, যথাশক্তি অলঙ্কৃতা এই কন্যাকে অমুকগোত্র অমুকশর্ম্মা আপনাকে প্রদান করিলাম, আপনি গ্রহণ করুন।'

এই অর্ককন্যাবিবাহেও নান্দীশ্রাদ্ধ ও হোমাদি সমস্ত ব্যাপারই আছে।

পূর্ব্বে কার্পাসতন্তুদ্বারা অর্কবৃক্ষকে বেষ্টন করিবার কথা বলা হইয়াছে। গায়ত্রীমন্ত্রে ঐ সূত্র বেষ্টন করিতে হয়। কন্যাসম্প্রদান শেষ হইলে ঐ সূত্রকে পঞ্চগুণ করিয়া 'বৃহৎ-সাম'নামক প্রসিদ্ধ বৈদিকমন্ত্রে হস্তে কঙ্কণ (বিবাহের হস্তসূত্র) বন্ধন করিতে হয়। ঐ পঞ্চগুণ সূত্রের কিয়দংশ পুনর্ব্বার পঞ্চগুণ করিয়া স্কন্ধদেশে ধারণীয়।

এই সমস্ত কার্য্যকলাপ সম্পন্ন হইলে অর্কবৃক্ষের পূর্ব্বাদি চতুর্দ্দিকে ও আগ্নেয়াদি চতুর্দ্দিকে এক একটি জলকুম্ভ স্থাপন করিয়া, প্রত্যেক কুম্ভে এক একখানি বস্ত্র দিয়া তিনবার করিয়া সূত্রদ্বারা বেষ্টন করিতে হয়। এই সমস্ত কুম্ভ হরিদ্রা ও চন্দনযুক্ত শীতলজলে পূর্ণ করিয়া দিতে হয়। প্রত্যেক কুম্ভ এইরূপে স্থাপিত হইলে, তাহাদের উপর মহাবিষ্ণুর যথাবিধি অর্চ্চনা বিধেয়।

অনন্তর হোমাদি সম্পন্ন করিয়া বিবাহার্থী প্রার্থনা করিবেন—

'ময়া কৃতমিদং কর্ম্ম স্থাবরেষু জরায়ুণা।
অর্কাপত্যানি নো দেহি তৎ সর্ব্বং ক্ষন্তুমর্হসি॥'

'আমি জরায়ুজ হইয়া স্থাবরে এই কার্য্য করিলাম। হে অর্ক, সেই সমস্ত ক্ষমা করুন, আপনি আমাদিগকে অপত্য প্রদান করুন।' †

বঙ্গদেশে বরেন্দ্রসমাজে করণ করিবার সময় কুশপুত্তলের বিবাহ সম্ভবত এই তৃতীয় স্ত্রীবিবাহের আদর্শে প্রচলিত হইয়া থাকিবে। কুশপুত্তলদাহপদ্ধতিও এই শ্রেণীর;—কোন-রূপে শাস্ত্রার্থ রক্ষা করিয়া মিথ্যা সান্ত্বনা রক্ষা করা মাত্র।

শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী।

---

* অর্ককন্যার পিতৃপুরুষের নাম লইয়া একটু গোলমাল বোধ হয়। পারস্করগৃহ্যসূত্রের গদাধরভাষ্যধৃত পুরাণবচন এই :—

"ততশ্চ কন্যাবরণং ত্রিপুরুষং কুলমুচ্চরেৎ।
আদিত্যঃ সবিতা সূর্য্যঃ পুত্রী পৌত্রী চ নপ্তৃকা।
গোত্রং কাশ্যপ ইত্যুক্তং লোকে লৌকিকমাচরেৎ॥"

কমলাকরভট্ট নির্ণয়সিন্ধুতে বলিয়াছেন :—

"কাশ্যপগোত্রাম্ আদিত্যপ্রপৌত্রীং সবিতুঃ পৌত্রীং 'মম' পুত্রীম্ অর্ককন্যামমুকগোত্রায় বরায় দাস্যে।"

† এই তৃতীয়স্ত্রীবিবাহবিবরণ মৎস্য ও ব্রহ্ম প্রভৃতি পুরাণে পাওয়া যায়। ব্যাস ও শৌনক প্রভৃতিও তাহা লিখিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধ কমলাকরভট্টের নির্ণয়সিন্ধু ও গদাধরকৃত পারস্করগৃহ্যসূত্রের ভাষ্য হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে।

অসময়ে।

আমার কুঞ্জকুটীরদুয়ারে
অতিথি এসেছে আজ
তুলি নাই ফুল, গাঁথি নাই মালা,
শূন্য পড়িয়া কুসুমের ডালা
নিবিয়া আসিছে দিনের আলোক
এখন আসিছে সাঁঝ
কি দিয়া তুষিব অতিথে আমার
সে যে রাজ-অধিরাজ।

ঘন-ঘোর-মেঘ-ঘেরা দুর্দ্দিনে
অতিথি এসেছে আজ
চারিধার আজ, জলে জলময়
ক্ষুব্ধ পবন ঘনঘন বয়
কেন নাথ, তুমি এলে অসময়
এখন আসিছে সাঁঝ
কি দিয়া তোমারে তুষিব আজিকে
কি দিয়া রাখিব লাজ।

আসিতে হে যদি নব ফাল্‌গুনে
ওগো রাজ-অধিরাজ
হৃদিনিকুঞ্জ — ফুলসম্ভার
সব সঁপিতাম, চরণে তোমার
মালতীর লতা এখন আমার
রিক্ত-কুসুম-সাজ,
মরণের তটে কি দিয়ে বাসর
সাজাব বল গো আজ।

শ্রীজঃ—

——*——

কৈকেয়ী।

অযোধ্যা হইতে আগত দূতগণের নিকট ভরত স্বীয় মাতার কুশলসংবাদজিজ্ঞাসার সময়ে এইভাবে তাঁহার উল্লেখ করিয়াছিলেন,—"আত্মকামা সদা চণ্ডী ক্রোধনা প্রাজ্ঞমানিনী।" কৈকেয়ীর কোন কামনা জীবনে প্রতিহত হয় নাই, সুতরাং অতিমাত্র আদরে বর্দ্ধিত শিশু যেরূপ কাম্যবস্তু না পাইলে কিছুতেই শান্তভাব ধারণ করে না, কৈকেয়ী প্রৌঢ়-বয়সেও কতকটা সেইরূপ ছিলেন, আত্মসংযম একেবারেই শেখেন নাই। ইহার উপর তিনি আবার "প্রাজ্ঞমানিনী" ছিলেন—স্বীয় বুদ্ধির উপর তাঁহার প্রবল আস্থা ছিল; সুতরাং প্রৌঢ়ার দৃঢ়তা ও শিশুর অসংযম, এই দুই উপাদান তাঁহার চরিত্রে মিশ্রিত হইয়াছিল। রামবনবাসাদি ব্যাপার ঘটিবার বহুপূর্ব্ব হইতে ভরতের মাতৃচরিত্রসম্বন্ধে এইরূপ ধারণা ছিল।

ঈদৃশ চরিত্র দশরথ রাজার অতিশয় আদরে প্রস্তুত হইয়াছিল। দেবাসুরযুদ্ধে ক্লিষ্ট দশরথের উৎকট পরিচর্য্যা এবং রামবনবাসের ষড়যন্ত্র, এই দুই বিরুদ্ধ ঘটনা তাঁহার চরিত্রের অসামান্যত্ব সুস্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন করিতেছে,—উহা মাহাত্ম্যে যেরূপ অবাধ, নীচাশয়তায়ও সেইরূপ অবাধ। এরূপ চরিত্র সর্ব্বদাই প্রবল উত্তেজনায় কার্য্য করিয়া থাকে, উহা কেন্দ্রে সমাহিত থাকিবার নহে,—পরিধির এক প্রান্ত হইতে অসম্ভব দ্রুততায় অপর প্রান্তে চলিয়া যায়। মন্থরা যখন রামাভিষেকের সংবাদ প্রদান করিয়া কৈকেয়ীর ভাবী দুরবস্থার একটা দুঃসহ চিত্র অঙ্কন করিল এবং এতৎসম্বন্ধে তাঁহার ঔদাস্যের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বহুসংখ্যক যুক্তি উপস্থিত করিল, তখন কৈকেয়ী প্রথমত সেই সকল কথায় একেবারে কর্ণপাত করিলেন না, পরন্তু গগনে সমুদিত শুভ্র চন্দ্রলেখার ন্যায় প্রসন্নমুখে পর্য্যঙ্ক হইতে অর্দ্ধাঙ্গ উন্নমিত করিয়া স্বীয়বক্ষোবিলম্বিত মুক্তাহার মন্থরাকে প্রদান করিয়া বলিলেন—"তুমি যে অমৃতস্বরূপ প্রিয়বাক্য বলিলে, ততোধিক প্রিয় আমার আর কিছুই নাই, সুতরাং তোমাকে আমার পুরস্কার প্রদান করা উচিত;—তুমি যাহা প্রার্থনা করিবে, আমি তাহাই দিব।"

এই চিত্র হয় মহত্ত্বের শিখরদেশে প্রতিষ্ঠা পাইবে, না হয় নীচতার অধস্তন কোণে নিপতিত হইবে, ইহা মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত থাকিবার নহে। হিন্দুসমাজে গৃহলক্ষ্মী যে কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া পারিবারিক মণ্ডলটি প্রীতির আকর্ষণে আবদ্ধ রাখেন, অসম উপাদানগুলিতে ঐক্যের সমতা প্রদান করেন, অযোধ্যার রাজান্তঃপুরে কৌশল্যার সেই স্থান ছিল, তাহা কোনকালেই কৈকেয়ীর অধিগম্য হয় নাই। স্বেচ্ছাচারিণী রমণী মহৎগুণরাশি-সত্ত্বেও আমাদের সমাজে নিন্দিত হন—রমণীর নিজ ইচ্ছা বলিয়া কোন বস্তুর অস্তিত্ব

প্রকাশ পাওয়া পারিবারিক বিড়ম্বনার এক-শেষ—সকলের ইচ্ছার পালয়িত্রীরূপেই আমরা তাঁহাকে পূজা করিতে পারি।

রামবনবাসাদি ব্যাপারের পূর্ব্বেই কৈকেয়ীর চরিত্রের খলতার দিক্‌টাও অনেকাংশে বিকাশ পাইয়াছিল। কৌশল্যা রামচন্দ্রের নিকট বলিয়াছিলেন—"আমি কৈকেয়ীর পরিজনবর্গকর্ত্তৃক সর্ব্বদা নিগৃহীত হইয়া থাকি, কোন ভৃত্য আমার পরিচর্য্যায় মনোযোগী হইলে কৈকেয়ীর অন্তরঙ্গ কাহাকেও দেখিলে একান্ত ভীত হয়।"

কিন্তু কৌশল্যা এ সকল কথা কখন স্বামীকে বলেন নাই, পরন্তু সপত্নীকে সহোদরার ন্যায় প্রীতির চক্ষে দেখিয়াছেন, এ কথা আমরা দশরথের মুখে শুনিতে পাইয়াছি। কৈকেয়ী নিজেই রামচন্দ্রের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—"কৌশল্যাতোঽতিরিক্তঞ্চ মম শুশ্রূষতে বহু"—কৌশল্যা হইতেও রাম আমার অধিক শুশ্রূষা করিয়া থাকে।

সুতরাং চারিদিকের আদরযত্ন ও ক্ষমাশীলতায় তাঁহার চিত্তের অসংযম পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছিল, উহা স্নিগ্ধ ধর্ম্মভীরু রাজপুরীতে অলক্ষিতভাবে একটা ভীষণ কাণ্ড করিবার জন্য শক্তিসঞ্চয় করিতেছিল, একটা অমৃতভাণ্ডের মধ্যে পড়িয়া যেন তাঁহার চরিত্রের ক্রূর অংশটি বহুদিন প্রসুপ্ত ছিল—তাহা সময়ে সময়ে অলক্ষিতভাবে কৌশল্যাকে বিদ্ধ করিত, কেহ তাহা জানিতে পারিত না। রাজা স্বয়ং তরুণী ভার্য্যাকে প্রাণ হইতেও অধিক ভালবাসিতেন, সৌন্দর্য্যের কুহকে তিনি কৈকেয়ীচরিত্রের প্রকৃত পরিচয় পান নাই। রামাভিষেকসংক্রান্ত ঘটনায় তাঁহার চক্ষু সহসা উন্মুক্ত হইয়াছিল—ভয়বিমূঢ় হইয়া তিনি বলিয়াছিলেন—"হে উদ্বন্ধনি, আমি তোমাকে না জানিয়া কণ্ঠসংলগ্ন করিয়া রাখিয়াছিলাম।"

কৈকেয়ীর মাতা তাঁহার স্বামিহত্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, মাতা হইতে কৈকেয়ী চরিত্রের ক্রূরতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সুমন্ত্র রাজসভায় প্রকাশ্যভাবে সেই ঘটনাটির উল্লেখ করেন। রামাভিষেকব্যাপারে আমরা মন্থরাকেই সর্ব্বদা অভিযুক্ত করিয়া থাকি, কিন্তু অনিষ্টের বীজ কৈকেয়ীর চরিত্রের মধ্যে ছিল, মন্থরা তাহার বিকাশের উপলক্ষ্যমাত্র হইয়াছিল।

কিন্তু যে কৈকেয়ী "রামে বা ভরতে বাহং বিশেষং নোপলক্ষয়ে।" "যথা বৈ ভরতো মান্যস্তথা ভূয়োঽপি রাঘবঃ। রাজ্যং যদি হি রামস্য ভরতস্যাপি তত্তদা॥"—রাম এবং ভরতে আমি কোন প্রভেদই দেখি না, আমার নিকট রামও যেরূপ, ভরতও সেইরূপ, রাজ্য রামের হইলেই ভরতের হইল;—প্রভৃতি বাক্যে চিত্তের এতটা ঔদার্য্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তিনি মন্থরার কোন যুক্তিতে মতিচ্ছন্ন হইয়াছিলেন, তাহা বিচার্য্য।

কৈকেয়ীর পুত্রকে রাজ্যপ্রদান করিবেন, অশ্বপতির কাছে এইরূপ প্রতিশ্রুতি করিয়া দশরথ কৈকেয়ীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, * সেই প্রতিশ্রুতির কথা হয় ত দশরথের স্মৃতিপথে জাগ্রত ছিল, এইজন্যই তিনি রামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন—"ভরত তোমার অনুগত ও পরম ধার্ম্মিক। কিন্তু সে মাতুলালয়ে থাকিতে থাকিতেই তোমার অভিষেক হইয়া যায়,

* অযোধ্যাকাণ্ড, ১০৭ সর্গ ২—৩ শ্লোক।

ইহাই আমার ইচ্ছা—কারণ ধার্ম্মিক ব্যক্তির মনও বিচলিত হইতে পারে," কিন্তু ইক্ষ্বাকু-বংশের নিয়মানুসারে জ্যেষ্ঠপুত্রই রাজ্যের অধিকারী, সুতরাং এই আশঙ্কা তাঁহার মনে কেন হইয়াছিল, তাহার অন্য কোন ব্যাখ্যা আমরা ভাবিয়া পাই না। পূর্ব্বপ্রতিশ্রুতির ভয়েই হয় ত তিনি অশ্বপতিকে ও জনক-রাজাকে নিমন্ত্রণ করিলেন না। রামচন্দ্রকে বলিলেন—"ইহাদিগকে এখন নিমন্ত্রণ করিবার প্রয়োজন নাই।" শ্বশুরমহাশয় যদি উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বপ্রতিশ্রুতিপালনের জন্য বাধ্য করেন, তবে রাজর্ষি বৈবাহিক স্বীয় জামাতার ভাবিশুভকামনায়ও কখনই ন্যায়পথ হইতে বিচলিত হইবেন না—দশরথের মনে বোধ হয় এইরূপ আশঙ্কার উদয় হইয়া থাকিবে। এই অভিষেকব্যাপারে একটু স্থানে ছিদ্র ছিল, তাহা যে কোন-প্রকারে পূরণ করিয়া দশরথ দ্বিধাকম্পিতভাবে ত্রস্ততার সহিত এই কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু কৈকেয়ী সেই প্রতিশ্রুতির কথা জানিতেন না, সুতরাং রাজার মনে তৎপ্রতি কোন সন্দেহের উদয় হয় নাই।

কৈকেয়ী বারংবার মন্থরার সমস্ত আশঙ্কার কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু দুইটি কথায় তাঁহার মনে সন্দেহ অঙ্কুরিত হইয়া উঠিল।

প্রথমটি।—"ভরতকে রাজা মাতুলালয়ে ফেলিয়া রাখিয়াছেন কেন? এরূপ ব্যাপারে তাহাকে আনিবার চেষ্টা না করা অস্বাভাবিক, শত্রুঘ্ন ভরতভক্ত—তাহাকেও তিনি দূরে রাখিয়াছেন। কণ্টকাকীর্ণ তরুকে যেরূপ কাঠুরিয়া ছেদন করিতে যাইয়াও বাধা পাওয়ার আশঙ্কায় ফিরিয়া আসে, সেইরূপ শত্রুঘ্ন উপস্থিত থাকিলে রাজা নানাপ্রকার ভয়ে এই কার্য্য হইতে বিরত হইতেন; রাজার মন যদি উদার হইত, তবে কখনই তিনি কণ্টকের ন্যায় ইহাদিগকে এসময়ে দূরে রাখিতেন না।" পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, রাজার এই কার্য্যের মধ্যে ন্যায়-পরতার অভাব ছিল, সুতরাং এই যুক্তি কৈকেয়ীর হৃদয়ে সন্দেহের উদ্রেক করিল।

দ্বিতীয়টি।—"তুমি কৌশল্যাকে চিরকাল নানাভাবে উৎপীড়ন করিয়াছ, তাঁহার পুত্র অভিষিক্ত হইলে তিনি প্রতিশোধ তুলিতে অবশ্যই সচেষ্ট হইবেন, অযোধ্যা তখন তোমার কণ্টকশয্যা হইবে।"

মন্থরার অপরাপর নানাপ্রকারের যুক্তি ছিল, কিন্তু এই দুইটি কথায় সম্ভবত কৈকেয়ীর মনে প্রকৃত আশঙ্কার উদ্রেক করিয়াছিল। এইরূপ সমারোহপূর্ণ বিশেষ ব্যাপারে পুত্রদ্বয়কে দেশান্তরে রাখিয়া ব্যস্ততার সহিত কেন এই অভিষেক সম্পাদন করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, কৈকেয়ী ইহার মীমাংসা করিতে পারিলেন না। এই কথায় তাঁহার হৃদয়তন্ত্রী সহসা একটা উৎকট ঝঙ্কারে বাজিয়া উঠিল। দ্বিতীয় কথাটিতেও আত্মদোষজনিত আশঙ্কা জাগ্রত হইয়াছিল। যাঁহার প্রতি তিনি চিরদিন অত্যাচার করিয়াছেন, তিনি সুবিধা পাইলে প্রতিশোধ তুলিতে বিরতা হইবেন—এ কথা তাঁহার বিশ্বসনীয়বোধ হইল না।

এই দুইটি কথায় তাঁহার ভিতরের কোপন, আত্মসুখপ্রিয় প্রবৃত্তি জাগ্রত হইয়া উঠিল। চিরকাল যিনি জগৎকে স্বীয় সুখের ক্রীড়নক বলিয়া মনে করিয়াছেন, যাঁহার চক্ষের কুটিল কটাক্ষে প্রধানা মহিষী সর্ব্বদা বিচলিত

থাকিতেন এবং স্বয়ং মহারাজ "অহঞ্চ হি মদীয়াশ্চ সর্ব্বে তব বশানুগাঃ"—'আমি এবং আমার সমস্ত তোমার অধীন'—বলিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া ঘর্ম্মাক্ত হইয়া পড়িতেন—সূর্য্যচক্রের আবর্ত্তনে যে সকল রাজ্য আলোকিত হয়, ততদূর পর্য্যন্ত সাগরাম্বরা পৃথিবীর একমাত্র অধীশ্বরের যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কিরীটমণি যাঁহার আজ্ঞায় রাজা "অবধ্যো বধ্যতাং কো বা" বলিয়া নিরপরাধের প্রাণদণ্ড দেওয়ার জন্য অকুণ্ঠিতচিত্তে হস্ত উত্তোলন করিতে ইচ্ছুক, সেই প্রবলপ্রতাপান্বিতা, সৌন্দর্য্যাভিমানিনী মহারাণী কৈকেয়ী এই অভিষেকের পর একান্ত নিষ্প্রভ, বিগতশ্রী ও মানহীনা হইয়া অগ্রমহিষীর কৃপাভিখারিণী অথবা অপ্রীতিপাত্রী হইয়া নিগৃহীতা হইবেন—এ কথা মনে হইতে তাঁহার সমস্ত প্রকৃতি বিদ্রোহী হইয়া উঠিল; যাহা-কিছু শুভ, যাহা-কিছু কল্যাণের হেতুভূত—সমস্ত তিরোহিত হইয়া আশঙ্কাতুর ক্রূরতা স্পর্দ্ধিত ও বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। কৈকেয়ী সর্ব্বদা বর্ত্তমানের উত্তেজনায় কার্য্য করিতেন—ফলাফল গণ্য করিতেন না। রমণীজাতির সঙ্কল্প কতদূর ক্রূর, কতদূর নির্ম্মম, নির্ভীক ও প্রচণ্ড হইতে পারে, কৈকেয়ী এই ব্যাপারে তাহার জলন্ত উদাহরণ দেখাইয়াছেন।

ভূলুণ্ঠিতা পুষ্পিতা লতার ন্যায় কৈকেয়ী ক্রোধাগারে পড়িয়া ছিলেন, মলিন বসন, পৃষ্ঠাবলম্বিত বেণী, নিরাভরণ দেহশ্রীতে তিনি বল্লহীনা কিন্নরীর ন্যায় দৃষ্ট হইতেছিলেন। তিনি গৃহের চিত্র, কণ্ঠের হার ও পুষ্পমাল্য ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছিলেন—তাহারাও তাঁহারই মত অনাদরে মৃত্তিকার উপর 'নিপতিত' ছিল। দশরথ তাঁহার অসংবৃত কেশকলাপ হস্তে ধারণ করিয়া বিমূঢ়ের ন্যায় বলিলেন—"বলমাত্মনি পশ্যন্তী ন বিশঙ্কিতুমর্হসি।" 'আমার প্রতি তোমার কত বল, তাহা তুমি জান—তোমার আশঙ্কার কোন কারণ নাই।'

আদরে বর্দ্ধিত কৈকেয়ীর ইচ্ছা অনিবার্য্য, কিন্তু সেই ইচ্ছার আবেগে তাঁহার বালকের ন্যায় চাঞ্চল্য ছিল না, তাহাতে প্রৌঢ়ার দৃঢ়তা ছিল। তিনি দশরথকে ধীরভাবে দেবাসুরযুদ্ধের পর প্রদত্ত দুইটি বরের কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন, দশরথ রূপসীর অশ্রুর ইন্দ্রজালে বদ্ধ হইয়া গেলেন। "তুমি যাহা চাহিবে, তাহাই তোমাকে দিব" এইরূপ প্রতিশ্রুতিদানের পর রাজ্ঞী ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন; তাঁহার ধৈর্য্য ও দৃঢ়বদ্ধ সঙ্কল্প নারীমূর্ত্তিকে একটা ভয়ঙ্করভাব প্রদান করিতেছে—চন্দ্র, সূর্য্য, মেদিনী, দিক্‌পাল প্রভৃতিকে আহ্বান করিয়া কৈকেয়ী ধীরগম্ভীরকণ্ঠে বলিলেন—"সত্যসন্ধ, ধর্ম্মজ্ঞ, পরমপবিত্র মহারাজ দশরথ প্রতিশ্রুতি করিতেছেন, তোমরা শোন।" তৎপরে বজ্রতুল্য দুইটি ভীষণ বরপ্রার্থনায় বৃদ্ধ রাজাকে একেবারে বিমূঢ় করিয়া ফেলিলেন। ইহার পরে আমরা দেখিতে পাই, ব্যথিত-বিক্লব দৃষ্টিতে চাহিয়া রাজা তাঁহার প্রিয়তমা মহিষীর নিকট কৃতাঞ্জলি হইয়া আছেন; কখন তিনি তাঁহার পদপ্রান্তে নিপতিত; কখন ধূসরাকাশে নক্ষত্রপংক্তির প্রতি নির্নিমেষদৃষ্টি বদ্ধ করিয়া রাজা নিশীথিনীকে এই লজ্জার দৃশ্য চিরদিনের তরে আচ্ছাদন করিয়া রাখিতে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিতেছেন; কখন তাঁহার ভাবী মৃত্যু ও শ্যামচ্ছবি রামচন্দ্রের দুর্গতির কথা

স্মরণ করাইয়া কৈকেয়ীর মনে কৃপালেশ জাগ্রত করিতে চেষ্টা পাইতেছেন ; কিন্তু নির্মম ক্রূরতা এবং অটল সঙ্কল্পের জীবন্তমূর্ত্তির ন্যায় কৈকেয়ী তাঁহার স্বামীর অযোগ্যতাকে ধিক্কার দিয়া ক্রূরবাক্যে রাজার ক্ষতস্থান দ্বিগুণ ব্যথিত করিতেছেন মাত্র, বারংবার রোষ-কষায়িতচক্ষে দশরথের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন—"মহারাজ অলর্ক সত্য-রক্ষার জন্য স্বীয় চক্ষু উৎপাটন করিয়া ফেলিয়া-ছিলেন, মহারাজ শৈব্য সত্যবদ্ধ হইয়া স্বীয় মাংস শ্যেনপক্ষীকে প্রদান করিয়াছিলেন, তুমি সত্যপালন না করিলে আমি বিষভক্ষণে প্রাণত্যাগ করিব,—রাজসভায় বসিয়া তোমার সত্যরক্ষার কথা তুমি প্রচার করিও।" ক্ষুধিত ব্যাঘ্রীর পার্শ্বে যেরূপ মুমূর্ষু শিকার পড়িয়া থাকে, ব্যাঘ্রী তাহার ব্যগ্রচক্ষের দৃষ্টিদ্বারাই যেন উহার প্রাণ কাড়িয়া লয়, দশরথের নিকট কৈকেয়ী সেইরূপভাবে অবস্থিত ছিলেন। একি ঘোর সঙ্কল্প! রাজাকে লইয়া তিনি উৎকট পরিহাস করিতেও পশ্চাৎপদ নহেন ; দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণায় অনিদ্ররজনী কাটিয়া গেল ; সুমন্ত্র প্রাতে রাজসকাশে উপস্থিত হইলে রাজা আর্ত্ত ও নিষ্প্রভ চক্ষে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন,—শুষ্ক রসনা কোন কথা উচ্চারণ করিতে পারিল না। তখন কৈকেয়ী তাঁহাকে বলিলেন—

"সুমন্ত্র রাজা রজনীং রামহর্ষসমুৎসুকঃ
প্রজাগরপরিশ্রান্তো নিদ্রাবশমুপাগতঃ ॥"

'সুমন্ত্র, রাজা কল্যরাত্রি রামের অভিষেকের হর্ষে জাগিয়া কাটাইয়াছেন, এইজন্য রাত্রি-জাগরণক্লান্ত হইয়া নিদ্রার আয়ত্ত হইয়া পড়িয়াছেন।"

এই বিদ্রূপ কি ভীষণ!

রামচন্দ্র সমাগত হইয়া কৈকেয়ীর মুখে বরদানের ব্যাপার শুনিয়া বলিলেন—

"এবমস্তু গমিষ্যামি বনং বস্তুমহং ত্বিতঃ।
জটাচীরধরো রাজ্ঞঃ প্রতিজ্ঞামনুপালয়ন্ ॥"

* * * *

"অলীকং মানসস্ত্বেকং হৃদয়ং দহতীব মে।
স্বয়ং যন্নাহ মাং রাজা ভরতস্যাভিষেচনম্ ॥"

'তাহাই হউক, আমি রাজার প্রতিজ্ঞাপালনের জন্য জটাচীর ধারণ করিয়া বনগমনার্থ এখান হইতে প্রস্থান করিব ; কিন্তু এই একটি মনের দুঃখে আমার হৃদয়কে যেন দগ্ধ করিয়া দিতেছে,—রাজা কেন স্বয়ং আমাকে ভরতের অভিষেকের কথা বলিলেন না।'

পাছে রাজার আদেশ না শুনিলে রামচন্দ্র বনযাত্রা না করেন এবং রাজা নিতান্ত বিচলিত অবস্থায় কিছু বলিতে না পারেন, এই আশঙ্কায় কৈকেয়ী তাঁহাকে বলিলেন—'রাজা দশরথ লজ্জিত হইয়া তোমাকে কিছু বলিতে পারিতেছেন না, তজ্জন্য তুমি কিছু মনে করিও না।'—

"যাবত্ত্বং ন বনং যাতঃ পুরাদস্মাদতিত্বরন্।
পিতা তাবন্ন তে রাম স্নাস্যতে ভোক্ষ্যতেঽপি বা ॥"

'তুমি ত্বরান্বিত হইয়া যে পর্য্যন্ত এখান হইতে বনে যাত্রা না করিবে, সে পর্য্যন্ত তোমার পিতা স্নানাহার কিছুই করিবেন না।' সত্যের সঙ্গে উৎকট মিথ্যার মিশ্রণ করিয়া উদ্দেশ্য-সাধনে তিনি বিমুখ হিলেন না, রাম তৎ-কর্ত্তৃক—"কশয়েব হতো বাজী বনং গন্তুং কৃতত্বরঃ" কশাঘাতে অশ্বের ন্যায় বনযাত্রার জন্য তাড়িত হইতে লাগিলেন। বারংবার "তব স্বহং ক্ষমং মন্যে নোৎসুকস্য বিলম্বনম্"

'তোমার বনে যাইতে ঔৎসুক্য হইতেছে, সুতরাং তোমার আর বিলম্ব করা উচিত মনে করি না' —কৈকেয়ী এই ভাবের বাক্যে রামচন্দ্রকে তাড়িত করিতেছেন।

তার পরে রামচন্দ্রের বিদায়দৃশ্য। সেখানে মহারাজ দশরথ সংজ্ঞাহীন অবস্থায় শায়িত। একদিকে বশিষ্ঠ, সুমন্ত্র, সিদ্ধার্থ প্রভৃতি সচিব, অপর দিকে শোকের নিঃশব্দ চিত্রপটের ন্যায় কৌশল্যাদেবী, তৎপার্শ্বে আর্ত্তস্বরে রোরুদ্যমান মহিষীবর্গ, সম্মুখে কৈকেয়ী,—সমবেত ব্যক্তিবৃন্দের সমকণ্ঠে উচ্চারিত তিরস্কারের প্রতি ভ্রুক্ষেপহীন, একান্ত স্পর্দ্ধিত, দুরবস্থার চরম দৃশ্যে অবিচলিত, স্বীয় কার্য্যের করুণ ও শোচনীয় ফল প্রত্যক্ষ করিয়া সম্পূর্ণরূপে অম্রিয়মাণ। কৈকেয়ী রাজ্ঞীর ন্যায় প্রভুত্ব-ব্যঞ্জক কণ্ঠে, বিদ্রোহীর ন্যায় স্পর্দ্ধিতভাবে শত-শত ব্যক্তির প্রতিকূলতা উপেক্ষা করিয়া, সকলের যুক্তিতর্ক খণ্ডবিখণ্ড করিয়া, সত্যের ধ্বজা উচ্ছ্রিত করিয়া পাপ অভিসন্ধিকে আশ্রয় দিতেছেন; সেদিন তাঁহার উদ্দাম প্রতিভা অশুভ ও অকল্যাণের জীবন্তবিগ্রহের ন্যায় অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু তন্মধ্যে যে একটা দুর্দ্দান্ত সঙ্কল্প ছিল, তাহা আমাদিগকে প্রতি মুহূর্ত্তে স্তম্ভিত করিয়া ফেলে এবং আমরা যে এক প্রবলপ্রতাপান্বিতা সম্রাজ্ঞীর সমীপবর্ত্তী, তাহা ক্ষণতরেও বিস্মৃত হইতে অবকাশ দেয় না। সুমন্ত্র দন্ত কট্‌মট্ ও হস্তে হস্ত-নিষ্পেষণ করিয়া বলিতেছিলেন—'ইঁহার মাতা স্বীয় স্বামীর বধের উপায় এইভাবেই করিয়াছিলেন—মাতার গুণ কন্যায় পাইবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? আম্রবৃক্ষ কুঠারচ্ছিন্ন হইলে আমরা নিম্ববৃক্ষের আশ্রয় কখনই স্বীকার করিব না,—"ভর্ত্তুরিচ্ছা হি নারীণাং পুত্রকোট্যা বিশিষ্যতে"—স্ত্রীলোকের পক্ষে কোটি পুত্র হইতেও স্বামীর ইচ্ছা অধিকতর গণ্য, ইনি সেই পতিকে বধ করিতে দাঁড়াইয়াছেন। যেখানে রাম যাইবেন, আমরা সেইখানে যাইব,—অযোধ্যা বনে পরিণত এবং বন রাজধানীতে পরিণত হইবে।' বশিষ্ঠ ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন—'ভরত যদি দশরথ হইতে জাত হইয়া থাকেন, তবে পিতৃবংশ-চরিত্রজ্ঞ কখনই রাজ্যগ্রহণ করিবেন না।' এইরূপ শত শত আক্রোশপূর্ণ কথা শুনিয়াও—

"নৈব সা ক্ষুভ্যতে দেবী ন চ স্ম পরিদূয়তে।
ন চাস্যা মুখবর্ণস্য লক্ষ্যতে বিক্রিয়া তদা॥"

'তিনি কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ বা বিচলিত হইলেন না—তাঁহার মুখবর্ণও কিছুমাত্র বিকৃত হইল না।'

তাঁহার দৃঢ় ও অবিচলিত মূর্ত্তি এইভাবে সকলের নিকট অতিশয় ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছিল। শুধু যখন রাজা বলিলেন—"ধনকোষ শূন্য করিয়া সমস্ত ধন রামের সঙ্গে দেওয়া হউক, তিনি উহা বনে ঋষিদিগকে যাগযজ্ঞের জন্য দান করিবেন;—সৈনিকগণ, মিষ্টভাষিণী গণিকারা, পণ্যদ্রব্য সহ বণিক্‌গণ ইঁহার অনুগমন করিয়া বনকে সুশোভিত করুক,—মল্লগণ ও শিল্পিগণ যাইয়া বনে এক নূতন রাজধানী স্থাপিত করুক,—শোভাসম্পদ্‌বর্জ্জিত একান্ত নির্জ্জন অযোধ্যায় ভরত অভিষিক্ত হইবেন।"—তখন কৈকেয়ী ক্ষণতরে ভীতা ও বিচলিতা হইয়াছিলেন, কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যে আত্মসংযম করিয়া ক্রুদ্ধ রাজাকে তিনি দ্বিগুণ ক্রোধের ভাষায় বলিলেন—"পীতসারাংশ সুরার ন্যায় এই রাজ্যকে তাহা হইলে আমার

পুত্র তখনই পরিত্যাগ করিবেন। তুমি সত্য-লঙ্ঘন করিতে চাও, করিও—কিন্তু তোমার পূর্ব্বপুরুষ সগর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র অসমঞ্জকে বনবাস দিয়াছিলেন। সত্যরক্ষার্থ তুমি এই কার্য্য করিতে এত ভীত হইতেছ, তোমাকে ধিক্।” রাজা হতবুদ্ধি হইয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িলেন, তখন মহামাত্র সিদ্ধার্থ বলিলেন, “অসমঞ্জ প্রজাদিগের শিশুসন্তানগুলি ধরিয়া লইয়া তাহাদিগকে ক্রীড়াচ্ছলে সরযূগর্ভে নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করিতেন, বিপদে পড়িয়া প্রজারা রাজাকে জানাইলে রাজা তাঁহাকে বনবাস দিয়াছিলেন ; কিন্তু রামের অপরাধ কি আছে, তাহা দেখাইয়া দিন।” এই সকল কথায় কৈকেয়ী কর্ণপাত না করিয়া রামের জন্য চীর ও বল্কল লইয়া আসিলেন। রামের বিষয়নিঃস্পৃহ উদার উক্তিসকল এই ক্রোধ ও উত্তেজনাপূর্ণ গৃহে স্বর্গীয় বাণীর ন্যায় অপূর্ব্ব ও স্নিগ্ধ বোধ হইল—

“নৈবাহং রাজ্যমিচ্ছামি ন সুখং ন চ মেদিনীম্।”

“মা বিমর্শো বসুমতী ভরতায় প্রদীয়তাম্।”

‘আমি রাজ্য, সুখ বা পৃথিবীর অভিলাষী নহি।’ ‘আপনি দ্বিধাশূন্য হৃদয়ে এই রাজ্য ভরতকে প্রদান করুন’—বলিয়া তিনি বারংবার রাজার নিকট বনযাত্রার অনুমতি চাহিতে লাগিলেন ;—এই উদার দৃশ্য স্বার্থান্ধ কৈকেয়ীকে আকৃষ্ট করিতে পারে নাই। সীতা বনগমনকালে কৌশল্যাকথিত স্বামিভক্তির উপদেশ নতশিরে গ্রহণ করিয়া বলিলেন—

“নাতন্ত্রী বিদ্যতে বীণা নাচক্রো বিদ্যতে রথঃ।
নাপতিঃ সুখমেধেত যা স্যাদপি শতাত্মজা॥”

‘তন্ত্রীশূন্য বীণা এবং চক্রশূন্য রথ যেরূপ ব্যর্থ, শতপুত্রবতী হইলেও স্বামী ভিন্ন স্ত্রীলোকের জীবন সেইরূপ ব্যর্থ—তাঁহার সুখের আর কোন মূল নাই।’ এই সময়ে দশরথ মৃত্যুতুল্য কষ্টে ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছিলেন, স্বামিভক্তির এই জীবন্ত দৃশ্য—পতির আসন্ন-মৃত্যু, বৈরাগ্যকঠোর রামের সঙ্কল্প, সচিব ও প্রজাদের উদ্যত আক্রোশ—ইহার কিছুই কৈকেয়ীর প্রতি কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। মুক্তলজ্জা রমণী অযোধ্যার আক্ষেপোক্তির প্রতি কঠোর বধিরতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই দৃশ্য একটি চূড়ান্ত দৃশ্য, ইহার নৃশংসতা ও অভিপ্রায়ের অটলতা ভয়-মিশ্র বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

কৈকেয়ীর দৃষ্টি অন্য দিকে ছিল, এজন্য সম্মুখের সমস্ত দৃশ্য তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারে নাই। পুত্রের ভাবী শুভচিন্তা তাঁহাকে সঙ্কল্পে সুদৃঢ় করিয়া রাখিয়াছিল। স্বামী পরিত্যাগ করিলেন, প্রজারা তাঁহার নাম শুনিয়া ভয়ে শিহরিয়া উঠিত, সমস্ত জগৎ হইতে তিনি তাড়িত হইয়া একমাত্র মন্থরা-সঙ্গিনীসম্বলা হইলেন। এই অনর্থোৎপাতে তাঁহার অবস্থার বিপর্য্যয় ঘটিল, সমস্ত দুরবস্থাকে তিনি মস্তকোপরি স্বহস্তে আকর্ষণ করিয়া আনিয়া সম্রাজ্ঞীর ন্যায় বিশাল দম্ভে দাঁড়াইলেন ; যাঁহার একটি কেশের শোভাবৃদ্ধির জন্য অযোধ্যার সমস্ত রাজভাণ্ডার উন্মুক্ত হইয়া যাইত, আজ তিনি স্বেচ্ছায় সমস্ত আদরের বন্ধন ছিন্ন করিয়া একান্ত সঙ্গিহীনা হইয়া দাঁড়াইলেন। “নিষ্ঠুরা,” “পাপচরিত্রা,” “কুলপাংশনী” প্রভৃতি বিশেষণ অঙ্গের ভূষণ করিয়া কৈকেয়ী আজ অযোধ্যার রাজপ্রাসাদে নিঃসঙ্গ দর্পে অকুণ্ঠিতা রহিলেন। ভরত রাজা হইয়া সিংহাসনে বসিলে তাঁহার দুর্দ্দিনের

মেঘ কাটিয়া সুখসূর্য্য সমুদিত হইবে—এই ভরসায় তিনি স্বামীর মৃত্যুতেও বিচলিত হন নাই। যে পুত্রের জন্য এত সহ্য করিলেন, সে আসিয়া তাঁহার চরণচুম্বনপূর্ব্বক স্নেহ-বিগলিতচক্ষে তাঁহাকে পূজা করিবে, তাহার মাতৃভক্তি উথলিয়া উঠিবে,—এই আশায় প্রফুল্ল হইয়া তিনি ভরতের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন।

ভরত আসিলেন। স্বর্ণাসন হইতে স্নেহার্দ্রচক্ষে দৃষ্টিপাত করিয়া কৈকেয়ী পুত্রের প্রীতি-উৎপাদনের ভরসায় সমস্ত সংবাদ প্রদান করিলেন। যিনি অযোধ্যার বিদ্বেষ অকুণ্ঠিত-চিত্তে সহ্য করিয়াছিলেন, ভরতের বিদ্বেষে আজ তাঁহার মজ্জাভেদ হইয়া গেল। উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে যখন ভরত "মা" "মা" বলিয়া কৌশল্যার কণ্ঠাবলম্বন করিলেন এবং "ধার্ম্মিক অশ্বপতির কন্যা তুমি নও" বলিয়া কৈকেয়ীকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন—তখন কবিও তাঁহাকে ত্যাগ করিলেন। অত বড় স্পর্দ্ধার পতন, আকাশচুম্বী আত্মগরিমার ভূলুণ্ঠন বাল্মীকিও চিত্রিত করিতে সাহসী হন নাই,—তাহার উপর এক আঁধার যবনিকা পাত করিয়া চিত্রকর বিদায় লইয়াছেন। শুধু দুই-একবার ঘটনার আবর্ত্ত বায়ুবেগান্দোলিত যবনিকার অবকাশে আভাসে পরিদৃশ্যমান চিত্রপটের ন্যায় আমরা মহাকাব্যের নিগূঢ়-প্রদেশে দেখিতে পাই—ভরদ্বাজাশ্রমে তিনি ঋষির পদে প্রণাম করিতেছেন। সেই স্থানে এই ছত্রকয়টি আছে—

> অসমৃদ্ধেন কামেন সর্ব্বলোকস্য গর্হিতা।
> কৈকেয়ী তস্য জগ্রাহ চরণৌ সব্যপত্রপা॥
> তং প্রদক্ষিণমাগম্য ভগবন্তং মহামুনিম্।
> অদূরাদ্ভরতস্যৈব তস্থৌ দীনমনাস্তদা॥

'ব্যর্থমনোরথা, সলজ্জা, সর্ব্বলোকনিন্দিতা কৈকেয়ী তাঁহার পাদদ্বয় ধারণ করিলেন এবং সেই ভগবান্ মহামুনিকে প্রদক্ষিণ করিয়া দুঃখিত-অন্তরে ভরতের অনতিদূরে রহিলেন।' আর একস্থলে বর্ণিত আছে, ভরত দৃষ্টিপাত করিয়া "দীনাং মাতরং"—দীনা মাতাকে দেখিলেন। এই দৈন্য ও এই লজ্জা কি ভয়ানক, তাহা আমরা কল্পনা করিতে পারি। অযোধ্যার বিষণ্ণ, শোককরুণ, প্রভাহীন রাজপ্রাসাদের কক্ষে কক্ষে আত্মীয়দৃষ্টিবর্জ্জিত ঘৃণায়, লজ্জা ও দৈন্যে অবগুণ্ঠনবতী কি ভাবে আপনাকে লুকাইয়া ফিরিতেন, তাহার চিত্র ক্ষণে ক্ষণে আমরা কল্পনানেত্রে দেখিয়া শিহরিয়া উঠি। সীতার অলক্তকরাগবর্জ্জিত পদ্মকোষসমপ্রভ পদযুগল কণ্টকক্ষত হইতেছে, এই আশঙ্কায় যে তপ্তশ্বাস উঠিত, সেবাপরায়ণ লক্ষ্মণের বনজীবনের কঠোর কর্ত্তব্য স্মরণ করিয়া যে অশ্রুবিন্দু প্রবুদ্ধ হইত, ইন্দীবরশ্যাম রামচন্দ্রের মলিনকান্তি মনে করিয়া রাজ্যে যে আর্ত্তনাদ উঠিত, পরিব্রাজকবেশী ফলমূলাহারী ভরতের দৈন্য দেখিয়া প্রজার বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠ যে আবেগে অধীর হইয়া উঠিত—অযোধ্যাময়, নন্দী-গ্রামময় অপার কারুণ্যের মধ্যে যে একটা উদ্দাম ঘৃণা ও ক্রোধের ভাব প্রতি মুহূর্ত্তে রোষ-কষায়িতচক্ষে বিধবা রাজ্ঞীর প্রতি বিস্ফারিত হইয়া অবজ্ঞাবর্ষণ করিত—সেই অবজ্ঞা ও ঘৃণা হইতে আত্মগোপন করিবার জন্য অভিমানিনী প্রবলপ্রতাপান্বিতা রাজ্ঞী কোন্ যবনিকার অন্তরালে, কোন্ নিগূঢ় কক্ষতল আশ্রয় করিয়া চতুর্দ্দশবৎসর কি ভাবে কাটাইয়াছিলেন, জানি না; কবি সে

যবনিকা উত্তোলন করেন নাই, কিন্তু আমাদের দেশের আধুনিক লোকেরা শেষ পর্য্যন্ত কিছু না দেখিলে পরিতৃপ্ত নহেন। সারেঙের মধুর স্বরের সঙ্গে একতানকণ্ঠে বৈষ্ণব-গায়ককে গাহিতে শুনিয়াছি—প্রত্যাগত রামকে বক্ষে ধারণ করিয়া কৈকেয়ী বলিতেছেন—

এত দিনের পর ঘরে
আলি রে রামধন।
মা বলে ডাকে না ভরত,
মুখ দেখে না শত্রুঘন্।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

রাজতপস্বিনী।

[জীবনীপ্রসঙ্গ]

১১

শ্রাবণমাসের প্রাতে একদিন মহারাণীমাতাকে প্রণাম করিতে গেলাম। পিতৃদেবমহাশয় সেবার পেন্‌শন্ লইয়াছিলেন, আমাদের পুটিয়াত্যাগের সময় ঘনাইয়া আসিতেছিল। নূতন চৌকীর দক্ষিণ পাড়ে আমাদের বাসা,—আমি সেই প্রকাণ্ড দীর্ঘিকার ঠিক্ উপরে নিজের পড়াশুনার জন্য পছন্দসই ক্ষুদ্র একটি বাংলো প্রস্তুত করাইয়াছিলাম। স্বহস্তে দুইটি রাধাচূড়ার গাছ তাহার সম্মুখে রোপণ করিয়াছিলাম, এবং কয়বৎসরের ভিতর তাহারা বেশ বড় হইয়া পত্রে-পুষ্পে বারমাস স্থানটিকে রমণীয় করিয়া রাখিত। মাতা অন্দরের স্নানের ঘাট হইতে সেই তরু-চ্ছায়াচ্ছন্ন বাংলো মাঝে মাঝে দেখিতেন। আমায় বলিলেন, গাছ ও ঘর দেখিয়া তাঁহার মন কেমন করিয়াছে যে, আমরা সব ছাড়িয়া যাব। আমাদের সাংসারিক কথাবার্ত্তা কিছু-কিছু হইতেছিল, এমন সময়ে রাজবাড়ীর গুরুবংশীয় * * আসিলেন। মা দাঁড়াইয়া তাঁহাকে আসন দেওয়াইলেন এবং ভক্তিভাবে প্রণাম করিলেন। তাঁহার সঙ্গে মহারাণীর "পাওনা"র কথাবার্ত্তা শেষ হইলে ঠাকুরটি আমায় "রামের বনবাস" নাটকের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। মা বলিলেন, "রামের রাজ্যাভিষেক" তাঁহার লাইব্রেরিতে আছে এবং তাহা স্কুলের পাঠ্যপুস্তক। সেবার নৃসিংহবাবু যখন নিজের পুস্তক পাঠান, শশি-বাবুও নিজের বইগুলি পাঠাইয়াছিলেন। এই সময়ে মহারাণী মাঝে মাঝে আশ্রিতা বিধবা-দের বই পড়িয়া শোনাইতেন। আমি এই কথোপকথনের অবসরে তাঁহার নিকটে উপবিষ্ট * * দেবীকে সুধাইলাম, এ কয়দিন মার কাছে কি কি পুস্তক শুনিলেন? মহারাণী একখানি পৌরাণিক নাটকের নাম

করিলেন। আমি "সুরুচির কুটীরে"র কথা তুলিলাম, তিনি তাহার প্রশংসা করিয়া বলিলেন, লাইব্রেরিতে খুঁজিয়া দেখিয়াছেন, ভাল ভাল অনেক বই নাই। বাহিরে কুমার-মহাশয়ের কাছে অনেক পুস্তক চলিয়া গিয়াছিল, আমি আনিয়া দিতে চাহিলাম। মা প্রথমে সম্মত হইলেন, কিন্তু যেন একটু কুণ্ঠিতভাবে, তার পর আবার বলিলেন, "না, কাজ নাই।" আমি জানিতাম, পাঠাগারের সযত্নসংগৃহীত এবং বাঁধান বইগুলি তাঁর শোণিততুল্য প্রিয়। কিন্তু এখন সকলই ত্যাগ করিয়া তীর্থবাসে যাইতে প্রস্তুত হইতেছিলেন।

যে ঠাকুরাণীটির কথা কয়বার বলিয়াছি, তিনি অনেকসময়ে মহারাণীমাতার কাছে বসিয়া থাকিতেন। একদিন একটি স্ত্রীলোক মার কাছে কি প্রার্থনা করিতে আসিয়া অন্যের কথা জানাইতেছিল। শুনিয়া ঠাকুরাণী বলিতেছিলেন, নিজের কথা থাকে ত কর্ত্তাকে বল, অন্যের কথা বলিয়া কেবল উঁহাকে মিছামিছি বিরক্ত করা হয়। মা হাসিলেন, বলিলেন, "কোকন বলে, নিজের দেনা আগে শোধ দেন। সত্য কথা! চুপ করিয়া থাকি।"

একদিন কিছু বেলা হইলে রাজান্তঃপুরে গিয়া দেখি, তিনি কিছু চিন্তাযুক্ত। কোন সরিকের পোষ্যপুত্রের আজ যাগ। নিমন্ত্রণ হইয়াছে, যাওয়া উচিত কি না, মা তাহারই পরামর্শ ও মীমাংসায় ব্যস্ত। বলিলেন, "অন্যান্য তরফেরা বলেন যে, উইল প্রকৃত নহে। সুতরাং দত্তকপুত্র নহে, পালিত! তাঁহারা তাহার সহিত একাসনে বসিবেন না। * * রাণী কাল নিজে আসিয়াছিলেন, তাঁহারও ইচ্ছা যে, যাওয়া না হয়। বরং যাগের পর অপরাহ্নে গেলেই হইবে।" শেষে সিদ্ধান্ত হইল, যখন উহা লইয়া কথা উঠিয়াছে, তখন যাওয়াই কর্ত্তব্য। মহারাণী বলিতে লাগিলেন, "প্রথমে যে উইল হয়, নাবালকী অবস্থার বলিয়া সন্দেহবশত তাহা বাহির করা হইতেছে না। শুনিতেছি, শেষের উইলও রেজেষ্টারি করা হয় নাই। পাঁচশ টাকা জরিমানা দিলে রেজেষ্টারি হইবে। এরূপ অবস্থায় দত্তকপুত্র টিকিবে বোধ হয় না, একটা সাক্ষীতে হয় ত পড়িতে হইবে।" আমার প্রশ্নমতে বলিলেন যে, "শেষ উইলখানি অন্যের স্বার্থে পূর্ণ, অনেকগুলি টাকা তদনুসারে মাসহারা দিতে হয়। কন্যার প্রাপ্য মাসিক কেবল দশটি টাকা!" আমি কহিলাম, "দেখুন, কত ভুল। নিজের সন্তান থাকিতে অন্যকে আনা কেন? পোষ্যপুত্র প্রায় ভাল হয় না। বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে আমার একদিন সে কথা হইয়াছিল, তিনিও তাই বলিয়াছিলেন। লোকে নাম রাখিবার জন্য এ সব করে, সৎকীর্ত্তির দ্বারা নাম রাখিলেই ত হয়। সেই টাকায় একটা স্থায়ী কাজ কিছু হইতে পারে। নহিলে নিজের সন্তান দিয়া অনেকের মুখ অন্ধকার হয়, পরের ছেলে ত দূরের কথা।" মহারাণী স্মিতমুখে বলিলেন, "সত্য কথা।" কিন্তু তখনই আবার গম্ভীর হইলেন। উইলের কথা চলিতে লাগিল। কেহ বলিল; "অন্তিমকালে যে সব উইল লিখিত হয়, তাহাতে লেখকেরা স্বার্থসিদ্ধি করিয়া লয়। কিন্তু আমাদের রাজবাড়ীর উইলে তেমন কিছু হইতে পায় নাই।" মাতা কহিলেন,

"উইল গিরিধর রায়ের লেখা, একটিমাত্র অক্ষর তাহাতে লিখিত হইয়াছিল।" আমি বলিলাম, "তাহাতে ডাক্তার সারকোরসাহেবের দস্তখৎ আছে। সে সব কথা আমাদের আত্মীয় বহরমপুরের বৈকুণ্ঠবাবুর কাছে শুনিয়াছি, সাহেব তাঁহার কাছে গল্প করিয়াছিলেন। গিরিধর রায় মহাশয়ের কাছে শুনিয়াছিলাম, বোয়ালিয়ার জোড়া-বাংলোর রাজা পরলোকগমনের কিছুমাত্র পূর্ব্বে তাঁহাকে উইল লিখিতে আদেশ করেন এবং বারংবার বলেন, দেখিও, ধর্ম্ম ভাবিয়া কাজ করিও। শেষে স্বাক্ষর করিবার সময় রাজার হাত এতই দুর্ব্বল হইয়া পড়িল যে, J-অক্ষরটি ছাড়া আর কিছুই লিখিতে পারিলেন না। বাকীটা লিখিবার জন্য তিনি ডাক্তার সারকোরকে অনুরোধ করিলেন। ডাক্তার তাহা পালন করিতে উদ্যত হইলে রায়মহাশয় মহা আপত্তি করিয়া বসিলেন, এবং বলিলেন, সাহেব, আপনি সাক্ষিস্বরূপ দস্তখৎ করুন। তাহাই হইল। ডাক্তারসাহেব এখনও সর্ব্বদা আপনার সংবাদ লইয়া থাকেন!" এই কথাপ্রসঙ্গে মাতাকে আমি সুধাইলাম, সে সময়ে তাঁহার বয়ঃক্রম ১৪।১৫ হইবে? মা বলিলেন, "অত হইবে না। দেওয়ান তখন কলিকাতায় কি মুর্শিদাবাদে ছিলেন।"

দত্তকপুত্রের কথায় মহারাণী বলিতেছিলেন যে, "৪।৫ বৎসর হইল, একজন মুসলমান প্রজা এই বলিয়া নালিশ করে যে, তাঁহার মোকদ্দমা চালাইবার অধিকার নাই। হাইকোর্ট বিচার করেন, আছে। দেখাদেখি আরো একজন প্রজা ঐরূপ করিয়াছিল। * * উইলসম্বন্ধে অনেকে গোলে পড়ে, আমার সে সব কিছু হয় নাই। আমি যখন ইচ্ছা, তখনই পোষ্যপুত্র লইতে পারিতাম। গোত্র লইয়া তর্কবশত কোকার যাগের কিছু দেরি হইয়াছিল।" স্বগোত্র বলিয়া কয়জনের দত্তক অসিদ্ধ হইয়াছে, সে গল্প করিলেন। বলিলেন, পিতামাতা টাকা লইলেও তাহা হয়, কিন্তু তা প্রমাণ করা সহজ নহে। টাকা লওয়ার কথায় বলিলেন যে, "ধর্ম্মেও বটে, লৌকিকতাতেও বটে, উহা বড় পাপ।"

পোষ্যপুত্রের চরিত্র নিজের আদর্শে গঠিত না হওয়ায় মহারাণী ইদানীং বড় মনঃকষ্টে থাকিতেন। তাঁহার সুশিক্ষাবিধানের জন্য যত্ন এবং চেষ্টার কোন ত্রুটি হয় নাই। কুমারের বয়স যখন ৮।৯বৎসর মাত্র, তখনই মাতা বিদ্যাসাগরমহাশয়কে একজন সুশিক্ষক নির্ব্বাচন করিয়া পাঠাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন এবং তদনুসারে সংস্কৃতকলেজের বি.-এ.-উপাধিধারী রাধারমণ সেন মহাশয় কলিকাতা হইতে প্রেরিত হন। ইনি আমাদের স্বগ্রামবাসী আত্মীয় এবং ভূতপূর্ব্ব কাশ্মীররাজবৈদ্য হারাধন সেন মহাশয়ের মধ্যমপুত্র ছিলেন। কবিরাজমহাশয়ের সহিত বিদ্যাসাগরমহাশয়ের সম্প্রীতি ছিল এবং শেষোক্ত উপযুক্ত বন্ধুপুত্রদ্বয়কে—স্বনামখ্যাত কবিরাজ ব্রজেন্দ্রকুমার এবং রাধারমণবাবুকে—পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। তাঁহাদের জোড়াসাঁকো রতনসরকারের গার্ডন্‌-ষ্ট্রীটস্থ বাসায় পণ্ডিতপ্রবরকে অনেকসময় দেখা যাইত। এক দিনের গল্প বলি। রাধারমণবাবুর ৪।৫ বৎসরের এক পুত্র একদিন মধ্যাহ্নে বাসার প্রাঙ্গণে খেলা করিতেছে, এমন সময়ে বিদ্যাসাগরমহাশয় আসিয়া

উপস্থিত। তিনি ছেলেটিকে পূর্ব্বে কখন দেখেন নাই, কিন্তু তাহার চেহারা দেখিয়াই সুধাইলেন—"তুই রমণের ছেলে—নয়?" চটিজুতাপরিহিত অর্দ্ধমুণ্ডিতমস্তক এক ব্যক্তিকে সেভাবে প্রশ্ন করিতে দেখিয়া শিশুর আত্মাভিমান ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। সে গম্ভীর অথচ তাচ্ছীল্যভাবে কেবল একটা "হুঁ" জোরে উচ্চারণ করিল। কিন্তু বিদ্যাসাগর ছাড়েন না। "কি পড়িস্?" উত্তর—"দ্বিতীয় ভাগ।" প্রশ্ন—"দ্বিতীয় ভাগ! আচ্ছা, বানান কর্ তো নৃত্য।" ছেলেটি শুদ্ধরূপে বর্ণবিন্যাস করিলে তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"বল্ তো, নৃত্য মানে কি?" "কেন, নাচা-গাওয়া।" প্রশ্ন—"বলিস্ কি রে, নাচা-গাওয়া, দুইই?" বালক ভারি চটিয়া বলিল, "নাচা, গাওয়া, আরো কত কি হয়! তুই উড়ে, তুই তার বুঝ্‌বি কি?"

এই শিক্ষক দীর্ঘকাল কুমারের অধ্যাপনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে বিশেষ উপকার হয় নাই। লেখাপড়ায় কুমারের আদৌ মতিগতি ছিল না, কবুতরের পাল ও রাজ্যের যত দুষ্ট ছেলে পোষণ কোমলবয়স হইতেই তাঁর প্রিয়কার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল। রাধা-রমণবাবু নির্দ্দিষ্টসময় পড়াইতে আসিতে-ছেন, বালক অনুচরদের অমনি ডাক বসিয়া গেল এবং তাহাদের শিস্ শুনিয়া কুমার পূর্ব্ব হইতে সতর্ক হইয়া গেলেন। শিক্ষকমহাশয় যখন এ সব বুঝিতে পারিলেন, তখন আর প্রতিবিধানের উপায় ছিল না। সে যাহা হউক, দুষ্ট ছেলেদের সংসর্গে মিথ্যাচরণ রাজ-কুমারের কিরূপ অভ্যস্ত হইয়াছিল, একটি গল্পে তাহা বেশ বুঝা যাইবে। বাহিরে বৈঠকখানার ছাদে তাঁর পারাবতসকল থাকিত, এবং তাহাদের উড়াইয়া আমোদ করিবার যে সব অনুপানের দরকার, তাহার কিছুরই অপ্রতুল সেখানে ছিল না। একদিন তিনি তন্ময় হইয়া কবুতর উড়াইতে-ছেন, হঠাৎ একটা খোঁচা চক্ষের অতি নিকটে লাগিয়া রক্তপাত হইল। সে কথা গোপন করিবার জন্য কুমার মহারাণীকে বলিলেন, "মা, চারি-আনির ক্ষ্যাপা বানরটা আমার চোখে হাঁচড় মারিয়াছে।" এ কথা অবিশ্বাস করার কোন কারণ ছিল না। মহারাণী অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইলেন। লোকে বলিল, ক্ষ্যাপা বাঁদর দংশন করিলে ফল বড় ভয়ানক হয়,—তাহাকে মারিয়া তার উপর স্নান করিলে তবে দোষ কাটিতে পারে। চাকরদের ভিতর অনেকেই ভিতরের কথা জানিত না, তাহারা সেই নির্দোষ শাখামৃগের জীবনান্ত করিয়া প্রভুপুত্রকে তদুপরি স্নান করাইল। অন্যান্য যে সকল ব্যবস্থা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতমহাশয়েরা করিলেন, তাহা আচরণেরও কোন ত্রুটি হইল না। কিছুদিন পরে আসল কথা প্রকাশ পাইল। তখন মহারাণী শাস্ত্রসম্মত প্রায়শ্চিত্তাদি করিতে বাধ্য হইলেন।

ফলত পোষ্যপুত্রকে তিনি যেরূপ স্নেহ করিতেন, সচরাচর গর্ভজাত পুত্রও তাহাতে আদুরে হইয়া উঠে। কুমারের মাতৃশাসন প্রথম হইতে কঠোর হইলে সঙ্গদোষ ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না। যাহা হউক, তিনি কিশোরবয়সে পদার্পণ করিতে না করিতে মহারাণীর ন্যায় সকলেরই ধারণা হইল যে সংসর্গদোষের অনিবার্য্য কুফলসকল ফলিতে বড়

বিলম্ব নাই। তখন সকলেই কিছু সতর্ক হইলেন। বেগতিক দেখিয়া কুমারের ছোট-বড় সহচরেরা তাঁহাকে দিনকতকের জন্য পলায়ন করিতে পরামর্শ দিল।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার।

বারাণসী-অভিমুখে।

৪

ধ্বংসাবশেষের মধ্যে।

যেখানে মোগলবাদশারা বাস করিতেন, সেই সমস্ত দেশই এখন নগরপ্রাসাদের বিস্তীর্ণ কঙ্কালস্তূপে পরিণত হইয়াছে। এখানকার মরা-মাটীর উপর যত ধ্বংসাবশেষ, মিশরের বালুরাশির উপরেও তত নাই। সেখানে, নীল-নদের ধারে, প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড পাষাণ-স্তূপ; এখানে—খোদিত মার্ব্বেল, জালি-কাটা ধূসরবর্ণের প্রস্তর, প্রস্তরময় জাফ্রির কাজ—বিষণ্ণ মাঠময়দানের মধ্যে, হারাণ জিনিষের মত ইতস্তত পড়িয়া আছে। যেখানে কত শতাব্দী ধরিয়া মানবচিন্তা ও মানব-উদ্যম অসাধারণ স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াছিল, সেই এই ভারতবর্ষে পূর্ব্ব-পূর্ব্ব যুগের অসংখ্য ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান; এবং উহাদের প্রাচুর্য্যে, উহাদের সৌন্দর্য্যে, আমাদের আধুনিক কল্পনা দিশাহারা হইয়া যায়। অনেকগুলি নগর যুদ্ধ-বিগ্রহ ও লোকহত্যার পরেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়; আবার কতকগুলি বিলাসশোভন নগর অমুক অমুক রাজার খামখেয়ালী-আদেশক্রমে গঠিত হইতে আরম্ভ হয়, কিন্তু সময়ের মধ্যে শেষ হয় নাই; কতকগুলি প্রাসাদ অমুক সুলতানার জন্য পরিকল্পিত হয়, কিন্তু উহা ভাস্কর-শিল্পী-দিগেরই ব্যবহারে আসিয়াছে,—অন্য কেহ সেখানে কখনো বাস করে নাই।

দিল্লি এবং প্রাচীন রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ, যেখানে পৃথিবীর মধ্যে বোধ হয় উচ্চতম কীর্ত্তিস্তম্ভ সেই গোলাপী পাথরের কুতব-মিনার সমুত্থিত—এই দুই স্থানের মধ্যবর্ত্তী সমস্ত পথটার দুই ধারে, কত নগর ও কত দুর্গেরই ছায়ামূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়;—ত্রিশ-চাল্লিশ ফীট্ উচ্চ দস্তুর প্রাকার, পরিখা ও পরিখার যন্ত্রসেতু; ভিতরে জনপ্রাণী নাই; সমস্তই নিস্তব্ধ; কিংবা ভিতরে প্রবেশ করিলে দেখা যায়, গড়াইয়া-পড়া শিলারাশির মধ্য হইতে, কাঁটাগাছের, ঝোপঝাড়ের মধ্য হইতে, বানরের পাল ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলাইতেছে।

তা ছাড়া, কত গোরস্থান, তাহার আর শেষ নাই। কত ক্রোশ পর্য্যন্ত সমস্ত ভূমি মৃতদেহে পরিপূর্ণ; গোরস্থানের চতুষ্কমণ্ডপ, সকল যুগেরই সমাধিস্তম্ভ পর-পর চলিয়াছে;—

রাশিরাশি ভাঙাচুরা জিনিষের মধ্যে গোলক-ধাঁধার মত পরস্পরের সহিত যেন জড়াইয়া-পাকাইয়া রহিয়াছে।

ইহার মধ্যে কতকগুলি সমাধিমন্দির এখনো ভক্তিসহকারে বহুব্যয়ে সংরক্ষিত; আবার কতকগুলি একেবারেই প্রচ্ছন্ন—ধসিয়া-পড়া পরিত্যক্ত আরো অসংখ্য সমাধিমন্দিরের পিছনে যেন ডুবিয়া রহিয়াছে। প্রস্তররাশির মধ্য দিয়া, গর্ত্তসমূহের মধ্য দিয়া, 'হাঁ-করা' প্রাচীন গুহাগহ্বরের মধ্য দিয়া যে সকল পথ গিয়াছে এবং যে সকল পথ ঐ গোরস্থানে আসিয়া মিলিয়াছে, ঐ সকল পথ চেনা দুষ্কর হইত, যদি ভিক্ষুকের দল, খঞ্জ কিংবা কুষ্ঠরোগী লোক খোঁটাচিহ্নের মত উহার চারিধারে না থাকিত। উহারা তীর্থযাত্রীদের নিকট ভিক্ষা পাইবার আশায় ঐখানে বসিয়া থাকে। এই সকল ধূলিসমাচ্ছন্ন পথ অতিক্রম কবিবার পর হঠাৎ একএকটা চমৎকার মস্‌জিদ দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়;—জালিকাটা মার্ব্বেলের দেয়াল, লাল রেশমের কাপড়ে যেন সোনালি পাড় বসান, জমকালো কার্পেট—যাহার উপর টাট্‌কা gardenia ও tubereuse পুষ্পসকল সজ্জিত রহিয়াছে। ইহার মধ্যে প্রাচীন ফকীর-দর্ব্বেশের বাসগৃহগুলিই সর্ব্বাপেক্ষা বিভবময়। উহারা নিজে ইচ্ছা করিয়াই দৈন্যের মধ্যে বাস ও পরম সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করিত; কিন্তু কোন কোন রাজা উহাদের স্মৃতিরক্ষার জন্য এইরূপ মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

প্রাকারাবলী ও খোদিত প্রাসাদাদির বহুপূর্ব্বেই গোলাপী পাথরের মিনারটি এই মৃত্যুর-দেশের দিগন্তে, বহুদূর হইতে নেত্র-সমক্ষে প্রকাশ পায়। শুষ্ক পাথুরে জমির তরঙ্গায়িত ক্ষেত্রের উপর দিয়া এই প্রাকার-প্রাসাদাদি মিনারের পাদদেশ পর্য্যন্ত প্রসারিত রহিয়াছে। এই সমস্ত শুষ্ক পাথুরে ভূমিখণ্ডের উপর এখন শুধু রাখালরা ছাগল চরাইয়া থাকে।

এখন প্রায় মধ্যাহ্ন; দুঃসহ প্রখর উত্তাপ; এই সময়ে আমি কোণালু-খিলান-বিশিষ্ট যুগল-দ্বার পার হইয়া এই ছায়ামূর্ত্তি নগরীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম। একটা শ্মশানের মত ভূমি-খণ্ড—বড় বড় দস্তুর প্রাকারে বেষ্টিত এবং এত বিশাল যে, সেই ঘেরের সমস্ত আয়তন সম্পূর্ণরূপে দৃষ্টিগোচর হয় না। উহার ভিতরে কতকগুলা গাছ, যাহা জলাভাবে মরিয়া যাইতেছে এবং উষ্ণবায়ু যাহার স্বর্ণ-পীত পত্রপুঞ্জ চারিদিকে উড়াইয়া ফেলিতেছে; আকার-গঠনহীন কতকগুলা প্রস্তরস্তূপ; ইতস্তত দৃশ্যমান কতকগুলা গম্বুজ, কতকগুলা মিনার—এতটা ক্ষয়গ্রস্ত হইয়াছে যে, উহাদিগকে শৈল-খণ্ড বলিয়া ভ্রম হয়; কেবল ঐ আশ্চর্য্যজনক মিনারের সন্নিকটে যে সকল গুরুভার বৃহদাকার ইমারতের অবশেষগুলি আছে, তাহা রাজকীয় মহল বলিয়া বেশ বুঝা যায়। কিন্তু এই গৌরবান্বিত ভগ্নাবশেষগুলির গঠনরীতি এক-প্রকার নহে—বিভিন্ন গঠনরীতি একত্র মিশিয়া গিয়াছে; এত যুদ্ধবিগ্রহ, এত আক্রমণ এই প্রাচীন ভূমির উপর দিয়া গিয়াছে, এতবার ধ্বংস হইয়াছে, আবার অমানুষিকভাবে এতবার নূতন করিয়া গঠিত হইয়াছে যে, ইহার কোন ঠিক-ঠিকানা পাওয়া যায় না। পৃথিবীর এই কোণটির ইতিহাস ঘোর তিমিরজালে সমাচ্ছন্ন।

ঐখানে—উপকথা-বর্ণিত কোন রাজার প্রাসাদের মধ্যে, সহস্রবৎসরব্যাপী প্রস্তররাশির সুশীতল ছায়াতলে, আমি আজ সমস্ত নিস্পন্দ মধ্যাহ্নকালটা আপনাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিব। কয়েকঘণ্টা একাগ্রচিন্তায় কিংবা নিদ্রায় অতিবাহিত করিবার জন্য, একটি ভৃত্যও সঙ্গে না লইয়া একাকী আমি একটা উচ্চ বারাণ্ডার কোণে আপনাকে স্থাপন করিলাম—অসংখ্য চৌকো-থাম-বিশিষ্ট ও প্রাচীন ভাস্কর-কার্য্যে আচ্ছন্ন একটা দালানঘর হইতে এই বারাণ্ডাটি বাহির হইয়াছে। এই সমস্ত ধ্বংসাবশেষের সহিত ঘনিষ্ঠরূপে পরিচিত হইবার উদ্দেশে—আজ এখানকার যাহারা গৃহস্বামী, সেই সব পশুদের সহিত ঘনিষ্ঠরূপে পরিচিত হইবার উদ্দেশেই আমি একাকী আসিয়াছি। বাহিরে—প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড এই বিস্তীর্ণ মরুভূমির উপর অনলবর্ষণ করিতেছে; পতঙ্গের গান, মক্ষিকার গুঞ্জন এখানে শোনা যায় না, কেবল দূরদূরান্তর হইতে কোন নিঃসঙ্গ টিয়াপাখীর তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না: উপরে, প্রাসাদের খোদাই-কাজের মধ্যে তাহার নীড়, সে প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নিদ্রা যায়। অথবা, দুর্ভিক্ষের দম্‌কা-বাতাসে তাড়িত হইয়া কতকগুল শুক্‌না-পাতা ঘোরপাক খাইতে খাইতে স্তম্ভশ্রেণীর মধ্যে আসিয়া পড়ে,—তাহারই মর্ম্মরশব্দ কচিৎ-কখন শুনা যায়।

দালান-ঘরের গুরুভার ছাদটা যে সকল প্রস্তরখণ্ডে আচ্ছাদিত, সেই প্রস্তরখণ্ডগুলা আড়াআড়িভাবে এবং কৌণিক স্তূপাকারে উপর্য্যুপরি স্থাপিত; এগুলি অতিদীর্ঘ অখণ্ড প্রস্তর; আমাদের পুরাতন ছাদের কাঠাম যেরূপ বড়-বড় গুঁড়িকাঠের উপর স্থাপিত হইত, ইহা কতকটা সেই ধরণের। যে সময়ে গম্বুজ অজ্ঞাত ছিল, বক্র-খিলান অজ্ঞাত ছিল, কিংবা তাহার উপর লোকের সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল না—সেই মানবজাতির শৈশবকালোচিত এই গঠনপদ্ধতি। আমার নীচে, প্রথমেই স্তম্ভের অরণ্য। থামগুলা প্রকাণ্ড,—বলা বাহুল্য, অখণ্ড পাথরের—এবং উহার চৌকোণা ধরণ দেখিয়া খুব পুরাতন হিন্দু-আমলের কল্পনা করা যায়। আমি যে অন্ধকারাচ্ছন্ন ছায়াময় কোণটিতে বসিয়া সমস্ত দেখিতেছি, সেখানকার কতক-গুলি 'গুল্‌গুলি'-গবাক্ষ হইতে বাহিরের জিনিষও দেখিতে পাইতেছি; লাল পাথর দেখিতেছি, ধূসরবর্ণের পাথর দেখিতেছি, বেগ্‌নি রঙের পাথর দেখিতেছি,—মনে হইতেছে, বাহিরের সমস্ত ধ্বংসাবশেষ অগ্নিময় সূর্য্য-কিরণে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে। আরো একটু দূরে, বায়ু এরূপ স্বচ্ছ এবং আলোটা এরূপ ঠিকভাবে পড়িয়াছে যে, আমি এখান হইতে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি—কতকগুলা দ্বারপ্রকোষ্ঠ খাড়া হইয়া রহিয়াছে—উহার কোণাল খিলানে চমৎকার খোদাই-কাজ এবং আদিম-কালের coufique অক্ষরে মুসলমানি লিপি লিখিত রহিয়াছে। এবং কোন * অজ্ঞাতযুগের একটি লৌহ-ধ্বজস্তম্ভ সমুত্থিত—সমস্তই কৃষ্ণবর্ণ ও সংস্কৃত অক্ষরে সমাচ্ছন্ন; উহার চারিদিকে কতকগুলা সমাধি-

* স্মৃতিস্তম্ভটি ২০ফিট্ উচ্চ; উহার শিলালিপিতে এইরূপ লিখিত আছে যে, বাহ্লিকদিগের উপর জয়লাভ করিয়া রাজা ধব এই স্মৃতিস্তম্ভটি উঠাইয়াছেন। বোধ হয় ৩ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি কোন সময়ে। প্রাচীনকালের ইহা একটি অপূর্ব্ব অতুলনীয় স্মৃতিস্তম্ভ।

স্তম্ভ এবং সান-বাঁধানো একটা মুক্ত প্রাঙ্গণ। পূর্ব্বে এই প্রাঙ্গণটি একটি খুব পবিত্র মস্‌জিদের অন্তঃপ্রাঙ্গণ ছিল। ‘পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর” বলিয়া সেই সময়ে এই মস্‌জিদের খ্যাতি ছিল।

নীচে, সানের উপর ‘তুড়ুক-তাড়ুক’ লম্ফঝম্প!…বাচ্ছারা পিছনে-পিছনে চলিয়াছে—তিনটা ছাগল প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করিল এবং কোন ইতস্তত না করিয়া, যেন চিরাভ্যস্ত এইভাবে আমার এই উপরের বারাণ্ডায় উঠিয়া আসিল এবং মাধ্যাহ্নিক নিদ্রার জন্য ছায়ায় আসিয়া শয়ন করিল। কতকগুলি কাক এবং কতকগুলি ঘুঘুও আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল। সকলেই এখন ঠাণ্ডা জায়গা খুঁজিতেছে এবং ছায়ায় বসিয়া নিদ্রা যাইবার উদ্যোগ করিতেছে। এখন নিস্তব্ধতার একাধিপত্য; সেই উড়ন্ত মরা-পাতার মর্ম্মরশব্দও এখন আর শুনা যায় না; কেন না, অন্যান্য পদার্থের ন্যায় বায়ুও এখন নিদ্রামগ্ন। আমার ঢাকা-বারাণ্ডার প্রান্তদেশে একটি ক্ষুদ্র গবাক্ষ আছে, সেখান হইতে বহির্দ্দেশ দেখা যায়; সেখান হইতে আকাশও দেখা যাইবার কথা; কিন্তু না, দেখিলাম শুধু গোলাপী ‘জমি’র উপর একটা শাদা জরি যেন অস্পষ্ট দূরদিগন্তে সটানভাবে বিলম্বিত; দেখিলাম, বৃহৎ মিনারের পার্শ্বদেশে, তাহার পাথরের গোলাপী রং এবং তাহাতে যে মার্ব্বেলের টুক্‌রাসকল বসানো আছে, তাহারই শাদা রং।…

যে বারাণসীসম্বন্ধে আমি ভয়ে-ভয়ে আছি, সেই বারাণসী-অভিমুখে যাইবার পথে এইটি আমার শেষ আড্ডা; দুইদিনের মধ্যেই আমি সেখানে পৌঁছিব; সেখানে গিয়া নিশ্চয়ই বিড়ম্বিত হইব, কিন্তু সেই মহাবিড়ম্বনা হইতে এখন আর পিছাইবার জো নাই।…এই সব ধ্বংসাবশেষের রহস্যময় শান্তির মধ্যে, সেই বিষয়ে আমি অনেক চিন্তা করিয়াছি; আমার মন সেই সাধুসন্ন্যাসীদিগের গৃহাভিমুখে ধাবিত হইতেছে,—যাঁহাদের শাকান্নের আতিথ্য—যাঁহাদের অদ্ভুত বিস্ময়জনক আতিথ্য আমি গ্রহণ করিব বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছি।…

কিন্তু চারিদিক্‌কার জড়তাপ্রভাবে আমার মন নিদ্রা ও স্বপ্নে অভিভূত হইলেও, আমার কল্পনাকে এখনো সেই বৃহৎ মিনারটি অধিকার করিয়া রহিয়াছে—যাহা এক্ষণে আমার খুবই নিকটে রাজসিংহাসনে বিরাজমান। গল্প আছে, রাজকন্যার খেয়াল হইল, দিগন্তপটে দূরবাহিনী একটি নদী দেখিবেন; রাজা স্বীয় দুহিতার খেয়াল চরিতার্থ করিবার জন্য উর্দ্ধগামী নদীর আকারে ঐ মিনার নির্ম্মাণ করাইলেন। আমার বারাণ্ডার জানালা দিয়া উহা যেমন স্পষ্ট দেখা যায়, এমন আর কোথাও হইতে নহে। একটা গোলাপী-রঙের দ্বারপ্রকোষ্ঠের পার্শ্বদেশে, ঐ গোলাপী মিনারটি অমলশুভ্র আকাশ ভেদ করিয়া উর্দ্ধে উঠিয়াছে। উহার তন্বী শ্রী, উহার উচ্চতা দর্শনে নেত্র বিহ্বল হইয়া পড়ে; অন্যান্য জানিত মিনার ও মিনারেটের যেরূপ পরিমাণ,* তাহা ছাড়াইয়া উঠিয়াছে; তলদেশ যেরূপ ফুলিয়া উঠিয়াছে, তাহাতে মনে হয়, যেন মিনারটি ঝুঁকিয়া রহিয়াছে; তা ছাড়া, বড়ই আশ্চর্য্য—এমন যে চমৎকার

* এই মিনারটি ২৪০ ফীট্ উচ্চ; ইহা প্রাচীন ভারতের একটা পরমাশ্চর্য্য সামগ্রী।

জিনিষ—এখনো এমন অক্ষত ও অক্ষুণ্ণ—উহা ধ্বংসাবশেষ-বিকীর্ণ মরুভূমির মধ্য হইতে উত্থিত হইয়াছে। উহার পাথর এমন মসৃণ ও উহার উপাদান-রেণু এমন সূক্ষ্ম যে, এত শতাব্দী হইয়া গেল, তবু উহাতে 'মোর্চ্চে' ধরে নাই এবং উহার রং এখনো যেন টাটকা রহিয়াছে *। গোলাকার খোদিত-'খোল', যাহা তলদেশ হইতে চূড়া পর্য্যন্ত উঠিয়াছে, উহা স্ত্রীলোকদিগের গাউনের একপ্রকার রেশ্‌মি ভাঁজের মত; ছাতা বন্ধ করিলে যেরূপ ভাঁজ পড়ে, সমস্ত যেন সেইরূপ ভাঁজবিশিষ্ট। সমস্তটা দেখিলে মনে হয়, যেন অর্গ্যান্‌-পাইপের একটা বাণ্ডিল, বড়-বড় তালকাণ্ডের একটা গুচ্ছ; এবং বিভিন্ন উচ্চদেশে যেন এক-একটা আংটার মধ্যে ঐগুলা আবদ্ধ—যাহাকে আংটা বলিতেছি, উহা পাথরের বারণ্ডা-ঘের; শাদা খচিত-কার্য্যের আকারে মুসলমানি লিপির দ্বারা ঐ সকল বারণ্ডা সমাচ্ছন্ন···

আমি প্রায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম।···সহসা মানুষের পায়ের শব্দ---দ্রুতগমনের শব্দ! এত ঘণ্টা নিস্তব্ধতার পর, এ একটা অচিন্তিতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন। ১০জন লোক, একঘেয়ে-লাল বড়-বড় পাথরের উপর দেখা দিল; উত্তর-প্রদেশের মুসলমান, ছুঁচাল টুপি দেখিয়া আফ্‌গান বলিয়া চিনিলাম: পাগ্‌ড়ির পাক এত নীচে দিয়া গিয়াছে যে, উহাদের কান ও চোখের কোণ তাহাতে ঢাকিয়া গিয়াছে, কেবল শুকচঞ্চু-নাসিকামাত্র বাহির হইয়া আছে। দাড়ির রং মিষ্‌-কালো। উহারা খুব দ্রুত চলিতেছে; মুখে খলতা ও বদমাইসি প্রকাশ পাইতেছে। আমার কোটরে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া, আমি যে উপরে আছি তাহা ইঙ্গিতেও প্রকাশ না করিয়া, উহাদের দেখিয়া আমোদ উপভোগ করিতেছিলাম। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, উহারা ভক্ত তীর্থযাত্রী, ভক্তির দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াই এইখানে আসিয়াছে। লুপ্তপ্রায় মস্‌জিদের সুন্দর দ্বারপ্রকোষ্ঠের সম্মুখে আসিয়া উহারা দাঁড়াইল; সমাধিস্থান চুম্বন করিবার জন্য সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইল; তাহার পর তাড়াতাড়ি উঠিয়া আরো দূরে চলিয়া গেল; ভগ্নাবশেষের মধ্যে কোথায় মিলাইয়া গেল—আর দেখা গেল না।

এখন প্রায় তিনটা বাজিয়াছে। আবার জীবন-উদ্যম আরম্ভ হইল। সবুজ টিয়াগুলা খিলানের গর্ত্ত হইতে বাহির হইল, খোদাই-কাজের ফাঁকের ভিতর পায়ের নখ বসাইয়া কি করিবে ভাবিতে লাগিল, বহির্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল; তাহার পর চীৎকার করিতে করিতে সাঁ করিয়া উড়িয়া গেল। ছাগত্রয়ও জাগিয়া উঠিল, মুড়া ও শুক্‌না ঘাসের সন্ধানে বাচ্ছাদের লইয়া বাহির হইল। এবং আমিও ছায়াদেহসার নগরটিতে ভ্রমণ করিবার জন্য নীচে নামিলাম।

গৃহের ভগ্নাবশেষ, মন্দিরের ভগ্নাবশেষ, প্রাসাদ ও মস্‌জিদের ভগ্নাবশেষ; হেথা-হোথা শীর্ণ গাভীবৃন্দ প্রস্তরাদির মধ্যে তৃণচর্ব্বণের চেষ্টা করিতে করিতে ক্রমে প্রাচীরবদ্ধ সেই শ্মশান-বিষণ্ণ ভূমিখণ্ডের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল। যাহারা গরু চরাইতে আসিয়াছিল, সেই বুনো রাখালেরা চাপা আওয়াজে বাঁশী বাজাইতেছিল। তাহাদের মুখে চিন্তার ভাব, ভয়ের ভাব; চতুর্দ্দিকস্থ দেবালয়ের ধ্বংসদশা তাহাদের মনে এই ভীতির

* ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে ইহার পুনরুদ্ধার হয়।

উদ্রেক করিয়াছে। চারিদিক্ হইতেই দেখা যায়, ঐ গোলাপী মিনারটি মাথা তুলিয়া রহিয়াছে ; এই সার্ব্বভৌম ধ্বংসদৃশ্যের মধ্যে, উহা যেন সাক্ষিরূপে দণ্ডায়মান।

অস্পষ্ট-অনির্দ্দেশ্য চৌমাথা-রাস্তার উপর, কতকগুলা দেয়ালের গায়ে এখনো কতকগুলা গবাক্ষ রহিয়াছে ; এখনো কতকগুলা বারাণ্ডা বাহির হইয়া রহিয়াছে ; পূর্ব্বে সেখান হইতে সুন্দরীরা বেগ্‌নি পরিচ্ছদে আচ্ছাদিত গজবৃন্দের গমনাগমন, সারিবন্দি বৃহৎ ছত্রের উৎসব-ঠাট্, অশ্বারোহী যোদ্ধৃবর্গের রণযাত্রা, গৌরবান্বিত প্রাচীনকালের জনতা এই সমস্ত নিরীক্ষণ করিত।...আহা! লুপ্ত রাজপথের কোণে-কোণে অবস্থিত এই সব নহবদ্‌খানার কি বিষণ্ণ মুখশ্রী!

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রাইবনীদুর্গ।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

শিবাপ্রসন্ন দাস মহাশয়কে নিতান্ত বিপন্ন অবস্থায় রাখিয়া আমরা অবান্তর অন্যান্য কথায় কালক্ষেপ করিতেছি। এখন তাঁহার অনুসরণ করিবার সময় উপস্থিত।

অশ্বপৃষ্ঠ হইতে জলে লাফাইয়া পড়িয়া দাসমহাশয় সেই বিশ্বস্ত জীবের স্কন্ধে আদরে হাত বুলাইলেন এবং তাহাকে তীরাভিমুখে ছুটিয়া পলাইতে ইঙ্গিত করিলেন। দেখিতে দেখিতে সে ভাস্করপণ্ডিতের সঙ্গে সঙ্গে রাইবনীর পারে উত্তীর্ণ হইল। তখন শিবাপ্রসন্ন আকস্মিক বন্যাপ্লাবনে অভ্যস্ত সন্তরণপটুর ন্যায় নিমেষে পরিধেয়বস্ত্রাদি সংযত করিয়া লইলেন এবং আপনার উত্তরীয়খণ্ড প্রবাহমুখে নিমজ্জনোন্মুখ মূর্চ্ছিত ভক্তের কটিদেশে বন্ধন করিয়া তাঁহাকে পৃষ্ঠোপরি তুলিয়া লইলেন! পলকে পলকে সুবর্ণরেখা মায়াবিনী রাক্ষসীর মত বিপুল বারিদেহ ফেনপুঞ্জে বিস্ফারিত করিতে করিতে উদ্দামগতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে। ক্ষীণ চন্দ্রালোক তাহার ফেনিল আয়তবক্ষে সহস্র ইন্দ্রধনু বিচ্ছুরিত করিয়া ভীষণে সুন্দরে অপূর্ব্ব সুষমার সৃষ্টি করিয়াছিল। ভক্ত শিবাপ্রসন্ন প্রকৃতির সে মূর্ত্তিতে ভগবানের অপার লীলা অনুভব করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

দেখিতে দেখিতে তাঁহারা রাজঘাটের নিকটবর্ত্তী হইলেন। তথায় ময়ূরভঞ্জরাজের অতিথিশালায় বিস্তর লোক সমবেত হইয়াছিল এবং মশালের আলোকসহায়ে বন্যাপ্রবাহতাড়িত,—নিমজ্জিত এবং নিমজ্জনোন্মুখ,—জীবমাত্রের উদ্ধারসাধনে নিযুক্ত ছিল। পরমবৈষ্ণব রাজা চক্রাধিপভঞ্জ সুবর্ণরেখার তীরবর্ত্তী গ্রামসমূহের এইরূপ দৈববিপদ্ অনেকবার প্রত্যক্ষ করিয়া যথাসাধ্য জীবক্লেশ-

নিবারণের জন্য অহোরাত্র একদল নৌ-ব্যবসায়ীকে এখানে নিযুক্ত রাখিতেন। যে মুহূর্ত্তে দাসমহাশয় সে অবস্থায় রাজঘাটের অদূরে ভাসিয়া যাইতেছিলেন, তাঁহার বিশ্বস্ত ভৃত্য গঙ্গাদীন ঠিক্ সেই মুহূর্ত্তে ধর্ম্মশালায় উপনীত হইয়া স্বেদসিক্ত অশ্বপৃষ্ঠ হইতে লাফাইয়া পড়িল।

যতদূর সংক্ষেপে সম্ভব, প্রভুর বিপন্নাবস্থার কথা প্রচার করিয়া সে ক্ষিপ্রবৎ কাহারো হাতের মশাল কাড়িয়া লইল এবং নদীতীরে ছুটিয়া চলিল। অনেকেই তাহার অনুগমন করিতেছিল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

রাজঘাটের ধর্ম্মশালায় যে বন্যাপ্রপীড়িতদের উদ্ধার জন্য উপযুক্ত বন্দোবস্ত আছে, দাস-মহাশয়ের তাহা জানা ছিল। বন্যাগর্জ্জনে দিগ্ দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হইতেছিল,—এবং প্রতি মুহূর্ত্তে তিনি পৃষ্ঠের সেই গুরুভার লইয়া অতিশয় বেগে স্রোতোমুখে নিক্রান্ত হইয়া যাইতেছিলেন। সুতরাং বারংবার তাঁহার মনে হইতেছিল, অলক্ষিতে কখন্ রাজঘাট উত্তীর্ণ হইয়া যাইবেন। কিন্তু তীরে আলোকের প্রাচুর্য্য দেখিয়া আর ভ্রম রহিল না। সৌভাগ্যক্রমে এই সময়ে দীর্ঘ কাষ্ঠখণ্ড শিবাপ্রসন্নের পশ্চাতে ভাসিয়া আসিতেছিল। তিনি পদস্পর্শে তাহা অনুভব করিয়া ধরিয়া ফেলিলেন এবং অপেক্ষাকৃত অনায়াসে আলোকের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এরূপ বিপদে তিনি অভ্যস্ত এবং অনেকসময় তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া আমোদিত হইতেন। অতএব সাধারণ আর্ত্তের মত সাহায্যার্থে গোলযোগ করিয়া লোকগুলাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিবার কোন দরকার দেখিতেছিলেন না।

তীরে উত্তীর্ণ হইয়া দাসমহাশয় সর্ব্বাগ্রে সেই ভক্তটির পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন। আলোকসহায়ে তিনি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলেন, গেরুয়াবসনধারী দণ্ডী সন্ন্যাসীটি আর যেই হউন তিনি রাইবনী বা নিকট-বর্ত্তী গ্রামবাসী নহেন। গতরাত্রে অস্ফুট চন্দ্রালোকে তিনি বুঝিতে পারেন নাই যে, যে বিপন্ন ভক্তের জীবনরক্ষায় তিনি নিযুক্ত হইয়াছেন, বয়সে তিনি তাঁহার অপেক্ষা অনেক বড়। ফলত এই বলিষ্ঠ কমনীয়কান্তি যুবক দূরদেশ হইতে কেন এ প্রদেশে দণ্ডী দিতে আসিয়াছে, জানিবার জন্য দাসমহাশয় কিছু কৌতূহলী হইলেন। বিশেষত এই অতিথির সুঠাম ললাট ও উন্নত নাসা দেখিয়া তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, ইনি সামান্য লোক নহেন।

দাসমহাশয় প্রথম হইতেই সাবধান হইয়াছিলেন, বন্যাজল যেন কোনরূপে তাঁহার অতিথিটির উদরস্থ না হয়। সেই অভাবনীয় অবস্থায় ইহা প্রায় অসম্ভব হইলেও তিনি নানা কৌশলে ইহাতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। কিন্তু সমস্ত দিনের উপবাস ও কৃচ্ছ্রবশত সুবর্ণরেখার উত্তপ্ত সৈকতশয্যায় ভক্তটি মহারাষ্ট্রপণ্ডিত ও দাসমহাশয়ের কথোপ-কথনের অবসরে সেই যে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া-ছিলেন, রাজঘাটে উত্তীর্ণ হওয়ার পরও তাহা ভাঙে নাই।

শিবাপ্রসন্ন অনেক যত্ন ও শুশ্রূষা করিয়া অতিথির অজ্ঞানাবস্থা দূর করিলেন। সংক্ষেপে তাঁহার মূর্চ্ছার পর যে ঘোর বিপদ্ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা বলিয়া ভগবান্‌কে ধন্যবা

দিলেন। নিজে যাহা-কিছু করিয়াছিলেন, যথাসাধ্য তাহা গোপন করিলেন। কিন্তু অপরিচিত যুবকের বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, সেই সৌম্যমূর্ত্তি মহাত্মাই তাঁহার জীবনদাতা। অনেকদিনের অনেক কথা তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। তখন তিনি সহসা শয্যাত্যাগ করিয়া দাসমহাশয়ের পদধূলি গ্রহণ করিলেন। শিবা-প্রসন্ন নিবারণ করিতে যাইতেছিলেন,—পারিলেন না।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

রাজঘাটের ধর্ম্মশালায় ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে পথিকদের আশ্রয় মিলিত। হিন্দুমুসলমানের জন্য পৃথক্ পৃথক্ স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল এবং ময়ূরভঞ্জরাজের সুব্যবস্থায় রাজকর্ম্মচারী একজন বারমাস সেখানে উপস্থিত থাকিয়া সকলকেই সিধা' বিতরণ করিতেন।

ঘটনার দিন সায়ংকালে কটকের দিক্ হইতে একদল ফকীর—সংখ্যায় দশজন—আসিয়া মুসলমানদের জন্য রক্ষিত বিশ্রামাগারটি দখল করিয়া বসিল। রাজকর্ম্মচারী প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া কেবলমাত্র জানিতে পারিলেন যে, তাহারা মসজীদ্‌নির্ম্মাণের জন্য ভিক্ষায় বাহির হইয়াছে এবং সম্প্রতি হরিহর-পুরের দিকে যাইবে।

হরিহরপুর তখন ময়ূরভঞ্জের রাজধানী। কটক বা বালেশ্বর হইতে তথায় যাইতে হইলে সোজাপথের অভাব ছিল না। অতএব রাজ-কর্ম্মচারী এই উত্তরে কোন বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলেন না। তখন উড়িষ্যার শাসন-কর্ত্তার সহিত নেবাব আলীবর্দ্দির যুদ্ধ অবশ্য-ম্ভাবী হইয়া উঠিয়াছে এবং রাজা চক্রাধিপভঞ্জ ক্রমশ রাজঘাটে সমরোদ্যোগ সম্পূর্ণ করিতে-ছিলেন। চুয়াড় এবং খণ্ডাইৎ সেনারা কুলী-মজুরের কাজ করিবার অছিলায় প্রতিদিন বর্দ্ধিতসংখ্যায় সমবেত হইতেছিল। রাজ-কর্ম্মচারী কল্যাণপণ্ডা বহুদর্শী বিজ্ঞব্যক্তি। "সাবধানের বিনাশ নাই"—তাঁহার রাজনীতির মূলসূত্র ইহাই। তিনি স্থির করিয়া বসিলেন, এই ফকীরগুলা ছদ্মবেশে পাঠানসৈন্য,—কোন মতলবসিদ্ধির জন্য দেওয়ান মীর-হবীবের আদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

কল্যাণপণ্ডা ঠিক্ ঠাহর করিয়াছিলেন। তাহারা দেওয়ানসাহেবের অনুচরই বটে। তবে কি উদ্দেশ্যে মিত্রভাবাপন্ন ময়ূরভঞ্জাধিপের অধিকারে তিনি গুপ্তচর পাঠাইবার স্পর্দ্ধা রাখেন, সেটি জানিবার এক্তিয়ার রাজঘাট-কেল্লার প্রধান কর্ম্মচারীর অবশ্য আছে।

পণ্ডামহাশয়ের কতকটা বিদ্যাসাগরী ধরণের বেশ। সেই অর্দ্ধমুণ্ডিত পরিপক্ক মস্ত-কের ভিতর সুশীতল তীক্ষ্ণধী এবং উত্তরীয়-খণ্ডে মাত্র আবৃত বিশালবক্ষে অদম্য সাহস ও শৌর্য্য বিরাজ করিত। যেমন তাঁহার প্রতীতি হইল, মীরহবীব তদীয় প্রভুর সহিত চাতুরী খেলিতে সাহস করিয়াছেন, অমনি তিনি দৃঢ়সঙ্কল্পে একাকী ফকীরশালায় দর্শন দিলেন। তখন তাহারা স্তূপাকৃতি "রোটী" পাকাইয়া প্রাতরাশের অবশিষ্ট কাবাবের রাশি গরম করিবার উদ্যোগে ব্যস্ত ছিল। সুতরাং লশুনগন্ধে আমোদিত সে স্থান তখন পণ্ডাজীর মত গোঁড়াহিন্দুর পক্ষে "অতিসেব্য" ছিল না।

এই প্রাচীন রাজকর্ম্মচারী মেদিনীপুর হইতে জলেশ্বর এবং রাজঘাট হইতে বালেশ্বর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র সুপরিচিত ছিলেন। ফকীরেরাও

তাঁহাকে বেশ চিনিত। সেলাম, তস্‌লীম্ এবং আদবকায়দার বিনিময় শেষ হইলে পণ্ডামহাশয় জানিতে চাহিলেন যে, আগন্তুকদের ভিতর সর্দ্দার কে? তাঁহার সঙ্গে তাঁর গোটাকতক "পুষিদা বাৎচিৎ" আছে।

আমরা সেই কথোপকথনের সবিস্তার ও সটীক বিবরণ রাখি নাই। সংক্ষেপে অনেক বিচারবিতর্ক, অনুনয়বিনয় ও ভয়প্রদর্শনের পর কল্যাণপণ্ডা মীরহবীবের স্বহস্তলিখিত "খৎ"খানি পড়িতে পাইলেন। চিঠি রাধাচরণের নামে লিখিত। দেওয়ানজী বলিতেছেন, শিবাপ্রসন্ন দাস জলেশ্বর-অঞ্চলে মহা প্রতাপশালী লোক। ছলে-কৌশলে তাহাকে আয়ত্ত করার দরকার। তাহাতে কার্য্যোদ্ধার না হইলে বলে বন্দী করিয়া উহাকে আপাতত সিমুলিপাহাড়ের দুর্জ্জয় দুর্গে যেন পাঠান হয়। এই ক্ষুদ্র বিশ্বস্ত সেনা সেই কাজের মদৎ জন্য ছদ্মবেশে প্রেরিত হইল।

ক্রমশ।

সদানন্দ-সুরধুনী।

["হরিহরমূর্ত্তি"—অর্থাৎ অর্দ্ধাঙ্গ হরি ও অপরার্দ্ধ হর—ও "হরগৌরী"মূর্ত্তি—অর্থাৎ অর্দ্ধাঙ্গ হর ও অপরার্দ্ধ গৌরী—এই দুই যুগল মূর্ত্তির বর্ণনা করিয়া অনেক কবি কবিতা লিখিয়াছেন। কিন্তু "হরগঙ্গা"র বর্ণনা করিয়া কেহই আজ পর্য্যন্ত এরূপ যুগল কবিতা লেখেন নাই। অন্তত এরূপ কবিতা আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। আমি এই ক্ষুদ্র কবিতাটি রচনা করিয়া "সদানন্দ-সুরধুনী"র পাদপদ্মে অর্পণ করিলাম। হরগঙ্গার আশীর্ব্বাদে আমার এ অকিঞ্চিৎকর কবিতাটি জয়যুক্ত হউক।]

আধা—সদা সদানন্দ, যোগে নিমগন,
অর্দ্ধনিমীলিত সুন্দর নয়ন,
ভালে শশিকলা প্রাণ-আহ্লাদন,
কষিত-কনক-অঙ্গা!

আধা—শুভ্রফেনময়ী, চন্দ্রকরোজ্জ্বলা,
দুকূলধারিণী, পবিত্রা, বিমলা,
হসিত-সুনেত্রা আনন্দ-বিহ্বলা
দেবী সুরধুনী, তরলা, শীতলা,
চপল-তরঙ্গা গঙ্গা!

আধা—আপন স্বরূপে—শব্দহীন, চুপ,
কোকনদে ভৃঙ্গ যেন রে লোলুপ!
মৌনব্রতধারী,—আহা অপরূপ,
যোগানন্দে সদানন্দ!

আধা—ঝঙ্কারকারিণী, গুহাবিদারিণী,
কুলুকুলু শব্দে সঙ্গীতকারিণী,
রিণি-রিণি শব্দে ত্রিতন্ত্রীবাদিনী,
কলকল শব্দে ভৈরবনাদিনী,
দেবী সুরধুনী সাগরগামিনী,
চরণে শিঞ্জিনী-ছন্দ।

আধা—বিভূতিভূষণ শ্রীঅঙ্গ মোহন,
ধবল ধুতূরা গলে কি শোভন!
নীলকণ্ঠ কিবা নীরদবরণ,
সদানন্দ যোগিবেশ!

আধা—চন্দ্রকরহার শ্রীকণ্ঠে ধারিণী,
চন্দনচর্চ্চিত শ্বেতাঙ্গশোভিনী,
নেত্র-কুবলয়, নীলাব্জ-নিন্দিনী,
দেবী সুরধুনী, বিশ্ববিমোহিনী,
চাঁচর-চিকুর কেশ!

আধা—পিঙ্গল সুজটা,—যেন ভূর্জ্জপত্র!
ফণিফণাজাল—যেন আতপত্র!
ফণিশিরে কিবা শোভিছে বিচিত্র,
হীরা, পান্না, মণি, চুনি!

আধা—জলমুক্তাজালে গ্রথিত কুন্তল,
কুন্দদন্তপাঁতি মরি কি উজ্জ্বল,
হাস্যচ্ছটা কিবা সুন্দর শীতল,
স্বচ্ছ দুটি আঁখি, দর্পণ বিমল,
সুহাসিনী সুরধুনী।

আধা—যোগানন্দরসে সদা কুতূহলী,
দুটি রক্তজবা চারু বীরবৌলী,
ভাঙে রাঙা আঁখি, চারু চন্দ্রমৌলী,
সদা সদানন্দ মুনি।

আধা—শুভ্র শঙ্খদলে শ্বেতাঙ্গশোভিনী,
যোগি-সদানন্দ-হৃদয়বাসিনী,

ভক্তহৃদয়ের ত্রিতাপনাশিনী,
মধুরহাসিনী, মধুরভাষিণী,
সুকেশিনী, সুরধুনী ।

আধা—ধক্-ধক্ জ্বলে জটাজুটজাল
ধক্-ধক্ জ্বলে বিশাল কপাল,
লক্-লক্-জিহ্বা ফণিনা করাল,
জ্বলজ্বল-মণি-অঙ্গা !

আধা—মুক্তিময়ী দেবী, মুকতি-উৎসঙ্গা,
কল্লোল-উৎসবে সদা নবরঙ্গা !
(আনন্দ-তুফানে সদা নবরঙ্গা,)
মাতা সুরধুনী, ললিত-ভ্রূভঙ্গা,
চপল-তরঙ্গা গঙ্গা !

জয়—সদা সদানন্দ, সদা আশুতোষ,
ত্রিনেত্র হেরে না ভকতের দোষ,
মূর্ত্তিমান্ তম, তবু নাহি রোষ
অপরাধী ভক্তজনে !

জয়—পতিতপাবনী, জীব-উদ্ধারিণী,
জন্মজন্মান্তর-পাতকহারিণী,
মহাদর্পে,তুঙ্গ-শৃঙ্গ-বিদারিণী,
চঞ্চলা, কুটিলা, প্রসাদরূপিণী
তবু ভক্ত অকিঞ্চনে !

জয়—নির্গুণস্বরূপ, কেবলি আভাস,
শুধু ব্যোমকেশ, কেবলি আকাশ,
রূপ-রস-গন্ধ পেয়েছে বিনাশ
বর্ণহীন নিত্যরূপে !

জয়—সত্ত্বরজস্তম মায়াস্বরূপি
যবনিকা-আড়ে কৌতুককারিণী,
ভোজবাজী-রঙ্গে নাটের রঙ্গিণী,
মাতা সুরধুনী, মহা কুহকিনী,
লীলা করে চুপে চুপে !

হে যুগ-মূরতি, গঙ্গা-সদানন্দ,
কত কাল আর মোহে রব অন্ধ ?
ত্রিশূলে কাটহ এই মায়াবন্ধ,
ঢাল ঢাল গঙ্গাজল !

মুছাও মুছাও ভারতকলঙ্ক,
প্রেম-ভগীরথ প্রীতি-মহাশঙ্খ
বাজাক্ ভৈরবে, ঘুচুক্ আতঙ্ক,
আন জাহ্নবীরে বাজাইয়া ডঙ্ক,
জ্বালি ধর্ম্ম-হোমানল !

পরা ভক্তি—গঙ্গা হিমাচল-শৃঙ্গে
ভেদিয়া, নামুক উত্তাল-তরঙ্গে,
তা বিনা গোসাঞি, আর গতি নাই
এ দুঃখিনী ভারতের !

বাক্য-আস্ফালন জীমূত-গর্জ্জন,
"স্বদেশী" "স্বদেশী" বাষ্প-উদ্গিরণ:
করিলে কি হয় বারি-বরিষণ ?
কি উত্তাপ ! শেষ নাহি ত্রিলোচন
হায় এই নিদাঘের !

এ মহাজাহ্নবী আসুক্ ধাইয়া ;
নাচিয়া, গাহিয়া, গর্জ্জিয়া, ফুলিয়া,
তব জটাজাল হইতে নামিয়া,
তরল রজতকান্তি।

ভারত হউক্ সুজলা সুফলা,
শত বারাণসী হাসুক্ উজ্জ্বলা,
উরুক্ দেউলে ভারত-কমলা !
স্বস্তি ! স্বস্তি ! শান্তি ! শান্তি !

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

বঙ্গদর্শন।

সাহিত্যপরিষদ্

বাংলাদেশের স্থানে স্থানে সাহিত্যপরিষদের শাখাস্থাপন ও বৎসরে বৎসরে ভিন্ন ভিন্ন জেলায় পরিষদের বাৎসরিক-মিলনোৎসব-সাধনের প্রস্তাব অন্তত দুইবার আমার মুখ দিয়া প্রচার হইয়াছে। তাহাতে কি উপকারের আশা করা যায় এবং তাহার কার্য্যপ্রণালী কিরূপ হওয়া উচিত, তাহাও সাধ্যমত আলোচনা করিয়াছি। অতএব তৃতীয়বারে আমাকে বিশ্রাম করিতে দেওয়া উচিত ছিল। একই জমিতে একই ফসল বারবার চাষ করিতে গেলে ফলন ভাল হয় না, নিঃসন্দেহই আমার সুহৃদ্গণ সে কথা জানেন—কিন্তু তাঁহারা যে ফলের প্রতি দৃষ্টি না করিয়াও আমাকে সভাস্থলে পুনশ্চ আকর্ষণ করিলেন, এর কারণ ত আর কিছু বুঝি না,—এ কেবল আমার প্রতি পক্ষপাত। এই অকারণ পক্ষপাতব্যাপারটার অপব্যয় অন্যের সম্বন্ধে সহ্য করা অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু নিজের সম্বন্ধে সেটা তেমন অত্যুগ্র অন্যায় বলিয়া ঠেকে না—মনুষ্যস্বভাবের এই আশ্চর্য্য ধর্ম্মবশত আমি বন্ধুদের আহ্বান অমান্য করিতে পারিলাম না —ইহাতে যদি আমার অপরাধ হয় ও আমাকে অপবাদ সহ্য করিতে হয়, তাহাও স্বীকার করিতে হইবে।

পূর্ব্বে আমাদের দেশে পালপার্ব্বণ অনেক-রকমের ছিল—তাহাতে আমাদের একঘেয়ে একটানা জীবনের মাঝে মাঝে নাড়া দিয়া ঢেউ তুলিয়া দিত। আজকাল সময়াভাবে, অন্নাভাবে ও শ্রদ্ধার অভাবে সে সকল পার্ব্বণ কমিয়া আসিয়াছে। এখন সভা-সমিতি-সম্মিলন সেই সকল পার্ব্বণের জায়গা দখল করিতেছে। এইজন্য সহরে-মফস্বলে কতরকম উপলক্ষ্যে কতপ্রকার নাম ধরিয়া কত সভাস্থাপন হইতেছে, সেই সকল সভায় দেশের বক্তাদের বক্তৃতার পালা জমাইবার জন্য কত চেষ্টা ও কত আয়োজন হইয়া থাকে, তাহা সকলেই জানেন।

অনেকে এই সকল চেষ্টাকে নিন্দা করেন ও এই সকল আয়োজনকে হুজুগ বলিয়া উড়াইয়া দিয়া থাকেন। বাংলাভাষায় এই 'হুজুগ'শব্দটা কোথা হইতে আসিল, তাহা আমাদের পরিষদের শব্দতাত্ত্বিক মহাশয়গণ স্থির করিবেন—কিন্তু এটা যে আমাদের সমাজের শনিগ্রহের রচনা, আমার তাহাতে সন্দেহ নাই। নিজের জড়ত্বকে অন্য লোকের উৎসাহের চেয়ে বড় পদবী দিবার জন্যই প্রায় অচললোকেরা এই শব্দটা ব্যবহার করিয়া দেশের সমস্ত

উদ্যমের মূলে হুল ফুটাইবার চেষ্টা করিয়া থাকে।

দেশের মধ্যে কিছুকাল হইতেই এই যে চাঞ্চল্য দেখা যাইতেছে, এটা যদি হুজুগ হয় ত হোক্। আমাদিগকে ভুল করিতে দাও, গোল করিতে দাও, বাজে-কাজ করিতে দাও, পাঁচজন লোককে ডাকিতে ও পাঁচজায়গায় ঘুরিতে দাও। এই নড়াচড়া চলুক। এই নড়াচড়ার দ্বারাই, যেটা যেভাবে গড়িবার সেটা ক্রমে গড়িয়া উঠে, যেটা বাহুল্য সেটা আপনি বাদ পড়ে, যেটা বিকৃতি সেটার সংশোধন হইতে থাকে। বিবেচকভাবে চুপচাপ করিয়া থাকিলে তাহার কিছুই হয় না। আমাদের মনটা যে স্থির হইয়া নাই, দেশের নানাস্থানেই যে ছোটবড় ঘূর্ণাবেগ আজকাল কেবলি প্রকাশ পাইতেছে, ইহাতে বুঝা যাইতেছে, একটা সৃষ্টির প্রক্রিয়া চলিতেছে। ঘুরিতে ঘুরিতে জ্যোতির্বাষ্পই যে কেবল আকার ধারণ করে, তাহা নহে—মানুষের মনগুলি যখন গতির বেগ পায়, তখন তাহারা জমাট বাঁধিয়া একটা-কিছু গঠন না করিয়া থাকিতে পারে না। অন্তত, আমরা যদি কিছু গড়িয়া তুলিতে চাই, তবে এইপ্রকার বেগবান্ অবস্থাই তাহার পক্ষে অনুকূল। কুমোরের চাকা যখন ঘুরিতে থাকে, তখনি কুমোর যাহা পারে গড়িয়া লয়; যখন তাহা স্থির থাকে, তখন তাহার কাছে প্রত্যাশা করিবার কিছুই থাকে না।

আজ দেশের মধ্যে চারিদিকে যে একটা বেগের সঞ্চার দেখা যাইতেছে, তাহাতেই হঠাৎ দেশের কাছে আমাদের সমস্ত প্রত্যাশাই বাড়িয়া গেছে। আমাদের যাহার মনে যে উদ্দেশ্য আছে, এই বেগের সুযোগে তাহা সিদ্ধ করিয়া লইবার জন্য আমরা সকলেই চকিত হইয়া উঠিয়াছি। আজ আমরা দশজনে যে-কোনো উপলক্ষ্যে একত্র হইলেই তাহার মধ্য হইতে কিছু-একটা মথিয়া উঠিবে, এমন ভরসা হয়। এইরকম সময়ে যাহা অনপেক্ষিত, তাহাও দেখা দেয়, যাহাকে আশা করিবার কোনো কারণ ছিল না, তাহাও হঠাৎ সম্ভব হইয়া উঠে। আমাদের প্রত্যেকের শক্তি সামান্য হইলেও সমস্ত সমাজের বেগে ক্ষণে ক্ষণে অসাধ্যসাধন হইতে থাকে।

আজ আমাদের সাহিত্যপরিষদেরও আশা বাড়িয়া গেছে। এই যে এখানে নানা জেলা হইতে আমরা বাঙালী একত্র হইয়াছি, এখানে শুধু একটা মিলনের আনন্দেই এই সম্মিলনকে শেষ করিয়া দিয়া যাইব, এমন আমরা মনে করি না—হয় ত এইবারেই, ফল যেমন যথা-সময়ে ডাল ছাড়িয়া ঠিকমত জমিতে পড়ে ও গাছ হইবার পথে যায়, সাহিত্যপরিষদ্‌ও সেইরূপ নিজেকে বৃহৎ বাংলাদেশের মধ্যে রোপিত করিবার অবসর পাইবে। এবার হয় ত সে বৃহত্তর জন্ম লাভ করিবার জন্য বাহির হইয়াছে। আপনাদের আহ্বান শুধু সমাদরের আহ্বান নহে, তাহা সফলতার আহ্বান। আমরা ত এইমতই আশা করিয়াছি।

যদি আশা বৃথাই হয়, তবু মিলনটা ত কেহ কাড়িয়া লইবে না;—বুদ্ধিমান্ কবি ত বলিয়াছেন যে, মহাবৃক্ষের সেবা করিলে ফল যদি-বা না পাওয়া যায়, ছায়াটা পাওয়া যাইবেই। কিন্তু ঐটুকু নেহাৎপক্ষের আশা লইয়াই আমরা সন্তুষ্ট হইতে পারিব না—আমরা এই কথাই বলিব, আচ্ছা, আজ যদি-বা শুধু ছায়াই জুটিল, নিশ্চয়ই কাল ছায়াও পাইব, ফলও ধরিবে;

কোনোটা বাদ দিব না। সফলতাসম্বন্ধে আধা-আধি রফানিষ্পত্তি করা কোনোমতেই চলিবে না। বহরমপুরের ডাকে আজ আমরা সাহিত্য-পরিষদ্ অত্যন্ত লোভ করিয়াই এখানে আসিয়া জুটিয়াছি—শুধু আহার দিয়া বিদায় করিলে নিন্দার বিষয় হইবে—দক্ষিণা চাই। সেই দক্ষিণার প্রস্তাবটাই আজ আপনাদের কাছে পাড়িব।

আমার দেশকে আমি যত ভালবাসি, তার দশগুণ বেশি ভালবাসা ইংরেজের কর্ত্তব্য, এ কথা আমরা মুখে বলি না, আমাদের ব্যবহারে তাহাই প্রকাশ পায়। এইজন্য ভারতবর্ষের হিতসাধনে বিদেশীর যত-কিছু ত্রুটি, তাহা ঘোষণা করিয়া আমাদের শ্রান্তি হয় না, আর দেশীলোকের যে ঔদাসীন্য, সে সম্বন্ধে আমরা একেবারেই চুপ। কিন্তু এ কথাটার আলোচনা বিস্তর হইয়া গেছে, এমন কি, আমার আশঙ্কা হয়, কথাটা আপনার অধিকারের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া ছুটিয়াছে বা! কথা-জিনিষটার দোষই ঐ—সেটা হাওয়ার জিনিষ কিনা, তাই উক্তি দেখিতে দেখিতে অত্যুক্তি হইয়া উঠে। এখন যেন আমরা একটু বেশি তারস্বরে বলিতেছি, ইংরেজের কাছ হইতে আমরা কিছুই লইব না। কেন লইব না? দেশের হিতের জন্য যেখানে যাহা পারি, অনন্ত আদায় করিব। কেবল এইটুকু পণ করিব, সেই লওয়ার পরিবর্ত্তে নিজেকে বিকাইয়া দিব না। যাহা বিশেষভাবে ইংরেজগবর্মেণ্টের কাছ হইতেই পাইবার, তাহা ষোলো-আনাই সেইখান হইতেই আদায় করিবার পূরা চেষ্টাই করিতে হইবে—না করিলে সে ত নিতান্তই ঠকা। নির্ব্বুদ্ধিতাই বীরত্ব নহে।

কিন্তু এই আদায় করিবার কোনো জোর থাকে না,—আমরা যদি নিজের দায় নিজে স্বীকার না করি। দেশের যে সকল কাজ আমরা নিজে করিতে পারি, তাহা নিজেরা সাধ্যমত করিলে তবেই আদায়-করাটা যথার্থ আদায় করা হয়, ভিক্ষা করা হয় না। এ নহিলে অন্যের কাছে দাবি করার আব্রুই থাকে না। কিছুকাল হইতে আমাদের সেই আব্রু একেবারে ঘুচিয়া গিয়াছিল—সেইজন্যই লজ্জাবোধটাকে এত জোর করিয়া জাগাইবার একটা একান্ত চেষ্টা চলিতেছে। সকলেই জানেন, জামেকায় ভূমিকম্পের উৎপাতের পর সেখানকার কিংষ্টন্-সহরে ভারি একটা সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছিল। সেই সঙ্কটের সময় আমেরিকার রণতরীর কাপ্তেন্ ডেভিস্ তাঁহার ম্যানোয়ারি গোরার দল লইয়া উপকার করিবার উৎসাহবশত কিছু অতিশয়পরিমাণে সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন—ইহা সেখানকার ঘোরতর দুর্যোগেও জামেকাদ্বীপের ইংরেজ অধ্যক্ষ সহ্য করিতে পারেন নাই। ইহার ভাবখানা এই যে, অত্যন্ত দুঃসময়েও পরের কাছে সাহায্য লইবার কালে নিজের ক্ষমতার অপমান করা চলে না—তা যদি করি, তবে যাহা পাই, তাহার চেয়ে দিই অনেক বেশি। পরের কাছে আনুকূল্য লওয়া নিতান্ত নিশ্চিন্তমনে করিবার নহে।

এইরূপ, দান পাইয়া যদি ক্ষমতা বিক্রয় করি, আমার দেশের কাজ আমি করিবই এবং আমিই করিতে পারি এই পুরুষোচিত অভিমান যদি অনর্গল আবেদনের অজস্র অশ্রুজলধারায় বিসর্জ্জন দিই, তবে তেমন করিয়া পাওয়ার ধিক্কার হইতে ঈশ্বর যেন আমাদিগকে নৈরাশ্য-দ্বারাই রক্ষা করেন।

বস্তুত এমন করিয়া কখনই আমরা কোনো আসল জিনিষ পাইতেই পারি না। গ্রামে কোনো উৎপাত ঘটিলে আমরা রাজসরকারে প্রার্থনা করিয়া দুজন পুলিসের লোক বেশি পাইতে পারি, কিন্তু নিজেরাই যদি সমবেত হইয়া আত্মরক্ষার সুব্যবস্থা করিতে পারি, তবে রক্ষাও পাই, রক্ষার শক্তিও হারাইতে হয় না। বিচারের সুযোগের জন্য দরখাস্ত করিয়া আদালত বাড়াইয়া লইতে পারি, কিন্তু নিজেরা যদি নিজের সালিশিসভায় মকদ্দমা মিটাইবার বন্দোবস্ত করি, তবে অসুবিধার জড় মরিয়া যায়। মন্ত্রণাসভায় দুজন দেশী লোক বেশি করিয়া লইলেই কি আমরা রেপ্রেজেণ্টেটিভ্ গবর্মেণ্ট পাইলাম বলিয়া হরির লুঠ দিব? বস্তুত আমাদের নিজের পাড়ার, নিজের গ্রামের শিক্ষা-স্বাস্থ্য-অশন-বসন-সম্বন্ধায় সমস্ত শাসনব্যবস্থা আমরা যদি নিজেরা গড়িয়া তুলিতে পারি, তবেই যথার্থ খাঁটি জিনিষটি আমরা পাই। অথচ এই সমস্ত অধিকার গ্রহণ করা পরের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে না। এ আমাদের নিজের ইচ্ছা, চেষ্টা ও ত্যাগস্বীকারের অপেক্ষা করে। আমাদের দেশজোড়া এই সমস্ত কাজই আমাদের পথ চাহিয়া বসিয়া আছে; কিন্তু সে পথও আমরা মাড়াই না, পাছে সেই কর্ত্তব্যের সঙ্গে চোখে-চোখেও দেখা হয়। যাহাদের এম্নি দুরবস্থা, তাহারা পরের কাছ হইতে কোনো দুর্লভ জিনিষ চাহিয়া-লইয়া সেটাকে যথার্থভাবে রক্ষা করিতে পারিবে, এমন দুরাশা কেন তাহাদের মনে স্থান পায়? যে কাজ আমাদের হাতের কাছেই আছে এবং যাহা আমরা ছাড়া আর কেহই ঠিকমত সাধন করিতে পারে না, তাহাকেই সত্যরূপে সম্পন্ন করিতে থাকিলে তবেই আমরা সেই শক্তি পাইব,—যে শক্তির দ্বারা পরের কাছ হইতে নিঃসঙ্কোচে আমাদের প্রাপ্য আদায় করিয়া তাহাকে কাজে খাটাইতে পারি। এইজন্যই বলিতেছি, যাহা নিতান্তই আমাদের নিজের কাজ, তাহার যেটাতেই হাত দিব, সেটার দ্বারাই আমাদের মানুষ হইয়া উঠিবার সহায়তা হইবে এবং মানুষ হইয়া উঠিলে তবেই আমাদের দ্বারা সমস্তই সম্ভব হইতে পারিবে।

আমরা যখন প্রায় পঁচিশত্রিশবৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষের প্রাচীনগৌরব লইয়া স্বদেশাভিমান অনুভব করিতে সুরু করিয়াছিলাম, তখন সেই প্রাচীন বিবরণের জোগান পাইবার জন্য আমরা বিদেশের দিকেই অঙ্গুলি পাতিয়াছিলাম— এমন কোনো পণ্ডিত পাইলাম না, যিনি স্বদেশের ইতিহাস উদ্ধার করিবার জন্য জর্ম্মান্-পণ্ডিতের মত নিজের সমস্ত চেষ্টা ও সময় এই কাজে উৎসর্গ করিতে পারিলেন। আজ আমরা স্বদেশপ্রেম লইয়া কম কথা বলিতেছি না—কিন্তু আজও এই স্বদেশের সামান্য একটি বৃত্তান্তও যদি জানিতে ইচ্ছা করি, তবে ইংরেজের রচিত পুঁথি ছাড়া আমাদের গতি নাই। এমন অবস্থায় পরের দরবারে দাবী লইয়া দাঁড়াই কোন্ মুখে, সম্মানই বা চাই কোন্ লজ্জায়, আর সফলতাই বা প্রত্যাশা করি কিরূপে? যাহার ব্যবসা চলিতেছে, বাজারে তাহারই ক্রেডিট্ থাকে, সুতরাং অন্য ধনীর কাছ হইতে সে যে সাহায্য পায়, তাহাতে তাহার লজ্জার কারণ ঘটে না—কিন্তু যাহার শিকি পয়সার কারবার নাই, সে যখন ধনীর দ্বারে দাঁড়ায়, তখন কি সে মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়ায় না—এবং তখন যদি সে আঁজলা ভরিয়া কড়ি না

পায়, তবে তাহা লইয়া বকাবকি করা কি তাহার পক্ষে আরো অবমানকর নহে ?

সেইজন্য আমি এই কথা বারবার বলিবার চেষ্টা করিয়াছি যে, নিজের দেশের কাজ যখন আমরা নিজেরা করিতে থাকিব, তখনই অন্যের কাছ হইতেও যথোচিত কাজ আদায় করিবার বল পাইব। নিজেরা নিশ্চেষ্ট থাকিয়া কেবলমাত্র গলার জোরে যাহা পাই, সেই পাওয়াতে আমাদের গলার জোর ছাড়া আর সকল জোরই কমিয়া যায়।

আমার অদৃষ্টক্রমে এই কথাটা আমাকে অনেকদিন হইতে অনেকবার বলিতে হইয়াছে—এবং বলিতে গিয়া সকল সময় সমাদরও লাভ করি নাই ;—এখন না বলিলেও চলে, কারণ এখন অনেকেই এই কথাই আমার চেয়ে অনেক জোরেই বলিতেছেন। কিন্তু কথাজিনিষটার এই একটা মস্ত দোষ যে, তাহা সত্য হইলেও অতি শীঘ্রই পুরাতন হইয়া যায়—এবং বরঞ্চ সত্যের হানি লোকে সহ্য করে, তবু পুরাতনত্বের অপরাধ কেহ ক্ষমা করিতে পারে না। কাজজিনিষটার মস্ত সুবিধা এই যে, যতদিনই তাহা চলিতে থাকে, ততদিনই তাহার ধার বাড়িয়া ওঠে।

এইজন্যই বাংলাদেশের ভাষাতত্ত্ব, পুরাবৃত্ত, গ্রাম্যকথা প্রভৃতি দেশের সমস্ত ছোট-বড় বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিবার জন্য সাহিত্যপরিষদ্‌ যখন দেশের সভার একটি ধারে আসিয়া আসন লইল, আমরা আনন্দে ও গৌরবে তাহার অভিষেককার্য্য করিয়াছিলাম।

যদি বলেন, সাহিত্যপরিষদ্‌ এতদিনে কি এমন কাজ করিয়াছে—তবে সে কথাটা ধীরে বলিবেন এবং সঙ্কোচের সহিত বলিবেন। আমাদের দেশের কাজের বাধা যে কোথায়, তাহা আমরা তখনই বুঝিতে পারি, যখনই আমরা নিজেরা কাজ হাতে লই—সে বাধা আমরা নিজেরা—আমরা প্রত্যেকে। যে কাজকে আমরা **আমাদের** কাজ বলিয়া বরণ করি, তাহাকে আমরা কেহই **আমার** কাজ বলিয়া গ্রহণ করিতে এখনো শিখি নাই। সেইজন্য আমরা সকলেই পরামর্শ দিতে অগ্রসর হই, কেহই সাহায্য করিতে প্রস্তুত হই না ; ত্রুটি দেখিলে কর্ম্মকর্ত্তার নিন্দা করি, অকর্ম্মকর্ত্তার অপবাদ নিজের উপর আরোপ করি না,—ব্যর্থতা ঘটিলে এমনভাবে আস্ফালন করি, যেন কাজ নিষ্ফল হইবে পূর্ব্বেই জানিতাম এবং সেইজন্যই অত্যন্ত বুদ্ধিপূর্ব্বক নির্ব্বোধের উদ্যোগে যোগ দিই নাই। আমাদের দেশে জড়তা লজ্জিত নহে, অহঙ্কৃত—আমাদের দেশে নিশ্চেষ্টতা নিজেকে গোপন করে না—উদ্যোগকে ধিক্কার দিয়া এবং প্রত্যেক কাজের খুঁৎ ধরিয়া সে নিজের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করিতে চায়। এইজন্য আমাদের দেশে এ দৃশ্য সর্ব্বদাই দেখিতে পাই যে, দেশের কাজ একটিমাত্র হতভাগ্য টানিয়া লইয়া চলিয়াছে ; হাওয়া এবং স্রোত দুই উল্টা ; এবং দেশের লোক তীরে বসিয়া দিব্য হাওয়া খাইতে খাইতে কেহ বা প্রশংসা করিতেছে, কেহ বা লোকটার অক্ষমতা ও বিপত্তি দেখিয়া নিজেকে ধন্যজ্ঞান করিতেছে।

এমন অবস্থায় দেশের অতি ক্ষুদ্র কাজটিকেও গড়িয়া তোলা কত কঠিন, সে কথা আমরা যেন প্রত্যেকে বিবেচনা করিয়া দেখি। একটা ছোট ইস্কুল, একটা সামান্য লাইব্রেরি, একটা আমোদ করিবার দল বা একটা অতি

ছোট-রকমেরও কাজ করিবার ব্যবস্থা আমরা জাগাইয়া রাখিতে পারি না। সমুদ্রে জল থইথই করিতেছে, তাহার এক ফোঁটা মুখে দিবার জো নাই—আমাদের দেশেও ষষ্ঠীর প্রসাদে মানুষের অভাব নাই, কিন্তু কর্ত্তব্য যখন তাহার পতাকা লইয়া আসিয়া শঙ্খধ্বনি করে, তখন চারিদিকে চাহিয়া একটি মানুষ দেখিতে পাওয়া যায় না।

এই যে আমাদের দেশে কোনোমতেই কিছুই আঁট বাঁধে না, সঙ্কল্পের চারিদিকে দল জমিয়া উঠে না—কোনো আকস্মিক কারণে দল বাঁধিলেও সকালের দল বিকালবেলায় আলগা হইয়া আসে, এইটি ছাড়া আমাদের দেশে আর দ্বিতীয় কোনো বিপদ্ নাই। আমাদের এই একটিমাত্র শত্রু। নিজের মধ্যে এই প্রকাণ্ড শূন্যতা আছে বলিয়াই আমরা অন্যকে গালি দিই। আমরা কেবলি কাঁদিয়া বলিতেছি আমাদিগকে দিতেছে না, বিধাতা আমাদের কানে ধরিয়া বলিতেছেন তোমরা লইতেছ না। আমরা একত্র হইব না, চেষ্টা করিব না, ত্যাগ করিব না, কষ্ট সহিব না, কেবলি চাহিব এবং পাইব, কোনো জাতির এত-বড় সর্ব্বনেশে প্রশ্রয়ের দৃষ্টান্ত জগৎ-সংসারের ইতিহাসে ত আজ পর্য্যন্ত দেখা যায় নাই। তবু কেবল আমাদেরই জন্য বিশ্ববিধাতার একটি বিশেষ-বিধির অপেক্ষায় আকাশে চাহিয়া বসিয়া আছি—সে বিধি আমাদের দেশে কবে চলিবে জানি না, কিন্তু বিনাশ ত সবুর করিবে না। সবুর করেও নাই; অনশন, মহামারী, অপমান, গৃহবিচ্ছেদ চারিদিকে জাগিয়া উঠিয়াছে। রুদ্রদেব বজ্রহাতে আমাদের অনেককালের পাপের হিসাব লইতে আসিয়াছেন;—খবরের কাগজে মিথ্যা লিখিতে পারি, সভাস্থলে মিথ্যা বলিতে পারি, রাজার চোখে ধূলা দিতে পারি, এমন কি, নিজেকে ফাঁকি দেওয়াও সহজ, কিন্তু তাঁহাকে ত ভুল বুঝাইতে পারিলাম না। যাহার উপরেই দোষারোপ করি না কেন, রাজাই হোক্ বা আর যেই হোক্, মরিতেছি ত আমরাই! মাথা ত আমাদেরই হেঁট হইতেছে, এবং পেটের ভাত ত আমাদেরই গেল! পরের কর্ত্তব্যের ত্রুটি অন্বেষণ করিয়া আমাদের শ্মশানের চিতা ত নিবিল না!

আরামের দিনে নানাপ্রকার ফাঁকি চলে, কিন্তু মৃত্যুসহচর বিধাতা যখন স্বয়ং দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, তখন আজ আর মিথ্যা দিয়া হিসাবপূরণ হইবে না। এখন আমাদের কঠোর সত্যের দিন আসিয়াছে। আজ আমরা যে-কোনো কাজকেই গ্রহণ করি না কেন, সকলে মিলিয়া সে কাজকে সত্য করিয়া তুলিতে হইবে। দেশের যে-কোনো যথার্থ মঙ্গল-অনুষ্ঠানকে আমরা উপবাসী করিয়া ফিরাইব, সে-ই আমাদের পৃথিবীর মধ্যে মাথা তুলিবার ও বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার কিছু-না-কিছু কাড়িয়া লইয়া চলিয়া যাইবে। ছোটো হউক বড় হউক, নিজের হাতে দেশের যে-কোনো কাজকে সত্য করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিব, সেই কাজই রুদ্রের দরবারে আমাদের উকিল হইয়া দাঁড়াইবে, সে-ই আমাদের রক্ষার উপায় হইবে।

কেবল সঙ্কল্পের তালিকা বাড়াইয়া চলিলে কোনো লাভ নাই, কিন্তু যেমন করিয়া হউক, দেশের যথার্থ স্বকীয় একটি একটি কাজকে সফল করিয়া তুলিতেই হইবে। সে কেবল

সেই একটি বিশেষকার্য্যের ফললাভ করিবার জন্য নহে;—সকল কার্য্যেই ফললাভের অধিকার পাইবার জন্য। কারণ, সফলতাই সফলতার ভিত্তি। একটাতে কৃতকার্য্য হইলেই অন্যটাতে কৃতকার্য্য হইবার দাবী পাকা হইতে থাকে—এই কথা মনে রাখিয়া দেশের কাজগুলিকে সফল করিবার দায় আমাদের প্রত্যেককে আপনার বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। যাঁহার টাকা আছে তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া টাকা ভোগ করিবেন না, যাঁহার বুদ্ধি আছে তিনি কেবল অন্যের প্রয়াসকে বিচার করিয়া দিনযাপন করিবেন না; দেশের কাজগুলিকে সফল করিবার জন্য যেখানেই আমাদের সকলের চেষ্টা মিলিত হইতে থাকিবে, সেখানেই আমাদের স্বদেশ সত্য হইয়া উঠিবে।

দেশজিনিষটা ত কাহাকেও নিজের শক্তিতে উপার্জ্জন করিয়া আনিতে হয় নাই। আমরা যে পৃথিবীতে এত জায়গা থাকিতে এই বাংলাদেশেই জন্মিতেছি ও মরিতেছি, সে ত আমাদের নিজগুণে নহে, এবং বাংলাদেশেরও বিশেষ পুণ্যপ্রভাবে, এমনও বলিতে পারি না। দেশ পশুপক্ষিকীটপতঙ্গেরও আছে—কিন্তু স্বদেশকে নিজে সৃষ্টি করিতে হয়। সেইজন্যই স্বদেশে কেহ হাত দিতে আসিলে স্বদেশীমাত্রেই উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠে, কেন না, সেটা যে বহুকাল হইতে তাহাদের নিজের গড়া—সেখানে যে তাহাদের বহুযুগের আহরিত মধু সমস্ত সঞ্চিত হইয়া আছে। যে সকল দেশের লোক তাঁহাদের নিজের শরীরমনবাক্যের সমস্ত চেষ্টার দ্বারা জ্ঞানে-প্রেমে-কর্ম্মে স্বদেশকে আপনি গড়িয়া তুলিতেছে, দেশের অন্নবস্ত্র-স্বাস্থ্যজ্ঞানের সমস্ত অভাব আপনি পূরণ করিয়া তুলিতেছে, দেশকে তাহারাই স্বদেশ বলিতে পারে, এবং স্বদেশজিনিষটা যে কি, তাহাদিগকে বক্তৃতা করিয়া বুঝাইতেও হয় না;—মৌমাছিকে আপন চাকের মর্য্যাদা বুঝাইবার জন্য বড়-বড় পুঁথির দোহাই পাড়া সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। আমরা দেশের কোনো সত্যকর্ম্মে নিজেরা হাত না লাগাইয়াও আজ ২৫।৩০বৎসর ইংরেজি ও বাংলায়, গদ্যে ও পদ্যে স্বদেশের গৌরব ঘোষণা করিয়া আসিতেছি। কিন্তু এই স্বদেশের স্বটা যে কোথায়, এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া গোল্‌ড্‌ষ্টুকর, ম্যাক্স্‌মূলর, মুয়রের প্রত্নতত্ত্ব খুঁজিয়া হয়রান্‌ হইতে হইয়াছে। শাণ্ডিল্যমুনির আশ্রমের জায়গাটার যদি আজ হঠাৎ আবিষ্কার হয়, তবে আমি শাণ্ডিল্যগোত্রের দোহাই দিয়া সেটা দখল করিতে গেলে আইনের পেয়াদা ত মানিবে না। পাঁচসাতহাজার বৎসর পূর্ব্বের উপর স্বদেশের স্বকীয়ত্বের বরাৎ দিয়া গৌরব করিতে বসিলে কেবল গলাভাঙাই সার হয়। স্বকীয়ত্বকে অবিচ্ছিন্ন নিজের চেষ্টায় রক্ষা করিতে হয়। আজ আমাদের পক্ষে স্বদেশ কোথায়? সমস্ত দেশের মধ্যে যেখানেই আমরা নিজের শক্তিতে দেশবাসীদের জন্য কিছু-একটা গড়িয়া তুলিতে পারিয়াছি, কেবলমাত্র সেইখানেই আমাদের স্বদেশ। এম্‌নি করিয়া যাহা-কিছু গড়িয়া তুলিতে পারিব, তাহাতেই আমাদের স্বদেশের বিস্তার ঘটিতে থাকিবে—সেই স্বদেশের উপর আমাদের সমস্ত প্রাণের দাবী জন্মিতে থাকিবে—অন্যে যাহা দয়া করিয়া দিবে, তাহাতেও নহে এবং বহুহাজারবৎসর পূর্ব্বে যে দলিল পাকা হইয়াছিল, তাহাতেও না।

অদ্যকার সভায় আমার নিবেদন এই, সাহিত্যপরিষদের মধ্যে আপনারা সকলে মিলিয়া স্বদেশকে সত্য করিয়া তুলুন। বাংলাদেশের প্রত্যেক জেলা এবং প্রত্যেক জেলার প্রত্যেক বাঙালী সাহিত্যপরিষদের মধ্যে নিজের ইচ্ছা ও চেষ্টাকে একত্রে জাগ্রত করিয়া আজ যাহা অস্ফুট আছে তাহা স্পষ্ট করুন, যাহা ক্ষুদ্র আছে তাহাকে মহৎ করুন। কোন্‌খানে এই পরিষদের কি অসম্পূর্ণতা আছে, তাহা লইয়া প্রশ্ন করিবেন না, ইহাকে সম্পূর্ণ করিয়া তুলিয়া প্রত্যেকে গৌরবলাভ করুন। দেবপ্রতিমা ঘরে আসিয়া পড়িলে গৃহস্থকে তাহার পূজা সারিতেই হয়; আজ বাঙালীর ঘরে তিনটি দেবপ্রতিমা আসিয়াছে—সাহিত্য-পরিষদ্, শিক্ষাপরিষদ্ ও শিল্পবিদ্যালয়; ইহাদিগকে ফিরাইয়া দিলে দেশে যে অমঙ্গল ঘটিবে, তাহার ভার আমরা বহন করিতে পারিব না।

অনেকের মনে এ প্রশ্ন উঠিবে, দেশের কাজহিসাবে সাহিত্যপরিষদের কাজটা এম্‌নি কি একটা মস্ত ব্যাপার! এইরূপ প্রশ্ন আমাদের দেশের একটা বিষম বিপদ্। য়ুরোপ-আমেরিকা তাহার প্রকাণ্ড কর্ম্মশালা লইয়া আমাদের চোখের সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাই দেখিয়া আমাদের অবস্থা বড় হইবার পূর্ব্বেই আমাদের নজর বড় হইয়া উঠিয়াছে। যে কাজ দেখিতে ছোট, তাহাতে উৎসাহই হয় না;—এইজন্য বীজরোপণ করা হইল না,—একেবারে আস্ত বনস্পতি তুলিয়া-আনিয়া পুঁতিয়া অন্যদেশের অরণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি। এ ত প্রেমের লক্ষণ নহে, এ অহঙ্কারের লক্ষণ। প্রেমের অসীম ধৈর্য্য, কিন্তু অহঙ্কার অত্যন্ত ব্যস্ত। আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, ইংরেজ নানামতে আমাদিগকে অবজ্ঞা দেখাইয়া আমাদের অহঙ্কারকে অত্যন্ত রাঙা করিয়া তুলিয়াছে। আমাদের এই কথাই কেবল বলিবার প্রবৃত্তি হইতেছে, আমরা কিছুতেই কম নই। এইজন্য আমরা যাহা-কিছু করি, সেটাকে খুবই বড় করিয়া দেখাইতে না পারিলে আমাদের বুক ফাটিয়া যায়। একটা কাজ ফাঁদিবার প্রথমেই ত একটা খুব মস্ত নামকরণ হয়—নামের সঙ্গে "ন্যাশনাল্"শব্দটা কিংবা ঐরকমের একটা বিদেশী বিড়ম্বনা জুড়িয়া দেওয়া যায়। এই নামকরণ-অনুষ্ঠানেই গোড়ায় ভারি একটি পরিতৃপ্তি বোধ হয়। তার পরে বড় নামটি দিলেই বড় আয়তন না দিলে চলে না,—নতুবা বড় নাম ক্ষুদ্র আকৃতিকে কেবলি বিদ্রূপ করিতে থাকে। তখন নিজের সাধ্যকে লঙ্ঘন করিতে চাই। তক্‌মাওয়ালা লাগামের খাতিরে ওয়েলারের জুড়ি না হইলে মুখরক্ষা হয় না—এদিকে 'অন্তভক্ষ্যধনুর্গুণঃ'। যেমন করিয়া হৌক্, একটা প্রকাণ্ড ঠাট গড়িয়া তুলিতে হয়; ছোটোকে ক্রমে ক্রমে বড় করিয়া তুলিবার, কাঁচাকে দিনে দিনে পাকা করিয়া তুলিবার যে স্বাভাবিক প্রণালী, তাহা বিসর্জ্জন দিয়া যত-বড় প্রকাণ্ড স্পর্দ্ধা খাড়া করিয়া তুলি, তত-বড়ই প্রকাণ্ড ব্যর্থতার আয়োজন করা যায়। যদি বলি, গোড়ার দিকে সুর আর একটু নামাইয়া ধর না কেন? তবে উত্তর পাওয়া যায়, তাহাতে লোকের মন পাইব না। হায় রে লোকের মন! তোমাকে পাইতেই হইবে বলিয়া পণ করিয়া বসাতেই তোমাকে হারাই। তোমাকে চাই না বলিবার জোর যাহার আছে, সে-ই তোমাকে জয় করে। এইজন্যই যে

ছোট, সে-ই বড় হইতে থাকে; যে গোপনে সুরু করিতে পারে, সেই প্রকাশ্যে সফল হইয়া উঠে।

সকল দেশেরই মহত্ত্বের ইতিহাসে যেটা আমাদের চক্ষুর গোচর, তাহা দাঁড়াইয়া আছে কিসের উপরে? যেটা আমাদের চক্ষুর গোচর নহে, তাহারই উপর। আমরা যখন নকল করিতে বসি, তখন সেই দৃষ্টিগোচরটারই নকল করিতে ইচ্ছা যায়—যাহা চোখের আড়ালে আছে, তাহা ত আমাদের মনকে টানে না। এ কথা ভুলিয়া যাই, যাহাদের নামধাম কেহই জানে না, দেশের সেই শতসহস্র অখ্যাত লোকেরাই নিজের জীবনের অজ্ঞাত কাজগুলি দিয়া যে স্তর বাঁধিয়া দিতেছে, তাহারই উপরে নামজাদা লোকেরা বড় বড় ইমারৎ বানাইয়া তুলিতেছে। এখন যে আমাদিগকে ভিৎ কাটিয়া গোড়াপত্তন করিতে হইবে—সে ব্যাপারটা ত আকাশের উপরকার নহে, তাহা মাটির নীচেকার,—তাহার সঙ্গে ওয়েষ্টমিনিষ্টারহলের তুলনা করিবার কিছুই নাই। গোড়ায় সেই গভীরতা, তার পরে উচ্চতা। এই গভীরতার রাজ্যে স্পর্দ্ধা নাই, ঘোষণা নাই—সেখানে কেবল নম্রতা অথচ দৃঢ়তা, আত্মগোপন এবং আত্মত্যাগ। এই সমস্ত ভিতের কাজে, ভিতরের কাজে, মাটির সংস্রবের কাজে আমাদের মন উঠিতেছে না—আমরা একদম চূড়ার উপর জয়ডঙ্কা বাজাইয়া ধ্বজা উড়াইয়া দিতে চাই। স্বয়ং বিশ্বকর্ম্মাও তেমন করিয়া বিশ্বনির্ম্মাণ করেন নাই। তিনিও যুগে যুগে অপরিস্ফুটকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিতেছেন।

তাই বলিতেছি, সকল দেশেই গোড়ার কাজটা ঠিকমত চলিতেছে বলিয়াই ডগার কাজটা রক্ষা পাইতেছে; নেপথ্যের ব্যবস্থা পাকা বলিয়াই রঙ্গমঞ্চের কাজ দিব্য চলিয়া যাইতেছে। স্বাস্থ্যরক্ষা, অন্ন-উপার্জ্জন, জ্ঞানশিক্ষার কাজে দেশ ব্যাপিয়া হাজার হাজার লোক মাটির নীচেকার শিকড়ের মত প্রাণপণে লাগিয়া আছে বলিয়াই সে সকল দেশে সভ্যতার এত শাখাপ্রশাখা, এত পল্লব, এত ফুলফলের প্রাচুর্য্য। এই গোড়াকার অত্যন্ত সাধারণ কাজগুলির মধ্যে যে-কোনো-একটা কাজ করিয়া তোলাই যে আমাদের পক্ষে অসাধারণ হইয়া উঠিয়াছে। দেশের লোককে শিখাইতে হইবে, তাহার উদ্যোগ করিতেই প্রাণ বাহির হইয়া যায়; খাওয়াইতে হইবে, তাহার সঙ্গতি নাই; রোগ দূর করিতে হইবে, সাহেব এবং বিধাতার উপর ভার দিয়া বসিয়া আছি। মাট্‌সীনি, গারিবাল্ডি, হ্যাম্প্‌ডেন্, ক্রমোয়েল হইয়া উঠাই যে একমাত্র বড় কাজ, তাহা নহে; তাহার পূর্ব্বে গ্রামের মোড়ল, পাঠশালার গুরুমশায়, পাড়ার মুরুব্বি, চাষাভূষার সর্দ্দার হইতে না পারিলে বিদেশের ইতিবৃত্তকে ব্যঙ্গ করিবার চেষ্টা একান্তই প্রহসনে পরিণত হইবে। আগে দেশকে স্বদেশ করিতে হইবে, তার পরে রাজ্যকে স্বরাজ্য করিবার কথা মুখে আনিতে পারিব। অতএব পরিষদের কাজ কি হিসাবে বড় কাজ, এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়ো না—এ সমস্ত গোড়াকার কাজ—ইহার ছোটবড় নাই।

দেশকে ভালবাসিবার প্রথম লক্ষণ ও প্রথম কর্ত্তব্য দেশকে জানা—এই কথাটা আমাদের দেশ ছাড়া আর কোনো দেশে উল্লেখমাত্র করাই বাহুল্য। পৃথিবীর অন্যত্র সকলেই আপনার দেশকে বিশেষ করিয়া, তন্নতন্ন করিয়া জানিতেছে। না জানিলে দেশের কাজ

করা যায় না। শুধু তাই নয়—এই জানিবার চর্চ্চাই ভালবাসার চর্চ্চা। দেশের ছোটবড় সমস্ত বিষয়ের প্রতি সচেতন দৃষ্টি প্রয়োগ করিলেই তবে সে আমার আপন ও আমার পক্ষে সত্য হইয়া উঠে। নহিলে দেশহিতসম্বন্ধে পুঁথিগত শিক্ষা লইয়া আমরা যে সকল বড়-বড় কথা বার্ক-মেকলের ভাষায় আবৃত্তি করিতে থাকি, সেগুলো বড়ই বেসুরো শোনায়।

তাই দেশের ভাষা, পুরাবৃত্ত, সাহিত্য প্রভৃতি সকল দিক্ দিয়া দেশকে জানিবার জন্য সাহিত্য-পরিষদ্ প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বাংলাদেশের সকল জেলাই যদি তাঁহার সঙ্গে সচেষ্টভাবে যোগ দেন, তবেই তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইবে। সফলতা দুইদিক্ দিয়াই হইবে—এক, যোগের সফলতা, আর এক সিদ্ধির সফলতা। আজ বরিশাল ও বহরমপুর যে আমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন, ইহাতে মনে মনে আশা হইতেছে, আমাদের বহুদিনের চেষ্টার সার্থকতা আসন্ন হইয়া আসিয়াছে।

দীপশিখা জ্বালিবার দুইটা অবস্থা আছে। তাহার প্রথম অবস্থা চকমকি-ঠোকা। সাহিত্য-পরিষদ্ কাজ আরম্ভ করিয়া প্রথম কিছুদিন চকমকি ঠুকিতেছিল, তাহাতে বিচ্ছিন্নভাবে স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছিল। দেশে বুঝি তখনো পলিতা পাকানো হয় নাই অর্থাৎ দেশের হৃদয়গুলি এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত এক-সূত্রে পাকাইয়া ওঠে নাই। তার পরে স্পষ্টই দেখিতেছি, আমাদের দেশে হঠাৎ একটা শুভদিন আসিয়াছে—যেমন করিয়াই হোক্, আমাদের হৃদয়ে হৃদয়ে একটা যোগ হইয়াছে—তাহা হইবামাত্র দেশের যেখানে যে-কোনো আশা ও যে-কোনো কর্ম্ম মরোমরো হইয়াছিল, তাহারা সকলেই যেন একসঙ্গে রস পাইয়া নবীন হইয়া উঠিয়াছে। সাহিত্য-পরিষদ্‌ও এই অমৃতের ভাগ হইতে বঞ্চিত হয় নাই। এইবার তাহার বিক্ষিপ্ত স্ফুলিঙ্গ যদি শুভদৈবক্রমে পলিতার মুখে ধরিয়া উঠে, তবে একটি অবিচ্ছিন্ন শিখারূপে দেশের অন্তঃপুরকে সে আলোকিত করিয়া তুলিতে পারিবে।

অতএব বিশেষ করিয়া বহরমপুরের প্রতি এবং সেই সঙ্গে বাংলাদেশের সমস্ত জেলার কাছে আজ আমাদের নিবেদন এই যে, সাহিত্যপরিষদের চেষ্টাকে আপনারা অবিচ্ছিন্ন করুন—দেশের হৃদয়-পলিতাটির একটা প্রান্ত ধরিয়া উঠিতে দিন, তাহা হইলে একটি ক্ষুদ্র সভার প্রয়াস সমস্ত দেশের আধারে তাহার স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া অমর হইয়া উঠিবে। আমাদের অদ্যকার এই মিলনের আনন্দ স্থায়ী যোগের আনন্দে যদি পরিণত হয়, তবে যে চিরন্তন মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান হইবে, সেখানে ভাগীরথীর তীর হইতে ব্রহ্মপুত্রের তীর পর্য্যন্ত, সমুদ্রকূল হইতে হিমাচলের পাদদেশ পর্য্যন্ত বাংলাদেশের সমস্ত প্রদেশ আপন উদ্‌ঘাটিত প্রাণভাণ্ডারের বিচিত্র ঐশ্বর্য্য বহনপূর্ব্বক এক ক্ষেত্রে মিলিত হইয়া তাহাকে পুণ্যক্ষেত্র করিয়া তুলিবে। আপনারা মনে করিবেন না, আমাদের এ সভা কেবল বিশেষ একটি কার্য্যসাধন করিবার সভামাত্র। দেশের অদ্যকার পরম দুঃখদারিদ্র্যের দিনে যে-কোনো মঙ্গলকর্ম্মের প্রতিষ্ঠান আমরা রচনা করিয়া তুলিতে পারিব, তাহা শুদ্ধমাত্র কাজের আপিস্ হইবে না, তাহা তপস্যার আশ্রম হইয়া উঠিবে—

সেখানে আমাদের প্রত্যেকের নিঃস্বার্থ সাধনার দ্বারা সমস্ত দেশের বহুকালসঞ্চিত অকৃত-কর্ত্তব্যের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হইতে থাকিবে। এই সমস্ত পাপের ভরা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে বলিয়াই আজ দেশের অতি ছোট কাজটিও আমাদের পক্ষে এত একান্ত দুঃসাধ্য হইয়াছে। আজ হইতে কেবলি কর্ম্মের দ্বারাই কর্ম্মের এই সমস্ত কঠিন বাধা ক্ষয় করিবার জন্য আমাদিগকে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। হাতে-হাতে ফল পাইব, এমন নহে—বারংবার ব্যর্থ হইতে হইবে, কিন্তু তবু অপরাধমোচন হইবে, বাধা জীর্ণ হইবে, দেশের ভবিতব্যতার রুদ্রমুখচ্ছবি প্রতিদিন প্রসন্ন হইয়া আসিবে।*

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

স্বদেশীব্রত।

বর্ত্তমান সময়ের মাতৃপূজা ও স্বদেশীব্রত দেখিয়া প্রকৃতই মনে আশার সঞ্চার হয়। আমাদের দুঃখিনী মাতার উদ্ধারের জন্য ইহাতে আমরা ঈশ্বরের হস্ত স্পষ্ট দেখিতে পাই। আমরা যেন কোন দৈবদুর্ব্বিপাকে বা কোন দুষ্টগ্রহের অশুভদৃষ্টিতে আমাদের স্বকীয় কক্ষ হইতে ভ্রষ্ট ও বিপথগামী হইয়া বিনাশের পথে অগ্রসর হইতেছিলাম,—তার পর কোন শুভ-গ্রহের মঙ্গলময় আকর্ষণে আমরা যেন পুনরায় স্বকীয় কেন্দ্রে স্থাপিত হইয়া বিধাতার অলঙ্ঘ্য নিয়মে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছি। কিন্তু আমরা স্বকীয় পথে আনীত হইয়া থাকিলেও পুনরায় কক্ষভ্রষ্ট হইয়া যাওয়ার আশঙ্কা বড় প্রবল। কারণ, বহুকালের রোগ আরোগ্য হওয়ার সময় পুনরাবৃত্তির ভয় অধিক এবং প্রতিক্রিয়ার ফলও ভয়ানক। ঐ সময় পূর্ব্বের শুভফলসকল নষ্ট হইয়া পুনরায় দ্বিগুণতর অনিষ্টাপাতের আশঙ্কা প্রবল হইয়া থাকে। আমাদের ব্যক্তিগত শরীরে যেরূপ, জাতীয় শরীরেও সেইরূপ নিয়মই খাটিয়া থাকে। অতএব অতিশয় সাবধানতার সহিত এই চিররুগ্ণ জাতিকে উন্নতির পথে লইয়া যাওয়া আবশ্যক। এই সময় সামান্য ভুল বা অসাবধানতা বা ত্রুটিতে সকলই নষ্ট হইয়া যাইতে পারে, সুতরাং অতি সাবধানে ধীর-স্থির পাদবিক্ষেপে আমাদের অগ্রসর হওয়া আবশ্যক। সেই পন্থা কি,—যে পথে অগ্রসর হইলে আমাদের বিপৎপাতের আশঙ্কা অতি অল্প,

* এই প্রবন্ধ বহরমপুরের প্রস্তাবিত প্রাদেশিক সাহিত্যসম্মিলনের জন্য লিখিত হইয়াছিল। এই সাহিত্য-সম্মিলনের প্রধান উদ্যোগী ও পৃষ্ঠপোষক সাহিত্যানুরাগী মহানুভব মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের জ্যেষ্ঠ-পুত্রের শোচনীয় অকালমৃত্যুতে এই সম্মিলন স্থগিত করা হইয়াছে। এই প্রবন্ধ বঙ্গদর্শনে মুদ্রিত হইবার সময়ে আমরা এই নিদারুণ সংবাদ পাই, সেজন্য প্রবন্ধ যেভাবে রচিত হইয়াছিল, ঠিক সেইভাবেই প্রকাশিত হইল।—বঃ সঃ।

ইহাই বর্ত্তমান সময়ের প্রধান আলোচ্য। এই সময় নানা জনে নানা পন্থা দেখাইতেছেন। আমার মতে স্বদেশীব্রতে ঐকান্তিক নিষ্ঠাই একমাত্র প্রকৃষ্ট পন্থা। আমাদের উদ্ধারের আর অন্য পন্থা নাই।

স্বদেশীব্রতে ঐকান্তিক নিষ্ঠা কি?—কায়-মনোবাক্যে স্বদেশী হওয়া। কেবল স্বদেশী-দ্রব্য ব্যবহার করিলেই প্রকৃতরূপে স্বদেশীব্রত উদযাপন করা হইবে না। আমাদের বাক্য, মন ও শরীরকে স্বদেশী করিয়া লইতে হইবে। আমরা যদিও স্বদেশী বলিয়া বাহিরে আড়ম্বর করিতেছি, কিন্তু আমাদের তথাকথিত শিক্ষিত-সমাজ কি প্রকৃতরূপে স্বদেশী হইতে পারিয়াছেন। তাঁহাদের হৃদয়ে বিজাতীয় ভাব, বাক্যে বিজাতীয় ভাষা, মন বিজাতীয় প্রকৃতিতে গঠিত। তাঁহাদের মনে-প্রাণে বিজাতীয়ভাব অনুবিদ্ধ হইয়া গিয়াছে, তাঁহাদের রক্তমাংসে বিজাতীয়ভাব প্রবেশলাভ করিয়াছে এবং তদনুসারে দেহ ও মনের অদ্ভুত পরিবর্ত্তন হইয়া এক অদ্ভুত জীবের সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহারা যাহাদের অনুকরণ করিতেছেন, তাহারাও তাঁহাদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেছে এবং তাঁহারা যে শ্রেণী হইতে গিয়াছেন, তাহারাও তাঁহাদিগকে ভালরূপে বুঝিতে ও চিনিতে পারিতেছে না। আমরা যদি প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে চাই, তবে শরীর হইতে বিদেশীবস্ত্র যেরূপ ত্যাগ করিয়াছি, মন হইতেও সেইরূপ বিদেশীভাবের আবরণ বিসর্জ্জন করিতে হইবে। ইহাই আমাদের শক্তিসঞ্চয়ের একমাত্র উপায়।

শক্তিই এই জগতে পূজনীয়, শক্তিই এই জগতে আধিপত্য করিতেছে, শক্তির নিকটই সকলে অবনত, শক্তিকে অধিককাল উপেক্ষা করে এমন সাধ্য কাহারও নাই। আমাদের মাতৃভূমিকে বর্ত্তমান দুঃখদারিদ্র্য হইতে উদ্ধার করিতে হইলে শক্তি আবশ্যক। তাহা কেবল শারীরিক বল নহে,—কেবল শারীরিক বলের দ্বারা কাহাকেও কেহ সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করিতে পারে না। কাহাকেও সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে বিশ্বতোমুখ বলের প্রয়োজন। শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আর্থিক, সকল-প্রকার বলের প্রাচুর্য্য হইলে কাহার সাধ্য সেই সমন্বিত শক্তিকে উপেক্ষা করে। অতএব সকল বিষয়েই আমাদের বলসঞ্চয় আবশ্যক। এই বলসঞ্চয়েই আমাদের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

অনেকের মনে এইরূপ বিশ্বাস আছে, ভারত আবার একদিন উন্নত হইবে। কিন্তু কিরূপে এই উদ্ধারকার্য্য সাধিত হইবে, ইহা প্রায় সকলের নিকট প্রহেলিকা বা গূঢ় রহস্যের ন্যায় ভবিষ্যতের গর্ভে লুক্কায়িত। নানা জনে এ সম্বন্ধে নানারূপ জল্পনা-কল্পনা করিতেছে, কিন্তু স্থিরসিদ্ধান্তে কেহই উপনীত হইতে পারে নাই। আমিও স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, এরূপ গৌরব না করিয়াও বলিতে পারি যে, আমার মনে হয়, এই পরিবর্ত্তন অতি অলক্ষিত ও ধীরভাবে, অতি সহজ ও স্বাভাবিক উপায়ে সংঘটিত হইবে। ইহা ঘটিবার পূর্ব্বে কোন যুদ্ধবিগ্রহের প্রয়োজন হইবে না। ইহা রাত্রির পর দিনের ন্যায় ধীর ও অতর্কিতভাবে উপনীত হইবে। দিবসারম্ভে যেরূপ ক্রমশ অন্ধকারের বিলোপে আলোক বিকশিত হইয়া উঠে, জ্ঞান ও শক্তির বিকাশে সেইরূপ যথেচ্ছাচারের অন্ধকার বিদূরিত হইবে। অন্ধকারের পাথীর ন্যায়

জ্ঞানালোকের শুভ্রতেজ সহ্য করিতে না পারিয়া অত্যাচার-অবিচার দিগ্‌বিদিকে পলায়ন করিবে। যখন আমাদের জ্ঞান ও মহত্ত্বের শক্তি আমাদের শাসকগণের জ্ঞান ও মহত্ত্বকে অতিক্রম করিয়া উঠিবে, তখন তাহারা আপনা হইতেই আমাদের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া ও আমাদের পদানত হইয়া আমাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবে। কেবল পাশব-বলে স্থায়ী আধিপত্য বিস্তার করা যায় না, মানবহৃদয়ের উপর প্রভুত্ব মানসিক ও নৈতিক বল ব্যতীত একপ্রকার অসম্ভব। ইংরেজগণের মানসিক ও নৈতিক বল আমাদের অপেক্ষা অধিক বলিয়া তাহারা আমাদের উপর আধিপত্য করিতেছে। কিন্তু আমাদের মানসিক ও নৈতিক শক্তি যখন তাহাদের অপেক্ষা অধিক হইবে, তখন তাহারা আমাদের নিকট পরাভূত হইয়া যাইবে। যদি আমাদের মাতৃ-ভূমির দুঃখদারিদ্র্য দুর করিবার ইচ্ছা থাকে, তবে আমাদের তদুপযোগী শক্তি-সঞ্চয় আবশ্যক। বাহিরের অপর কোন শক্তির সাহায্যে আমাদের দেশের উদ্ধার হওয়া অসম্ভব।

এখন প্রশ্ন এই, কিরূপে এই শক্তিসঞ্চয় হইতে পারে। আমার মতে ইহার একমাত্র উপায় প্রকৃষ্ট স্বদেশভক্তি। কেবলমাত্র বাহিরে স্বদেশীদ্রব্যব্যবহারে স্বদেশভক্তি যথেষ্টপরিমাণে আচরিত হয় না। আমাদের প্রাণমন স্বদেশী উপকরণে গঠিত হওয়া আবশ্যক। সমস্ত আড়ম্বর, সমস্ত ছদ্মবেশ, সমস্ত "ধারে লওয়া" ভাব পরিত্যাগ করিয়া আমাদের খাঁটি স্বদেশী হওয়ার প্রয়োজন। কেবলমাত্র বিদেশী পণ্যদ্রব্যের স্রোত বন্ধ করিলে হইবে না,—বিদেশীভাবের স্রোত বন্ধ করিতে হইবে। বিদেশী পণ্যদ্রব্যের অধীনতা হইতে বিদেশী ভাবের অধীনতা অধিক অনিষ্টকর ও নীচতা-সূচক। আমাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি যেরূপ অপরের সাহায্য ব্যতীত আমরা নিজে প্রস্তুত করিয়া বিদেশী পণ্যদ্রব্যের অধীনতাপাশ ছেদন করিব, সেইরূপ আমরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষের মহান্ ভাবগুলিকে আহ্বান করিয়া নিজে মহান্ হইব ও অন্তরের স্বাধীনতা লাভ করিব। প্রাচীন গ্রীস্ তাহার বিজেতা রোমকে যেমন বিদ্যা ও বুদ্ধির দ্বারা বিজিত করিয়াছিল, সেইরূপ আমরাও আমাদের বিজেতা ইংরেজকে নৈতিক উচ্চ আদর্শ, হৃদয়ের বল ও বিদ্যাবুদ্ধির দ্বারা পরাজিত ও অভিভূত করিব। আমাদের মাতৃভূমি ভারতবর্ষ সত্য, ন্যায়, পুণ্য, জ্ঞান ও ধর্ম্মের গৌরবে গৌরবান্বিত। আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণ এই সকল উচ্চ ভাব ও আদর্শের জন্য সর্ব্বস্বত্যাগ করিতে পারিতেন। এ সকলের তুলনায় অর্থ, সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য তাঁহাদের নিকট নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ছিল। উচ্চভাবে লক্ষ্য নিবদ্ধ রাখিয়া তাঁহারা পার্থিবপদার্থ অম্লানবদনে নিজ পদধূলির ন্যায় ত্যাগ করিতে পারিতেন। আমাদের প্রাচীন ইতিহাস এই সকল উচ্চ আদর্শচরিত্রে পরিপূর্ণ। কিন্তু আমরা এমনই হতবুদ্ধি যে, ঐ সকল দেবোপম আদর্শ ত্যাগ করিয়া বর্ত্তমানসময়ের কৃত্রিমসভ্যতা-ভিমানী জাতিসকলের অভিনব আদর্শ ও ভাবসমূহের অনুকরণে আমরা নিজেকে অতি হীন ও কলঙ্কিত করিতেছি। বর্ত্তমান সভ্যতার মূলভিত্তি অর্থ। এই অর্থকে বর্ত্তমান সভ্যতা-ভিমানী জাতিগণ সর্ব্বোচ্চ সিংহাসনে স্থাপন

করিয়া তাহার পদতলে দয়া, সৌজন্য, মনুষ্যত্ব, সত্য, জ্ঞান, সকলই জলাঞ্জলি দিতেছে। এই অর্থের জন্য তাহারা হিংসাদ্বেষের বশবর্ত্তী হইতেছে এবং পরস্পরকে নানারূপ উপায় ও কৌশল উদ্ভাবন করিয়া অসঙ্কোচে বিনাশের মুখে ফেলিয়া দিতেছে। মনুষ্যহননের জন্য তাহারা কতপ্রকার অস্ত্রশস্ত্রের সৃষ্টি করিতেছে এবং বুদ্ধিকৌশলে যে অধিকতর হননকারী অস্ত্র-সকলের সৃষ্টি করিতে পারিতেছে, জগতে সে-ই অধিকতর সম্মানিত ও পূজিত হইতেছে। মানবজাতির রক্তপাতেই তাহাদের আনন্দ। যে অধিক রক্তপাত করিতে পারে, সেই জাতি শ্রেষ্ঠজাতি বলিয়া কীর্ত্তিত। একে অন্যের অর্থ কিরূপে আকর্ষণ করিতে পারিবে, ইহারই উপায়-উদ্ভাবনে সকলে ব্যস্ত। ইহাই প্রকৃত মনুষ্যত্ব ও গৌরব বলিয়া গণ্য হইতেছে। সভ্যতাভিমানী বর্ত্তমান জাতিসকলের বাহ্যিক আড়ম্বর ও চাকচিক্যে বিমোহিত হইয়া আমরা এই সকল নীচ আদর্শের অনুকরণে ক্রমশ অধোগামী এবং গুণ অপেক্ষা দোষের অনুকরণ করিয়া পদে পদে লাঞ্ছিত ও অপ-মানিত হইতেছি। যে স্থান প্রকৃত আমাদের নহে, তাহা অধিকার করিতে যাইয়া আমরা পতিত ও স্বস্থানভ্রষ্ট হইয়া বিকলাঙ্গ এবং অপরের নিকট হাস্যাস্পদ হইতেছি। বর্ত্তমান পাশ্চাত্যজাতির শ্রেষ্ঠত্ব বাহ্যিক বিষয়ে, কিন্তু আমরা ভারতবাসী, আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব আভ্য-ন্তরীণ। আমাদের অধিকার ও শক্তি বিভিন্ন। এরূপ অবস্থায় আমরা কিরূপে তাহাদের অনুকরণ করিয়া তাহাদের সমকক্ষ বা তাহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইব।

এক্ষণে বিদেশীভাব আমাদিগকে সর্ব্বথা অধিকার করিয়াছে এবং সেই বিদেশীভাবের সংস্পর্শে আমাদের স্বকীয় ও স্বাভাবিক অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। আমরা আমাদের প্রাচীন ইতিহাসে দেখিতে পাই, প্রাচীন হিন্দুগণ আদর্শ সত্যপ্রিয়, সরল, উদার, স্বার্থত্যাগী ও ধর্ম্মপ্রাণ ছিলেন। তখনই ভারতের সত্যযুগ ছিল। বহুশতাব্দীর বিদেশী-সংস্পর্শে এখন আমাদের ঘোর অধঃপতন হইয়াছে। এখন আমরা মিথ্যাবাদী বলিয়া কীর্ত্তিত এবং আমরা ভয়ানক স্বার্থপর, লোভী ও ধর্ম্মবিমুখ নাস্তিক হইয়া পড়িয়াছি। এখন আমাদিগকে আর সেই হিন্দু বলিয়া চেনা যায় না। অধঃপাত ইহা হইতে আর অধিক কি হইতে পারে। বিদেশীয় ভাব ও আদর্শের অনুকরণই কি আমাদের এই অধঃপাতের কারণ নহে। আমরা বিদেশীর গুণের অনুকরণ করিতে না পারিয়া দোষেরই অনুকরণ করিতেছি,—আর সে অনুকরণে আমরা স্বার্থপর, অর্থলোলুপ, মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক ও সঙ্কীর্ণমনা হইয়াছি। বিদেশীর পুস্তকপাঠে আমাদের ধর্ম্মবিশ্বাস বিচলিত হইয়াছে। ধর্ম্মে বা আধ্যাত্মিক বিষয়ে আমাদের আস্থা বা বিশ্বাস নাই। যতই স্বদেশী বলিয়া গর্ব্ব করি না, অদ্যাবধি আমরা সম্পূর্ণরূপে বিদেশীভাবের দ্বারাই চালিত,—বিদেশীভাবের দাসত্বশৃঙ্খলে আমাদের হৃদয় ও মন সম্পূর্ণরূপে বদ্ধ ও বিজড়িত।

যদি আমরা যথার্থই স্বাধীন হইতে চাই, তবে আমাদের দাসত্বপাশগুলি একে একে ছেদন করা আবশ্যক। আমাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি নিজে ও অপরের সাহায্য ব্যতীত প্রস্তুত করিয়া আমাদের দেহকে যেমন

বিদেশী পণ্যদ্রব্যের দাসত্ব হইতে মুক্ত করিতে হইবে, সেইরূপ আমাদের মনকেও বিদেশী ভাবের দাসত্ব হইতে বিমুক্ত করিতে হইবে। মনের দাসত্বই প্রকৃত দাসত্ব। মনের দাসত্ব হইতেই আমাদের অধঃপতন আরম্ভ হইয়াছে,—আবার মনের স্বাধীনতা হইতেই আমাদের অভ্যুত্থানের সূত্রপাত করিতে হইবে। আমাদের মনকে যদি আমরা স্বাধীন ও পূর্ব্ব-গৌরবে প্রতিষ্ঠিত ও তাহাতে আমাদের স্বদেশের স্বকীয় মহত্ত্ব পুনরানয়ন করিতে পারি, তবে সকলপ্রকারের স্বাধীনতাই অনায়াসে আমাদের করতলগত হইবে।

যে দেশের যাহা স্বাভাবিক, তাহাই তাহার প্রকৃতি। প্রকৃতির অন্যথাচরণই পাপ। পাপের ফল দুঃখ ও দুর্গতি। আমরা সেই পাপের ফলই এখন ভোগ করিতেছি। আমাদের মাতৃভূমি স্বকীয় মহত্ত্বে ও গৌরবে জগতের শীর্ষ-স্থানীয় ছিলেন এবং জগতের ধর্ম্মগুরু বলিয়া পূজিত হইতেন। সেই মাতার সন্তানগণ আমরা হীনতায় সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্টজাতি বলিয়া গণ্য হইতেছি, ইহা অপেক্ষা অধিক পাপভোগ আর কি হইতে পারে। যদি আমরা পূর্ব্বগৌরব পুনঃপ্রাপ্ত হইতে চাই, তবে বিদেশীয় কৃত্রিম-ভাব বর্জ্জন করিয়া হৃদয়ে স্বদেশীভাবের পুনঃপ্রতিষ্ঠা আবশ্যক;—বিদেশীর বিলাসিতা ও মিথ্যাভাব পরিত্যাগ করিয়া সত্যকে প্রতিষ্ঠিত ও উচ্চসিংহাসনে স্থাপন করার প্রয়োজন। তাহা হইলে আমাদের কার্য্যে ও মনে বল হইবে। তাহার নিকট জগৎ স্তম্ভিত, ভীত অভিভূত হইয়া যাইবে এবং তাহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক আমাদিগকে উচ্চাসন ও স্বাধীনতা দান করিবে। বিনা রক্তপাতে আমাদের যুদ্ধে জয় হইবে এবং তাহাতেই আমাদের চিরাভীপ্সিত সত্যযুগ আমাদের মধ্যে আবার অবতীর্ণ হইবে।

সত্য, উদারতা ও ধর্ম্ম, এই তিনটি আমাদের সর্ব্বপ্রধান জাতীয়ভাব। এই সকল ভাব চিরকাল ভারতবর্ষে অক্ষুণ্ণভাবে রাজত্ব করিয়াছে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের ভাব-গুলিকে আশ্রয় করিয়া সংসারপথে অগ্রসর হওয়া আবশ্যক। এই ভাবগুলিই আমাদের মহাব্রত, ইহারাই আমাদের অবলম্বন। বিদেশী-ভাবের অধীনতায় আমরা নিম্ন হইতে নিম্নতর স্তরে অবতরণ করিয়া মনুষ্যনামের অযোগ্য হইয়াছি;—আমরা শঠ, প্রবঞ্চক ও ঘোর মিথ্যাবাদী হইয়া পড়িয়াছি। সেই দিক্ হইতে আমাদের অধঃপাতের সূত্রপাত হইয়াছে, সেই দিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া আমাদিগকে পুন-রুন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। অতএব সত্যকে আহ্বান ও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়া সেই সত্যের সাধনাতেই আমরা সত্যযুগের অবতারণা করিব।

এই সত্য কি? যাহা আছে, তাহাই সত্য। যাহা তাহার বিরোধী, তাহাই মিথ্যা। সত্য কথা, সত্য আচরণ বা সাধুতা, বাক্য ও মন একরূপ হওয়া, মুখে যাহা বলা যায় মনেও তাহা দৃঢ়রূপে ধারণা করা, মনের প্রকৃত-ভাবের বিপরীত মুখে প্রকাশ না করা—এই সকলই সত্যের অঙ্গ। সংসারের নিকট প্রশংসা-লাভের জন্য যাহা বাক্যে প্রকাশ করিতেছি, মনে সেই ভাব পোষণ না করা, ঈপ্সিত বিষয়ে মনের দৃঢ়বিশ্বাস বা ধারণা না থাকা, অসরলতা, শঠতা, প্রবঞ্চনা, মনের ভাব গোপনপূর্ব্বক অন্যথা উক্তি, তোষামোদ, নীচতা ও পর-প্রত্যাশা—এই সকল মিথ্যার অঙ্গ। যতদিন

আমাদের মধ্যে এই সত্য প্রতিষ্ঠিত না হইবে, ততদিন আমাদের উদ্ধার নাই—ততদিন আমরা মনুষ্যত্বের নিম্ন হইতে নিম্নতর স্তরে নিমগ্ন হইতে থাকিব,—কাহার সাধ্য আমাদিগকে রক্ষা করে। নিজের বলের উপর নির্ভর করিয়াই আমাদের উঠিতে হইবে,—অপরের বলের উপর কেহই দাঁড়াইতে পারে না। সত্যই আমাদের সেই বল। আমাদের মধ্যে এই সত্য, সরলতা, সাধুত্ব ও আন্তরিক দৃঢ়তারই নিতান্ত অভাব। আমরা বাক্যে স্বদেশভক্ত বলিয়া পরিচয় দিতেছি, কিন্তু প্রকৃতই কি আমরা স্বদেশভক্ত। আপনার অন্তরের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ, প্রকৃতই কি স্বদেশের জন্য তোমার প্রাণ কাঁদিতেছে,—প্রকৃতই কি স্বদেশের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে তুমি প্রস্তুত আছ। তোমরা কি নিজের হৃদয়ে স্বদেশের পরিবর্ত্তে নিজেকেই উচ্চাসনে বসাইয়া পূজা করিতেছ না। তোমরা নিজের স্বার্থ বা সম্মানের জন্যই কি স্বদেশভক্ত সাজ নাই। যদি এইরূপ হইয়া থাকে, তবে তোমাদের ন্যায় মিথ্যাচারী আর কে হইতে পারে। যদি স্বদেশব্রত তোমাদের সত্য হয়, তবে সত্যরূপ সাধনার নিকট সিদ্ধি কখনই দুর্লভ হইবে না। বিদেশী সভ্যতাভিমানী জাতিগণের নিকট হইতে শিক্ষিত মিথ্যা আড়ম্বর, মিথ্যা সভ্যতা, মিথ্যা শিষ্টাচার ত্যাগ কর। তোমার স্বদেশের, তোমার পূর্ব্বপুরুষের মহৎ সত্যের সাধনা কর,—তাহা বাক্য, মন ও আচরণে প্রতিষ্ঠিত কর। তাহা হইলে তোমাদের দুর্গতির অবসানে সুখ ও স্বাধীনতা দুষ্প্রাপ্য হইবে না।

সত্যের ন্যায় উদারতা, আত্মত্যাগ ও ধর্ম্ম, এই সকলও আমাদের জাতীয়ভাব। আমরা যদি প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে চাই, তবে এই সকল ভাব আমাদের জীবনে প্রতিফলিত করিতে হইবে। অন্যথা আমাদের স্বদেশী জল্পনা মিথ্যা আড়ম্বরমাত্র,—আমাদের কোন কার্য্যই তদ্দ্বারা সুসিদ্ধ হইবে না। মিথ্যা কখন সফল ও চিরস্থায়ী হইতে পারে না।

আমাদের ভারতে আত্মত্যাগের অনন্ত উদাহরণ সকল স্থানে ও সকল সময়ে বর্ত্তমান রহিয়াছে। কত বীরপুরুষ, কত ধার্ম্মিক স্বদেশ ও স্বধর্ম্মের জন্য আত্মজীবন বলি দিয়াছেন। আমাদের প্রাচীন ইতিহাস হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান সময়ের ইতিহাস পর্য্যন্ত আলোচনা করিলে কতশত উদাহরণ পাওয়া যাইবে। এই সকল জীবন্ত উদাহরণই এই নির্জ্জীব ভারতে কতকপরিমাণে জীবনদান করিতেছে। আমরা বর্ত্তমানসময়ের শিক্ষিত সন্তানগণ কি সেইরূপ আত্মত্যাগে প্রস্তুত আছি। ইংরেজিশিক্ষা আমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে স্বার্থপর করিয়া রাখিয়াছে। আমরা নিজের স্বার্থের জন্য দেশের স্বার্থকে বলি দিতে এবং স্ত্রীপুত্রের ও নিজের সুখের জন্য ধর্ম্মে পর্য্যন্ত জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত আছি। যে দানশীলতার জন্য হিন্দুগণ প্রসিদ্ধ ছিলেন, আমরা বিদেশীর অনুকরণে সেই দানশীলতা ভুলিয়া গিয়া আত্মপরায়ণ ও ঘোর কৃপণ হইয়াছি। বিদেশীর অনুকরণে ভ্রাতা ভ্রাতাকে ত্যাগ করিতেছে। স্বার্থের জন্য নানাপ্রকারে আমরা পরস্পর পরস্পরকে হিংসাদ্বেষ করিতেছি এবং ভীরু কাপুরুষ সাজিয়া নিজের স্বার্থের কূপে ডুবিয়া রহিয়াছি। সেই স্বার্থপরতায় আমাদের সাহস কুণ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। আমাদের শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে স্বদেশ ও স্বধর্ম্মের জন্য আমরা

জীবনবিসর্জ্জন করিতে পারি না। আমরা যদি প্রকৃত মনুষ্য হইতে চাই, তবে বিদেশী-শিক্ষার সহিত শিক্ষিত এই স্বার্থপরতা ভুলিয়া যাইতে হইবে এবং আমাদের স্বদেশের মৃত্তিকার সহিত যে নিষ্কামধর্ম্ম গ্রথিত ও নিবদ্ধ রহিয়াছে এবং তাহার জলবায়ুর সহিত যাহা প্রবাহিত হইতেছে, সেই নিষ্কামধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে হইবে। এই ধর্ম্মের ন্যায় মহান্ ধর্ম্ম আর কিছুই নাই। নিষ্কামযোগীর ক্ষমতা অসীম,—নিষ্কামধর্ম্ম জলন্ত অগ্নির ন্যায়। এই ধর্ম্মে শিক্ষিত যাঁহারা, অগ্নিস্নাত পুরুষের ন্যায় তাঁহারা অসীম তেজস্বী ও শক্তিমান্। এইরূপ অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হওয়া ব্যতীত আমাদের মাতৃভূমির উদ্ধারের উপায়ান্তর নাই।

ধর্ম্ম আমাদের জাতির তৃতীয় মহাভাব। ধর্ম্মই আমাদের জাতির প্রাণ, ধর্ম্মই আমাদের সর্ব্বস্ব। আমরা ধর্ম্মেই জীবিত আছি। ধর্ম্ম যদি আমাদিগকে ত্যাগ করিতেন, তবে এই ভূপৃষ্ঠ হইতে আমরা বহুকাল পূর্ব্বে অন্তর্হিত হইয়া যাইতাম। কিন্তু সৌভাগ্যবশত অদ্যাপি হিন্দুধর্ম্ম বিদ্যমান আছে এবং ধর্ম্মপ্রাণ মহাত্মারাও অদ্যাপি ভারতে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। তাই এই পতিত জাতি এতকাল বিদেশী ও বিধর্ম্মীর কঠোর নির্যাতন সহ্য করিয়াও আজ পর্য্যন্ত নির্ব্বংশ হইয়া যায় নাই এবং বিজেতাগণের মধ্যে বিলীন না হইয়া এখনও নিজ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতেছে। হিন্দুগণ ধর্ম্মের জন্য অদ্যাপি কত কষ্ট সহিতেছে এবং কঠোর ক্লেশে জীবনপাত পর্য্যন্ত করিতেছে। তীর্থাদিপর্য্যটনে তাহারা যে ক্লেশ সহ্য করে, তাহা অন্য জাতির নিকট বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হয়। বিদেশী শিক্ষার কুফলে আমরা সেই সনাতন ধর্ম্ম বিসর্জ্জন করিয়া অবিশ্বাসপরায়ণ ও নাস্তিক হইতেছি। এইরূপ সংশয়াত্মা ও অধার্ম্মিক জীবের দ্বারা সংসারের কোন মহৎকার্য্য সাধিত হইতে পারে না। বিদেশ হইতে আগত অবিশ্বাস, সংশয় ও নাস্তিকতা আমাদিগকে আক্রমণ করিতেছে। আমরা বাহিরে স্বদেশী বলিয়া ভাণ করিয়াও অন্তরে ঘোর বিদেশীভাবাপন্ন রহিয়াছি। আমাদের মাতৃভূমিকে আমরা যদি উদ্ধার করিতে চাহি, তবে সর্ব্বপ্রথমে বিদেশী নীচভাবের দাসত্ব মোচন করিয়া আমাদের মনকে উক্ত স্বদেশী মহান্ ভাবে অনুপ্রাণিত করিতে হইবে। তবেই আমাদের দেশ উন্নত ও স্বাধীন হইবে। আমাদের ত্রিকালদর্শী ঋষিগণ বলিয়া গিয়াছেন যে, কলিযুগের পরই সত্যযুগ। যদি আমরা আমাদের হৃদয়কে আমাদের জাতীয়ধর্ম্ম—সত্য, পুণ্য ও নিষ্কামকর্ম্মে দীক্ষিত করিতে পারি, তবেই আমাদের মধ্যে আবার সত্যযুগের আবির্ভাব হইবে। পৃথিবীতে আমরা স্বাধীন, মহান্ ও পূজনীয় হইব এবং পূর্ব্বে যেমন আমরা জগতের আদর্শস্থানীয় ও গুরু ছিলাম, সেইরূপই হইয়া উঠিব। অন্যথা আমাদের পতন অবশ্যম্ভাবী।

শ্রীশারদানন্দ।

প্রাদেশিক-সমিতি।*

আজ পর্য্যন্ত জাতীয় মহাসমিতির মত আমাদের প্রাদেশিক সমিতিগুলিও কেবলমাত্র একটা নৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়াই রহিয়াছে। ইহাদের সর্ব্ববিধ অনুষ্ঠানই কেবল বক্তৃতা ও দরখাস্তেই নিঃশেষিত হইয়াছে।

এক সময়ে ইহাই যথেষ্ট ছিল। কারণ, তখন ইংরেজের হৃদয়মনই আমাদের সকল রাজনৈতিক আন্দোলন ও আলোচনার লক্ষ্যভূত হইয়াছিল। ইংরেজকে আমাদের দুঃখক্লেশ ভাল করিয়া জ্ঞাপন করিতে পারিলেই তাহার উপশম হইবে, আমাদের রাষ্ট্রীয় বাসনার অনুকূলে ইংরেজের শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি লাভ করিতে পারিলেই আমরা আমাদের সমুদায় স্বত্বস্বাধীনতা প্রাপ্ত হইব,—তখন আমরা সত্যসত্যই এ বিশ্বাস করিতাম। আর ইংরেজের জ্ঞান জন্মাইবার ও সহানুভূতি জাগাইবার জন্য বক্তৃতা ও দরখাস্ত ব্যতীত অপর কোনো অনুষ্ঠানের আবশ্যকতাও ছিল না।

আমাদের সে ভাব, সে আস্থা, সে ভরসা আর নাই। আমরা এখন বুঝিয়াছি যে, দরখাস্ত করিয়া ইংরেজের নিকট হইতে কিছু পাইব না। এখন আমরা জানিয়াছি যে, ইংরেজ দেবতা নহে, মানুষ। সে পরার্থপরতাদ্বারা প্রণোদিত হইয়া ভারতে পদার্পণ করে নাই, এবং এদেশের জনগণের পরমার্থলাভের পন্থা পরিষ্কার করিবার জন্য সে স্মিতমুখে, প্রসন্নচিত্তে কদাপি কেশাগ্রপরিমাণেও আপনার প্রতিষ্ঠিত অধিকার হইতে সরিয়া দাঁড়াইবে না। সুতরাং তাহার নিকট আবেদন-আর্ত্তনাদ বৃথা।

এখন আমাদিগকে রাজনৈতিক স্বত্বস্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, আত্মশক্তিকে জাগাইতে হইবে। ইংরেজের করুণা উদ্রেক করিয়া কেবল তাহার অহমিকাই বাড়াইয়া দিব, আমাদের দুর্গতি দূর করিতে পারিব না। যদি ইংরেজ সত্যভাবে আমাদের কোনোপ্রকারের রাজনৈতিক কল্যাণসাধনে কখনো নিযুক্ত হয়, সে ভয়েতে হইবে,—দয়াপরবশ হইয়া নহে।

কারণ রাজনীতিমাত্রেই কেবল শক্তির খেলা ও শক্তির পরীক্ষা। এক্ষেত্রে জয়শ্রী কেবল সবলকেই বরণ করে। আত্মশক্তির দ্বারা বিরোধী শক্তিকে পরাভূত করিতে না পারিলে, রাষ্ট্রীয়ব্যাপারে কেহ কোথাও আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। ইংরেজের সঙ্গে আমাদের সকল বিষয়েই একটা বিষম বিরোধ বাধিয়া আছে। ইংরেজের স্বার্থসিদ্ধিতে আমাদের স্বার্থ নষ্ট, ইংরেজের সম্পদে আমাদের দারিদ্র্য, ইংরেজের বুদ্ধিবৃত্তির স্বাধীন পরিচালনায় শাসনকার্য্যে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির যথাযোগ্য পরিচালনার অবসর ও সুযোগের হানি,—বর্ত্তমানে ইংরেজের সঙ্গে আমাদের এই

---

* গতবৎসর বরিশালের প্রাদেশিকসমিতির পূর্ব্বে এই প্রবন্ধ আমাদের হস্তগত হয়, কিন্তু সে সময় ইহা প্রকাশের সুবিধা না হওয়ায় এইবারের সমিতি উপলক্ষে প্রকাশিত হইল।—বং:সং:।

সম্বন্ধই দাঁড়াইয়াছে। এই স্বার্থদ্বন্দ্বের নিষ্পত্তি করিতে চাহিলে, ইংরেজের মন জোগাইয়া চলিলে কেবল চলিবে না। তাহার নিকট ভিক্ষা বা করুণ-ক্রন্দনে কোনো লাভ হইবে না। ভালোয়-ভালোয় যদি এই বিরোধের নিষ্পত্তি করিতে হয়, তবে আমাদিগকে আত্মস্থ ও আত্মপ্রতিষ্ঠ হইতে হইবে। প্রজাশক্তিকে জাগ্রত ও সংহত করিয়া, সেই সংহত প্রজাশক্তিকে ইংরেজের সম্মুখে ধরিয়া, তাহার প্রাণে আতঙ্কের সঞ্চার করিতে হইবে। এ ভিন্ন এ সমস্যার মীমাংসা অসম্ভব। প্রজাশক্তিকে জাগ্রত করিলেই যে ইংরেজের সঙ্গে শত্রুতা করিতে যাইব, এমনও নহে। ইহাতে বাস্তবিক দেশের শান্তিভঙ্গ হইবে না, বরং আরো স্থায়িভাবে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিতই হইবে। কারণ, অপরাজয়া শক্তির উপরেই অচলা শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, দুর্ব্বলতার উপরে নয়।

প্রজাশক্তি যেখানে সুষুপ্ত, রাজশক্তি সেখানে স্বতই অত্যাচারী হইয়া ক্রমে অরাজকতা আনয়ন করে। প্রজার বিদ্রোহে কোনো দেশে প্রকৃত অরাজকতা উপস্থিত হয় না, রাজার অত্যাচার-অবিচারে প্রজা যেখানে একই সঙ্গে নির্ব্বীর্য্য ও অশক্ত ও অসংযত হইয়া পড়ে, সেইখানেই প্রকৃত অরাজকতা উপস্থিত হয়। রাজ্যের শান্তির জন্য, রাজার মঙ্গলের জন্য, প্রজার আত্মজীবনের চরিতার্থতা-সম্পাদনের জন্য, সর্ব্বত্রই প্রজাশক্তিকে জাগ্রত করিয়া সতত সজাগ রাখিতে হয়। আমাদিগকেও তাহাই করিতে হইবে।

এখন আমাদের সর্ব্ববিধ রাজনৈতিক চেষ্টাকে এই লক্ষ্যমুখে পরিচালিত করিতে হইবে। জাতীয়-মহাসমিতিই হউক, আর প্রাদেশিক সমিতিই হউক, এ সকলকেই এখন আন্দোলনের কাজটা কথঞ্চিৎ কমাইয়া, সংগঠনের কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হইবে। বক্তৃতার মাত্রা কমাইয়া, এখন বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। এতকাল আমরা ইংরেজের মুখ চাহিয়া এসকল সভাসমিতি করিয়াছি। সরকারের কানে তুলিবার আশায় কথা কহিয়াছি। দেশের লোক বুঝিবে কি না বুঝিবে,—তাহারা শোনে কি না শোনে, এ ভাবনা কখনো জাগে নাই এখন এই ভাবনাই ভাল করিয়া জাগাইতে হইবে।

এখন আর ইংরেজকে আমাদের দুঃখক্লেশ জ্ঞাপন করিবার জন্য ব্যগ্র হইলে চলিবে না। দেশের লোকের প্রাণে তাহাদের দুর্গতির জ্ঞান উজ্জ্বল করা আবশ্যক। এখন ইংরেজের উপরে লোকের আস্থা জন্মাইয়া, আর ফল নাই, তাহাদের নিজেদের উপরে প্রগাঢ় বিশ্বাস জন্মাইতে হইবে।

এ শক্তি কেবল কথায় জাগিবে না, যদিও এ বিষয়ে প্রচুর উপদেশের প্রয়োজন আছে। এ বিশ্বাস কেবল আন্দোলনে জন্মিবে না। যদিও উপযুক্তরূপে আন্দোলন-আলোচনাদি পরিচালিত হইলে, ব্রিটিশশাসনের দোষপ্রদর্শন ও ব্রিটিশপ্রভুশক্তিকে লোকচক্ষে হীন করিয়া,—আমরা যে বিদেশী মোহের দ্বারা একান্ত অভিভূত হইয়া এরূপভাবে আপনাদিগের শক্তি-সামর্থ্যের প্রতি অনাস্থাবান্ হইয়া পড়িয়াছি,—সে মোহঘোর অনেকপরিমাণে কমিয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে। গত ত্রিশবৎসরের রাজনৈতিক আন্দোলন এ কাজ অনেকটা করিয়াছে। এ ঔষধ এখনো আরো প্রয়োগ করিতে হইবে সত্য, কিন্তু পূর্ব্বেকার অনুপানে আর ফলোদয় হইবে না।

এতদিন আমরা ব্রিটিশশাসনের দোষ-প্রদর্শন করিতে যাইয়া, বিশেষ বিশেষ রাজ-কর্ম্মচারীর ঔদ্ধত্য বা অজ্ঞতাকেই তজ্জন্য দায়ী করিয়াছি। ইংরেজ-শাসননীতির মূলেই যে এ সকল দোষ রহিয়াছে, ইংরেজচরিত্র ও ইংরেজের স্বার্থসন্ধান হইতেই যে এ সকলের উৎপত্তি,এবং ইংরেজের দ্বারা যে এ সকল দোষ সংশোধনের কোনোই সম্ভাবনা নাই,—এ সকল কথা এতকাল, অজ্ঞতাবশতই হউক, কিংবা ভ্রান্ত রাজনীতিবুদ্ধির দ্বারা প্রণোদিত হইয়াই হউক, আমরা চাপিয়া গিয়াছি। এই কারণে ইংরেজের শাসননীতির পরিবর্ত্তনের জন্য আমরা ইরেজের নিকটই প্রার্থনা করিয়াছি, আমাদের সুখ-সৌভাগ্যলাভের আশায় ইংরেজের শরণাপন্ন হইয়াই ছিলাম। এইজন্য মোহ কাটিয়াও কাটে নাই। এখন সর্ব্বপ্রযত্নে এই মোহকে কাটা-ইতে হইবে।

মোহ কাটিলে জ্ঞান জাগে বটে, কিন্তু জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই সর্ব্বথা শক্তি জাগে না। শক্তি জাগাইবার একমাত্র মূলমন্ত্র—কর্ম্ম। কর্ম্মকে অবলম্বন করিয়াই শক্তি জাগিয়া উঠে, কর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতেই শক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতীয়জীবনের শক্তিকে জাগাইতে হইলে আমাদিগকে যথাযোগ্য কর্ম্ম অবলম্বন করিতে হইবে; দেশহিতকর অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানাদির মধ্যে এই শক্তিকে যথাযোগ্যভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। এইজন্য প্রাদেশিক-সমিতিকে ভাল করিয়া গঠন করিয়া, বহুল কর্ম্মানুষ্ঠানা-দির মধ্যে তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, তাহার একটা নিত্য ও দৈনন্দিন কর্ম্মাকর্ম্মের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

এখন পর্য্যন্ত কংগ্রেসের মত প্রাদেশিক-সমিতিগুলিও স্বল্পবিস্তর একটা রাজনৈতিক বারওয়ারিতেই যেন পরিণত হইয়াছে। এরূপ বারওয়ারিতে উপকার নাই বা এতদিন ইহার দ্বারা কোনো কল্যাণ সাধিত হয় নাই, এমন কথা বলি না। দেশের শিক্ষিতসাধারণে এই সকল কংগ্রেসে বা কন্‌ফারেন্সে সমবেত হইয়া, আর কিছু কাজ করুন বা না করুন, পরস্পরকে জানিবার ও চিনিবার যে সুযোগ প্রাপ্ত হন, তাহাতে জাতীয়জীবনের ঘনিষ্ঠতা ও ঘননিবিষ্টতা বৃদ্ধি করে, ইহা অস্বীকার করা যায় না। এ কাজটা এখন অনেকটা হইয়া গিয়াছে। আমাদের পূর্ব্বেকার বিচ্ছিন্নতা এখন আর নাই। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোকেরা কংগ্রেসে সম্মিলিত ও বিভিন্ন জেলার লোকেরা কন্‌ফারেন্সে একত্র হইয়া পরস্পরকে জানি-য়াছে, চিনিয়াছে, দেশের সাধারণ অভাব ও অভিযোগসম্বন্ধে অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে, এবং ব্রিটিশশাসনাধীনে ধনি-নির্ধন, জমিদার-রায়ত, ব্রাহ্মণ-শূদ্র, সকলেরই অবস্থা যে একরূপ, সকলের সুখশান্তি ও স্বার্থ যে এক ও পরস্পরের সুখশান্তিস্বার্থের সঙ্গে বিজড়িত,—ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছে। এ সকল উপায়ে জাতীয়জীবন ও জাতীয় একতার ভিত্তি স্থাপিত হয়। বিধাতার কৃপায় সে ভিত্তি আমাদের মধ্যে স্থাপিত হইয়াছে। এখন তাহার উপরে এই বিরাট্ জাতীয়জীবনকে গড়িয়া তুলিতে হইবে।

কংগ্রেস ও প্রাদেশিক-সমিতি উভয়কেই এখন এই কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হইবে।

যাহাতে সত্যসত্যই ইহারা দেশের প্রজা-শক্তির আধার ও অবলম্বনরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, সর্ব্বাদৌ তাহারই চেষ্টা দেখিতে হইবে।

এখন পর্য্যন্ত আমাদের প্রাদেশিক-সমিতি কেবলমাত্র মুষ্টিপ্রমাণ শিক্ষিতলোকেরই প্রতিনিধি হইয়া কার্য্য করিতেছে। দেশের জনসাধারণ ইহার সঙ্গে এখনো কোনোপ্রকারেই সংযুক্ত ও সম্মিলিত হয় নাই। গতবৎসর মৈমনসিংএ স্বল্পপরিমাণে জেলার সাধারণ লোকে ইহার কথা শুনিয়াছিল এবং কেহ কেহ সভাদিতেও আসিয়া যোগদান করিয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহারাও স্থায়িভাবে কন্‌ফারেন্সের অঙ্গীভূত হইয়া যায় নাই। দেশের লোককে স্থায়িভাবে কংগ্রেস বা কন্‌ফারেন্সের অঙ্গীভূত করিবার কোনো বন্দোবস্তও আজ পর্য্যন্ত হয় নাই। নেতৃদের মধ্যে দশ-পোনের জন বহুকালাবধিই এসকলের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া আছেন সত্য; কিন্তু অধিকাংশ সভ্য ও শ্রোতাই নদীজলের মত জোয়ারে আসেন, ভাটায় নামিয়া যান,—পঞ্জিকায় জোয়ারভাটার তালিকার মত ইঁহাদের নাম উপস্থিত সভ্যদিগের তালিকায় প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু তাঁহাদের কার্য্যের চিহ্ন কোথাও থাকে না।

আর এরূপভাবে এ সকল কাজ করিলে চলিবে না। প্রাদেশিক-সমিতিকে একটা স্থায়ী আকার প্রদান করিতে হইবে; তাহাতে বিবিধ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাকে নিয়ত কর্ম্মশীল করিয়া তুলিতে হইবে, এবং এই সকল নিত্যকর্ম্মের যোগে জনমণ্ডলীর ভাব, চিন্তা, আদর্শ, আকাঙ্ক্ষা ও দৈনন্দিন কর্ম্মাকর্ম্মের সঙ্গে তাহাকে বিস্তৃত ও জটিল ও অচ্ছেদ্যরূপে সংযুক্ত করিতে হইবে।

এতদর্থে সর্ব্বপ্রথমেই প্রাদেশিক-সমিতির একটা স্থায়ী সভ্যদল গঠন করিতে হইবে। বাঙালীমাত্রেই জাতি, বর্ণ ও ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে, অষ্টাদশবর্ষ বয়ঃক্রম অতিক্রম করিলেই, যৎসামান্য বার্ষিক বা ত্রৈবার্ষিক প্রণামীদানে, এই সমিতির সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইতে পারিবেন। এই প্রণামীর হার যত অল্প হয়, ততই ভাল;—দুই-আনা, এমন কি, এখন এক-আনা করিলেও ক্ষতি নাই। সমিতির উদ্দেশ্য প্রচার করিয়া, গ্রামে গ্রামে ও নগরে নগরে বক্তা, উপদেষ্টা ও প্রচারক প্রেরণ করিয়া, এই সভ্যদল গঠন করিতে হইবে। কোনো গ্রামে পঞ্চাশজন সভ্য হইলেই তাহাদের দ্বারা গ্রাম্যসমিতি গঠন করিতে হইবে। গ্রামের মধ্যে স্বদেশীভাবের প্রতিষ্ঠা করা, স্বদেশীদ্রব্যের প্রচলন করা, স্বদেশী-আন্দোলন জাগ্রত করা ও জাগাইয়া রাখা;—গ্রামের সুখস্বাস্থ্যের ব্যবস্থা করা, গ্রাম্য পথঘাট পরিষ্কার রাখা, জলকষ্টনিবারণের জন্য প্রয়োজনমত বাপীতড়াগাদি খনন করা, গ্রাম্য বালকদিগের সংশিক্ষার সাহায্য করা, গ্রামের যুবকদিগের মধ্যে ব্যায়ামাদির বন্দোবস্ত করা, গৃহস্থেরা যাহাতে আপন-আপন দেওয়ানী বা ছোট ছোট ফৌজদারী মামলা মোকদ্দমা আপনারা সালিশ নিযুক্ত করিয়া মিটাইতে পারে, তাহার চেষ্টা দেখা,—এই সকলই গ্রাম্যসমিতির কার্য্য হইবে। গ্রাম্যসমিতি এতদর্থে অর্থসংগ্রহ করিবে, কর্ম্মকর্ত্তা নিযুক্ত করিবে, এবং যতটা সম্ভব, গ্রামের সর্ব্ববিধ শাসনসংরক্ষণের ভার আপনাদের হস্তে গ্রহণ করিবে।

এ কার্য্যে ইংরেজের সঙ্গে বা তাহার শাসনযন্ত্রের সঙ্গে কোনো বিরোধ উৎপন্ন হইবার কোনোই আশঙ্কা নাই। ইংরেজ যাহা করে, তাহাতে আমাদের হাত দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু ইংরেজ তো অনেক কাজ করে

না, সকল কাজ করিয়াও উঠিতে পারে না। লোক্যাল বোর্ডসকল গ্রামে বড় বড় রাস্তা-ঘাট নির্ম্মাণ করে, কিন্তু গরিবপল্লির মধ্যে যে নিয়তপঙ্কপূর্ণ সঙ্কীর্ণ পথ আছে, তাহার সংবাদ কে লয়? ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড সভ্যদের পল্লিতে বহু অর্থব্যয় করিয়া দীর্ঘিকা খনন করে বটে, কিন্তু নিরন্ন ও নিরক্ষর কৃষকের দ্বারে কচিন্মাত্র কালেভদ্রে বিশুদ্ধ পানীয়জল বহন করিয়া থাকেন। ইহাদিগকে যোজনান্তর হইতে নিদাঘা-পরাহ্ণে তপ্তসৈকত অতিক্রম করিয়া পানীয়জল সংগ্রহ করিতে হয়। মন্বন্তরের সময় পঙ্গপালের মত লোক যখন ঝাঁকে ঝাঁকে পথিপার্শ্বে মরিতে আরম্ভ করে, তখন ইংরেজের অসাধারণ অনুকম্পার উদয় হয়—এবং তখন ইংরেজ-রাজ দেশবিদেশ হইতে অর্থসংগ্রহ করিয়া অন্নসত্র খুলিয়া প্রজার প্রাণরক্ষার জন্য সচেষ্ট হন; কিন্তু প্রতিদিন যে ভারতের চারিকোটি লোক অনশনে বা অর্দ্ধাশনে দিনাতিপাত করে, তাহার সন্ধান কে লয়? ইংরেজ পাঠশালা, স্কুল, কালেজাদি প্রতিষ্ঠা করিয়া আপনার মনোমত একটা শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছে বটে, কিন্তু এ শিক্ষার সঙ্গে আমাদের জাতীয়জীবনের এখনো কোনো ঘনিষ্ঠযোগ স্থাপিত হয় নাই। এ শিক্ষাদ্বারা জাতীয়-প্রতিভা ফুটিয়া উঠিতে পারিতেছে না। এ শিক্ষা শাব্দিকজ্ঞান উৎপাদন করে মাত্র, বস্তুজ্ঞান জন্মায় না। ইহাতে লোকচরিত্র লঘু হইয়া যায়, হৃদয়মন কিছুরই তেজ ও শক্তি সম্যঙ্‌মাত্রায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না। ইংরেজ এ কাজ করিতে পারে না। এবংবিধ বহু বিষয়ে এখনো ইংরেজ হস্তক্ষেপ করে নাই। এ সকল ক্ষেত্রেই আমরা আপাততঃ আত্মপ্রতিষ্ঠা করি না কেন?

আগে ইংরেজ গ্রামে কেবল এক চৌকিদার-মাত্র বসাইয়াছিল, এখন না হয় তার উপরে একটা একটা পঞ্চায়েৎ বসাইয়াছে। কিন্তু চৌকিদার বা পঞ্চায়েৎ গ্রাম্যজীবনের অতি সামান্য স্থানমাত্র অধিকার করিয়া আছে। তারা সেখানে থাকুক। তারা চৌকিদারী টেক্স নিক্। তারা চোরডাকাতের সন্ধান রাখুক। ইহাতে আমাদের কোনো ক্ষতি নাই। এ বিষয়ে তাহাদের সঙ্গে আমাদের কোনো বিরোধ নাই। কিন্তু যে সকল শাসন-সংরক্ষণের কার্য্য ইহারা করে না বা করিতে পারে না, সে সকল কেনই না আমরা নিজেরা নিজেদের হাতে গ্রহণ করিব? ইহাই প্রকৃত স্বায়ত্তশাসন। গ্রাম্যসমিতি গঠন করিয়া গ্রামে গ্রামে এই সত্য স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

গ্রাম্যসমিতির উপরে জেলাসমিতি। অন্তত কুড়িটা গ্রাম্যসমিতি লইয়া এক একটা জেলাসমিতি গঠিত হইবে। গ্রাম্যসমিতি যেমন গ্রামের শাসনসংরক্ষণের ব্যবস্থা করিবে, জেলাসমিতি সেইরূপ জেলার সাধারণ শাসনসংরক্ষণের উপায়বিধান করিবে। ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম সম্মিলিত না হইলে বৃহত্তর পূর্ত্ত-কার্য্য অসম্ভব হয়; জেলাসমিতি ভিন্ন ভিন্ন গ্রামকে একত্র করিয়া এই সকল বৃহত্তর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। জেলার সাধারণ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ব্যবসায়বাণিজ্য ও কৃষি প্রভৃতির উন্নতি ও সংস্কারকল্পে জেলাসমিতি সর্ব্বদা যথাযোগ্য উপায়বিধান করিবে। জেলাসমিতি-সকল আপন-আপন অধীনস্থ গ্রাম্যসমিতির সভ্যদিগের দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবে।

জেলাসমিতির উপরে, সমুদায় প্রদেশের

প্রতিনিধিস্বরূপ, প্রাদেশিক-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইবে। গ্রাম্যসমিতিসকলের রেজিষ্টারিভুক্ত সভ্যেরা এই প্রাদেশিক-সমিতির সভ্যগণকে যথাবিধি নির্ব্বাচিত করিবেন। এখনকার মত তিনজন উকিল বা পাঁচজন সম্পাদক বসিয়া খোসগল্প করিতে করিতে আপনাদের খেয়াল-মত আর সমিতির সভ্যনির্ব্বাচন করিতে পারিবেন না। এই প্রাদেশিক-সমিতি সমগ্র প্রদেশের শাসনসংরক্ষণের যথাসম্ভব ও যথাপ্রয়োজন ব্যবস্থা করিবে। ব্রিটিশশাসন-চক্রের পরিধির বহির্ভাগে যে বিশাল কর্ত্তব্যক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে, প্রাদেশিক-সমিতি সেখানেই আপনাকে সর্ব্বতোভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবে। প্রাদেশিক-সমিতির সভাপতি যথাসম্ভব প্রদেশ-বাসিগণের অভিমতগ্রহণে নির্ব্বাচিত হইবেন। তিনি তাঁহার সম্পাদক ও অপরাপর কর্ম্ম-কর্ত্তাগণকে নিযুক্ত করিবেন। ইহারা স্থায়ি-ভাবে পরবর্ত্তী সমিতির অধিবেশনকাল পর্য্যন্ত সমিতির সমুদায় কার্য্য সাধন করিবেন। সমিতিতে সমবেত প্রজাপ্রতিনিধিগণ আপনা-দের মধ্য হইতে সমিতির একটি অধ্যক্ষসভা গঠন করিবেন। সমিতির সভাপতি ও তাঁহার কর্ম্মিসভা এই অধ্যক্ষসভার নিকট আপনাদের কর্ম্মাকর্ম্মের জন্য দায়ী থাকিবেন। এই অধ্যক্ষ-সভা তিনমাস অন্তর সম্মিলিত হইয়া সভাপতি ও তাঁহার কর্ম্মিসভার কার্য্যাকার্য্যের হিসাব-গ্রহণ ও তাহার সমালোচন করিবেন। সমিতির নির্দ্দেশ ও নির্দ্ধারণগুলিকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য এই অধ্যক্ষসভা প্রাদেশিক-সমিতির সাধারণ সভ্যমণ্ডলীর নিকট দায়ী থাকিবেন। পরবর্ত্তী বার্ষিক অধিবেশনে ইঁহাদের কার্য্যাকার্য্যের বিচার ও আলোচনা হইবে।

আমরা অল্পে অল্পে জাতীয়শিক্ষার ভার নিজেদের হাতে লইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিতেছি। জাতীয়শিক্ষাপরিষদ্ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিশেষভাবে শিল্পকলাশিক্ষার জন্য বৃহৎ আকারে একটা স্বতন্ত্র চেষ্টাও হইতেছে। পূর্ব্ব হইতেই, কৃষিবিজ্ঞান ও শিল্পশিক্ষা-বিধায়িনী সভা কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া, বিদেশে প্রতিবৎসর কতিপয় যুবককে শিক্ষার্থে প্রেরণ করিতেছে। বঙ্গভঙ্গের আন্দোলন-অবলম্বনে একটা জাতীয় ধনভাণ্ডার স্থাপিত হইয়াছে। এইরূপে অল্পে অল্পে আমরা বিবিধ দেশহিতকর অনুষ্ঠানের সূত্রপাত করিয়াছি। এই সকলকে প্রণালীবদ্ধ ও কেন্দ্রীভূত করা অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। প্রাদেশিক-সমিতি যদি এ কাজ না করে, তবে আর কে করিবে?

সর্ব্বশেষে বক্তব্য এই যে,—বঙ্গভঙ্গনিবন্ধন আমাদিগকে এবারে এই প্রাদেশিক-সমিতিকে একটা স্থায়িত্বদান করিতেই হইবে, নতুবা আমরা আর যুক্তবঙ্গের ঐক্য রক্ষা করিতে পারিব না। লাটকে অভ্যর্থনা-অভিনন্দন না দিলেই যে বঙ্গভঙ্গবিধানকে অগ্রাহ্য বা অস্বীকার করা হইল, তাহা নহে। শিষ্টভাবে এক প্রণালীতে কেবল এই বিধানকে আমরা অস্বীকার করিতে পারি;—সে প্রণালী রাজ-কীয় শাসনসংরক্ষণাদি ব্যাপারে, যেখানে প্রজার কোনো কর্ত্তব্য আছে, সেখানে সংযুক্ত-ভাবে সে কর্ত্তব্য পালন করা, বিযুক্ত হইয়া নহে।

ইংরেজ রাজা, আমরা প্রজা; রাজস্ব দরতে হইবে, দিব; যেখানে দিতে হলে, সেইখানেই দিব। রাজার প্রতি প্রজার

অবশ্যপ্রতিপাল্য কতকগুলি কর্ত্তব্য আছে, সে সম্বন্ধে আমাদের কোনো স্বাধীনতা নাই; সে কর্ত্তব্যপালনে হঠকারিতা বা অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে, রাজদ্রোহিতাপরাধ হয়। সে অপরাধ করিতে প্রস্তুত নহি। সুতরাং অবশ্যপ্রতিপাল্য যে সকল রাষ্ট্রীয় কর্ত্তব্য আছে, তাহা যথাবিধি ও যথাশক্তি পালন করিতেই হইবে। কিন্তু এতদ্ব্যতীত এমন অনেক বিষয় আছে, যাহাতে রাজা আমাদের সাহায্য প্রার্থনা করেন। এও প্রজার কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু এ কর্ত্তব্যপালনে রাজপ্রসাদলাভ হইলেও, অবহেলায় প্রত্যবায় নাই। আমরা বঙ্গবিভাগের বিধান গ্রাহ্য করি না, ইংরেজের এই স্বেচ্ছাচারের দ্বারা আমরা পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গকে পরস্পর হইতে পৃথক্ হইতে দিব না,—এ সঙ্কল্প যদি রক্ষা করিতে হয়, তবে এই সকল অবান্তর কর্ত্তব্য-পালনে আমরা পূর্ব্বের ন্যায় সম্মিলিত হইয়া কার্য্য করিব, নতুবা এ সকল কাজ একেবারেই করিব না,—এ পণ করিতে হইবে।

এইজন্য পূর্ব্ববঙ্গে ও পশ্চিমবঙ্গে যে সকল রাজনৈতিক সভাসমিতি আছে, তৎসমুদায়কে একই কেন্দ্রসমিতির অধীনে স্থাপন করিতে হইবে। কলিকাতার ভারতসভা বা বঙ্গীয়-ভূম্যধিকারিসভা এবং ঢাকার জমিদারসভা, বরিশালের প্রজাসভা, মৈমনসিংএর জনসভা, এই সকল সভাসমিতিকে এক কর্ত্তৃত্বাধীনে আসিতে হইবে। ইংরেজগবর্মেণ্ট যদি পশ্চিম-বঙ্গের শাসনসম্বন্ধীয় কোনো বিষয়ে ভারতসভা বা ভূম্যধিকারিসভার মতামত জিজ্ঞাসা করেন, কিংবা ঢাকার বা মৈমনসিংএর কোনো প্রজা-প্রতিনিধিসভার সহিত যদি পূর্ব্ববঙ্গের শাসন-সম্পর্কীয় কোনো বিষয়ে পরামর্শ করিতে চাহেন, ইহারা সাক্ষাৎভাবে কোনো উত্তর দান করিবেন না; কিন্তু কেন্দ্রসমিতিকে যুক্তবঙ্গের সর্ব্ববিধ কার্য্য করিবার ভার অর্পণ করিয়াছেন বলিয়া, গবর্মেণ্টকে ঐ কেন্দ্রসমিতির নিকট পরামর্শ লইতে বলিবেন। গবর্মেণ্ট হয় ত এইরূপ কোনো সমিতির অধিকার গ্রাহ্য করিতে চাহিবেন না; তাহাতে আমাদেরই বা ক্ষতি কি? কথা শুনিতে চান তাঁহারা, পরামর্শ আবশ্যক তাঁহাদের—আমাদের পরামর্শ লইতে হইলে আমাদের মতে, আমাদের প্রণালী-অনুযায়ী লইবেন, না গ্রহণ করেন, তথাস্তু।

আমাদের পরামর্শ ইংরেজ কেমন শোনে, আমাদের মতামতের খাতির ইংরেজ কতটা করে, তা এই বঙ্গভঙ্গসম্বন্ধীয় ব্যাপারে সবিশেষ জানিয়াছি। সুতরাং ইংরেজ আমাদের কথা শুনিতে পাইল কি না পাইল, তাহাতে আর এখন কিছুই আসে-যায় না। শোনে, তারই ভাল। না শোনে, সে-ই অন্ধকার থাকিবে—তার জন্য দায়ীও সে নিজে।

প্রাদেশিক-সমিতিকে এইজন্য যুক্তবঙ্গের সর্ব্ববিধ রাষ্ট্রীয়কার্য্যের একমাত্র মুখপাত্ররূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। এই সমিতির স্থায়ী কর্ম্মিসভার দ্বারাই উভয় বঙ্গের গবর্মেণ্টের সঙ্গে আমাদের যাহা-কিছু কাজ, সকলই করিতে হইবে। গবর্মেণ্টও ইহার অধিকার অস্বীকার করিতে পারিবে বলিয়া বোধ হয় না।

এইরূপভাবে, প্রাদেশিক-সমিতিকে গড়িয়া তুলিলে, নবযুগের এই নবীনশক্তির প্রতিষ্ঠায় ইহা অক্ষয়কীর্ত্তি লাভ করিবে। আর যদি এখনো ইহা পূর্ব্বপথেই পরিক্রম করে, ইহার শক্তিহানি ও আশুবিলোপ অনিবার্য্য। দুই পথ সমিতির সম্মুখে বিস্তৃত হইয়া আছে;—এক

মৃত্যুর পথ ও বন্ধনের পথ, অপর মুক্তির পথ ও অমৃতের পথ। বরিশালে দেখা যাইবে, এবারে আমাদের প্রাদেশিক রাজনীতি কোন্ পথ অবলম্বন করে।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

রাজতপস্বিনী।

[জীবনীপ্রসঙ্গ]

১২

কুমারের পলায়নঘটনা—সে আজ ২৮।২৯ বছরের কথা, কিন্তু যেন কাল বলিয়া মনে হইতেছে। সেদিন পুটিয়ায় বড় দুর্দ্দৈব উপস্থিত। চারি-আনির রাজা পরেশনারায়ণ অন্তিমশয্যায় অজ্ঞান—তাঁহাকে গোবিন্দজীর বাটীতে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। তথায় প্রাঙ্গণস্থ নাটমন্দিরে চিকিৎসক ও কর্ম্মচারিগণে পরিবৃত হইয়া সমস্ত রাত্রি কোনরূপে তাঁহার কাটিয়াছে। নাটমন্দিরের দুইদিকে রাজমাতা ও বধূরাণীর পট্টাবাস পড়িয়াছে, তাঁহারা বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে থাকিয়া রাজার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। প্রত্যূষে পিতৃদেবমহাশয়ের সঙ্গে সেখানে গেলাম। স্বর্গীয় পিতামহ পরেশ-নারায়ণের নাবালকী অবস্থায় কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের অধীনে তাঁহার অছি-ম্যানেজার নিযুক্ত হন—এবং তিনি দেহত্যাগ করিলে পিতাঠাকুর-মহাশয় প্রথমে সেই কার্য্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে পাঁচ-আনির ষ্টেটও তাঁহার হস্তে অর্পিত হইয়াছিল। অতএব রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণের মত রাজা পরেশনারায়ণ রায়ও আবাল্য তদীয় স্নেহপ্রীতির পাত্র ছিলেন। পরেশ-নারায়ণের জ্যেষ্ঠভ্রাতা বাল্যে স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন, পিতৃদেবের নামে তাঁহার নাম। রাজমাতা সেইজন্য তাঁহাকে পুত্রসম্বোধন করিতেন এবং চিরদিন সন্তানবৎ তাঁহার হিতাকাঙ্ক্ষিণী ছিলেন। রাজার পীড়াবৃদ্ধি হইলে পিতৃদেবমহাশয়কে অধিকাংশসময় কয়দিন চারি-আনির বাটীতে কাটাইতে হইয়াছে।—এই প্রভাতে রাজার শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া তিনি অশ্রুমোচন করিতেছিলেন। রাজ-মাতা পর্দ্দার অন্তরালে থাকিয়া তাঁহাকে মর্ম্মভেদী করুণকণ্ঠে বারংবার বলিতেছিলেন—"বাবা, পরেশকে বাঁচাও!" এই শোকের দৃশ্য আমি সহ্য করিতে পারিতেছিলাম না। সহসা পাঁচ-আনির বাড়ীর বক্সীমহাশয় দ্রুত-পদে আসিয়া পিতাঠাকুরমহাশয়ের সঙ্গে আমাকেও একটু একান্তে লইয়া গেলেন এবং সংবাদ দিলেন, কুমার রাত্রে কোথায় পলায়ন করিয়াছেন। আমরা তাড়াতাড়ি রাজবাটীতে গিয়া দেখি, হুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছে, একটি অনুচরমাত্র সঙ্গে তিনি কোথায় চলিয়া গিয়া-ছেন। যাহারা সর্ব্বদা কাছে-কাছে থাকিত,

তাহারাও ঘুণাক্ষরে জানিতে পারে নাই। অন্দরমহলে প্রবেশ করিয়া দেখি, মাতা শোকে-দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়াছেন। তিনি বলিতে-ছিলেন,"আমার কাছে স্নেহযত্নের ত্রুটি হইয়াছে,—নহিলে কোকা এভাবে যাইবে কেন?" তৎক্ষণাৎ আদেশ হইয়া গেল, চারিদিকে লোকজন পাঠাও, অর্থের মায়া করিও না। দেখিতে দেখিতে নানা যানে কর্ম্মচারীরা ও ভৃত্যবর্গ চতুর্দ্দিকে বাহির হইয়া গেল। মহারাণীমাতার ইচ্ছামত আমি নাটোরষ্টেশনে গিয়া যেখানে যেখানে কুমারের গমন সম্ভব, সর্ব্বত্র তার দিলাম। তার পর অপরাহ্নের ট্রেণে কলিকাতায় গিয়া পরদিন সেখানে অনুসন্ধান আরম্ভ করিলাম। দুইদিনের পর তারযোগে খবর পাওয়া গেল, আত্রাই-ষ্টেশনের নিকটে কুমারকে পাওয়া গিয়াছে। আবার তার দিবার ও সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন প্রত্যাহার করিবার পালা আমারই। উত্তরে দার্জ্জিলিং, পশ্চিমে বেনারস পর্য্যন্ত প্রায় প্রত্যেক ষ্টেশনে রাজবাটীর লোক—খবরের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। রাজধানীর ইংরেজী-বাঙ্‌লা সংবাদপত্রের আপিসে-আপিসে ঘুরিয়া-ঘুরিয়া বিজ্ঞাপন তুলিয়া লইলাম—কিন্তু মফস্বলে তারযোগে সে কাজটা ভাল সম্পন্ন হইল না। তাহার ফলে, ২।৩খানি প্রাদেশিক কাগজে পরদিন পলায়নের খবরটা বাহির হইয়া পড়িল।

কুমার ফিরিয়া আসিলে মহারাণীমাতা বুঝিতে পারিলেন, কি উদ্দেশ্যে এবং কাহাদের পরামর্শে তিনি গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু চক্ষুলজ্জায় তিনি কাহাকেও কিছু বলিতে পারিলেন না। কুমার অধিকতর আদুরে হইয়া উঠিলেন—তাঁহার সঙ্গীদেরও সাহস বাড়িয়া গেল। প্রধান কর্ম্মচারীরা কঠোর শাসনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিলে কি হয়, মাতার স্নেহাতিশয্যে কেহ কিছু করিতে পারিলেন না। অন্য এক সরিকের প্রবীণা রাণীঠাকুরাণী বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, "পোষ্য-পুত্র বিগ্‌ড়াইতে বসিয়াছে, তার জন্য অত মায়া কেন?" মহারাণী উত্তর করিলেন, "যদি গর্ভজাত ছেলে হইত—কি করিতাম?"

মহারাণী এই সময়ে যে ভ্রম করিয়াছিলেন, পরে তাহার আর অপনোদন হইল না এবং চিরদিন সেজন্য তাঁহাকে ভুগিতে হইয়াছিল।

সেই অবধি কুমারের ভয় একেবারে ভাঙিয়া গেল। যখন-তখন তিনি মহারাণী-মাতাকে নামমাত্র জানাইয়া সদলবলে বাহির হইয়া পড়িতেন, এবং এরূপ নিষিদ্ধ কাজে হাত দিতেন, যাহাতে মাতার মর্ম্মপীড়া অবশ্য-ম্ভাবী হইয়া উঠিত। একদিন খবর পাওয়া গেল, নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামের বারোয়ারি-তলায় রাজবাটীর তাঁবু খাড়া হইয়াছে। স্থান-টার তেমন সুনাম ছিল না। কুমারের সহচরদের ভিতর দুইএকজন বয়োবৃদ্ধও ছিল। একজন রাজার আমলের লোক, রাজান্তঃপুরে তাহার প্রবেশাধিকার ছিল, এবং মহারাণী-মাতা তাহাকে লজ্জা করিলেও সে সম্মুখে আসিতে পাইত। শিবিরসংস্থাপনের জনরব প্রচারিত হইতে না হইতে সেই ক্ষুদ্রকায় প্রবীণ ব্রাহ্মণ মাতাকে জানাইল, তাহারা সকলে ** গ্রামে যাইবে। মা জিজ্ঞাসা করাইলেন, কুমারসুদ্ধ নাকি? সে বলিল, না। মা আবার বলাইলেন, সেখানে কোকনেরও গিয়াই কাজ নাই, গেলে লোকে নিন্দা করিবে।

বৃদ্ধটি কথার ছলে মহারাণীর অভিপ্রায় বুঝিতে আসিয়াছিল, মা তাহা উপলব্ধি করিয়া স্পষ্ট-কথায় নিষেধ করিলেন। ইহাতে সে কিঞ্চিৎ রাগিয়া গেল। বলিল, "বারোয়ারি কোথায় না হয়?" তার পর কত উদাহরণ দিল। আমরা মার কাছে বসিয়া ছিলাম, বুড়ার ধৃষ্টতায় ভারি বিরক্তিবোধ হইতেছিল। সে আপন মনে বকিয়া বকিয়া শেষে চলিয়া গেল। মা তখন অবগুণ্ঠনমোচন করিয়া তাহার পিছু-পিছু লোক পাঠাইলেন এবং বলিয়া দিলেন, যে কথা হইয়াছে, তা কুমারকে যেন বলা না হয়। পরে আমাদিগকে বলিলেন, "কেনই বা বলিলাম!"

আর একদিন এই ব্রাহ্মণটি আসিয়া মার কাছে জানাইল, কোন লোকের পিতৃশ্রাদ্ধে কিছু সাহায্যের প্রয়োজন। মা আমার দ্বারা বলাইলেন, কোকনকে জানান হউক, তিনি সে সব কিছুতে আর হাত না দেন। ব্রাহ্মণ তথাপি ছাড়ে না, জেদ্ করিতে লাগিল। কিন্তু মহারাণী শুনিলেন না। সে চলিয়া গেলে আমায় বলিলেন, "কোকা হুকুম দিয়াছে, দুইটাকার বেশী আর দান হইবে না।"

দূরদেশভ্রমণের ইচ্ছা হইলে কুমার ইদানীং মহারাণীমাতাকে সঙ্গে যাইবার জন্য জেদ্ ধরিতেন, তাঁহার ইচ্ছা-অনিচ্ছা বিবেচনা করিতেন না। একদিন প্রাতে মার কাছে শুনিলাম, গতরাত্রে কুমার প্রস্তাব করিয়াছেন যে, মাকে শ্রীবৃন্দাবন যাইতে হইবে, তিনিও সদলবলে যাইবেন। তীর্থবাসের জন্য মহারাণী-মাতা সর্ব্বদাই প্রস্তুত, কিন্তু সেভাবে যাইতে আদৌ ইচ্ছুক ছিলেন না। তিনি কুমারকে বলিয়াছিলেন, তাঁর যেরূপ অভ্যাস হইয়াছে, অনায়াসে মাকে ফেলিয়া সদলে আজ পাঞ্জাব, কাল বোম্বে বেড়াইতে যাইবেন। আরো অনেক আপত্তি তিনি তুলিয়াছিলেন, কিন্তু কুমার হাতে-পায়ে ধরিয়া নিরস্ত করিয়াছেন। এই সব কথা হইতেছে, এমনসময় কুমার স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত। আমার এবং সান্যালমহাশয়ের দিকে তাকাইয়া মা বলিলেন, "কোকনের যাহা দোষ, তাহা বলি। এখানে যেমন, সেখানে সেইরূপ মাঝে-মাঝে পলাইলেই আমি নিরুপায়।" কুমার বলিলেন, তিনি স্বীকার করিতেছেন যে, পলাইবেন না। যাহা হউক, এই যাত্রা পরে স্থগিদ হইল।

আর একবার কুমার জেদ্ ধরিলেন, একাকী তিনি অযোধ্যা যাইবেন। মহারাণী অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া আমাদিগকে বলিলেন, গেলে যে উহাকে ফিরিয়া পাইব, সে আশা নাই। শরীর শোধরাইবার জন্য মুঙ্গের, বৈদ্যনাথ প্রভৃতি স্থানে গেলে ত হয়। অথবা পদ্মার ধারে যে সব স্বাস্থ্যকর স্থান আছে, সেখানে বেড়াইলেও চলিত! * * যাহারা কুমারের সহগামী হইবে, তাহাদের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন, তারা ত সর্ব্বনাশ করিবে। পরে কহিলেন, তিনি বলিয়াছেন, রাজবাটীতে তিনি থাকিতে পারিবেন না। যাহা হউক, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা এ যাত্রায় প্রতিবন্ধক হইলেন। পরদিন প্রাতঃকালে মহারাণীমাতাকে দর্শন করিতে গেলাম। অনেকে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কুমারের অযোধ্যাগমনের প্রস্তাব লইয়া বড় গোল উঠিয়াছে। যাহারা ইহাতে তাঁহাকে প্রবৃত্ত করাইয়াছে, তাহাদের উপর মাতার বিরক্তির সীমা নাই। কুমার নিবৃত্ত হইতে চান না, কিন্তু কোন কোন ব্রাহ্মণপণ্ডিত

বলিয়াছেন যে, ছয়মাসমধ্যে তাঁহার কয়টা রিষ্টি আছে। কাজেই তাহার নাশার্থ কিছু না করিলে নহে। কেহ কেহ সন্দেহ করিতে-ছিলেন, উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া পণ্ডিতমহাশয়েরা একহাত লাভের পন্থা দেখিতেছেন, কিন্তু মহারাণী অবশ্য তাহা বুঝিতেছিলেন না। রিষ্টিনাশোপলক্ষে যাহা-কিছু করণীয়, সকলেরই অনুষ্ঠান করিবার আদেশ হইয়া গেল। গণক-গণ বলিয়াছিল যে, প্রাণসংশয় হইবে, কিন্তু সে কথা তাঁহার নিকট গোপন করা হইতেছে, মার বিশ্বাস ইহাই। তাঁহার চক্ষু জলে ভাসিতেছিল।

আবার পরদিন প্রাতে রাজান্তঃপুরে গিয়া দেখি, অবস্থা পূর্ব্ববৎ। একাদশীর উপবাস ও কুমারের রিষ্টিসংক্রান্ত চিন্তায় মাতার মূর্ত্তি শীর্ণ ও মলিন দেখাইতেছিল। স্থির হইয়াছিল, রিষ্টিনাশার্থ দুইপ্রকারের যাগ হইবে, বৈষ্ণব ও তান্ত্রিক। তান্ত্রিকমতে তাঁহার যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল না, কিন্তু ব্রাহ্মণগণের ব্যবস্থায় দুইয়েরই অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

এ সকলে কিন্তু কুমারের যাত্রা স্থগিদ হওয়ার কোন সম্ভাবনা দেখা গেল না। মা বলিতেছিলেন, "আমার অনুরোধ শুনিবে কেন? আমরা ত কেহ নহি। তা দূর হোক্, বিবাহ পর্য্যন্ত করে নাই।" এই কথাকয়টিতে আমি মহারাণীমাতার আন্তরিক বেদনা অনুভব করিলাম। কুমার তাঁহার মতে বিবাহ করেন নাই, ইহা লইয়া বাহিরের লোককে আলোচনা করিতে শুনিতাম, কিন্তু মার মুখে ইতিপূর্ব্বে সে কথা আর কখন ব্যক্ত হয় নাই। আমি বলিলাম, "মা যদি বুঝিতেছেন যে, যাওয়ার ফল বিশেষ অনিষ্টকর হইবে, তবে আপনিই কেন জেদ্ করুন না? জেদ্ না করিলে চলিবে কেন?" মা উত্তর করিলেন, "কি করিব? কোকন কাল আমায় বলিয়াছিল, যদি আমি না যাইতে দিবার জন্য জেদ্ করি, তবে লুকাইয়া যাইবে।" পরে অতি মৃদুভাবে আবার বলিলেন যে, গোপনে তিনি জানিতে পারিয়াছেন, উইল পর্য্যন্ত নাকি হইতেছে। খস্ড়া হইয়া রামপুর গিয়াছে, ইহা তিনি শুনিয়াছেন। * * কে জিজ্ঞাসা করিলে বলে, সে সব কথায় এখন তাঁর দরকার কি? পুনশ্চ মা বলিলেন, "দেখ বাপু, উহাকে শিশুকাল হইতে পালন করিলাম। এতদিন উহার জন্য বিষয়ভার বহন করিলাম। কোষ্ঠীতে যেমন দেখা যাইতেছে, বেশীদিন আর বাঁচে বোধ হয় না। আমি কি করিব? মানুষ কাহারো না কাহারো আশায় বিষয়-আশয় করে। যদি কিছু হয়, আমি এই বিষয়ের মধ্যে কদাপি থাকিব না।" মার চক্ষু জলে পূর্ণ হইল।

ইহা এখানে বলা আবশ্যক যে, কুসংসর্গের মোহে পড়িয়া কুমার অনেকসময় মহারাণী-মাতাকে কষ্ট দিতেন বটে, কিন্তু তিনি বাস্তবিক তাঁহাকে আন্তরিক ভক্তি করিতেন। নানা কার্য্যে ও ব্যবহারে ইহা বুঝা যাইত। এরূপ মাতার স্নেহক্রোড়ে আশৈশব লালিত-পালিত হইয়াও তিনি মানুষ হইতে পারেন নাই, ইহা অবশ্য অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। কিন্তু মাতৃচরিত্রের স্নিগ্ধজ্যোতিঃপ্রভাবে তাঁহাতেও মধ্যে মধ্যে মহত্ত্বের উন্মেষ দেখা দিত।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার।

ধর্ম্ম, সমাজ ও স্বাধীনচিন্তা।*

কারণাদ্ধর্ম্মমন্বিচ্ছেন্ন লোকচরিতং চরেৎ।

মহাভা ১২।২৬১।৫৩

ধর্ম্ম কি? ইংরেজ দার্শনিক মার্টিনো (Dr. Martineau) বলিয়াছেন—"নিত্য পরমেশ্বরে বিশ্বাসের নাম ধর্ম্ম অর্থাৎ বিশ্বনিয়ন্ত্রী কর্ম্মফল-দাত্রী ঐশী চিচ্ছক্তি ও ক্রিয়াশক্তিতে বিশ্বাসই ধর্ম্ম।" এই বিশ্বাস কেবল জ্ঞান নহে। ইহাতে জ্ঞান, ভক্তি এবং অনুষ্ঠান, সকলই তুল্যরূপে বিদ্যমান আছে। ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকিলে, দৃঢ় বিশ্বাস থাকিলে, মনে-প্রাণে বিশ্বাস থাকিলে, আগুনের দাহিকা শক্তিতে আমরা যেরূপ বিশ্বাস করি, সেইরূপ দৃঢ়বিশ্বাস থাকিলে, কে না তাঁহাকে ভক্তি করে? কে না তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করে? কে না দয়া, দাক্ষিণ্য, সত্যনিষ্ঠা, অহিংসা, ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতির অনুষ্ঠান করে? তখন—

'নামে রতি, জীবে দয়া, বৈষ্ণবসেবন'

আপনা-আপনি আসিয়া পড়ে। তাই আমরা প্রধানত, ঈশ্বরে বিশ্বাস বা ভক্তিকেই ধর্ম্ম বলিয়া ধরিব, এবং গৌণত, ঈশ্বরে ভক্তির স্বাভাবিক-ফলস্বরূপ মানবের চিত্তবৃত্তির উৎকর্ষ —অর্থাৎ অহিংসা, সত্য, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ প্রভৃতি-কেও ধর্ম্ম বলিয়া ধরিব †। যদি এই গুণগুলি ঈশ্বরে বিশ্বাস ভিন্নও কুত্রাপি উপলব্ধ হয়, তথাপি তাহাকে ধর্ম্ম বলিব। ইংরেজিতে যাহাকে morality বলে, ধর্ম্মের প্রাণ না হইলেও তাহা যে ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।' ঐ morality বা নীতিই ধর্ম্মশব্দের গৌণ এবং দ্বিতীয় অর্থ।

স্বাধীনচিন্তা কি? যাহা শাস্ত্রে' আছে, গুরুমহাশয় যাহা বলিয়া দিয়াছেন, তাহাই সত্য—তাহা নিঃসংশয়ে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে, এইরূপ বিশ্বাসের নাম অন্ধবিশ্বাস। স্বাধীনচিন্তা ইহার ঠিক্ বিপরীত। স্বাধীনচিন্তা মানুষকে সব জিনিষ বুঝিয়া লইতে বলে। যাহা না বুঝিব, তাহা গ্রহণ করিব না—এইরূপ দৃঢ়সঙ্কল্প, আর, সকল জিনিষেরই একটা কারণ আছে এবং ঐ কারণ মানুষের জ্ঞানের অবিষয়ীভূত নহে, এইরূপ বিশ্বাসই স্বাধীনচিন্তার মূল। ইংরেজ আমাদিগকে স্বাধীনচিন্তা শিখাইয়াছেন। এখন আর অনুষ্টুভের শ্লোক দেখিলে শিক্ষিতেরা তাহার নিকট অবনত-মস্তক হন না। এখন আর রামায়ণ বা কৃত্তি-বাসের দোহাই দিয়া শিক্ষিতেরা হনুমানের সমুদ্রোল্লম্ফন বা সূর্য্যকে বগলে পোরা বিশ্বাস করেন না। স্বাধীনচিন্তায় বলে—'সব জিনিষই বুঝা যাইতে পারে।' আমাদের দেশের লোকের এবং দার্শনিকদের বিশ্বাস—"ধর্ম্ম

---

* গীতাসভায় পঠিত।

† অহিংসা সত্যমস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
এতং সামাসিকং ধর্ম্মং চাতুর্ব্বর্ণ্যেঽব্রবীন্মনুঃ।

মনু, ১০।৬৩

মানববুদ্ধির অগোচর। প্রত্যক্ষ এবং অনুমান দ্বারা ধর্ম্মের নির্ণয় হয় না। ধর্ম্মাধর্ম্ম-নির্ণয়ে শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ।"

'তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।'

গীতা ১৬।২৪

'প্রত্যক্ষেণানুমানেন যস্তূপায়ো ন বোধ্যতে।
এতং বিন্দন্তি বেদেন তস্মাদ্বেদস্য বেদতা॥'

ঋগ্বেদের ভাষ্যের উপক্রমণিকাধৃত বচন।

'প্রত্যক্ষানুমানানধিগতবস্তুতত্ত্বান্বাখ্যানং শাস্ত্রধর্ম্মঃ।'

ন্যায়বার্ত্তিক।

এইরূপে স্বাধীনচিন্তা এবং আমাদের শাস্ত্র-সম্বন্ধীয় ধারণা ঠিক্ বিপরীত।

আজকাল অনেকে বলেন যে, আমরা কেবল মনু, জৈমিনি ও ব্যাসকে ছাড়িয়া কান্ত্ (Kant), মিল্ (Mill) এবং স্পেন্‌সারকে (Spencer) ধরিয়াছি মাত্র, কিন্তু এখনও আমরা প্রকৃত স্বাধীনচিন্তায় উপনীত হইতে পারি নাই। এ কথা সম্পূর্ণ ঠিক্ নহে। আমরা কান্ত্ বা মিলের উক্তিকে উহাদের উক্তি বলিয়াই বিশ্বাস করি না। কান্ত্ বা মিল্ যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা আমাদের ভাল লাগে, তাহাতে আমাদের আত্মতুষ্টি হয়, এইজন্যই কান্ত্ বা মিলের উক্তিতে আমাদের আস্থা। সকলেই সর্ব্বশেষে নিজের উপর নির্ভর করে। কান্ত্ বা মিল্ বলিয়াছেন, কেবল এইজন্যই কোন কথা সত্য বলিয়া গৃহীত হয় না। আমরা কান্ত্ এবং মিল্-কেও পরীক্ষা করি এবং তাঁহাদের যে যে অংশ যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়, তাহাই গ্রহণ করি। একাদশীতে উপবাস করি, কেন না, তাহা শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। "হিতবাদ" বা Doctrine of Utility মানি, কেন না, উহা ভাল লাগে,—উহাতে "আত্মতুষ্টি" হয়। তবে মিল্ বা কান্ত্ কোন কথা বলিলে, তাহা সহজে উড়াইয়া দিই না। উঁহারা স্ব স্ব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ (Expert)। বিশেষজ্ঞের সাক্ষ্য বলিয়া উঁহাদের বাক্যে সমধিক মনোযোগ দিই। কিন্তু যদি উঁহাদের সিদ্ধান্ত বিশেষ মনোযোগের সহিত বুঝিয়াও যুক্তিযুক্ত মনে না করি, তবে শত কান্ত্ বা শত মিল্‌ও আমাদিগকে ঐ ঐ সিদ্ধান্তে আস্থাবান্ করিতে পারেন না। ভারতীয় ঋষিরা এইরূপে "আধ্যাত্মিক বিষয়ে" Expert বা বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তাঁহারা পরলোক, সূক্ষ্মদেহ প্রভৃতি সম্বন্ধে যে সকল সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা বিশেষ মনোযোগের সহিত বুঝিতে হইবে। একবারে না হউক, দশবারে না হউক্, শতবার চেষ্টা করিয়া দেখিব, তাঁহাদের লিখিত আপাতদুর্বোধ কথাগুলির মধ্যে কোন সত্য আছে কি না। ইহাই স্বাধীনচিন্তার লক্ষণ।

এইরূপে ধর্ম্ম এবং স্বাধীনচিন্তা, এই শব্দ-দুইটি বর্ত্তমান প্রবন্ধে কিরূপ অর্থে ব্যবহৃত হইবে, মোটামুটি তাহার একটা আভাস দিয়া আমরা "ধর্ম্ম, সমাজ ও স্বাধীনচিন্তা" সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

আমাদের দার্শনিকেরা বলেন, "চোদনা-লক্ষণোঽর্থো ধর্ম্মঃ" (পূর্ব্বমীমাংসাসূত্র ১।১।১), "বেদৈকপ্রতিপাদ্যোঽর্থো ধর্ম্মঃ" (শূলপাণি—প্রায়শ্চিত্তবিবেক), অর্থাৎ যাহার অনুষ্ঠান বেদে উপদিষ্ট হইয়াছে অথচ যাহার অনুষ্ঠানে মানুষের অভ্যুদয় বা উন্নতি হয়, তাহারই নাম ধর্ম্ম। বেদে যাহা যাহা উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা সকলই ধর্ম্ম নহে। বেদে উপদিষ্ট শ্যেন-যাগ প্রভৃতিতে মানুষের প্রকৃত উন্নতি হয় না—

তাই উহা দ্বারা শত্রুবধ প্রভৃতি সাংসারিক উদ্দেশ্য সফল হইলেও উহারা ধর্ম্ম নহে, উহারা অনর্থজনক, উহারা অর্থ নহে। যাহাতে অভ্যুদয়, শ্রেয় বা মঙ্গল হয়, তাহাই অর্থ। "কোঽর্থো যোঽভ্যুদয়ায়" (শবরভাষ্য)। কিন্তু যাহাতে যাহাতে অর্থ, অভ্যুদয় বা সুখ হয়, অর্থাৎ যাহা যাহা প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহা সমস্তই ধর্ম্ম নহে। 'বেদৈক-প্রতিপাদ্য' না হইলে উহাদিগকে ধর্ম্ম বলে না। যেমন ভোজন। লৌকিক প্রয়োজন ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য ভোজনের অনুষ্ঠান। উহা 'বেদৈকপ্রতিপাদ্য' নহে। অতএব উহা ধর্ম্ম নহে।

বস্তুত এই মতে, কি ধর্ম্ম, কি অধর্ম্ম, তাহা জানিবার জন্য বেদই একমাত্র মূল উপায়। তার পর বেদাবিরোধী স্মৃতি (পুরাণ ও স্মৃতি), শিষ্টাচার এবং আত্মতুষ্টি।

বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।
এতচ্চতুর্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাদ্ধর্ম্মস্য লক্ষণম্॥

(মনু ২।১২)

শ্রুতি বা স্মৃতিতে যে বিষয় উপদিষ্ট হয় নাই, এইরূপ বিষয়ে, কি ধর্ম্ম, কি অধর্ম্ম, জানিতে হইলে শিষ্ট ব্রাহ্মণের আশ্রয়গ্রহণ করিতে হইবে। তাঁহারা যাহাকে ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিবেন, তাহাই ধর্ম্ম। এখানেও পরের উপর ধর্ম্মাধর্ম্মনির্ণয়ের ভার ন্যস্ত হইল।

অনাম্নাতেষু ধর্ম্মেষু কথং স্যাদিতি চেদ্ভবেৎ।
যং শিষ্টা ব্রাহ্মণা ব্রূয়ুঃ স ধর্ম্মঃ স্যাদশঙ্কিতঃ॥

মনু ১২।১০৮

ধর্ম্মের এইরূপ ধারণা হিন্দুর মজ্জাগত। যাহা শাস্ত্রে আছে তাহা ধর্ম্ম, যাহা নাই তাহা ধর্ম্ম নহে। শাস্ত্রে অবিচলিত শ্রদ্ধা না থাকিলে এ-লক্ষণাক্রান্ত ধর্ম্ম মানুষের কোন প্রয়োজনে আইসে না এবং ধর্ম্মসম্বন্ধে এইরূপ ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গেলে ক্রমে সমাজ স্বাধীনচিন্তা হারাইয়া ফেলে। তখন শাস্ত্রের ব্যাখ্যা এবং কথার কাটাকাটিই দর্শনশাস্ত্রের মূলবিষয় হইয়া দাঁড়ায়। ধর্ম্মাৎ পরতরং ন হি—ধর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ পদার্থ আর নাই। ইংরেজিতে বলে, "তুমি কাহার সংসর্গে কাল কাটাও, বল, আমি তোমার কিরূপ স্বভাব, তাহা বলিয়া দিতেছি।" অর্থাৎ সংসর্গ দেখিয়া মানুষের স্বভাবনির্ণয় হয়। আমরা বলিতে পারি, "তুমি কোন্ ধর্ম্মে আস্থাবান্, কোন্ কোন্ বিষয়ে তোমার যথার্থ বিশ্বাস আছে, বল, আমি তোমার যথাসর্ব্বস্ব বলিয়া দিতেছি।" বস্তুত ধর্ম্মই মনুষ্যজীবনের সর্ব্বাপেক্ষা বড় জিনিষ। ইহা যদি সঙ্কীর্ণ, স্বার্থপর, পরাধীন হয়, তবে সেই মানুষ বা সেই সমাজ কখনই উদার, প্রেমিক বা স্বাধীন হইতে পারে না। ধর্ম্মে যদি মানবের চিন্তা-স্রোতের স্বৈরসঞ্চারে বাধা দিয়া উহাকে শাস্ত্রের গণ্ডিতে প্রবাহিত হইতে বলে, তবেই বুঝিবে, ঐ-ধর্ম্মাবলম্বী লোকেরা ক্রমে জ্ঞানালোক হারাইয়া, অজ্ঞানরূপ অন্ধতামিস্রে ডুবিয়া যাইবে এবং বিষয় ছাড়িয়া কথা লইয়া মারা-মারি করিবে।

পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তদনুসারে হিন্দুর দশবিধ সংস্কার, সন্ধ্যাহ্নিক, বারমাসের তের পার্ব্বণ, দোলদুর্গোৎসব, কালীপূজা, লক্ষ্মীপূজা, যমবুড়ীর ব্রত, তিলগুজারের ব্রত—সবই ধর্ম্ম। এইরূপ সংখ্যাতীত ক্রিয়াকলাপই ধর্ম্ম। তাই সুপ্রসিদ্ধ লৌগাক্ষিভাস্কর বলিলেন—

"অথ কো ধর্ম্মঃ কিং তস্য লক্ষণম্ ইতি চেদুচ্যতে যাগাদিরেব ধর্ম্মঃ।"

বস্তুত সাধারণ হিন্দু এইগুলিকেই ধর্ম্ম বলিয়া ধরে; এতদ্ব্যতীত সর্ব্ববর্ণসাধারণ সত্য, অহিংসা, শৌচ প্রভৃতিকে বড়-একটা আমল দেয় না। ধর্ম্মের বাহ্য আড়ম্বরকে—ক্রিয়াকলাপকেই—ধর্ম্ম বলিয়া মনে করা যে কেবল সাধারণ হিন্দুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ, এরূপ নহে। ইয়ুরোপের প্রাকৃতজনের পক্ষেও ঠিক্ ঐ কথা বলা যাইতে পারে। আমাদের এরূপ হইল কেন?

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—

"অহিংসা সত্যমস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
দানং দমো দয়া ক্ষান্তিঃ সর্ব্বেষাং ধর্ম্মসাধনম্॥"

১।১২২

মহর্ষি মনু বলিয়াছেন—

"চতুর্ভিরপি চৈবৈতৈর্নিত্যমাশ্রমিভির্দ্বিজৈঃ। *
দশলক্ষণকো ধর্ম্মঃ সেবিতব্যঃ প্রযত্নতঃ॥
ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণম্॥"

৬।৯১—৯২

বিষ্ণু, ব্যাস, বৃহস্পতি প্রভৃতির ধর্ম্মশাস্ত্রে এবং মহাভারতাদিতেও ঠিক্ এইরূপ বিধান দেখা যায়। এগুলি সকল মানবের—সকল বর্ণের—সকল আশ্রমের সাধারণ ধর্ম্ম। এগুলি পালন না করিলে মানুষ মানুষপদবাচ্যই হইতে পারে না। চণ্ডালকেও এ "ধর্ম্মদশটি" পালন করিতে হইবে। আগে মানুষ হও, পরে মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হইবে। অগ্রে সত্য, শৌচ, দয়া, অহিংসা প্রভৃতির অনুশীলন কর, পরে ব্রাহ্মণোচিত সন্ধ্যাহ্নিকে মনোনিবেশ করিবে। যে মানুষ নয়, সে ব্রাহ্মণ হইবে কিরূপে? মানুষ একটি ব্যাপক শ্রেণী Genus। এই ব্যাপক শ্রেণীর নিখিলধর্ম্ম বিদ্যমান না থাকিলে ব্যাপ্য (Species) ব্রাহ্মণশ্রেণীতে প্রবেশই অসম্ভব। ধর্ম্মধ্বজী, মিথ্যাবাদী, ব্রাহ্মণ-নামধারী জীব মানুষই নহে। সে উপবাসে দেহপাত করুক—সন্ধ্যাতর্পণে অষ্টপ্রহর কাটাক্—তথাপি সে ব্রাহ্মণ নহে। মহর্ষি অত্রি বলিয়াছেন—

যমান্ সেবেত সততং ন নিত্যং নিয়মান্ বুধঃ।
যমান্ পতত্যকুর্ব্বাণো নিয়মান্ কেবলান্ ভজন্॥ ৪৭॥
আনৃশংস্যং ক্ষমা সত্যমহিংসা দানমার্জবম্।
প্রীতিঃ প্রসাদো মাধুর্য্যং মার্দ্দবঞ্চ যমা দশ॥ ৪৮॥
শৌচমিজ্যা তপো দানং স্বাধ্যায়োপস্থনিগ্রহঃ।
ব্রতমৌনোপবাসাশ্চ স্নানঞ্চ নিয়মা দশ॥ ৪৯॥

ঋষিদের এই যুক্তিযুক্ত উপদেশ আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। তাই আমাদের এত দুর্গতি।

এ উপদেশ ভুলিলাম কেন? কেন লোকে মনে করে যে, সন্ধ্যাদিই ধর্ম্ম? কেন লোকে সত্যনিষ্ঠা, স্বার্থত্যাগ প্রভৃতিকে মনে আনে না? ইহার কারণ কি? কারণ—আমাদের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ধারণা এবং শাস্ত্রগ্রন্থে অচলা ভক্তি। যেদিন কর্ম্মমীমাংসক আচার্য্য জৈমিনি "চোদনা-লক্ষণোঽর্থো ধর্ম্মঃ" বলিলেন, সেইদিনই আমাদের সনাতন ধর্ম্মের মূলে সুদৃঢ় কুঠারাঘাত আরম্ভ হইল। বেদ—একখানা বা দশখান বই—ইহারা আমাদের ধর্ম্মের প্রমাণ হইয়া দাঁড়াইল। বেদে যাহা লিখে, তাহা ধর্ম্ম—তদিতর ধর্ম্ম নহে—এই বিশ্বাসই আমাদের ধর্ম্মোচ্ছেদের মূলকারণ।

কথাটা খুলিয়া বলিতেছি। 'ধর্ম্ম কি' এ প্রশ্নের শতশত উত্তর হইতে পারে। যদি

* মনুসংহিতার পূর্ব্বোক্ত ১০।৬৩শ্লোকের সহিত একবাক্যতা করিলে সহজেই উপলব্ধ হইবে যে, মনুর ৬।৯১শ্লোকস্থ দ্বিজপদ উপলক্ষণ।

ধর্ম্মকে আত্মার গুণ বলিয়া ধর, যদি ধর্ম্মকে মানসিক বা আধ্যাত্মিক উন্নতির নামান্তর মনে কর, যদি ভাবশুদ্ধিবিহীন কর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিতে সঙ্কুচিত হও, তবে নিশ্চয়ই ধর্ম্মের এরূপ লক্ষণ করিবে, যাহাতে মানবের আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতি চোখ পড়ে। এইজন্য বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুয়ানি শিখাইতে যাইয়াও, ধর্ম্মের হিন্দুকৃত লক্ষণ ছাড়িয়া দিয়া, বিদেশীমাল বাঙালীকে খাঁটি স্বদেশী বলিয়া উপহার দিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

"মনুষ্যের কতগুলি শক্তি [বৃত্তি] আছে।...সেইগুলির অনুশীলন, প্রস্ফুরণ ও চরিতার্থতায় মনুষ্যত্ব। তাহাই মানুষের ধর্ম্ম। এই অনুশীলনের সীমা পরস্পরের সহিত বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্য। এই সমস্ত বৃত্তির উপযুক্ত অনুশীলন হইলে উহারা সকলেই ঈশ্বরমুখী হয়। সেই অবস্থাই ভক্তি ...."

এখানে বাহ্য ক্রিয়াকলাপের নামগন্ধ নাই, কেবল কতগুলি আন্তর বিষয় লইয়া ধর্ম্মের লক্ষণ করা হইয়াছে। অবশ্য আন্তর ভাবগুলি বাহ্যবিষয়ের অবলম্বন না করিয়া অভিব্যক্ত হইতে পারে না। তাই বৃত্তিসকলের অনুশীলনে বাহ্য ক্রিয়াকলাপ আসিয়া পড়ে। হইতে পারে—চতুরাশ্রম, পঞ্চমহাযজ্ঞ, দশবিধসংস্কার প্রভৃতি আত্মবিকাশের—মানবীয় বৃত্তিসমূহের অনুশীলনের প্রকৃষ্ট উপায়। কিন্তু এগুলি উপেয় নহে। ইহাদের দ্বারা ধর্ম্মলাভ হয় সত্য, কিন্তু ইহারা ধর্ম্ম নহে। ইহারা ধর্ম্মের দেহ, আত্মা নহে। ধর্ম্মের লক্ষণ করিতে গিয়া ধর্ম্মের আত্মস্বরূপ আন্তর ভাবগুলিকে—চিত্তশুদ্ধিকে—বৃত্তির অনুশীলনকে ছাড়িয়া দিলে পরিণামে যে ধর্ম্মের ঐ নির্জ্জীবদেহকে—ঐ খোলসকেই—লোকে ধর্ম্মের আত্মা বলিয়া বুঝিবে, তাহাতে বিচিত্র কি? তাই আজ হিন্দুসন্তান ভাবশুদ্ধি অর্থাৎ ঈশ্বরে ভক্তি, সত্যনিষ্ঠা, দয়া, ন্যায়পরায়ণতা প্রভৃতিকে ধর্ম্মের আত্মা বলিয়া বুঝে না; যাহা ধর্ম্মের স্থূলশরীরমাত্র—যাহার অবলম্বনে প্রাচীনকালে ভক্তি, স্বার্থত্যাগ, স্বদেশপ্রীতি প্রভৃতি প্রকটিত হইত বলিয়াই যাহা ধর্ম্ম-আখ্যা লাভ করিয়াছে—সেই সকল বাহ্য ক্রিয়াকলাপ—যাগযজ্ঞ—পূজাআচ্চা - ব্রতনিয়মই—আজ ধর্ম্মনামের একমাত্র অধিকারী। তাই লৌগাক্ষি বলিলেন—"যাগাদিরেব ধর্ম্মঃ।" তাই আমরা অনুষ্ঠানপ্রধান—ক্রিয়াকলাপবহুল—হইয়া পড়িয়াছি। তাই আমাদের খাঁটি ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি নাই।

বেদবিহিত যাগাদিই ধর্ম্ম, তদিতর ধর্ম্ম নহে, এই বিশ্বাসের আর একটি বিষময় ফল নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে। মানুষের অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার ধর্ম্মও একটু বদ্লাইয়া যায়। যাহা বৈদিকযুগে ধর্ম্ম ছিল, তাহা স্মার্ত্তযুগে স্থানভ্রষ্ট হইল; আবার স্মার্ত্তযুগের কর্ম্মগুলি তান্ত্রিক কর্ম্মদ্বারা বিতাড়িত হইল। ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। মহানির্ব্বাণতন্ত্রের প্রথমোল্লাসে ভারতীয় ধর্ম্মের এই ইতিহাসটুকু অতিবিশদরূপে বর্ণিত আছে। যথা—

শ্রীআদ্যোবাচ।
ভগবন্ সর্ব্বভূতেশ সর্ব্বধর্ম্মবিদাং বর।
কৃপাবতা ভগবতা ব্রহ্মান্তর্যামিণা পুরা॥ ১৮॥
প্রকাশিতাশ্চতুর্ব্বেদাঃ সর্ব্বধর্ম্মোপবৃংহিতাঃ।
বর্ণাশ্রমাদিনিয়মা যত্র চৈব প্রতিষ্ঠিতাঃ॥ ১৯॥
তদুক্তযোগযজ্ঞাদ্যৈঃ কর্ম্মভির্ভুবি মানবাঃ।
দেবান্ পিতৄন্ প্রীণয়ন্তঃ পুণ্যশীলাঃ কৃতে যুগে॥ ২০॥
কৃতে ব্যতীতে ত্রেতায়াং দৃষ্ট্বা ধর্ম্মব্যতিক্রমম্।
বেদোক্তকর্ম্মভির্মর্ত্ত্যা ন শক্তাঃ শ্রেষ্ঠসাধনে॥ ৩০॥

বহুক্লেশকরং কর্ম্ম বৈদিকং ভূরিসাধনম্।
কর্ত্তুং ন যোগ্যা মনুজাশ্চিন্তাব্যাকুলমানসাঃ ॥ ৩১ ॥
ত্যক্তুং কর্ত্তুং ন চার্হন্তি সদা কাতরচেতসঃ।
বেদার্থযুক্তশাস্ত্রাণি স্মৃতিরূপাণি ভূতলে ॥ ৩২ ॥
তদা ত্বং প্রকটীকৃত্য তপঃস্বাধ্যায়দুর্ব্বলান্
লোকানতারয়ঃ পাপাৎ দুঃখশোকাময়প্রদাৎ ॥ ৩৩ ॥
ততোঽপি দ্বাপরে প্রাপ্তে স্মৃত্যুক্তে সুকৃতোজ্ঝিতে।
ধর্ম্মার্দ্ধলোপে মনুজে আধিব্যাধিসমাকুলে ॥ ৩৫ ॥
সংহিতাদ্যুপদেশেন ত্বয়ৈবোদ্ধারিতা নরাঃ ॥ ৩৬ ॥
আয়াতে পাপিনি কলৌ সর্ব্বধর্ম্মবিলোপিনি ॥ ৩৭ ॥
কলিকল্মষদীনানাং দ্বিজাদীনাং সুরেশ্বরি।
মেধ্যামেধ্যাবিচারাণাং ন শুদ্ধিঃ শ্রৌতকর্ম্মণা।
ন সংহিতাদ্যৈঃ স্মৃতিভিরিষ্টসিদ্ধির্নৃণাং ভবেৎ ॥ ২।৬
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যং সত্যং ময়োচ্যতে।
বিনা হ্যাগমমার্গেণ কলৌ নাস্তি গতিঃ প্রিয়ে ॥ ২।৭

এই বর্ণনা পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, প্রথমে বৈদিকধর্ম্ম, পরে স্মার্ত্তধর্ম্ম, পরে সংহিতা-*-পুরাণ-প্রতিপাদ্য ধর্ম্ম, পরে তান্ত্রিক-ধর্ম্ম। ভারতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিলে, স্বাধীনভাবেও এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হয়। মন্বাদিপ্রণীত স্মৃতিশাস্ত্রেও যুগভেদে ধর্ম্মভেদের উল্লেখ আছে। যথা—

অন্যে কৃতযুগে ধর্ম্মাস্ত্রেতায়াং দ্বাপরে পরে।
অন্যে কলিযুগে…॥

মনু ১।৮৫ ; মহাভারত ১২।২৫১।৮ ; পরাশর ১।২২

বস্তুত বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মকে বৈদিকধর্ম্ম বলা কেবল লোকসংগ্রহ মাত্র। এমন কি, যুধিষ্ঠিরের সময়েও দেশে বৈদিকধর্ম্ম প্রচলিত ছিল না। যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে বলিতেছেন—

আম্নায়বচনং সত্যমিত্যয়ং লোকসংগ্রহঃ।

মহাভা. ১২।২৫৯।৯

ধর্ম্ম একটি সাংসারিক জিনিষ। অন্যান্য সকল সাংসারিক জিনিষের যেমন উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও ক্ষয় আছে, ধর্ম্মেরও ঠিক্ তাহাই। এইজন্য সকল দেশেই মানুষের অবস্থাপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার ধর্ম্ম বদ্‌লাইয়া যায়। ইয়ুরোপের ইতিহাসেও এই পরিবর্ত্তন উপলব্ধ হয়। রোমক-ধর্ম্ম ও লুথারের ধর্ম্ম একই খৃষ্টধর্ম্মের বিভিন্ন অবস্থার রূপ।

যদি শাস্ত্রকে ধর্ম্মাধর্ম্মনির্ণয়ের একমাত্র উপায় বলিয়া ধরা যায়, তবে অবস্থাপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মের আবশ্যক পরিবর্ত্তন দুষ্কর হইয়া উঠে। কারণ, এরূপ অবস্থায় লোকে ধর্ম্মনির্ণয়ের জন্য নিজের বুদ্ধি খাটায় না, শাস্ত্রেই বিশ্বাস করে। ক্রমে ধর্ম্মসম্বন্ধে স্বাধীনচিন্তা দেশ হইতে দূরে পলায়ন করে। "যাহা পূর্ব্ব-পুরুষেরা করিয়া গিয়াছেন, তাহাই ধর্ম্ম— সমাজে যাহার চল নাই, তাহাই অধর্ম্ম" এইরূপ বিশ্বাস ক্রমে সমাজকে কলঙ্কিত করে। তখন লোকে মহর্ষি মনু এবং অত্রির—

একোঽপি বেদবিদ্ধর্ম্মং যং ব্যবস্যেদ্দ্বিজোত্তমঃ।
স জ্ঞেয়ঃ পরমো ধর্ম্মো নাজ্ঞানামুদিতোঽযুতৈঃ ॥

মনু, ১২।১১৩ ; অত্রি ১৪৪

এই মহাবচন ভুলিয়া গিয়া কথায় কথায়—

যেনাস্য পিতরো যাতা যেন যাতাঃ পিতামহাঃ।
তেন যায়াৎ সতাং মার্গং তেন গচ্ছন্ন রিষ্যতে।

মনু ৪।১৭৮

এই বলিয়া ধর্ম্মসংস্কার ও সমাজসংস্কারে পরাঙ্‌মুখ হয়। সমাজে প্রচলিত অশাস্ত্রীয় আচারব্যবহারও শাস্ত্রীয় বলিয়া গৃহীত হয়

* আধুনিক ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা বলেন যে, বৈদিকযুগের অব্যবহিত পরে ধর্ম্মশাস্ত্র গদ্যে সূত্রাকারে লিখিত হইত। তাঁহাদের মতে, বর্ত্তমান মনুসংহিতাদি শ্লোকে গ্রথিত ধর্ম্মশাস্ত্রগুলি ঐ প্রাচীন গদ্যধর্ম্মশাস্ত্রের অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে। মহানির্ব্বাণতন্ত্রোক্ত স্মৃতি কি তবে ঐ গদ্যধর্ম্মশাস্ত্র (বৌধায়ন, আপস্তম্ব, মূল বিষ্ণুস্মৃতি ইত্যাদি)? সংহিতা কি প্রচলিত পদ্যস্মৃতি?

এবং উহার অশাস্ত্রীয়তাপ্রতিপাদনকারী পুরুষ-শ্রেষ্ঠও নাস্তিক এবং অধার্ম্মিক বলিয়া গণ্য হন। এইরূপে প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণ তপস্বী জাজলি সর্ব্বভূতহিতে রত বৈশ্য মহাত্মা তুলাধারকে নাস্তিক বলিয়া ঠাওরাইয়াছিলেন (মহাভারত ১২।৫৪—৫৬ অধ্যায় দেখুন)। আবার এই-জন্যই বঙ্গে এখনও বিধবাবিবাহের প্রচলন, বহুবিবাহের উচ্ছেদ বা কৌলিন্যপ্রথার বিলয় সাধিত হইল না। লোকে বলে—"বিধবাবিবাহ সমাজে অপ্রচলিত; কাজেই উহা অধর্ম্ম; কৌলিন্যপ্রথার চল আছে, কাজেই উহা ধর্ম্ম। যদি শাস্ত্রে বিধবাবিবাহ প্রতিষিদ্ধ এবং কৌলিন্য-প্রথা সমর্থিত না হইত, তবে অবশ্যই উহারা সমাজে নিন্দনীয় বা প্রশংসনীয় হইত না। অতএব উহারা যথাক্রমে শাস্ত্রনিষিদ্ধ (বা অধর্ম্ম) এবং শাস্ত্রানুমোদিত (বা ধর্ম্ম)।" এইরূপ অদ্ভুত যুক্তির অবতারণা জৈমিনিকৃত ধর্ম্ম-লক্ষণের অবশ্যম্ভাবী ফল। ভারতীয় আস্তিক-দর্শনসমূহের পর্য্যালোচনা করিলে, দার্শনিক-দের মতে, শাস্ত্রের সহিত স্বাধীনচিন্তার কিরূপ সম্বন্ধ থাকা উচিত, তাহা বেশ সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম হয়। ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ, মীমাংসা, বেদান্ত—ইহারা আস্তিকদর্শন। ইহারা সকলেই বস্তুতত্ত্বজ্ঞানবিষয়ে শাস্ত্রকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করে। একই শ্রুতি বা উপনিষৎ সকলেরই উপজীব্য। অথচ প্রত্যেকের দর্শন অপর প্রত্যেকের দর্শন হইতে ভিন্ন। "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" (ছান্দোগ্য), "অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাম্" (শ্বেতাশ্বতর)—এই উভয় শ্রুতির প্রামাণ্য সাংখ্য এবং বেদান্তী উভয়েই মানেন। তবে বেদান্তী প্রথমশ্রুতির অক্ষরার্থ গ্রহণ করেন, এবং দ্বিতীয় শ্রুতিকে, স্বকীয় দার্শনিকমতানুসারে, কষ্টকল্পনা করিয়া ব্যাখ্যা করেন। সাংখ্য দ্বিতীয়শ্রুতিকে নিজের উপজীব্য করিয়া প্রথমশ্রুতির অক্ষরার্থ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন। আবার একই বেদান্তদর্শন নানান্ ভাগে বিভক্ত। শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ, মধ্বাচার্য্য—ইহারা সকলেই শ্রুতির প্রামাণ্যে অবিপ্রতিপন্ন; কিন্তু ইহাদের দর্শনে আকাশ-পাতাল ভেদ। কেহ বা এক বই দুই একে-বারেই মানেন না; কেহ বা একের মধ্যে, একের ক্রোড়গত বহুত্ব স্বীকার করেন; আর কেহ বা অবাধে "প্রপঞ্চো ভেদ-পঞ্চকঃ" বলিয়া বসেন। শ্রুতিকে—শাস্ত্রকে প্রমাণ বলিয়া ধরিলেও দর্শনে এইরূপ মতভেদ হইতে পারে। এই মতভেদ কি কতকটা স্বাধীনচিন্তার সূচক নহে? শঙ্কর, রামানুজ, এবং মধ্বাচার্য্য—ইহারা শাস্ত্র পড়িয়া নিজ নিজ প্রতিভানুসারে জ্ঞাতব্যপ্রপঞ্চসম্বন্ধে একএকটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন; এক-একটি জিনিষ তথ্য বলিয়া বুঝিলেন, এবং ঐরূপ বুঝিয়া সমস্ত শ্রুতিকে তদনুসারে ব্যাখ্যাত করিলেন। শাস্ত্রাধ্যয়ন—স্বাধীনচিন্তা—শাস্ত্র-ব্যাখ্যা—এই হইল ইহাদের মনোবৃত্তির ক্রমিক বিকাশের নিয়ম। বস্তুত, পৃথিবীর সকল দার্শনিকের মনোবৃত্তির অভিব্যক্তিতেই প্রথম দুইটি ক্রম বিদ্যমান থাকে। আধুনিক দার্শনিক-যুগের প্রবর্ত্তক ফরাসীপণ্ডিত দেকার্ত (Des-cartes) প্রথমে তৎকালীন সমস্ত জ্ঞান অর্জ্জন করিলেন (শাস্ত্রাধ্যয়ন)। ইহাতে তাঁহার জ্ঞানপিপাসার নিবৃত্তি হইল না। তিনি নিজে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহারই চিন্তার ফলে ইয়ুরোপে নূতন দার্শনিকযুগ প্রবর্ত্তিত হইল (স্বাধীনচিন্তা)। কিন্তু ইয়ুরোপ

ভারত নহে। তাই দেকার্তকে নিজের দর্শনানুসারে সমস্ত বাইবেলের ব্যাখ্যা লিখিতে হয় নাই। প্রাচীনেরা যাহা-কিছু বলিয়া গিয়াছেন, তাহাই সত্য, এ বিশ্বাস ইয়ুরোপে ততটা ছিল না; তাই প্রাচীনদের যে যে মত নিজের মতের সহিত মিলিল না, দেকার্ত (Descartes) অকুতোভয়ে হয় তাহাকে "ভুল" বলিয়া দিলেন, নয় তাহা উপেক্ষা করিলেন। পক্ষান্তরে, শঙ্করের সময়ে ভারতবর্ষ শাস্ত্রদলিত। শৈবাগম, বৈষ্ণবাগম, কাপালিকাগম দ্বারা তখন ধর্ম্ম পর্য্যুদস্ত। স্বাধীনচিন্তা তখন বৌদ্ধদিগকেও পরিহার করিয়াছে। উহারাও তখন বৌদ্ধাগমের * ভারে অবনতমস্তক। আর, গোঁড়া-হিন্দুরা তখন "চোদনালক্ষণোঽর্থো ধর্ম্মঃ" এই দার্শনিকবাক্যকেও শাস্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে! দেশে স্বাধীনচিন্তার গন্ধও ছিল না। সকলেই নিজ নিজ খেয়াল অনুসারে একএকটি উপধর্ম্ম বা অধর্ম্ম অবলম্বন করিত এবং ভাবিত ঐ ধর্ম্ম বা অধর্ম্মের দ্বারাই আত্মার উদ্ধার হইবে। এ জগতে কখন পাষণ্ডের—ভণ্ড, ধূর্ত্ত, নিশাচরের—অভাব হয় না। ঐ পণ্ডিতনামধারী পাষণ্ডেরা পূর্ব্বেই শাস্ত্র তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছিল। লোকে উহা অবলম্বন করিয়া নরকের পথে অগ্রসর হইত। এইরূপ সময়ে মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব। তিনিও দেকার্তের মতন সমসাময়িক সমস্ত জ্ঞান অর্জ্জন করিলেন। উহাতে তাঁহার মন উঠিল না। সমাজে প্রচলিত শাস্ত্রব্যাখ্যাকে এবং শাস্ত্রকে তিনি অপব্যাখ্যা এবং অশাস্ত্র বলিয়া বুঝিলেন। তিনি নূতন করিয়া শাস্ত্রব্যাখ্যা করিলেন এবং তৎকালে প্রচলিত অনেক শাস্ত্রকে শাস্ত্রাভাস বলিয়া উড়াইয়া দিলেন। এইরূপে অধর্ম্মের গড্ডলিকাপ্রবাহে শঙ্কর বাধা দিলেন। স্বাধীনচিন্তা পুরাণ মলিন ধর্ম্মের বিরুদ্ধে দাঁড়াইল। স্বাধীনচিন্তার জয় হইল। কিন্তু একটি দোষ রহিয়া গেল। দেকার্ত (Descartes) দর্শনকে শাস্ত্রের অধীনতা হইতে একেবারে মুক্ত করিয়াছিলেন। শঙ্কর তাহা পারিলেন না। শঙ্কর নূতন শাস্ত্র ছাড়িয়া—শৈবাগম, বৈষ্ণবাগম, কাপালিকাগম ছাড়িয়া—পুরাতন শাস্ত্রের আশ্রয় লইলেন। বেদ, উপনিষৎ এবং গীতাদি-স্মৃতিকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিলেন। শঙ্কর মানুষের স্বাধীনতার জন্য স্বকীয় অদ্ভুত শক্তি-বলে যে যে অধিকার লাভ করিয়াছিলেন, তাহা আবার শ্রুতিস্মৃতির সাম্রাজ্যে কর দিলেন। ভারতীয়েরা যে পরাধীন, সেই পরাধীন রহিয়া গেল। দুর্ব্বল পতনোন্মুখ রাজার সিংহাসনে প্রবলপরাক্রান্ত সম্রাট্ অটলভাবে বসিলেন। সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল না। এইরূপ দৈবদুর্বিপাকের দৃষ্টান্ত ভারতের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় বিদ্যমান!!

তাই বলিয়া, শঙ্করের জীবনব্যাপী কঠোর সাধনায় যে কোন ফলই হয় নাই, এ-কথা বলা যায় না। শঙ্কর দেখাইলেন যে, শাস্ত্রকে যেমন ইচ্ছা তেমন করিয়া ব্যাখ্যা করা যায়। আগে শাস্ত্র পড়িয়া স্বাধীনচিন্তাদ্বারা একটি দর্শন গড়িয়া লও, পরে তদনুসারে শাস্ত্রব্যাখ্যা করিবে। শাস্ত্র মৃত। শাস্ত্রে কথা কয় না।

* তৎপ্রণীতাগমালম্বৈর্বৌদ্ধৈর্দর্শনদূষকৈঃ।
ব্যাপ্তেদানীং প্রভো ধাত্রী রাত্রিঃ সন্তমসৈরিব॥
সংক্ষেপশঙ্করজয় ১।৩১

তুমি যেমনভাবে শাস্ত্রকে বলাইবে, শাস্ত্রও ঠিক্ তেমনি বলিবে। শাস্ত্র তোমার প্রতিভার অধীন। বিশেষত সকল শাস্ত্রের প্রামাণ্য অঙ্গীকার করাও নিষ্প্রয়োজন।

আগে জগৎসম্বন্ধে একটা মত দাঁড় করাইয়া, পরে উহাকে শাস্ত্রীয়মত বলিয়া চালান – এই হইল বেদান্তের প্রস্থানভেদের মূল। এইরূপে অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈত প্রভৃতি নানাপ্রকার বেদান্তব্যাখ্যার সৃষ্টি হইয়াছে। এই প্রস্থান-ভেদই দার্শনিকদিগের স্বাধীনচিন্তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তবে এই স্বাধীনচিন্তা সম্পূর্ণ স্বাধীন হইল না, লোকসংগ্রহের জন্য অন্তত মুখে বেদের প্রামাণ্য স্বীকৃত হইল, ইহাই আমাদের ক্ষোভের বিষয়।

পূর্ব্বে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহাতে মনে হইতে পারে যে, জৈমিনির "চোদনালক্ষণো-হর্থো ধর্ম্মঃ" এই সূত্রটিই যত অনর্থের মূল। কিন্তু একটি সূত্র অথবা একজন দার্শনিকের বা ধর্ম্ম-প্রচারকের মতে সমাজের কিছু আসে-যায় না। সমাজ যদি পূর্ব্ব হইতে ঐ মতের দিকে একটু ঝুঁকিয়া না থাকে, তবে ঐ নূতন মতগুলি উষরভূমিতে পতিত বীজের ন্যায় শুকাইয়া যায়। সমাজে যাহা নিঃশব্দে চলিতেছিল, জৈমিনি তাহারই সম্যক্ অভিব্যক্তি করিয়াছেন মাত্র। জৈমিনির "চোদনালক্ষণোহর্থো ধর্ম্মঃ" এই সূত্রটি যেমন আমাদিগকে চিরকালের জন্য গর্ভদাস করিয়া রাখিয়াছে, তেমনি তাঁহারই আর একটি সিদ্ধান্তে আমাদিগকে প্রদর্শিত প্রস্থানভেদের মূলীভূত স্বাধীনতাটুকু দান করিয়াছে। এই সিদ্ধান্তটি অর্থবাদাধিকরণে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বেদে বস্তুতত্ত্বজ্ঞাপক এরূপ অনেক কথা আছে, যাহা প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণবিরুদ্ধ। যাহা প্রমাণ-দ্বারা মিথ্যা বলিয়া ঠিক্ হয়, শত শ্রুতিও তাহাকে সত্য বলিয়া প্রমাণ করিতে পারে না। "ন হ্যাগমাঃ শতমপি ঘটং পটয়িতুমীশতে", "বাধিতমর্থং শ্রুতিরপি ন বোধয়তি।" বাধিত অর্থ কি, তাহা যুক্তিবলে, প্রত্যক্ষ ও অনুমানের দ্বারা, ঠিক্ করিতে হইবে। পরে ঐ সকল বাধিত অর্থের প্রতিপাদক শ্রুতিগুলির অনুরূপ অর্থ করিতে হইবে। তাহা না করিলে ঐ সকল শ্রুতির প্রামাণ্য লোপ পায়, এবং উহাদের প্রামাণ্য না থাকিলে অপরাপর শ্রুতির প্রামাণ্যেও লোকের আস্থা থাকে না। তাই প্রথমে যুক্তিতর্কদ্বারা কি সত্য, কি মিথ্যা, তাহা ঠিক্ করিবে। পরে যে যে অংশ ঐ নির্দ্ধারিত সত্যের বিরোধী, তাহাদিগকে একেবারে উড়া-ইয়া না দিয়া, তাহাদের অনুরূপ অর্থ করিবে। এই হইল অর্থবাদাধিকরণের মূলতত্ত্ব। বেদে লিখিত আছে, "বনস্পতয়ঃ সত্রমাসত"— বৃক্ষেরা যজ্ঞ করিয়াছিল। এটি ভুল কথা। বৃক্ষেরা কিরূপে যজ্ঞ করিবে? তাই ইহার অনুরূপ অর্থ করিতে হইবে। অস্ফুটচেতন বৃক্ষে-রাও যজ্ঞ করিয়াছিল, তবে চেতনশ্রেষ্ঠ মানুষ যজ্ঞ করিবে না কেন? এইরূপ প্ররোচনাই এই শ্রুতির অর্থ। এইরূপ অর্থবাদসিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া আমরা বলিতে পারি যে, পৃথিবী অচল বলিয়া যে শাস্ত্রে লিখিত আছে, তাহা অর্থবাদমাত্র। এই অর্থবাদবলেই বেদান্তের নানা ব্যাখ্যা। এই অর্থবাদসিদ্ধান্তের সাহায্যে এখনও বেদের প্রামাণ্য কথঞ্চিৎ রক্ষিত হইতে পারে। যদি যুক্তিদ্বারা নির্ণীত হয় যে, জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত্ত ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না, তবে জগতের বিকৃতিবোধক শ্রুতিকে অর্থবাদ বলিব না কেন?

দর্শনে যুক্তিতর্কদ্বারা বস্তুতত্ত্ব নির্ণীত হয়, পরে ঐ নির্ণীততত্ত্ব বেদে-উপনিষদে আছে, ইহাই বস্তুত আমাদের দার্শনিকেরা দেখান। ধর্ম্মসম্বন্ধে বা কর্ত্তব্যসম্বন্ধে, duty-সম্বন্ধে বা Oughtness-সম্বন্ধে কিন্তু ঠিক্ ইহার বিপরীত। ইন্দ্রিয়দ্বারা এবং অনুমানদ্বারা যাহা হয়, হইয়াছে বা হইবে, কেবল তাহাই জানা যায়। আমাদের কি করা উচিত, প্রত্যক্ষ বা অনুমান তাহা বলিয়া দিতে পারে না। এখন আমি লিখিতেছি বা চিন্তা করিতেছি—এতটা প্রত্যক্ষ বলিয়া দিতে পারে। অনুমানদ্বারা ইহাও জানা যায় যে, কাল সূর্য্য উঠিবে বা কালও এই প্রবন্ধ লিখিব। কিন্তু আমার এরূপ প্রবন্ধ লেখা উচিত কি না, তাহা প্রত্যক্ষ ও অনুমান বলিয়া দিতে পারে না। এই প্রবন্ধ লিখিলে আমার সাংসারিক কি কি লাভ হইবে, কি কি অনিষ্ট হইবে, মাত্র তাহারই কতকটা অনুমানদ্বারা জানা যাইতে পারে। অমুক কাজে সমাজের উপকার হয়, অমুক কাজে সমাজের অনিষ্ট হয়, এতটা যুক্তিতর্কদ্বারা জানা যাইতে পারে। কিন্তু যাহাতে সমাজের মঙ্গল হয়, তাহাই যে ভাল, তাহাই যে প্রত্যেকের কর্ত্তব্য, এ কথা বলিয়া দেওয়া ইন্দ্রিয় ও অনুমানের সাধ্যাতীত। এইজন্যই ইয়ুরোপীয় দার্শনিকেরা conscience (ধর্ম্মজ্ঞান) বা Moral Reason (ধর্ম্মচক্ষু—দিব্যচক্ষু) নামে একটি স্বতন্ত্র শক্তি মানিতে বাধ্য হইয়াছেন। এই conscience বা সহজ ধর্ম্মজ্ঞানেই আমাদের কর্ত্তব্যপথ দেখাইয়া দেয়। পক্ষান্তরে, সকল দেশের ধর্ম্মব্যবসায়ীরাই শাস্ত্রকেই ধর্ম্মাধর্ম্মনির্ণয়ের একমাত্র উপায় বলিয়া মনে করেন। ব্রাহ্মণেরা বেদ, পাদরীরা বাইবেল এবং মৌলবীরা কোরাণকেই ধর্ম্মবিষয়ে প্রমাণ বলিয়া ধরেন। এই ভুল বিশ্বাসে যে সমাজের কতদূর অনিষ্ট হয়, পূর্ব্বে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া হইয়াছে।

ইয়ুরোপীয়দের ন্যায় ভারতীয়েরাও একসময় Conscience বা Moral Reasonএর আভাস পাইয়াছিলেন। মনু বলিতেছেন—

> বিদ্বদ্ভিঃ সেবিতঃ সদ্ভির্নিত্যমদ্বেষরাগিভিঃ।
> হৃদয়েনাভ্যনুজ্ঞাতো যো ধর্ম্মস্তং নিবোধত॥ ২।১
> বেদোঽখিলো ধর্ম্মমূলং স্মৃতিশীলে চ তদ্বিদাম্।
> আচারশ্চৈব সাধূনাম্ আত্মনস্তুষ্টিরেব চ॥ ২।৬
> বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।
> এতচ্চতুর্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাদ্ধর্ম্মস্য লক্ষণম্॥ ২।১২
> যৎ কর্ম্ম কুর্ব্বতোঽস্য স্যাৎ পরিতোষোঽন্তরাত্মনঃ
> তৎ প্রযত্নেন কুর্ব্বীত বিপরীতন্তু বর্জ্জয়েৎ॥ ৪।১৬১
> সত্যপূতং বদেদ্বাচং মনঃপূতং সমাচরেৎ॥ ৬।৪৬

বিষ্ণু বলিতেছেন—

> মনঃপূতমাচরেৎ।৯৬।১৭

যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন—

> শ্রুতিঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।
> সম্যক্‌সঙ্কল্পজঃ কামো ধর্ম্মমূলমিদং স্মৃতম্॥ ১।৭

এই বচনগুলি পড়িলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ধর্ম্মবিষয়ে শ্রুতিস্মৃতি-সদাচার ভিন্ন আরও একটি প্রমাণ ছিল। যাহা হৃদয়ের অভ্যনুজ্ঞাত, যাহাতে আত্মার তুষ্টি হয়, যাহা নিজের মনে ভাল লাগে, যাহাতে অন্তরাত্মার পরিতোষ হয়, যাহা মনঃপূত, তাহা ধর্ম্ম। এস্থলে টীকাকারগণ বলেন, "শাস্ত্রে কতকগুলি বিষয়ে আমাদের স্বাধীনতা দিয়াছে, কেবলমাত্র ঐ সকল বৈকল্পিক স্থলেই আত্মতুষ্টি প্রমাণ, অন্য সকল বিষয়ে শাস্ত্রেরই অনুসরণ করিতে হইবে? শাস্ত্র ও আত্মতুষ্টির বিরোধ হইলে, শাস্ত্রই

প্রমাণ বলিয়া পরিগণিত হইবে।" যথা মিতাক্ষরা—

"স্বস্য চ আত্মনঃ প্রিয়ং বৈকল্পিকে বিষয়ে যথা গর্ভাষ্টমেঽষ্টমে বাব্দে ব্রাহ্মণমুপনয়নমিত্যাদৌ আত্মেচ্ছেব নিয়ামিকা।"

কুল্লুক বলিতেছেন—

"আত্মতুষ্টিশ্চ বৈকল্পিকপদার্থবিষয়ধর্ম্মে প্রমাণম্ তদাহ গর্গঃ—বৈকল্পিকে আত্মতুষ্টিঃ প্রমাণম্"।

মনু ২।৬ টীকা।

আবার—

"এতচ্চাবিহিতানিষিদ্ধগোচরং বৈকল্পিকবিষয়ঞ্চ"

মনু ৪।১৬১ টীকা।

এইরূপে মন্বাদিশাস্ত্রে Conscience বা Moral Reason এর যে একটু আভাস পড়িয়াছিল, তাহা ক্রমে পরিস্ফুট না হইয়া কালে লোপ পাইল। মানবের "অন্তরাত্মা" ধর্ম্মবিষয়ে প্রমাণ হইতে পারিল না। বাহ্য কয়েকখানি পুস্তক—বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র—ইহারাই ধর্ম্মবিষয়ে প্রমাণ রহিয়া গেল। ফলে, আমাদের স্বাধীনচিন্তা গেল -ধর্ম্ম গেল—সব গেল।

আমাদের দেশের প্রচলিত ধারণানুসারে, বেদই ধর্ম্মের একমাত্র মূলপ্রমাণ। কেন না, স্মৃতি ও শিষ্টাচারের প্রামাণ্যও বেদের প্রামাণ্যের উপর নির্ভর করে। স্মৃতি ও শিষ্টাচার দ্বারা উহাদের মূলীভূত শ্রুতি অনুমিত হয় এবং ঐ অনুমিত শ্রুতির প্রামাণ্যেই উহাদের প্রামাণ্য। কার্য্যত কিন্তু সমাজে বেদের প্রামাণ্য নাই বলিলেই চলে। স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের স্মৃতিনিবন্ধ প্রভৃতিই আমাদের ধর্ম্মে প্রমাণ। ঐ সকল নিবন্ধে প্রধানত পুরাণ-তন্ত্র-প্রতিপাদ্য ধর্ম্মই উপদিষ্ট হইয়াছে। বস্তুত আমাদের দেশের শিষ্টাচারের মধ্যে শতকরা নিরেনব্বইটির জন্য কোন শ্রুতি দেখিতে পাওয়া যায় না। স্মৃতিকেই প্রমাণ বলিয়া ধরা হয়। স্মৃতিদ্বারা অনুমান করিয়া লই যে, এক সময়ে ঐ সকল স্মৃতির মূলীভূত শ্রুতি বিদ্যমান ছিল, অধুনা উহারা লোপ পাইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ভারতে এবং ইয়ুরোপে যে শত শত বৈদিকগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে প্রচলিত আচার-পদ্ধতির পোষক কথা কমই দেখা যায়। বস্তুত বেদের আলোচনা করিলে, বৈদিকধর্ম্মকে এক স্বতন্ত্র ধর্ম্ম বলিয়াই মনে হয়। যুধিষ্ঠির সত্যই বলিয়াছেন—

আম্নায়বচনং সত্যমিত্যয়ং লোকসংগ্রহঃ।

মহাভা, ১২।২২৯ ৯।

বেদকে প্রচলিত ধর্ম্মের মূল বলা লোকসংগ্রহ-(Legal fiction)-মাত্র। অন্যথা প্রচলিত ক্রিয়াকলাপবোধক শ্রুতির এরূপ অত্যন্ত লোপ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? কাজেই আমাদের সমাজের উপর বেদের আধিপত্য মাত্র নামে। কার্য্যত স্মৃতিই (পুরাণতন্ত্র) আমাদের কাছে ধর্ম্মবিষয়ে শ্রেষ্ঠপ্রমাণ। আমরা শ্রুতি ছাড়িয়া স্মৃতি—স্মৃতিই বা বলি কেন—আমরা শ্রুতিস্মৃতি ছাড়িয়া কেবলমাত্র শিষ্টাচার-(দেশাচার)-কেই ধর্ম্মাধর্ম্মনির্ণয়ের সর্ব্বপ্রধান উপায় বলিয়া ধরিতেছি (বিদ্যাসাগর-মহাশয়ের বিধবাবিবাহ শেষ ৪ পৃষ্ঠা দেখুন)।

আমরা শ্রুতিস্মৃতি ছাড়িয়া দিয়াছি। এখন দেশাচারকে ছাড়িতে হইবে। "স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ"—এইটুকুই আমাদের ধর্ম্মাধর্ম্মনির্ণয়ের সর্ব্বপ্রধান প্রমাণ হওয়া উচিত। বস্তুত, "অন্তরাত্মা" যাহাতে তুষ্ট হয়, তাহাই ধর্ম্ম। এই "অন্তরাত্মা" বা "আত্মতুষ্টি" ইয়ুরোপীয় দর্শনের

Conscienceস্থানীয়। চক্ষুদ্বারা যেরূপ বর্ণ-জ্ঞান হয়, তেম্নি এই অন্তরাত্মাদ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্ম-নির্ণয় হয়। "অন্তরাত্মা" যাহাকে অধর্ম্ম বলিয়া দিবে, তাঁহাকে শত শ্রুতিও ধর্ম্মে পরিণত করিতে পারে না। "ন হ্যাগমাঃ শতমপি ঘটং পটয়িতুমীশতে।" বেদে যদি লিখে যে, পাথর ভাসে, তবে যেরূপ তথায় বেদের প্রামাণ্য * না মানিয়া, আমাদের ইন্দ্রিয়ের উপরই আস্থাস্থাপন করিতে হইবে, ঠিক্ সেইরূপ আমাদের "অন্তরাত্মা" যাহাকে ধর্ম্ম বলে, শত শ্রুতিও তাহাকে অধর্ম্ম করিতে পারে না। অন্তরাত্মাই ধর্ম্মবিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ। যাহা "অন্তরাত্মা"কর্ত্তৃক দূষিত হয়, তাহাকে বাধিত অর্থ বলিয়া ধরিবে। বাধিত অর্থকে শত শ্রুতিও সত্য করিয়া দিতে পারে না।

কিন্তু Conscience, অন্তরাত্মা বা আত্মতুষ্টিকে ধর্ম্মাধর্ম্মবিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলিয়া ধরিলে, একটি বিষয়ে গোলযোগ উপস্থিত হয়। যাহাতে শ্যামের আত্মতুষ্টি হয়, তাহাতে রামের অন্তরাত্মা পরিতৃপ্ত হয় না। তবে কি ব্যক্তিভেদে ধর্ম্মের ভেদ হয়? বস্তুর স্বরূপ ব্যক্তিভেদে ভিন্ন হয় না। যাহা কালো, তাহা সকলের পক্ষেই কালো; যাহা তরল, তাহা সকলের পক্ষেই তরল। সত্যনিষ্ঠা, দয়া, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ প্রভৃতি কি সকলেরই পক্ষেই ধর্ম্ম নহে? এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, সাধারণত সত্য-নিষ্ঠা, দয়া, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ প্রভৃতিতে সকলেরই অন্তরাত্মা তুষ্ট হয়। কাজেই উহারা সকলের পক্ষেই ধর্ম্ম। কিন্তু মানবের এমন অবস্থাও হইতে পারে, যখন সে ধর্ম্মকে অধর্ম্ম এবং অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া বুঝে। এইরূপে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের প্রাক্‌কালে মহাত্মা অর্জ্জুনের মোহ উপস্থিত হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন, পাপাচরণ করিতে করিতেও লোকের অন্তরাত্মা এরূপ মলিন হইয়া যায় যে, তাহার মধ্য দিয়া শুক্লকর্ম্মকে কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণকর্ম্মকেও শুক্ল বলিয়া ভ্রম হয়। কামলারোগে শাদা জিনিষকে পীতবর্ণ দেখায় বলিয়া যেমন রূপবিষয়ে চক্ষুর অপ্রামাণ্য হয় না, ঠিক্ সেইরূপ পাপীর অন্তরাত্মার নিকট অধর্ম্মও ধর্ম্ম বলিয়া প্রতিভাত হইলেও, উহাতে অন্তরাত্মার প্রামাণ্য লোপ পায় না। ব্যক্তিবিশেষের বা সমাজের অন্তরাত্মা এইরূপ রুগ্‌ণ হইলে, তাহার জন্য বিশেষ চিকিৎসার দরকার—গুরুর দরকার। শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, যীশু, শঙ্কর, মহম্মদ, লুথার প্রভৃতি জগদ্‌গুরুরা তত্তৎকালীন সমাজের রুগ্‌ণ অন্তরাত্মাকে প্রকৃতিস্থ করিয়াছিলেন। ইহাই ধর্ম্মস্থাপন। এইরূপে ধর্ম্ম স্থাপিত হইলে, অর্থাৎ সদ্‌গুরুর প্রসাদে পাপীর অন্তরাত্মা পুনঃপ্রকৃতিস্থ হইলে, তখন সে অনায়াসে ধর্ম্মাধর্ম্মবিবেকে সমর্থ হয়। বর্ত্তমান বঙ্গের রুগ্‌ণ অন্তরাত্মার চিকিৎসার জন্য কি কোন মহাত্মার আবির্ভাব হইবে না? অন্তরাত্মাকে (conscienceকে) নির্ম্মল রাখিবার প্রধান উপায়—স্বার্থত্যাগ ও পরার্থপরতা। প্রাচীনকালে ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ তুলাধার যথার্থই বলিয়াছিলেন—

সর্ব্বেষাং যঃ সুহৃন্নিত্যং সর্ব্বেষাঞ্চ হিতে রতঃ।
কর্ম্মণা মনসা বাচা স ধর্ম্মং বেদ জাজলে॥

মহাভা ১২।২৬১।৯

নিঃস্বার্থ হৃদয় ধর্ম্মাধর্ম্মনির্ণয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়।

* অর্থবাদাধিকরণে "গ্রাবাণঃ সংপ্লবন্তে" প্রভৃতি শ্রুতির স্বার্থে প্রামাণ্য প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। উহারা অর্থবাদমাত্র।

আমরা যে কখন-কখন ধর্ম্মকে অধর্ম্ম এবং অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া মনে করি, তাহার প্রধান কারণ আমাদের স্বার্থপরতা। যিনি সর্ব্বভূতকে আত্মভাবে দেখেন, তিনি 'কি ধর্ম্ম, কি অধর্ম্ম,' তাহা নির্ণয় করিতে কখন গোলে পড়েন না।

আর এক হিসাবে কিন্তু বস্তুতই প্রত্যেক ব্যক্তির ধর্ম্ম অপর প্রত্যেকের ধর্ম্ম হইতে ভিন্ন। ইংরেজ কেপ্লার হার্ডি, জাপানী টোগো এবং বাঙালী আশুতোষের ধর্ম্ম এক নহে। ইঁহাদের মধ্যে একের অন্তরাত্মা যাহাতে তৃপ্ত হয়, অন্যে তাহাতে কোন শান্তি পান না। যাঁহার মধ্যে যে কল্যাণী শক্তি গূঢ়ভাবে বিদ্যমান আছে, তাহার পূর্ণ অভিব্যক্তি করাই তাঁহার পক্ষে ধর্ম্ম। যিনি বৈজ্ঞানিক, তিনি বিজ্ঞান নিয়া থাকুন। যিনি দার্শনিক, তিনি দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা করুন। যিনি যোদ্ধা, তিনি রণ-নৈপুণ্যের অনুশীলন করুন। বৈজ্ঞানিক যদি বিজ্ঞান ছাড়িয়া সাহিত্যে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে চান, দার্শনিক যদি দর্শন ছাড়িয়া যুদ্ধবিদ্যায় প্রবীণ হইতে চান, তবে তাঁহার আত্মতুষ্টি হইবে না, তাঁহার অধর্ম্ম হইবে। হিন্দুদের অধিকারি-ভেদে ধর্ম্মভেদ এই আত্মতুষ্টির প্রামাণ্যের ফল।

অন্তরাত্মা বা আত্মতুষ্টি একটি আন্তর (subjective) উপায়। উহাদ্বারা সকল সময়ে সুচারুরূপে ধর্ম্মনির্ণয় হওয়া কঠিন। এইজন্য ধর্ম্মনির্ণয়ার্থ একটি বাহ্য (objective) উপায়ের প্রয়োজন। হিতবাদ বা doctrine of utility ধর্ম্মনির্ণয়ের একটি বাহ্য উপায়। যাহাতে সমাজের কল্যাণ সাধিত হয়, যাহাতে মানবের উন্নতি হয়, তাহাই কর্ত্তব্য, তাহাই ধর্ম্ম —এই মত অবলম্বনে পৃথিবীর সকল স্থানেরই আইন-কানুন প্রণীত হইয়া থাকে। সাধারণ শিক্ষিতলোকেরা এই মত দিয়াই অন্যের কাজের সাধুতা বা অসাধুতা নির্ণয় করে। আমাদের শাস্ত্রে এই utilitarean doctrine বা হিত-বাদের উল্লেখ আছে। যথা—

পরিনির্ম্মথ্য বাগ্‌জালমিদমেব সুনিশ্চিতম্।
নোপকারাৎ পরং পুণ্যং নাপকারাদঘং পরম্॥

মহাভারতের টীকায় নীলকণ্ঠধৃত বচন।

যদ্‌যদাত্মনি চেচ্ছেত তৎ পরস্যাপি চিন্তয়েৎ।

মহাভা, ১২।২৫৮।২২

সর্ব্বং প্রিয়াভ্যুপগতং ধর্ম্মমাহুর্ম্মনীষিণঃ।
পশ্যৈতং লক্ষণোদ্দেশং ধর্ম্মাধর্ম্মে যুধিষ্ঠির॥

মহাভা, ১২।২৫৮।২৫

সর্ব্বেষাং যঃ সুহৃন্নিত্যং সর্ব্বেষাঞ্চ হিতে রতঃ।
কর্ম্মণা মনসা বাচা স ধর্ম্মং বেদ জাজলে॥

মহাভা, ১২।২৬১।৯

সন্নিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ॥

গীতা ১২।৪

সদাচারঃ স্মৃতির্ব্বেদাস্ত্রিবিধং ধর্ম্মলক্ষণম্।
চতুর্থমর্থমিত্যাহুঃ কবয়ো ধর্ম্মলক্ষণম্॥

মহাভা, ১২।২৫৮।৩

অপিচ—

যদন্যৈর্ব্বিহিতং নেচ্ছেদাত্মনঃ কর্ম্ম পূরুষঃ।
ন তৎ পরেষু কুর্ব্বীত জানন্নপ্রিয়মাত্মনঃ॥

মহাভা, ১২।২৫৮।২০

শ্রূয়তাং ধর্ম্মসর্ব্বস্বং শ্রুত্বা চৈবাবধারয়েৎ।
আত্মনঃ প্রতিকূলানি পরেষাং ন সমাচরেৎ॥

বল্লবদেবধৃত ব্যাসমুনির বচন।

অদ্রোহেণৈব ভূতানামল্পদ্রোহেণ বা পুনঃ।
যা বৃত্তিঃ স পরো ধর্ম্মস্তেন জীবামি জাজলে॥

মহাভা, ১২।২৬১।৬; মনু ৪।২

ধর্ম্মং শনৈঃ সঞ্চিনুয়াদ্‌বল্মীকমিব পুত্তিকাঃ।
পরলোকসহায়ার্থং সর্ব্বভূতান্যপীড়য়ন্॥

মনু ৪।২৩৮; মনু ৬।৫২, ৬০

ন ভূতানামহিংসায়া জ্যায়ান্ ধর্ম্মোঽস্তি কশ্চন।

মহাভা, ১২।২৬২।৩০

অসংরোধেন ভূতানাং বৃত্তিমীপ্সেত বৈ দ্বিজঃ।

মহাভা, ১২।২৩৪।৪

উপরি-উদ্ধৃত বচনগুলি দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ছয়টি বিধ্যাত্মক (affirmative) অর্থাৎ 'ইহা কর' এইরূপ বলিয়া দিতেছে; আর শেষোক্ত ছয়টি নিষেধাত্মক (negative) অর্থাৎ 'ইহা করিও না' এইরূপ বলিতেছে।

নোপকারাৎ পরং পুণ্যম্—

উপকার হইতে শ্রেষ্ঠ পুণ্য নাই;

যদ্যদাত্মনি চেচ্ছেত তৎ পরস্যাপি চিন্তয়েৎ—

নিজে যাহা পাইতে ইচ্ছা কর, পরেও যাহাতে তাহা পায়, তাহার চিন্তা করিবে;

সর্ব্বং প্রিয়াভ্যুপগতং ধর্ম্মমাহুর্ম্মনীষিণঃ—

যাহা-কিছু সুখপ্রদ, পণ্ডিতেরা তাহাকেই ধর্ম্ম বলিয়া জানেন;

সর্ব্বেষাং যঃ সুহৃন্নিত্যং—*

মন, বাক্য এবং কর্ম্মদ্বারা যিনি সকলের হিত করেন, তিনিই প্রকৃত ধর্ম্ম কি, তাহা জানেন;

তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ—

সর্ব্বভূতহিতে রত সেই মহাত্মারা ঈশ্বরকেই প্রাপ্ত হন;

চতুর্থমর্থমিত্যাহুঃ কবয়ো ধর্ম্মলক্ষণম্—

বিদ্বানেরা প্রয়োজন অর্থাৎ সুখ ও তৎসাধনকেই ধর্ম্মলক্ষণ বলিয়া থাকেন। এই ছয়টি বচনে মানুষকে জগতের উপকার করিতে বলা হইয়াছে। হিতবাদ বা doctrine of utilityর মূলতত্ত্ব এই যে, যাহাতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লোকের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপকার হয়, তাহাই ধর্ম্ম। এই উপকার হিসাব করিবার জন্য, প্রত্যেক ব্যক্তির হিতকে অপর প্রত্যেকের হিতের সমান বলিয়া ধরিতে হয়। হিতবাদে নিজের সুখ এবং পরের সুখ উভয়ই ঠিক্ তুল্য।

"আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ"

বলিয়া শাস্ত্র হিতবাদের এই সকল তত্ত্ব এক কথায় বুঝাইয়া দিয়াছে।

ন তৎ পরস্য সন্দধ্যাৎ প্রতিকূলং যদাত্মনঃ—

সর্ব্বৈর্বিবিধৈর্হিংসং নেচ্ছেদাত্মনঃ কর্ম্ম পুরুষঃ—†

প্রভৃতি ছয়টি বাক্য নিষেধাত্মক। উহাতে পরের হিংসা বা অনিষ্ট নিষিদ্ধ হইয়াছে। বস্তুত হিন্দুশাস্ত্র মনোযোগপূর্ব্বক অধ্যয়ন করিলে প্রতীতি হয় যে, অহিংসাই হিন্দুদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ ছিল। ভূমি কর্ষণে ভূমিস্থ জন্তুর প্রাণ যায়, তাই কৃষিতেও পাপ আছে। যাগযজ্ঞ করিলে অগত্যা পশুর বিনাশ অবশ্যম্ভাবী, তাই যাগযজ্ঞও একেবারে বিশুদ্ধ নহে। "উদ্ভিদেরও জীবন আছে এবং সে জীবননাশেও পাপ হয়"—এই বিশ্বাস হিন্দুর ছিল বলিয়াই তাপসেরা অন্নত্যাগ করিতেন এবং অভুক্ষ ও বায়ুভক্ষ হইয়া থাকিতেন। অহিংসার এরূপ সর্ব্বব্যাপক আদর্শ অপর ধর্ম্মে দুর্লভ।

এখন আমরা ধর্ম্মসম্বন্ধে তিনটি বড় প্রমাণ পাইলাম। প্রথম—আত্মতুষ্টি বা হৃদয়ের অভ্যনুজ্ঞা, দ্বিতীয়—পরোপকার, তৃতীয়—অহিংসা। ইহাদের মধ্যে আত্মতুষ্টিই মূল-

* এই শ্লোকটি পূর্ব্বে একবার অন্যার্থপ্রতিপাদক বলিয়া উদ্ধৃত হইয়াছে।

† Cf. Do unto others as you would they should do unto you. ৺কালীপ্রসন্ন সিংহের শান্তিপর্ব্বের অনুবাদ ভ্রমপূর্ণ।

যদ্যদাত্মনি চেচ্ছেত তৎ পরস্যাপি চিন্তয়েৎ—

এই শ্লোকটির অনুবাদেও ভুল আছে।

প্রমাণ। পরোপকার ও অহিংসার প্রামাণ্য আত্মতুষ্টির উপর নির্ভর করে অর্থাৎ "পরোপকার এবং অহিংসা ধর্ম্ম" এ কথায় আমাদের আত্মতুষ্টি হয় বলিয়াই আমরা পরোপকার এবং অহিংসাকে ধর্ম্মাধর্ম্মনির্ণয়ে উপায় বলিয়া মনে করি।

হিন্দুশাস্ত্রের দিকে এবং ইদানীন্তন হিন্দু-সমাজে যাঁহারা প্রকৃত ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত, তাঁহাদের দিকে দৃষ্টি করিলে দেখা যাইবে যে, ধর্ম্মের নিষেধাত্মক (পরহিংসা করিও না) অংশই এদেশে বহুল প্রচারিত হইয়াছে। পরের উপকার কর, সমাজের কল্যাণ কর প্রভৃতি বিধির তত চল নাই। পরের জন্য, সমাজের জন্য চিন্তা করাটা যেন বে-আদবী বলিয়া গণ্য। ধার্ম্মিকেরা বলেন—"আমাদের জ্ঞান কতটুকু? আমাদের শক্তি কতটুকু? আমরা নিজেই পাপিষ্ঠ। আমরা পরের জন্য কি করিব? বিশেষত সমাজের কিসে উপকার হয়, কিসে অপকার হয়, তাহাই বা কিরূপে ঠিক্ করিব? আর কেবল হিন্দুসমাজ বা ভারতবর্ষ ধরিলে চলিবে কেন? সমগ্র মানবসমাজের কিসে উপকার, কিসে অপকার, তাহা নিরূপণ করা আরও দুরূহ। তার পর, কেবলমাত্র মানব-সমাজের উপকারই ত শাস্ত্রবিহিত লক্ষ্য নহে। আমাদের শাস্ত্রে সর্ব্বভূতের হিতের কথা বলা হইয়াছে। আমাদের শাস্ত্রানুসারে যাহাতে আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত—ব্রহ্মা হইতে তৃণ পর্য্যন্ত—সকলের কুশল হয়, তাহাই ধর্ম্ম। কিন্তু কিসে ব্রহ্মাদিস্থাবরান্ত জগতের মঙ্গল হয়, তাহা কে বলিয়া দিবে? অতএব এস, আমরা সর্ব্বভূত-হিতে রত মহর্ষিদের প্রণীত শাস্ত্রের আদেশ পালন করি, ঈশ্বরে ভক্তি করি এবং কাহারও হিংসা করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করি। স্বাধীন-চিন্তাদ্বারা ধর্ম্মনিরূপণ, সর্ব্বভূতের হিত-নিরূপণ অসম্ভব।" যাঁহারা সর্ব্বান্তঃকরণে এই কথা বলেন, তাঁহারা ধর্ম্মবিষয়ে যে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছেন, তাহা নিঃসন্দেহ। তাঁহারা মুখে এরূপ বলিলেও তাঁহাদের জীবন সর্ব্বদা পরোপকারে ব্যয়িত হয়। রোগীর পরিচর্য্যা, বিপন্নের উদ্ধার বা স্বদেশের শিল্পবাণিজ্যের উন্নতিচেষ্টা—এ বিষয়ে ইঁহারা যে-কোন সমাজের আদর্শ হইতে পারেন। ইঁহারা মানবসমাজের উন্নতিকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ বলিয়া মনে করেন না। ইঁহারা অত্যন্ত ঈশ্বরপরায়ণ।

> বিস্তারঃ সর্ব্বভূতস্য বিষ্ণোর্বিশ্বমিদং জগৎ।
> দ্রষ্টব্যমাত্মবৎ তস্মাদভেদেন বিচক্ষণৈঃ॥
>
> বিষ্ণুপুরাণ ১।১৭।৮৪

এই শাস্ত্রানুসারে ইঁহারা সর্ব্বভূতে আত্মদৃষ্টি করেন। তাই ইঁহারা সর্ব্বভূতহিতে রত। সামান্য কীটের জন্যও ইঁহাদের প্রাণ কাঁদে। কিন্তু এইরূপ অতিমানুষিক আদর্শ বর্ত্তমান সমাজে চলিতে পারে না। সাধারণ লোকে সর্ব্বভূত-হিতের কথা বুঝে না। বরং তাহাদিগকে মানবসমাজের হিতের কথা বলিলে বেশী কাজ হইতে পারে। সাধারণে এই সকল মহাত্মার জীবনে কেবল স্বার্থই দেখিতে পায়, মনে করে, "ইঁহারা কেবল নিজেকে লইয়াই ব্যস্ত।" বস্তুত হিমালয়ের গুহায় অবস্থান করিয়া পরমার্থচিন্তন যাঁহাদের জীবনের আদর্শ বলিয়া মনে হয়, তাঁহারা যে সর্ব্বভূতহিতের জন্য জীবন-ধারণ করেন, ইহা সমাজ বুঝিবে কিরূপে? ফলে, আমাদের সমাজের জনসাধারণ স্বার্থপর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আপনার ইন্দ্রিয়সংযম

করিব, ভগবানের ধ্যান করিব, তিনবেলা স্নানাদি করিব, কাহারও অনিষ্ট করিব না—ইত্যাদি হইল আমাদের সমাজের প্রকৃত আদর্শ। সমাজের কয়জনে "সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে" (কামিনী রায়)—এই মহামন্ত্রে দীক্ষিত হন?

উপরে যাঁহাদের কথা বলা হইল, সেইরূপ মহাপুরুষ অতি বিরল। সাধারণতঃ যাঁহারা সাধু বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাঁহারা কেবল পরের অন্নে উদরপূর্ত্তি করেন, এবং নিজের আত্মার কল্যাণের জন্য গায়ে ভস্ম মাখেন, গাঁজা খান, আর আগুন জ্বালিয়া তাহার সাম্নে বসেন। এই শ্রেণীর সাধুদের মতিগতি ফিরাইবার জন্য মহাত্মা টহলরামকে একটি বিদ্যালয় খুলিবার সঙ্কল্প করিতে হইয়াছে!

আমাদের শাস্ত্র আর একভাবেও সর্ব্বভূতের হিতকে জীবনের লক্ষ্য বলিয়া বুঝাইয়াছেন। যথা—

ইহ হি ভগবান্ মনুঃ প্রথমং সর্ব্বভূতানুগ্রহার্থম্ আচারস্থিতিহেতুভূতং শাস্ত্রং চকার।

নারদস্মৃতির প্রারম্ভে।

হিতার্থং সর্ব্বভূতানাং ভগবন্ কথয়স্ব নঃ।

অত্রি, ২ শ্লো

চাতুর্ব্বর্ণ্যহিতার্থায় শঙ্খঃ শাস্ত্রমথাকরোৎ। শঙ্খ ১।২

ব্রহ্মচারী গৃহস্থশ্চ বানপ্রস্থো যতিস্তথা।
এতেষাং তু হিতার্থায় দক্ষঃ শাস্ত্রমথাকরোৎ॥

দক্ষ, ১।৩

সর্ব্বেষাং হিতকর্ত্তারং দেবদেবং নিরাময়ম্।
প্রসন্নবদনং বীক্ষ্য লোকানাং হিতকাম্যয়া।
বিনয়াবনতা দেবী পার্ব্বতী শিবমব্রবীৎ॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্র ১।১০

তে হি বেদার্থতত্ত্বজ্ঞা লোকানাং হিতকাম্যয়া।
প্রাদিশন্তো যং ধর্ম্মং তং ধর্ম্মং ন বিচারয়েৎ॥

যাজ্ঞবল্ক্যের টীকায় অপরার্কধৃত বচন ১।৭

শাস্ত্রকার ঋষিরা আমাদের আদর্শ। তাঁহারা মুক্তপুরুষ। তাঁহারা সর্ব্বলোকের হিতের জন্য শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। অতএব আমাদেরও যে ঐ আদর্শ গ্রহণ করা উচিত, তাহাতে সন্দেহ কি? মূল আদর্শ— সর্ব্বভূতের হিত। এই সর্ব্বভূতের হিত দেশকালপাত্র-ভেদে নানা উপায়ে সাধিত হইতে পারে। ঋষিরা যে যে নিয়ম লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা তৎকালীন প্রাচীন সমাজের প্রভূত মঙ্গল হইত; এবং ঐ সকল বিধিনিষেধদ্বারা এইরূপ মঙ্গল হইত বলিয়াই উহারা ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। মনু ধর্ম্মশাস্ত্র লিখিয়াছেন। কিন্তু, 'কি ধর্ম্ম, কি অধর্ম্ম', তাহা তিনি নিজে কিরূপে স্থির করিয়াছিলেন? এ প্রশ্নের উত্তর মনু নিজেই দিয়াছেন—

ইদং শাস্ত্রং তু কৃত্বাসৌ মামেব স্বয়মাদিতঃ।
বিধিবদ্গ্রাহয়ামাস মরীচ্যাদীংস্ত্বহং মুনীন্॥

মনু ১।৫৮

স্বয়ং ব্রহ্মা- সৃষ্টিকর্ত্তা 'ঈশ্বর— মনুকে শাস্ত্র অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম শিখাইয়াছিলেন। এইরূপেই স্বয়ং ঈশ্বর মহম্মদকে কোরাণ এবং এইরূপেই স্বয়ং ঈশ্বর যীশুকে ধর্ম্মাধর্ম্মের উপদেশ দিয়াছিলেন। এই ঐশ্বরিক উপদেশ লাভ করিবার জন্য সকলেরই একটি বিশেষ ইন্দ্রিয় আছে। উহার নাম অন্তরাত্মা— হৃদয় বা conscience। ভগবান্ মনু ঐ অন্তরাত্মার মধ্য দিয়াই ঐশ আদেশ পাইয়াছিলেন। সেই আদেশের মূলতত্ত্ব ছিল অদ্রোহ বা অহিংসা এবং সর্ব্বভূতের হিত (মনু, ৪।২; ৪।২৩৮; ৬।৫২; ৬।৬০; নারদ ১।১)। বস্তুত ভগবান্ যে একখানা সংস্কৃত বই লিখিয়া উহা মনুকে কণ্ঠস্থ করাইয়া দিয়াছিলেন, এ কথা

নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়। মনুর অন্তরাত্মায় বুঝিয়াছিল যে, অহিংসা এবং সর্ব্বভূতহিতই ধর্ম্ম। এইটুকু ভগবদুপদেশ। তার পর, তিনি নিজের প্রতিভা অনুসারে তাৎকালিক সমাজের উপযোগী করিয়া এমন কতগুলি নিয়ম বাঁধিয়া দিয়াছিলেন, যাহা দ্বারা এই অহিংসা এবং হিত সাধিত হইতে পারে। মনু নিজে নিঃস্বার্থ ধার্মিক ছিলেন, তাই তাঁহার প্রণীত নিয়মগুলি তৎকালীন সমাজের অবিমিশ্র উপকার করিয়াছিল। এখন সমাজ বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। ইদানীন্তন সমাজের জন্য মানবধর্ম্মশাস্ত্র প্রণীত হয় নাই। কিন্তু মন্বাদি ঋষিরা যে ঐশ আদেশ পাইয়াছিলেন, এখনও প্রত্যেক সাধুব্যক্তি সেই আদেশ পান। সে আদেশের স্থান মানুষের অন্তরাত্মা এবং তাহার মূলমন্ত্র অহিংসা ও পরোপকার। যে সকল সামাজিক নিয়ম এই দুইএর অনুকূল, তাহারা ধর্ম্ম; যাহারা প্রতিকূল, তাহারা সর্ব্বথা পরিহর্ত্তব্য। এইরূপ করিলে, অনেকস্থলে শাস্ত্রের অক্ষরার্থ পরিত্যাগ করিতে হয় বটে, কিন্তু শাস্ত্রের মূল তাৎপর্য্য বাহাল থাকে। একমাত্র এইরূপেই স্বাধীনচিন্তা ও শাস্ত্রের সামঞ্জস্য সম্ভব। আমরা বহুশতাব্দী ধরিয়া শাস্ত্রের অক্ষরার্থ লইয়া ব্যস্ত আছি, এখন ঐ অক্ষরার্থ ছাড়িয়া শাস্ত্রের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। ধর্ম্মনির্ণয়ের জন্য অন্তরাত্মার আশ্রয় লইতে হইবে। ধর্ম্মকে স্বাধীন করিতে হইবে। কেন না—

সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখম্।

শ্রীবনমালী বেদান্ততীর্থ।

রাইবনীদুর্গ।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ।

ছেলেবেলায় যার সঙ্গে গলায়-গলায় ভাব—যার সঙ্গে নিত্য খেলাধূলা করিয়া নাম ধরিয়া ডাকিয়া অহোরাত্র তুইমুই করিয়াছি, সে যদি কালে বড়লোক হয়, এই সভ্যতা-ভব্যতার দিনে সকলের সম্মুখে তাহাকে কি বলিয়া সম্বোধন করিব? ব্রজবিহারী বংশীধারীকে হঠাৎ মথুরার সিংহাসনে উপবিষ্ট দেখিয়া শ্রীদামসুদামাদির মনোভাব যেরূপ হইয়াছিল, সে বেয়াদবি মনে স্থান দিলেও এখনকার দিনে পেনাল্‌কোডের আমলে আসিতে হয়। অধিক দিনের কথা নয়, স্বর্গীয় দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার পাঠশালার সহতীর্থ "বলুদাদা"কে প্রৌঢ়বয়সে চিনিয়া এবং তার কর্দ্দমসিক্ত পা-দুখানির প্রতি লক্ষ্য না করিয়া যে সমাদরে তাহাকে আপনার পার্শ্বে বসাইয়াছিলেন, বাঙ্‌লার আধুনিক আব্‌হাওয়ায় সে সহৃদয়তা আর পরিপাক হয় না। তাই একটু ভয়েভয়েই মহাশয়দিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, সেরূপ বিপদে পড়িলে উদ্ধারের উপায় কি?

রাধাচরণকে বাল্যকালে আমরা রাখালবেশে দেখিয়াছি। যমকুঞ্জে তাঁহার কৈশোরের সেই "বুলে বেড়াঞা নাম লইয়া ধাইতে বংশী

বাইয়া”-ভাব, আর জীবনমধ্যাহ্নে প্রধান রাজপুরুষের প্রতিপত্তি এবং তজ্জনিত সহস্র-প্রকারের দায়িত্ব ও উৎকণ্ঠা, এ উভয়ে প্রভেদ বিস্তর। এখন নূতন একটি নামকরণের প্রয়োজন বৈ কি? তাহার গুরুদেব নাম দিয়াছিলেন, অভয়ানন্দগিরি। অতএব পদোন্নতির জয়োচ্চারণকল্পে দেওয়ানবাহাদুর কি রায়বাহাদুর অথবা তদ্রূপ শ্রুতিমধুর আর কিছু একটা-না বলিয়া অতঃপর এই ইতিহাসে রাধাচরণকে আমরা গুরুদত্তনামেই পরিচিত করিব।

গিরিসম্প্রদায়ের যে বেশ, তাই ধারণ করিয়া রাধাচরণ ময়ূরভঞ্জরাজ্যে আসিয়াছিলেন। রাজা চক্রাধিপভঞ্জ নিজে রাজকার্য্যে তেমন মনোনিবেশ করিতেন না। অধিকাংশ সময় তাঁহার জপতপ লইয়া কাটিত। কিন্তু গিরিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে প্রভুপুত্রকে হত্যা করিয়া আলিবর্দ্দি-খাঁ বাঙ্গলার মসনদে বসিয়াছে, সেই অকৃতজ্ঞ আবার হিন্দুমুসলমানের সমান প্রিয় ধর্ম্মরক্ষক মুর্শিদকুলীকে উড়িষ্যা হইতে বিদূরিত করিবার আয়োজন করিতেছে, অধর্ম্মের এই প্রশ্রয়-দান করা তিনি নিতান্ত অবৈধ জ্ঞান করিলেন। দণ্ডদেবাচার্য্যের সহিত তাঁহার প্রীতি ছিল এবং তাঁহারই পরামর্শ ও প্ররোচনায় তিনি বিচক্ষণ মীরহবীবের সহিত সখ্য করিলেন। এখানে বলা আবশ্যক, উড়িষ্যার দেওয়ানকে তিনি ঘুণাক্ষরেও মুর্শিদকুলীর অহিতাকাঙ্ক্ষী বলিয়া জানিতে পারেন নাই। তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস হইয়াছিল, উৎকলে জগন্নাথদেবকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়া রাজা দণ্ডদেবাচার্য্য যে অক্ষয়কীর্ত্তি লাভ করিয়াছিলেন, মুর্শিদকুলী এবং মীর-হবীব তুল্যরূপে তাহার প্রধান সহায় ছিলেন। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি মীরহবীবের সহিত সন্ধিবন্ধনে বদ্ধ হইয়াছিলেন।

পরমহিন্দু ময়ূরভঞ্জপতির দরবারে রাধা-চরণকে সেই সঙ্কটকালে মন্ত্রণাকার্য্যে প্রেরণ করিয়া মীরহবীব এক তীরে দুই শিকার খেলিয়াছিলেন। তাহাতে সফল হইয়াছিলেন কি না, পরবর্ত্তী ঘটনাবলীতে দেখা যাইবে। তবে উদ্দেশ্য তাঁহার সেইরূপ ছিল। রাধাচরণ ওরফে অভয়ানন্দগিরি ক্রমশ ইহা বুঝিতে পারিলেন। মীরহবীবের বাচনিক পরামর্শ এবং পরবর্ত্তী চিঠিপত্রে যে রাজনৈতিক রেখা-পাত হইতেছিল, তাহার তির্য্যগ্‌গতি উপলব্ধি করিতে তাঁহার বেশীদিন লাগিল না। সেই-জন্য প্রথম হইতেই তিনি সাবধান হইতে পারিয়াছিলেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

অভয়ানন্দগিরি ময়ূরভঞ্জরাজ্যের কর্ণধার হইয়া আসিলেন, কিন্তু লোকে বুঝিল—এ ব্যক্তি সন্ন্যাসিফকীর, মহারাজকে যোগবিদ্যা শিখাইতে আসিয়াছে। চক্রাধিপভঞ্জ নিজে চাণক্য-নীতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন না এবং কখন তাহার উপযোগিতাও বুঝিতেন না। অভয়া-নন্দের সহিত পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইলে তাঁহার প্রতীতি হইল, উপস্থিত ক্ষেত্রে মন্ত্রগুপ্তির শুধু যে প্রয়োজন, তাহা নহে, উহা বাস্তবিক সিদ্ধির পথে প্রধান সাধনা। তিনি অতঃপর সাধারণের ভ্রম ভাঙিতে অণুমাত্র ব্যস্ত হইলেন না। যোগবিদ্যার পারদর্শিতাসম্বন্ধে গিরি-মহাশয়ের যে খ্যাতি রটিয়াছিল,—তাহা অটুট রহিল।

অভয়ানন্দ প্রথমে আসিয়া সর্ব্বসাধারণের যেরূপ জল্পনা-কল্পনার বিষয়ীভূত হইয়াছিলেন,

ভিতরের কথা বাহির হইতে না পারায় কিছুদিনের মধ্যে সে সব থামিয়া গেল। অতএব তিনি ইচ্ছামত সর্ব্বদা পদব্রজে বাহির হইয়া রাজ্যের সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে লাগিলেন।

ভ্রমণকালে তিনি কাহাকেও সঙ্গে লইতেন না। তবে তাঁর বিশ্বস্ত অনুচরদের ভিতর কেহ কেহ ২।৪ক্রোশ ব্যবধানে থাকিয়া প্রভুর অনুসরণ করিত। এই অনুচরেরা সংখ্যায় নিতান্ত কম ছিল না। কিন্তু তাহারা লোকালয়ে এবং পাহাড়জঙ্গলে ছড়াইয়া থাকিত বলিয়া কেহ তাহাদের খবর রাখিত না। গিরিমহাশয় ইহাদের প্রতি ভার দিয়াছিলেন - সাহসী এবং বলিষ্ঠ লোক দেখিলেই সৈন্যশ্রেণীভুক্ত করিয়া লইবে। রাজঘাটে যে বিপুল খণ্ডাইৎ ও চুয়াড়বাহিনীর সমাবেশ হইতেছিল, তাহা এইরূপ যত্নসম্ভূত নির্ব্বাচনের ফল।

অভয়ানন্দ সচরাচর গৈরিক বস্ত্র এবং উত্তরীয় ধারণ করিতেন। কিন্তু কখন-কখন ছদ্মবেশে পর্য্যটন করারও তাঁহার প্রয়োজন হইত। রাজঘাটে ইহার ভিতর অনেকবার তাঁহাকে আসিতে হইয়াছে। সেখানে বরাবর তিনি অশ্বারোহী রাজপুতবেশে দর্শন দিয়াছেন। স্বয়ং কল্যাণপণ্ডাও তাঁহাকে চিনিতেন না। ফলত পুরাতন রাজকর্ম্মচারীরা বিস্মিত হইয়া দেখিতেছিলেন যে, ময়ূরভঞ্জপতি নিপুণ সৈন্যাধ্যক্ষের ন্যায় গোড়া বাঁধিয়া সমরোদ্যোগে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইহা কেহ তাঁহার নিকট আশা করিত না।

ক্রমশ।

মুক্তকণ্ঠ।

১

জীবনের শত কাজে বেজে ওঠে তারি মাঝে
কার গান হৃদয়-বীণায়?
কার গান প্রাণ ভরি' রেখেছি সর্ব্বস্ব করি,'
বহিতেছি শোণিতে শিরায়?
কার রূপ, কার স্মৃতি, কার উন্মাদনা-গীতি
পরাণের উপকণ্ঠ ভরি'?
কে দেছে জীবনে জয়, প্রেমেরে মহিমাময়,
কে ক'রেছে আপনা পাশরি?

২

কবে কোন্ শুভক্ষণে সে পশিল মোর মনে
প্রভাতের আলোক যেমন।
তেমনি প্রফুল্লকর, তেমনি সে মনোহর,
জাগাইল পুলক তেমন!

মুদে ছিল অন্ধকারে, শত ফুল একবারে
ফুটিল কি হৃদয়ে আমার ?
হৃদে ধরি' সেই আলো আমি যে বেসেছি ভালো,
এ জীবনে নহে ভুলিবার।

৩

জন্ম জন্ম তারে চাহি, সে বিনা কামনা নাহি,
প্রেম দিয়া গড়িয়াছি তারে।
অন্তরে অন্তরতম সে যে মোর নিরুপম,
তুল তার মিলে না সংসারে।
বিনিময়ে স্বর্গ পাই, তাও আমি নাহি চাই,
সে বিনা যে নন্দন শ্মশান!
তারি হাসি ঊষা হাসে তারি মুখে স্বর্গ ভাসে,
তারি বুকে দেবতার স্থান!

৪

সে নির্ম্মাল্য দেবতার, পবিত্র পরশ তার
বহি আনে ফুলগন্ধী বায়;
বুকে রাখি, শিরে রাখি, সকল অঙ্গেতে মাখি,
তৃপ্তি যেন নাহিক কোথায়!
অণু-পরমাণু তার নহে যেন এ ধরার,
সে ফুটেছে ত্রিদিবের ফুল!
মর্ত্ত্যে সেই মন্দাকিনী, অমৃতের প্রবাহিণী,
আমি মরু তৃষিত আকুল।

৫

সকল স্মরণ-মাঝে তাহারি মূরতি রাজে,
আমি তার নামেতে পাগল;
দেখ না ত চুপে-চুপে, বিশ্বভরা তারি রূপে,
দেখি যেন তারেই কেবল।
নিশ্বাসের মত আছে সে আমার কাছে-কাছে
ভরি' মোর বাহির-অন্তর;
তেমনি অবাধ-গতি, তেমনি সহজ অতি,
আমার সে তেমনি নির্ভর।

শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়।